চিরভাস্বর মহানবী (সা.)

প্রথম খণ্ড

আয়াতুল্লাহ্ জা’ফার সুবহানী

অনুবাদ : মোহাম্মদ মুনীর হোসেন খান

চিরভাস্বর মহানবী (সা.)

মূল: আয়াতুল্লাহ্ জাফার সুবহানী

অনুবাদ: মোহাম্মদ মুনীর হোসেন খান

সম্পাদনা: অধ্যাপক সিরাজুল হক

তত্ত্বাবধানে: শাহাবুদ্দীন দারায়ী

কালচারাল কাউন্সেলর

ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরান দূতাবাস, ঢাকা

প্রকাশকাল : ররিউস সানী- ১৪২৫, জ্যৈষ্ঠ- ১৪১১, জুন- ২০০৪

প্রকাশনায় :

কালচারাল কাউন্সেলরের দফতর

ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরান দূতাবাস

বাড়ী নং ৫৪, সড়ক নং ৮/এ,

ধানমন্ডি আ/এ, ঢাকা- ১২০৯, বাংলাদেশ

প্রচ্ছদ:রফিকউল্লাহ গাযালী

মুদ্রণে:চৌকস প্রিন্টার্স লিঃ

১৩১ ডিআইটি এক্সটেনশন রোড (৪র্থ তলা), ঢাকা- ১০০০

Chira Vashwar Mahanabi (Sm.),Written by: Ayatollah Zafar Sobhani;Translated by: Mohammad Munir Hossain Khan;Edited by: Prof. Shirazul Haque;Supervised by: Shahaboddin Daraei,Cultural Counsellor,Embassy of the Islamic Republic of Iran,Dhaka;Published by: Office of the Cultural Counsellor,Embassy of the Islamic Republic of Iran,Dhaka,Bangladesh;Published on: Rabiuth Thani,1425,Jaishtha,1411,June,2004;

প্রকাশকের কথা

বিস্মিল্লাহির রাহমানির রাহীম

মানব জাতির শ্রেষ্ঠতম পথ প্রদর্শক ইসলামের মহান পয়গাম্বর (সা.)- এর জীবনী সম্পর্কে প্রচুর বই- পুস্তক লেখা হয়েছে, যদিও ইতিহাসের সকল শ্রেষ্ঠ মানবের জীবন তাঁদের শ্রেষ্ঠত্বের কারণে বিরাট ঔজ্জ্বল্যের অধিকারী এবং একই সাথে শিক্ষণীয় গুঢ়তত্ত্ব ও রহস্যে পরিপূর্ণ। তাঁরা যেহেতু সৃষ্টিজগতের এবং সকল মানুষের সেরা, তাঁদের জীবনও ইতিহাসের সোনালী অধ্যায় এবং সৃষ্টিলোকের বিস্ময়কর বীরত্বে পরিপূর্ণ। কিন্তু ইতিহাসের এ মহামানবদের মাঝে কেউই ইসলামের মহান পয়গাম্বর হযরত মুহাম্মদ (সা.)- এর মতো এতখানি ঘটনাব ল, তর ায়িত ও বি বমুখর জীবনের অধিকারী ছিলেন না। অ কেউ এত ত তাঁর পরিবেশে এবং পরে গোটা বি এত গভীর প্রভাব সৃষ্টি করেন নি। তাঁদের মধ্যে কেউই এতখানি অধঃপতিত ও পশ্চাৎপদ সমাজ থেকে এত উন্নত সভ্যতার উন্মেষ ঘটান নি। এ ধরনের মহাপুরুষের জীবন ও ইতিহাস পর্যালোচনা আমাদেরকে অনেক কিছু শিক্ষা দিতে পারে এবং আমাদের চোখের সামনে বিভিন্ন শিক্ষণীয় বিষয় ফুটিয়ে তুলতে পারে। এ দৃষ্টিকোণ থেকেই তাঁর পবিত্র জীবনকে যদি আমরা ইতিহাসের সবচেয়ে তর ব ল বীরত্বের ইতিহাস এবং মানব জাতির ইতিহাসে মানবীয় উন্নতির চূড়ান্ত শিখর বলে আখ্যায়িত করি, তাহলে কোনরূপ অতিরঞ্জিত করা হবে না।

এই গ্রন্থে পয়গাম্বর (আ.)- এর শিক্ষাগত, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক অ নে এবং মানব জাতির হেদায়েতের ক্ষেত্রে নবুওয়াতের পূর্ণা দায়িত্ব পালনের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে অতি উত্তম পন্থায় পর্যাপ্ত পরিমাণে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। সত্যিকার অর্থে এ দেশে আমার অবস্থানকালে এ ধরনের একটি পূর্ণা গ্রন্থের প্রয়োজনীয়তা তীব্রভাবে অনুভব করেছি, যেখানে ইতিহাসের সকল ঘটনা ইসলামের সোনালী যুগের প্রথম স্তরের তথ্যসূত্র ব্যবহার করে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

এ কারণেই মহান আল্লাহ্ তায়ালার তাওফীক-এর সাহায্য নিয়ে এবং একদল সহকর্মীর সহায়তায় কোমের দীনী মাদ্রাসার নেতৃস্থানীয় শিক্ষক, গবেষক ও ইসলামী চিন্তাবিদ হযরত আয়াতুল্লাহ্ জাফার সুবহানীর লেখা 'ফুরুগে আবাদিয়াত' গ্রন্থটি 'চিরভাস্বর মহানবী' নামে অনুবাদ ও প্রকাশের উদ্যোগ নিয়েছি। এই গ্রন্থের বিশ্লেষণগুলো বাংলাদেশের বিজ্ঞ মুসলিম গবেষক ও চিন্তাবিদদের জ ইসলামের রাজনৈতিক ইতিহাস বিশেষ করে মানব জাতির দিক-নির্দেশনার ক্ষেত্রে এই মহান আদর্শের প্রবর্তক ও স্থপতি পয়গাম্বর আকরামের অনুসৃত ভূমিকাকে নতুনভাবে দেখা ও পর্যালোচনার সুযোগ করে দেবে।

সত্যের অনুসারীদের প্রতি সালাম জানাচ্ছি।

শাহাবুদ্দীন দারায়ী

কালচারাল কাউন্সেলর

ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরান দূতাবাস, ঢাকা

১৫ খোরদাদ (ফার্সী), ১৩৮৩

৪ জুন, ২০০৪

লেখকের তৃতীয় সংস্করণের ভূমিকা

বিস্মিল্লাহির রাহমানির রাহীম

ঐতিহাসিক ঘটনাবলী লিপিবদ্ধকরণ ও সেগুলোর ব্যাখ্যা- বিশ্লেষণ

মানব জাতির পথ প্রদর্শক সর্বশ্রেষ্ঠ নেতা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সা.)- এর জীবনী সম্পর্কে এ পর্যন্ত অগণিত গ্রন্থ ও সন্দর্ভ লেখা হয়েছে। এ ব্যাপারে লিখিত গ্রন্থাবলী যদি এক জায়গায় সংগ্রহ করি, তাহলে এগুলোর দ্বারা একটি বিশাল গ্রন্থাগার স্থাপন করা যাবে এবং নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, মহানবী (সা.)- এর মতো আর কোন মনীষী বা মহামানবই ইতিহাস-লেখক এবং উন্নত চিন্তাধারার অধিকারী বুদ্ধিজীবীদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারেন নি। বি র আর কোন মহামানবের ক্ষেত্রে এত গ্রন্থ লেখা হয় নি।

তবে অধিকাংশ গ্রন্থে নিম্নোক্ত দু'টি ক্রুটির যে কোন একটি আছেই। হয় জীবনী গ্রন্থসমূহকে শুধু ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর বিবরণ লিপিবদ্ধকরণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে, যেখানে ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর সঠিক ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ, যুক্তিপূর্ণ মন্তব্য, গভীর অধ্যয়ন ও ব্যাপক গবেষণা করা তো হয়ই নি, এমনকি একদল লেখক ও জীবনচরিত রচয়িতা ইসলামের ইতিহাসে ঘটে যাওয়া গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলীর অন্তর্নিহিত মূল কারণ এবং এগুলোর সুদূরপ্রসারী প্রভাব, পরিণতি ও ফলাফল বর্ণনা করা থেকেও বিরত থেকেছেন।

অথবা ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর বিশ্লেষণধর্মী আলোচনা ও পর্যালোচনা হিসাবে নিছক কতগুলো ভিত্তিহীন ধারণা, প্রমাণবিহীন গবেষণাকর্ম এবং ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর বর্ণনা ও এগুলোর বিবরণের সাথে বিচার- বিশ্লেষণকে মিলিয়ে ফেলা হয়েছে। আর এগুলোকে 'ঐতিহাসিক গবেষণাধর্র্মী গ্রন্থ ' হিসাবে ইসলামের ইতিহাসের আগ্রহী পাঠকবর্গের কাছে উপস্থাপন করা হয়েছে।

জীবনী সংক্রান্ত প্রথম ধরনের গ্রন্থগুলোর ক্ষেত্রে আপত্তি হচ্ছে এই যে,ইতিহাসের মূল লক্ষ্য শুধু বিভিন্ন ঘটনা লেখা ও বর্ণনা করাই নয়;বরং বিশুদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিক তথ্য,সাক্ষ্য- প্রমাণ ও উৎসের ভিত্তিতে অতীতের ঘটনাবলী এবং এগুলোর মূল কারণ ও (সুদূরপ্রসারী)

ফলাফলসমূহের বিবরণ লিপিবদ্ধ করা। এতদর্থে ইতিহাস আসলে সবচেয়ে সমৃদ্ধ তথ্যভাণ্ডার যা পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে আজও স্মৃতি হিসাবে আমাদের কাছে বিদ্যমান রয়েছে। আর মানবতার শ্রেষ্ঠ নেতা হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সা.)- এর জীবনী সংক্রান্ত এ ধরনের ইতিহাস খুব কমই লেখা হয়েছে। অনেক মুসলিম ইতিহাসবিদ ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর মূল পাঠ (Text) রক্ষা করার অজুহাতে (ঐতিহাসিক ঘটনাবলী সংক্রান্ত) যে কোন ধরনের মন্তব্য এবং ব্যাখ্যা- বিশ্লেষণ থেকে বিরত থেকেছেন। অথচ এ ধরনের অজুহাত এ কাজ থেকে বিরত থাকার জ যথেষ্ট নয়। কারণ এ ধরনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সংরক্ষণ করার জ তাঁরা দু'ধরনের গ্রন্থ রচনা করতে পারতেন। এক ধরনের গ্রন্থ তাঁরা ইতিহাসের মূল বিষয়বস্তু বর্ণনা করার জ নির্দিষ্ট করতে পারতেন এবং কোন ধরনের মন্তব্য ও ব্যাখ্যা- বিশ্লেষণ করা থেকে বিরত থাকতেন এবং তাঁরা আরেক ধরনের গ্রন্থে ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর সঠিক ব্যাখ্যা- বিশ্লেষণসহ বর্ণনা করতে পারতেন অথবা একই গ্রন্থে ঐতিহাসিক ঘটনাসমূহ থেকে এতৎসংক্রান্ত ব্যাখ্যা- বিশ্লেষণ ও অভিমতগুলো পৃথকভাবেও লিখতে পারতেন।

যা হোক প্রাচীন যুগের মুসলিম আলেমগণের দ্বারা মহানবী (সা.)- এর বিশ্লেষণধর্মী জীবনচরিত খুব কমই লেখা হয়েছে। কেবল মহানবী (সা.)- এর জীবনী সংক্রান্তই নয়, বরং মন্তব্য ও সূক্ষ্ম আলোচনা ব্যতিরেকেই বিগত শতাব্দীগুলোতে ঘটে যাওয়া ঐতিহাসিক ঘটনাসমূহও (ঐতিহাসিক গ্রন্থসমূহে) লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। তবে হ্যাঁ, প্রথম যিনি বি র লেখক সমাজের সামনে এ পথ উন্মুক্ত করেছেন তিনি হলেন মরক্কোর প্রসিদ্ধ আলেম ইবনে খালদুন।[১] তিনি তাঁর প্রসিদ্ধ 'আল মুকাদ্দামাহ্ ওয়াত তারিখ ' গ্রন্থে বিশ্লেষণধর্মী ইতিহাসশাস্ত্রের গোড়াপত্তন করেন।

জীবনী সংক্রান্ত দ্বিতীয় ধরনের গ্রন্থসমূহে যদিও ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর বিচার- বিশ্লেষণ করা হয়েছে এবং গবেষণা ও পর্যালোচনার ছাপ রয়েছে, তবুও যেহেতু কতিপয় রচয়িতা গবেষণা ও অধ্যয়নের কষ্ট স্বীকার করতে চান নি সেহেতু তাঁরা এ সব গ্রন্থে অনির্ভরযোগ্য দলিল- প্রমাণ এবং অশুদ্ধ বিবরণের ভিত্তিতে বিভিন্ন ঐতিহাসিক ঘটনার বিচার ও বিশ্লেষণ করেছেন। এর ফলে তাঁরা বিস্ময়কর ভুল- ভ্রান্তির শিকার হয়েছেন। প্রাচ্যবিদদের রচিত অধিকাংশ গ্রন্থ যেগুলো কদাচিৎ

সত্য অনুধাবন ও বাস্তবতা উন্মোচন করার জ   রচিত হয়ে থাকে সেগুলোই হচ্ছে এ ধরনের গ্রন্থের প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

উপরিউক্ত ত্রুটিগুলোর দিকে লক্ষ্য রেখেই আমি আমার সামর্থ্য অনুযায়ী এ পুস্তকে এ দু'ধরনের গ্রন্থের যে সব ত্রুটি রয়েছে সেগুলো দূর করার চেষ্টা করেছি।

এ গ্রন্থের বৈশিষ্ট্যসমূহ

ভূমিকায় গ্রন্থের বৈশিষ্ট্য ও শ্রেষ্ঠ দিকগুলো উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই। এটি এমন এক বিষয় যা শ্রদ্ধেয় পাঠকবর্গ গ্রন্থ পাঠ করার মাধ্যমেই অনুধাবন করতে পারবেন। তবে পাঠকবর্গের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জ   এ গ্রন্থের দু'টি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য এখানে উল্লেখ করতে চাই :

প্রথম বৈশিষ্ট্য : এ গ্রন্থে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা এবং যে সব ঘটনা অত্যধিক শিক্ষণীয় সেগুলোই কেবল আলোচনা করেছি এবং অনেক সময় সারীয়ার [মুসলমানদের ঐ সব যুদ্ধকে বলা হয় যেগুলোয় মহানবী (সা.) উপস্থিত ছিলেন না]   ায় খুঁটিনাটি ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ দান করা থেকে বিরত থেকেছি। আমরা ইসলামের ইতিহাসের গৌরবোজ্জ্বল শতাব্দীগুলোতে রচিত নির্ভরযোগ্য অকাট্য ঐতিহাসিক উৎস থেকে সকল ঐতিহাসিক ঘটনা গ্রহণ ও বর্ণনা করেছি। আমরা ঘটনাসমূহের বিবরণ দানকালে আমাদের হাতে যে সব তথ্য ও প্রমাণ বিদ্যমান ছিল সেগুলোর শরণাপন্ন হয়েছি এবং আমরা এ সব তথ্যপ্রমাণের সংক্ষিপ্তসার হিসাবে প্রতিটি ঐতিহাসিক ঘটনা লিপিবদ্ধ করেছি এবং এ সব তথ্যপ্রমাণের মধ্যে যে দু'একটিতে ঘটনার বিশদ বিররণ পাওয়া যায় কেবল সেগুলোর প্রতি ই ি ত করেছি।

সম্ভবত কতিপয় পাঠক ভাবতে পারেন যে, আমার ঐতিহাসিক ঘটনার বিবরণ দানকালে পাদটীকাসমূহে যে সব প্রামাণ্য উৎসের কথা উল্লেখ করেছি কেবল সেগুলোরই শরণাপন্ন হয়েছি, অথচ বাস্তবতা হচ্ছে এর সম্পূর্ণ বিপরীত, বরং যে কোন ঘটনা তা যত ছোটই হোক না কেন তা বর্ণনাকালে যাবতীয় প্রসিদ্ধ ও মৌলিক প্রামাণ্য উৎস ব্যবহার ও অধ্যয়ন করা হয়েছে এবং নিশ্চিত হবার পরই আমরা যাবতীয় প্রামাণ্য তথ্য, সূত্র ও বিবরণের সংক্ষিপ্তসার হিসাবে ঐতিহাসিক ঘটনা বর্ণনা করেছি।

সকল ঐতিহাসিক ঘটনা বর্ণনা করার ক্ষেত্রে যদি এগুলোর যাবতীয় উৎস উল্লেখ করতাম তাহলে গ্রন্থটির এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ প্রমাণপঞ্জি ও তথ্যসূত্রের বিবরণ দ্বারাই ভরে যেত এবং এমতাবস্থায় সকল পাঠকের জ বইটি অধ্যয়ন করা খুবই বিরক্তিকর হয়ে যেত। সুধী পাঠক যাতে এ বই পাঠ করতে গিয়ে বিরক্ত ও ক্লান্ত হয়ে না পড়েন এবং আরেক দিক থেকে বইটির মৌলিকত্ব ও বলিষ্ঠতা বজায় থাকে সেজ প্রমাণপঞ্জি ও তথ্যসমূহ যতটুকু উল্লেখ করা প্রয়োজন ঠিক ততটুকুই আমরা এ বইয়ে উল্লেখ করেছি।

দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য : যে সব আলোচনা ও পর্যালোচনা প্রয়োজনীয় ও অপরিহার্য সেগুলোর ক্ষেত্রে আমরা প্রাচ্যবিদদের আপত্তি এবং কখনো কখনো তাঁদের দুরভিসন্ধিগুলোও উল্লেখকরতঃ তাঁদের যাবতীয় অবৈধ ও অযৌক্তিক সমালোচনার সঠিক জবাব দিয়েছি এবং সবাইকে নিরস্ত করেছি। আর এ বিষয়টি শ্রদ্ধেয় পাঠকবর্গের কাছে যথাস্থানে স্পষ্ট হয়ে যাবে বলে আশা করি।

এই একই কারণে শিয়া ও সুন্নী ঐতিহাসিকদের মধ্যে যে সব ক্ষেত্রে মতপার্থক্য বিদ্যমান রয়েছে সে সব ক্ষেত্রে প্রামাণ্য ঐতিহাসিক তথ্য, সাক্ষ্য ও দলিলের ভিত্তিতে শিয়া ঐতিহাসিকদের দৃষ্টিভি ও অভিমতের বিশুদ্ধতা প্রমাণ করেছি এবং শিয়া দৃষ্টিভি ও অভিমতের সত্যতা ও বিশুদ্ধতা সংক্রান্ত যে কোন ধরনের প্রশ্ন, সন্দেহ ও আপত্তির অপনোদনও করেছি।

এ গ্রন্থটি ইতোমধ্যে ‘দারস-ই আয মাকতাবে ইসলাম’ নামক একটি সমৃদ্ধ গবেষণা-সাময়িকীতে ধারাবাহিকভাবে প্রবন্ধাকারে প্রকাশিত হয়েছে। তবে কতিপয় শ্রদ্ধেয় পাঠকের অনুরোধ পুনর্বিবেচনা করার পর ধারাবাহিক প্রবন্ধগুলো পূর্ণরূপে একটি নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ আকারে আগ্রহী পাঠকবর্গের কাছে পেশ করা হলো। এ ধরনের গ্রন্থ ফার্সী ভাষায়ও খুবই বিরল।

কোম, হাওযা-ই এলমীয়াহ্

জা’ফার সুবহানী

২৬ জামাদিউস সানী, ১৩৯২ হি.

১৫ তীর, ১৩৫১ (ফার্সী সাল)

প্রথম অধ্যায় : আরব উপদ্বীপ : ইসলামী সভ্যতার সূতিকাগার

দক্ষিণ- পশ্চিম এশিয়ায় অবস্থিত আরব ভূখণ্ড একটি বৃহৎ উপদ্বীপ। এর আয়তন ৩০, ০০, ০০০ বর্গ কিলোমিটার অর্থাৎ তা ইরানের প্রায় দ্বিগুণ, ফ্রান্সের ৬ গুণ, ইটালীর ১০ গুণ এবং সুইজারল্যান্ডের ৮০ গুণ বড়।

এ উপদ্বীপটি অসমান্তরাল বা বিশিষ্ট চতুর্ভূজের ায় এবং উত্তরে ফিলিস্তিন ও সিরিয়ার (শামের) মরুভূমি; পূর্বদিকে হীরা, দজলা, ফোরাত ও পারস্য উপসাগর; দক্ষিণে ভারত মহাসাগর ও ওমান সাগর এবং পশ্চিমে লোহিত সাগর দ্বারা বেষ্টিত।

অতএব, পশ্চিম ও দক্ষিণ দিক থেকে আরব উপদ্বীপ সমুদ্র দ্বারা এবং উত্তর ও পূর্ব দিক থেকে মরুভূমি ও পারস্য উপসাগর দ্বারা বেষ্টিত।

সুদূর অতীতকাল থেকেই এ ভূখণ্ডকে তিন ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। যথা : ১. উত্তর- পশ্চিমাঞ্চল যা 'হিজায ' (حجاز) নামে পরিচিত; ২. মধ্য ও পূর্বাঞ্চল যা 'আরব মরুভূমি ' নামে এবং ৩. দক্ষিণাঞ্চল যা 'ইয়েমেন ' (يمن) নামে পরিচিত।

উপদ্বীপের ভিতরে অনেক বড় বড় মরুভূমি এবং তপ্ত ও বসবাসের অযোগ্য বালুকাময় প্রান্তরও আছে। এ ধরনের একটি মরুভূমি হচ্ছে বাদিয়াতুস্ সামাওয়াহ্ (بادية السّماوة) মরুভূমি যা আজ 'নুফূয ' (نفوذ) নামে পরিচিত। পারস্য উপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত আরেকটি বিশাল মরুভূমি আছে যা 'আর রুবুল খালী ' (الربع الخالي) নামে পরিচিত। অতীতে এ সব মরুভূমির একাংশ 'আহকাফ ' (أحقاف) এবং অপর অংশ 'দাহানা ' (دهنا) নামে পরিচিত ছিল।

এ সব মরুভূমির কারণে আরব উপদ্বীপের এক- তৃতীয়াংশ ভূখণ্ড পানি ও উদ্ভিদবিহীন হওয়ায় বসবাসের অযোগ্য। কখনো কখনো বৃষ্টিপাতের কারণে মরুভূমির ভিতর অতি অল্প পানি পাওয়া

যায়। আর এ কারণে কতিপয় আরব গোত্র অল্প সময়ের জ   উট ও চতুষ্পদ পশু চরানোর জ সেখানে নিয়ে যায়।

আরব উপদ্বীপের জলবায়ু ও আবহাওয়া মরুভূমির আবহাওয়া। মধ্যাঞ্চলীয় এলাকাসমূহ অত্যন্ত উষ্ণ ও শুষ্ক এবং সমুদ্র তীরবর্তী এলাকাসমূহের আবহাওয়া আর্দ্র। আর কিছু কিছু এলাকার আবহাওয়া সমভাবাপন্ন। খারাপ আবহাওয়ার দরুন আরব উপদ্বীপের জনসংখ্যা ১, ৫০, ০০, ০০০ (দেড় কোটি)- এর বেশি হবে না।

এখানে একটি পর্বতমালা আছে যা দক্ষিণ থেকে উত্তর পর্যন্ত বিস্তৃত। এর সর্বোচ্চ উচ্চতা হচ্ছে ২৪৭০ মিটার।

প্রাচীনকাল থেকেই স্বর্ণ, রৌপ্য এবং মূল্যবান পাথরসমূহের খনি ছিল আরব উপদ্বীপের প্রাকৃতিক সম্পদ। পশুর মধ্যে উট ও ঘোড়াই সবচেয়ে বেশি পালন করা হতো। আর পাখির মধ্যে কবুতর ও উটপাখিই অ া   পাখির চেয়ে সংখ্যায় বেশি ছিল।

বর্তমানে আরবের আয় ও সম্পদের প্রধান উৎস হচ্ছে খনিজ তেল ও পেট্রোলিয়াম। ‘যাহরান ’ (ظهران) শহর আরব উপদ্বীপের খনিজ তেল ও পেট্রোলিয়ামের কেন্দ্রস্থল। আর এ যাহরান নগরী ইউরোপীয়দের কাছে ‘দাহরান ’ নামে পরিচিত। এ শহরটি আরবের আল আহসা (الأحساء) অঞ্চলে পারস্য উপসাগরের তীরে অবস্থিত।

সম্মানিত পাঠকবর্গ যাতে আরব উপদ্বীপের বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে সঠিকরূপে অবহিত হতে পারেন সেজ   আমরা আরবের তিনটি অঞ্চল সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করব :

১ .হিজায: আরব উপদ্বীপের উত্তর- পশ্চিমাঞ্চল হচ্ছে হিজায যা লোহিত সাগরের তীর দিয়ে ফিলিস্তিন থেকে ইয়েমেন পর্যন্ত বিস্তৃত। হিজায একটি পার্বত্য এলাকা; এর রয়েছে অনুর্বর ও চাষাবাদের অনুপযোগী মরুভূমি এবং প্রচুর প্রস্তরময় ভূমি।

ইতিহাসে হিজায আরবের অ   সকল এলাকার চেয়ে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। কিন্তু এ সুখ্যাতি যে ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতার কারণে তাতে কোন সন্দেহ নেই। আর বর্তমানে যে কাবা কোটি কোটি মুসলমানের ‘কিবলা ’ তা এ হিজায এলাকায় অবস্থিত।

পবিত্র কাবার অবস্থান হিজাযের যে অঞ্চলে তা ইসলামের ব বছর আগে থেকেই আরব ও অনারব জাতিসমূহের কাছে সম্মানিত ছিল। এর সম্মান রক্ষার্থে পবিত্র কাবার নিকটে যুদ্ধ করা নিষিদ্ধ (হারাম) ছিল। আর পবিত্র ধর্ম ইসলামও পবিত্র কাবার জ   সীমারেখা নির্ধারণ ও এর প্রতি যাথাযথ সম্মান প্রদর্শন করেছে।

হিজাযের গুরুত্বপূর্ণ শহরগুলোর মধ্যে পবিত্র মক্কা (مكة), পবিত্র মদীনা (مدينة) ও তায়েফ (طائف) নগরী উল্লেখযোগ্য। অতীতকাল থেকেই হিজাযের দু’টি বন্দর আছে : ১. জেদ্দা (جدة) : পবিত্র মক্কার অধিবাসীরা এটি ব্যবহার করে এবং ২. ইয়ানবূ (ينبوع) : মদীনাবাসীরা তাদের প্রয়োজনের এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ এ বন্দরের মাধ্যমে পূরণ করে থাকে। এ দু’টি বন্দরই লোহিত সাগরের তীরে অবস্থিত।

পবিত্র মক্কা নগরী

পৃথিবীর সবচেয়ে প্রসিদ্ধ শহরসমূহের একটি হচ্ছে এ মক্কা নগরী। এ নগরী হিজাযের সবচেয়ে জনব ল শহর। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে এর উচ্চতা প্রায় ৩০০ মিটার।

যেহেতু পবিত্র মক্কা নগরী দু’পর্বতমালার মাঝে অবস্থিত সেহেতু দূর থেকে এ নগরী দৃষ্টিগোচর হয় না। বর্তমানে মক্কা নগরীর লোকসংখ্যা প্রায় দেড় লক্ষ (১, ৫০, ০০০)।

পবিত্র মক্কার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

মক্কা নগরীর ইতিহাস হযরত ইবরাহীম (আ.)- এর যুগ থেকে শুরু হয়েছে। তিনি তাঁর সন্তান ইসমাঈলকে মা হাজেরার সাথে মক্কায় বসবাসের জ পাঠিয়ে দেন। হযরত ইসমাঈল (আ.) মক্কার আশে- পাশে বসবাসকারী গোত্রসমূহের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক গড়ে তুলেছিলেন। হযরত ইবরাহীম (আ.) মহান আল্লাহর নির্দেশে পবিত্র কাবা নির্মাণ করেন। আর কতগুলো বিশুদ্ধ বর্ণনা ও হাদীস অনুযায়ী পবিত্র কাবা- যা ছিল হযরত নূহ (আ.)- এর পুণ্যস্মৃতি তা হযরত ইবরাহীম (আ.) পুনঃনির্মাণ ও সংস্কার করেন। আর এর পর থেকেই মক্কা নগরীতে জনবসতি গড়ে ওঠে।

পবিত্র মক্কা নগরীর চারদিকের ভূমি এতটা লবণাক্ত যে, তা চাষাবাদের অযোগ্য। আর কতিপয় প্রাচ্যবিদের মতে খারাপ ভৌগোলিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এ নগরীসদৃশ স্থান পৃথিবীর কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না।

মদীনা আল মুনাওয়ারাহ্

পবিত্র মক্কা নগরীর উত্তরে এ নগরী অবস্থিত। মক্কা থেকে এ নগরীর দূরত্ব ৯০ ফারসাখ (৫৪০ কি.মি.)। এ নগরীর চারপাশে খেজুর ও অ । ফলের বাগান আছে। মদীনার ভূমি বনায়ন ও চাষাবাদের জ অধিকতর উপযোগী।

প্রাক ইসলামী যুগে এ নগরী 'ইয়াসরিব ' (يثرب) নামে পরিচিত ছিল। মহানবী (সা.)- এর হিজরতের পর এ নগরীর নামকরণ করা হয় 'মদীনাতুর রাসূল ' (مدينة الرّسول) অর্থাৎ রাসূলের নগরী; পরে সংক্ষেপ করার জ এর নামের শেষাংশ বাদ দেয়া হলে এ নগরী 'মদীনা ' নামে অভিহিত হয়। ইতিহাস পাঠে জানা যায় যে, প্রথম যারা এ নগরীতে বসতি স্থাপন করেছিল তারা আমালিকাহ্ (عمالقة) গোত্রীয় ছিল। এদের পর এখানে ইয়া দী, আওস (أوس) ও খাযরাজ (خزرج) গোত্র বসতি স্থাপন করে। আওস ও খাযরাজ গোত্র মুসলমানদের কাছে 'আনসার ' (أنصار) নামে পরিচিত।

একমাত্র হিজায এলাকাই অ সকল এলাকার বিপরীতে বহিরাগত বিজেতাদের হাত থেকে সুরক্ষিত ছিল। তৎকালীন বি র দু'পরাশক্তি পারস্য ও রোমান সাম্রাজ্যের সভ্যতার নিদর্শন হিজাযে দেখা যায় না। কারণ হিজাযের অনুর্বর ও বসবাসের অযোগ্য ভূমিসমূহ বিজেতাদের কাছে মূল্যবান ও গুরুত্বপূর্ণ না হওয়ায় তারা সেখানে কোন সেনা অভিযান পরিচালনা করে নি। আর অত্র এলাকায় আধিপত্য প্রতিষ্ঠার অনিবার্য পরিণতি হচ্ছে যে, হাজারো সমস্যা ও প্রতিকূলতা দেখা দেয়ার পর তাদেরকে অবশ্যই ব্যর্থ হয়ে ফিরে যেতে হবে।

এতৎসংক্রান্ত একটি গল্প প্রচলিত আছে। এ গল্পটি ডিওডোরাস (ديودور) বর্ণনা করেছেন : গ্রীক সেনাপতি ডিমিত্রিউস্ যখন আরব উপদ্বীপ দখল করার জ পেট্রা নগরীতে (হিজাযের একটি প্রাচীন নগরী) প্রবেশ করেন তখন সেখানকার অধিবাসীরা তাঁকে বলেছিল, "হে গ্রীক সেনাপতি!

আপনি কেন আমাদের সাথে যুদ্ধ করতে চান? আমরা বালুকাময় অঞ্চলের অধিবাসী যা জীবনযাপনের সব ধরনের উপায়- উপকরণ থেকে বঞ্চিত। যেহেতু আমরা কারো বশ্যতা স্বীকার করতে রাজী নই সেহেতু আমরা জীবনযাপনের জ এ ধরনের শুষ্ক এবং পানি ও উদ্ভিদবিহীন মরুভূমিকেই বেছে নিয়েছি। অতএব, আমাদের যৎসামা উপঢৌকন গ্রহণ করে আমাদের দেশ জয়ের চিন্তা ত্যাগ করুন। আর আপনি যদি আপনার পূর্ব ইচ্ছার ওপর বহাল থাকেন তাহলে আমরা আপনাকে পরিষ্কার জানিয়ে দিতে চাই যে, অচিরেই আপনাকে হাজারো সমস্যা ও বিপদের সম্মুখীন হতে হবে। আপনার জানা থাকা প্রয়োজন যে, ‘নাবতী’রা কখনই তাদের জীবনযাত্রা ত্যাগ করবে না। কয়েকটি পর্যায় অতিক্রম করার পর আপনি কতিপয় নাবতীকে যুদ্ধবন্দী হিসাবে যদি নিজের সাথে নিয়ে যান এরপরও তারা (বন্দীরা) আপনার কোন উপকারে আসবে না। কারণ তারা কুচিন্তা ও কর্কশ আচরণের অধিকারী এবং তারা তাদের জীবনযাত্রা পরিবর্তন করতে মোটেও ইচ্ছুক নয়। ”

গ্রীক সেনাপতি তাদের শান্তিকামী আহ্বানে সাড়া দিয়ে আরব উপদ্বীপে সেনা অভিযান এবং আধিপত্য বিস্তারের পরিকল্পনা বাদ দিয়েছিলেন।[২]

২. **আরব উপদ্বীপের মধ্য ও পূর্বাঞ্চলীয় অংশ**: এ অংশটি আরব মরুভূমি (صحراء العرب) নামে পরিচিত। ‘নজদ ’ (النّجد) এলাকা এ অংশেরই অন্তর্গত এবং তা উচ্চভূমি। এখানে লোকবসতি খুবই কম। আরব উপদ্বীপে সৌদী রাজবংশের আধিপত্য প্রতিষ্ঠার পর তাদের রাজধানী রিয়াদ নগরী আরব উপদ্বীপের অ তম গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে।

৩ .**আরব উপদ্বীপের দক্ষিণ -পশ্চিমাংশ**: যা ইয়েমেন নামে প্রসিদ্ধ। এ ভূখণ্ডের দৈর্ঘ্য উত্তর থেকে দক্ষিণে ৭৫০ কি.মি. এবং পশ্চিম থেকে পূর্বে প্রায় ৪০০ কি.মি.। বর্তমানে এ দেশের আয়তন ৬০, ০০০ বর্গমাইল। কিন্তু অতীতে এর আয়তন এর চেয়েও বেশি ছিল। এ ভূখণ্ডের একটি অংশ বিগত ৫০ বছর ধরে ব্রিটেনের নিয়ন্ত্রণাধীনে ছিল। এ কারণে ইয়েমেনের উত্তর সীমান্ত নজদ এবং দক্ষিণ সীমান্ত এডেন, পশ্চিমে লোহিত সাগর এবং পূর্বে আর রুবুল খালী মরুভূমি।[৩]

ঐতিহাসিক সানা (صنعاء) নগরী ইয়েমেনের অ তম প্রসিদ্ধ নগরী। আর আল হাদীদাহ্ (الحديدة) বন্দর হচ্ছে ইয়েমেনের সবচেয়ে প্রসিদ্ধ বন্দর যা লোহিত সাগরের তীরে অবস্থিত।

ইয়েমেন আরব উপদ্বীপের সবচেয়ে সমৃদ্ধশালী অঞ্চল। এর রয়েছে অত্যুজ্জ্বল সভ্যতা। ইয়েমেন 'তুব্বা ' রাজাদের কেন্দ্রস্থল ছিল। এ তুব্বা রাজবংশ দীর্ঘকাল ইয়েমেন শাসন করেছিল। এ দেশটি ইসলামের অভ্যুদয়ের পূর্বে ব্যবসা- বাণিজ্যের কেন্দ্র ছিল। প্রকৃতপক্ষে ইয়েমেনকে আরব ভূখণ্ডের 'চৌরাস্তার মোড় ' বলে গণ্য করা হতো। ইয়েমেনে অনেক আশ্চর্যজনক স্বর্ণের খনি ছিল। ইয়েমেনের স্বর্ণ, রৌপ্য ও মূল্যবান পাথর বিদেশে রফতানী করা হতো।

ইয়েমেনের প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শনাদি আজও বিদ্যমান। যে যুগে মানব জাতির হাতে ভারী কাজ করার যন্ত্রপাতি ছিল না তখন ইয়েমেনের বুদ্ধিমান জনগোষ্ঠী সাহস করে অত্যন্ত আকর্ষণীয় ও সুউচ্চ অট্টালিকা নির্মাণ করতে সক্ষম হয়েছিল।

ইয়েমেনের সুলতানদের শাসনকর্তৃত্বের কোন প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল না। কিন্তু তাঁরা জ্ঞানী- গুণী ও সুধীজন কর্তৃক প্রণয়নকৃত ও গৃহীত সংবিধান বা শাসনকার্য পরিচালনা করার বিধি- বিধান বাস্তবায়ন করা থেকে বিরত থাকতেন না। তারা কৃষি ও উদ্যান ব্যবস্থাপনায় অ দের চেয়ে অনেক অগ্রসর ছিল। তারা জমি চাষাবাদ এবং ক্ষেত- খামার ও বাগানসমূহে সেচ দেয়া সংক্রান্ত সূক্ষ্ম বিধিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবে তা প্রয়োগ করেছিল। এ কারণে তাদের দেশ ঐ সময় অ তম উন্নত ও সমৃদ্ধ দেশ হিসাবে গণ্য হতো।

প্রসিদ্ধ ফরাসী ইতিহাসবিদ গোস্তাব লোবোঁ ইয়েমেন সম্পর্কে লিখেছেন : "সমগ্র আরব উপদ্বীপ জুড়ে ইয়েমেন অপেক্ষা আর কোন উর্বর ও মনোরম অঞ্চল নেই। "

দ্বাদশ শতাব্দীর ঐতিহাসিক ইদ্রিসী সানা নগরী সম্পর্কে লিখেছেন : "সেখানে আরব উপদ্বীপ ও ইয়েমেনের রাজধানী অবস্থিত। এ নগরীর প্রাসাদ ও অট্টালিকাসমূহ বি খ্যাত। শহরের সাধারণ বাড়ি- ঘরও মসৃণ ও কারুকার্যময় পাথর দ্বারা নির্মিত। "

যে সব আশ্চর্যজনক ঐতিহাসিক নিদর্শন প্রাচ্যবিদ ও প্রত্নতত্ত্ববিদদের সর্বশেষ অনুসন্ধান ও খনন কার্যের দ্বারা আবিস্কৃত হয়েছে তা ইয়েমেনের বিভিন্ন এলাকা, যেমন মারাব, সানা ও বিলকীসে ইয়েমেনের গৌরবোজ্জ্বল অতীতের বিস্ময়কর সভ্যতাকেই প্রমাণ করে।

মারাব শহরে (প্রসিদ্ধ সাবা নগরী) গগনচুম্বী প্রাসাদসমূহের ফটকসমূহ এবং ঐগুলোর খিলান ও তাক স্বর্ণের কারুকার্য দ্বারা সুশোভিত ছিল। এ শহরে প্রচুর স্বর্ণ ও রৌপ্যনির্মিত পাত্র এবং ধাতুনির্মিত খাট ও বিছানা ছিল।[৪]

মারাবের ঐতিহাসিক নিদর্শনাদির অ তম হচ্ছে মারাবের প্রসিদ্ধ বাঁধ যার ধ্বংসাবশেষ আজও বিদ্যমান। এ শহরটি জলোচ্ছ্বাসের দ্বারা বিলুপ্ত হয়ে যায়। এ জলোচ্ছ্বাসের নাম পবিত্র কোরআনে ‘র্আম ’ (عرم) বলা হয়েছে।[৫]

দ্বিতীয় অধ্যায় : প্রাক ইসলামী যুগে আরব জাতি

ইসলাম ধর্মের আবির্ভাবের পূর্বে আরব জাতির অবস্থা জানার জ   নিম্নোক্ত সূত্রসমূহ ব্যবহার করা যেতে পারে :

১. তাওরাত যদিও এতে সকল ধরনের বিকৃতি রয়েছে;

২. মধ্যযুগীয় গ্রীক ও রোমান সাহিত্য ও বিবরণাদি;

৩. মুসলিম পণ্ডিত ব্যক্তিবর্গ কর্তৃক প্রণীত ইসলামের ইতিহাস;

৪. প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধান ও খনন কার্য এবং প্রাচ্যবিদগণের গবেষণার মাধ্যমে প্রাপ্ত প্রাচীন নিদর্শনাদি। আর এগুলো সীমিত পরিসরে হলেও বেশ কিছু অজানা বিষয়ের ওপর থেকে রহস্যের জট খুলেছে।

এ সব সূত্র থাকা সত্ত্বেও আরব জাতির ইতিহাসের অনেক দিক ও বিষয় এখনো অস্পষ্ট থেকে গেছে এবং এমন এক ঐতিহাসিক ধাঁধার রূপ পরিগ্রহ করেছে যা সমাধান করা সম্ভব হচ্ছে না। কিন্তু যেহেতু ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে আরব জাতির অবস্থা কিরূপ ছিল তা অধ্যয়ন আমাদের অত্র গ্রন্থের ভূমিকার জ   অত্যন্ত প্রয়োজনীয় এবং আমাদের প্রকৃত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হচ্ছে মহানবী (সা.)- এর জীবনী বিশ্লেষণ, সেহেতু ইসলামপূর্ব আরব জাতির জীবনের উজ্জ্বল দিকগুলো খুব সংক্ষেপে আমরা এখানে বর্ণনা করব।

নিঃসন্দেহে আরব উপদ্বীপে সুদূর অতীতকাল থেকেই ব গোত্র বসতি স্থাপন করেছে। এ সব গোত্রের মধ্য থেকে কতিপয় গোত্র বিভিন্ন ঘটনাপ্রবাহে ধ্বংস হয়ে গেছে। কিন্তু এ ভূখণ্ডের ইতিহাসে কেবল তিনটি প্রধান গোত্র অ   সকল গোত্রের চেয়ে বেশি খ্যাতি লাভ করেছে। আর এ তিন গোত্র থেকে ব শাখাগোত্রের উৎপত্তি হয়েছিল। এ গোত্র তিনটি হলো :

১. বায়েদাহ্ (بائدة) : বায়েদাহ্ শব্দের অর্থ ধ্বংসপ্রাপ্ত। কারণ এ গোত্র অবাধ্যতা ও পাপাচারের কারণে প্রাকৃতিক দুর্যোগের মাধ্যমে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। সম্ভবত ধ্বংসপ্রাপ্ত গোত্রগুলো আদ ও সামুদ জাতি হয়ে থাকবে- যাদের বর্ণনা পবিত্র কোরআনে ব বার এসেছে।

২. কাহতানিগণ (القحطانيون) : এরা ইয়া'রব বিন কাহতানের বংশধর। এরা আরব ভূখণ্ডের দক্ষিণাঞ্চল অর্থাৎ ইয়েমেনে বসবাস করত। এদেরকেই খাঁটি আরব বলা হয়। আজকের ইয়েমেনের অধিবাসীরা এবং আওস ও খাযরাজ গোত্র যারা ইসলামের আবির্ভাবের শুরুতে মদীনায় বসবাস করত তারা কাহতানেরই বংশধর। কাহতানিগণ অনেক সরকার ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেছিল। তারা ইয়েমেনকে সমৃদ্ধশালী ও আবাদ করার ক্ষেত্রে অনেক অবদান রেখেছে। তারা ব   সভ্যতারও গোড়াপত্তন করেছিল এবং সেগুলোর নিদর্শনাদি আজও বিদ্যমান। তাদের রেখে যাওয়া প্রাচীন শিলালিপিসমূহ বৈজ্ঞানিক নীতিমালার ভিত্তিতে পাঠোদ্ধার করা হচ্ছে। এর ফলে কাহতানীদের ইতিহাস কিছুটা হলেও পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে। ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে আরব জাতির সভ্যতা সম্পর্কে যা কিছু আলোচনা করা হয় আসলে তার সবই এ কাহতানীদের সাথেই সংশ্লিষ্ট এবং এ সভ্যতার বিকাশস্থল হচ্ছে ইয়েমেন।

৩. আদনানিগণ (العدنانيّون) : এরা হযরত ইসমাঈল (আ.)- এর বংশধর। ইসমাঈল (আ.) ছিলেন হযরত ইবরাহীম (আ.)- এর পুত্র। এ গোত্রের উৎসমূল আমরা পরবর্তী আলোচনাসমূহে স্পষ্ট করে দেব। তবে উক্ত আলোচনাসমূহের সারসংক্ষেপ নিম্নরূপ : পুত্র ইসমাঈলকে তাঁর মা হাজেরাসহ পবিত্র মক্কায় পুনর্বাসন করার ব্যাপারে হযরত ইবরাহীম (আ.) আদিষ্ট হন। তিনি ইসমাঈল ও তাঁর মা হাজেরাকে ফিলিস্তিন থেকে একটি গভীর উপত্যকায় নিয়ে আসলেন যা মক্কা নামে অভিহিত। এ উপত্যকা ছিল পানি ও উদ্ভিদবিহীন মরুপ্রান্তর। মহান আল্লাহ্ তাঁদের ওপর করুণা ও রহমতস্বরূপ সেখানে 'যমযম ' ঝরনা সৃষ্টি করে তাঁদের হাতে অর্পণ করেন। ইসমাঈল (আ.) মক্কার অদূরে বসতি স্থাপনকারী জুর ম গোত্রের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন। তিনি অনেক সন্তান- সন্ততি লাভ করেছিলেন। হযরত ইসমাঈলের এ সব বংশধরের একজন

ছিলেন আদনান। কয়েকজন ঊর্ধ্বতন পিতৃপুরুষের মাধ্যমে আদনানের বংশ হযরত ইসমাঈল (আ.)- এর সাথে মিলিত হয়।

আদনানের সন্তান ও বংশধরগণ বিভিন্ন গোত্রে বিভক্ত হয়ে যায়। এ সব গোত্রের মধ্যে যে গোত্রটি সর্বাধিক খ্যাতি লাভ করেছিল তা হলো কুরাইশ গোত্র। আর বনি হাশিম ছিল কুরাইশ গোত্রের অন্তর্ভুক্ত।

হযরত মুহাম্মদ (সা.)- এর যুগে আরব উপদ্বীপ

আরবদের সাধারণ চরিত্র

আরবদের ঐ সকল স্বভাব- চরিত্র এবং সামাজিক রীতি- নীতি তুলে ধরাই এখানে লক্ষ্য যা ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে তাদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। এ সব রীতি- নীতির মধ্যে বেশ কিছু রীতি গোটা আরব জাতির মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল। সার্বিকভাবে আরবদের সাধারণ এবং প্রশংসনীয় বৈশিষ্ট্য নিম্নোক্ত কয়েকটি বাক্যের মাধ্যমে বর্ণনা করা যেতে পারে :

জাহেলীয়াতের যুগে আরবগণ, বিশেষ করে আদনানের বংশধরগণ স্বভাবতঃই দানশীল ও অতিথিপরায়ণ ছিল। তারা কদাচিৎ আমানতের খিয়ানত করত। তারা প্রতিজ্ঞা ভ   করাকে ক্ষমার অযোগ্য পাপ বলে গণ্য করত। তারা আকীদা- বি াসের জ   আত্মোৎসর্গ করতে কু াবোধ করত না। তারা স্পষ্টভাষী ছিল। তাদের মাঝে শক্তিশালী ধী ও স্মরণশক্তিসম্পন্ন এমন ব্যক্তিবর্গ ছিল যারা আরবের কবিতা এবং বক্তৃতাসমূহ ক স্থ করে রেখেছিল। আরবগণ কাব্যচর্চা এবং বক্তৃতায় সে যুগে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেছিল। তাদের সাহস প্রবাদে পরিণত হয়েছিল। তারা অ চালনা এবং তীর নিক্ষেপে সিদ্ধহস্ত ছিল। পলায়ন এবং শত্রুর প্রতি পৃষ্ঠপ্রদর্শনকে তারা মন্দ ও গর্হিত কাজ বলে বিবেচনা করত।

এ সব গুণের পাশাপাশি অনেক চারিত্রিক দোষ তাদেরকে এমনভাবে আষ্টেপৃষ্টে জড়িয়ে ফেলেছিল যে, তাদের সব ধরনের মানবীয় পূর্ণতার দীপ্তি নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল। আর অদৃশ্যলোক থেকে যদি তাদের ওপর করুণা ও দয়ার বাতায়ন উন্মুক্ত করা না হতো তাহলে নিঃসন্দেহে তাদের জীবনপ্রদীপ নির্বাপিত হতো। আপনারা বর্তমানে কোন আদনানী আরবের অস্তিত্বই খুঁজে পেতেন না এবং অতীতের বিলুপ্ত আরব গোত্রসমূহের কাহিনীরই পুনরাবৃত্তি হতো।

একদিকে যোগ্য নেতৃত্বের অভাব ও সঠিক কৃষ্টি- সংস্কৃতির অনুপস্থিতি এবং অ দিকে চরিত্রহীনতা ও কুসংস্কারের ব্যাপক প্রসারের কারণে আরব জাতির জীবন মানবেতর জীবনে পরিণত হয়েছিল। ইতিহাসের পাতা আরবদের পঞ্চাশ বছর ও একশ ’ বছর স্থায়ী যুদ্ধের কাহিনী

ও বিবরণে পূর্ণ। এ সব যুদ্ধ তুচ্ছ বিষয়কে কেন্দ্র করেই সংঘটিত হয়েছে। বিশৃঙ্খলা ও গোলযোগ এবং বিভিন্ন পরিস্থিতিকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে এবং বিদ্রোহীদেরকে দমন করতে সক্ষম কোন শক্তিশালী সরকার ও প্রশাসন না থাকার কারণে আরব জাতি যাযাবর জীবনযাপন করতে বাধ্য হয়েছিল। এর ফলে তারা প্রতি বছর তাদের পশু ও অ সমেত মরুভূমিতে এমন সব এলাকার সন্ধানে ঘুরে বেড়াত যেখানে প্রচুর পানি ও লতাগু র অস্তিত্ব আছে। এ কারণে যেখানেই তারা পানি ও বসতির নিদর্শন দেখতে পেত সেখানেই অবতরণ করে তাঁবু স্থাপন করত। আর যখনই অধিকতর উত্তম কোন স্থানের সন্ধান পেত তখনই সেখানে যাওয়ার জ মরুপ্রান্তর পাড়ি দিত।

তাদের এ যাযাবর জীবনের পেছনে দু'টি কারণ রয়েছে : ১. পানি, জলবায়ু- আবহাওয়া এবং চারণভূমির দিক থেকে আরবের খারাপ ও প্রতিকূল ভৌগোলিক অবস্থা এবং ২. প্রচুর রক্তপাত ও হানাহানি যা তাদেরকে ভ্রমণ ও এক জায়গা ত্যাগ করে অ ত্র গমন করতে বাধ্য করত।

ইসলামপূর্ব আরব জাতি কি সভ্য ছিল?

‘ তামাদ্দুনে ইসলাম ওয়া আরাব ’ গ্রন্থের রচয়িতা জাহেলী যুগের আরব জাতির অবস্থা অধ্যয়ন ও গবেষণা করে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, আরবগণ শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে সভ্য ছিল। আরব ভূখণ্ডের বিভিন্ন স্থানে আরবদের বিদ্যমান বৃহৎ ও উঁচু ইমারতসমূহ এবং সে সময়ের সভ্য জাতিসমূহের সাথে তাদের বাণিজ্যিক সম্পর্ক তাদের সভ্যতা ও সভ্য হওয়ার প্রমাণস্বরূপ। কারণ যে জাতি রোমান জাতির আবির্ভাবের আগে উন্নত শহর ও নগর স্থাপন করেছিল এবং বি র বড় বড় জাতির সাথে যাদের ব্যবসায়িক ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল সে জাতিকে অসভ্য- বর্বর জাতি বলা যায় না।

পুনশ্চ,আরবী সাহিত্য এবং আরবদের একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ভাষার অধিকারী হওয়া তাদের সভ্যতার শিকড় গভীরভাবে প্রোথিত হওয়ারই প্রমাণস্বরূপ। তাই লেখকের বক্তব্য : “আমরা যদি ধরেও নিই যে,আরব উপদ্বীপের প্রাচীন ইতিহাস সম্পর্কে কিছুই জ্ঞাত ছিলাম না,এরপরও আমরা আরব জাতির অসভ্য হওয়া সংক্রান্ত তত্ত্বটি প্রত্যাখ্যান করতে সক্ষম। একটি জাতির ভাষা সংক্রান্ত যে বিধান সে একই বিধান উক্ত জাতির সভ্যতা সম্পর্কেও প্রযোজ্য। উক্ত জাতির সভ্যতা ও ভাষা একই সাথে অস্তিত্ব লাভ করে থাকতে পারে। তবে তার ভিত্তিসমূহ নিঃসন্দেহে অত্যন্ত প্রাচীন এবং সুদূর অতীতকাল থেকে ধীরে ধীরে বিকাশ লাভ করেছে। কোন পূর্বপ্রস্তুতিমূলক পদক্ষেপ ও ভূমিকা ছাড়াই সংশ্লিষ্ট সাহিত্যসহ কোন ভাষার উদ্ভব ও উন্মেষ সম্ভব নয়। অধিকন্তু সভ্য জাতিসমূহের সাথে সম্পর্ক স্থাপন একটি যোগ্যতাসম্পন্ন জাতির ক্ষেত্রে সর্বদা উন্নতি ও প্রগতির কারণ বলে গণ্য।” উপরিউক্ত লেখক ইসলামপূর্ব আরব জাতির একটি উন্নত ও সুদীর্ঘ সভ্যতা প্রমাণ করার জ গ্রন্থের কয়েকটি পৃষ্ঠা বরাদ্দ করেছেন। তাঁর তত্ত্ব তিনটি বিষয়ের ওপর নির্ভরশীল। এগুলো হচ্ছে : ১ .অতি উন্নত একটি ভাষার) আরবী ভাষা (অধিকারী হওয়া, ২ .উন্নত দেশসমূহের সাথে সম্পর্ক স্থাপন এবং ৩ .ইয়েমেনের আশ্চর্যজনক ইমারতসমূহ- যা ি ষ্টের জন্মের

পূর্বে হেরোডোট (Herodote) ও আরটিমিডোর (Artemidor) নামীয় দু’জন প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক এবং মাসউদী ও অ া মুসলিম ঐতিহাসিক বর্ণনা করেছেন।[৬]

আলোচনার অবকাশ নেই যে, আরবের বিভিন্ন অঞ্চলে সীমিত পরিসরে বিভিন্ন সভ্যতা ছিল। তবে লেখক যে সব দলিল-প্রমাণ তাঁর গ্রন্থে উপস্থাপন করেছেন তা থেকে প্রমাণিত হয় না যে, আরবের সর্বত্র সভ্যতা ছিল।

এটি ঠিক যে, সভ্যতার সকল নিদর্শনের সাথেই একটি ভাষার পূর্ণ বিকাশ হয়ে থাকে। তবে আরবী ভাষাকে স্বাধীন-স্বতন্ত্র এবং হি , সুরিয়ানী, আশুরী ও কালদানী ভাষার সাথে সংশ্লিষ্টহীন বলে বি াস করা যায় না। কারণ বিশেষজ্ঞদের সত্যায়ন ও সাক্ষ্য অনুসারে এ সব ভাষা এক সময় একীভূত একক ভাষা ছিল এবং একটি আদি ভাষা থেকে এগুলোর উৎপত্তি হয়েছে। এতদসত্ত্বেও ধারণা করা যায় যে, ইব্রানী (হি) অথবা অ্যাসীরীয় ভাষাসমূহের মাঝেই আরবী ভাষা পূর্ণতা লাভ করেছে। আর পূর্ণতা লাভ করার পর তা স্বাধীন-স্বতন্ত্র ভাষার রূপ পরিগ্রহ করেছে।

নিঃসন্দেহে বি ে র উন্নত জাতিসমূহের সাথে বাণিজ্যিক সম্পর্ক রাখা উন্নতি ও সভ্যতার পরিচায়ক। কিন্তু সমগ্র আরব উপদ্বীপে কি ধরনের বাণিজ্যিক সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল অথবা প্রধানত হিজায অঞ্চলটি কি এ ধরনের সম্পর্ক থেকে বঞ্চিত ছিল? অ দিকে ইরান ও রোম সাম্রাজ্যের সাথে হিজাযের দু’টি সরকার শাসিত অঞ্চলের (হীরা ও গাসসান) সম্পর্ক থেকে আরব জাতির সভ্যতার অস্তিত্ব প্রমাণিত হয় না। কারণ উক্ত সরকারদ্বয় সম্পূর্ণরূপে বিদেশী শক্তির সমর্থন ও মদদে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছিল। আজও আফ্রিকা মহাদেশের অনেক দেশই পাশ্চাত্য দেশসমূহের উপনিবেশ। কিন্তু ঐ সব দেশে প্রকৃত পাশ্চাত্য সভ্যতার কোন নিদর্শনই বিদ্যমান নেই।

তবে ইয়েমেনের সাবা ও মারিব-এর আশ্চর্যজনক সভ্যতাকে অস্বীকার করা যায় না। কারণ তাওরাতে যে বিবরণ রয়েছে তা এবং হেরোডোট ও অ া ঐতিহাসিক যা বর্ণনা করেছেন সেগুলো ছাড়াও প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক মাসউদী মারিব সম্পর্কে লিখেছেন : “সব দিক থেকে মারাব

সুরম্য অট্টালিকা, ছায়াদানকারী বৃক্ষ, প্রবাহমান ঝরনা ও নদী দিয়ে পরিবেষ্টিত ছিল। আর দেশটি এত বড় ছিল যা একজন সামর্থ্যবান অ   ারোহী এক মাসেও তা পাড়ি দিতে পারত না।

আরোহী ও পায়ে হেঁটে ভ্রমণকারী সকল পরিব্রাজক ও মুসাফির যারা এ দেশটির এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত গমন করত তাদের কেউই সূর্যালোক দেখতে পেত না। কারণ রাস্তার দু'পাশ জুড়ে থাকত ঘন ছায়াদানকারী বৃক্ষরাজি। দেশটির সবুজ- শ্যামল শস্যক্ষেত্রসমূহ এবং স্থায়ী রাজকীয় সরকার ও প্রশাসন সমগ্র বি   তখন খুবই প্রসিদ্ধ ছিল।[৭]

সংক্ষেপে এ সব দলিল- প্রমাণের অস্তিত্ব সমগ্র আরব ভূখণ্ড জুড়ে বিরাজমান সভ্যতার অস্তিত্ব প্রমাণ করে না; বিশেষ করে হিজায অঞ্চলে এ ধরনের সভ্যতার কোন অস্তিত্বই বিদ্যমান ছিল না, এমনকি গোস্তাব লোবোঁ এ প্রস   লিখেছেন : "আরব উপদ্বীপ কেবল উত্তরের সীমান্ত এলাকাসমূহ ব্যতীত সকল বৈদেশিক আক্রমণ ও জবরদখল থেকে মুক্ত থেকেছে এবং কোন ব্যক্তি সমগ্র আরব ভূখণ্ড নিজের করায়ত্তে আনতে পারেনি। পারস্য, রোম ও গ্রীসের বড় বড় দিগি জয়ী যাঁরা সে যুগের সমগ্র বি   তছনছ করেছেন তাঁরা আরব উপদ্বীপের প্রতি খুব কমই দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছেন।"[৮]

যদি এ কথা স্বীকার করে নেয়া হয় যে, সমগ্র আরব উপদ্বীপব্যাপী ঐ সকল পৌরাণিক সভ্যতা বাস্তবতার নিকটবর্তী; তারপরেও অবশ্যই বলতে হয় যে, ইসলাম ধর্মের আবির্ভাবের সময় হিজায অঞ্চলে আসলে সভ্যতার কোন নিদর্শনই বিদ্যমান ছিল না। পবিত্র কোরআন এ বিষয়টি উল্লেখ করেছে :

و كنتم على شفا حفرة من النّار فأنقذكم منها

"হে আরব জাতি! (ইসলাম ধর্মে তোমাদের দীক্ষিত ও বি াস স্থাপনের পূর্বে) তোমরা জাহান্নামের আগুনের নিকটে ছিলে। অতঃপর মহান আল্লাহ্ তোমাদেরকে (ইসলামের মাধ্যমে) মুক্তি দিয়েছেন।" (সূরা আলে ইমরান : ১০৩)

ইসলাম ধর্মের আবির্ভাবের পূর্বে আরব জাতির অবস্থা বর্ণনা করে হযরত আলী (আ.)- এর যে সব বক্তব্য আছে সেগুলো হচ্ছে এতৎসংক্রান্ত জীবন্ত দলিল। এ সব বক্তব্য থেকে প্রমাণিত হয়

যে, জীবনযাপন পদ্ধতি, চিন্তামূলক বিচ্যুতি ও নৈতিক অধঃপতনের দিক থেকে আরব জাতি অত্যন্ত দুঃখজনক অবস্থার মধ্যে ছিল। হযরত আলী তাঁর একটি ভাষণে ইসলামপূর্ব আরব জাতির অবস্থা ঠিক এভাবে বর্ণনা করেছেন :

" মহান আল্লাহ্ হযরত মুহাম্মদ (সা.)- কে বি াসীদের ভয় প্রদর্শনকারী ঐশী প্রত্যাদেশ ও গ্রন্থের (আল কোরআন) বি স্ত আমানতদার হিসাবে প্রেরণ করেছেন। হে আরবগণ! তখন তোমরা নিকৃষ্ট ধর্ম পালন ও নিকৃষ্টতম স্থানসমূহে বসবাস করতে। তোমরা প্রস্তরময় স্থান এবং বধির (মারাত্মক বিষধর) সর্পকুলের মাঝে জীবনযাপন করতে (সেগুলো এমন বিষধর সাপ ছিল যা যে কোন প্রকার শব্দে পলায়ন করত না), তোমরা নোংরা লবণাক্ত- কর্দমাক্ত পানি পান করতে, কঠিন খাদ্য (খেজুর বীজের আটা এবং গুঁইসাপ) খেতে, একে অপরের রক্ত ঝরাতে এবং নিজেদের আত্মীয়- স্বজনদের থেকে দূরে থাকতে। তোমাদের মধ্যে মূর্তি ও প্রতিমাপূজার ব্যাপক প্রচলন ছিল। তোমরা কুকর্ম ও পাপ থেকে বিরত থাকতে না। " [৯]

আমরা এখানে আসআদ বিন যুরারার কাহিনী উল্লেখ করব যা হিজাযের অধিবাসীদের জীবনের অনেক দিক উন্মোচন করতে সক্ষম।

মদীনায় বসবাসকারী আওস ও খাযরাজ গোত্রের মধ্যে ব বছর ধরে ধ্বংসাত্মক যুদ্ধের লেলিহান শিখা প্র লিত ছিল। একদিন আসআদ বিন যুরারাহ্ নামক খাযরাজ গোত্রের একজন নেতা মক্কা গমন করল যাতে করে কুরাইশদের আর্থিক ও সামরিক সাহায্য- সহযোগিতা নিয়ে ১০০ বছরের পুরানো শত্রু আওস গোত্রকে পদানত করতে সক্ষম হয়। উতবাহ্ বিন রাবীয়ার সাথে তার পুরানো বন্ধুত্ব থাকার সুবাদে সে উতবার গৃহে গমন করল এবং তার কাছে নিজের মক্কা আগমনের কারণও উল্লেখ করল। সে উতবার কাছে সাহায্য চাইলে তার পুরানো বন্ধু উতবাহ্ তাকে বলল, "আমরা তোমার অনুরোধ ও আহ্বানে ইতিবাচক সাড়া দিতে পারব না। কারণ বর্তমানে আমরা এক অদ্ভুত অভ্যন্তরীণ সমস্যায় জড়িয়ে পড়েছি। আমাদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি আবির্ভূত হয়ে আমাদের উপাস্যদের সম্পর্কে কটুক্তি করছে। সে আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে নির্বোধ ও স্বল্প বুদ্ধির অধিকারী বলে মনে করে এবং মিষ্টি- মধুর ভাষা ব্যবহার করে আমাদের

একদল যুবককে তার নিজের দিকে টেনে নিয়েছে। আর এভাবে আমাদের নিজেদের মাঝে এক গভীর ফাটলের সৃষ্টি হয়েছে। হ র মৌসুম ব্যতীত অ   সময় এ লোকটি শেবে আবু তালিবে (আবু তালিবের গিরিদেশে) বসবাস করে এবং হ র মৌসুমে গিরিদেশ থেকে বের হয়ে হিজরে ইসমাঈলে (কাবা শরীফের কাছে) এসে বসে এবং জনগণকে (হ   উপলক্ষে আগত ব্যক্তিদেরকে) তার ধর্মের প্রতি আহবান জানায়।"

আসআদ অ া   কুরাইশ গোত্রপতির সাথে যোগাযোগ করার আগেই মদীনা প্রত্যাবর্তন করার সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু সে আরবদের সনাতন প্রথা অনুযায়ী কাবাঘর যিয়ারত করতে আগ্রহী হয়। তবে উতবাহ্ তাকে এ ব্যাপারে ভয় দেখিয়েছিল যে, সে তাওয়াফ করার সময় ঐ লোকটির (রাসূলের) কথা শুনবে এবং তার মধ্যে তার প্রভাব বিস্তার করবে। অ দিকে কাবাঘর তাওয়াফ ও যিয়ারত না করে পবিত্র মক্কা নগরী ত্যাগ করাও খুবই অশোভন ও মর্যাদাহানিকর বলে এ সমস্যা সমাধান করার উদ্দেশ্যে উতবাহ্ আসআদকে প্রস্তাব করল সে যেন তাওয়াফ করার সময় কানের ভিতর তুলা দিয়ে রাখে, তাহলে সে ঐ লোকটির কথা শুনতে পাবে না।

আসআদ ধীরে ধীরে মসজিদুল হারামে প্রবেশ করে তাওয়াফ করায় মশগুল হলো। প্রথম তাওয়াফেই তার দৃষ্টি মহানবী (সা.)- এর ওপর নিবদ্ধ হলো। সে দেখতে পেল এক ব্যক্তি হিজরে ইসমাঈলে বসে আছে। কিন্তু মহানবীর কথায় প্রভাবিত হওয়ার ভয়ে সে তাঁর সামনে আসল না। অবশেষে সে তাওয়াফ করার সময় ভাবল, এ কেমন বোকামিপূর্ণ কাজ করছি! আগামীকাল যখন মদীনায় এ ব্যাপারে আমাকে জিজ্ঞাসা করা হবে তখন আমি কি জবাব দেব। তাই আসআদ বুঝতে পারল যে, এ বিষয়ে তথ্য ও জ্ঞান অর্জন করা প্রয়োজন।

আসআদ একটু সামনে এগিয়ে এসে জাহেলী আরবদের চিরাচরিত রীতি অনুযায়ী সালাম দিয়ে বলল, أنعم صباحا "আপনার প্রাতঃকাল ম লময় হোক।" মহানবী (সা.) এর জবাবে বললেন, "আমার প্রভু মহান আল্লাহ্ এর চেয়ে উত্তম সম্ভাষণ ও সালাম অবতীর্ণ করেছেন। আর তা হচ্ছে : سلام عليكم (আপনার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক)।" তখন আসআদ মহানবীর লক্ষ্য ও

উদ্দেশ্যসমূহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করল। মহানবী আসআদের এ প্রশ্নের জবাবে সূরা আনআমের ১৫১ ও ১৫২ নং আয়াত- যা আসলেই জাহেলী আরবদের মন মানসিকতা, আচার- আচরণ ও রীতিসমূহ চিত্রিত করেছে তা পাঠ করলেন। এ দু'আয়াত- যা ১২০ বছর ধরে গৃহযুদ্ধে লিপ্ত একটি জাতির সকল ব্যথা- বেদনা ও দুঃখ- দুর্দশা এবং এর উপশম ও সমাধান সম্বলিত ছিল তা আসআদের দয়ে গভীর প্রভাব বিস্তার করল। এ কারণে সে তৎক্ষণাৎ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করল এবং মহানবীর কাছে আবেদন জানাল- যেন তিনি এক ব্যক্তিকে মুবাল্লিগ হিসাবে মদীনায় প্রেরণ করেন। মহানবী আসআদের অনুরোধে মুসআব ইবনে উমাইরকে পবিত্র কোরআন এবং ইসলামের শিক্ষক হিসাবে মদীনায় প্রেরণ করলেন।

উক্ত আয়াতদ্বয়ের অন্তর্নিহিত বিষয়বস্তু নিয়ে একটু গভীরভাবে চিন্তা করলেই জাহেলী আরবদের অবস্থা সম্পর্কে গবেষণা ও অধ্যয়ন করার আর কোন প্রয়োজন থাকবে না। কারণ এ দু'আয়াত থেকে প্রতীয়মান হয় যে, দীর্ঘদিনের চারিত্রিক ব্যাধিসমূহ জাহেলী আরবদের জীবনকে মকির সম্মুখীন করেছিল। এ কারণে এখানে আয়াতদ্বয়ের আরবী ভা ও এর অনুবাদ সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যাসহ শ্রদ্ধেয় পাঠকবর্গের সামনে তুলে ধরা হলো :

"(হে মুহাম্মদ!) বলে দিন : আমার রিসালাতের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ ব্যাখ্যা করব। আমার রিসালাতের লক্ষ্যসমূহ নিম্নরূপ :

১. আমি শিরক ও মূর্তিপূজার মূলোৎপাটন করার জ প্রেরিত হয়েছি।[১০]

২. আমার কর্মসূচীর শীর্ষে আছে পিতা- মাতার প্রতি সদাচরণ করা।[১১]

৩. আমার ধর্মে দারিদ্র্যের ভয়ে সন্তান হত্যা সবচেয়ে মন্দ কাজ বলে বিবেচিত।[১২]

৪. মানব জাতিকে মন্দ কাজসমূহ থেকে দূরে রাখা এবং সকল প্রকার গুপ্ত ও প্রকাশ্য পাপ ও অ ায় থেকে বিরত রাখার জ প্রেরিত হয়েছি।[১৩]

৫. আমার শরীয়তে অ ায়ভাবে মানব হত্যা ও রক্তপাত ঘটানো সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এগুলো হচ্ছে মহান আল্লাহর নির্দেশ যাতে করে তোমরা চিন্তা- ভাবনা কর।[১৪]

৬. ইয়াতীমের সম্পদ আত্মসাৎ করা হারাম।[১৫]

৭. আমার ধর্মের ভিত্তি   ায়বিচার, এবং ওজনে কম দেয়া হারাম।[১৬]

৮. আমরা কোন ব্যক্তিকে তার সাধ্য ও সামর্থ্যরে ঊর্ধ্বে দায়িত্ব ও কর্তব্য চাপিয়ে দেই না।[১৭]

৯. মানুষের কথাবার্তা ও বক্তব্য- যা হচ্ছে তার সমগ্র মন- মানসিকতার আয়নাস্বরূপ তা সত্যের সমর্থনে ব্যব ত হওয়া আবশ্যক; আর সত্য ব্যতীত অ   কিছু যেন মানুষের ক   ধ্বনিত না হয়, এমনকি সত্য যদি তার ক্ষতিরও কারণ হয়।[১৮]

১০. মহান আল্লাহর সাথে যে সব প্রতিজ্ঞা করেছ তার প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকবে।[১৯]

এগুলো হচ্ছে তোমার   ষ্টার বিধি- নিষেধ ও নির্দেশাবলী যা তোমরা অবশ্যই মেনে চলবে।

এ আয়াতদ্বয়ের অন্তর্নিহিত অর্থ এবং আসআদের সাথে মহানবীর আলোচনাপদ্ধতি থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, এ সব হীন চারিত্রিক ত্রুটি অন্ধকার যুগের আরবদের আপাদমস্তক জুড়ে ছিল। আর এ কারণেই মহানবী (সা.) আসআদের সাথে প্রথম সাক্ষাতেই এ দু'আয়াত তেলাওয়াত করে শুনিয়েছিলেন। আর এভাবে তিনি আসআদকে তাঁর রিসালাতের মহান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ সম্পর্কে অবগত করেছিলেন।[২০]

আরবের ধর্মীয় অবস্থা

যখন হযরত ইবরাহীম (আ.) তাওহীদের পতাকা হিজায অঞ্চলে উ ীন এবং পুত্র ইসমাঈল (আ.)- এর সহায়তায় পবিত্র কাবা পুনঃর্নির্মাণ করলেন তখন একদল লোক তাঁর সাথে যোগ দিয়েছিল এবং তাঁর বরকতময় পবিত্র অস্তিত্বের আলোক প্রভায় অনেক মানুষের অন্তর আলোকিত হয়েছিল। তবে সঠিকভাবে জানা যায় নি যে, স্বর্গীয় ব্যক্তিত্ব হযরত ইবরাহীম (আ.) কতদূর ও কি পরিমাণ তাওহীদী ধর্ম ও মতাদর্শ প্রচার এবং সেখানে তাওহীদবাদী পূজারীদের দৃঢ় সমাজ গঠন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। হযরত আলী (আ.) আরব জাতি ও গোত্রসমূহের ধর্মীয় অবস্থার বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন :

و أهل الأرض يومئذ ملل متفرّقة و الهواء منتشرة و طوائف متشتّتة بين مشبّه لله بخلقه أو ملحد في اسمه أو مشير إلى غيره فهداهم به من الضّلالة و انقذهم من الجهالة

"তখন (অন্ধকার যুগে) আরব জাতি বিভিন্ন ধর্মের অনুসারী ছিল। তাদের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের বিদআত (ধর্ম বহির্ভূত প্রথা) প্রচলিত ছিল এবং তারা বিভিন্ন ধর্মীয় গোষ্ঠীতে বিভক্ত ছিল। একদল লোক মহান আল্লাহকে তাঁর সৃষ্টির সাথে তুলনা করত (এবং মহান আল্লাহর বিভিন্ন অ - প্রত্যে র অস্তিত্বে বি াস করত)। কেউ কেউ মহান আল্লাহর নামের ক্ষেত্রেও হস্তক্ষেপ করত [যেমন মূর্তিপূজকরা লাত (لات) মূর্তির নাম 'আল্লাহ্' শব্দ থেকে এবং প্রতিমা উয্যার (عزّى) নাম নবী 'উযাইর' (عزير) থেকে নিয়েছিল]। আবার কতিপয় ব্যক্তি আল্লাহ্ ব্যতীত অ সত্তার দিকে ইশারা- ইি ত করত; অতঃপর এদের সবাইকে আল্লাহ্ মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)- এর মাধ্যমে সৎ পথের সন্ধান দিলেন- সৎ পথে পরিচালিত করলেন এবং তাদেরকে পথভ্রষ্টতা ও অজ্ঞতা থেকে মুক্তি দিলেন।"[২১]

আরবের চিন্তাশীল শ্রেণীও চাঁদের উপাসনা করত। আরবের প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক কালবী) মৃত্যু ২০৬ হি (.লিখেছেন : বনি মালীহ্ গোত্র (بني مليح) ি নপূজারী ছিল। হিময়ার গোত্র (حمير) সূর্য, কিনানাহ্ গোত্র (كنانة) চাঁদ, তামীম গোত্র (تميم) আলদেবারান (Al-debaran),লাখম গোত্র (لخم) বৃহস্পতি, তাই গোত্র (طي) শুকতারা, কাইস গোত্র(قيس) শে ’ রা নক্ষত্র (Dogstar) এবং আসাদ গোত্র(أسد) বুধ গ্রহের পূজা করত।

কিন্তু নিম্নশ্রেণীর লোক যারা আরবের সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল তারা তাদের গোত্রীয় ও পারিবারিক প্রতিমা ছাড়াও বছরের দিবসসমূহের সংখ্যা অনুসারে ৩৬০টি মূর্তির পূজা করত এবং প্রতিদিনের ঘটনাসমূহকে ঐ ৩৬০টি মূর্তির যে কোন একটির সাথে জড়িত বলে বি াস করত।

হযরত ইবরাহীম (আ.)- এর পরে আমর বিন কুসাই- এর দ্বারা মক্কায় মূর্তিপূজার প্রচলন হয়েছিল। তবে নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, শুরুতে তা ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল না; বরং প্রথম দিকে আরবগণ মূর্তিগুলোকে সুপারিশকারী বলে বি াস করত। এরপর তারা আরো এক ধাপ এগিয়ে এ সব প্রতিমাকে খোদায়ী শক্তির অধিকারী বলে ভাবতে থাকে। যে সব মূর্তি পবিত্র কাবার চারপাশে স্থাপিত ছিল সেগুলো আরবের সকল গোত্রের শ্রদ্ধাভাজন ও আরাধ্য ছিল। তবে গোত্রীয় প্রতিমাসমূহ ছিল কেবল নির্দিষ্ট কোন গোত্র বা দলের কাছেই শ্রদ্ধাভাজন ও পূজনীয়। প্রতিটি গোত্রের প্রতিমা ও মূর্তি যাতে সংরক্ষিত থাকে সেজ তারা প্রতিমাসমূহের জ নির্দিষ্ট স্থান নির্ধারণ করত। মন্দিরসমূহের তদারকির দায়িত্ব উত্তরাধিকারসূত্রে এক প্রজন্ম থেকে অ প্রজন্মের হাতে স্থানান্তর হতো।

পারিবারিক প্রতিমা ও মূর্তিসমূহের পূজা প্রতি দিন- রাত একটি পরিবারের মধ্যে সম্পন্ন হতো। ভ্রমণে যাওয়ার সময় তারা নিজেদের দেহকে পারিবারিক প্রতিমাসমূহের সাথে রগড়াতো। ভ্রমণ অবস্থায় তারা মরুভূমির পাথরসমূহের পূজা করত। যে স্থানেই তারা অবতরণ করত সেখানে চারটি পাথর বাছাই করে এগুলোর মধ্যে সবচেয়ে সুন্দরটিকে নিজের উপাস্য এবং অবশিষ্ট পাথরগুলোকে বেদীর পদমূল হিসাবে গণ্য করত।

মক্কার অধিবাসীদের হারাম শরীফের প্রতি চরম আকর্ষণ ছিল। ভ্রমণের সময় তারা হারামের পাথর সাথে নিয়ে যেত এবং যে স্থানেই তারা যাত্রাবিরতি করত সেখানে তা স্থাপন করে পূজা করত। সম্ভবত এগুলোই ‘আনসাব ’ (أنصاب) হতে পারে যেগুলোকে মসৃণ ও অবয়বহীন পাথর হিসাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। আর এগুলোর বরাবরে আছে ‘আওসান ’ (أوثان) যার অর্থ হচ্ছে আকার- আকৃতি ও নকশাবিশিষ্ট এবং চেঁচে ফেলা হয়েছে এমন পাথর। ‘আসনাম ’ (أصنام) হচ্ছে ঐ সকল প্রতিমা যা স্বর্ণ ও রৌপ্যকে গলিয়ে অথবা কাঠ খোদাই করে তৈরি করা হয়েছে। মূর্তিসমূহের সামনে আরবদের বিনয়াবনত হওয়া আসলে মোটেও আশ্চর্যজনক বিষয় নয়। আরবগণ বি াস করত যে, কোরবানী করার মাধ্যমে এ সব মূর্তির সন্তুষ্টি অর্জন করা সম্ভব। কোরবানী করার পর তারা কোরবানীকৃত পশুর রক্ত প্রতিমার মাথা ও মুখমণ্ডলে মর্দন করত। গুরুত্বপূর্ণ কাজসমূহের ক্ষেত্রে তারা এ সব প্রতিমার সাথে পরামর্শ করত। তারা পরামর্শের জ কতগুলো কাঠ (লাঠি) ব্যবহার করত। এগুলোর একটিতে লেখা থাকত إفعل অর্থাৎ কর; অ টিতে লেখা থাকত لا تفعل (করো না)। এরপর তারা হাত বাড়িয়ে দিত, অতঃপর যে লাঠিটি বেরিয়ে আসত তাতে যা লেখা থাকত তদনুসারে তারা কাজ করত।

সংক্ষেপে : মূর্তিপূজা সমগ্র আরবে প্রচলিত হয়ে পড়েছিল। বিভিন্নরূপে তাদের মাঝে এ মূর্তিপূজা অনুপ্রবেশ করেছিল। পবিত্র কাবা জাহেলী আরবদের পূজ্য প্রতিমা ও বিগ্রহের আবাসস্থলে পরিণত হয়েছিল। প্রতিটি গোত্রেরই সেখানে একটি করে মূর্তি ছিল। কা’বাঘরে বিভিন্ন আকার- আকৃতির ৩৬০টির বেশি মূর্তি ছিল, এমনকি ি ষ্টানরাও কাবার স্তম্ভ ও দেয়ালসমূহে হযরত মরিয়ম ও হযরত ঈসা (আ.)- এর চিত্র, ফেরেশতাদের ছবি এবং হযরত ইবরাহীম (আ.)- এর কাহিনী চিত্রিত করে রেখেছিল।

লাত, মানাত ও উয্যা- এ তিন প্রতিমাকে কুরাইশরা আল্লাহর ক া বলে বি াস করত। কুরাইশরা বিশেষভাবে এ তিন প্রতিমার পূজা করত। লাত দেবতাদের মা হিসাবে গণ্য হতো। লাতের মন্দির

তায়েফে অবস্থিত ছিল। এ লাত ছিল সাদা পাথরের মতো। মানাতকে ভাগ্যদেবী ও মৃত্যুর প্রভু বলে বি াস করা হতো। মানাতের মন্দির মক্কা ও মদীনার মধ্যবর্তী একটি স্থানে অবস্থিত ছিল। আবু সুফিয়ান উ দের যুদ্ধের দিবসে লাত ও উয্যার মূর্তি সাথে নিয়ে এসেছিল এবং এগুলোর কাছে সাহায্য চেয়েছিল। কথিত আছে যে, আবু আহীহাহ্ সাঈদ বিন আস নামের এক উমাইয়্যা বংশীয় ব্যক্তি মৃত্যুশয্যায় শায়িত অবস্থায় কাঁদছিল। আবু জাহল তাকে দেখতে গেল। আবু জাহল তাকে জিজ্ঞাসা করেছিল, "এ কান্না কিসের জ ? মৃত্যুকে ভয় করছ, অথচ এর থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার কি কোন উপায় নেই?" সে বলল, "মৃত্যুর ভয়ে কাঁদছি না; বরং আমি ভয় পাচ্ছি যে, আমার মৃত্যুর পর জনগণ উয্যার পূজা করবে না।" তখন আবু জাহল বলল, "তোমার কারণে জনগণ উয্যার পূজা করেনি যে, তোমার মৃত্যুতেও তারা উয্যার পূজা করা থেকে বিরত থাকবে।"[২২]

এ সব মূর্তি ছাড়াও অ া দেবতার পূজা আরবদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। যেমন কুরাইশরা পবিত্র কাবার ভিতরে বাল (هبل) নামের একটি মূর্তি রেখেছিল। প্রতিটি গোত্রের নিজস্ব বিশেষ মূর্তিই ছিল না, বরং প্রতিটি পরিবারেরও গোত্রীয় প্রতিমার পূজা করা ছাড়াও নিজস্ব পারিবারিক প্রতিমা থাকত। নক্ষত্র, চন্দ্র, সূর্য, পাথর, কাঠ, মাটি, খেজুর এবং বিভিন্ন ধরনের মূর্তি প্রতিটি গোত্রের কাছে আরাধ্য ও পূজনীয় ছিল। পবিত্র কাবা ও অ া মন্দিরে রক্ষিত এ সব প্রতিমা বা মূর্তি কুরাইশ ও সকল আরব গোত্রের নিকট পরম শ্রদ্ধেয় ও সম্মানিত ছিল। এগুলোর চারদিকে তারা তাওয়াফ (প্রদক্ষিণ) করত এবং এগুলোর নামে পশু কোরবানী করত। প্রত্যেক গোত্র প্রতি বছর কোন না কোন ব্যক্তিকে আনুষ্ঠানিকতার দ্বারা নির্বাচিত করে তাদের দেবদেবী ও প্রতিমাসমূহের বেদীমূলে কোরবানী করত এবং তার রক্তাক্ত মৃতদেহ বলিদানের স্থানের নিকটেই দাফন করা হতো।

সংক্ষিপ্ত এ বর্ণনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, সমগ্র জাযিরাতুল আরবের (আরব উপদ্বীপের) প্রতিটি গৃহ ও প্রান্তর, এমনকি বাইতুল্লাহ্ অর্থাৎ পবিত্র কাবাও সে যুগে দেবদেবী দিয়ে পরিপূর্ণ ছিল।

কবির ভাষায় :

“ উপাসনাস্থলসমূহ বিরান ধ্বংসপ্রাপ্ত, কাবার পবিত্র অ ন হয়ে গিয়েছিল প্রতিমালয়

তখন জনগণ ছিল মহান ষ্টা থেকে বিমুখ- কি সুখে কি দুঃখে সর্বাবস্থায়। ”

এ সব অর্থহীন প্রতিমা ও দেবদেবীর পূজা করার ফলে আরবে দ্বন্দ্ব- সংঘাত, যুদ্ধ- বিগ্রহ, মতভেদ, হানাহানি ও হত্যাকাণ্ড বিরাজ করত। আর এর ফলে অসভ্য- বর্বর মরুচারী আরবদের জীবনে নেমে এসেছিল ভয় র দুর্ভাগ্য ও দুর্দশা এবং চরম পার্থিব ও আত্মিক ক্ষতি। হযরত আলী (আ.) তাঁর এক ভাষণে ইসলামপূর্ব আরব জাতির অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন : “মহান আল্লাহ্ হযরত মুহাম্মদ (সা.)- কে রিসালাতের দায়িত্বসহকারে জগদ্বাসীকে ভয় প্রদর্শন করার জ প্রেরণ এবং তাঁকে তাঁর ঐশী বিধি- বিধান ও নির্দেশাবলীর বি স্ত সংরক্ষক হিসাবে নিযুক্ত করেছিলেন। হে আরব জাতি! তখন তোমরা নিকৃষ্টতম ধর্মের অনুসারী ছিলে; তোমরা সর্পকুলের মাঝে শয়ন করতে, ময়লা- আবর্জনাযুক্ত পানি পান করতে এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক ও বন্ধন ছিন্ন করতে, তখন তোমাদের মধ্যে প্রতিমা ও মূর্তিসমূহ প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং তোমাদের আপদমস্তক জুড়ে ছিল পাপ, অ ায় ও অপরাধ।”[২৩]

মৃত্যুর পরবর্তী জীবন সম্পর্কে আরবদের চিন্তা

আরবরা এই দার্শনিক সমস্যাকে ঠিক এভাবে বর্ণনা করেছে : মানবাত্মা মৃত্যুর পর পেঁচাসদৃশ একটি পাখির আকৃতিতে দেহ থেকে বের হয়ে আসে যার নাম 'হামা' (هامة) ও 'সাদা' (صَدَى)। এরপর তা মানুষের নি প্রাণ দেহের পাশে অনবরত অত্যন্ত করুণ স্বরে ও ভয় রভাবে কাঁদতে থাকে। যখন মৃতের আত্মীয়- স্বজনরা ঐ মরদেহকে কবরে শায়িত করে তখন যেভাবে বলা হয়েছে ঠিক সেভাবে তার আত্মা তার সমাধিস্থলে আবাসন গ্রহণ করে সেখানে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে থাকে। কখনো কখনো সন্তান ও বংশধরদের অবস্থা জানার জ তাদের ঘরের ছাদে এসে বসে।

মানুষ যদি অস্বাভাবিকভাবে মৃত্যুবরণ করে তাহলে উক্ত প্রাণীটি (অস্বাভাবিকভাবে মৃত্যুবরণকারী মানুষের আত্মা যা পেঁচাসদৃশ পাখির আকৃতি ধারণ করেছে) অনবরত চিৎকার করে বলতে থাকে, 'আমাকে পান করাও, আমাকে পান করাও' অর্থাৎ আমার হত্যাকারীর রক্তপাত করে আমার তৃষ্ণা নিবারণ কর। আর যতক্ষণ পর্যন্ত হত্যাকারী থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করা না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত তা নীরব হবে না। ঠিক এভাবে সম্মানিত পাঠকবর্গের কাছে প্রকৃত অবস্থা পরিষ্কার হয়ে যাবে এবং তাঁরা অবগত হতে পারবেন যে, প্রাক- ইসলাম যুগে আরব জাতির ইতিহাস এবং ইসলামোত্তর আরব জাতির ইতিহাস আসলে দু'টি সম্পূর্ণ ভিন্ন ইতিহাস।

কারণ প্রাক- ইসলাম অর্থাৎ অন্ধকার যুগে আরবগণ ক াসন্তানকে হত্যা করত এবং তাদেরকে জীবন্ত কবর দিত। অনাথ শিশুদেরকে দয়া- মায়া দেখানো হতো না। লুটতরাজ করা হতো এবং কাঠ ও পাথরের প্রতিমাসমূহের পূজা করা হতো। তখন এক- অদ্বিতীয় আল্লাহর ব্যাপারে বি মাত্র চিন্তা- ভাবনা করা হতো না। (অথচ ইসলামোত্তর যুগে এ সব কুসংস্কার ও কুপ্রথা সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয়ে যায়। তাই ইসলাম ধর্মের আবির্ভাবের পরে আরব জাতির ইতিহাস প্রাক- ইসলাম যুগের আরব জাতির ইতিহাস থেকে সম্পূর্ণ আলাদা)।

সাহিত্য একটি জাতির মন -মানসিকতা প্রকাশকারী দর্পণ

একটি জাতির মন- মানসিকতা ও ধ্যান- ধারণা বিশ্লেষণ করার সর্বোত্তম পন্থা সেই জাতির চিন্তামূলক কর্মসমূহ এবং বংশ পরম্পরায় কথিত ও বর্ণিত গল্প ও কাহিনীসমূহ। কোন জাতি, গোষ্ঠী বা জনপদের সাহিত্য- কর্ম তথা কবিতা, গল্প ও উপকথাসমূহ তাদের চিন্তা ও ধ্যান- ধারণার প্রতিচ্ছবি, কৃষ্টি ও সভ্যতার মাপকাঠি এবং তাদের চিন্তা- পদ্ধতির ওপর আলোকপাতকারী। প্রতিটি জাতির সাহিত্যকর্মসমূহ যেন অংকিত চিত্রের ায় যা পারিবারিক জীবন এবং কতগুলো কোলাহলপূর্ণ প্রাকৃতিক ও সামাজিক দৃশ্য অথবা যুদ্ধ- বিগ্রহের চিত্র বর্ণনা করে।

আরবদের কাব্য এবং তাদের মাঝে প্রচলিত প্রবচনসমূহ অ সব কিছুর চেয়ে বেশি তাদের ইতিহাসের প্রকৃত স্বরূপ উন্মোচন করে। যে ঐতিহাসিক কোন জাতির মন- মানসিকতা এবং ধ্যান- ধারণার সাথে সম্পূর্ণরূপে পরিচিত হতে আগ্রহী তার উচিত যতদূর সম্ভব ঐ জাতির বিভিন্ন চিন্তামূলক কর্ম ও নিদর্শন, যেমন কাব্য, গদ্য, প্রবাদবাক্য, গল্প, লোককাহিনী ও উপকথার প্রতি সবিশেষ দৃষ্টি দেয়া। সৌভাগ্যক্রমে মুসলিম পণ্ডিত ও মনীষিগণ জাহেলী যুগের আরবী সাহিত্য যথাসাধ্য সংরক্ষণ করেছেন।

আবু তাম্মাম হাবিব ইবনে আওস (মৃত্যু ২৩১ হিজরী) যিনি একজন শিয়া সাহিত্যিক হিসাবে গণ্য এবং শিয়া মাজহাবের ইমামদের প্রশংসায় অনেক কবিতা রচনা করেছেন তিনি নিম্নোক্ত দশটি অধ্যায় বা শিরোনামে জাহেলী যুগের আরবী সাহিত্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করেছিলেন। অধ্যায় ও শিরোনামসমূহ হলো :

১. বীরত্ব ও বীরত্বগাথা;

২. শোকগাথা;

৩. গদ্য;

৪. যৌবন উদ্রিক্তকারী গজল (প্রেম ও গীতি কবিতা);

৫. ব্য - বি প এবং বিভিন্ন ব্যক্তি ও গোত্রের তিরস্কার ও নিন্দা;

৬. আপ্যায়ন এবং দানশীলতার উপযোগী কাব্য ও কবিতা;

৭. প্রশংসা গীতি;

৮. জীবনী;

৯. কৌতুক ও সূক্ষ্ম রসাত্মক ঘটনা ও রম্য কথাসমূহ এবং

১০. নারীদের প্রতি নিন্দাসূচক কাব্য।

মুসলিম জ্ঞানী, পণ্ডিত ও সাহিত্যিকগণ সংগৃহীত উক্ত কাব্যসমূহের রচয়িতাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং ব্যব ত শব্দসমূহের বিস্তারিত ব্যাখ্যাসম্বলিত প্রভূত গ্রন্থ রচনা করছেন। আর আবু তাম্মাম হাবিব ইবনে আওস কর্তৃক সংকলিত ও সংগৃহীত কাব্যগ্রন্থটিও বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়েছে যার একটি অংশ সংবাদপত্র ও প্রকাশিত বিষয়াদির অভিধানে উল্লিখিত হয়েছে।[২৪]

জাহেলী আরব সমাজে নারীর মর্যাদা

কবি আবু তাম্মাম হাবিব ইবনে আওস কর্তৃক সংকলিত জাহেলিয়াত যুগের আরব কাব্য গ্রন্থের দশম অধ্যায় তদানীন্তন আরব সমাজে নারীর মর্যাদার প্রকৃত চিত্র উন্মোচন করার একটি উজ্জ্বল প্রামাণ্য দলিল। গ্রন্থটির এই অধ্যায় পাঠ করলে প্রতীয়মান হয় যে, আরব সমাজে নারী এক আশ্চর্যজনক বঞ্চনার শিকার ছিল এবং তারা বেদনাদায়ক জীবনযাপন করত। এ ছাড়াও জাহেলিয়াত যুগের আরবদের নিন্দায় পবিত্র কোরআনের যেসব আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে সেসব আয়াতে তাদের নৈতিক অধঃপতনের বিষয়টি স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে।

পবিত্র কোরআন ক াসন্তান হত্যা করার মতো আরবদের জঘ কাজকে ঠিক এভাবে বর্ণনা করেছে : কিয়ামত দিবস এমনই এক দিবস যে দিবসে যে সব ক াসন্তানকে কবরে জীবন্ত পুঁতে হত্যা করা হয়েছে তাদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে।[২৫] সত্যিই মানুষ নৈতিকভাবে কতটা অধঃপতিত হলে তার নিজ কলিজার টুকরা সন্তানকে বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়ার পর অথবা জন্মগ্রহণ করার পরই মাটির নিচে পুঁতে ফেলতে পারে এবং সন্তানের বুকফাটা করুণ চিৎকারেও তার পাষাণ দয় বি মাত্র বিচলিত হয় না!

সর্বপ্রথম যে গোত্রটি এ জঘ প্রথাটির প্রচলন করেছিল তারা ছিল বনি তামীম গোত্র। ইরাকের শাসনকর্তা নূমান বিন মুনযির বিদ্রোহীদেরকে দমন করার জ এক বিশাল সেনাবাহিনী নিয়ে বিদ্রোহী তামীম গোত্রের ওপর আক্রমণ চালিয়ে সবকিছু ধ্বংস করে দেয়। তামীম গোত্রের যাবতীয় ধন- সম্পদ জব্দ করা হয় এবং নারীদেরকে বন্দী করা হয়। তামীম গোত্রের প্রতিনিধিগণ নূমান বিন মুনযিরের সাথে সাক্ষাৎ করে তাদের নারী এবং ক াসন্তানদেরকে বন্দীদশা থেকে মুক্তি দিয়ে ফেরত দেয়ার আবেদন করে। কিন্তু বন্দিশালায় তামীম গোত্রের কতিপয় যুদ্ধ- বন্দিনীর বিবাহ হয়ে যাওয়ায় নূমান তাদেরকে তাদের পিতা ও পরিবারের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করিয়ে স্বামীদের সাথে বসবাস অথবা স্বামীদের সাথে বৈবাহিক সম্পর্কচ্ছেদ করে নিজেদের মাতৃভূমিতে

প্রত্যাবর্তন করার স্বাধীনতা দেয়। কাইস বিন আসেমের মেয়ে বৈবাহিক সম্পর্ক অর্থাৎ স্বামীর সাথে বসবাস করাকে অগ্রাধিকার দিলে ঐ বৃদ্ধলোকটি অত্যন্ত ব্যথিত হয়। সে ছিল তামীম গোত্রের প্রেরিত প্রতিনিধিদের অ তম। সে এরপর প্রতিজ্ঞা করল যে, এখন থেকে সে তার ক াসন্তানদেরকে তাদের জীবনের ঊষালে ই হত্যা করবে। ধীরে ধীরে এ জঘ প্রথা অনেক গোত্রের মধ্যেই প্রচলিত হয়ে যায়।

কাইস বিন আসেম যখন মহানবী (সা.)- এর নিকট উপস্থিত হয়েছিল তখন একজন আনসার সাহাবী তাকে তার মেয়েদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করেছিল। কাইস জবাবে বলেছিল, "আমি আমার সকল ক াসন্তানকে জীবন্ত দাফন করেছি, কেবল একবার ব্যতীত। আর কখনই এ কাজ করতে গিয়ে আমি একটুও কষ্ট পাই নি। আর সেটি ছিল : একবার আমি সফরে ছিলাম। আমার স্ত্রীর সন্তান প্রসবকাল অতি নিকটবর্তী হয়ে গিয়েছিল। দৈবক্রমে আমার সফর বেশ দীর্ঘায়িত হলো। সফর থেকে প্রত্যাবর্তনের পর আমি আমার স্ত্রীকে সন্তান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। সে আমাকে বলল : কোন কারণে সে মৃত সন্তান প্রসব করেছে। আসলে সে একটি ক াসন্তান প্রসব করেছিল, কিন্তু সে আমার ভয়ে ঐ ক াসন্তানকে জন্মের পর পরই তার বোনদের কাছে রেখেছিল। অনেক বছর কেটে গেলে ঐ মেয়েটি যৌবনে পা দিল, অথচ তখনও আমি জানতাম না যে, আমার একটি মেয়ে আছে। একদিন আমি আমার ঘরে বসে আছি, হঠাৎ একটি মেয়ে ঘরে প্রবেশ করে তার মাকে খোঁজ করতে লাগল। ঐ মেয়েটি ছিল সুন্দরী। তার চুলগুলো বেনী করা ছিল এবং তার গলায় ছিল একটি হার। আমি আমার স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করলাম, এই মেয়েটি কে? তখন তার নয়নযুগল অশ্রুজলে পূর্ণ হয়ে গেল এবং সে বলল : এ তোমার ঐ মেয়ে যখন তুমি সফরে ছিলে তখন তার জন্ম হয়েছিল। কিন্তু আমি তোমার ভয়ে তাকে এতদিন লুকিয়ে রেখেছিলাম। আমার স্ত্রীর এ কথায় আমার নীরব থাকার বিষয়টি এতে আমার সন্তুষ্টি ও মৌন সম্মতি বলেই সে মনে করল। সে ভাবল যে, আমি এ মেয়েকে হত্যা করব না। এ কারণেই আমার স্ত্রী একদিন নিশ্চিন্ত মনে ঘর থেকে বাইরে গেল। আর আমিও যে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম তা পালন করার জ আমার মেয়েকে হাত ধরে দূরবর্তী একটি স্থানে নিয়ে গেলাম। সেখানে আমি একটি

গর্ত খুঁড়তে লাগলাম। গর্ত খোঁড়ার সময় সে আমাকে বার বার জিজ্ঞাসা করেছিল, কেন আমি এ গর্ত খনন করছি? খনন শেষে আমি তার হাত ধরে টেনেহিঁচড়ে গর্তের ভিতরে ফেলে দিলাম এবং তার দেহের ওপর মাটি ফেলতে লাগলাম। তার করুণ আর্তনাদের প্রতি মোটেও ভ্রুক্ষেপ করলাম না। সে কেঁদেই যাচ্ছিল এবং বলছিল : বাবা! আমাকে মাটির নিচে চাপা দিয়ে এখানে একাকী রেখে আমার মায়ের কাছে ফিরে যাবে? আমি তার ওপর মাটি ফেলেই যাচ্ছিলাম এবং তাকে সম্পূর্ণরূপে মাটির মধ্যে জীবন্ত পুঁতেই ফেললাম। হ্যাঁ, কেবল এই একবারই আমার দয় কেঁদেছিল- আমার অন্তর লে- পুড়ে গিয়েছিল।” কাইসের কথা শেষ হলে মহানবী (সা.)- এর দু'চোখ অশ্রুজলে ভরে গিয়েছিল। তিনি বলেছিলেন, “এটি পাষাণ দয়ের কাজ। যে জাতির দয়া- মায়া নেই সে জাতি কখনই মহান আল্লাহর দয়া ও করুণা লাভ করতে পারে না।[২৬]

আরব জাতির মাঝে নারীর সামাজিক অবস্থান

আরব সমাজে নারীদেরকে পণ্যের মতো কেনা- বেচা করা হতো। তারা সব ধরনের ব্যক্তিগত ও সামাজিক অধিকার, এমনকি উত্তরাধিকার থেকেও বঞ্চিত ছিল। আরব বুদ্ধিজীবীরা নারীদেরকে পশু বলে মনে করত। আর এ কারণেই তাদেরকে দৈনন্দিন জীবনের পণ্য- সামগ্রী ও আসবাবপত্রের মধ্যে গণ্য করা হতো। এ ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হয়েই و إنّما أمّهات النّاس أوعية ‘মায়েরা ঘটি- বাটি ও থালা- বাসনের মতো ’ - এ প্রবাদ বাক্যটি আরবদের মধ্যে প্রচলিত হয়ে গিয়েছিল।

প্রধানত দুর্ভিক্ষের ভয়ে এবং কখনো কখনো কলুষতা ও অশূচিতার ভয়ে আরবরা মেয়েদেরকে জন্মগ্রহণের পর পরই হত্যা করে ফেলত। কখনো পাহাড়ের ওপরে তুলে সেখান থেকে নিচে ফেলে দিত এবং কখনো কখনো পানিতে ডুবিয়ে হত্যা করত। আমাদের মহান ঐশী গ্রন্থ যা অমুসলিম প্রাচ্যবিদদের দৃষ্টিতে ন্যূনপক্ষে একটি অবিকৃত ঐতিহাসিক তাত্ত্বিক গ্রন্থ যা এতৎসংক্রান্ত একটি অভিনব কাহিনী বর্ণনা করেছে। পবিত্র কোরআনে বর্ণিত হয়েছে : যখন তাদের কোন এক ব্যক্তিকে ক াসন্তান জন্মগ্রহণের সুসংবাদ দেয়া হতো তখন তার বর্ণ কালো হয়ে যেত এবং বাহ্যত সে যেন তার ক্রোধকে চাপা দিত। আর এই জঘ সংবাদ শোনার কারণে সে (লজ্জায়) তার সম্প্রদায়ের কাছ থেকে পালিয়ে বেড়াত। আর সে জানত না যে, সে কি অপমান ও লাঞ্ছনা সহকারে তার এ নবজাতক ক াসন্তান প্রতিপালন করবে, নাকি তাকে মাটির নিচে জীবন্ত পুঁতে ফেলবে? সত্যিই তাদের ফয়সালা কতই না জঘ !”[২৭]

সবচেয়ে দুঃখজনক ছিল আরবদের বৈবাহিক ব্যবস্থা। পৃথিবীতে এর কোন নজির বিদ্যমান নেই। যেমন আরবদের কাছে স্ত্রীর কোন সুনির্দিষ্ট সংখ্যা ছিল না। স্ত্রীর মোহরানা যাতে আদায় করতে না হয় সেজ তারা স্ত্রীদেরকে নির্যাতন ও উৎপীড়ন করত। কোন মহিলা চারিত্রিক সততার পরিপন্থী কোন কাজ করলেই তার মোহরানা সম্পূর্ণরূপে বাতিল হয়ে যেত। কখনো কখনো আরবরা এ

নিয়মের অপব্যবহার করত। মোহরানা যাতে আদায় করতে না হয় সেজ   তারা নিজেদের স্ত্রীদের ওপর অপবাদ আরোপ করত। পুত্রসন্তানগণ পিতার মৃত্যুর পর বা পিতা তালাক দিলে পিতার স্ত্রীদেরকে নিজের স্ত্রী হিসাবে গ্রহণ করতে পারত এবং এতে কোন অসুবিধা ছিল না। যখন মহিলা তার স্বামী কর্তৃক তালাকপ্রাপ্তা হতো তখন প্রাক্তন তথা প্রথম স্বামীর অনুমতির ওপর তার পুনর্বিবাহ নির্ভর করত। আর কেবল অর্থ প্রদানের মাধ্যমেই প্রথম স্বামীর অনুমতি পাওয়া যেত। উত্তরাধিকারিগণ ঘরের আসবাবপত্রের মতো উত্তরাধিকারসূত্রে মহিলাদের) পিতার স্ত্রীদের (মালিক হতো এবং তাদের মাথার ওপর রোসারী) Scarf (নিক্ষেপ করে উত্তরাধিকারিগণ তাদের নিজ নিজ স্বত্বাধিকার ঘোষণা করত।

ছোট একটি তুলনা

সম্মানিত পাঠকবর্গ যদি ইসলামে নারীর অধিকার লক্ষ্য করেন তাহলে তাঁরা ভালোভাবে উপলব্ধি করতে সক্ষম হবেন যে, নারীর অধিকার সংক্রান্ত এত সব বিধান প্রবর্তন এবং এগুলো সংস্কার ও সংরক্ষণ সংক্রান্ত উদ্যোগ যা মহানবী (সা.) কর্তৃক গৃহীত হয়েছে তা থেকে স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, মহানবী (সা.) সত্যনবী এবং ঐশী জগতের সাথে তাঁর যোগসূত্র ছিল। কারণ পবিত্র কোরআনের ব   আয়াত এবং মহানবী (সা.)- এর অগণিত হাদীসে নারীর অধিকারসমূহের স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে এবং তিনিও তাঁর অনুসারীদেরকে নারীদের প্রতি সদাচরণ ও দয়া প্রদর্শন করার আহবান জানিয়েছেন। এছাড়াও তিনি বিদায় হ   র ভাষণে নারীদের ব্যাপারে পুরুষদেরকে নিম্নোক্ত যে উপদেশ দিয়েছেন তার চেয়ে বড় প্রমাণ আর কি হতে পারে? তিনি বিদায় হ   র ভাষণে বলেছেন,

...أيّها النّاس فإنّ لكم على نسائكم حقّا و لهنّ عليكم حقّا و استوصوا بالنّساء خيرا فإنّهنّ عندكم عوان أطعموهنّ ممّا تأكلون و ألبسوهنّ ممّا تلبسون

“হে লোকসকল! নারীদের ওপর যেমন তোমাদেরকে অধিকার দেয়া হয়েছে, ঠিক ত প তোমাদের ওপরও তাদের অধিকার রয়েছে। তাদের ব্যাপারে তোমরা একে অপরের প্রতি সদাচরণ করার আদেশ দেবে। কারণ তারা (নারীরা) তোমাদের কাজকর্মে তোমাদের

সাহায্যকারী। ...তোমরা যা খাবে তাদেরকে তা খেতে দেবে। আর তোমরা যা পরিধান করবে তাদেরকেও তা- ই পরিধান করতে দেবে। ” [২৮]

আরবদের সাহস ও বীরত্ব

বলা যেতে পারে যে, মানসিকভাবে জাহেলিয়াত যুগের আরবগণ লোভী মানুষের পূর্ণা উপমা ছিল। পার্থিব বস্তুসামগ্রীর প্রতি ছিল তাদের দুর্বার আকর্ষণ। তারা প্রতিটি বস্তু বা বিষয়কেই তার অন্তর্নিহিত লাভ ও উপকারের ভিত্তিতে মূল্যায়ন করত (অর্থাৎ যে জিনিসে যত বেশি লাভ ও উপকার পাওয়া যেত সেটিই তাদের কাছে প্রিয় ও কাম্য হতো)। তারা সর্বদা অ দের চেয়ে নিজেদের এক ধরনের উচ্চমর্যাদা, সম্মান ও শ্রেষ্ঠত্ব আছে বলে বি াস করত। তারা সীমাহীনভাবে স্বাধীন থাকতে ভালবাসত। তাই যে সব বিষয় তাদের স্বাধীনতাকে সীমিত করে দিত তা তারা মোটেও পছন্দ করত না।[২৯]

ইবনে খালদুন আরবদের অবস্থা প্রসে বলেছেন, "স্বভাবপ্রকৃতির দিক থেকে এ জাতিটি অসভ্য, বর্বর এবং লুটতরাজপ্রিয় ছিল। তাদের মধ্যে অসভ্যতা ও বর্বরতার কারণগুলো এতটা গভীরে প্রোথিত ছিল যে সেগুলো যেন তাদের স্বভাব- চরিত্রের অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হয়ে গিয়েছিল। তারা তাদের এ ধরনের অসভ্য স্বভাব- চরিত্রকে বেশ মজা করে উপভোগ করত। কারণ তাদের এই চারিত্রিক বর্বরতা ও অসভ্যতার কারণেই তারা কোন শাসকের শাসন বা আইন- কানুনের আনুগত্য ও সকল ধরনের বাধ্যতামূলক বন্ধন থেকে নিজেদেরকে মুক্ত করতে পারত এবং রাজ্যশাসন নীতির বিরুদ্ধাচরণ করত। আর এটি স্পষ্ট প্রমাণিত যে, এ ধরনের স্বভাব- চরিত্র সভ্যতা ও কৃষ্টির সম্পূর্ণ পরিপন্থী।..."

এরপর তিনি আরো বলেছেন, "তাদের স্বভাবে ছিল লু ন ও দস্যুবৃত্তি। তারা অ দের কাছে যা পেত তা ছিনিয়ে নিত। বর্শা ও তরবারির মাধ্যমেই তাদের জীবিকা নির্বাহ হতো। অে র সম্পদ লু ন করার ক্ষেত্রে তারা কোন সীমারেখার ধার ধারত না, বরং যে কোন সম্পদ ও জীবনযাপনের উপকরণের ওপর দৃষ্টি পড়লেই তারা তা লু ন করত।" [৩০]

আসলে লুটতরাজ ও যুদ্ধ- বিগ্রহ আরবদের নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপারে পরিণত হয়েছিল। কথিত আছে, মহানবী (সা.)- এর কে বেহেশতের সুখ- শান্তির কথা শোনার পর এক আরব বেহেশতে

যুদ্ধ- বিগ্রহের অস্তিত্ব আছে কিনা এ ব্যাপারে প্রশ্ন করেছিল। যখন তাকে এর উত্তরে বলা হলো : না সেখানে যুদ্ধ- বিগ্রহের কোন অস্তিত্ব নেই, তখন সে বলেছিল, "তাহলে বেহেশত থাকলেই বা লাভ কি?" আরব জাতির ইতিহাসে ১৭০০- এর বেশি যুদ্ধের কাহিনী লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। কোন কোন যুদ্ধ ১০০ বছর বা তার চেয়েও বেশি সময় ধরে চলেছে। অর্থাৎ কয়েকটি প্রজন্ম পরস্পর যুদ্ধ- বিগ্রহ করেই কালাতিপাত করেছে। কখনো কখনো অত্যন্ত তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ, রক্তপাত ও হত্যাযজ্ঞ সংঘটিত হয়েছে।[৩১] ইসলামপূর্ব আরব জাতির অ তম ঘটনা হচ্ছে একটি দীর্ঘ যুদ্ধ যা ইতিহাসে 'হারবু দাহিস ওয়া গাবরা ' নামে প্রসিদ্ধ। দাহিস ও গাবরা দু'গোত্রপতির দু'টি ঘোড়ার নাম ছিল। দাহিস বনি আবেস গোত্রের প্রধান কাইস বিন যুহাইরের ঘোড়ার নাম এবং গাবরা ছিল বনি ফিরাযাহ্ গোত্রপতি যাইফার ঘোড়ার নাম। উক্ত গোত্রপতিদ্বয়ের প্রত্যেকেই তার নিজ নিজ ঘোড়াকে অ র ঘোড়া অপেক্ষা অধিকতর তগতিসম্পন্ন বলে মনে করত। অবশেষে তাদের মধ্যে ঘোড়দৌড় প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়; কিন্তু প্রতিযোগিতা শেষ হওয়ার পর প্রত্যেকেই প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হওয়ার দাবি করল। এই তচ্ছু বিষয়কে কেন্দ্র করে একটি হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হলো। নিহতের গোত্রও হত্যাকারী গোত্রের এক ব্যক্তিকে হত্যা করল। কিন্তু ঘটনাটি এখানেই শেষ হলো না, বরং এ হত্যাকাণ্ডকে কেন্দ্র করে দু'বৃহৎ গোত্রের মধ্যে এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের সূচনা হলো যা ৫৬৮ ি ষ্টাব্দ থেকে ৬০৮ ি ষ্টাব্দ পর্যন্ত চলতে থাকে এবং এর ফলে উভয় পক্ষের অগণিত লোক নিহত হয়।[৩২]

জাহেলী যুগের আরবরা বি াস করত যে, রক্ত ছাড়া অ কিছু দিয়ে রক্তকে ধুয়ে সাফ করা যায় না। শানফারা- এর ঘটনা যা একটি উপাখ্যানসদৃশ তা জাহেলী গোত্রপ্রীতির মাত্রার নির্দেশক হতে পারে। সে (শানফারাহ্) বনি সালমান গোত্রের এক ব্যক্তির হাতে লাঞ্ছিত হলে এর প্রতিশোধ গ্রহণের জ উক্ত গোত্রের ১০০ জনকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। অবশেষে দীর্ঘকাল দিগি দিক ঘোরাঘুরি ও চোরাগুপ্তা হামলা চালিয়ে অপমানকারী গোত্রের ৯৯ জনকে হত্যা করে। এরপর একদল দস্যু একটি কূপের কাছে তাকেও হত্যা করে। ব বছর পর নিহত শানফারা- এর হাড় ও মাথার খুলি অপমানকারী গোত্রের শততম ব্যক্তির হত্যার কারণে পর্যবসিত হয়। কাহিনীটি

এরূপ : বনি সালমান গোত্রের এক পথিক সেখান দিয়ে অতিক্রম করছিল। হঠাৎ মরুঝড় মাথার খুলি উড়িয়ে এনে ঐ পথিকটির পায়ে কঠিনভাবে আঘাত করে। ফলে সে পায়ের তীব্র ব্যথায় মৃত্যুমুখে পতিত হয়।[৩৩]

আরব বেদুইনরা রক্তপাত, খুন- খারাবি, লুটতরাজ ও দস্যুবৃত্তিতে এতটা অভ্যস্ত ছিল যে, পরস্পর গর্ব- অহংকার করার সময় তারা অ দের ধন- সম্পদ লু নকে তাদের অ তম গর্ব ও অহংকারের বিষয় বলে গণ্য করত। এক জাহেলী আরব কবি লুটতরাজ করার ক্ষেত্রে নিজ গোত্রের অপারগতা দেখে মনঃক্ষুণ্ন হয়ে আকাঙ্ক্ষা করেছিল :

"হায় যদি সে এ গোত্রের না হয়ে অ কোন গোত্রের হতো যারা অ পৃষ্ঠে আরোহণ করে লুটতরাজ করত।" [৩৪]

এ জাতি সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে এ রকম বলা হয়েছে :

(و كنتم على شفا حفرة من النّار فأنقذكم منها)

"আর তোমরা, হে আরব জাতি! অি কুণ্ডের ধারে ছিলে। মহান আল্লাহ্ তোমাদেরকে তা থেকে পরিত্রাণ দিয়েছেন।" [৩৫]

জাহেলিয়াত যুগের আরবদের সাধারণ চরিত্র

যা হোক অজ্ঞতা, মূর্খতা, সংকীর্ণ জীবনযাত্রা, জীবনযাপনের সঠিক পদ্ধতি ও ব্যবস্থা না থাকা, হিং তা, পাশবিকতা, অলসতা, বেহাল অবস্থা এবং আরো অ া চারিত্রিক দোষ- ত্রুটির ায় বিভিন্ন ধরনের প্রভাব বিস্তারকারী উপাদান আরব উপদ্বীপের সার্বিক পরিবেশ ও পরিস্থিতিকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করে রেখেছিল এবং ধীরে ধীরে তাদের মধ্যে প্রকাশ্যে লজ্জাজনক বিষয়াদি স্বাভাবিক ও বৈধ হয়ে যায়।

লু ন, দস্যুবৃত্তি, জুয়া, সুদ ও মানুষকে বন্দী করা জাহেলী আরবীয় জীবনে ব ল প্রচলিত নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার ছিল। তাদের আরেকটি জঘ কুঅভ্যাস ছিল মদ্যপান। এ ঘৃণ্য অভ্যাসটি জাহেলী আরব সমাজে এতটা বিস্তৃতি লাভ করেছিল যে, তা তাদের ভাগ্য ও জীবনযাত্রার অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হয়েছিল। আরবের কবিরা মদের গুণ এবং মদ্যপান বর্ণনায় তাদের অধিকাংশ কাব্যপ্রতিভা ব্যবহার করত। পানশালা রাতদিন ২৪ ঘণ্টাই উন্মুক্ত থাকত। এগুলোর ছাদের ওপর বিশেষ ধরনের পতাকা উড়ত। ইসলামপূর্ব আরব সমাজে মদের কেনা- বেচার ব্যাপক প্রচলনের কারণে তাদের কাছে ব্যবসা- বাণিজ্য মদ বিক্রির সমার্থক ছিল।

আরবগণ চারিত্রিক নীতিমালাকে ভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করত। যেমন মহানুভবতা, সাহস ও তীব্র আত্মসম্ভ্রমবোধ আরবদের কাছে প্রশংসনীয় ছিল। তবে তাদের দৃষ্টিতে সাহসের অর্থ ছিল যুদ্ধে ব্যাপক হত্যাকাণ্ড ও রক্তপাত ঘটানো। আত্মসম্ভ্রমবোধ তাদের দৃষ্টিতে এমনভাবে ব্যাখ্যা করা হতো যার ফলে ক াসন্তানকে জীবন্ত কবরস্থ করা তাদের সর্বোচ্চ পর্যায়ের আত্মসম্ভ্রমবোধ বলে গণ্য হতো। আরবদের দৃষ্টিতে বি স্ততা ও সংহতি ছিল নিজ গোত্র ও চুক্তিবদ্ধ মিত্র গোত্রগুলোকে সমর্থন করা- তা সত্যই হোক, আর অ ায়ই হোক।[৩৬] তারা মদ, নারী ও যুদ্ধের প্রতি তীব্রভাবে আসক্ত ছিল।

জাহেলিয়াত যুগের আরবগণ কুসংস্কার পূজারী ছিল

পবিত্র কোরআনে মহানবী (সা.)- এর নবুওয়াত ও রিসালাতের পবিত্র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ নাতিদীর্ঘ বাক্যসমূহের মাধ্যমে বর্ণিত হয়েছে (যদিও বাক্যগুলো ছোট, কিন্তু গভীর অর্থ ও তাৎপর্যমণ্ডিত)। ঐ সকল আয়াত যা দৃষ্টি আকর্ষণযোগ্য তন্মধ্যে এ আয়াতটি এখানে উল্লেখ করা হলো :

(و يضع عنهم إصرهم و الأغلال الّتي كانت عليهم)

" তিনি (মহানবী) তাদের থেকে তাদের বোঝা এবং শিকল ও বেড়ী থেকে মুক্ত করেন যা তাদের ওপর (বাঁধা) রয়েছে। " (সূরা আরাফ : ১৫৭)

এখানে অবশ্যই দেখতে হবে যে, যে শিকল ও বেড়ীতে ইসলাম ধর্মের শুভ সূচনালে জাহেলিয়াতের যুগের আরব জাতির হাত ও পা বাঁধা ছিল তা কি? নিঃসন্দেহে এই শিকল ও বেড়ী লৌহ নির্মিত ছিল না, বরং এ সব শিকল ও বেড়ী বলতে কুসংস্কার, অলীক কল্পনা এবং ধ্যান- ধারণাকে বোঝানো হয়েছে যা মানুষের চিন্তাশক্তি ও বিবেকবুদ্ধিকে বাধাগ্রস্ত করে। এ ধরনের বাঁধন যদি মানুষের চিন্তাশক্তির পাখার সাথে বেঁধে দেয়া হয় তাহলে তা লোহার বেড়ী ও শিকল হতে বেশি ক্ষতিকর হবে। কারণ লৌহনির্মিত শিকল কিছুদিন অতিবাহিত হলে বন্দীর হাত ও পা থেকে খুলে নেয়া হয়। আর জেলে বন্দী ব্যক্তিটি সুস্থ চিন্তাধারাসহকারে এবং কুসংস্কার থেকে মুক্ত হয়ে বাস্তব জীবনে প্রত্যাবর্তন করে। কিন্তু অমূলক চিন্তা, ধারণা এবং ভ্রান্ত কল্পনার শিকলে যদি মানুষের বিবেক- বুদ্ধি, আবেগ- অনুভূতি এবং অনুধাবন শক্তি বাঁধা হয়ে যায় তাহলে তা আমৃত্যু তার সাথে থেকেই যেতে পারে এবং তাকে যে কোন ধরনের তৎপরতা ও প্রচেষ্টা, এমনকি তা এ ধরনের বাঁধন খোলার জ ও যদি হয়ে থাকে তা থেকে তাকে বিরত রাখে। মানুষ সুস্থ চিন্তাধারা এবং বিবেক ও জ্ঞানের ছত্রছায়ায় যে কোন ধরনের কঠিন বাঁধন ও শৃঙ্খল ভেঙে ফেলতে সক্ষম। তবে সুস্থ চিন্তাধারা ছাড়া এবং সব ধরনের অলীক ও ভ্রান্ত ধ্যান-

ধারণা থেকে মুক্ত না হলে মানুষের সকল চেষ্টা- প্রচেষ্টা ও কর্মতৎপরতা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে বাধ্য।

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)- এর অ তম গৌরব ও কৃতিত্ব হচ্ছে, তিনি সকল প্রকার কুসংস্কার, অমূলক চিন্তাভাবনা ও অলীক কল্প- কাহিনীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছেন। তিনি মানব জাতির বিবেক- বুদ্ধিকে কুসংস্কারের মরিচা ও ধুলোবালি থেকে ধৌত করে পরিষ্কার- পরিচ্ছন্ন করেছেন। তিনি বলেছেন, "মানুষের চিন্তাশৈলীকে শক্তিশালী করতে এবং সব ধরনের কুসংস্কার, এমনকি যে কুসংস্কার আমার লক্ষ্য অর্জনের পথে সহায়ক সেটিরও বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতেই আমি এসেছি। "

বি র রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, জনগণের ওপর শাসনকর্তৃত্ব চালানো ছাড়া যাদের আর কোন লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে নেই তারা সব সময় যে কোন অবস্থা ও পরিস্থিতিকে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করে; এমনকি প্রাচীন কল্পকাহিনী এবং জাতির কুসংস্কারাচ্ছন্ন আকীদা- বি াস যদি নেতৃত্ব ও শাসনকর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সহায়ক হয় তাহলে তারা তা প্রসার ও প্রচার করতে দ্বিধাবোধ করে না। আর তারা যদি চিন্তাশীল ও যুক্তিবাদীও হয় তাহলেও তারা সাধারণ জনতার ধ্যান- ধারণা ও সংখ্যাগরিষ্ঠের আকীদা- বি াসের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের নামে বিবেক- বুদ্ধির পরিপন্থী ঐ সকল অমূলক কল্প- কাহিনী ও ধ্যান- ধারণাকে সমর্থন করতে থাকে।

তবে মহানবী (সা.) যে সব কুসংস্কারাচ্ছন্ন আকীদা- বি াস তাঁর ও সমাজের জ ক্ষতিকর কেবল সেগুলোর বিরুদ্ধেই সংগ্রাম করেন নি, বরং যে কোন ধরনের আঞ্চলিক কল্প- কাহিনী ও উপাখ্যান অথবা ভিত্তিহীন চিন্তা ও বি াস যা তাঁর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের জ সহায়ক সেটির বিরুদ্ধেও তাঁর সকল শক্তি ও ক্ষমতা নিয়োগ করে সংগ্রাম করেছেন। তিনি সব সময় চেষ্টা করেছেন মানুষ যেন সত্যপূজারী হয়। ভিত্তিহীন কল্প- কাহিনী, উপাখ্যান ও কুসংস্কারের পূজারীতে যেন পরিণত না হয়। এখন উদাহরণস্বরূপ নিম্নোক্ত কাহিনীটি মনোযোগ সহকারে পাঠ করুন :

মহানবী (সা.)- এর এক পুত্রসন্তান মারা গেলেন যাঁর নাম ছিল ইবরাহীম। তিনি পুত্রবিয়োগে শোকাহত ও দুঃখভারাক্রান্ত ছিলেন এবং তাঁর পবিত্র নয়নযুগল থেকে অশ্রু ঝরছিল। ইবরাহীমের মৃত্যুর দিনে সূর্যগ্রহণ হয়েছিল। আরবের কুসংস্কারাচ্ছন্ন ও অলীক কল্প- কাহিনীর পূজারী জাতি সূর্যগ্রহণকে মহানবী (সা.)- এর ওপর আপতিত বিপদের চরম ও বিরাট হওয়ার প্রমাণ বলে মনে করল এবং বলতে লাগল : মহানবী (সা.)- এর পুত্রের মৃত্যুতে সূর্যগ্রহণ হয়েছে। মহানবী (সা.) তাদের এ কথা শুনে বললেন, "চন্দ্র ও সূর্য মহান আল্লাহর অসীম শক্তি ও ক্ষমতার দু'টি বড় নিদর্শন এবং তারা সর্বদা আদেশ পালনকারী। কারো জীবন ও মৃত্যু উপলক্ষে সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণ হয় না। যখনই চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্যগ্রহণ হবে তখন তোমরা সবাই নিদর্শনসমূহের নামায আদায় করবে।" এ কথা বলে তিনি মিম্বার থেকে নিচে নেমে আসলেন এবং উপস্থিত ব্যক্তিবর্গকে সাথে নিয়ে আয়াতের নামায পড়লেন।[৩৭]

মহানবী (সা.)- এর পুত্রের মৃত্যুতে সূর্যগ্রহণ হয়েছে চিন্তা করা যদিও মহানবী (সা.)- এর প্রতি জনগণের আস্থা ও বি াসকে দৃঢ়তর করত এবং পরিণতিতে তাঁর ধর্মের অগ্রগতি ও প্রসারের ক্ষেত্রে সহায়কও হতো, কিন্তু তিনি চান নি এবং সন্তুষ্ট হতে পারেন নি যে, অলীক কল্প- কাহিনীর দ্বারা জনগণের অন্তরে তাঁর স্থান দৃঢ় ও শক্তিশালী হোক। অলীক কল্প- কাহিনী ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে তাঁর সংগ্রাম যার জা ল্যমান দৃষ্টান্ত হচ্ছে মূর্তিপূজা এবং আল্লাহ্ ছাড়া অ   কোন সত্তার উপাস্য হওয়ার বিরুদ্ধে সংগ্রাম। তা কেবল তাঁর রিসালাতের পদ্ধতি ছিল না, বরং তিনি তাঁর জীবনের সব ক'টি পর্বেই, এমনকি তাঁর শৈশবকালেও কুসংস্কার ও ভ্রান্ত আকীদা- বি াসের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছেন।

যে সময় মহানবী (সা.)- এর বয়স ছিল চার বছর এবং মরুভূমিতে দুধ মা হালিমার তত্ত্বাবধানে প্রতিপালিত হচ্ছিলেন তখন তিনি তাঁর দুধ মা হালিমার কাছে তাঁর দু'ভাইয়ের সাথে মরুভূমিতে যাওয়ার ব্যাপারে অনুরোধ করেছিলেন। হালিমা এ ব্যাপার বলেন, "পরের দিন মুহাম্মদকে গোসল দিলাম। তার চুলে তেল ও চোখে সুরমা দিলাম। যাতে করে মরুর শয়তানগুলো তার অনিষ্ট সাধন করতে না পারে সেজ   একটি ইয়েমেনী পাথর সুতায় ভরে তাকে রক্ষা করার জ   তার গলায়

পরিয়ে দিলাম।” মহানবী (সা.) ঐ পাথরটি গলা থেকে খুলে এনে দুধ মা হালিমাকে বললেন, مهلا يا إمّاه، فإنّ معي من يحفظني "মা, শান্ত হোন, আমার আল্লাহ্ সর্বদা আমার সাথে আছেন। তিনি আমার রক্ষাকারী।” [৩৮]

জাহেলিয়াত যুগের আরবদের বিশ্বাসে কুসংস্কার

বিে র সকল জাতি ও সমাজের আকীদা- বি াস ইসলামের সূর্যোদয়ের সময় বিভিন্ন ধরনের কুসংস্কার ও অলীক উপাখ্যান দিয়ে পরিপূর্ণ ছিল। গ্রীক ও সামানীয় অলীক উপাখ্যান ও কল্প- কাহিনীসমূহ সে যুগের সবচেয়ে সভ্য ও উন্নত জাতিসমূহের ওপর প্রভাব বিস্তার করেছিল। এখনও প্রাচ্যের উন্নত জাতিসমূহের মধ্যে অনেক কুসংস্কার বিদ্যমান রয়েছে যা আধুনিক সভ্যতা জনগণের জীবন থেকে দূর করতে পারে নি। জ্ঞান ও কৃষ্টিসমূহের অনুপাতে কল্প- কাহিনী ও কুসংস্কারের প্রসার ও বিলুপ্ত হয়ে থাকে। সমাজ জ্ঞান- বিজ্ঞান ও কৃষ্টি- সংস্কৃতির দৃষ্টিকোণ থেকে যত পশ্চাদপদ ও অনগ্রসর হবে ঠিক সেই অনুপাতে কুসংস্কার ও ভ্রান্ত আকীদা- বি াসও তাদের মধ্যে বৃদ্ধি পাবে।

ইতিহাস আরব উপদ্বীপের অধিবাসীদের প্রচুর কুসংস্কার ও কল্প- কাহিনী লিপিবদ্ধ করেছে। ‘বুলূগুল আরবে ফী মারেফাতি আহওয়ালিল আরাব ’ গ্রন্থের রচয়িতা[৩৯] এ সব কুসংস্কার ও কল্প- কাহিনীর অনেকাংশ কতগুলো কবিতা ও গল্প আকারে ঐ গ্রন্থে সংগ্রহ করেছেন। যে কোন ব্যক্তি এ গ্রন্থ ও অ া গ্রন্থ পাঠ করার পর নানারূপ কুসংস্কারের সাথে পরিচিত হবেন যা জাহেলী আরবদের মন- মস্তিষ্ক ভর্তি করে রেখেছিল। আর এ সব ভিত্তিহীন বিষয়বস্তু ছিল অ া জাতি থেকে আরব জাতির অনগ্রসর ও পশ্চাদপদ হওয়ার কারণ। ইসলাম ধর্মের অগ্রগতির ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় বাধা ছিল ঐ সব কল্প- কাহিনী ও কুসংস্কার।

আর এ কারণেই মহানবী (সা.) তাঁর সকল শক্তি নিয়োগ করে জাহেলিয়াতের নিদর্শনসমূহ যা ছিল বিভিন্ন ধরনের অসার কল্প- কাহিনী, অলীক ধ্যান- ধারণা ও কুসংস্কার তা মূলোৎপাটন করার চেষ্টা করেছেন। মহানবী (সা.) যখন মায়ায ইবনে জাবালকে ইয়েমেনে প্রেরণ করেছিলেন তখন তিনি তাঁকে নির্দেশ দিয়েছিলেন, “হে মায়ায! জনগণের মধ্য থেকে জাহেলিয়াতের সকল চিহ্ন ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন আকীদা- বি াস উচ্ছেদ করবে এবং ইসলামের যাবতীয় প্রথা ও আদর্শ যা

হচ্ছে চিন্তা- ভাবনা এবং গভীর অনুধাবন ও উপলব্ধির দিকে আহবান তা পুনরুজ্জীবিত করবে। ” [৪০]

و أمت امر الجاهلية إلّا ما سنّهُ الإسلام و أظهر أمر الإسلام كلّه صغيره و كبيره

যে আরব জাতির ওপর ব বছর যাবত জাহেলী চিন্তাধারা ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন আকীদা- বি াস প্রভাব বিস্তার করে রেখেছিল তাদের সামনে তিনি এ রকম বলেছিলেন,

كلّ مأثرة في الجاهلية تحت قدمي

“ (ইসলামের আবির্ভাবের সাথে সাথে) সব ধরনের অলীক আচার- অনুষ্ঠান, আকীদা- বি াস, মিথ্যা অহমিকা ও গর্ব বিলুপ্ত হয়ে গেছে এবং তা আমার পদতলে রাখা হলো। ” [৪১]

যাতে করে ইসলাম ধর্মের উচ্চা র তত্ত্বজ্ঞান স্পষ্ট হয়ে যায় সেজ এখানে কতিপয় উদাহরণ পেশ করব :

১. বৃষ্টি বর্ষণের জ আগুন ালানো : আরব উপদ্বীপ বছরের বেশিরভাগ সময়ই শুষ্ক থাকে; সেখানকার অধিবাসীরা বৃষ্টিপাতের জ ‘সালা ’ (سلع) নামের এক প্রকার নিমজাতীয় বৃক্ষের কাঠ এবং ‘ওসর ’ (عشر) নামের অপর একটি ত দহনশীল বৃক্ষের কাঠ একত্র করে সেগুলোকে গরুর লেজের সাথে বেঁধে গরুকে পাহাড়ের চূড়ায় নিয়ে যেত। তারপর ঐ কাঠগুলোতে আগুন ধরিয়ে দিত। ওসর বৃক্ষের কাঠের মধ্যে দগ্ধকারী উপাদান থাকার কারণে ঐ কাঠগুলো থেকে অি স্ফুলি দাউ দাউ করে লে উঠত। আর গরুটি দগ্ধ হওয়ার কারণে ছুটোছুটি ও উচ্চৈঃস্বরে চিৎকার শুরু করত। তারা এ ধরনের কাপুরুষোচিত কাজকে পূর্বপুরুষদের প্রাচীন রীতিনীতির অনুসরণ হিসাবে আকাশের বিদ্যুৎ চমকানি ও বজ্রপাতের সাথে তুলনা করত। তারা অি স্ফুলি কে বিদ্যুৎ এবং গরুর চিৎকারকে বজ্রপাতের শব্দের স্থলে বিবেচনা করত; তারা তাদের এ কাজকে বৃষ্টি বর্ষণে কার্যকর প্রভাব রাখে বলে বি াস করত।

২. যদি গাভী পানি না খেত তাহলে তারা ষাঁড়কে প্রহার করত। পানি পান করানোর জ গাভী ও ষাঁড়গুলোকে পানির নালার ধারে নিয়ে যাওয়া হতো। মাঝে মধ্যে এমন হতো যে, ষাঁড়গুলো পানি খেত, কিন্তু গাভীগুলো পানি স্পর্শও করত না। আরবরা মনে করত যে, গাভীগুলোর পানি পান

করা থেকে বিরত থাকার কারণ হচ্ছে ঐ সব শয়তান যা ষাঁড়ের দু'শিংয়ের মাঝখানে স্থান নিয়েছে এবং গাভীগুলোকে পানি পান করতে দিচ্ছে না। তাই ঐ শয়তানগুলোকে তাড়ানোর জ ষাঁড়ের মাথা ও মুখমণ্ডলে প্রহার করত।[৪২]

৩. নীরোগ উটের মাথায় আগুনের ছ্যাঁকা দেয়া হতো যাতে করে অপরাপর উট সুস্থ হয়ে ওঠে: কোন উট যদি অসুস্থ হয়ে পড়ত অথবা উটের ঠোঁট ও মুখে ক্ষত ও ঠোসা দেখা যেত তাহলে অ া উটের মধ্যে এ রোগের সংক্রমণ রোধ করার জ একটি সুস্থ উটের ঠোঁট, বা ও উরুতে ছ্যাঁকা দেয়া হতো, কিন্তু তাদের এ কাজের কারণ স্পষ্ট নয়। কখনো কখনো ধারণা করা হয় যে, এ ধরনের কাজের রোগ-প্রতিষেধক দিক আছে এবং এটি এক ধরনের বৈজ্ঞানিক চিকিৎসাপদ্ধতিও হতে পারে। কিন্তু যেহেতু অনেক উটের মধ্য থেকে কেবল একটি উটের ওপর এ ধরনের বিপদ নেমে আসত তাই বলা যায় যে, তা এক ধরনের কুসংস্কার।

৪. একটি উটকে কোন কবরের কাছে আটকে রাখা হতো যাতে করে কবরবাসী কিয়ামত দিবসে পদব্রজে (কবর থেকে) উত্থিত না হয় (অর্থাৎ উক্ত উটের ওপর সওয়ার অবস্থায় উত্থিত হয়)।

যদি কোন মহান ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করত তখন ঐ ব্যক্তির কবরের পাশে একটি গর্ত খুঁড়ে তাতে একটি উট আটকে রাখা হতো এবং মৃত্যু পর্যন্ত ঐ উটকে দানা-পানি ও খড়কুটা কিছুই খেতে দেয়া হতো না যাতে করে কিয়ামত দিবসে মৃত ব্যক্তি ঐ উটের ওপর সওয়ার হয় এবং দণ্ডায়মান অবস্থায় তার পুনরুত্থান না হয়।

৫. কবরের পাশে উট জবাই করা হতো। যেহেতু মৃত ব্যক্তি জীবদ্দশায় তার প্রিয় ব্যক্তি ও অতিথিদের জ উট জবাই করত তাই মৃতকে সম্মান ও তার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জ তার আত্মীয়স্বজন তার কবরের কাছে বেদনাদায়কভাবে উট বধ করত।

এ ধরনের কাজ যা যুক্তি ও বৈজ্ঞানিক চিন্তার সাথে মোটেও সংগতিপূর্ণ নয়। কারণ আগুন ালানোর কারণে বৃষ্টিপাত হয় না, ষাঁড়কে প্রহার করলে গাভীর মধ্যে এর কোন প্রভাবই পড়ে না, আর নীরোগ উটকে ছ্যাঁকা দিলে তা রোগাক্রান্ত উটের সুস্থতা ও রোগমুক্তির কারণ হয় না এবং...) পশুগুলোর প্রতি অত্যাচার ছাড়া আর কিছু নয়। আমরা যদি এ সব আচার- আচরণকে ইসলামের সুদৃঢ় বিধিবিধান- যা জীবজন্তু সংরক্ষণ করার ব্যাপারে প্রবর্তিত হয়েছে সেগুলোর সাথে তুলনা করি তাহলে আমাদের বলতে হবে : এই শরীয়ত তদানীন্তন আরব সমাজে প্রচলিত চিন্তাধারার সম্পূর্ণ বিপরীত। আমরা এখানে ইসলামের অগণিত বিধানের মধ্য থেকে কেবল একটি ছোট বিধান উল্লেখ করব :

মহানবী (সা.) বলেছেন, "প্রতিটি বাহক পশুর আরোহীর ওপর ছয়টি অধিকার আছে : ১. যে অবতরণস্থলে অবতরণ করবে সেখানে পশুটিকে কিছু খাদ্য খেতে দেবে, ২. যদি পানি বা জলাধারের পাশ দিয়ে গমন কর, তাহলে ঐ পশুটিকে পানি পান করাবে, ৩. পশুর মুখের ওপর চাবুক মারবে না, ৪. দীর্ঘক্ষণ কথা বলার সময় পশুর পিঠের ওপর বসে থাকবে না, ৫. ক্ষমতার বাইরে পশুর ওপর অধিক বোঝা চাপাবে না, ৬. যে পথে চলার সামর্থ্য পশুটির নেই সে পথে পশুকে চালনা করবে না।" [৪৩]

৬. রোগীদের চিকিৎসাপদ্ধতির ক্ষেত্রে কুসংস্কার : যদি কোন ব্যক্তিকে বিচ্ছু বা সাপ দংশন করত তাহলে উক্ত ব্যক্তির ঘাড়ে স্বর্ণালংকার ঝোলানো হতো এবং বি াস করা হতো যে, যদি দংশিত ব্যক্তির সাথে তামা ও টিন থাকে তাহলে সে মারা যাবে। জলাত   রোগ- যা সাধারণত উক্ত রোগে আক্রান্ত কুকুরের দংশনে সংক্রমিত হয়- দংশিত স্থানের ওপর গোত্রপ্রধানের অল্প রক্ত মাখিয়ে চিকিৎসা করা হতো। আর নিম্নোক্ত কবিতায় তা প্রতিফলিত হয়েছে :

أحلامكـــــــــم لســــــــقام الجهـــــــل شـــــــافية   كمـــــا دمـــــاءكم تشـــــفى مـــــن الكلـــــب

“ যেমন (জলাত   ব্যাধিবাহী) কুকুর হতে আরোগ্য দেয় তোমাদের রক্ত
ঠিক তেমনি তোমাদের স্বপ্নগুলোও অজ্ঞতা (জনিত) ব্যাধির আরোগ্যদানকারী। ”

আর যদি কোন ব্যক্তির মধ্যে উন্মাদনার আলামত প্রকাশ পেত তাহলে অপবিত্র আত্মা দূর করার জ   নোংরা কার্যকলাপের আশ্রয় নেয়া হতো। নোংরা   াকড়া এবং মৃত ব্যক্তিদের হাড় পাগলের গলায় ঝুলানো হতো। যাতে করে শিশুরা শয়তানের কুপ্রভাব দ্বারা প্রভাবিত না হয় (অর্থাৎ শয়তানের প্রভাব তাদের ওপর না পড়ে) সেজ   শিয়াল ও বিড়ালের দাঁত সুতার সাথে বেঁধে শিশুদের গলায় ঝুলিয়ে দেয়া হতো। যখন শিশুদের ঠোঁট ও মুখ বিষফোঁড়ায় ভরে যেত তখন শিশুর মা একটি চালুনী মাথার ওপর বসিয়ে গোত্রের বাড়ি- বাড়ি গিয়ে রুটি ও খেজুর জমা করত এবং তা কুকুরকে খেতে দিত যাতে করে নিজ সন্তানের ঠোঁট ও মুখের ফোঁড়া সেরে যায়; গোত্রের মহিলারা সজাগ দৃষ্টি রাখত যে, তাদের সন্তানরা ঐ সব রুটি ও খেজুর থেকে কিছু না খায়, পাছে তারা এ রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়ে।

চর্মরোগ, যেমন দেহের চামড়া ঝরে পরার চিকিৎসা করার জ   মুখের লালা চর্মরোগাক্রান্ত স্থানে মালিশ করত। যদি কোন ব্যক্তির (চর্ম) রোগ এতে ভালো না হতো এবং অব্যাহত থাকত তাহলে ভাবা হতো রোগী যে সব প্রাণী, যেমন সাপ, শয়তানদের (অপদেবতা) সাথে যুক্ত সেগুলোর কোন একটিকে হত্যা করেছে। তারা শয়তানদের কাছে ক্ষমা প্রার্থনার জ   কাদামাটি দিয়ে উটের মূর্তি নির্মাণ করত। এরপর যব, গম ও খেজুর ঐ মূর্তিগুলোর ওপরে রেখে সেগুলো পাহাড়ের গুহার সামনে রেখে চলে আসত এবং পরের দিন তারা উক্ত স্থানে ফিরে যেত। যদি তারা দেখতে পেত যে, বোঝাগুলো খোলা হয়েছে, তাহলে তারা একে নজরানা কবুল হওয়ার নিদর্শন বলে গণ্য করত এবং বলত যে, রোগীটি সুস্থ হয়ে যাবে। আর এর অ থা হলে তারা বি াস করত, যেহেতু এ নজরানা তুচ্ছ ও নগণ্য তাই তা অপদেবতারা গ্রহণ করে নি।

ইসলাম বিভিন্ন পদ্ধতিতে এ সব কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছে। একদল মরুচারী আরব বেদুইন যারা যাদুর কর্ণফুল, যাদুর তাবীজ, মাদুলী এবং হার- যার মধ্যে পাথর ও হাড় বেঁধে রাখা হতো তা দিয়ে রোগীর রোগের চিকিৎসা করত তারা যখন মহানবী (সা.)- এর কাছে গমন করত

এবং উদ্ভিদ ও ঔষধ দিয়ে চিকিৎসা করার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করত তখন মহানবী (সা.) বলতেন, "প্রতিটি রোগীর জ   ঔষধ- পথ্যের ব্যবস্থা করা উচিত। কারণ যে আল্লাহ্ ব্যথা ও রোগযন্ত্রণা সৃষ্টি করেছেন তিনিই রোগের ঔষধও তৈরি করেছেন।"[৪৪] অর্থাৎ এ সব কর্ণফুল, তাবীজ, মাদুলী ও মালা রোগ নিরাময় করার ক্ষেত্রে কার্যকর নয়। এমনকি যখন সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস   দরোগে আক্রান্ত হন তখন মহানবী (সা.) তাঁকে বলেছিলেন, "সাকীফ গোত্রের প্রসিদ্ধ ডাক্তার হারিস কালদার কাছে তোমরা অবশ্যই যাবে।" এরপর তিনি তাঁকে একটি বিশেষ ঔষধ সেবনের পরামর্শ দিলেন।[৪৫]

অধিকন্তু যাদুর কর্ণফুল, তাবীজ ও মাদুলী যেগুলোর আসলে কোন কার্যকর প্রভাব নেই সেগুলো সংক্রান্ত বেশ কিছু বর্ণনা বিদ্যমান রয়েছে। এখানে আমরা দু'টি বর্ণনা উল্লেখ করাই যথেষ্ট বলে বিবেচনা করছি :

এক ব্যক্তি যার সন্তান গলাব্যথা রোগে আক্রান্ত হয়েছিল সে যাদুর মাদুলী ও তাবীজসহ মহানবীর সামনে উপস্থিত হলো। মহানবী (সা.) বললেন, "তোমরা তোমাদের সন্তানদের যাদুর এ সব কর্ণফুল, তাবীজ ও মাদুলী দিয়ে ভয় দেখিও না। এই অসুস্থ রোগীকে ভারতীয় চন্দন কাঠের নির্যাস সেবন করানো প্রয়োজন।"[৪৬]

ইমাম সাদেক (আ.) বলতেন, إنّ كثيرا من التّمائم شرك "ব বাজুবন্দ, কর্ণফুল ও মাদুলী হচ্ছে শিরক।"[৪৭]

মহানবী (সা.) এবং তাঁর সম্মানিত ওয়াসিগণ (নির্বাহী প্রতিনিধিগণ) জনগণকে অসংখ্য ঔষধ সম্পর্কে অবহিত করার মাধ্যমে যে সব অলীক ধারণা ও কুসংস্কার জাহেলী যুগের আরব জাতিকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল সেগুলোর ওপর জোরালো আঘাত হেনেছেন। তাঁদের বর্ণিত এ সব ঔষধ-পথ্য বড় বড় হাদীসশাস্ত্রবিদ কর্তৃক 'তিব্বুন নবী' (নবীর চিকিৎসাপদ্ধতি), 'তিব্বুর রেযা' (ইমাম রেযার চিকিৎসাপদ্ধতি) ইত্যাদি শিরোনামে সংকলিত হয়েছে।

৭. আরো কিছু কুসংস্কার : দুশ্চিন্তা ও ভীতি দূর করার জ   আরবরা নিম্নোক্ত মাধ্যমগুলো ব্যবহার করত :

ক. যখন তারা কোন গ্রামে প্রবেশ করত এবং কলেরা রোগ অথবা অপদেবতার ভীতি তাদের পেয়ে বসত তখন ভীতি দূর করার জ   তারা গ্রামের ফটকের সামনে ১০ বার গাধার   ায় চিৎকার করত। আবার কখনো কখনো এরূপ চিৎকার করার সময় শিয়ালের হাড় ঘাড়ে ঝুলিয়ে রাখত।

খ. যখন তারা কোন মরুপ্রান্তরে হারিয়ে যেত তখন তারা তাদের পরিধেয় বস্ত্র উল্টে- পাল্টে পরত। সফর করার সময় যখন তারা তাদের স্ত্রীদের বি াসঘাতকতা করার আশংকা করত তখন তারা নিশ্চিত হওয়ার জ   কোন গাছের কাণ্ডে বা ডালে একটি সুতা বেঁধে রাখত। ফেরার সময় যদি তারা দেখতে পেত, সুতা অক্ষত ও পূর্বের অবস্থায় আছে তাহলে তারা নিশ্চিত হতো যে, তাদের পত্নীরা বি াসঘাতকতা করেনি। আর যদি তারা দেখতে পেত, সুতাটি নেই অথবা খুলে গেছে তাহলে তারা তাদের স্ত্রীদের বি াসঘাতকতার অপরাধে দোষী সাব্যস্ত করত।

যদি তাদের সন্তানদের দাঁত পড়ে যেত তাহলে তারা ঐ দাঁতটিকে দু'আ ুল দিয়ে ধরে সূর্যের দিকে ছুঁড়ে দিত ও বলত, "হে সূর্য! এ দাঁতের চেয়ে উত্তম দাঁত দাও।" যে নারীর সন্তান বাঁচত না সে যদি কোন বয়স্ক মানুষের নিহত লাশের ওপর দিয়ে সাত বার হাঁটত, তখন তারা বি াস করত যে, তার সন্তান জীবিত থাকবে।

এগুলো হচ্ছে অগণিত কুসংস্কারের একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র যা জাহেলী যুগের বেদুইন আবরদের জীবনধারাকে প্রগাঢ়ভাবে তিমিরাচ্ছন্ন করেছিল এবং তাদের চিন্তা- ভাবনাকে উন্নতির সুউচ্চ শিখরে উ   য়ন করা থেকে বিরত রেখেছিল।

ইসলামের আবির্ভাবের সময়ে আরবের সামাজিক অবস্থা

মানব জাতি সামাজিক জীবনের দিকে প্রথম যে পদক্ষেপ নিয়েছিল তা ছিল গোত্রীয় জীবন। গোত্র ছিল কতগুলো পরিবার ও আত্মীয়ের সমষ্টি যারা গোত্রের শেখ বা নেতার নেতৃত্বাধীনে জীবনযাপন করত। আর এভাবে গোত্রের মাধ্যমে সমাজের আদিমতম চিত্র বা রূপ অস্তিত্ব লাভ করে। সে সময়ের আরব জাতির জীবনযাত্রা এমনই ছিল। প্রতিটি গোত্র অ   গোত্রের সাথে যোগ দিয়ে ছোট একটি সমাজ গঠন করত। গোত্রের সকল সদস্য গোত্রপতির আদেশ মেনে চলত। যে বিষয়টি তাদের পরস্পর সম্পর্কিত করে রেখেছিল তা ছিল তাদের গোত্রীয় বন্ধন ও আত্মীয়তা। এ সব গোত্র সব দিক থেকেই পরস্পর পৃথক ছিল; তাদের আচার- প্রথাও পৃথক ছিল। কারণ অ   সকল গোত্র মূলত একে অপর থেকে আলাদা ও অপরিচিত বলে গণ্য হতো। প্রতিটি গোত্র অ   গোত্রের কোন অধিকার ও সম্মান আছে- এ কথার স্বীকৃতি দিত না। প্রতিটি গোত্র অ   গোত্রের ধন- সম্পদ লু ন, সদস্যদের হত্যা এবং নারীদের অপহরণ করা তাদের আইনসংগত   ায্য অধিকার বলে গণ্য করত। তবে কোন গোত্রের সাথে যদি চুক্তি থাকত সে ক্ষেত্রে ছিল অ কথা। অ দিকে প্রতিটি গোত্র যখনই আগ্রাসন ও আক্রমণের শিকার হতো তখন সকল আগ্রাসনকারীকে হত্যা করা তাদের   ায্য অধিকার বলে গণ্য হতো। কারণ তারা বি াস করত যে, একমাত্র রক্ত ব্যতীত অ   কিছু রক্তকে ধুয়ে- মুছে পরিষ্কার করতে সক্ষম নয়।

আরব জাতি ইসলাম ধর্ম কবুল করার মাধ্যমে গোত্রতান্ত্রিক ব্যবস্থা থেকে মুক্ত হয়ে আন্তর্জাতিক প্রশাসনিক ব্যবস্থায় পদার্পণ করে। মহানবী (সা.) বিক্ষিপ্ত আরব গোত্রগুলোকে একটি ঐক্যবদ্ধ জাতিতে পরিণত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। নিঃসন্দেহে যে সব গোত্র সুদূর অতীতকাল থেকে পরস্পর দ্বন্দ্ব- সংঘাত ও আক্রমণে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিল এবং একে অ   র রক্ত ঝরাত তাদের অল্প সময়ের মধ্যে একটি ঐক্যবদ্ধ জাতিতে পরিণত করা সত্যি একটি বড় কাজ এবং একটি অতুলনীয় সামাজিক মুজিযা (অলৌকিক বিষয়) বলে গণ্য। কারণ এ ধরনের বিশাল পরিবর্তন

যদি কতগুলো স্বাভাবিক পরিবর্তন ও রূপান্তরেরই ফল হতো তাহলে এ ক্ষেত্রে দীর্ঘ প্রশিক্ষণ এবং অগণিত মাধ্যম ও উপায়- উপকরণের প্রয়োজন হতো।

টমাস কারলাইল বলেছেন, "মহান আল্লাহ্ ইসলাম ধর্মের মাধ্যমে আরব জাতিকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে পরিচালিত করেছেন। সে জাতি স্থবির ছিল, যাদের ধ্বনি শোনা যেত না, যাদের কর্মতৎপরতা ও প্রাণচাঞ্চল্য অনুভূত হতো না তাদের থেকে এমন এক জাতির উদ্ভব হয় যারা অখ্যাতি থেকে খ্যাতির দিকে, অলসতা ও শৈথিল্য থেকে জাগরণের দিকে, হীনতা ও দীনতা থেকে উচ্চ মর্যাদার পানে, দুর্বলতা ও অক্ষমতা থেকে শক্তি ও ক্ষমতার দিকে অগ্রসর হয়েছে। তাদের থেকে আলো পৃথিবীর সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল। ইসলামের আবির্ভাবের পর একশ বছর অতিক্রান্ত হতে না হতেই মুসলিম উম্মাহ্ এক পা ভারতে ও অপর পা আন্দালুসিয়ায় (বর্তমান স্পেন) রাখতে সক্ষম হয়েছিল।" [৪৮]

পাশ্চাত্যের প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক মেসিয়োর াঁ (مسیورنان) তাঁর গ্রন্থে লিখেছেন,

"এই বিস্ময়কর সুমহান ঘটনা (ইসলাম) যা আরব জাতিকে দি জয়ী এবং উন্নত চিন্তা ও ধ্যান-ধারণার উদ্ভাবকের পোশাকে আমাদের সামনে উপস্থাপন করেছে- তা ঘটার সময়কাল পর্যন্ত আরব উপদ্বীপের কোন অঞ্চলই না বি সভ্যতার ইতিহাসের অংশ বলে গণ্য হতো, আর না বিজ্ঞান বা ধর্মের দৃষ্টিতে সেখানে সভ্যতার কোন নিদর্শন বিদ্যমান ছিল।" [৪৯]

হ্যাঁ, জাহেলিয়াত যুগের প্রশিক্ষণপ্রাপ্তগণ অর্থাৎ বিভিন্ন আরব গোত্র না কোন সভ্যতার আলো প্রত্যক্ষ করেছে, আর না তাদের কোন শিক্ষা- দীক্ষা, নিয়ম- কানুন ও আচার- প্রথার প্রচলন ছিল। যে সকল সামাজিক সুযোগ- সুবিধা ও ইতিবাচক বৈশিষ্ট্য উন্নতি ও সভ্যতা বিকাশের কারণ সেগুলো থেকে তারা সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত ছিল। অতএব, কখনই আশা করা যেত না যে, এই জাতি এত অল্প সময়ের মধ্যে মর্যাদা ও সম্মানের শীর্ষে আরোহণ করবে এবং সংকীর্ণ গোত্রীয় জীবনের গণ্ডি পেরিয়ে মানবতার সুবিস্তৃত জগতের পানে অগ্রসর হবে।

পৃথিবীর জাতিসমূহ আসলে ইমারতসদৃশ। যেমনভাবে একটি মৌলিক ইমারত মজবুত উপাদানের মুখাপেক্ষী যা সঠিক পদ্ধতি অনুসারে এবং পূর্ণ শৃঙ্খলার সাথে নির্মিত হয়েছে যাতে করে তা ঝড়-

ঝঞ্ঝা ও বৃষ্টি- বাদলের প্রভাব থেকে টিকে থাকতে এবং স্থায়ী হতে পারে, ঠিক তেমনি একটি সাহসী ও নৈতিক গুণসম্পন্ন জাতির গঠন- কাঠামো ও দৃঢ় ভিত্তিসমূহ অর্থাৎ মৌলিক আকীদা- বি াস, পূর্ণা রীতি- নীতি এবং উন্নত মানবীয় স্বভাব- চরিত্রের মুখাপেক্ষী যাতে তা অস্তিত্ব বজায় রাখতে ও প্রগতির পথে অগ্রসর হতে সক্ষম হয়।

এ মূলনীতির ওপর ভিত্তি করে অবশ্যই ভেবে দেখা উচিত যে, কোথা থেকে এবং কিভাবে জাহেলী বেদুইন আরবদের ক্ষেত্রে এত আশ্চর্যজনক পরিবর্তন সাধিত হলো? যে জাতি গতকাল পর্যন্তও নিজেদের সার্বিক শক্তি মতবিরোধ ও কপটতার মধ্যে ব্যবহার করে নিঃশেষ করত এবং সব ধরনের সমাজব্যবস্থা থেকে ব দূরে ছিল, এত অত্যাশ্চর্যজনক তগতিতে সৌহার্দ, সম্প্রীতি ও ঐক্যের বাঁধনে আবদ্ধ হয়ে গেল এবং একটি শক্তিশালী রাষ্ট্র গঠন করল যে, সেই সময়ের বি র বৃহৎ জাতিসমূহকে তাদের আকীদা- বি াস ও রীতিনীতির সামনে নতজানু ও একান্ত আনুগত্যশীল করতে সক্ষম হয়েছিল।

সত্যিই যদি নির্ধারিত হয়ে থাকে যে, হিজায অর্থাৎ আরব উপদ্বীপের আরব জাতি এত উন্নতি করবে এবং এত বড় সম্মান ও গৌরবের অধিকারী হবে তাহলে ইয়েমেনের আরবগণ যারা (পূর্ব হতে) সভ্যতা ও কৃষ্টির অধিকারী ছিল তারা বছরের পর বছর ধরে রাজত্ব করেছে এবং বড় বড় শাসনকর্তাকে প্রশিক্ষিত করে গড়ে তুলেছে তারা কেন এ ধরনের উন্নতি ও প্রগতির অধিকারী হতে পারে নি? শামদেশের প্রতিবেশী গাসসানী আরবগণ যারা সভ্য রোমীয় শাসনব্যবস্থার অধীনে জীবনযাপন করত তারা কেন উন্নতি ও বিকাশের এ পর্যায়ে পৌঁছতে সক্ষম হয় নি? হীরার আরবগণ যারা গতকালও বিশাল পারস্য সাম্রাজ্যের অধীনে বসবাস করত তারা কেন এ ধরনের উন্নতি করতে সক্ষম হয় নি? প্রাগুক্ত জাতিসমূহ যদি এ ধরনের সাফল্য অর্জন করত তাহলে তা আশ্চর্যজনক বিষয় বলে বিবেচিত হতো না। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে এটিই যে, হিজাযের আরবগণ যাদের নিজেদের কোন ইতিহাসই ছিল না তারাই সুমহান ইসলামী সভ্যতার উত্তরাধিকারী হয়েছে।

হীরা ও গাসসান রাজ্যসমূহ

আরব উপদ্বীপের যে সব অঞ্চলের জলবায়ু ও আবহাওয়া ভালো ছিল সে সব অঞ্চল ইসলামের অভ্যুদয়ের আগে সর্বশেষ শতাব্দীতে পুরোপুরি তিন বৃহৎ শক্তি অর্থাৎ ইরান, রোম ও আবিসিনিয়ার অধীন ছিল। আরব উপদ্বীপের পূর্ব ও দক্ষিণ- পূর্বাঞ্চল ইরানের প্রভাবাধীন, উত্তর- পশ্চিমাঞ্চল রোমের অনুগত এবং মধ্য ও দক্ষিণাঞ্চল হাবাশাহ্ অর্থাৎ আবিসিনিয়ার নিয়ন্ত্রণে চলে গিয়েছিল। এ সব সভ্য রাষ্ট্রের পাশে থাকার কারণে এবং ঐ সব রাষ্ট্র ও সাম্রাজ্যের মধ্যে সর্বদা দ্বন্দ্ব থাকার কারণে আরব উপদ্বীপের সীমান্তবর্তী অঞ্চলসমূহে অর্ধ- স্বাধীন ও অর্ধ- সভ্য বেশ কিছু রাজ্যের পত্তন হয়েছিল যেগুলোর প্রতিটিই ছিল নিজ নিজ প্রতিবেশী সভ্য বৃহৎ সাম্রাজ্য ও রাষ্ট্রের অনুগত। হীরা, গাসসান ও কিন্দাহ্ ছিল ঐ ধরনের রাজ্য যেগুলোর প্রতিটি ছিল পারস্য, রোম ও আবিসিনীয় সাম্রাজ্যের যে কোন একটির প্রভাবাধীন।[৫০]

ঐতিহাসিক তথ্য ও বিবরণাদি অনুযায়ী ি ষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীর প্রথমাংশে আশকানীয় যুগের শেষের দিকে কতিপয় আরব গোত্র ফোরাত নদীর পাড়ে অবস্থিত এলাকায় বসতি স্থাপন করে এবং ইরাকের একটি অংশকে নিজেদের কর্তৃত্বে নিয়ে আসে। তারা ধীরে ধীরে এ সব বসতি স্থাপনকারী আরব গ্রাম, দুর্গ, শহর ও নগর প্রতিষ্ঠা করে যেগুলোর মধ্যে 'হীরা ' নগরটি ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এ নগরীটি বর্তমান কুফা নগরীর নিকটেই অবস্থিত ছিল।

এ শহরটি ছিল দুর্গ- নগরী। আর এ বিষয়টি এ শহরের নামকরণ থেকেও স্পষ্ট প্রতিভাত হয়ে যায়।[৫১] এ নগরীতে আরবগণ বসবাস করত। তবে ধীরে ধীরে তা শহরে রূপান্তরিত হয়ে যায়। ফোরাত অঞ্চলের ভালো জলবায়ু এবং প্রচুর নদ- নদীর অস্তিত্ব ও প্রাকৃতিক পরিবেশ অনুকূল হওয়ার কারণে অত্র অঞ্চল আবাদ হয়েছিল। ঐ অঞ্চলের অধিবাসিগণ মরুবাসী আরব সর্দারদেরকে কৃষ্টি ও সভ্যতার আহবান জানাতে সক্ষম হয়েছিল। হীরা অঞ্চলের অধিবাসিগণ পারস্যের প্রতিবেশী হওয়ার কারণে পারস্য সভ্যতা ও সংস্কৃতি দ্বারা উপকৃত হয়েছিল। খওরানাক প্রাসাদের ায় হীরার সন্নিকটে বেশ কিছু প্রাসাদ নির্মাণ করা হয়েছিল যা উক্ত নগরীকে এক

বিশেষ সৌন্দর্য দান করেছিল। এ অঞ্চলের আরবগণ লিপি ও লিখনপ্রণালীর সাথে পরিচিত হয়েছিল এবং সম্ভবত সেখান থেকেই লিপি ও লিখনপ্রণালী আরব উপদ্বীপের অ া স্থানে প্রচলিত হয়েছিল।[৫২]

হীরার শাসনকর্তা ও আমীরগণ বনি লাখম গোত্রের আরব ছিলেন এবং পারস্যের সাসানীয় সম্রাটগণ তাঁদের সমর্থন ও পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। হীরার আমীরদের সাসানীয় সম্রাটগণ এ কারণে সমর্থন করতেন যাতে করে তাঁরা তাঁদের (হীরার আমীরগণ) ইরান ও আরব বেদুইনদের মাঝে অন্তরায় হিসাবে গড়ে তুলতে এবং তাঁদের সহায়তায় পারস্য সাম্রাজ্যের সীমান্তবর্তী এলাকাসমূহে লু নকারী আরব বেদুইন ও যাযাবরদের আক্রমণ প্রতিহত করতে সক্ষম হন। (হীরার) এ সব আমীরের নাম ইতিহাসে লিপিবদ্ধ আছে। হামযাহ্ ইসফাহানী এ সব আমীরের নাম ও আয়ুষ্কাল এবং যে সব সাসানীয় সম্রাট তাঁদের সমসাময়িক ছিলেন তাঁদের একটি তালিকা প্রদান করেছেন।[৫৩]

যা হোক বনি লাখম বংশের রাজ্য ছিল হীরা অঞ্চলের বৃহত্তম আরবীয় রাজ্য যা ছিল অর্ধসভ্য। এ বংশের সর্বশেষ বাদশাহ্ ছিলেন নূমান বিন মুনযির যিনি পারস্য সম্রাট খসরু পারভেজ কর্তৃক অপসারিত ও নিহত হয়েছিলেন। তাঁর অপসারণ ও হত্যার কাহিনী ইতিহাসে বিখ্যাত হয়ে আছে।[৫৪]

পঞ্চম শতাব্দীর শেষে অথবা ষষ্ঠ শতকের প্রথম দিকে একদল বহিরাগত আরব আরব উপদ্বীপের প্রত্যন্ত এলাকা থেকে এর উত্তর- পশ্চিমাঞ্চলে বসতি স্থাপন করে যা ছিল রোমান সাম্রাজ্যের সীমান্তবর্তী। এ দেশটি রোমান সাম্রাজ্যের ছত্রছায়ায় ছিল এবং ঠিক যেমনি হীরার শাসকবর্গ পারস্য সম্রাটদের তাঁবেদার ছিল ঠিক তেমনি গাসসানীয় রাজ্যের শাসকবর্গও বাইজান্টাইনীয় সম্রাটদের তাঁবেদার ছিল।

গাসসান দেশটি কিছুটা সভ্য ছিল। যেহেতু দেশটির সরকারের কেন্দ্র একদিকে দামেস্কের কাছাকাছি, অ দিকে বসরার নিকটবর্তী অঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল সেহেতু এ দেশটি রোমান

প্রভাবাধীন আরব অঞ্চলের কেন্দ্রস্থলে পরিণত হয়েছিল। আর অত্র এলাকাতে রোমান সভ্যতা ও সংস্কৃতি ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছিল।

গাসসানিগণ হীরার লাখম গোত্রভুক্ত শাসকবর্গ এবং ইরানীদের সাথে মতবিরোধ ও দ্বন্দ্ব থাকার কারণে রোমান সাম্রাজ্যের মিত্র হয়েছিল। প্রায় ৯ অথবা ১০ গাসসানী আমীর একের পর এক এ দেশটিতে শাসনকার্য পরিচালনা করেছে।

হিজাযে প্রচলিত ধর্ম

হিজাযে যে ধর্ম প্রচলিত ছিল তা ছিল পৌত্তলিক ধর্ম। কেবল ইয়াসরিব (মদীনা) ও খাইবারে ইয়া দী সংখ্যালঘুরা বসবাস করত। ইয়েমেন ও হিজাযের সীমান্তবর্তী শহর নজরানের অধিবাসীরা যেমনি ি ষ্টধর্মাবলম্বী ছিল, ঠিক ত প আরব উপদ্বীপের উত্তরাঞ্চলীয় এলাকাসমূহ রোমান সাম্রাজ্যের প্রভাবাধীন এলাকা হওয়ার কারণে অত্র অঞ্চলেও ি ষ্টধর্ম প্রচলিত ছিল। যদি এ তিন সংবেদনশীল এলাকা বাদ দেই তাহলে হিজাযের অ সব এলাকায় মূলত বিভিন্ন আকার- অবয়বে মূর্তিপূজা এবং বিভিন্ন ধরনের কুসংস্কার ও বি াস প্রচলিত ছিল।

তবে ‘হানীফ ’ (حنيف) নামে পরিচিত অতি মুষ্টিমেয় ব্যক্তি তাওহীদী মতাদর্শের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল যারা নিজেদের হযরত ইবরাহীম (আ.)- এর ধর্মের অনুসারী বলে জানত। তাদের সংখ্যা আসলেই খুব কম ছিল। তদানীন্তন পৌত্তলিক আরব জনসংখ্যার তুলনায় তাদের সংখ্যা অতি নগণ্য ছিল।[৫৫]

হযরত ইবরাহীম (আ.) ও হযরত ইসমাঈল (আ.)- এর সময় থেকে ধর্মীয় ও চারিত্রিক আচার- প্রথা ও বিধিসমন্বিত একত্ববাদী ধর্ম হিজাযে প্রবর্তিত ও প্রচলিত হয়েছিল। পবিত্র কাবার সম্মানার্থে হ ব্রত পালন ছিল ঐ সব প্রথারই অন্তর্ভুক্ত। পরবর্তীকালে আমর বিন কুসাই নামের খুযাআ গোত্রের এক ব্যক্তি- যার হাতে সর্বময় কর্তৃত্ব ও নেতৃত্ব ছিল তার মাধ্যমে পবিত্র মক্কা নগরীতে মূর্তিপূজার প্রচলন হয়। এ ব্যক্তি শাম (সিরিয়া) ভ্রমণ করার সময় দেখতে পেয়েছিল যে, আমালাকা সম্প্রদায় সুন্দর সুন্দর প্রতিমার পূজা করে। তাদের এ কাজ তার মনঃপূত হয় এবং সে ‘ বাল ’ নামের একটি সুন্দর প্রতিমা শাম থেকে মক্কায় আনয়ন করে এবং জনগণকে তা পূজা করার ব্যাপারে আহবান জানায়।[৫৬]

প্রসিদ্ধ প্রতিমাসমূহ : ১. বাল ২. আসাফ ৩. নায়েলাহ্ ৪. লাত ৫. উয্যা ৬. মানাত ৭. আমইয়ানুস ৮. সা'দ ৯. যূল খালসাহ্ ১০. মান্নাফ।

এগুলোই ছিল আরবদের সবচেয়ে প্রসিদ্ধ প্রতিমা। এ সব প্রতিমা ছাড়াও আরবদের অ া প্রতিমার উপাসনাও প্রচলিত ছিল। কখনো কখনো কোন গোত্র, এমনকি কোন কোন বংশের নিজস্ব প্রতিমা ও মূর্তি ছিল যাকে তারা পূজা করত।

হিজাযে জ্ঞান ও শিক্ষা

হিজাযের জনগণ ও অধিবাসীদের 'উম্মী ' বলা হতো। 'উম্মী ' শব্দের অর্থ অশিক্ষিত। অর্থাৎ ঐ ব্যক্তিকে উম্মী বলা হয় যে মায়ের পেট থেকে যে অবস্থায় ভূমিষ্ঠ হয়েছিল ঠিক সে অবস্থায়ই রয়েছে। (জাহেলিয়াতের যুগে) আরবদের মধ্যে জ্ঞান ও শিক্ষার গুরুত্ব বুঝতে হলে আমাদের জ এতটুকু জানাই যথেষ্ট যে, ইসলামের শুভ অভ্যুদয়ের ল কুরাইশ গোত্রে কেবল ১৭ ব্যক্তি লেখাপড়া জানত। আর মদীনায় 'আওস ' ও 'খাযরাজ ' গোত্রদ্বয়ের মধ্যে কেবল ১১ জন লেখাপড়া জানত।[৫৭]

আরব উপদ্বীপের অধিবাসীদের ব্যাপারে সংক্ষিপ্ত এ আলোচনার প্রতি দৃষ্টিপাত করলে মতাদর্শ, চিন্তা- চেতনা, বি াস, অর্থনীতি, চরিত্র, আচার- ব্যবহার এবং কৃষ্টি- সংস্কৃতির ক্ষেত্রে পবিত্র ইসলাম ধর্মের শিক্ষা- দীক্ষার মাহাত্ম্য স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় এবং সব সময় সভ্যতাসমূহের মূল্যায়নের ক্ষেত্রে অবশ্যই আমাদের ঐ সব সভ্যতার পূর্ববর্তী অধ্যায় অধ্যয়ন করতেই হবে। অধ্যয়নের পরই কেবল উক্ত সভ্যতার মহত্ত্বের প্রকৃত মূল্যায়ন করা উচিত।[৫৮]

তৃতীয় অধ্যায় : দুই পরাশক্তি ইরান ও রোমের অবস্থা

ইসলাম ধর্মের পবিত্র আন্দোলনের প্রকৃত তাৎপর্য ও গুরুত্ব উপলব্ধি করার জ   দু'টি পরিবেশের সমুদয় অবস্থা অধ্যয়ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় :

১. পবিত্র কোরআন অবতীর্ণ হওয়ার পরিবেশ অর্থাৎ যে পরিস্থিতি ও পরিবেশের মধ্যে ইসলাম ধর্মের আবির্ভাব ও এর বিকাশ ঘটেছিল।

২. ঐ সময় পৃথিবীর সবচেয়ে সভ্য অঞ্চলসমূহে যে সব জাতি বসবাস করত তাদের চিন্তাধারা, চরিত্র, আচার, রীতি- নীতি, প্রথা ও সভ্যতা অধ্যয়ন।

ইতিহাস থেকে ঐ সময়ের পৃথিবীর সবচেয়ে আলোকিত যে অঞ্চলের সার্বিক পরিস্থিতি সম্পর্কে আমরা জানতে পারি তা হলো রোমান ও পারস্য সাম্রাজ্যের সার্বিক অবস্থা ও পরিবেশ। আলোচনা পূর্ণ করার জ   আমাদের অবশ্যই উক্ত দু'দেশের অবস্থা ভিন্ন ভিন্ন অংশে আলোচনা ও অধ্যয়ন করতে হবে। যার ফলে ইসলাম ধর্ম যে সুমহান সভ্যতা মানব জাতিকে উপহার দিয়েছে তার গুরুত্ব ও তাৎপর্য স্পষ্ট হয়ে যাবে।

তখনকার রোমান সাম্রাজ্যের অবস্থা প্রতিদ্বন্দ্বী পারস্য সাম্রাজ্যের অবস্থা অপেক্ষা কোন অংশে কম ছিল না। গৃহযুদ্ধ এবং আর্মেনিয়া ও অ ।   এলাকাকে কেন্দ্র করে ইরানের সাথে সংঘটিত যুদ্ধসমূহ রোমান সাম্রাজ্যের জনগণকে এক নতুন বি ব বরণ করার জ   মানসিকভাবে প্রস্তুত করে তুলেছিল। ধর্মীয় মতপার্থক্যসমূহ অ   সব কিছুর চেয়ে বেশি এ সব বিরোধ ও পার্থক্যকে বিস্তৃত করেছিল। মূর্তিপূজক ও ি ষ্টানদের মধ্যে যুদ্ধের বহ্নিশিখা নির্বাপিত হতো না। যখন গির্জার পুরোহিতগণ শাসনকর্তৃত্ব গ্রহণ করেছিলেন তখন তাঁরা তাঁদের প্রতিদ্বন্দ্বী ও বিরোধীদের কঠিন চাপের মধ্যে রেখেছিলেন যা একটি অসন্তুষ্ট সংখ্যালঘু গোষ্ঠীর উদ্ভব ঘটিয়েছিল। যে বিষয়কে রোমান সাম্রাজ্যের জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত ইসলাম ধর্ম গ্রহণের অ তম বড় কারণ বলে গণ্য করা হয়েছে তা ছিল গির্জার পুরোহিতদের সহিংসতার কারণে উক্ত সাম্রাজ্যের বিভিন্ন গোষ্ঠীর বঞ্চনা ও নাগরিক অধিকারহীনতা। একদিকে পুরোহিত ও ধর্মযাজকদের মধ্যকার অন্তর্দ্বন্দ্ব এবং অ   দিকে

বিভিন্ন ধরনের পথ ও মত দিন দিন রোমান সাম্রাজ্যের শক্তি, ক্ষমতা ও আধিপত্য নিঃশেষ করে দিচ্ছিল।

এ সব ছাড়াও উত্তর- পূর্ব দিকের ে তা ও পীতবর্ণের লোকেরা সর্বদা ইউরোপ মহাদেশের উর্বর অঞ্চলসমূহ নিজেদের করায়ত্তে আনার ইচ্ছা পোষণ করত এবং কখনো কখনো সামরিক সংঘর্ষ ও যুদ্ধসমূহে একে অপরের বিপুল ক্ষয়- ক্ষতি সাধন করত। এর ফলে রোমান সাম্রাজ্য দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। ঐতিহাসিকগণ বি াস করেন যে, ষষ্ঠ শতাব্দীতে রোমের রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা অত্যন্ত বিশৃঙ্খল ও দুর্দশাগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল। এমনকি পারস্য সাম্রাজ্যের ওপর রোমান সাম্রাজ্যের বিজয়ী হওয়ার বিষয়টি উক্ত সাম্রাজ্যের সামরিক পরাশক্তি হওয়ার প্রমাণ বলে গণ্য করা হতো না, বরং বি াস করা হতো যে, ইরানের পরাজয় আসলে সে দেশটির প্রশাসনের বিশৃঙ্খলারই ফসল ছিল। এ দু'টি দেশ যা নিজেদের ওপর বি রাজনীতি ও নেতৃত্বের মুকুট পরিধান করেছিল তা ইসলাম ধর্মের আবির্ভাব কালে চরম বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতার মধ্য দিয়ে অতিবাহিত করছিল। এটি স্পষ্ট যে, এ ধরনের পরিবেশ- পরিস্থিতি একটি সঠিক ধর্ম গ্রহণ করার জ অসাধারণ প্রস্তুতি ও তীব্র আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি করেছিল যা মানব জাতির জীবনের সার্বিক অবস্থা উন্নয়নে সক্ষম।

রোমের খণ্ডকালীন আলোচনাসভাসমূহ

কিছু কিছু দেশে একদল বেকার ও প্রবৃত্তিপূজারী ব্যক্তি নিজেদের অসদুদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জ কতগুলো অন্তঃসারশূ বিষয় জনসমক্ষে উত্থাপন ও প্রচার করত এবং এভাবে তারা জনগণের মূল্যবান জীবন নষ্ট করত। প্রাচ্যের অনেক দেশেই আমাদের এ বক্তব্যের পক্ষে প্রচুর দলিল- প্রমাণ বিদ্যমান যা বর্তমানে আলোচনা করার কোন অবকাশ নেই। ঘটনাচক্রে তখনকার রোম অ সব দেশের চেয়ে বেশি এ ধরনের সমস্যায় জড়িয়ে পড়েছিল। যেমন রোমান সম্রাট ও রাজনীতিকগণ কিছু কিছু ধর্মীয় সম্প্রদায়ের অনুসারী হওয়ার কারণে বি াস করতেন যে, হযরত ঈসা মসীহ্ (আ.) দু'ধরনের স্বভাব- প্রকৃতি ও ইচ্ছাশক্তির অধিকারী। কিন্তু কিছু সংখ্যক ইয়াকুবী সম্প্রদায়ভুক্ত ি ষ্টান বি াস করত যে, হযরত ঈসা (আ.) কেবল এক ধরনের স্বভাব- প্রকৃতি ও

ইচ্ছাশক্তির অধিকারী। আর ভিত্তিহীন এ বিষয়টিই রোমান সাম্রাজ্যের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব, ঐক্য ও সংহতির ওপর তীব্র আঘাত হানে এবং তাদের মধ্যে এক গভীর ফাটলের উদ্ভব ঘটায় যার ফলে সরকার ও প্রশাসন নিজ আকীদা- বি াস সংরক্ষণ করতে বাধ্য হয়। আর এ কারণেই প্রশাসন বিরোধীদেরকে অতি নিষ্ঠুরভাবে দমন করা হয়। উৎপীড়ন ও চাপের কারণে বেশ কিছুসংখ্যক বিরোধী ইরান সরকারের কাছে রাজনৈতিক আশ্রয় গ্রহণ করেছিল। এ সব বিরোধীই মুসলিম সেনাবাহিনীর সম্মুখে রণক্ষেত্র উন্মুক্ত করে দিয়েছিল এবং মনে- প্রাণে মুসলিম সেনাবাহিনীকে বরণ করে নিয়েছিল।

তদানীন্তন রোমান সাম্রাজ্য ঠিক মধ্যযুগীয় ইউরোপের মতো ছিল। প্রসিদ্ধ জ্যোতির্বিদ ফ্লামারীয়োন মধ্যযুগে ইউরোপীয় কৃষ্টির পর্যায় ব্যাখ্যা করতে গিয়ে নিম্নোক্ত কাহিনীটি বর্ণনা করেছেন : ‘আধ্যাত্মিক সমগ্র ’ নামক গ্রন্থটি মধ্যযুগে স্কলাসটিক দর্শনের পূর্ণ বহিঃপ্রকাশ ও নিদর্শন বলে গণ্য হতো। এ গ্রন্থটি চারশ ’ বছর ধরে আনুষ্ঠানিক পাঠ্যপুস্তক হিসাবে ইউরোপে পঠিত হতো। উক্ত গ্রন্থের একটি অংশে এ শিরোনামে আলোচনা করা হয়েছে : ‘একটি সুঁইয়ের অগ্রভাগের সরু ছিদ্রের মধ্যে কত জন ফেরেশতার অবস্থান গ্রহণ করা সম্ভব?’ ‘চিরন্তন পিতার বাম চোখের পুতুলী থেকে তাঁর ডান চোখের পুতুলী পর্যন্ত দূরত্ব কত ফারসাখ?’(১ ফারসাখ = প্রায় ৬ কিলোমিটার)

দুর্ভাগ্যপীড়িত রোমান সাম্রাজ্য বহিঃশক্তিগুলোর সাথে যুদ্ধে- বিগ্রহে লিপ্ত হওয়ার একই সময় অভ্যন্তরীণ মতবিরোধ ও দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়েছিল। এ সব দ্বন্দ্ব- সংঘাত ধর্মীয় রূপ পরিগ্রহ করেছিল। আর এর ফলে দিন দিন দেশটি পতনের দ্বারপ্রান্তে উপনীত হয়েছিল। ইয়া দিগণ যারা ছিল একটি ষড়যন্ত্রকারী জাতি, তারা যখন দেখল, রোমের ি ষ্টান সম্রাট কর্তৃক আরোপিত চাপ সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছে তখন তারা রোমান সাম্রাজ্য ধ্বংস ও এর মূলোৎপাটন করার জ ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হলো। তারা একবার আনতাকীয়া নগরীও দখল করে নিয়েছিল এবং নগরীর প্রধান ধর্মযাজকের কান, নাক ও ঠোঁট কর্তন করেছিল। রোম সরকার প্রতিশোধ নেয়ার জ আনতাকীয়ার ইয়া দীদের ওপর গণহত্যা চালিয়েছিল। রোমে ইয়া দী ও ি ষ্টানদের মধ্যে এ

ধরনের নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ডের কয়েকবার পুনরাবৃত্তি হয়েছিল। আবার কখনো কখনো এ শত্রুতা দেশের বাইরেও বিস্তার লাভ করেছিল। উদাহরণস্বরূপ ইয়া দীরা একবার ইরান থেকে ৮০, ০০০ ি ষ্টানকে ক্রয় করে দুম্বার মতো জবাই করেছিল।

এখানেই সম্মানিত পাঠকবর্গ ইসলাম ধর্মের অভ্যুদয়ের সমসাময়িক বি ে র অন্ধকারাচ্ছন্ন ও অরাজক পরিস্থিতি প্রত্যক্ষ করতে এবং স্বীকার করতে পারবেন যে, ইসলামের মুক্তিদানকারী শিক্ষা- দীক্ষা ও বিধি- বিধান ঐ অন্ধকারাচ্ছন্ন পরিবেশ থেকে সৃষ্ট হয় নি এবং তা মানুষের মস্তিষ্কপ্রসূত চিন্তাধারারও ফসল নয়। ঐক্য ও সহমর্মিতার মৃদুমন্দ এ সমীরণ এবং শান্তি ও মৈত্রীর সুর যা পবিত্র ইসলাম ধর্মের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য তা আসলে ঐ রিক উৎস থেকেই উৎসারিত হয়েছে। কিভাবে বলা সম্ভব যে, যে ইসলাম ধর্ম জীবজন্তু ও প্রাণীকুলকে পর্যন্ত জীবনধারণ করার অধিকার দিয়েছে আসলে তা এ ধরনের রক্তপিপাসু পরিবেশ থেকে উদ্ভূত?

ইসলাম ধর্ম হযরত ঈসা (আ.)- এর ইচ্ছা ও আকাঙ্ক্ষার ব্যাপারে ভিত্তিহীন এ সব আলোচনার অবসান ঘটিয়েছে এবং ঈসা (আ.)- কে ঠিক এভাবে পরিচিত করিয়েছে :

(ما المسيح بن مريم إلّا رسول قد خلت من قبله الرّسل و أمّه صدّيقة كانا يأكلان الطّعام)

“মরিয়ম তনয় মসীহ্ একজন নবীর চেয়ে বেশি কিছু নন যাঁর আগে অনেক নবী- রাসূল গত হয়েছেন। তাঁর মাতা ছিলেন একজন পূতঃপবিত্রা পরম সত্যবাদিনী। এমতাবস্থায় তাঁরা উভয়ই খাদ্য গ্রহণ করতেন এবং মানুষ ছিলেন।” (সূরা মায়েদাহ্ : ৭৫)

পবিত্র কোরআনের এ আয়াত হযরত ঈসা (আ.)- এর আত্মা, রক্ত ও পরিচিতি সংক্রান্ত গীর্জার ধর্মযাজকদের অনর্থক আলোচনা ও তর্ক- বিতর্কের অবসান ঘটিয়েছে। এ ধর্মের সুমহান শিক্ষা ও আদর্শ এবং মহৎ মানবীয় গুণাবলী পুনরুজ্জীবিত করার মাধ্যমে মানব জাতিকে অযথা যুদ্ধ- বিগ্রহ ও রক্তপাত থেকে বিরত রেখেছে।

ইরান : তদানীন্তন সভ্যতার লালনভূমি

যে কারণে আমরা রোমান সাম্রাজ্যের সার্বিক অবস্থা অধ্যয়ন করেছি সে একই কারণে আমরা সে সময়ের ইরানের সার্বিক পরিস্থিতি সম্মানিত পাঠকবর্গের সামনে তুলে ধরব। তবে এ বিষয়টির দিকেও দৃষ্টিপাত করা আবশ্যক যে, আমরা যদি আমাদের পূর্বপুরুষদের দেশের দুর্বল দিকগুলো বর্ণনা করে থাকি, তাহলে কেবল সত্য বিশ্লেষণ এবং ইসলাম ধর্মের সুমহান শিক্ষা ও আদর্শের প্রকৃত তাৎপর্য অনুধাবন করা ব্যতীত আমাদের আর কোন উদ্দেশ্য নেই। জাতীয় গর্ব ও স্বদেশপ্রেম যেন অবশ্যই আমাদের বাস্তববাদী হওয়া থেকে বিরত রাখতে না পারে। আমরা দেশকে ভালোবাসার পাশাপাশি পবিত্র ইসলাম ধর্মের অভ্যুদয়ের সমসাময়িক যে দুর্নীতিগ্রস্ত সরকার ইরানে রাজত্ব করত তা বর্ণনা করতে, বাস্তবকে মেনে নিতে এবং (তদানীন্তন ইরানী সমাজে প্রচলিত) কুসংস্কারাচ্ছন্ন আকীদা- বি াস ব্যাখ্যা করার ব্যাপারে কোন কিছু পরোয়া করি না। অ্যারিস্টটল তাঁর শিক্ষক ে টোর সাথে তাঁর মতবিরোধ প্রসে যা বলেছিলেন তা- ই পুনরাবৃত্তি করছি। তিনি তাঁর এ মতপার্থক্যের ব্যাপারে এভাবে একটি গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা দিয়েছেন: “আমি ে টোকে ভালোবাসি। তবে সত্যকে তার চেয়েও বেশি ভালোবাসি। ”

সে যুগের ইরানী সরকার ও প্রশাসনের প্রধান দুর্বল দিকটি ছিল স্বৈরাচারী একনায়ক সরকার। নিঃসন্দেহে ব্যক্তিবিশেষের বিবেক- বুদ্ধি ও তাকে নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করা এবং একটি সংঘ বা দলের নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করা মোটেও এক নয়। সামষ্টিক অর্থাৎ জনপ্রতিনিধিত্বশীল সরকার ও প্রশাসনের মধ্যে ষড়যন্ত্র, পেশী প্রদর্শন ও জোর খাটানো অপেক্ষাকৃত কমই হয়ে থাকে। এ কারণেই ইরানীদের মহত্ত্ব, নেতৃত্ব অথবা দুর্বলতা ও অপদস্থ হওয়ার বিষয়টি তাদের কর্তৃত্বশীল একনায়কতন্ত্রের দুর্বলতা অথবা সামর্থ্যরে সাথে পূর্ণরূপে জড়িত। সাসানী সরকার ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা সংক্রান্ত আলোচনা ও অধ্যয়ন এবং তাদের প্রশাসনের ছায়ায় যে সব অস্থিতিশীলতার উদ্ভব হয়েছে সেগুলো আমাদের এ বক্তব্যের জীবন্ত দলিল।

ইসলামের আবির্ভাবকালে ইরানের সার্বিক অবস্থা

ইসলামের আবির্ভাব এবং ৬১১ ি ষ্টাব্দে মহানবী (সা.)- এর নবুওয়াতপ্রাপ্তি পারস্য সম্রাট খসরু পারভেজের (৫৯০- ৬২৮ ি .) শাসনামলের সমসাময়িক ঘটনা ছিল। মহানবী (সা.) সম্রাট খসরু পারভেজের রাজত্বকালেই মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করেছিলেন। (সে দিনটি ছিল শুক্রবার, ১৬ জুলাই, ৬২২ ি .)। আর এ তারিখ অর্থাৎ মহানবীর হিজরত দিবস থেকেই মুসলমানদের সন ও তারিখ গণনা শুরু হয়েছিল।

দু'টি বৃহৎ পরাশক্তি (প্রাচ্যের রোমান সাম্রাজ্য ও সাসানীয় পারস্য সাম্রাজ্য) ঐ সময়ের সভ্য দুনিয়ার বেশিরভাগ অংশ শাসন করত। সুদূর প্রাচীনকাল থেকে এ দু'টি সাম্রাজ্য সমগ্র বি‌ে শাসনকর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করার জ একে অপরের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হতো।

পারস্য সম্রাট আনুশীরওয়ান (নওশেরওয়ান) [৫৩১- ৫৮৯ ি .]- এর রাজত্বকাল থেকে রোমানদের সাথে ইরানীদের দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ শুরু হয় এবং তা খসরু পারভেজের রাজত্বকাল পর্যন্ত দীর্ঘ ২৪ বছর স্থায়ী হয়েছিল।

পারস্য ও রোমান সাম্রাজ্যদ্বয় এ দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধে যে বিপুল সম্পদ ব্যয় করেছিল এবং ব্যাপক ক্ষয়-ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছিল সে কারণে উক্ত সাম্রাজ্যদ্বয়ের সরকার ও প্রশাসন কার্যত প ু ও অচল হয়ে গিয়েছিল; আসলে খোলস ছাড়া এ পরাশক্তিদ্বয়ের আর কিছুই তখন অবশিষ্ট ছিল না।

বিভিন্ন দিক ও প্রেক্ষাপট থেকে ইরানের সার্বিক অবস্থা ও পরিস্থিতি আলোচনা করতে হলে সম্রাট আনুশীরওয়ানের রাজত্বকালের শেষভাগ থেকে মুসলমানদের আগমন ও পারস্যবিজয় পর্যন্ত সে দেশের সরকার ও প্রশাসনের অবস্থা আমরা আলোচনা করব।

সাসানী শাসনামলে জৌলুস ও বিলাসিতা

সাসানী সম্রাটগণ সাধারণত বিলাসী ও আনুষ্ঠানিকতাপ্রিয় ছিলেন। সাসানী সম্রাটদের জাঁকজমকপূর্ণ শাহী দরবার এবং এর জৌলুস দর্শনার্থীদের চোখ ঝলসে দিত।

সাসানী শাসনামলে 'দারাফশেশে কভীয়নী ' নামে ইরানীদের একটি পতাকা ছিল যা সাধারণত যুদ্ধক্ষেত্রে অথবা সাসানীয়দের অতিরিক্ত আনুষ্ঠানিকতাপূর্ণ উৎসবসমূহের সময় রাজকীয়

প্রাসাদসমূহে উত্তোলন করা হতো। পতাকাটি মূল্যবান মণিমুক্তা ও হীরা- জহরত দ্বারা সুশোভিত করা হতো। একজন লেখকের বক্তব্য অনুযায়ী, এ পতাকাটির মূল্যবান মণিমুক্তা ও হীরা- জহরত আসলেই অদ্বিতীয় ছিল যার মূল্য ১২, ০০, ০০০ দিরহাম অর্থাৎ ৩০, ০০০ পাউন্ড।[৫৯]

সাসানীদের কল্পকাহিনীর মতো জমকালো প্রাসাদসমূহে বিপুল সংখ্যক মূল্যবান দ্রব্য- সামগ্রী, হীরা- জহরত, মণিমুক্তা এবং বিস্ময়কর চিত্রকলা ও ছবির সংগ্রহ ছিল যা দর্শনার্থীদের বিস্ময়াভিভূত করত। আমরা যদি এ সব শাহী প্রাসাদের বিস্ময়কর বিষয়াদি জানতে চাই তাহলে কেবল একটি বৃহদাকার সাদা কার্পেটের ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করলেই চলবে যা একটি (সাসানী) রাজপ্রাসাদে বিছিয়ে রাখা হয়েছিল। উক্ত কার্পেটের নাম ছিল 'বাহারিস্তানে কিসরা ' অর্থাৎ সম্রাট কিসরা বা খসরুর বসন্তবাগান। সাসানী শাসকবর্গ এ কার্পেটটি এ কারণে তৈরি করিয়েছিলেন যাতে করে তাঁরা আমোদ- প্রমোদ করার সময় হর্ষোৎফুল্ল থাকতে পারেন এবং সর্বদা বসন্ত ঋতুর সুন্দর ও আনন্দদায়ক দৃশ্য উপভোগ করতে পারেন।[৬০]

বর্ণনামতে এ কার্পেটের দৈর্ঘ্য ছিল ১৫০ হাত এবং প্রস্থ ৭০ হাত; আর এর সমস্ত সুতা স্বর্ণ, হীরা- মুক্তা ও জহরত খচিত ছিল।[৬১]

সাসানী সম্রাটদের মধ্যে সম্রাট খসরু পারভেজই অ সকল সম্রাটের চেয়ে বেশি জাঁকজমক, বিলাসিতা ও জৌলুসপ্রিয় ছিলেন। তাঁর শাহী হেরেমে নারী, দাসী, গায়িকা ও নর্তকীদের সংখ্যা কয়েক হাজার ছাড়িয়ে গিয়েছিল।

হামযাহ্ ইসফাহানী 'সানা মুলূকিল আরদ ' গ্রন্থে সম্রাট খসরু পারভেজের শান- শওকত, জৌলুস ও বিলাসিতা ঠিক এভাবে বর্ণনা করেছেন :

পারস্য সম্রাট খসরু পারভেজের তিন হাজার স্ত্রী, ১২০০০ গায়িকা দাসী, ৬০০০ দেহরক্ষী পুরুষ সৈনিক, ৮৫০০টি সওয়ারী ঘোড়া, ৯৬০টি হাতী, মালপত্র বহন করার জ ১২০০০টি গাধা এবং ১০০০টি উট ছিল।[৬২]

এরপর তাবারী আরো বলেছেন, এ সম্রাট অ সকলের চেয়ে বেশি মনিমুক্তা, হীরা- জহরত এবং মূল্যবান তৈজসপত্রের প্রতি আগ্রহ প্রদর্শন করতেন।[৬৩]

ইরানের সামাজিক অবস্থা

সাসানী যুগে ইরানের সামাজিক অবস্থা সে দেশের দরবার ও রাজনৈতিক অবস্থার চেয়ে কোনভাবেই ভালো ছিল না। শ্রেণীশাসন ও শোষণ যা সুদূর প্রাচীনকাল থেকেই ইরানে বিদ্যমান ছিল তা সাসানীদের যুগে সবচেয়ে মারাত্মক আকার ধারণ করে।

অভিজাত ও পুরোহিতশ্রেণী অ া শ্রেণী অপেক্ষা অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত শ্রেণী বলে বিবেচিত হতো। সকল ধরনের সামাজিক সংবেদনশীল পদ ও পেশা তাদেরই করায়ত্তে ছিল। পেশাজীবী ও কৃষকগণ সকল প্রকার ায্য অধিকারভিত্তিক ও সামাজিক সুযোগ- সুবিধা থেকে বঞ্চিত ছিল। কেবল কর প্রদান এবং যুদ্ধে অংশগ্রহণ করা ব্যতীত তাদের অ কোন পেশাই ছিল না।

সাসানীদের শ্রেণীবৈষম্যের বিষয়ে নাফীসী লিখেছেন :

“ যে বিষয়টি ইরানী জনগণের মধ্যে সবচেয়ে বেশি কপটতার প্রসার ও প্রচলন করেছিল তা ছিল অতি নিষ্ঠুর শ্রেণীবৈষম্য যা সাসানীরা ইরানে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। আর শ্রেণীবৈষম্যের মূল পূর্বতন সভ্যতাসমূহের মাঝেই নিহিত ছিল। কিন্তু সাসানীদের যুগে কঠোরতা আরোপের বিষয়টি চরমভাবে বৃদ্ধি পায়।

পারস্য সমাজে প্রথম স্থানে অবস্থানকারী সাত অভিজাত বংশ এবং তাদের পর পাঁচটি শ্রেণী এমন সব সুযোগ- সুবিধা ভোগ করত যা থেকে সাধারণ জনগণ বঞ্চিত ছিল। মালিকানা ও স্বত্বাধিকার প্রায় ঐ সাত পরিবার বা বংশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। সাসানী ইরানের জনসংখ্যা ছিল ১৪০ মিলিয়ন (১৪ কোটি)। ঐ সাত বংশের প্রতিটির লোকসংখ্যা যদি এক লক্ষও ধরি তাহলে ঐ সাত বংশের সম্মিলিত লোকসংখ্যা ৭, ০০, ০০০ হবে। আর সৈ - সামন্ত এবং জমিদারশ্রেণী যাদেরও কিছুটা মালিকানা স্বীকৃত ছিল তাদের সংখ্যাও যদি আমরা ৭, ০০, ০০০ বলে অনুমান করি তাহলে এ চৌদ্দ কোটি জনসংখ্যার মধ্যে প্রায় ১৫, ০০, ০০০ ব্যক্তির মালিকানা ছিল এবং বাকী জনগণ ষ্টাপ্রদত্ত এই স্বাভাবিক অধিকার থেকে বঞ্চিত ছিল।[৬৪]

পেশাজীবী ও কৃষিজীবিগণ যারা সকল প্রকার অধিকার সংক্রান্ত সুযোগ- সুবিধা থেকে বঞ্চিত ছিল, কিন্তু অভিজাতশ্রেণীর তাবৎ ব্যয়ভার যাদের স্কন্ধে অর্পিত হয়েছিল তারা এ অবস্থা বজায়

রাখার ক্ষেত্রে নিজেদের কোন স্বার্থ বা লাভের কথা চিন্তাও করতে পারত না। এ কারণেই অধিকাংশ কৃষিজীবী এবং সমাজের নিম্নশ্রেণীর লোক নিজেদের পেশা ত্যাগ করে অসহনীয় কর থেকে বাঁচার জ   মঠ অর্থাৎ সন্ন্যাসীদের আস্তানায় আশ্রয়গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছিল।[৬৫]

'সাসানীদের যুগে ইরান' নামক গ্রন্থের লেখক ইরানের কৃষিজীবী ও শ্রমিকশ্রেণীর দুর্ভাগ্য সম্পর্কে লিখেছেন : "এমিয়ান মার্সেলিনোস নামক পাশ্চাত্যের এক ঐতিহাসিকের বাণী এভাবে উদ্ধৃত হয়েছে : ইরানের কৃষিজীবী ও শ্রমিকশ্রেণী সাসানীদের যুগে চরম দীনতা ও দুর্ভাগ্যের মধ্যে দুর্বিষহ জীবনযাপন করত। তারা যুদ্ধের সময় সেনাবাহিনীর পেছনে পায়ে হেঁটে যাত্রা করত। তাদেরকে এমনভাবে মর্যাদাহীন বলে গণ্য করা হতো যেন তাদের ললাটে চিরকালের জ   দাসত্ব লিখে দেয়া হয়েছে। তারা তাদের শ্রমের বিনিময়ে কোন মজুরি লাভ করত না।"[৬৬]

সাসানী সাম্রাজ্যের একটি মুষ্টিমেয় শ্রেণী যারা জনসংখ্যায় শতকরা ১.৫ ভাগের কম ছিল তারাই সব কিছুর অধিকারী ছিল। কিন্তু ইরানের জনসংখ্যার শতকরা ৯৮ ভাগের বেশি দাসশ্রেণীর মতো জীবনের সকল অধিকার থেকে বঞ্চিত ছিল।

অভিজাতশ্রেণীই শিক্ষাগ্রহণের অধিকার রাখত

সাসানী যুগে কেবল অভিজাত ও উচ্চ পদমর্যাদাসম্পন্ন শিশুরাই বিদ্যার্জন করার অধিকার রাখত। সাধারণ জনতা ও সমাজের মধ্যবিত্তশ্রেণী শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত ছিল।

প্রাচীন ইরানের সংস্কৃতিতে সবচেয়ে বড় এ ত্রুটি এতটা প্রকট ছিল যে, এমনকি 'শাহনামা' ও রাজা-বাদশাদের উপাখ্যান রচয়িতাগণ যাঁদের একমাত্র লক্ষ্যই হচ্ছে বীরত্বগাথা রচনা করা তাঁরাও এ বিষয়টি স্পষ্ট করে উল্লেখ করেছেন।

ইরানের বীরত্বগাথা রচয়িতা কবি ফেরদৌসী 'শাহনামা'য় একটি কাহিনী বর্ণনা করেছেন যা এ বিষয়টির সর্বোত্তম সাক্ষ্য-প্রমাণ। কাহিনীটি সম্রাট আনুশীরওয়ানের শাসনামল অর্থাৎ যখন সাসানী সাম্রাজ্যের স্বর্ণযুগ তখন সংঘটিত হয়েছিল। এ কাহিনী থেকে প্রমাণিত হয়ে যায় যে, তাঁর শাসনামলে প্রায় সকল অধিবাসীরই শিক্ষা ও বিদ্যার্জন করার অধিকার ছিল না, এমনকি

জ্ঞানপ্রেমিক সম্রাট আনুশীরওয়ানও অ া শ্রেণীর জনসাধারণকে জ্ঞানার্জনের অধিকার দিতে প্রস্তুত ছিলেন না।

ফেরদৌসী লিখেছেন : ইরান ও রোমের যুদ্ধের ব্যয়ভার মেটানোর জ একজন জুতা নির্মাতা (মুচি) তার স্বর্ণ ও রূপার ভাণ্ডার দান করতে চেয়েছিল। সে সময় সম্রাট আনুশীরওয়ান আর্থিক সাহায্য ও পৃষ্ঠপোষকতার তীব্র মুখাপেক্ষী হয়ে পড়েছিলেন। কারণ ইরানের প্রায় তিন লক্ষ সৈ তখন তীব্র খাদ্য ও অস্ত্র সংকটের মুখোমুখি হয়ে পড়েছিল। সম্রাট আনুশীরওয়ান এ অবস্থার কারণে খুবই উদ্বি এবং তাঁর নিজ পরিণতি সম্পর্কেও শ ি ত হয়ে পড়েন। সম্রাট তাৎক্ষণিকভাবে জ্ঞানী প্রধানমন্ত্রী বুযুর্গমেহেরকে সংকট থেকে মুক্তি পাওয়ার উপায় খুঁজে বের করার জ ডেকে পাঠিয়ে নির্দেশ দেন যেন তিনি মাযেনদারান গমন করে যুদ্ধের খরচের জ প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করেন। কিন্তু বুযুর্গমেহের সম্রাটকে বললেন, ‘বিপদ অত্যাসন্ন। তাই তাৎক্ষণিকভাবে একটি উপায় খুঁজে বের করা আবশ্যক। ” তখন বুযুর্গমেহের ‘জাতীয় ঋণ ’ অর্থাৎ জাতির কাছ থেকে ঋণ গ্রহণ করার পরামর্শ দিলেন। সম্রাট আনুশীরওয়ানও তাঁর এ প্রস্তাবটি পছন্দ করলেন এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এ ক্ষেত্রে বাস্তব পদক্ষেপ নেয়ার নির্দেশও জারী করলেন। বুযুর্গমেহের নিকটবর্তী শহর, গ্রাম ও জনপদে রাজকীয় কর্মকর্তাদের প্রেরণ করে ঐ সকল স্থানের সচ্ছল ব্যক্তিদের আসন্ন বিপদ সম্পর্কে অবগত করলেন।

তখন একজন জুতা নির্মাতা যুদ্ধের যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করতে প্রস্তুত হয়ে যায়। তবে এ ক্ষেত্রে সে যা চেয়েছিল তা হলো : এর বিনিময়ে তার একমাত্র পুত্রসন্তান যে লেখাপড়া শিখতে অত্যন্ত আগ্রহী তাকে যেন লেখাপড়া শেখার অনুমতি দেয়া হয়। বুযুর্গমেহের ঐ মুচির আবেদনকে তার দানের তুলনায় অত্যন্ত নগণ্য বলে মনে করেন এবং সম্রাটের কাছে ফিরে গিয়ে তার আর্জি সম্পর্কে সম্রাটকে অবহিত করেন। আনুশীরওয়ান এ কথা শুনে খুব রেগে যান এবং প্রধানমন্ত্রী বুযুর্গমেহেরকে তিরস্কার করে বলেন, “ তুমি এ কেমন আবেদন করছ? এ কাজ কল্যাণকর নয়। কারণ যে শ্রেণীবি াসের আওতায় সে রয়েছে তা থেকে তার বের হয়ে আসার মাধ্যমে দেশের

শ্রেণীপ্রথা ধসে পড়বে এবং তখন সে যে স্বর্ণ ও রৌপ্য দান করছে তার মূল্যমান অপেক্ষা তার এ আর্জি অনেক বেশি ক্ষতি বয়ে আনবে।"

এরপর ফেরদৌসী সম্রাট আনুশীরওয়ানের ক তাঁর (সম্রাটের) 'মেকিয়াভ্যালি দর্শন' ব্যাখ্যা করেছেন:

"বণিকপুত্র যদি হয় সচিব
গুণী, জ্ঞানী ও শিক্ষানবীশ
তাই যখন বসবে মোদের যুবরাজ সিংহাসন 'পরি
অবশ্যই পাবে সে তখন এক (দক্ষ ও গুণী) ভাগ্যমান সহকারী
আর কভু যদি মোজা বিক্রেতা করে এ গুণ ও জ্ঞান অর্জন
এ জ্ঞান দেবে তারে অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন চক্ষু
আর নীচ বংশজাত জ্ঞানীকে দেবে অনুধাবনকারী কর্ণ
ব্যস্, তখন পরিতাপ ও শীতল বায়ু ছাড়া রইবে না আর কিছু।"

এভাবেই ায়পরায়ণ (!) বাদশার নির্দেশে জুতা নির্মাতা লোকটির টাকা- পয়সা ফেরত পাঠিয়ে দেয়া হয়। ঐ হতভাগা জুতা নির্মাতা তীব্র মনঃকষ্ট পায় এবং সে রাতের বেলা ায়বিচারক ষ্টার দরবারে দু'হাত উঠিয়ে এ ধরনের অত্যাচার ও ায্য অধিকার হরণের বিরুদ্ধে প্রার্থনা করে- যা হচ্ছে মজলুমদেরই রীতি। আর এভাবে সে মহান আল্লাহর ায়বিচারের ঘণ্টা ধ্বনিত করে।

"প্রেরিত দূত ফিরে আসল এবং ঐ দিরহামগুলো দেখতে পেয়ে
ঐ মুচির অন্তর হলো তীব্র দুঃখভারাক্রান্ত
রাত হলে শাহের কথায় হলো সে দুঃখভারাক্রান্ত
মহান আল্লাহর দরবারে সে চাইল ঐশী আদালতের ঘণ্টাধ্বনি ধ্বনিত হোক।"[৬৭]

এত কিছু সত্ত্বেও সম্রাট আনুশীরওয়ানের বিশাল প্রচারমাধ্যম ও প্রশাসন তাঁকে ায়পরায়ণ বলে আখ্যায়িত করতে এবং ইরানী সমাজকে এ বিষয়টি উপলব্ধি করতে উদ্বুদ্ধ করেছে। কিন্তু তথাকথিত ায়পরায়ণ এ শাহ তদানীন্তন ইরানী সমাজের মৌলিক সমস্যার জট খুলতে তো

সক্ষম হননি; বরং ইরানীদের প্রভূত সামাজিক সমস্যার কারণও হয়েছিলেন। কেবল মাযদাক গোলযোগের ঘটনায় আশি হাজার এবং অপর একটি অভিমত অনুযায়ী এক লক্ষ ইরানীকে জীবন্ত মাটিতে পুঁতে হত্যা করা হয়েছিল। তিনি ধারণা করেছিলেন যে, উক্ত ফিতনা পুরোপুরি নির্মূল হয়ে গেছে।[৬৮] অথচ এ ফিতনা যে মূলোৎপাটিত হয় নি তা তিনি মোটেও উপলব্ধি করতে পারেন নি। এ ধরনের শাস্তি আসলে ফলাফলের অস্তিত্ব নিশ্চিহ্ন করে দেয়, তা কারণের অস্তিত্ব বিলোপ করে না। এ হচ্ছে পাপীদের বিরুদ্ধে তথাকথিত সংগ্রাম- পাপ ও অপরাধের বিরুদ্ধে নয়। ফিতনার মূল কারণই ছিল সমাজে ভারসাম্যহীনতা, শ্রেণীবৈষম্য, দ্বন্দ্ব, বিশেষ একটি শ্রেণী কর্তৃক সম্পদ ও পদমর্যাদা কুক্ষিগতকরণ, নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের দারিদ্র্য ও বঞ্চনা এবং অপরাপর দুর্নীতি ও অপরাধ। আর সম্রাট আনুশীরওয়ান অস্ত্র বল ও চাপ প্রয়োগ করে চাইতেন যে, জনগণ সন্তুষ্টি প্রকাশ করুক।

এডওয়ার্ড ব্রাউন সম্রাট আনুশীরওয়ানের ায়পরায়ণতা সম্পর্কে লিখেছেন : "সম্রাট আনুশীরওয়ান নাস্তিকদের বিরুদ্ধে বেশ কিছু কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন এবং এ কারণে তিনি যারথুস্ত্রীয় (যারদোশ্ত) ধর্মযাজকদের প্রশংসা ও সম্মতি অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। আর ঐ সব ধর্মযাজকের হাতেই জাতীয় ইতিহাস রচিত হয়েছে...।"[৬৯] এ সব আনুষ্ঠানিক স্বীকৃত ইতিহাসে সম্রাট আনুশিরওয়ানকে ায়পরায়ণতা ও মানবতার পূর্ণ আদর্শ এক সম্রাট হিসাবে পরিচিত করানো হয়েছে। এ ব্যাপারে অনেক কাহিনীও রচনা করা হয়েছে।

খুবই আশ্চর্যজনক! এ দীর্ঘ সময় একমাত্র একটি বৃদ্ধ গাধা ব্যতীত আর কোন মজলুমই ায়বিচারের ঘণ্টা বাজায় নি, অবশ্য এটিও জ্ঞাত বিষয় যে, ঐ গাধাটি তার নিজের সাহসের অপরাধের কথা জানত না; আর যদি সে তা জানত তাহলে সে ঘুণাক্ষরেও ায়পরায়ণতার রজ্জুর নিকটবর্তী হতো না!!

আরো বলা হয় যে, একবার রোমের বাদশাহ্, আজম অর্থাৎ ইরানের বাদশাহ্ আনুশীরওয়ানের কাছে এক দূত প্রেরণ করেছিলেন। যখন ঐ দূত ইরানের বাদশার শানশওকত এবং বিশাল তাক- ই কিসরা প্রত্যক্ষ করলেন তখন তিনি দেখতে পেলেন যে, ইরানের বাদশাহ্ সিংহাসনে

উপবিষ্ট; আর রাজারা তাঁর দরবারে উপস্থিত। তিনি এক ঝলক দৃষ্টি শাহী দ্বারমণ্ডপের ওপর নিবদ্ধ করলে উক্ত দ্বারমণ্ডপটি তাঁর দৃষ্টিতে খুবই জমকালো ও জাঁকজমকপূর্ণ বলে মনে হয়। কিন্তু ঐ দ্বারমণ্ডপের চারপাশ যেন একটু বাঁকা। দূত তখন দরবারে উপস্থিত ব্যক্তিবর্গকে এর কারণ জিজ্ঞেস করলে তাঁরা তাঁকে বলেছিলেন : দ্বারমণ্ডপে যে সামা বক্রতা আপনি দেখতে পাচ্ছেন আসলে এর কারণ হচ্ছে এখানে এক বৃদ্ধার ঘর ছিল যা বাদশাহ্ কিনে নিয়ে দ্বারমণ্ডপের অন্তর্ভুক্ত করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ঐ বৃদ্ধা তার ঘর বিক্রি করতে রাজী না হওয়ায় বাদশাহ্ আনুশীরওয়ানও তাকে বিক্রি করতে বাধ্য করেন নি। তাই ঐ বৃদ্ধার বাড়িটিই অবশেষে এ দ্বারমণ্ডপটির বক্রতার কারণ হয়েছে। তখন ঐ দূত শপথ করে বললেন যে, দ্বারমণ্ডপের এই বক্রতা আসলে এর সরল ও অবক্র হওয়া অপেক্ষা শ্রেয়।[৭০]

এটি আশ্চর্যজনক যে, এ ধরনের জাঁকজমকপূর্ণ ভবন ও দ্বারমণ্ডপ যে ব্যক্তি নির্মাণ করতে ইচ্ছুক তিনি কি পূর্ব থেকেই এর নকশা সংগ্রহ করবেন না এবং নকশা ও পর্যাপ্ত পরিমাণ ভূমি ব্যতীতই কেউ কি এ ধরনের ভবন ও স্থাপনা নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে! আর এর ফলে শাহী প্রাসাদ বাঁকা হবে। এ কি কখনো বি াস করা যায়?

আসলে এ ধরনের গালগল্প সম্রাটের দরবারের ব্যক্তিবর্গ ও যারথুস্ত্রীয় ধর্মযাজকগণ, মাযদাকী মতাবলম্বীদের দমন করে সম্রাট তাঁদের স্বার্থে যে মহামূল্যবান খেদমত আঞ্জাম দিয়েছিলেন সে কারণেই তাঁরা সম্রাটের অনুকূলেই রচনা করে থাকতে পারেন।

'ইরান ও ইসলাম' গ্রন্থের লেখকের অভিমত অনুসারে এ সব কিছুর চেয়েও আশ্চর্যজনক ব্যাপার হচ্ছে এই যে, কেউ কেউ সম্রাট আনুশীরওয়ানের ায়পরায়ণতাকে শারয়ী ও নির্ভরযোগ্য বলে প্রমাণ করার জ এ ক্ষেত্রে মহানবী (সা.) ও তাঁর আহলে বাইতের সূত্র থেকেও হাদীস বর্ণনা করতে বাধ্য হয়েছে। যেমন : ولدت في زمن الملك العادل "আমি ায়পরায়ণ বাদশার রাজত্বকালে জন্মগ্রহণ করেছি।" - প্রসিদ্ধ এ হাদীসটি। মহানবী (সা.) যেন এ কথা বলতে গর্ববোধ করতেন যে, তিনি ায়পরায়ণ বাদশাহ্ আনুশীরওয়ানের শাসনামলে জন্মগ্রহণ করেছেন, অথচ মহানবীর সাথে তাঁর (বাদশার) ায়পরায়ণতার কি কোন সম্পর্ক আছে?

অপর একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে : হযরত আলী মাদায়েনে এসে কিসরার প্রাসাদে গমন করলেন। সেখানে তিনি আনুশীরওয়ানকে জীবিত করে তাঁর অবস্থা জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি তখন হযরত আলীকে বলেছিলেন যে, কুফ্রী করার কারণে তিনি বেহেশত থেকে বঞ্চিত হয়েছেন, তবে ায়পরায়ণ হবার কারণে জাহান্নামে শাস্তিপ্রাপ্তও হচ্ছেন না।[৭১] এখন আমরা পর্যালোচনা করব যে, সাসানীরা কি ধরনের অত্যাচার করেছে।

খসরু পারভেজের অপরাধসমূহের পর্দা উন্মোচন

সম্রাট খসরু পারভেজের অত্যাচারমূলক ও পাগলামিপূর্ণ আরেকটি কাজ ছিল প্রসিদ্ধ বুযুর্গমেহেরের সাথে তাঁর আচরণ। এ বুযুর্গমেহের আনুশীরওয়ানের দরবারে ১৩ বছর কর্মরত ছিলেন এবং তিনি প্রভূত যশ ও খ্যাতির অধিকারী হয়েছিলেন। অবশেষে সম্রাট খসরু পারভেজ তাঁকে বন্দী করে কারাগারে নিক্ষেপ করেন। সম্রাট কারাগারে বন্দী বুযুর্গমেহেরের কাছে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন : "তোমার জ্ঞান, বুদ্ধিমত্তা ও বিচক্ষণতা অবশেষে তোমারই নিহত হবার ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছে।" বুযুর্গমেহেরও উত্তরে লিখেছিলেন : "যে পর্যন্ত ভাগ্য আমার প্রতি প্রসন্ন ছিল সে পর্যন্ত আমি আমার বুদ্ধিমত্তা কাজে লাগিয়েছি। এখন যখন ভাগ্য আমার অনুকূলে নেই তখন আমার ধৈর্য ও সহ্যশক্তিকে কাজে লাগাব। আমার হাত দিয়ে যদি অগণিত সৎকর্মসম্পন্ন হয়ে থাকে তাহলে আমি আমার মন্দ কাজ থেকেও নিরাপদ ও নিশ্চিত হয়েছি। আমার কাছ থেকে মন্ত্রিত্ব পদ কেড়ে নেয়া হলেও আমা থেকে ঐ পদের অসংখ্য অ ায় ও অত্যাচারের দুঃখ- কষ্টও দূর করা হয়েছে। অতএব, আমার আর ভয় কিসে?

যখন সম্রাট খসরু পারভেজের হাতে বুযুর্গমেহেরের উক্ত চিঠি পৌঁছালো তখন সম্রাট বুযুর্গমেহেরের নাক ও ঠোঁট কেটে ফেলার আদেশ দিলেন। যখন বুযুর্গমেহেরকে সম্রাটের এ আদেশ শুনানো হলো তখন তিনি উত্তরে বলেছিলেন : "আমার ঠোঁট এর চেয়ে আরোও বেশি শাস্তি পাওয়ার যোগ্য।" সম্রাট খসরু পারভেজ তখন জিজ্ঞাসা করলেন : "কি কারণে?" বুযুর্গমেহের তখন বললেন : "যেহেতু আপামর জনতার কাছে তোমার এমন সব গুণের প্রশংসা করেছি যা তোমার ছিল না এবং অসন্তুষ্ট অন্তঃকরণসমূহকে তোমার প্রতি আকৃষ্ট করেছিলাম। আমি তোমার এমন সব ভালো কাজ ও পুণ্যের কথা জনগণের মধ্যে প্রচার করেছি যার উপযুক্ত তুমি ছিলে না। হে নিকৃষ্ট অসৎকর্মশীল সম্রাট! যদিও আমার সততার ব্যাপারে তুমি নিশ্চিত এতদসত্ত্বেও আমাকে কুধারণার বশবর্তী হয়ে হত্যা করছ? অতএব, তোমার কাছে সুবিচার আশা করা এবং তোমার কথায় ভরসা করা যায় কি?"

সম্রাট খসরু পারভেজ বুযুর্গমেহেরের কথায় খুবই উত্তেজিত হয়ে তাঁর শিরচ্ছেদ করার আদেশ দিলেন।[৭২]

'ইরানের সামাজিক ইতিহাস' গ্রন্থের রচয়িতা- যিনি জাতীয়তাবাদের অ তম প্রবক্তা সাসানী যুগের অরাজকতা, অধঃপতিত অবস্থা ও উত্তেজনাকর পরিস্থিতির কারণসমূহ বর্ণনা করতে গিয়ে কেবল দেশের অভিজাতশ্রেণীর জ শিক্ষাগ্রহণের অধিকার ও সুযোগ সীমিত থাকার বিষয়টি এভাবে চিত্রিত করেছেন :

"এ যুগে তখনকার প্রচলিত সকল জ্ঞান ও শাস্ত্র অধ্যয়ন এবং শিক্ষা কেবল পুরোহিত, যাজক ও অভিজাতশ্রেণীর সন্তানগণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল; আর ইরানের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ শিক্ষার অধিকার থেকে বঞ্চিত ছিল।"[৭৩]

হ্যাঁ, এ জাহেলী প্রথা সাসানী সম্রাটদের দৃষ্টিতে খুবই গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হতো। আর তাঁরা কোনভাবেই এ বিষয়টি পরিহার করতে চাইতেন না।

এ কারণেই সৌভাগ্য ও সুখের ক্রোড়ে প্রতিপালিত এ সংখ্যালঘু শ্রেণীটির অপরিপক্ক ও অসংযত প্রবৃত্তি ও রিপুর কামনা- বাসনা ইরানের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণকে জ্ঞানার্জনের অধিকারসহ সকল বৈধ সামাজিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছিল।

সাসানী সম্রাটদের ব্যাপারে ইতিহাসের ফয়সালা

সাসানী সম্রাটগণ প্রধানত এবং বিশেষ করে প্রশাসনের ক্ষেত্রে অতি নিষ্ঠুর ও অমানবিক নীতি গ্রহণ করেছিলেন এবং তাঁরা জনগণকে অস্ত্রের ভয় দেখিয়ে নিজেদের অনুগত রাখতে চাইতেন। তাঁরা জনগণ থেকে বিপুল পরিমাণ কর বলপূর্বক আদায় করতেন যা তাদের জ খুবই কঠিন ছিল। আর এ কারণে ইরানের জনগণ সার্বিকভাবে অসন্তুষ্ট ছিল। কিন্তু প্রাণের ভয়ে তারা এ ব্যাপারে কথা বলতে পারত না, এমনকি সচেতন জনতা, সাসানী দরবারের বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিবর্গেরও কোন মূল্য ছিল না।

সাসানী শাসকগণ এতটা একগুঁয়ে ও স্বেচ্ছাচারী ছিলেন যে, (তাঁদের সামনে) কোন ব্যক্তিরই কোন কাজে নিজ মতামত ব্যক্ত করার অধিকার ছিল না।

প্রভাবশালী ও ক্ষমতাশালী ব্যক্তিদের মাধ্যমে ইতিহাসের বিকৃতি সাধন করা সত্ত্বেও অ ায় অত্যাচারের পরিধি এতটা বিস্তৃতি লাভ করেছিল যে, ইতিহাসের পাতায় পাতায় অত্যাচারীদের অ ায়- অত্যাচার সংক্রান্ত ঘটনা ও কাহিনী বর্ণিত হয়েছে।

সম্রাট খসরু পারভেজ এতটা নিষ্ঠুর ছিলেন যে, ঐতিহাসিক সা'লিবী লিখেছেন, "সম্রাট খসরুকে একবার বলা হলো যে, অমুক শাসনকর্তাকে দরবারে আহবান করা হলে তিনি দরবারে উপস্থিত না হওয়ার ব্যাপারে টালবাহানা করছেন ও অজুহাত দেখাচ্ছেন। সম্রাট খসরু তৎক্ষণাৎ আদেশ দিলেন : আমাদের কাছে তার সশরীরে আসা যদি কষ্টসাধ্য হয় তাহলে তার দেহের একটি ক্ষুদ্র অংশই আমাদের জ যথেষ্ট যার ফলে তার কাজও তার জ সহজসাধ্য হয়ে যাবে। বলে দাও, কেবল তার মাথাটা যেন আমাদের কাছে পাঠিয়ে দেয়া হয়। " [৭৪]

সাসানী প্রশাসন ও সরকারের মধ্যে উত্তেজনা

সাসানী যুগের শেষভাগে যে বিষয়টি অবশ্যই উল্লেখ না করে পারা যায় না তা ছিল সাসানী প্রশাসনে গোলযোগ ও স্বেচ্ছাচারিতার প্রসার, ষড়যন্ত্র এবং রাজ্যজুড়ে বিশৃঙ্খলা। রাজপুত্রগণ, অভিজাতশ্রেণী এবং সেনাপতিগণ পরস্পর দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়ে পড়েছিল। যে দলই

একজন রাজপুত্রকে মনোনীত করত আরেকটি দল তাকে হত্যা করত এবং তদস্থলে অ   কোন রাজপুত্রকে সম্রাট মনোনীত করত। যখন মুসলমানরা ইরান জয় করার চিন্তা করছিল তখন সাসানী রাজকীয় পরিবার চরম দুর্বলতা ও কপটতা কবলিত হয়ে পড়েছিল।

সম্রাট খসরু পারভেজের নিহত হবার পর থেকে চার বছরের মধ্যে অর্থাৎ শীরাভেই- এর সিংহাসনে আরোহণ করার সময় থেকে সর্বশেষ সাসানী সম্রাট ইয়াযদগারদের সিংহাসনে আরোহণ পর্যন্ত যাঁরা ইরানের শাহী তখেত আরোহণ করেছিলেন তাঁদের সংখ্যা ৬ থেকে ১৪ জন পর্যন্ত (ইতিহাসে) উল্লেখ করা হয়েছে।

এভাবেই ৪ বছরের মধ্যে ১৪ বার অথবা তার চেয়ে কিছু কমসংখ্যকবার ইরানের রাজকীয় ক্ষমতা হাতবদল হয়েছে। এটি খুবই স্পষ্ট, যে রাষ্ট্রে ৪ বছরের মধ্যে ১৪ বার ক্যুদেঁতা সংঘটিত হয় এবং প্রতিবারই যদি একজন রাষ্ট্রপ্রধানকে হত্যা করে তদস্থলে অ   এক ব্যক্তিকে সিংহাসনে বসানো হয় তাহলে ঐ রাষ্ট্র বা সাম্রাজ্যের পরিণতি কি হতে পারে!

প্রত্যেক শাসনকর্তা ক্ষমতাগ্রহণ করার পর যারা রাজসিংহাসনের দাবিদার ছিল তাদের সবাইকে হত্যা করত। তারা নিজেদের রাজত্ব স্থায়ীভাবে নিজেদের করায়ত্তে রাখার জ   কত জঘ   কাজই না করেছে! পিতা পুত্রকে, পুত্র পিতাকে হত্যা করত। ভাই ভাইদের হত্যা করত।

শীরাভেই রাজকর্তৃত্ব হস্তগত করার জ   নিজ পিতাকে হত্যা করেছিলেন।[৭৫] আর একই সাথে তিনি খসরু পারভেজের ৪০ পুত্রসন্তানকেও বধ করেছিলেন।[৭৬]

'শাহর বারায' কাউকে বি াস করতে না পারলেই তাকে হত্যা করতেন। পরিশেষে যারা রাজত্ব লাভ করেছিল তারা সবাই কি পুরুষ, কি মহিলা, কি বড় ও কি ছোট, সকল নিকটাত্মীয় অর্থাৎ সাসানী রাজপুত্রদেরকে (ঠাণ্ডা মাথায়) হত্যা করত যাতে করে সাম্রাজ্যে রাজসিংহাসনের কোন দাবিদার বিদ্যমান না থাকে।

সংক্ষেপে, সাসানী যুগে বিশৃঙ্খলা এতটা বৃদ্ধি পেয়েছিল যে, শিশু ও নারীদেরকে রাজসিংহাসনে বসানো হতো এবং কয়েক সপ্তাহ পরে তাদেরকে হত্যা করে অ   কাউকে তার স্থলে বসানো হতো।

এভাবেই সাসানী সাম্রাজ্য বাহ্যিক শানশওকত ও জৌলুস থাকা সত্ত্বেও দিন দিন পতন ও ধ্বংসের দিকে ধাবিত হচ্ছিল।

ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে সাসানীয় ইরানের দুরবস্থা

সাসানী যুগে ইরানের দুর্দশা ও দুরবস্থার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কারণই ছিল ধর্মীয় মতভেদ।

সাসানী রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা ‘আরদশীর বাবাকান ’ যেহেতু নিজেই পুরোহিতসন্তান ছিলেন এবং যারদোশতী ধর্মযাজকদের সহায়তায় রাজকর্তৃত্ব লাভ করেছিলেন সেহেতু তিনি সম্ভাব্য সকল পন্থায় ইরানে নিজ পূর্বপুরুষদের ধর্মের প্রচার ও প্রসার করেছিলেন।

সাসানী যুগে ইরানের জনগণের আনুষ্ঠানিক ধর্ম ছিল যারদোশত কর্তৃক প্রবর্তিত ধর্ম। যেহেতু সাসানী সালতানাত ধর্মযাজকদের সাহায্য ও সমর্থনের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তাই যারদোশতী ধর্মযাজকগণ সাসানী প্রশাসন কর্তৃক পরিপূর্ণ পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিলেন। পরিণতিতে সাসানী যুগে যারদোশতী ধর্মযাজকগণ তদানীন্তন ইরানের সবচেয়ে প্রভাবশালী ও শক্তিশালী শ্রেণীতে পরিণত হয়েছিলেন।

সাসানী শাসকগণ সর্বদা যারদোশতী ধর্মযাজকদের হাতের ক্রীড়নক ছিলেন। তাই কোন শাসক যদি ধর্মযাজকদের আনুগত্য না করতেন তাহলে তিনি তাঁদের তীব্র বিরোধিতার সম্মুখীন হতেন। এ কারণেই সাসানী বাদশাগণ সমাজের অ   সকল শ্রেণীর চেয়ে ধর্মযাজকদের প্রতি বেশি মনোযোগ দিতেন। আর সাসানীদের পৃষ্ঠপোষকতা, সমর্থন ও সাহায্যের কারণে পুরোহিতদের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছিল।

সাসানীরা নিজেদের রাজত্ব ও সাম্রাজ্য সুসংহত করার জ   ধর্মযাজকদের সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করেছিলেন। আর ইরানের প্রত্যন্ত অঞ্চলেও বিরাট বিরাট অি উপাসনালয় প্রতিষ্ঠা করতেন। প্রতিটি অি উপাসনালয়ে প্রচুর ধর্মযাজক অবস্থান করতেন।

ইতিহাসে লিপিবদ্ধ আছে : খসরু পারভেজ এমন একটি অি উপাসনালয় নির্মাণ করেছিলেন এবং সেখানে ১২০০০ ধর্মযাজক নিযুক্ত করেছিলেন যাঁরা ধর্মীয় সংগীত ও প্রার্থনার অনুষ্ঠান পরিচালনা করতেন।[৭৭]

এভাবেই যারদোশতী ধর্ম আনুষ্ঠানিক ধর্মে পরিণত হয়েছিল। ধর্মযাজকগণ তাঁদের সর্বশক্তি নিয়োগ করে সমাজের বঞ্চিত ও কষ্টসহিষ্ণু শ্রেণীগুলোকে শান্ত ও তৃপ্ত করার চেষ্টা করতেন। তাঁরা এমনভাবে চেষ্টা করতেন যাতে করে সাধারণ জনতা নিজেদের দুরবস্থা উপলব্ধি করতে সক্ষম না হয়।

ধর্মযাজকদের অসীম চাপ ও ক্ষমতা জনগণকে যারদোশতী ধর্ম সম্পর্কে বীতশ্রদ্ধ করে তোলে। তাই সাধারণ জনগণ অভিজাতশ্রেণীর ধর্মমত বর্জন করে অ ধর্মের সন্ধান করতে থাকে।

'ইরানের সামাজিক ইতিহাস' গ্রন্থের রচয়িতা লিখেছেন : "বাধ্য হয়েই ইরানের জনগণ সম্ভ্রান্তশ্রেণী ও যাজক সম্প্রদায়ের চাপের কারণে এ সব অস্বস্তিকর অবস্থা থেকে নিজেদেরকে বের করে আনার চেষ্টা করছিল। এ কারণেই রাষ্ট্রের আনুষ্ঠানিক ধর্ম 'মাযদা ইয়াসতী যারতুশতী' (مزديستى زرتشتي) -যা 'বেহদীন' হিসাবে পরিচিত ছিল তার বিপরীতে যারদোশতী ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে দু'টি পৃথক মতের আবির্ভাব হয়েছিল।" [৭৮]

হ্যাঁ, অভিজাতশ্রেণী ও ধর্মযাজকদের চাপ ও কড়াকড়ির কারণেই সাসানী ইরানে একের পর এক বিভিন্ন মাযহাবের (ধর্মমত ও সম্প্রদায়) উদ্ভব হয়েছিল। ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক অবস্থাসমূহের মধ্যে সংস্কার ও পরিবর্তন সাধন করার জ 'মাযদাক'(مزدك) ও তাঁর পূর্বে 'মনী' প্রভৃত চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু তাঁরা কেউ সফল হন নি।[৭৯]

৪৯৭ ি ষ্টাব্দে মাযদাক বিদ্রোহ করেছিলেন। একচেটিয়া মালিকানার বিলুপ্তি, ব বিবাহ এবং হেরেম নিষিদ্ধকরণ তাঁর সংস্কারমূলক কর্মসূচীর শীর্ষে স্থান পেয়েছিল। যখন বঞ্চিত শ্রেণীগুলো এ ধরনের কর্মসূচী সম্পর্কে অবগত হলো তখন তারা প পালের মতো তাঁর চারপাশে সমবেত হয়েছিল এবং তাঁর নেতৃত্বে একটি ব্যাপক বি বের সূচনা করেছিল। জনগণ যাতে করে তাদের ষ্টাপ্রদত্ত অধিকারসমূহ পেতে পারে সেজ এ বি ব পরিচালিত হয়েছিল। অবশেষে মাযদাকের আন্দোলন যাজকশ্রেণীর প্রতিরোধ ও রাজকীয় সেনাবাহিনীর বিরোধিতার সম্মুখীন হয় এবং ইরানে বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতার সৃষ্টি করে।

আর ঠিক একইভাবে সাসানী যুগের শেষে যারদোশতী ধর্মমত সম্পূর্ণরূপে নিজস্ব বাস্তব রূপ হারিয়ে ফেলেছিল। 'অি ' কে পবিত্র মনে করার বিষয়টি এমন এক পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে, গলিত লোহা যা আগুনের সংস্পর্শে থাকার কারণে আগুনের প্রকৃতি গ্রহণ করত তাতে হাতুড়ি মারা অবৈধ বলে গণ্য করা হতো। যারদোশতী ধর্মমতের আকীদা- বি াসসমূহ ছিল বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কুসংস্কারাচ্ছন্ন ও পৌরাণিক। এ যুগে এ ধর্মের যাবতীয় বাস্তবতার স্থান কতগুলো নি প্রাণ, অনর্থক স্লোগান ও আচার- প্রথা দখল করে নিয়েছিল। ধর্মযাজকগণ সর্বদা নিজেদের অবস্থান শক্তিশালী করার জ এ সব স্লোগান ও রীতিনীতির আনুষ্ঠানিকতা বৃদ্ধি করেছিলেন। অযৌক্তিক কল্পকাহিনী ও কুসংস্কারসমূহ এত পরিমাণে ধর্মে অনুপ্রবেশ করেছিল যে, এমনকি ধর্মযাজকগণ পর্যন্তও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন। ধর্মযাজকদের মধ্যে এমন সব ব্যক্তিও ছিলেন যাঁরা প্রথম থেকেই যারদোশতী ধর্মমতের আকীদা- বি াস, রীতিনীতি এবং আচার- প্রথার অসারত্ব বুঝতে পেরেছিলেন এবং এগুলো থেকে বের হয়ে এসেছিলেন।

অ দিকে আনুশীরওয়ানের শাসনামলের পর থেকেই ইরানে গভীরভাবে চিন্তা করার পথ উন্মুক্ত হয়েছিল; গ্রীক ও ভারতীয় কৃষ্টির অনুপ্রবেশ এবং একইভাবে ি ষ্টধর্ম ও অ া ধর্মমতের সাথে যারদোশতী ধর্মমত আসার কারণে এ বিষয়টি (অর্থাৎ গভীর চিন্তা ও ধ্যান- ধারণা) আগের চেয়ে আরো বেশি শক্তিশালী হয়েছিল এবং এ কারণে ইরানী জাতির মধ্যে জাগরণ এসেছিল। আর এ জ ই তারা যারদোশতী ধর্মমতের ভিত্তিহীন বিষয় ও কুসংস্কারসমূহের কারণে অ যে কোন সময়ের চেয়ে বেশি কষ্ট পেতে থাকে।

অবশেষে যারদোশতী সমাজ ও ধর্মযাজক সম্প্রদায়ের মধ্যে যে দুর্নীতির উদ্ভব হয়েছিল এবং এ ধর্মে যে সব অযৌক্তিক কল্পকাহিনী অনুপ্রবেশ করেছিল তা ইরানী জাতির আকীদা- বি াসে মতবিরোধ ও অনৈক্যের সৃষ্টি করেছিল। এ ধরনের মতবিরোধ এবং বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের উদ্ভবের ফলে চিন্তাশীল শ্রেণীর মধ্যে সন্দেহ ও সংশয়ের বীজ রোপিত হয়। আর তা তাদের মধ্য থেকে ধীরে ধীরে অ দের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। পরিণতিতে ইরানী জাতি পূর্বের ধর্মীয় আকীদা- বি াস সম্পূর্ণরূপে হারিয়ে ফেলে।

এভাবেই বিশৃঙ্খলা ও অধার্মিকতা সমগ্র ইরানে ব্যাপকহারে ছড়িয়ে পড়ে। উদাহরণস্বরূপ, সাসানী যুগের প্রসিদ্ধ চিকিৎসাবিজ্ঞানী বারযাওয়াইহ্ ‘কালীলাহ্ ওয়া দিমনাহ্’ গ্রন্থের প্রারম্ভিকায় সাসানী ইরানের শোচনীয় অবস্থা এবং তীব্র ধর্মীয় মতবিরোধের চিত্র অ ন করেছেন।

ইরান ও রোম সাম্রাজের মধ্যকার যুদ্ধসমূহ

বুযুর্গমেহের যিনি অত্যন্ত বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমান ছিলেন এবং আনুশীরওয়ানের প্রশাসনযন্ত্রের প্রধান (প্রধানমন্ত্রী) ছিলেন তিনি তাঁর বিচক্ষণতা ও অভিজ্ঞতার সদ্ব্যবহার করে অনেক সময় ইরানকে বড় বড় বিপদের হাত থেকে রক্ষা করেছেন। কিন্তু কখনো কখনো ষড়যন্ত্রকারীরা সম্রাট আনুশীরওয়ানের সাথে তাঁর সম্পর্কের অবনতি ঘটাত এবং তাঁকে (আনুশীরওয়ানকে) তাঁর বিরুদ্ধে প্ররোচিত করে তাঁকে গ্রেফতার করার ফরমান জারি করাত।

এ সব বিবাদপ্রিয় বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী রোম সম্রাট সম্পর্কে সম্রাট আনুশীরওয়ানকে ক্ষেপিয়ে তুলত। তারা দেশের সীমানা প্রসারিত করা এবং ইরানের বিপজ্জনক প্রতিদ্বন্দ্বীকে অর্থাৎ রোমান সাম্রাজ্যকে দুর্বল করার জ চিরস্থায়ী শান্তি ও অনাক্রমণ চুক্তি ভ করে রোমানদের ওপর হামলা করার জ সম্রাট আনুশীরওয়ানকে প্ররোচিত করতে থাকে। অবশেষে যুদ্ধের শিখা প্র লিত হলো। খুব অল্প সময়ের মধ্যে ইরানী সেনাবাহিনী সিরিয়া দখল করল এবং আনতাকীয়ার ওপর আক্রমণ চালিয়ে সমগ্র এশিয়া মাইনরে লুটতরাজ করল। ২০ বছরের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে ইরান ও রোম শক্তি ও সম্পদ নিঃশেষ করে ফেলেছিল। প্রচুর রক্তপাতের পর দু'দেশের মধ্যে পুনরায় সন্ধিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয় এবং ইরান সরকারের কাছে রোমান প্রশাসনের প্রতি বছর ২০, ০০০ দীনার প্রদান করার শর্তে পূর্বেকার মতো দু'দেশের মধ্যে সীমান্ত নির্ধারণ করা হয়।

বলার অপেক্ষা রাখে না যে, এ ধরনের দীর্ঘমেয়াদী যুদ্ধ, তা- ও আবার রাজধানী থেকে দূরবর্তী অঞ্চলসমূহে- একটি জাতির সম্পদ ও শিল্পের ওপর কি পরিমাণ ভয় র আঘাত হানতে পারে! সে সময়ের সুযোগ- সুবিধা বিবেচনাকরতঃ দীর্ঘমেয়াদী যুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতি ও ধ্বংস অতি অল্প সময়ের মধ্যে সংস্কার করা অসম্ভব। এ যুদ্ধ ও লু ন ইরান সরকারের অবশ্যম্ভাবী পতনের কারণ হয়েছিল।

উপরিউক্ত ২০ বছরব্যাপী যুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতি পূরণ হতে না হতেই রোমান সম্রাট তি- বারিয়োস্ সিংহাসনে আরোহণ করার পর প্রতিশোধ গ্রহণের উদ্দেশ্যে তীব্র আক্রমণের দ্বারা ইরানের

স্বাধীনতা মকির সম্মুখীন করেন। উভয় সেনাদলের অবস্থা স্পষ্ট হতে না হতেই সম্রাট আনুশীরওয়ান মৃত্যুমুখে পতিত হন এবং তাঁর পুত্র খসরু পারভেজ শাসনভার গ্রহণ করেন। ৬১৪ সালে তিনিও কতিপয় অজুহাত দাঁড় করিয়ে পুনরায় রোমানদের ওপর আক্রমণ করেন। প্রথম আক্রমণেই তিনি শাম, ফিলিস্তিন ও আফ্রিকা দখল করে নেন; জেরুজালেম লু ন, কিয়ামত (পুনরুত্থান) গির্জা ও হযরত ঈসা মসীহর মাযার ধ্বংস করেন। পুরো শহরকে বিজয়ী ইরানী বাহিনী ধ্বংসস্তুপে পরিণত করে এবং ৯০, ০০০ ি ষ্টানকে হত্যা করার মাধ্যমে পারস্য সাম্রাজ্যের পক্ষে যুদ্ধ সমাপ্ত হয়।

এ সময় যখন তদানীন্তন সভ্যজগৎ যুদ্ধ ও অ ায়ের বহ্নিশিখায় প্র লিত হচ্ছিল ঠিক তখন মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) ৬১০ ি ষ্টাব্দে রিসালাতের দায়িত্বপ্রাপ্ত হন। তিনি বি বাসীর কর্ণে তাওহীদের অমিয় বাণী পৌঁছে দেন এবং মানব জাতিকে শান্তি, সমৃদ্ধি ও শৃঙ্খলার দিকে আহবান জানান।

অি পূজকদের হাতে আল্লাহপূজারী রোমানদের পরাজয়বরণকে মক্কার পৌত্তলিকগণ শুভ লক্ষণ হিসাবে গ্রহণ করে এবং তারা একে অপরকে বলতেও থাকে যে, আমরাও অচিরেই আল্লাহর পূজারীদেরকে (মুসলমানদেরকে) দমন করতে সক্ষম হব। মুসলমানগণ এ কথা শুনে খুবই উদ্বি হয়ে পড়ে।

মহানবী (সা.) মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহীর অপেক্ষায় ছিলেন। অবশেষে নিম্নোক্ত আয়াতটি অবতীর্ণ হয় :

(ألم غلبت الرُّوم في أدنى الأرضِ و لهم مِنْ بعدِ غلبهم سيغلبون)

"রোম আরবের নিকটবর্তী এক স্থানে পরাজিত হয়েছে। কিন্তু তারা তাদের পরাজয়ের কয়েক বছর পরেই পুনরায় বিজয়ী হবে।" (সূরা রূম : ১)

রোমানদের ব্যাপারে পবিত্র কোরআনের ভবি দ্বাণী ৬২৭ সালে বাস্তবায়িত হয়েছিল। রোমান সম্রাট হেরাক্লিয়াস ব্যাপক আক্রমণ চালিয়ে নেইনাভা (نينوا) দখল করে নেন। প্রতিদ্বন্দ্বী পরাশক্তিদ্বয় (পারস্য ও রোমান সাম্রাজ্য) সর্বশেষ মুহূর্তগুলো অতিবাহিত করছিল এবং নিজেদের

সামরিক শক্তি ও সেনাবাহিনী পুনর্গঠনে রত হয়েছিল। কিন্তু মহান আল্লাহর ইচ্ছা ছিল এ দু'সাম্রাজ্য ইসলামের প্রাণসঞ্জীবনী সমীরণের প্রভাবে জীবন্ত হয়ে উঠবে। অল্প কিছু দিনের মধ্যে খসরু পারভেজ নিজ সন্তান শীরাভেইয়ের হাতে নিহত হন। আর শীরাভেইও খসরু পারভেজের মৃত্যুর ৮ মাস পরে মৃত্যুমুখে পতিত হন। এ সময় ইরানে অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলা এতটা চরম পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে, শীরাভেইয়ের মৃত্যুর পরে চার বছরের মধ্যে ব শাসনকর্তা ইরানের শাসনভার গ্রহণ করেছিলেন যাঁদের মধ্যে ৪ জন নারীও ছিলেন। অবশেষে ইসলামী সেনাদলের আক্রমণের মাধ্যমে এ অবস্থার অবসান হয়। সাসানী ইরানের ৫০ বছরের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব ও সংঘাত মুসলমানদের পারস্য বিজয়ের পথ সুগম করে দেয়।

চতুর্থ অধ্যায়: মহানবী) সা -(.এর পূর্বপুরুষগণ

১. হযরত ইবরাহীম খলীল (আ.)

খলীলুর রাহমান (মহান আল্লাহর বন্ধু) হযরত ইবরাহীম (আ.)- এর জীবনচরিত বিশ্লেষণ করার উদ্দেশ্য হলো মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)- এর পূর্বপুরুষদের সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান ও পরিচিতি লাভ করা। কারণ মহানবীর সম্ভ্রান্ত বংশধারা ইবরাহীম (আ.)- এর পুত্র ইসমাঈল (আ.)- এর সাথে সংশ্লিষ্ট। আর যেহেতু এ দু'জন এবং মহানবীর কতিপয় মহান পূর্বপুরুষ আরব জাতি ও ইসলামের ইতিহাসে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিলেন সেজ আমরা সংক্ষেপে তাঁদের বিভিন্ন অবস্থা ও ঘটনা সম্পর্কে আলোচনা করা সংগত বলেই মনে করছি। বিশেষ করে ইসলাম ধর্মের ঘটনাসমূহ এ ধর্মের শুভ অভ্যুদয়ের সমকালীন ঘটনা অথবা ইসলামপূর্ব অতীত ঘটনাবলীর সাথে শিকলের গ্রথিত আংটা বা কড়াসমূহের ায় পরস্পর সংযুক্ত ও গ্রথিত।

উদাহরণস্বরূপ পিতামহ হযরত আবদুল মুত্তালিব কর্তৃক শৈশবে মহানবী (সা.)- এর লালন-পালন, পিতৃব্য হযরত আবু তালিবের অশেষ কষ্ট বরণ এবং মহানবীর প্রতি অকু সমর্থন দান ও পৃষ্ঠপোষকতা, বনি হাশিমের উচ্চ সম্মান ও মর্যাদা এবং বনি উমাইয়্যার শত্রুতার মূল উৎস ও কারণ ইসলামের ইতিহাসের ঘটনাবলীর মৌলিক ভিত্তিমূল হিসাবে গণ্য। এ কারণেই এ ধরনের আলোচনাসমূহের জ ইসলামের ইতিহাসে একটি স্বতন্ত্র অধ্যায়ের অবতারণা করা হয়েছে।

তাওহীদের মহানায়ক হযরত ইবরাহীম (আ.)- এর জীবনের অনেক সমুজ্জ্বল অধ্যায় ও দিক রয়েছে। তাওহীদের প্রসার এবং শিরক ও মূর্তিপূজার মূলোৎপাটনের পথে তাঁর অক্লান্ত সাধনা, সংগ্রাম ও শ্রম, তারকা পূজারীদের সাথে তাঁর তাত্ত্বিক, তাৎপর্যমণ্ডিত ও ক্ষুরধার আলোচনাসমূহ সত্যান্বেষীদের জ তাওহীদের সর্বোচ্চ পাঠ ও শিক্ষা বলে গণ্য যা আমাদের জ পবিত্র কোরআনে বর্ণিত হয়েছে।

হযরত ইবরাহীম (আ.)- এর জন্মভূমি

হযরত ইবরাহীম (আ.) এমন এক সমাজে জন্মগ্রহণ করেছিলেন যা পুরোপুরি মূর্তিপূজা, শিরক ও মানবপূজায় লিপ্ত ছিল। মানুষ নিজ হাতে নির্মিত মূর্তি ও তারকারাজির কাছে মাথা নোয়াত।

বাবিল বা ব্যাবিলন নগরী ছিল তাওহীদের মহান পতাকাবাহী হযরত ইবরাহীম (আ.)- এর জন্মভূমি। ঐতিহাসিকগণ এ নগরীকে পৃথিবীর সাত আশ্চর্যের একটি বলে গণ্য করেছেন। আর এ নগরীর উন্নত কৃষ্টি ও সভ্যতা সম্পর্কে বিভিন্ন ঐতিহাসিক গ্রন্থে বিশদ আলোচনা হয়েছে। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক হেরোডোট লিখেছেন : "ব্যাবিলন নগরী বর্গাকৃতিতে তৈরি করা হয়েছিল যার (চতুর্দিকের) প্রতিটি পাশের দৈর্ঘ্য ১২০ ফারসাখ এবং পরিধি ৪৮০ ফারসাখ ছিল।[৮০] যদিও এ বর্ণনাটি অতিশয়োক্তির দোষে দুষ্ট তারপরও একটি অনস্বীকার্য বাস্তবতা (এতৎসংক্রান্ত লিখিত অ া তথ্য ও গ্রন্থ বিবেচনায় আনলে) এ বর্ণনা থেকে ভালোভাবে উন্মোচিত হয়। কিন্তু আজ দজলা ও ফোরাতের মাঝখানে ছোট- খাটো একটি মাটির টিলা ব্যতীত ঐ সময়ের চিত্তাকর্ষক দৃশ্যাবলী, উঁচু উঁচু সুরম্য প্রাসাদ ও ভবনের আর কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না। এখন ঐ জায়গার সর্বত্র মৃত্যুপুরীর নীরবতা বিরাজমান। তবে কখনো কখনো প্রত্নতত্ত্ববিদগণ বাবিল নগরী ও রাজ্যের জনগণের সভ্যতার স্বরূপ জানা ও বোঝার জ খননকার্য চালানোর ফলে সেখানকার এ নীরবতার জাল ছিন্ন- ভিন্ন করে ফেলেন।

নমরুদ বিন কিনআন- এর রাজত্বকালে তাওহীদের মহানায়ক হযরত ইবরাহীম (আ.) জন্মগ্রহণ করেছিলেন। যদিও নমরুদ মূর্তিপূজক ছিল, তথাপি সে জনগণের কাছে নিজেকে 'খোদা ' বলে দাবি করত। সম্ভবত আশ্চর্যই লাগতে পারে যে, কিভাবে একই ব্যক্তি মূর্তিপূজক, আবার একই সাথে সে জনগণের কাছে নিজেকে 'খোদা ' বলে দাবি করে? আর ঠিক মিশরের ফিরআউনের ব্যাপারেও আমরা পবিত্র কোরআন থেকে এ ধরনের বিষয়ই জেনেছি (অর্থাৎ ফিরআউন মূর্তিপূজক হওয়ার পাশাপাশি নিজেকে 'খোদা ' বলে দাবি করেছিল)। যখন মূসা ইবনে ইমরান (আ.) শক্তিশালী যুক্তি ও দলিল- প্রমাণের মাধ্যমে ফিরআউনের প্রশাসন ও সরকারের ভিত টলিয়ে দিয়েছিলেন তখন ফিরআউনের সমর্থকগণ প্রতিবাদী কে তাকে (ফিরআউনকে) সম্বোধন করে বলেছিল,

(أ تذر موسى و قومه ليفسدوا في الأرض و يذرك و آلهتك)

" আপনি কি মূসা ও তার কওমকে পৃথিবীর বুকে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে দেবেন? সে আপনাকে ও আপনার উপাস্যদেরকে বিস্মৃতির অতল গহ্বরে নিমজ্জিত করছে। " (সূরা আরাফ : ১২৭)

এটি অত্যন্ত স্পষ্ট যে, ফিরআউন নিজেকে খোদা বলে দাবি করত এবং

(أنا ربّكم الأعلى)

'আমি তোমাদের শ্রেষ্ঠ প্রভু'[৮১] ও

(ما علمت لكم من إله غيري)

'আমি ব্যতীত তোমাদের যে আর কোন উপাস্য আছে তা আমি জানি না'[৮২]

- এ কথাগুলো বলত, অথচ সে ঐ একই সময় মূর্তিপূজকও ছিল। কিন্তু মূর্তিপূজক ও মুশরিকদের যুক্তিতে এতে কোন অসুবিধা নেই যে, কোন ব্যক্তি কোন এক গোষ্ঠীর খোদা ও উপাস্য হবে, অথচ ঐ একই সময় উক্ত উপাস্যও তার চেয়ে বড় খোদার পূজা করবে। কারণ খোদা ও উপাস্য শব্দের অর্থ বি ব্রহ্মাণ্ডের ষ্টা নয়, বরং এমন সত্তা যার অ দের ওপর কোন এক ধরনের শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে এবং তাদের জীবনের সর্বময় কর্তৃত্ব তার হাতেই স্ত। ইতিহাসে বর্ণিত হয়েছে : রোমে কোন এক বংশের বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিগণকে বংশের অ া সদস্য পূজা করত, অথচ ঐ একই সময় ঐ সব পূজিত বয়োজ্যেষ্ঠগণেরও নিজস্ব উপাস্য ছিল যার পূজা তারা করত।

সবচেয়ে বড় যে দুর্গ নমরুদ নিজ হাতের মুঠোয় এনেছিল তা ছিল (তার প্রতি) একদল জ্যোতির্বিদ ও ভবি দ্বক্তার সমর্থন, মনোযোগ ও দৃষ্টি আকর্ষণ। এ সব জ্যোতির্বিদ ও ভবি দ্বক্তা সে যুগের জ্ঞানী ও বুদ্ধিজীবী বলে গণ্য হতো। তাদের নমরুদের প্রতি ভক্তি ও বিনয় সমাজের নিম্ন ও অজ্ঞ শ্রেণীকে দাসত্ব বন্ধনে আবদ্ধ করার ক্ষেত্র প্রস্তুত করে। অধিকন্তু হযরত ইবরাহীম (আ.)- এর আত্মীয়স্বজনদের মধ্যে আযরের মতো ব্যক্তিবর্গও ছিল। আযর ছিল মূর্তিনির্মাতা এবং সে তারকারাজির অবস্থান সম্পর্কে জ্ঞাত। সে নমরুদের একজন সভাসদও হয়েছিল। আর এ বিষয়টিও হযরত ইবরাহীম (আ.)- এর জ এক বিরাট অন্তরায় ছিল। কারণ জনগণের কুসংস্কারাচ্ছন্ন আকীদা- বি াসের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা ছাড়াও তিনি তাঁর নিজ আত্মীয়- স্বজনদের বিরোধিতার সম্মুখীন হয়েছিলেন।

যখন নমরুদ স্বপ্নিল জীবনের মধ্যে বুঁদ ছিল ঠিক তখনই আকস্মিকভাবে জ্যোতির্বিদগণ বিপদের প্রথম ঘণ্টা বাজিয়ে বলল, "তোমার কুমত এমন এক ব্যক্তির হাতে ধ্বংস হবে যে এ জনপদেরই সন্তান।" নমরুদের সুপ্ত চিন্তাধারা জাগ্রত হলো এবং সে জিজ্ঞেস করল, "সে কি জন্মগ্রহণ করেছে না করে নি?" তারা বলল, "সে এখনও জন্মগ্রহণ করে নি।" রাজা নমরুদ জ্যোতির্বিদদের ভবি দ্বাণী অনুযায়ী যে রাতে তার উক্ত ভয় র শত্রুর ভ্রূণ মাতৃগর্ভে স্থিতি লাভ করবে সে রাতে সক্ষম নারী-পুরুষদের বিচ্ছিন্ন রাখার আদেশ দিয়েছিল। বর্ণনা অনুসারে নমরুদের জল্লাদরা ছেলে শিশুদের হত্যা করত। ধাত্রীদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল তারা যেন নবজাতক শিশুদের মুখ নমরুদের বিশেষ দফতরে পাঠিয়ে দেয়।

ঘটনাক্রমে যে রাতে নারী-পুরুষের দৈহিক মিলন নিষিদ্ধ করা হয়েছিল সে রাতেই হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর পবিত্র ভ্রূণ মাতৃগর্ভে স্থিতি লাভ করে। ইবরাহীম (আ.)-এর মা গর্ভধারণ করলেন এবং মূসা ইবনে ইমরানের মায়ের মতোই তাঁর গর্ভধারণকাল গোপনে সমাপ্ত হলো। প্রসব করার পর প্রাণপ্রিয় সন্তান নবজাতক ইবরাহীমকে নিয়ে তাঁর মা শহরের পাশে অবস্থিত এক গুহায় আশ্রয় নিয়েছিলেন এবং তাঁকে সেখানেই রেখেছিলেন। দিন-রাত যতবার সম্ভব ততবার তিনি তাঁর প্রাণাধিক প্রিয় সন্তানকে দেখতে ঐ গুহায় যেতেন। সময় গত হওয়ার সাথে সাথে এ ধরনের অত্যাচার নমরুদকে নিশ্চিত ও নিরুদ্বি করে এবং তার নিশ্চিত বি াস জন্মে যে, সে তার রাজত্ব ও রাজসিংহাসনের শত্রুকে হত্যা করতে সক্ষম হয়েছে।

ইবরাহীম (আ.) পুরো ১৩ বছর ঐ গুহায় কাটিয়েছিলেন। স্মর্তব্য যে, ঐ গুহাটির একটি সরু প্রবেশপথ ছিল। ১৩ বছর পর ইবরাহীম (আ.)-এর মা তাঁকে গুহার বাইরে নিয়ে আসেন। ইবরাহীম (আ.) জনপদে পদার্পণ করলেন। নমরুদপন্থীদের জিজ্ঞাস্য দৃষ্টি তাঁর ওপর পড়লে তাঁর মা বললেন, "এ আমার সন্তান; জ্যোতির্বিদদের ভবি দ্বাণী করার আগেই সে জন্মগ্রহণ করেছিল।" [৮৩]

ইবরাহীম (আ.) গুহা থেকে বের হয়ে এসে ভূপৃষ্ঠ, আকাশ, উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক ও তারকারাজি এবং বৃক্ষসমূহের সবুজ-শ্যামল হওয়ার দৃশ্য প্রত্যক্ষ করার মাধ্যমে তাঁর ফিতরাতগত তাওহীদী (توحيد

فطري) আকীদা- বি াসকে পূর্ণতর করেন।[৮৪] সমাজ ও জনপদে পদার্পণ করেই হযরত ইবরাহীম (আ.) কতিপয় ব্যক্তিকে তারকারাজির ঔজ্জ্বল্যের সামনে নিজেদের বিবেক- বুদ্ধি বিকিয়ে দিতে দেখলেন। তিনি আরেক দলকে দেখতে পেলেন যে, তাদের চিন্তাধারার পর্যায় পূর্বোক্ত গোষ্ঠীর চেয়েও নিকৃষ্ট এ কারণে যে, তারা কাঠ বা পাথর নির্মিত প্রতিমার পূজায় রত। আর এ সব কিছুর চেয়েও নিকৃষ্ট ব্যাপার যা তিনি দেখতে পেলেন তা ছিল এই যে, এক ব্যক্তি (নমরুদ) জনগণের অজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে নিজেকে খোদা বলে দাবি করছে।

হযরত ইবরাহীম (আ.) তাই এ তিন রণা নে সংগ্রাম করার প্রস্তুতি নিতে বাধ্য হয়েছিলেন। পবিত্র কোরআনে হযরত ইবরাহীম যে এ তিনটি ক্ষেত্রে সংগ্রাম করেছিলেন তা বর্ণিত হয়েছে।

মূর্তিপূজার বিরুদ্ধে হযরত ইবরাহীম (আ.)- এর সংগ্রাম

মূর্তিপূজার নিকষ কালো আঁধার সমগ্র ব্যাবিলন রাজ্যকে গ্রাস করেছিল। পার্থিব ও স্বর্গীয় অগণিত মিথ্যা খোদা সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর বিবেক- বুদ্ধি কেড়ে নিয়েছিল। তারা কতিপয় মিথ্যা খোদাকে মহাশক্তির এবং আরো কিছু মিথ্যা খোদাকে মহান আল্লাহর নৈকট্য লাভের মাধ্যম বলে বি াস করত।

মানব জাতিকে পথ প্রদর্শন করার ক্ষেত্রে মহান নবী- রাসূলদের পথ ও রীতিনীতি যুক্তি ও দলিল- প্রমাণের ওপর প্রতিষ্ঠিত। কারণ মানুষের দয়ের সাথে তাঁদের সম্পর্ক। আর তাঁরা চান এমন এক শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করতে যা ঈমান ও দৃঢ় বি াসের ওপর প্রতিষ্ঠিত। এ ধরনের শাসনব্যবস্থা বা বল ও তরবারির মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। মহান নবীদের শাসনব্যবস্থা এবং নমরূদ ও ফিরআউনদের শাসনব্যবস্থার মধ্যে অবশ্যই পার্থক্য করতে হবে। দ্বিতীয় গোষ্ঠীর একমাত্র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হচ্ছে যে কোনভাবে তাদের শাসনকর্তৃত্ব ও নেতৃত্ব টিকিয়ে রাখা, যদিও তাদের প্রশাসন তাদের মৃত্যুর পর ধ্বংস হয়ে যায়। কিন্তু আধ্যাত্মিক ব্যক্তিগণ (মহান নবিগণ ও তাঁদের অনুসারিগণ) এমন প্রশাসন প্রতিষ্ঠা করতে চান যা প্রকাশ্যে ও গোপনে, শাসকের ক্ষমতা- অক্ষমতার সময়, তাঁর জীবদ্দশায় ও মৃত্যুর পরবর্তীকালে শাসনকার্য পরিচালনা করতে সক্ষম। অর্থাৎ তাঁরা মানব জাতির দয়ে কর্তৃত্ব করেন- দেহের ওপর নয়। আর এ মহান লক্ষ্যটি কখনই জোর করে বাস্তবায়িত হবে না।

হযরত ইবরাহীম (আ.) শুরুতেই নিজ আত্মীয়- স্বজনদের ধর্মমতের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছিলেন। আযর তাঁর আত্মীয়- স্বজনদের নেতৃত্ব দিত। এ সংগ্রামে পুরোপুরি সাফল্য আসতে না আসতেই[৮৫] ইবরাহীম (আ.) সংগ্রামের আরেকটি ক্ষেত্রের মুখোমুখি হয়েছিলেন। এ দলটির চিন্তাধারার পর্যায় পূর্বোক্ত প্রথম দলটির চিন্তাধারা থেকে কিছুটা উন্নত ছিল। কারণ তারা হযরত ইবরাহীমের জ্ঞাতি- গোত্রের অনুসৃত রীতিনীতি ও ধর্মমতের বিপরীতে ভূলোকের নীচ ও হীন অস্তিত্ববান সত্তাসমূহকে পরিত্যাগ করে নভোমণ্ডলীয় গ্রহ, জ্যোতিষ্ক ও তারকারাজির পূজা করত। ইবরাহীম (আ.)

মহাজাগতিক নভোমণ্ডলীয় বস্তুসমূহের পূজা- অর্চনার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার ক্ষেত্রে কতগুলো ধারাবাহিক দার্শনিক ও তাত্ত্বিক সত্য যা সে সময়ের মানুষের চিন্তা- চেতনায় উদিতই হয় নি তা অত্যন্ত সহজ ভাষায় বর্ণনা করেছেন। তাঁর উপস্থাপিত দলিল- প্রমাণ ও যুক্তিসমূহ আজও জ্ঞানী-গুণী, দার্শনিক, তাত্ত্বিক ও কালামশাস্ত্রবিদদের মনে বিস্ময়ের সৃষ্টি করে। আর সবচেয়ে বড় ব্যাপারটি হচ্ছে যে, পবিত্র কোরআনে হযরত ইবরাহীম (আ.)- এর যুক্তি ও দলিল- প্রমাণ বর্ণনা করার ক্ষেত্রে বিশেষ দৃষ্টি দেয়া হয়েছে। এ কারণেই আমি একটি সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যাসহ এ কয়েক পৃষ্ঠায় হযরত ইবরাহীম (আ.)- এর বক্তব্য উল্লেখ করব।

ইবরাহীম (আ.) জনগণকে হেদায়েত করার জ   এক রাতে সূর্যাস্তের শুরু থেকে পরের দিন সূর্যাস্ত পর্যন্ত জেগে থেকে আকাশ পর্যবেক্ষণ করলেন। এ ২৪ ঘণ্টায় তিনি পূর্বোক্ত তিন দলের সাথে আলোচনা এবং উপরিউক্ত গোষ্ঠীত্রয়ের আকীদা- বি াস মজবুত যুক্তি ও দলিল- প্রমাণের আলোকে খণ্ডন করেছেন।

রাতের কালো আঁধার ছেয়ে গেল এবং অস্তিত্বজগতের নিদর্শনগুলো সেই কালো আঁধারের মাঝে ঢাকা পড়ে গেল। নভোমণ্ডলীয় উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক শুক্রগ্রহ দিকচক্রবাল রেখার কোণে আবির্ভূত হলো। ইবরাহীম (আ.) শুক্রগ্রহের পূজারীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জ   বাহ্যত তাদেরই রীতিনীতি অনুসরণ করে বললেন, "এ আমার প্রভু।" যখন তা অস্ত গেল এবং এক কোণে আত্মগোপন করল তখন তিনি বললেন, "যে খোদা অস্ত যায় তাকে আমি পছন্দ করি না।" তিনি তাঁর বলিষ্ঠ এ যুক্তির আলোকে শুক্রগ্রহের পূজারীদের আকীদা- বি াস প্রত্যাখ্যান এবং এর অসারত্ব স্পষ্টভাবে প্রমাণ করেন।

পরবর্তী পর্যায়ে তাঁর দৃষ্টি চাঁদের উজ্জ্বল গোলকের ওপর নিবদ্ধ হয় যার ঔজ্জ্বল্য ও সৌন্দর্য সবাইকে আকৃষ্ট করছিল। তিনি চন্দ্রপূজারীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জ   চাঁদকে উপাস্য বলে বাহ্যত স্বীকার করলেন এবং এর পরেই তিনি দৃঢ় শক্তিশালী যুক্তির মাধ্যমে এ বি াসের তীব্র সমালোচনা করলেন। ঘটনাক্রমে মহান আল্লাহর অসীম শক্তি ও ক্ষমতা চাঁদকে দিকচক্রবাল রেখায় অদৃশ্য করে ফেলল। আর সে সাথে চাঁদের সকল আলো ও ঔজ্জ্বল্যও হারিয়ে গেল।

উপত্যকা ও প্রান্তর কালো আঁধারে ছেয়ে গেল। ইবরাহীম (আ.) সত্যান্বেষীদের মনোবৃত্তি নিয়ে চন্দ্রপূজারীদের অন্তরে ব্যথা না দিয়ে বললেন, "হে আমার প্রতিপালক! আপনি যদি আমাকে পথ প্রদর্শন না করেন তাহলে আমি নিঃসন্দেহে পথভ্রষ্ট হয়ে যাব। কারণ তারকাসমূহের ায় চাঁদেরও উদয়- অস্ত আছে। আর তা নিজেই এমন এক নিয়ম- শৃঙ্খলা ও ব্যবস্থার অধীন যা স্থায়ী এবং যাতে বিঘ্ন ঘটানো সম্ভব নয়।"

রাতের আঁধার কেটে গেলে পূর্ব দিকের দিকচক্রবাল রেখার বক্ষভেদ করে সূর্যোদয় হলো। সূর্যের সোনালী আলো মরুপ্রান্তর, উপত্যকা ও পাহাড়ের পাদদেশ আলোকোদ্ভাসিত করল। সূর্যপূজারীরা তাদের উপাস্যের দিকে নিজেদেরকে রুজু করল। ইবরাহীম (আ.) বিতর্কের মূলনীতি সংরক্ষণ করার ছলে বাহ্যিকভাবে সূর্যকে নিজ প্রতিপালক বলে স্বীকার করলেন। কিন্তু সূর্য অস্ত গেলে তিনি নিশ্চিতভাবে প্রমাণ করলেন যে, সূর্যও এ অস্তিত্বজগতের অমোঘ নিয়মের অধীন। এরপর তিনি সূর্যের উপাস্য হওয়ার বিষয়টি দ্ব্যর্থহীন কে বর্জন করেন।

তখন তিনি উপরিউক্ত গোষ্ঠীত্রয় থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বললেন,

(...إنّي وجّهت وجهي للّذي فطر السّموات و الأرض حنيفا و ما أنا من المشركين)

"নিশ্চয়ই আমি আমার মুখমণ্ডল (তথা সমগ্র অস্তিত্বকে) একনিষ্ঠ চিত্তে এমন এক সত্তার দিকে নিবদ্ধ করলাম যিনি যমীন ও আকাশসমূহ সৃষ্টি করেছেন এবং আমি মুশরিক নই।" (সূরা আনআম: ৭৫- ৭৯)

ইবরাহীম (আ.)- এর বক্তব্যের উপলক্ষ ছিল ঐ সব ব্যক্তি যারা চিন্তা করত যে, পার্থিবজগতের যাবতীয় অস্তিত্ববান সত্তার প্রতিপালন ও পরিচালনা, যেমন তন্মধ্যে মানব জাতির অস্তিত্ব ও সৃষ্টির বিষয়টি নভোমণ্ডলীয় জ্যোতিষ্ক ও বস্তুসমূহের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

এ বর্ণনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, উপরিউক্ত তিনটি বিষয়ে অনুষ্ঠিত হযরত ইবরাহীম (আ.)- এর আলোচনার চাপ অবশ্যই নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর ওপর ছিল না। যথা : ১. ষ্টার অস্তিত্ব প্রমাণ, ২. মহান আল্লাহর সত্তার একত্ব ও তিনি যে এক ও অদ্বিতীয় এবং একাধিক খোদার অস্তিত্ব নেই- এ বিষয়টি প্রমাণ করা, ৩. ষ্টার একত্ব (মহান আল্লাহ্ ব্যতীত আর কোন ষ্টা নেই অর্থাৎ নিখিল

বি র ষ্টা মাত্র একজন)- এ বিষয়টি প্রমাণ, বরং ইবরাহীম (আ.)- এর আলোচনার কেন্দ্রবি ছিল প্রভুত্ব, প্রতিপালন ও পরিচালনার ক্ষেত্রে তাওহীদ বা একত্ববাদ। মহান আল্লাহ্ ব্যতীত সকল অস্তিত্ববান সত্তার প্রভু, পরিচালক ও প্রতিপালক অ কোন সত্তা নয়- এ বিষয়টির ওপর তিনি তাঁর আলোচনায় বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। এ কারণেই তিনি নভোমণ্ডলীয় জ্যোতিষ্ক ও পদার্থসমূহের প্রভুত্ব খণ্ডন করার দলিল উপস্থাপন করার পর তৎক্ষণাৎ বলেছেন, "নিশ্চয়ই আমি আমার মুখমণ্ডল মহান আল্লাহর দিকেই নিবদ্ধ করেছি যিনি আসমানসমূহ ও যমীনের ষ্টা।" অর্থাৎ পৃথিবী ও আকাশসমূহের ষ্টাই এগুলোর প্রভু, প্রতিপালক ও পরিচালক। কখনই এ নিখিল বি র একাংশের পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব কতিপয় নভোমণ্ডলীয় জ্যোতিষ্ক ও তারকার হাতে অর্পণ করা হয় নি। আর তাই ষ্টা এবং পালনকর্তা ও পরিচালক এক ও অদ্বিতীয়। ব্যাপারটি এমন নয় যে, মহান আল্লাহ্ ষ্টা আর পালনকর্তা তিনি ব্যতীত অ সত্তা।

মুফাসসির ও কালামশাস্ত্রবিদগণ যাঁরা পবিত্র কোরআনের তত্ত্বজ্ঞানে গভীরভাবে চিন্তা ও আলোচনা করেছেন তাঁরা ইবরাহীম (আ.)- এর প্রদত্ত যুক্তি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বিরাট ভুল করেছেন। তাঁরা ভেবেছেন যে, ইবরাহীম (আ.)- এর আলোচনা ও কথোপকথনের লক্ষ্য এ সব নভোমণ্ডলীয় বস্তুসমূহের খোদায়ী অস্বীকার করা। অর্থাৎ যে খোদার প্রতি পৃথিবীর সকল জাতি বি াস রাখে এবং সমগ্র অস্তিত্বজগতই যার অস্তিত্বের নিদর্শন সেই খোদার অস্তিত্ব প্রমাণ। আবার কেউ কেউ ভেবেছেন যে, ইবরাহীম (আ.)- এর উপরিউক্ত আলোচনার আসল উদ্দেশ্য এ সব নভোমণ্ডলীয় বস্তুসমূহের সৃষ্টিক্ষমতা (خالقيّة) রদ করা। কারণ অনেকেই এমন ধারণা করতে পারে যে, নিখিল বি র ষ্টা মহান আল্লাহ্ এক পূর্ণা অস্তিত্ববান সত্তাকে সৃষ্টি করার পর কতিপয় অস্তিত্বময় সত্তার কাছে সৃষ্টিকর্তার পদ হস্তান্তর করে থাকতে পারেন। যদি উপরিউক্ত ব্যাখ্যাদ্বয় সঠিক না হয় এবং অবশ্যম্ভাবী অস্তিত্ববান সত্তা (واجب الوجود) এবং তাঁর তাওহীদ (একত্ব) এবং ষ্টার একত্বের শিরোনামে কতিপয় বিষয় মেনে নেয়ার পর 'তাওহীদে রুবূবী' (প্রভুত্বের ক্ষেত্রে একত্ব) নামের অ এক ধরনের তাওহীদ প্রসে এবং নিখিল বি র যে একজন ষ্টা ও পালনকর্তা আছেন- এ

ব্যাপারে আলোচনা করাই ছিল ইবরাহীম (আ.)- এর মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং 'নিশ্চয়ই আমি আমার মুখমণ্ডলকে নিবদ্ধ করলাম... " - এ আয়াতটি বর্ণিত ব্যাখ্যার সর্বোত্তম দলিল ও সাক্ষ্যপ্রমাণ। এ কারণেই প্রতিপালক এবং তারকা, চন্দ্র ও সূর্যের মতো নভোমণ্ডলীয় বস্তুসমূহের প্রভুত্বের মধ্যেই হযরত ইবরাহীম (আ.)- এর আলোচনার সমগ্র চাপ ও দৃষ্টি নিহিত ছিল।[৮৬]

আলোচনা পূর্ণ করার জ ইবরাহীম (আ.)- এর প্রদত্ত যুক্তি ও দলিল- প্রমাণকে আমরা আরেকভাবে ব্যাখ্যা করব :

হযরত ইবরাহীম (আ.) তিন ক্ষেত্রেই এ সব নভোমণ্ডলীয় পদার্থের উদয়- অস্তকে এ বিষয়ের ওপর সাক্ষ্য- প্রমাণ হিসাবে গ্রহণ করেছেন যে, এ সকল নভোমণ্ডলীয় বস্তু পৃথিবীর প্রপঞ্চ ও ঘটনাবলী, বিশেষ করে 'মানুষ ' নামের প্রপঞ্চটির প্রতিপালন ও পরিচালনা করার কোন যোগ্যতাই রাখে না। এখন প্রশ্ন করা যায় যে, এ সব বস্তুর উদয়- অস্ত কেন এগুলোর প্রতিপালক ও পরিচালক না হওয়ার পক্ষে সাক্ষ্য- প্রমাণ ও দলিলস্বরূপ?

এ বিষয়টি বিভিন্নভাবে বর্ণনা করা সম্ভব। আর প্রতিটি ক্ষেত্রেই তা কোন না কোন গোষ্ঠীর জ উপকারী। নভোমণ্ডলীয় বস্তুসমূহের প্রতিপালক ও পরিচালক হওয়ার বিষয়টি অপনোদন করা সংক্রান্ত হযরত ইবরাহীম (আ.)- এর প্রদত্ত যুক্তিকে বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করার মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে, পবিত্র কোরআনের বিভিন্ন দিক, মাত্রা ও পর্যায় রয়েছে; আর এর প্রতিটি দিক ও পর্যায় কোন না কোন গোষ্ঠীর জ উপস্থাপন করা যায়।

ইবরাহীম (আ.) **কর্তৃক প্রদত্ত যুক্তি ও দলিল- প্রমাণের বিভিন্ন ব্যাখ্যা নিচে দেয়া হলো** :

ক. প্রভু ও প্রতিপালক হিসাবে গ্রহণ করার লক্ষ্য হচ্ছে এই যে, দুর্বল অস্তিত্ববান সত্তা তার শক্তি ও সামর্থ্যরে আলোকে পূর্ণতার পর্যায়ে উপনীত হয়। আর এ ধরনের প্রতিপালক ও প্রশিক্ষকের অবশ্যই প্রতিপালিত ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত অস্তিত্ববান সত্তাদের সাথে এমন গভীর সম্পর্ক থাকতে হবে যে, প্রতিপালক ও প্রশিক্ষক সর্বদা প্রতিপালিত ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সত্তার অবস্থা সম্পর্কে অবগত থাকবে, তার থেকে কখনই পৃথক হবে না এবং তার সামনে উপস্থিত থাকবে।

যে অস্তিত্ববান সত্তা ঘণ্টার পর ঘণ্টা প্রতিপালিত সত্তার কাছ থেকে অনুপস্থিত থাকে, সম্পূর্ণরূপে তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং তার থেকে সরাসরি আলো ও কল্যাণ উঠিয়ে নেয়, সে কিভাবে ভূলোকের অস্তিত্ববান সত্তাসমূহের প্রশিক্ষক ও প্রতিপালক হবে? এ কারণেই তারকার উদয়- অস্ত যা মর্ত্যলোকের ঘটনাবলী থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়ার নিদর্শন তা সাক্ষ্য দেয় যে, মর্ত্যলোকের অস্তিত্ববান সত্তাসমূহের অ কোন প্রশিক্ষক ও প্রতিপালক আছেন যিনি এ ত্রুটি থেকে মুক্ত।

খ .নভোমণ্ডলীয় বস্তুসমূহের উদয়- অস্ত এবং এগুলোর সুশৃঙ্খল গতি সাক্ষ্য দেয় যে, এগুলো সবই আজ্ঞাধীন এবং এমন সব নিয়মের অধীন যা ঐ সব বস্তুর ওপর কর্তৃত্বকারী ও ক্রিয়াশীল। আর এ সব বস্তুর সুশৃঙ্খল নিয়মসমূহ মেনে চলাই এগুলোর দুর্বলতা ও অক্ষমতার দলিলস্বরূপ। এ ধরনের দুর্বল অস্তিত্ববান সত্তাসমূহ অস্তিত্বজগৎ এবং বি র বিভিন্ন ঘটনা ও প্রপঞ্চের ওপর কর্তৃত্বশীল হতে পারে না। আর পৃথিবীর অস্তিত্ববান সত্তাসমূহ যদি এ সব নভোমণ্ডলীয় বস্তুর আলো থেকে উপকৃত হয় তাহলে তা এ সব বস্তুর প্রভুত্বের দলিল বলে গণ্য হবে না, বরং এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, ঊর্ধ্বতন পর্যায় থেকে আদেশপ্রাপ্ত হয়ে এ সব বস্তু এ পৃথিবীর বিভিন্ন ঘটনা ও প্রপঞ্চের বরাবরে দায়িত্ব পালন করে মাত্র; অ ভাবে বলা যায় যে, এ বিষয়টি নিখিল বি র যাবতীয় অস্তিত্ববান সত্তার মধ্যে যে পারস্পরিক সম্পর্ক, সামঞ্জস্য, নির্ভরশীলতা ও প্রভাব বিদ্যমান আছে তা প্রমাণ করে।

গ. এ সব (নভোমণ্ডলীয়) বস্তুসমূহের গতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যই বা কি হতে পারে? লক্ষ্য কি এটিই যে, এগুলো অপূর্ণতা থেকে পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হচ্ছে অথবা এর উল্টোটি? দ্বিতীয়টি মোটেও ভাবা যায় না। আর দ্বিতীয়টি যদি কল্পনা করা হয় তাহলে অস্তিত্ববান সত্তাসমূহের প্রতিপালক ও পরিচালক এ সব নভোমণ্ডলীয় বস্তুর পূর্ণতার পর্যায় থেকে অপূর্ণতা, অস্তিত্বহীনতা ও ধ্বংসের দিকে ধাবমান হওয়ার কোন অর্থই হয় না। আর স্বয়ং এ বিষয়টি (পূর্ণতা থেকে অপূর্ণতার পর্যায়ে অবনতি) থেকে প্রমাণিত হয় যে, অ এক প্রতিপালক আছেন যিনি এ সব বাহ্যত শক্তিশালী অস্তিত্ববান সত্তাকে এক পর্যায় থেকে পূর্ণতর পর্যায়ে উন্নীত করেন এবং আসলে তিনিই প্রভু ও

প্রতিপালক। আর তিনিই এ সব বস্তু এবং এগুলোর অধীনে যা কিছু আছে সেগুলোকেও পূর্ণতার দিকে পৌঁছে দেন।

সংলাপ ও আলোচনায় মহান নবীদের পদ্ধতি

পূর্বে আমরা উল্লেখ করেছি যে, হযরত ইবরাহীম (আ.) গুহা থেকে বের হবার পর তাওহীদের পথ থেকে বিচ্যুত দু'টি গোষ্ঠীর মুখোমুখি হয়েছিলেন। উক্ত গোষ্ঠীদ্বয় হলো :

ক. মূর্তিপূজকগণ এবং খ. নভোমণ্ডলীয় বস্তুসমূহের পূজকগণ।

দ্বিতীয় গোষ্ঠীর সাথে হযরত ইবরাহীম (আ.)- এর আলোচনা আমরা শুনেছি। এখন অবশ্যই দেখা উচিত যে, তিনি কিভাবে মূর্তিপূজকদের সাথে বিতর্ক করেছিলেন?

মহান নবীদের ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, তাঁরা তাঁদের প্রচার কার্যক্রমের শুরুতে নিজেদের আত্মীয়- স্বজনদের থেকেই সংস্কার ও সংশোধনমূলক কর্মকাণ্ড শুরু করতেন। এরপর তাঁরা তাঁদের প্রচার কার্যক্রমের পরিধি বিস্তৃত করতেন। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) তাঁর নবুওয়াতের সূচনালে সর্বাগ্রে নিজের নিকটাত্মীয় ও জ্ঞাতিগোষ্ঠীকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণের আহবান জানিয়েছিলেন। তিনি মহান আল্লাহর আদেশ অনুযায়ী ((و أنذر عشيرتك الأقربين) "এবং আপনার অতি নিকটাত্মীয়দেরকে ভয় প্রদর্শন করুন" - সূরা শুআরা : ২১৪) তাঁর দাওয়াহ্ বা প্রচার কার্যক্রমের ভিত্তি নিজ আত্মীয়- স্বজন ও জ্ঞাতির সংশোধন করার ওপর স্থাপন করেছিলেন।

ইবরাহীম (আ.)- এর প্রচার পদ্ধতিও ঠিক এমনই ছিল। তাঁর সমাজসংস্কার ও সংশোধনমূলক কার্যক্রম নিকটাত্মীয়দের থেকে শুরু করেছিলেন।

আযর তাঁর গোত্রের মধ্যে অত্যন্ত উঁচুমর্যাদা ও সম্মানের অধিকারী ছিল। তাত্ত্বিক (বৈজ্ঞানিক) ও শৈল্পিক তথ্য, জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতা ছাড়াও সে অতি দক্ষ জ্যোতির্বিদও ছিল। তাই নমরুদের শাহী দরবারে তার ভীষণ প্রভাব ছিল। তার জ্যোতির্বিদ্যাভিত্তিক গণনা এবং ভবি দ্বাণীসমূহ নমরুদের দরবারে সকলের কাছে সমাদৃত হতো। ইবরাহীম (আ.) বুঝতে পেরেছিলেন যে, তাকে তাওহীদী ধর্মে দীক্ষিত করা গেলে মূর্তিপূজকদের একটি গুরুত্বপূর্ণ দুর্গ দখল করা সম্ভব হবে। এ কারণেই তিনি সর্বোত্তম পন্থায় তাকে মূর্তিপূজা থেকে বিরত রাখলেন। কিন্তু কতিপয় কারণবশত

আযর ইবরাহীম (আ.)- এর আহবান, বাণী ও উপদেশ গ্রহণ করে নি। যে বিষয়টি অতি গুরুত্বপূর্ণ তা হলো আযরের সাথে হযরত ইবরাহীম (আ.)- এর কথোপকথন পদ্ধতি। পবিত্র কোরআনের যে সব আয়াতে আযরের সাথে হযরত ইবরাহীম (আ.)- এর কথোপকথন বর্ণনা করা হয়েছে সে সব আয়াত যদি আমরা সূক্ষ্মভাবে পর্যালোচনা করি তাহলে প্রচারপদ্ধতির ক্ষেত্রে মহান নবীদের রীতিনীতি স্পষ্ট হয়ে যাবে। এখন আমরা হযরত ইবরাহীম (আ.)- এর প্রচারপদ্ধতি সম্পর্কে জানার চেষ্টা করব।

(إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع و لا يبصر و لا يغني عنك شيئا يا أبت إنّي قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتّبعني أهدك صراطا سويّا يا أبت لا تعبد الشّيطان إنّ الشّيطان كان للرّحمان عصيا. يا أبت إنّي أخاف أن يمسّك عذاب من الرّحمان فتكون للشّيطان وليّا)

"হে পিতা! যে বস্তু শোনেও না, দেখেও না এবং তোমাকে কোন কিছু থেকে অমুখাপেক্ষী করে না, কেন তুমি তার উপাসনা কর? হে আমার পিতা! নিশ্চয়ই আমি ওহীর মাধ্যমে যে সব বিষয়ে জ্ঞান লাভ করেছি সে সব বিষয় সম্পর্কে তোমার কোন জ্ঞান নেই। তাই তুমি যদি আমার অনুসরণ কর তাহলে তোমাকে আমি সত্য পথে পরিচালিত করব। হে আমার পিতা! শয়তানের উপাসনা কর না। কারণ শয়তান পরম দয়ালু আল্লাহর অবাধ্য। আমার ভয় হয় যে, মহান আল্লাহর আযাব তোমার কাছে পৌঁছবে আর এমতাবস্থায় তুমি শয়তানের বন্ধু ও মিত্রে পরিণত হবে।" (সূরা মরিয়ম : ৪৪- ৪৭)

আযর ইবরাহীম (আ.)- এর এ আহ্বানে এ রকম বলেছিল, "ইবরাহীম! আমার খোদাদের[৮৭] থেকে কি তুমি মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছ? যদি তুমি এ কাজ বর্জন না কর তাহলে আমি তোমাকে রজম (প্রস্তর নিক্ষেপ) করে হত্যা করব। আর এ ধরনের বিরুদ্ধাচরণ করার জ কিছু সময় তোমাকে অবশ্যই আমার নিকট থেকে দূরে থাকতে হবে।"

যেহেতু ইবরাহীম (আ.) মহান আত্মা ও প্রশস্ত দয়ের অধিকারী ছিলেন তাই তিনি আযরের কটুক্তিগুলো নিজের মধ্যে হজম করে নিলেন এবং তিনি এমনই উত্তর দিলেন, "আপনার ওপর সালাম (শান্তি)। অচিরেই আমি আপনার জ আমার প্রভুর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করব।" এ

ধরনের বর্ণনার চেয়ে উত্তম জবাব আর কি হতে পারে; আর এ ধরনের কথা অপেক্ষা আর কোন্ বক্তব্য ভদ্রতাপূর্ণ এবং আকর্ষণীয় হবে?

আযর কি ইবরাহীম (আ.)- **এর পিতা ছিল?**

উপরিউক্ত আয়াতসমূহ, সূরা তাওবার ১১৫ নং আয়াত এবং সূরা মুমতাহিনার ১৪ নং আয়াতের বাহ্য অর্থ হচ্ছে আযর ইবরাহীম (আ.)- এর পিতৃস্থানীয় ছিল এবং হযরত ইবরাহীমও তাকে পিতা বলে সম্বোধন করতেন। কিন্তু মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এবং সকল নবী- রাসূলের পূর্বপুরুষগণ তাওহীদবাদী ও খোদায় বি াসী ছিলেন- এতৎসংক্রান্ত সকল শিয়া আলেমের ঐকমত্যের (ইজমা) সাথে মূর্তিপূজক আযরের ইবরাহীম (আ.)- এর পিতা হওয়া মোটেও খাপ খায় না। প্রসিদ্ধ আলেম শেখ মুফিদ (রহ.) তাঁর 'আওয়ায়েলুল মাকালাত ' নামক গ্রন্থে উপরিউক্ত বিষয়টিতে যে ইমামীয়া শিয়া আলেমদের ইজমা রয়েছে তা লিখেছেন। এমনকি অনেক সুন্নী আলেমও এ ব্যাপারে তাঁদের সাথে অভিন্ন দৃষ্টিভি পোষণ করেন। এমতাবস্থায় উপরিউক্ত আয়াতসমূহের বাহ্য অর্থের অবস্থাই বা কি হবে এবং কিভাবে এ সমস্যাটি সমাধান করতে হবে?

অনেক মুফাসসির বলেছেন যে, أب (আব) শব্দটি যদিও সাধারণত আরবী ভাষায় 'পিতা ' র ক্ষেত্রে ব্যব ত হয়, তবুও এ শব্দটির ব্যবহার কেবল 'পিতা ' র মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয় এবং কখনো কখনো আরবী ভাষা ও পবিত্র কোরআনের পরিভাষায় 'চাচা ' অর্থেও ব্যব ত হয়, যেমন নিচের আয়াতে أب শব্দটি 'চাচা ' অর্থে ব্যব ত হয়েছে :

(إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك و إله ءابائك إبراهيم و إسماعيل و إسحاق إلها واحدا و نحن له مسلمون)

" যখন ইয়াকুব নিজ সন্তানদেরকে বললেন : আমার পরে তোমরা কার উপাসনা করবে? তখন তারা বলেছিল : আমরা আপনার ও আপনার পূর্বপুরুষগণ ইবরাহীম, ইসমাঈল ও ইসহাকের এক- অদ্বিতীয় উপাস্যের উপাসনা করব। আর আমরা তাঁর প্রতি আত্মসমর্পণকারী। " (সূরা বাকারা: ১৩২)

নিঃসন্দেহে হযরত ইসমাঈল হযরত ইয়াকুব (আ.)- এর চাচা ছিলেন। তাঁর পিতা ছিলেন না। কারণ হযরত ইয়াকুব হযরত ইসহাকের সন্তান। আর হযরত ইসহাক হযরত ইসমাঈলের ভাই ছিলেন। এতদসত্ত্বেও হযরত ইয়াকুবের সন্তানগণ হযরত ইয়াকুবের চাচা হযরত ইসমাঈলকে পিতা বলেছে। অর্থাৎ তারা أب শব্দটি তাঁর (ইসমাঈল) ওপরও প্রয়োগ করেছে। এ দু'ধরনের ব্যবহার সত্ত্বেও এ সম্ভাবনা থেকে যায় যে, আযরকে হেদায়েত করা সংক্রান্ত যে সব আয়াত রয়েছে সেগুলোতে উল্লিখিত أب শব্দটির কাঙ্ক্ষিত অর্থ হচ্ছে চাচা, বিশেষ করে শেখ মুফীদ যে ইজমার কথা বর্ণনা করেছেন তা থেকে। আর আযরকে ইবরাহীম (আ.) পিতা বলেছিলেন তা সম্ভবত এ কারণে যে, ইবরাহীম (আ.)- এর অভিভাবকত্বের দায়িত্ব দীর্ঘদিন আযরের ওপর ছিল। এ কারণেই হযরত ইবরাহীম (আ.) তাকে পিতার ায় সম্মান প্রদর্শন করতেন।

কোরআন আযরকে ইবরাহীম (আ.)- এর পিতা বলে নি

হযরত ইবরাহীম (আ.)- এর সাথে আযরের আত্মীয়তার সম্পর্ক সংক্রান্ত পবিত্র কোরআনের দৃষ্টিভি স্পষ্ট করার জ নিম্নোক্ত দু'টি আয়াতের ব্যাখ্যার দিকে আমরা সম্মানিত পাঠকবর্গের দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করব :

১. আরব উপদ্বীপের পরিবেশ মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)- এর অপার আত্মত্যাগের কারণে ঈমান ও ইসলামের নির্মল আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। অধিকাংশ অধিবাসীই আন্তরিকতার সাথে ঈমান আনয়ন করেছিল এবং বুঝতে পেরেছিল যে, শিরক ও মূর্তিপূজার চূড়ান্ত পরিণতি হচ্ছে দোযখ এবং শাস্তি। তারা যদিও ঈমান আনয়ন করার কারণে আনন্দিত ও প্রফুল্ল ছিল কিন্তু তাদের পিতা- মাতাদের মূর্তিপূজারী হওয়ার তিক্ত স্মৃতি স্মরণ করে তারা কষ্ট পেত। যে সব আয়াতে কিয়ামত দিবসে মুশরিকদের জীবন সংক্রান্ত বিশদ বিবরণ ও ব্যাখ্যা এসেছে সেগুলো শ্রবণ করা তাদের জ ছিল খুবই কষ্টকর ও বেদনাদায়ক। নিজেদের এ আত্মিক যন্ত্রণা লাঘব ও দূর করার জ তারা মহানবী (সা.)- এর কাছে অনুরোধ জানাত যেন তিনি তাদের প্রয়াত অতি নিকটাত্মীয় যারা কাফির ও মুশরিক অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে তাদের জ মহান আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা

করেন। আর ঠিক এভাবেই হযরত ইবরাহীম (আ.) তাঁর চাচা আযরের জ ও এ কাজটিই করেছিলেন। নিম্নোক্ত আয়াতটি তাদের (আরবের নবদীক্ষিত মুসলমানগণ) অনুরোধের প্রতি উত্তরস্বরূপ অবতীর্ণ হয়েছিল :

(ما كان للنَّبِيِّ وَ الّذين آمنوا أنْ يَسْتَغْفِروا للمشرِكين و لو كانوا أولي قُربى مِن بعدِ ما تبيَّن لهم أنَّهم أصحابُ الجحيم و ما كان استغفارُ إبراهيمَ لأبيه إلّا عن موعدةٍ وعدها إيّاه فلمّا تبيَّن له إنَّه عدوٌّ للهِ تبرَّأ منه إنَّ إبراهيمَ لأوّاهٌ حليم)

"নবী ও যারা ঈমান এনেছে তাদের জ শোভনীয় নয় যে, তারা মুশরিকদের জ ক্ষমা প্রার্থনা করবে যদি তারা অতি নিকটাত্মীয়ও হয়, যখন তাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, ঐ সব মুশরিক জাহান্নামের অধিবাসী। আর নিজ পিতার জ ইবরাহীমের ক্ষমা প্রার্থনা ছিল ঐ প্রতিজ্ঞার কারণে যা তিনি তাকে (চাচা আযরকে) করেছিলেন। তবে যখন ইবরাহীমের কাছে স্পষ্ট হয়ে গেল যে, সে (আযর) আল্লাহর শত্রু তখন তিনি তার সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করলেন। নিশ্চয়ই ইবরাহীম অত্যন্ত দয়ালু ও ধৈর্যশীল।" (সূরা তাওবা : ১১৩- ১১৪)

অগণিত দলিল- প্রমাণ থেকে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, আযরের সাথে ইবরাহীম (আ.)- এর কথোপকথন এবং তার জ ক্ষমা প্রার্থনা করার অ ীকার ইবরাহীম (আ.)- এর যৌবনেই হয়েছিল। অবশেষে ইবরাহীম (আ.) চাচা আযরের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করেছিলেন। অর্থাৎ এটি ঐ সময় হয়েছিল যখন ইবরাহীম (আ.) তাঁর জন্মভূমি বাবেল ত্যাগ করে ফিলিস্তিন, মিশর ও হিজাযে গমন করেন নি। এ আয়াত থেকে এ ধরনের সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, যখন আযর কুফর ও শিরকের মধ্যে দৃঢ়পদ থেকেছে তখন ইবরাহীম (আ.) তার সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করেছেন এবং জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তাকে মোটেও স্মরণ করেন নি।

২. ইবরাহীম (আ.) তাঁর জীবনের শেষভাগে একটি মহান দায়িত্ব পালন (অর্থাৎ পবিত্র কাবার পুনঃনির্মাণ কার্য সমাপ্ত করার পর) এবং পবিত্র মক্কার শুষ্ক ও মরুপ্রান্তরে নিজ স্ত্রী ও সন্তানকে আনয়ণ করার পর এমন সব ব্যক্তি সম্পর্কে আন্তরিকভাবে প্রার্থনা করেন যার মধ্যে তাঁর পিতা-

মাতাও ছিলেন। তিনি মহান আল্লাহর কাছে তাঁর প্রার্থনা কবুল হওয়ার জ   এ ধরনের দোয়াও করেছিলেন,

(ربَّنا اغْفِرْلي وَلِوالِدَيَّ و للمُؤْمنين يومَ يقومُ الحِساب)

"হে আমার প্রভু! আমাদেরকে, আমার পিতা- মাতা এবং মুমিনদেরকে যেদিন বিচার (হিসাব-নিকাশ) করা হবে সেদিন ক্ষমা করে দিন।" (সূরা ইবরাহীম : ৪১)

এ আয়াত থেকে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, পবিত্র কাবাগৃহ নির্মাণ করার পরই ইবরাহীম (আ.) বৃদ্ধাবস্থায় এ প্রার্থনা করেছিলেন। যদি উক্ত আয়াতে বর্ণিত والديَّ (আমার পিতা- মাতা) যাঁরা ছিলেন হযরত ইবরাহীম (আ.)- এর দয়া, ভালোবাসা এবং ভক্তিশ্রদ্ধার পাত্র এবং তাঁদের ম লের জ   প্রার্থনা করেছেন তিনিই যদি আযর হন তাহলে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, ইবরাহীম (আ.) আমৃত্যু এবং তাঁর জীবনের শেষ দিনগুলো পর্যন্ত আযরের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করেন নি এবং কখনো কখনো তার জ   ক্ষমা প্রার্থনাও করেছেন, অথচ যে আয়াতটি মুশরিকদের অনুরোধের উত্তরে বর্ণিত হয়েছে তা স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, হযরত ইবরাহীম (আ.) তাঁর যৌবনকালেই আযরের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করেছিলেন এবং তার থেকে পৃথক হয়ে গিয়েছিলেন। আর ক্ষমা প্রার্থনার সাথে সম্পর্কচ্ছেদ মোটেও সংগতিসম্পন্ন নয়।

এ দু'টি আয়াত পরস্পর সংযোজন করলে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, যে ব্যক্তি যৌবনকালে ইবরাহীম (আ.)- এর ঘৃণার পাত্র হয়েছিল এবং যার সাথে তিনি সম্পর্কচ্ছেদ করেছিলেন সেই ব্যক্তিটি ঐ ব্যক্তি থেকে ভিন্ন যাঁকে তিনি জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত সর্বদা স্মরণ করেছিলেন এবং যাঁর জ   ক্ষমা প্রার্থনা করেছিলেন।[৮৮]

মূর্তি ধ্বংসকারী ইবরাহীম

উৎসবের মুহূর্ত সমাগত হয়েছে। বাবেল শহরের অমনোযোগী জনগণ ক্লান্তি দূর করা, উদ্যম পুনঃসঞ্চার ও উৎসব উদযাপন করার জ   মরুভূমির দিকে গমন করল এবং শহর সম্পূর্ণরূপে জনশূ   হয়ে গেল। হযরত ইবরাহীম (আ.)- এর উজ্জ্বল ইতিহাস এবং শিরক ও মূর্তিপূজার বিরুদ্ধে তাঁর বক্তব্য ও নিন্দাবাদ বাবেলের জনগণকে ভীষণভাবে চিন্তিত করে তুলেছিল। এ

কারণেই তারা সবাই অনুরোধ করেছিল যে, ইবরাহীমও যেন তাদের সাথে ঐ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে। তবে তারা এ ব্যাপারে জোর- জবরদস্তি করতে থাকলে ইবরাহীম (আ.) অসুস্থতার সম্মুখীন হন। তখন তিনি إِنِّ سقيم (আমি অসুস্থ অথবা আমার শরীর ভালো নেই) এ কথা বলে তাদের কথার উত্তর দিয়েছিলেন এবং উৎসবে যোগদান করা থেকে বিরত ছিলেন।

সত্যিই ঐ দিন ছিল তাওহীদবাদী ও মুশরিকদের জ   আনন্দের দিন। মুশরিকদের জ   ঐ দিন ছিল প্রাচীন উৎসব উদযাপনের। উৎসবের আনুষ্ঠানিকতা উদযাপন এবং পূর্বপুরুষদের আচার- অনুষ্ঠান পুনরুজ্জীবিত করার জ   তারা পাহাড়ের পাদদেশ ও চিরসবুজ ক্ষেত- খামারে গিয়েছিল। আর তাওহীদের বীর পুরুষের জ   ও এটি ছিল অতি প্রাথমিক ও অভূতপূর্ব উৎসবের দিন যার আগমনের জ   তিনি (ইবরাহীম) দীর্ঘদিন যাবত অপেক্ষা করছিলেন। তিনি চাচ্ছিলেন শহর জনশূ   হয়ে যাক এবং সে সুযোগে শিরক ও কুফরের যাবতীয় নিদর্শন তিনি ধ্বংস করে দেবেন।

যখন জনতার সর্বশেষ দলটি শহর থেকে বের হয়ে গেল তখন হযরত ইবরাহীম (আ.) সুযোগের সদ্ব্যবহার করলেন। তিনি মহান আল্লাহর প্রতি ঈমান এবং তাঁর ওপর পূর্ণ ভরসাসহকারে মন্দিরে প্রবেশ করলেন। তিনি মন্দিরের মধ্যে নি প্রাণ মূর্তি ও কাষ্ঠনির্মিত প্রতিমাসমূহ দেখতে পেলেন। তাবাররুক হিসাবে মূর্তিপূজকরা যে সব খাবার মন্দিরে রেখে যেত তা হযরত ইবরাহীমের দৃষ্টি আকর্ষণ করল এবং তিনি সরাসরি খাদ্যের নিকটে গেলেন। তিনি এক টুকরা রুটি হাতে নিয়ে ঐ সব মূর্তির দিকে বি পের দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন, “কেন তোমরা বিভিন্ন ধরনের খাবার খাচ্ছ না?” বলার অপেক্ষা রাখে না যে, মুশরিকদের হস্তনির্মিত প্রতিমাসমূহের সামা   নড়া- চড়া করার ক্ষমতাও ছিল না। তারা খাবে কি? মন্দিরের বিরাট অ নে সুনশান নীরবতা বিরাজ করছিল। কিন্তু ইবরাহীম (আ.) মূর্তিগুলোর হাত, পা ও দেহের ওপর কুঠার দিয়ে একের পর এক আঘাত হানতে লাগলেন। যার ফলে সেখানকার নীরবতা ভে   গেল। তিনি মূর্তিগুলোকে ভে   টুকরো টুকরো করে ফেললেন। আর এভাবে মন্দিরের মধ্যে কাঠ ও ধাতুর একটি বিরাট স্তূপের সৃষ্টি হলো। তিনি কেবল বড় মূর্তিটিকে অক্ষত রেখে দিলেন এবং ঐ মূর্তিটির কাঁধে কুড়াল ঝুলিয়ে

রাখলেন। তাঁর কাজের লক্ষ্য ছিল এটিই যে, তিনি বোঝাতে চেয়েছেন স্বয়ং বড় মূর্তিটিই মূর্তিগুলো ধ্বংস করেছে। কিন্তু তাঁর এ বাহ্য কার্যকলাপের পেছনে একটি সুমহান উদ্দেশ্য ছিল যা বর্ণিত হওয়া উচিত। ইবরাহীম (আ.) ভালোভাবেই জানতেন যে, মুশরিকরা উৎসবস্থল থেকে ফিরে আসার পর মন্দিরগুলোর মূর্তিসমূহ ধ্বংস করার প্রকৃত কারণ অনুসন্ধান করবে এবং তারা এ ঘটনার বাহ্য রূপকে এক ধরনের অন্তঃসারশূ অবাস্তব কার্যকলাপ বলে অভিহিত করবে। কারণ তারা বি াস করবে না যে, এ বড় মূর্তিটিই এ সব আঘাত হেনেছে যার নড়াচড়া ও কাজ করার কোন ক্ষমতাই নেই। এমতাবস্থায় হযরত ইবরাহীম (আ.) প্রচারণার দৃষ্টিকোণ থেকে এ সুযোগের সদ্ব্যবহার করে বলতে পারবেন যে, তোমাদের স্বীকারোক্তি অনুযায়ী যখন এ বড় মূর্তিটির সামা তম ক্ষমতাই নেই তখন কিভাবে তোমরা তার উপাসনা করছ?

দিকচক্রবাল রেখার ওপর সূর্যোদয় হলো। সূর্যের আলোয় মরুপ্রান্তর ও সমতলভূমি সবকিছু আলোকিত হলো। জনগণ দলে দলে শহরে রওয়ানা হলো। প্রতিমাপূজার ল উপস্থিত হলো। একদল মন্দিরে প্রবেশ করল। এক অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা যা দেবতাদের হীনতা ও অপদস্থতা প্রকাশ করছিল তা যুবা- বৃদ্ধ সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। মন্দিরে পিনপতন নীরবতা বিরাজ করছিল। এক ব্যক্তি সেই নীরবতা ভে বলল, "কোন্ ব্যক্তি এ কাজ করেছে?" ইবরাহীম (আ.) প্রতিমাসমূহকে যে পূর্ব হতেই মন্দ বলতেন এবং মূর্তিপূজার স্পষ্ট বিরোধিতা করতেন তা সকলের জানা ছিল। তাই তারা নিশ্চিত হতে পারল যে, ইবরাহীম (আ.)- ই এ কাজ করেছেন। নমরুদের তত্ত্বাবধানে একটি বিচারসভার আয়োজন করা হলো। যুবক ইবরাহীমকে মায়ের সাথে এক সর্বসাধারণ বিচার অধিবেশনে জেরা করা হলো।

মায়ের অপরাধ ছিল এই যে, কেন তিনি তাঁর সন্তানকে গোপন রেখেছিলেন এবং শিরোচ্ছেদ করার জ কেন তিনি সরকারের বিশেষ দফতরে তাঁর সন্তানের পরিচিতি প্রদান করেন নি? তখন ইবরাহীম (আ.)- এর মা জেরাকারীর প্রশ্নের জবাবে বলেছিলেন, "আমি দেখতে পেলাম এ দেশের ভবি ৎ প্রজন্ম ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। তাই আমার এ সন্তানের ভবি ৎ কি হবে তা না জানা পর্যন্ত আমি তার ব্যাপারে কোন তথ্য প্রদান করি নি। যদি এ ব্যক্তি (ইবরাহীম) গণক ও

ভবি   দ্বক্তাদের ভবি   দ্বাণীতে বর্ণিত ঐ ব্যক্তিই হয়ে থাকে তাহলে আমি পুলিশকে তার ব্যাপারে অবশ্যই তথ্য প্রদান করতাম যাতে করে তারা অ   দের রক্তপাত সংঘটিত করা থেকে বিরত থাকে। আর এ যদি ঐ ব্যক্তি না হয়ে থাকে তাহলে আমি এ দেশের এক ভবি   ৎ যুবপ্রজন্মকেই রক্ষা করেছি। ইবরাহীম (আ.)- এর মায়ের যুক্তি বিচারকদের দৃষ্টি সম্পূর্ণরূপে আকর্ষণ করেছিল।

এরপর ইবরাহীম (আ.)- কে জেরা করার পালা আসে। তিনি বললেন, "বাহ্যিক অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে যে, এটি বড় প্রতিমারই কাজ। আর আপনারা ঘটনা সম্পর্কে তাকেই জিজ্ঞাসা করুন। যদি তাদের (প্রতিমাদের) বাকশক্তি থেকে থাকে!" তেজোদ্দীপ্ত এ জবাব যা ব্য   ও অবজ্ঞাপূর্ণ ছিল তা আসলে অ   উদ্দেশ্যেই দেয়া হয়েছিল; আর তা হলো : ইবরাহীম (আ.) নিশ্চিত ছিলেন যে, তারা তাঁর জবাবে এটিই বলবে, "ইবরাহীম! তুমি তো জান, এ সব প্রতিমার বাকশক্তি নেই।" তখন তিনি একটি মৌলিক বিষয়ের দিকে বিচারকমণ্ডলীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হবেন। ঘটনাক্রমে তিনি যা পূর্ব হতে উপলব্ধি করেছিলেন তা- ই হলো। তাদের এ কথা মূর্তিগুলোর দুর্বলতা, অপদস্থতা ও অসামর্থ্যেরই পরিচায়ক ছিল। ইবরাহীম (আ.) জবাবে বললেন, "আসলেই যদি প্রতিমাগুলোর অবস্থা এমন হয় যা তোমরা বর্ণনা করেছ তাহলে কেন তোমরা তাদের উপাসনা করছ এবং তাদের কাছে নিজেদের মনস্কামনা প্রার্থনা করছ?! "

অজ্ঞতা, গোঁড়ামি, অন্ধভক্তি ও অনুসরণ বিচারকদের মন- মানসিকতার ওপর প্রাধা   বিস্তার করে রেখেছিল এবং ইবরাহীম (আ.)- এর দাঁতভা   া জবাবে তারা একদম নিরুপায় হয়ে পড়ে; তাই তারা ইবরাহীম (আ.)- কে জীবন্ত দগ্ধ করে হত্যা করার পক্ষে রায় দিল। অ ি কুণ্ড প্র   লিত করা হলো এবং তাওহীদের অমিত বিক্রম পুরুষ ইবরাহীম (আ.)- কে অ ি কুণ্ডের মধ্যে নিক্ষেপ করা হলো। কিন্তু ইবরাহীম (আ.)- এর প্রতি মহান আল্লাহ্ দয়া ও অনুগ্রহের হস্ত প্রসারিত করলেন এবং তাঁকে তাদের অনিষ্ট থেকে রক্ষা করলেন। মহান আল্লাহ্ মনু   নির্মিত দোযখকে (অ ি কুণ্ডকে) চিরসবুজ পুষ্পোদ্যানে রূপান্তরিত করলেন।[৮৯]

এ কাহিনীর শিক্ষণীয় দিকসমূহ

যেহেতু ইয়া দিগণ নিজেদেরকে তাওহীদের অনুসারী বলে বিবেচনা করে তাই তাদের মধ্যে এ কাহিনীটি প্রসিদ্ধ এবং তাদের ধর্মীয় গ্রন্থ তাওরাতে বিদ্যমান এবং ঐশী গ্রন্থসমূহের মধ্যে কেবল পবিত্র কোরআনই বর্ণনার দায়িত্ব নিয়েছে। এ কারণেই এ গল্পের কতিপয় শিক্ষণীয় দিক যা হচ্ছে পবিত্র কোরআন কর্তৃক নবীদের কাহিনী বর্ণনা করারই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য তা আমরা এখানে উল্লেখ করব :

১. এ কাহিনী হযরত ইবরাহীম খলীল (আ.)- এর অসাধারণ সাহস ও বীরত্বের শক্তিশালী দলিল। মূর্তি ভাঙা এবং শিরকের যাবতীয় নিদর্শন ও উপায়- উপকরণ ধ্বংস করার ব্যাপারে হযরত ইবরাহীম (আ.)- এর সিদ্ধান্ত এমন কোন কিছু ছিল না যা নমরুদের অনুসারীদের কাছে গোপন থাকবে। কারণ তিনি মূর্তি ও প্রতিমাসমূহের নিন্দা ও কটূক্তি করে মূর্তিপূজার ব্যাপারে তাঁর পূর্ণ ঘৃণা ও ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন। তিনি খুব স্পষ্ট ভাষায় বলতেন, "তোমরা যদি এ গর্হিত কাজ থেকে বিরত না হও তাহলে আমি নিজেই এ সব মূর্তি ও প্রতিমার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেব।" যেদিন সবাই মরুভূমিতে গমন করেছিল সেদিন তিনি প্রকাশ্যে বলেছিলেন, "তোমাদের অনুপস্থিতিতে আমি এ সব মূর্তি ও প্রতিমার ব্যাপারে একটি চিন্তা- ভাবনা করব।"[৯০]

ইমাম সাদেক (আ.) বলেছেন, "কয়েক সহ াধিক কাফির- মুশরিকের সংঘবদ্ধ দল ও চক্রের বিরুদ্ধে একজন তাওহীদবাদী ব্যক্তির আন্দোলন ও সংগ্রাম হযরত ইবরাহীম (আ.)- এর পূর্ণ সাহসিকতা ও দৃঢ়পদ থাকার জীবন্ত দলিল। তিনি তাওহীদের বাণী উন্নীতকরণ এবং এক উপাস্যের উপাসনার মূলনীতি ও ভিত্তিসমূহ দৃঢ় করার পথে যে কোন ধরনের ঘটনায় মোটেও ভীত হন নি।"[৯১]

২. হযরত ইবরাহীমের তীব্র আঘাতসমূহ : যদিও বাহ্যত এক ধরনের সশস্ত্র ও বৈরীসুলভ বি ব ছিল, তবে বিচারকমণ্ডলীর সাথে হযরত ইবরাহীম (আ.)- এর কথোপকথন থেকে যেমন প্রতিভাত হয় তদনুযায়ী এ বি ব ও আন্দোলনের প্রকৃত স্বরূপের কেবল প্রচার পর্যায়ই রয়েছে। কারণ তাঁর জনপদের অধিবাসীদের ঘুমন্ত বিবেক ও স্বভাব- প্রকৃতি জাগ্রত করার সর্বশেষ উপায় হিসাবে তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে, তিনি যাবতীয় মূর্তি ধ্বংস করবেন, সবচেয়ে বড়

বিগ্রহটিকে অক্ষত রাখবেন এবং তার কাঁধেই কুঠারটি ঝুলিয়ে রাখবেন যাতে করে এ জনগণ এ ধরনের বিষয়ের প্রকৃত উৎস ও কারণসমূহের ব্যাপারে আরো বেশি অনুসন্ধান ও গবেষণা করতে সচেষ্ট হয় এবং পরিশেষে যখন তারা এ কাজকে (মূর্তি ভাঙা) পূর্বপরিকল্পিত ঘটনার চেয়ে বেশি কিছু মনে করবে না এবং কখনই তারা বি াস করবে না যে, বড় মূর্তিটি এ সব আঘাত করতে পারে তখন হযরত ইবরাহীম (আ.) এ কাজটি থেকে সত্যধর্ম প্রচার কার্যক্রমের ফায়দা উঠাতে সক্ষম হবেন এবং বলতে পারবেন যে, তোমাদের স্বীকারোক্তি অনুযায়ী এ বড় মূর্তিটির সামা ক্ষমতাও নেই; তাহলে তোমরা কিভাবে এগুলোর উপাসনা করছ? ঘটনাচক্রে হযরত ইবরাহীম (আ.) এ সিদ্ধান্ত নিয়েই ফেললেন এবং তাঁর (হযরত ইবরাহীমের) কথাগুলো শোনার পর তাদের বিবেকবোধ জাগ্রত হলো এবং নিজেদেরকে তারা ‘জালেম ’ বলে অভিহিত করেছিল। পবিত্র কোরআনে ঘটনাটি এভাবে বর্ণিত হয়েছে :

(فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنّكم أنتم الظّالمون...)

“ তারা নিজেদের বিবেকের দিকে প্রত্যাবর্তন করল (অর্থাৎ তাদের বিবেকবোধ জাগ্রত হলো)। অতঃপর তারা বলল : নিঃসন্দেহে তোমরাই তো জালেম। আর তারা লজ্জাবশত নিজেদের মাথা নিচে নামিয়ে বলল : তুমি তো জান, মূর্তিগুলোর বাকশক্তি নেই। ” (সূরা আম্বিয়া : ৬৪)

আর এ থেকে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, শুরু থেকেই নবীদের সাফল্য ও বিজয়ের সোপান যুক্তি ও দলিল- প্রমাণ ব্যতীত আর কিছুই ছিল না। তবে প্রতিটি যুগে তা ছিল সে যুগেরই উপযোগী। আর যদি তা না হয় তাহলে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে হযরত ইবরাহীম (আ.) প্রতিমাগুলো যে ভে ছিলেন তারই বা কি মূল্য থাকে? অবশ্যই তাঁর এ কাজের মাধ্যমে একটি বিরাট খেদমত সম্পন্ন হয়েছে যার জ নিজ প্রাণ উৎসর্গ করা বুদ্ধিবৃত্তিক দৃষ্টিকোণ থেকে অত্যন্ত প্রশংসনীয়।

৩. হযরত ইবরাহীম (আ.) বেশ ভালোভাবেই বুঝতেন যে, এ কাজ তাঁর জীবনকে বিপন্ন ও নিঃশেষ করে দেবে এবং স্বাভাবিকভাবে তিনি অত্যন্ত উদ্বি থাকবেন ও পালিয়ে যাবেন। অথবা তিনি অন্ততঃপক্ষে ঠাট্টা- মশকরা ও আজে- বাজে কথা বলায় লিপ্ত হবেন। কিন্তু এর বিপরীতে নিজ আত্মা, বিবেক- বুদ্ধি ও স্নায়ুর ওপর তাঁর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ ছিল। যেমন যখন তিনি মন্দিরে প্রবেশ

করছিলেন তখন তিনি বি পাত্মক কে প্রতিমাগুলোর কাছে গিয়ে প্রতিটিকে রুটি খেতে আহবান জানিয়েছিলেন। এরপর তিনি মন্দিরকে ভা া কাঠ ও লাকড়ির ছোট- খাটো একটি স্তূপ বা টিলায় পরিণত করলেন। তিনি এ কাজকে অত্যন্ত সাদামাটা ও স্বাভাবিক কাজ বলে গণ্য করেছিলেন যেন তাঁর এ কাজের ফলশ্রুতিতে তাঁকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হতে হবে না। যখন হযরত ইবরাহীম (আ.) বিচারকমণ্ডলীর সম্মুখীন হলেন তখন তিনি এমন উত্তরই দিয়েছিলেন, "এটি আমার কাজ নয়, বরং এ হচ্ছে সবচেয়ে বড় মূর্তিটিরই কাজ। আপনারা তো তার কাছ থেকেই প্রকৃত ঘটনা জেনে নিতে পারেন।" বিচারালয়ে এ ধরনের রসিকতাপূর্ণ উক্তি আসলে ঐ ব্যক্তিরই সাজে যে নিজেকে যে কোন ধরনের পরিস্থিতি ও অবস্থা মোকাবিলা করার জ পূর্ণ প্রস্তুত করেছে এবং (যে কোন পরিণতি বরণ করার জ) সে মোটেও ভীত ও শ ি ত হয় না।

এ সব কিছুর চেয়ে আশ্চর্যজনক হচ্ছে ইবরাহীম (আ.)- এর অবস্থা পর্যালোচনা করা ঐ মুহূর্তে যখন তাঁকে মিনজানিকের ওপর স্থাপন করা হয়েছিল এবং তখন তিনি নিশ্চিত ছিলেন যে, আর কয়েক মিনিট পরেই তাঁকে ঐ আগুনের লেলিহান শিখার মধ্যে নিক্ষেপ করা হবে যার ালানি কাষ্ঠ দেবতাদের সাহায্যার্থে এবং একটি পবিত্র ধর্মীয় দায়িত্ব পালন করার জ ব্যাবিলনের অধিবাসীরা পূর্ব হতে একত্র ও স্তূপীকৃত করেছিল। আর আগুনের লেলিহান শিখাগুলো এতটা লকলকিয়ে উঠছিল যে, তার ওপর উ য়নের ক্ষমতা শকুনেরও ছিল না। ঠিক ঐ মুহূর্তে ওহীর ফেরেশতা হযরত জিবরাইল (আ.) অবতীর্ণ হলেন এবং যে কোন সাহায্য করার ব্যাপারে যে তিনি প্রস্তুত এ কথা হযরত ইবরাহীমকে জানালেন এবং বললেন, "আপনার যদি কোন বক্তব্য থেকে থাকে তাহলে তা বলুন।" হযরত ইবরাহীম (আ.) বললেন, "আমার আর্জি আছে, তবে তা আপনার কাছে নয়, বরং তা মহান আল্লাহর কাছেই বলব।" ঐ কঠিন পরিস্থিতিতে হযরত ইবরাহীম (আ.)- এর এ উত্তর তাঁর আত্মা ও চিত্তের মহত্ত্বকে সম্পূর্ণরূপে পরিস্ফুটিত করে।

বাদশাহ্ নমরুদের প্রাসাদ যে স্থানে অ ি কুণ্ড প্র লিত করা হয়েছিল সেখান থেকে কয়েক মাইল দূরে অবস্থিত ছিল। বাদশাহ্ নমরুদ তার সেই প্রাসাদে বসে খুব সূক্ষ্মভাবে এবং অধীর আগ্রহে প্রতিশোধ গ্রহণের প্রতীক্ষা করছিল। আর সে মনে- প্রাণে দেখতে চাচ্ছিল যে, আগুনের লেলিহান

শিখাগুলো কিভাবে ইবরাহীমকে দগ্ধ ও ভস্মীভূত করে ফেলছে। মিনজানিক সচল করা হলো। এক প্রচণ্ড ঝাঁকুনির পরপরই তাওহীদের অমিত বিক্রম বীর পুরুষের দেহ প্র লিত অ কুণ্ডের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হলো। কিন্তু মহান আল্লাহর অপ্রতিরোধ্য ইচ্ছাশক্তি ঐ কৃত্রিম (মানবনির্মিত) দোযখকে পুষ্পোদ্যানে রূপান্তরিত করল। এ দৃশ্য দেখে সবাই আশ্চর্যান্বিত হয়ে গেল। এমনকি বাদশাহ্ নমরুদ পর্যন্ত অনিচ্ছাকৃতভাবে আযরের দিকে মুখ ফিরিয়ে বলেই ফেলল, "ইবরাহীম তার নিজ প্রভুর কাছেও দেখছি সম্মানিত।"

কার্যকারণের ষ্টা এবং কার্যকারণের অস্তিত্ব বিলোপকারী মহান আল্লাহরই নির্দেশে অ কুণ্ডটি হযরত ইবরাহীমের জ পুষ্পোদ্যানে পরিণত হয়েছিল। যেহেতু মহান আল্লাহ্ই আগুনকে দহন করার ক্ষমতা, সূর্যকে আলোকোজ্জ্বল্য এবং চন্দ্রকে স্নিগ্ধতা দান করেছেন সেহেতু তিনি এ সব পদার্থ ও বস্তুর এ সব গুণ ও ক্ষমতা কেড়ে নিতে সক্ষম। আর এ কারণেই মহান আল্লাহকে কার্যকারণের ষ্টা এবং ঐ একই কার্যকারণের অস্তিত্বলোপকারী বলে অভিহিত করা যায়।

পুনশ্চ এ সব ঘটনাপ্রবাহ দীন প্রচারের ক্ষেত্রে হযরত ইবরাহীমকে পূর্ণ স্বাধীনতা দিতে পারে নি। অবশেষে নমরুদ- সরকার পরামর্শ করার পর হযরত ইবরাহীমকে দেশ থেকে বহিষ্কার করার সিদ্ধান্ত নিল। আর এভাবে শাম (সিরিয়া), ফিলিস্তিন, মিশর ও হিজাযের পবিত্র ভূমির দিকে হযরত ইবরাহীম (আ.)- এর হিজরতের পটভূমি তৈরি হয়ে গেল।

হযরত ইবরাহীম (আ.)- এর হিজরত

ব্যাবিলনের বিচারালয় হযরত ইবরাহীমকে বহিষ্কার করার পক্ষে রায় দিল। আর তিনিও বাধ্য হয়ে নিজ জন্মভূমি ত্যাগ করে ফিলিস্তিন ও মিশরের দিকে যাত্রা করলেন। সেখানে ফিলিস্তিনের শাসকবর্গ আমালিকগণ তাঁকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানায়। তারা তাঁকে প্রভূত উপঢৌকন প্রদান করে। তাদের প্রদত্ত উপঢৌকনসমূহের মধ্যে হাজার (হাজেরা) নাম্নী এক দাসীও ছিল।

হযরত ইবরাহীম (আ.)- এর স্ত্রী সারাহ্ ঐ সময় পর্যন্ত মা হন নি (অর্থাৎ ইবরাহীম ও সারাহ্ দম্পতি তখনও নিঃসন্তান ছিলেন)। এ ঘটনা প্রাণপ্রিয় স্বামীর প্রতি তাঁর ভালোবাসা ও আবেগকে আরো বৃদ্ধি করল। তিনি (হযরত সারাহ্) দাসী হাজারের (হাজেরার) সাথে সহবাস করার জ ইবরাহীম (আ.)- কে উদ্বুদ্ধ করতে লাগলেন এতদুদ্দেশ্যে যে, নিঃসন্তান ইবরাহীম (আ.) সম্ভবত হাজেরার মাধ্যমে সন্তানের জনক হতে পারেন। আর এর ফলে তাঁদের জীবন সন্তানের দ্বারা আলোকিত হয়ে যাবে। বিবাহ অনুষ্ঠান সুসম্পন্ন হলো। হযরত হাজেরা কিছুদিন পরে একটি পুত্রসন্তান প্রসব করলেন যাঁর নাম 'ইসমাঈল ' রাখা হলো। এর অল্প দিন পরেই হযরত সারাহ্ও মহান আল্লাহর অপার কৃপা ও করুণায় গর্ভধারণ করলেন। মহান আল্লাহ্ তাঁকে একটি পুত্রসন্তান দিলেন হযরত ইবরাহীম (আ.) যাঁর নাম 'ইসহাক'রেখেছিলেন।[৯২]

কিছুকাল পরে হযরত ইবরাহীম (আ.)- কে মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে ইসমাঈল (আ.)- কে তাঁর মাতাসহ দক্ষিণে অর্থাৎ পবিত্র মক্কার অখ্যাত এক উপত্যকায় আবাসন দেয়ার আদেশপ্রাপ্ত হলেন। এ উপত্যকায় কোন মনু বসতি ছিল না। শাম থেকে ইয়েমেন এবং ইয়েমেন থেকে শামে যে সব কাফেলা যাতায়াত করত কেবল তারাই উক্ত উপত্যকায় (বিশ্রামের জ) সাময়িকভাবে তাঁবু স্থাপন করত। এছাড়া বছরের বাকী সময় এ উপত্যকা আরব উপদ্বীপের অ সকল অঞ্চলের মতোই মানবশূ উত্তপ্ত মরুপ্রান্তর হিসাবেই পড়ে থাকত।

এ ধরনের ভীতিপ্রদ অঞ্চলে বসবাস আমালিকদের দেশে বসবাসরত একজন নারীর জ অত্যন্ত কষ্টসাধ্য ও অসহনীয় ব্যাপার ছিল।

মরুভূমির দগ্ধকারী উত্তাপ ও এর উষ্ণ বাতাস তাঁর চোখের সামনে যেন মৃত্যুর ভয় র ছায়ামূর্তিকে উপস্থাপন করেছিল। এ ধরনের পরিস্থিতির উদ্ভব হতে পারে বিধায় আর ইবরাহীম (আ.) নিজেও চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন। তিনি সওয়ারী পশুর লাগাম ধরে অশ্রুসজল নয়নে স্ত্রী ও পুত্রকে বিদায় জানানোর সময় হযরত হাজেরাকে বললেন, "হে হাজেরা! এ সব কিছু মহান আল্লাহর আদেশ অনুযায়ী করা হয়েছে। আর তাঁর আদেশ পালন করা থেকে পালিয়ে বেড়াবার কোন পথ নেই। মহান আল্লাহর দয়া ও কৃপার ওপর নির্ভর কর। আর নিশ্চিতভাবে বি াস কর যে, তিনি আমাদেরকে লাঞ্ছিত ও অপদস্থ করবেন না।" এরপর তিনি মহান আল্লাহর কাছে একাগ্রতা সহকারে প্রার্থনা করে বললেন :

(ربِّ اجعل هذا بلداً آمناً و ارْزُقْ أهْله مِنَ الثّمرات مَنْ آمنَ منهم باللهِ و اليومِ الآخرِ)

"হে প্রভু! এ স্থানকে নিরাপদ শহর ও জনপদে পরিণত কর। এর অধিবাসীদের মধ্য থেকে যারা মহান আল্লাহ্ ও শেষ বিচার দিবসের প্রতি বি াস স্থাপন করবে তাদেরকে বিভিন্ন ধরনের ফল ও খাদ্য রিযিক হিসাবে প্রদান কর।" (সূরা বাকারা : ১২৬)

আর যখন তিনি টিলা বেয়ে নিচে নামছিলেন তখন তিনি পেছনের দিকে তাকিয়ে তাঁদের জ মহান আল্লাহর দয়া, কৃপা ও অনুগ্রহ প্রার্থনা করলেন।

এ হিজরত ও ভ্রমণ বাহ্যত অত্যন্ত কষ্টকর হলেও পরবর্তীতে স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল যে, তা সুমহান ফলাফল ও পরিণতি বয়ে এনেছিল। কারণ কাবাগৃহ নির্মাণ, তাওহীদে বি াসীদের জ সুমহান ও সুবৃহৎ ঘাঁটির গোড়াপত্তন, অত্র এলাকায় তাওহীদের ঝাণ্ডা উত্তোলন এবং এক গভীর ধর্মীয় আন্দোলনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন- যা এতদঞ্চলে সর্বশেষ নবী কর্তৃক বাস্তবায়িত হবে- আসলে এগুলোই হযরত ইবরাহীম (আ.)- এর এ সুমহান হিজরতের মহাপরিণতি বা ফলাফল বলে গণ্য।

যমযম কূপ আবিষ্কার

হযরত ইবরাহীম (আ.) সওয়ারী পশুর লাগাম হাতে ধরে অশ্রুসজল নেত্রে পবিত্র মক্কায় বিবি হাজেরা এবং নিজ সন্তান ইসমাঈলকে ত্যাগ করে রওয়ানা হলেন। অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই তাঁদের খাদ্য ও পানি ফুরিয়ে গেল এবং হাজেরার স্ত   শুকিয়ে গেল। সন্তান ইসমাঈলের অবস্থা সংকটাপন্ন হয়ে গেল। মা হযরত হাজেরার দু'চোখ বেয়ে অশ্রু ঝরতে লাগল। তিনি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে উঠে দাঁড়ালেন এবং সাফা পাহাড়ের পাথরগুলোর কাছে উপস্থিত হলেন। মারওয়া পাহাড়ের কাছে যে মরীচিকা ছিল তা দূর থেকে তাঁর দৃষ্টিগোচর হলে তিনি দৌড়ে   ত সেখানে পৌঁছলেন। তবে প্রহেলিকাময় প্রাকৃতিক এ দৃশ্যের তিক্ততা তাঁর জ   অত্যন্ত কষ্টকর ও যন্ত্রণাদায়ক হয়েছিল। তাঁর শিশুসন্তানের অনবরত গগনবিদারী ক্রন্দনধ্বনি এবং স ীন অবস্থা তাঁকে সবচেয়ে বেশি কিংকর্তব্যবিমূঢ় করেছিল। আর এর ফলে তিনি (পানির খোঁজে) যত্রতত্র ছুটাছুটি করতে লাগলেন। তিনি সাফা ও মারওয়া পাহাড়দ্বয়ের মাঝে পানির আশায় সাত বার আসা- যাওয়া করলেন। কিন্তু অবশেষে নিরাশ হয়ে সন্তানের কাছে ফিরে আসলেন।

দুগ্ধপো   শিশু ইসমাঈলের   াস- প্র   াসগুলো গোনা যাচ্ছিল (ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় তাঁর প্রাণ এতটা ওষ্ঠাগত হয়েছিল যে, তাঁর   াস- প্র   াস অত্যন্ত ধীর ও টানা- টানা হয়ে গিয়েছিল এবং তা গণনা করা যাচ্ছিল)। এর ফলে তাঁর ক্রন্দন ও চিৎকার করার শক্তিও যেন রহিত হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু এ ধরনের বিপদসঙ্কুল পরিস্থিতিতে হযরত ইবরাহীম (আ.)- এর প্রার্থনা কবুল হলো। ক্লান্তশ্রান্ত মা দেখতে পেলেন ইসমাঈলের পায়ের তলদেশ থেকে স্বচ্ছ পানি বের হচ্ছে। যে মা সন্তানের জীবনের শেষ মুহূর্তগুলো প্রত্যক্ষ করছিলেন এবং নিশ্চিত ছিলেন যে, আর কয়েক মুহূর্তের মধ্যে তাঁর সন্তানের প্রাণপাখি দেহ থেকে বের হয়ে যাবে, তিনি এ পানি দেখে এতটা আনন্দিত হলেন যে যার কোন সীমা ছিল না এবং তাঁর চোখে জীবনের আলো ও দ্যুতি চমকাচ্ছিল। ঐ স্বচ্ছ পানি পান করে তিনি নিজে ও তাঁর সন্তানের তৃষ্ণা মেটালেন। হতাশা ও নিরাশার কালো মেঘ যা তাঁদের

জীবনের আকাশে ছায়া বিস্তার করেছিল তা মহান আল্লাহর দয়ার মৃদুমন্দ সমীরণের দ্বারা দূরীভূত হয়ে গেল।[৯৩]

এ ঝরনাটি সেদিন থেকে আজ পর্যন্ত 'যমযম ঝরনা ' নামে পরিচিত। এ ঝরনাটির উদ্ভব হওয়ার কারণে সেটির ওপর পাখির আনাগোনা শুরু হয়। জুর ম গোত্র যারা উক্ত উপত্যকা থেকে দূরবর্তী এক অঞ্চলে বসবাস করত তারা পাখিদের আনাগোনা ও উড়ে বেড়ানো থেকে নিশ্চিত হলো যে, ঐ উপত্যকার আশেপাশে কোথাও পানি পাওয়া গেছে। প্রকৃত অবস্থা জানার জ জুর ম গোত্র দু'ব্যক্তিকে সেখানে প্রেরণ করল। তারা অনেক অনুসন্ধান করার পর মহান আল্লাহর রহমতের এ কেন্দ্রবি র সাথে পরিচিত হলো। যখন তারা হযরত হাজেরার কাছে আসলো তখন দেখতে পেল যে, একজন রমণী এক সন্তানের সাথে উক্ত পানির ধারে (যমযমের পাশে) বসে আছেন। তারা তৎক্ষণাৎ ফিরে গিয়ে এ ব্যাপারটি গোত্রপতিদেরকে জানাল। জুর ম গোত্র দলে দলে রহমতের এ ঝরনাধারার চারপাশে তাঁবু স্থাপন করল। একাকিত্বের তিক্ততা যা হযরত হাজেরাকে ঘিরে রেখেছিল তা এখন বিদূরিত হয়ে গেল। ইসমাঈল (আ.) সেখানে শশীকলার ায় বেড়ে উঠতে লাগলেন এবং বসতিস্থাপনকারী জুর ম গোত্রের সাথে তাঁদের মেলামেশার কারণে ইসমাঈল (আ.) জুর ম গোত্রে বিবাহ করেছিলেন। আর এ বৈবাহিক সম্পর্কের কারণে তিনি জুর ম গোত্রের যথেষ্ট সামাজিক সমর্থন ও সাহায্য- সহযোগিতা লাভ করেছিলেন। অল্প কিছুদিনের মধ্যেই ইসমাঈল (আ.) এ গোত্রেরই এক মেয়েকে বিয়ে করলেন। আর এ কারণেই হযরত ইসমাঈল (আ.)- এর বংশধরগণ মায়ের মাধ্যমে এ গোত্রের সাথে সংযুক্ত হয়ে পড়ে।

পুনরায় দেখা- সাক্ষাৎ

মহান আল্লাহর আদেশে প্রাণপ্রিয় সন্তান ইসমাঈলকে তাঁর মা হাজেরার সাথে মক্কায় রেখে আসার পর সন্তানকে দেখার জ হযরত ইবরাহীম কখনো কখনো পবিত্র মক্কা অভিমুখে সফর করতেন। তিনি খুব সম্ভবত তাঁর প্রথম সফরে যখন মক্কায় প্রবেশ করেন তখন তিনি পুত্র ইসমাঈলকে ঘরে পেলেন না। ঐ সময় ইসমাঈল (আ.) শক্ত- সামর্থ্যবান যুবকে পরিণত হয়েছিলেন এবং জুর ম গোত্রের এক রমণীকে বিয়ে করেছিলেন। ইবরাহীম (আ.) ইসমাঈল (আ.)- এর স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা

করলেন, “তোমার স্বামী কোথায়?” তখন সে উত্তরে বলেছিল, “সে শিকারে গিয়েছে।” এরপর তিনি ঐ মহিলাকে জিজ্ঞাসা করলেন, “তোমাদের কাছে খাবার আছে কি?” সে তখন বলেছিল, “না, নেই।” ইবরাহীম (আ.) পুত্রবধুর এ নিষ্ঠুর আচরণে খুবই ব্যথিত হয়েছিলেন। তাই তিনি বললেন, “ইসমাঈল যখনই শিকার থেকে ফিরবে তখন আমার পক্ষ থেকে তাকে সালাম জানাবে। আর তাকে বলবে : তোমার ঘরের চৌকাঠটি (স্ত্রী) পাল্টে ফেলবে।” এ কথা বলে তিনি যে পথ দিয়ে এসেছিলেন সে পথেই তাঁর লক্ষ্যস্থলের দিকে প্রত্যাবর্তন করলেন।

ইসমাঈল (আ.) শিকার থেকে ফিরে এসেই পিতার সুঘ্রাণ পেলেন এবং স্ত্রীর কথাবার্তা থেকেও নিশ্চিত হলেন যে, আগন্তুক ব্যক্তিটি ছিলেন তাঁর পিতা ইবরাহীম (আ.)। আর তিনি পিতার প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবহিত হলেন এবং বুঝতে পারলেন যে, তাঁর পিতা তাঁকে তাঁর বর্তমান স্ত্রীকে তালাক দিয়ে অ আরেকজনকে বিয়ে করার আদেশ দিয়েছেন। কারণ এমন রমণী তাঁর সহধর্মিণী হওয়ার যোগ্যতা রাখে না।

কেউ হয়তো প্রশ্ন করতে পারে যে, হযরত ইবরাহীম (আ.) কেন এত দীর্ঘ পথ ও দূরত্ব অতিক্রম করেও ছেলের শিকার থেকে ফিরে না আসা পর্যন্ত ধৈর্যধারণ করতে পারলেন না এবং তিনি কিভাবে শত শত ফারসাখ দূরত্ব অতিক্রম করে সন্তানের সাথে দেখা না করেই ফিরে যেতে পারলেন?

ঐতিহাসিকগণ লিখেছেন, তিনি স্ত্রী সারাহকে কথা দিয়েছিলেন যে, তিনি এর চেয়ে বেশি বিলম্ব করবেন না। এ প্রতিশ্রুতিই ছিল তাঁর ত্বরা করার কারণ। যাতে করে তিনি তাঁর কথার খেলাপ না করেন সেজ তিনি বেশিক্ষণ অপেক্ষা করেন নি। এ সফরের পরে তিনি মহান আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে পবিত্র মক্কা সফর করার জ পুনরায় আদিষ্ট হয়েছিলেন। হযরত নূহ (আ.)- এর মহা াবনে ধ্বংস হয়ে যাওয়া পবিত্র কাবাগৃহের পুনঃনির্মাণ এবং একত্ববাদী বি াসীদের অন্তঃকরণ এ গৃহের পানে নিবদ্ধ করার ব্যাপারে তিনি আদেশপ্রাপ্ত হয়েছিলেন।

পবিত্র কোরআন সাক্ষ্য দেয় যে, হযরত ইবরাহীম (আ.)- এর জীবনের শেষভাগে পবিত্র কাবা পুনঃনির্মাণের পর পবিত্র মক্কার মরু এলাকা শহরে পরিণত হয়েছিল। কারণ হযরত ইবরাহীম (আ.) নির্মাণ কার্য সমাপ্ত হওয়ার পর মহান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করে বলেছিলেন :

(ربِّ اجعلْ هذا البلدَ آمناً و اجنُبْني و بنيَّ أنْ نعبدَ الأصنام)

"হে প্রভু! এ শহরকে নিরাপদ নগরী করে দিন; আর আমাকে ও আমার বংশধরদেরকে মূর্তিপূজা করা থেকে বিরত রাখুন।" (সূরা ইবরাহীম : ৩৫)

হযরত ইবরাহীম (আ.) মক্কার মরুভূমিতে প্রবেশ করার সময় এ প্রার্থনা করেছিলেন,

(ربِّ اجعل هذا بلداً آمناً)

"হে আমার প্রভু! এ স্থানকে নিরাপদ নগরীতে পরিণত করে দিন।" (সূরা বাকারা : ১২৬)

আলোচনা পূর্ণ করার জ পবিত্র কাবাগৃহের নির্মাণপদ্ধতি এবং এর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বর্ণনা করার প্রয়োজন ছিল। কিন্তু আমরা যেন আমাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য থেকে পিছিয়ে না থাকি সেজ আমরা মহানবী (সা.)- এর যে কতিপয় পূর্বপুরুষ ইতিহাসে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন তাঁদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে এখন আলোচনা করব।

২. কুসাই বিন কিলাব

মহানবী (সা)- এর পূর্বপুরুষগণ যথাক্রমে আবদুল্লাহ্, আবদুল মুত্তালিব, হাশিম, আবদে মান্নাফ, কুসাই, কিলাব, মুররাহ্, কা ' ব, লুওয়াই, গালিব, ফিহর
(কুরাইশ), মালেক, নাযার, কিনানাহ্, খুযাইমাহ্, মুদ্রিকা, ইলইয়াস, মুযার (মুদার), নিযার, মা'দ ও আদনান।[৯৪]

নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, মা'দ বিন আদনান পর্যন্ত মহানবী (সা.)- এর নসব (বংশ লতিকা) হচ্ছে এটিই যা ওপরে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু আদনান থেকে তদূর্ধ্বে হযরত ইসমাঈল (আ.) পর্যন্ত সংখ্যা ও নামের দিক থেকে বেশ মতপার্থক্য আছে এবং ইবনে আব্বাস হতে বর্ণিত রেওয়ায়েত অনুযায়ী যখনই মহানবীর নসব আদনান পর্যন্ত পৌঁছবে তখন অবশ্যই আদনানকে ছাড়িয়ে যাওয়া যাবে না। কারণ মহানবী (সা.) যখন নিজ পূর্বপুরুষদের নাম বর্ণনা করতেন তখন তিনি আদনানকে অতিক্রম করতেন না এবং হযরত ইসমাঈল (আ.) পর্যন্ত অবশিষ্ট নসব গণনা করা থেকে অ দেরকে বিরত থাকার নির্দেশ দিতেন। তিনি বলতেন যে, আরবের মধ্যে যা প্রসিদ্ধ ও খ্যাত হয়েছে তা তাঁর বংশলতিকার এ অংশটি (অর্থাৎ পিতা আবদুল্লাহ্ থেকে ঊর্ধ্বতন পিতৃপুরুষ আদনান)।[৯৫]

এ কারণেই আমরা মহানবী (সা.)- এর নসবের যে অংশটি সুনিশ্চিত ও সকল তর্ক- বিতর্কের ঊর্ধ্বে কেবল সেটিই উল্লেখ করতঃ পিতা আবদুল্লাহ্ থেকে আদনান পর্যন্ত মহানবী (সা.)- এর পূর্বপুরুষ সম্পর্কে নিম্নে একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিতে চেষ্টা করব।

উপরিউক্ত ব্যক্তিগণ (আবদুল্লাহ্ থেকে আদনান পর্যন্ত মহানবীর পূর্বপুরুষগণ) আরব জাতির ইতিহাসে প্রভূত যশ ও খ্যাতির অধিকারী ছিলেন এবং তাঁদের কয়েকজনের জীবনের সাথে ইসলামের ইতিহাসেরও সম্পর্ক আছে। এ কারণেই কুসাই থেকে মহানবী (সা.)- এর শ্রদ্ধেয় পিতা

পর্যন্ত তাঁর পূর্বপুরুষদের জীবনী বর্ণনা করব এবং তাঁর অ া পূর্বপুরুষদের জীবনী বর্ণনা করা থেকে বিরত থাকব, আমাদের এ বক্ষ্যমাণ আলোচনার সাথে যাঁদের তেমন একটা সংশ্রব নেই।

কুসাই মহানবী (সা.)- এর চতুর্থ ঊর্ধ্বতন নিকটবর্তী পিতৃপুরুষ। তাঁর মাতা ফাতিমা বনি কিলাবের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন। অল্প কিছুদিনের মধ্যেই তিনি যাহরাহ্ ও কুসাই নামের দুই সন্তানের জন্ম দেন। দ্বিতীয় সন্তানটি (কুসাই) কোলে থাকাবস্থায় ফাতিমার স্বামী কিলাব মৃত্যুবরণ করেন। তিনি পুনরায় রবীয়াহ্ নামের এক ব্যক্তির সাথে বিবাহ- বন্ধনে আবদ্ধ হন এবং স্বামীর সাথে শামে চলে যান। রবীয়ার গোত্র ও কুসাই- এর মধ্যে মতবিরোধ প্রকাশ পাওয়া পর্যন্ত কুসাই রবীয়ার পিতৃসুলভ পৃষ্ঠপোষকতা ও স্নেহ লাভ করেছিলেন। মতবিরোধ প্রকাশ পেলে রবীয়াহ্ কুসাইকে তার গোত্র থেকে বহিষ্কার করে দেয়। যার ফলে তাঁর মা এতটা দুঃখ পান যে, তিনি তাঁকে (কুসাইকে) মক্কায় ফেরত পাঠাতে বাধ্য হন। ভাগ্য তাঁকে পবিত্র মক্কায় নিয়ে আসে। কুসাইয়ের লুক্কায়িত যোগ্যতা ও প্রতিভা অল্প সময়ের মধ্যেই তাঁকে মক্কাবাসী, বিশেষ করে কুরাইশদের মাঝে শ্রেষ্ঠত্বের আসনে পৌঁছে দেয়। কিছুদিন গত না হতেই কুসাই উচ্চ সম্মান ও মর্যাদা, পবিত্র মক্কার প্রশাসনের পদ ও পবিত্র কাবা গৃহের চাবি রক্ষকের পদ লাভ করেছিলেন। তিনি পবিত্র মক্কা শরীফের নিরঙ্কুশ শাসনকর্তা হতে পেরেছিলেন। তিনি ব স্মৃতি ও নির্দশন রেখে গেছেন। তিনিই সর্বপ্রথম জনগণকে পবিত্র মক্কার পাশে গৃহ নির্মাণ করার ব্যাপারে উৎসাহ দিয়েছিলেন। তিনি আরবদের জ 'দারুন নাদওয়া' নামে মন্ত্রণা ও পরামর্শসভা (সংসদসদৃশ্য) নির্মাণ করেছিলেন যাতে করে আরব গোত্রপতি ও সর্দারগণ এ ধরনের গণকেন্দ্রে একত্র হয়ে নিজেরাই নিজেদের সমস্যা সমাধান করতে সক্ষম হয়। পরিশেষে ি ষ্টীয় পঞ্চম শতকে তাঁর জীবনসূর্য অস্তমিত হয়। তিনি আবদুদ দার ও আবদে মান্নাফ নামের যোগ্য দু'পুত্রসন্তান রেখে যান।

৩. আবদে মান্নাফ

তিনি মহানবী (সা.)- এর তৃতীয় নিকটবর্তী ঊর্ধ্বতন পুরুষ। তাঁর নাম ছিল মুগরীহ্ এবং তাঁর উপাধি 'কামারুল বাতহা ' (অর্থাৎ মক্কা উপত্যকার চাঁদ)। তিনি তাঁর ভ্রাতা আবদুদ দার থেকে ছোট ছিলেন। কিন্তু জনতার অন্তরে তাঁর বিশেষ মর্যাদা ছিল। তাঁর কণ্ঠে তাকওয়া- পরহেজগারী ধ্বনিত হতো। তিনি তাকওয়া ও জনগণের সাথে সদাচরণ এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করার আহবান জানাতেন। এত বড় সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও তিনি কখনই জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা আবদুদ দারের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় লিপ্ত হওয়ার এবং পবিত্র মক্কার উচ্চপদ ও দায়িত্বভার অধিকার করার ইচ্ছা পোষণ করেন নি। কিন্তু এ দু'ভাইয়ের মৃত্যুর পর পদগুলো লাভ করার জন্য তাঁদের সন্তানদের মধ্যে মতভেদ ও বিবাদ শুরু হয়ে যায়। অতঃপর অনেক টানাপড়েন ও দ্বন্দ্বের পর পারস্পরিক সন্ধি ও পদগুলো নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করার মাধ্যমে উক্ত বিরোধ ও মতভেদের নিষ্পত্তি হয়। সিদ্ধান্ত নেয়া হয় যে, কাবাগৃহের অভিভাবকত্ব, দেখাশুনা ও দারুন নদওয়ার সভাপতির পদ আবদুদ দারের সন্তানদের এবং হাজীদের পানি দান ও আপ্যায়নের দায়িত্ব হচ্ছে আবদে মান্নাফের সন্তানদের ওপর। আর এ রকম অবস্থা অর্থাৎ দায়িত্ব ও পদসমূহের বণ্টন পবিত্র ইসলাম ধর্মের আবির্ভাব পর্যন্ত বহাল ছিল।[৯৭]

৪. হাশিম

তিনি মহানবী (সা.)- এর দ্বিতীয় নিকটবর্তী ঊর্ধ্বতন পিতৃপুরুষ ছিলেন। তাঁর নাম ছিল আমর এবং উপাধি ছিল আলা। হাশিম আবদে শামসের যমজ ভ্রাতা ছিলেন। মুত্তালিব ও নওফেল নামের তাঁর আরো দু'ভাই ছিল।

ঐতিহাসিকদের মধ্যে প্রসিদ্ধি আছে যে, হাশিম আবদে শামসের যমজ ভাই ছিলেন। জন্মগ্রহণের সময় হাশিমের আ ুল ভাই শামসের কপালে লাগানো ছিল। পৃথক করার সময় ফিংকি দিয়ে রক্ত ঝরতে লাগলে জনগণ এ ঘটনাকে অলুক্ষণে হিসাবে গ্রহণ করে।[৯৮] হালাবী তাঁর সিরাত গ্রন্থে লিখেছেন, এ ধরনের অশুভ লক্ষণ অলুক্ষণে ফলাফলই বয়ে এনেছিল। কারণ হাশিমের পৌত্র আব্বাসের বংশধরগণ এবং আবদে শামসের বংশধর বনি উমাইয়্যার মধ্যে ইসলামের আবির্ভাবের পরও ব্যাপক রক্তপাত ও যুদ্ধ- বিগ্রহ সংঘটিত হয়েছিল।[৯৯]

সীরাতে হালাবীর লেখক যেন হযরত আলী (আ.)- এর বংশধরদের করুণ কাহিনী ও ঘটনাবলীকে একদম উপেক্ষা করেছেন, অথচ মহানবী (সা.)- এর বংশধরদের পবিত্র রক্ত ঝরিয়ে বনি উমাইয়্যাহ্ যে সব ভয় র রক্তাক্ত দৃশ্যের অবতারণা করেছিল সেগুলো হচ্ছে এ গোত্রদ্বয়ের মধ্যকার বিদ্যমান দ্বন্দ্ব ও বিবাদের সর্বোৎকৃষ্ট দলিল। কিন্তু সীরাতে হালাবীর লেখক কেন ঐ সব ঘটনাপ্রবাহ একেবারেই উল্লেখ করলেন না তা আমাদের বোধগম্য হয় নি।

আবদে মান্নাফের সন্তানদের অ তম বৈশিষ্ট্য যা আরবীয় কবিতা ও সাহিত্যে প্রতিফলিত ও আলোচিত হয়েছে তা হচ্ছে এই যে, তাঁরা পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে মৃত্যুবরণ করেছিলেন। যেমন হাশিম যুদ্ধক্ষেত্রে, আবদে শামস মক্কায়, নওফেল ইরাকে এবং মুত্তালিব ইয়েমেনে মৃত্যুবরণ করেছেন।[১০০]

হাশিমের মহৎ চরিত্রের একটি নমুনা : যখনই যিলহ   মাসের চাঁদ দেখা যেত তখনই তিনি সকাল বেলা কাবায় আসতেন এবং কাবার দেয়ালে হেলান দিয়ে নিম্নোক্ত ভাষণ প্রদান করতেন, "হে কুরাইশ গোত্র! তোমরা আরবদের মধ্যে সবচেয়ে বুদ্ধিমান ও সম্ভ্রান্ত গোত্র। তোমাদের বংশধারা

সর্বোত্তম বংশধারা। মহান আল্লাহ্ তোমাদেরকে তাঁর নিজ গৃহ কাবার পাশে আবাস দিয়েছেন। আর এ অতীব মহান মর্যাদা হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর বংশধরদের মধ্যে কেবল তোমাদেরকেই তিনি বিশেষভাবে দিয়েছেন। অতএব, হে আমার গোত্র! মহান আল্লাহর ঘরের যিয়ারতকারিগণ এ মাসে এক অভূতপূর্ব আলো ও উদ্দীপনাসহকারে তোমাদের কাছে আসবে। তারা মহান আল্লাহর মেহমান। তাদের আপ্যায়নের দায়িত্ব তোমাদের ওপর স্ত। এ সব হাজী ও যিয়ারতকারীর মধ্যে প্রচুর নিঃস্ব ও সহায়সম্বলহীন ব্যক্তি আছে যারা দূর- দূরান্ত থেকে আসে। এ গৃহের মালিকের শপথ, মহান আল্লাহর এ সব অতিথিকে আপ্যায়ন করার সামর্থ্য যদি আমার থাকত তাহলে আমি কখনই তোমাদের কাছে সাহায্য চাইতাম না। তবে এখন আমার যতটুকু সামর্থ্য রয়েছে এবং হালাল উপায়ে যা উপার্জন করেছি তা এ পথে ব্যয় করব এবং তোমাদেরকে এ পবিত্র গৃহের মর্যাদা ও সম্মানের শপথ দিয়ে বলছি যে, যারা এ পথে অর্থ ব্যয় করবে তা যেন তাদের অ ায়ভাবে অর্জিত না হয়ে থাকে। অথবা তা যেন তারা রিয়াবশত (লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে) অথবা অনিচ্ছা সহকারে চাপে পড়ে বাধ্য হয়ে তা ব্যয় না করে। আর সাহায্য করার ব্যাপারে কোন ব্যক্তির যদি আত্মিক সম্মতি না থাকে সে যেন ব্যয় করা থেকে অবশ্যই বিরত থাকে।”[১০১]

হাশিমের নেতৃত্ব ও শাসন সবদিক থেকেই মক্কাবাসীদের জ উপকার ও কল্যাণ বয়ে এনেছিল। তাঁর নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব জনগণের জীবনযাত্রা উন্নয়নে ব্যাপক প্রভাব রেখেছিল। দুর্ভিক্ষের বছরগুলোতে হাশিমের দানশীলতা ও মহানুভবতার কারণেই জনগণ দুর্ভিক্ষজনিত কষ্ট ও দুর্ভোগ মোটেও অনুভব করে নি।

মক্কাবাসীদের বাণিজ্যের প্রসার ও উন্নতিকল্পে হাশিমের গৃহীত মহান উদ্যোগ ও পদক্ষেপগুলোর মধ্যে আমীর গাসসানের সাথে তাঁর সম্পাদিত চুক্তিটি সবিশেষ গুরুত্বের অধিকারী। তার এ ধরনের উদ্যোগের ফলশ্রুতিতে তাঁর ভাই আবদে শামস হাবাশার শাসনকর্তার সাথে এবং তাঁর অ দুই ভ্রাতা মুত্তালিব ও নওফেল যথাক্রমে ইয়েমেনের শাসনকর্তা এবং ইরানের শাহের সাথে চুক্তি সম্পাদন করেছিলেন। যার ফলে উভয়পক্ষের বাণিজ্যিক পণ্যসমূহ সম্পূর্ণ স্বাধীন ও পূর্ণ

নিরাপত্তাসহকারে একে অপরের দেশে রপ্তানি হতে থাকে। এ ধরনের চুক্তি অগণিত সমস্যার সমাধান করেছিল। এর ফলে পবিত্র মক্কা নগরীতে অনেক বাজার ও বাণিজ্যিক কেন্দ্রের গোড়াপত্তন হয়েছিল যা ইসলামের সূর্যোদয় পর্যন্ত স্থায়িত্ব লাভ করেছিল।

এছাড়াও হাশিম কর্তৃক প্রবর্তিত লাভজনক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডসমূহের অ তম ছিল গ্রীষ্মকালে শামের দিকে এবং শীতকালে ইয়েমেনের দিকে কুরাইশদের বাণিজ্যিক সফর। তাঁর প্রবর্তিত এ বাণিজ্যিক কার্যক্রম ইসলামের শুভ অভ্যুদয়ের পরেও অনেক সময় পর্যন্ত স্থায়ী হয়েছিল।

উমাইয়্যাহ্ ইবনে আবদে শামস- এর ঈর্ষা

উমাইয়্যাহ্ ছিল আবদে শামসের পুত্র এবং হাশিমের ভাতিজা। সে তার চাচা হাশিমের উচ্চ মর্যাদা ও সম্মানের কারণে তাঁর প্রতি হিংসা- বিদ্বেষ পোষণ করত। সে দান ও ব্যয় করে জনগণের অন্তরকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করতে চাইত। কিন্তু অনেক চেষ্টা- প্রচেষ্টা ও বাধাদান করার পরেও সে হাশিমের পথ- পদ্ধতি অনুযায়ী চলতে সক্ষম হয় নি। চাচা হাশিমের প্রতি তার কটূক্তি সত্ত্বেও তাঁর মর্যাদা ও সম্মানকে উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই করেছিল।

উমাইয়্যার অন্তরে হিংসার আগুন দাউ দাউ করে লতে থাকে। অবশেষে সে চাচা হাশিমকে আরবের কয়েকজন গণক ও ভবি দ্বক্তার কাছে যেতে বাধ্য করে। ঠিক করা হয়েছিল যে, তাদের দু'জনের মধ্যে যাকে ঐ ভবি দ্বক্তা প্রশংসা করবে সে- ই সকল বিষয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত হবে। মহানুভবতার কারণে হাশিম তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রের সাথে দ্বন্দ্বে লিপ্ত হওয়া থেকে বিরত থেকেছেন। কিন্তু ভাতিজা উমাইয়্যার পীড়াপীড়ির কারণে দু'টি শর্তসাপেক্ষে এ ধরনের কাজে তিনি প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে বাধ্য হয়েছিলেন। শর্তদ্বয় হলো :

ক. এ দু'জনের মধ্যে থেকে যে কেউ দোষী সাব্যস্ত হলে হ র দিনগুলোতে তাকে ১০০টি কালো রংয়ের উট কোরবানী করতে হবে।

খ. দোষী ও দণ্ডিত ব্যক্তিকে অবশ্যই ১০ বছর মক্কার বাইরে নির্বাসনে থাকতে হবে।

সৌভাগ্যক্রমে আরবের জ্ঞানী ব্যক্তি নামে পরিচিত গণক আসফানের দৃষ্টি হাশিমের দিকে পড়ামাত্রই তিনি তাঁর প্রশংসা করেছিলেন। তাই চুক্তি অনুযায়ী উমাইয়্যাহ্ দেশ ত্যাগ করে শামে দশ বছর বসবাস করতে বাধ্য হয়েছিল।[১০২]

এ বংশানুক্রমিক হিংসা- বিদ্বেষের ফলাফল ও প্রভাব ইসলাম ধর্মের অভ্যুদয়ের পরেও ১৩০ বছর পর্যন্ত স্থায়ী হয়েছিল এবং এর ফলে অনেক জঘ অপরাধ সংঘটিত হয়েছিল ইতিহাসে যার কোন নজির নেই। পূর্ববর্তী কাহিনীটি যেমন দু'গোত্রের (বনি হাশিম ও বনি উমাইয়্যাহ্) মধ্যকার শত্রুতার সূচনা সম্পর্কে আলোকপাত করে ঠিক তেমনি শামদেশে বনি উমাইয়্যার প্রভাব-

প্রতিপত্তির কারণগুলোকেও স্পষ্ট করে দেয়। আর এ থেকে ভালোভাবে জানা যায় যে, শামদেশের অধিবাসীদের সাথে বনি উমাইয়্যার পুরানো সম্পর্কই অত্র অঞ্চলে বনি উমাইয়্যার শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার অনুকূল ক্ষেত্রও প্রস্তুত করেছিল।

হাশিম- এর বিবাহ

আমর খাযরাজীর ক ा সালমা ছিলেন সম্ভ্রান্ত ও ভদ্র রমণী যিনি স্বামীর কাছ থেকে তালাক নেয়ার পর অ কোন পুরুষের সাথে বিবাহ- বন্ধনে আবদ্ধ হতে মোটেও রাজী ছিলেন না। একবার শাম সফর শেষে মক্কায় প্রত্যাবর্তন করার সময় হাশিম কয়েক দিনের জ ইয়াসরিবে যাত্রাবিরতি করেছিলেন এবং তখন তিনি সালমাকে বিবাহের প্রস্তাব দেন। হাশিমের মহৎ চরিত্র, মহানুভবতা, তাঁর বিত্তবিভব, দানশীলতা এবং কুরাইশদের ওপর তাঁর কথার প্রভাব সালমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং দু'টি শর্তে তিনি হাশিমের সাথে বিবাহ- বন্ধনে আবদ্ধ হতে রাজী হন। শর্তদ্বয়ের একটি ছিল এই যে, সন্তান প্রসবের সময় তিনি তাঁর গোত্রের কাছে থাকবেন। আর এই শর্তের কারণে মক্কায় হাশিমের সাথে কিছুদিন বসবাস করার পর যখন অন্তঃসত্ত্বা হওয়ার লক্ষণ প্রকাশ পেল তখন তিনি ইয়াসরিবে প্রত্যাবর্তন করলেন এবং সেখান একটি পুত্রসন্তান প্রসব করলেন যাঁর নাম রাখলেন শাইবাহ্। এ সন্তানই পরবর্তীকালে আবদুল মুত্তালিব নামে খ্যাতি লাভ করেছিলেন। ঐতিহাসিকগণ তাঁর এ উপাধি লাভ করার কারণ সম্পর্কে ঠিক এ রকম লিখেছেন :

"যখন হাশিম বুঝতে পারলেন যে, তাঁর জীবনের অন্তিম সময় ঘনিয়ে আসছে তখন তিনি তাঁর ভাই মুত্তালিবকে বলেছিলেন : তোমার দাস শাইবাকে অবশ্য অবশ্যই দেখবে। যেহেতু হাশিম (শাইবার পিতা) তাঁর নিজ সন্তানকে মুত্তালিবের দাস বলেছেন এ কারণে তিনি (শাইবাহ্) 'আবদুল মুত্তালিব ' নামে প্রসিদ্ধ হয়ে যান। "

কখনো কখনো তাঁরা বলেছেন, "একদিন একজন মক্কাবাসী ইয়াসরিবের সড়কগুলো অতিক্রম করছিল। তখন সে দেখতে পেল যে, অনেক বালক তীর নিক্ষেপ করছে। যখন একটি বালক প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হলো তখন সে তৎক্ষণাৎ বলে উঠল : আমি বাতহার নেতার পুত্র। ঐ মক্কাবাসী লোকটি সামনে এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করল : তুমি কে? তখন সে উত্তরে শুনতে পেল : শাইবাহ্ ইবনে হাশিম ইবনে আবদে মান্নাফ। "

ঐ লোকটি ইয়াসরিব থেকে মক্কায় প্রত্যাবর্তন করার পর হাশিমের ভ্রাতা ও মক্কা শহরের প্রধান মুত্তালিবের কাছে পুরো ঘটনাটি খুলে বলল। চাচা (মুত্তালিব) তখন আপন ভ্রাতুষ্পুত্রের কথা চিন্তা করতে লাগলেন। এ কারণেই তিনি ইয়াসরিবের উদ্দেশে রওয়ানা হলেন। ভ্রাতুষ্পুত্রের চেহারা দেখে মুত্তালিবের দু'চোখে ভাই হাশিমের প্রতিচ্ছবি ভেসে উঠল, তাঁর দু'চোখ বেয়ে অশ্রু ঝরতে লাগল। অত্যন্ত আবেগ, উষ্ণতা ও উদ্দীপনাসহকারে চাচা- ভাতিজা একে অপরকে চুম্বন করলেন। মুত্তালিব ভাতিজাকে মক্কায় নিয়ে যেতে চাইলে শাইবার মা সালমার তীব্র বিরোধিতার সম্মুখীন হন। সবশেষে মুত্তালিবের আশা বাস্তবায়িত হলো। মায়ের কাছ থেকে অনুমতি পাবার পর শাইবাকে নিজ অ র পিঠে বসিয়ে মুত্তালিব মক্কাভিমুখে রওয়ানা হলেন। আরবের প্রখর রৌদ্র ভাতিজা শাইবার রূপালী মুখমণ্ডলকে ঝলসে দিয়েছিল এবং তাঁর পোশাক- পরিচ্ছদও প্রখর তাপে মলিন ও জীর্ণ হয়ে গিয়েছিল। এ কারণেই মক্কাবাসীরা মক্কায় মুত্তালিবের প্রবেশের সময় ধারণা করল যে, অ ারোহী বালকটি মুত্তালিবের দাস। মুত্তালিব যদিও বারবার বলেছিলেন, 'হে লোকসকল! এ আমার ভাতিজা', তবুও মানুষের ধারণা ও কথাই শেষ পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল। পরিণতিতে মুত্তালিবের ভাতিজা শাইবাহ্ 'আবদুল মুত্তালিব' উপাধিতেই প্রসিদ্ধি লাভ করলেন।[১০৩]

কখনো কখনো বলা হয় যে, শাইবাকে 'আবদুল মুত্তালিব' বলে অভিহিত করার কারণ ছিল এই যে, যেহেতু তিনি স্নেহশীল চাচা মুত্তালিবের তত্ত্বাবধানে প্রতিপালিত হয়েছিলেন এবং আরবদের প্রচলিত রীতিনীতিতে পালনকারীর অবদান ও পৃষ্ঠপোষকতার কারণে তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার জ এ ধরনের ব্যক্তিদেরকে (যারা পালিত হতো) পালনকারীর দাস বা গোলাম বলে অভিহিত করা হতো।

৫. আবদুল মুত্তালিব

হাশিমের পুত্র আবদুল মুত্তালিব ছিলেন মহানবী (সা.)- এর পিতামহ, কুরাইশ গোত্রের অবিসংবাদিত নেতা ও বিরল ব্যক্তিত্ব। তাঁর গোটা সামাজিক জীবনটিই ছিল আলোকময় ঘটনাবলীতে পরিপূর্ণ। যেহেতু তাঁর নেতৃত্বকালীন ঘটনাবলীর সাথে ইসলামের ইতিহাসের অত্যন্ত গভীর সম্পর্ক আছে সেহেতু তাঁর জীবনের কতিপয় ঘটনা আমরা এখানে আলোচনা করব :

নিঃসন্দেহে মানুষের আত্মা যতই শক্তিশালী হোক না কেন পরিণামে সে খানিকটা হলেও পারিপার্শ্বিক পরিবেশ দ্বারা প্রভাবিত হয় এবং পরিবেশ ও সমাজের রীতিনীতি তার চিন্তাধারায় অতি সামান্য হলেও প্রভাব বিস্তার করে থাকে। তবে কখনো কখনো এমন কিছু ব্যক্তি আবির্ভূত হন যাঁরা পূর্ণ সাহসিকতার সাথে পারিপার্শ্বিক পরিবেশের বিভিন্ন প্রভাবকে প্রতিরোধ ও মোকাবিলা করেন এবং যে কোন ধরনের দূষণ দ্বারা বিন্দুমাত্র দূষিত হন না, বরং নিজেদেরকে তা থেকে পবিত্র ও মুক্ত রাখেন।

আমাদের আলোচিত বীরপুরুষ (আবদুল মুত্তালিব) এ ধরনের ব্যক্তিদের অন্যতম পূর্ণ নমুনা। তাঁর সমগ্র জীবন অগণিত আলোকমালায় উদ্ভাসিত। কোন ব্যক্তি আশি বছরের অধিককাল এমন এক সমাজ ও পরিবেশে বসবাস করেও মূর্তিপূজা, মদপান, সুদ খাওয়া, নরহত্যা ও অসৎ কার্যকলাপ ঐ সমাজের পূর্ব থেকে প্রতিষ্ঠিত রীতি- নীতি বলে গণ্য হওয়া সত্ত্বেও সমগ্র জীবনে যদি একবারও মদপান না করে থাকেন, জনগণকে নরহত্যা, মদ্যপান ও খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখেন, যাদের সাথে বিবাহ নিষিদ্ধ তাদেরকে বিবাহ করা এবং উলঙ্গ দেহে তাওয়াফ করা থেকে নিজেকে বিরত রাখেন এবং জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত নিজ মানত ও প্রতিজ্ঞার প্রতি অটল ও নিষ্ঠাবান থাকেন তাহলে এ ব্যক্তিটি অবশ্যই ঐ সব আদর্শবান ব্যক্তির অন্তর্ভুক্ত হবেন যাঁদেরকে সমাজে খুব কমই দেখা যায়।

হ্যাঁ, যে ব্যক্তির ঔরসে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)- এর পবিত্র নূর আমানত হিসাবে রাখা হয়েছিল, তিনি অবশ্যই সব ধরনের পাপ- পঙ্কিলতা থেকে মুক্ত হবেন।

তাঁর সংক্ষিপ্ত জ্ঞানগর্ভমূলক বাণী, ঘটনা ও কাহিনীসমূহ থেকে প্রতিভাত হয় যে, তিনি ঐ অন্ধকারাচ্ছন্ন পরিবেশে থেকেও একত্ববাদী ও পরকালে বি াসী ছিলেন। তিনি সর্বদা বলতেন, "জালেম ব্যক্তি এই ইহলৌকিক জীবনেই কৃতকর্মের শাস্তি পায়। আর ঘটনাক্রমে যদি তার ইহলৌকিক জীবন শেষ হয়ে যায় এবং তার কৃতকর্মের শাস্তি না পায়, তাহলে সে পরকালে শেষবিচার দিবসে অবশ্যই তার কৃতকর্মের সাজাপ্রাপ্ত হবে।'[১০৪]

হারব ইবনে উমাইয়্যাহ্ আবদুল মুত্তালিবের নিকটাত্মীয় ছিল এবং সে কুরাইশ গোত্রের নেতৃত্বস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য হতো। এক ইয়া দী তার প্রতিবেশী ছিল। এই ইয়া দী একদিন ঘটনাক্রমে তিহামার একটি বাজারে অত্যন্ত নিষ্ঠুর আচরণ প্রদর্শন করে এবং তার ও হারবের মধ্যে উত্তপ্ত বাক্যবিনিময় হয়। অবস্থা এতদূর গড়ালো যে, হারবের প্ররোচনায় ঐ ইয়া দী নিহত হয়। আবদুল মুত্তালিব ব্যাপারটি জানতে পেরে হারবের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করলেন এবং তার কাছ থেকে ঐ ইয়া দীর রক্তমূল্য আদায় করে তা নিহতের আত্মীয়- স্বজনের নিকট পৌঁছে দিলেন। এ ছোট কাহিনী থেকে এ মহান ব্যক্তির দুর্বল- অত্যাচারিতদের রক্ষা ায়পরায়ণতার এক অত্যুজ্জ্বল মনোবৃত্তিই প্রমাণিত হয়।

যমযম কূপ খনন

যে দিন যমযম কূপের উদ্ভব হয়েছিল সে দিন থেকেই জুর ম গোত্র ঐ কূপের চারপাশে বসতি স্থাপন করেছিল এবং পবিত্র মক্কা নগরীর শাসনকর্তৃত্ব দীর্ঘ দিন তাদের হাতেই ছিল। তারা উক্ত কূপের পানি নিজেদের দৈনন্দিন কাজে ব্যবহার করত। কিন্তু পবিত্র মক্কা নগরীতে ব্যবসায় ও জনগণের আমোদ- প্রমোদের প্রসার ঘটলে তাদের শৈথিল্য, উদাসীনতা এবং চারিত্রিক দুর্বলতা ধীরে ধীরে এমন এক পর্যায়ে উপনীত হয় যে, এর ফলে যমযম কূপের পানি শুষ্ক হয়ে যায়।[১০৫]

কখনো কখনো বলা হয় যে, জুর ম গোত্র খুযাআহ্ গোত্রের মকির সম্মুখীন হয়ে নিজেদের আবাসস্থল ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিল। সেহেতু জুর ম গোত্রপতি মাদ্দাদ ইবনে আমর নিশ্চিত বি াস করত যে, অতি শীঘ্রই সে তার নেতৃত্ব হারাবে এবং শত্রুদের আক্রমণে তার রাজ্য ও শাসনকর্তৃত্ব ধ্বংস হয়ে যাবে। এ কারণে সে পবিত্র মক্কার জ হাদিয়াস্বরূপ স্বর্ণনির্মিত যে দু'টি হরিণ এবং খুব দামী যে কয়টি তলোয়ার আনা হয়েছিল তা যমযম কূপে নিক্ষেপ করে কূপটি মাটি দিয়ে ভরাট করে ফেলার নির্দেশ দিয়েছিল যাতে করে শত্রুরা এ মহামূল্যবান সম্পদ ব্যবহার করতে না পারে। এর কিছুদিন পরেই খুযাআহ্ গোত্রের আক্রমণ শুরু হয়। এর ফলে জুর ম গোত্র এবং হযরত ইসমাঈল (আ.)- এর অনেক বংশধরই পবিত্র মক্কা নগরী ত্যাগ করে ইয়েমেনের দিকে গমন করতে বাধ্য হয়। তাদের মধ্য থেকে আর কোন ব্যক্তি মক্কায় ফিরে আসে নি। এরপর থেকে মহানবী (সা.)- এর চতুর্থ উর্ধ্বতন পূর্বপুরুষ কুসাই বিন কিলাবের শাসনকর্তৃত্ব অর্জন করার মাধ্যমে কুরাইশদের জীবনাকাশে সৌভাগ্য- তারার উদয় হওয়া পর্যন্ত পবিত্র মক্কা নগরীর শাসনকর্তৃত্ব খুযাআহ্ গোত্রের হাতে থেকে যায়। কিছুকাল পরে শাসনকর্তৃত্ব আবদুল মুত্তালিবের হাতে চলে আসে। তিনি যমযম কূপ পুনরায় খনন করার সিদ্ধান্ত নেন। তবে তখনও যমযম কূপের আসল অবস্থান সূক্ষ্মভাবে কেউ জানত না। অনেক অনুসন্ধান চালানোর পর তিনি যমযম কূপের প্রকৃত অবস্থান সম্পর্কে তথ্য পেলেন এবং নিজ পুত্র হারেসকে নিয়ে কূপ খননের পূর্বপ্রস্তুতি সম্পন্ন করার সিদ্ধান্ত নিলেন।

সাধারণত প্রতিটি গোত্র বা সমাজেই এমন কিছু মুষ্টিমেয় লোক পাওয়া যাবে যারা সব সময় যে কোন ভালো কাজ বাধাগ্রস্ত করার জ   যে কোন ধরনের নেতিবাচক অজুহাত খুঁজে বেড়ায়। এ কারণেই আবদুল মুত্তালিবের প্রতিদ্বন্দ্বীরা ঘোর আপত্তি জানাতে থাকে যাতে করে তিনি এ বিরল সম্মান ও গৌরবের অধিকারী না হতে পারেন। তারা আবদুল মুত্তালিবকে লক্ষ্য করে বলেছিল, “হে কুরাইশপ্রধান! যেহেতু এ কূপ আমাদের পূর্বপুরুষ হযরত ইসমাঈলের পুণ্যস্মৃতি এবং আমরা সবাই যেহেতু তাঁরই বংশধর তাই আমাদের সবাইকে এ কাজে শরীক করুন। বিশেষ কতিপয় কারণে হযরত আবদুল মুত্তালিব তাদের কথা মেনে নিলেন না। কারণ তাঁর দৃষ্টিভ ছিল এটিই যে, তিনি একাই এ কূপটি খনন করবেন এবং এর পানি বিনামূল্যে সকলের হাতে ছেড়ে দেবেন। আর এভাবেই বাইতুল্লাহ্ যিয়ারতকারী হাজীদের জ   প্রয়োজনীয় পরিমাণ পানিরও সুব্যবস্থা হয়ে যাবে। হাজীদের পানির বন্দোবস্ত করার বিষয়টি তাঁর তত্ত্বাবধানে থাকার কারণে তা সব ধরনের অনিয়ম ও বিশৃঙ্খলা থেকে মুক্ত হবে।

যখন তিনি স্বাধীনভাবে এ কাজের গুরুদায়িত্ব নিজ হাতে নেবেন ঠিক তখনই এ বিষয়টির পূর্ণ নিশ্চয়তা বিধান করা সম্ভব হবে।

অবশেষে তাঁরা একটি তীব্র বিরোধ ও টানাপড়েনের সম্মুখীন হলেন। আরবের একজন জ্ঞানী ভাববাদীর কাছে যাওয়া এবং এ ব্যাপারে তার বিচার মেনে নেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়া হলো। আবদুল মুত্তালিব ও তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীরা সফরের উদ্দেশে রওয়ানা হলেন। তাঁরা হিজায ও শামের মধ্যবর্তী ফুল- ফল, পত্র- পল্লবহীন ধূসর মরু এলাকাগুলো একের পর এক অতিক্রম করতে লাগলেন। পথিমধ্যে তাঁরা অত্যন্ত পিপাসার্ত ও ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন এবং ধীরে ধীরে তাঁদের বি াস জন্মেছিল যে, তাঁরা তাঁদের অন্তিম মুহূর্তগুলো অতিবাহিত করছেন। এ কারণেই তাঁরা যখন মৃত্যুর কথা চিন্তা করতে থাকেন, তখন আবদুল মুত্তালিব এ অভিমত ব্যক্ত করলেন যে, প্রত্যেক ব্যক্তি তার নিজ কবর খনন করুক। যখন তার মৃত্যু হবে তখন অ রা তার মৃতদেহ উক্ত কবরে শায়িত করবে। আর এভাবে যদি পানি পাওয়া না যায় এবং সকলের তৃষ্ণা অব্যাহত থাকে এবং সবাই

মৃত্যুবরণ করে তাহলে এভাবে সকলেই (কেবল শেষ ব্যক্তি ব্যতীত) কবরে চিরনিদ্রায় শায়িত হবে এবং তাদের মৃতদেহ হিং প্রাণী ও পাখির খাদ্যবস্তুতে পরিণত হবে না।

আবদুল মুত্তালিবের অভিমত সকলের কাছে মনঃপূত হলো। প্রতিটি ব্যক্তি তার নিজের কবর খনন করল এবং সকলেই বিষণ্ন বদনে মৃত্যুর জ অপেক্ষা করতে লাগল। হঠাৎ করে আবদুল মুত্তালিব উচ্চকে বললেন, "হে লোকসকল! এটি এমনই এক মৃত্যু যা হীনতা ও দীনতা বয়ে আনে। তাই এটি কতই না উত্তম যে, আমরা সবাই দলবদ্ধ হয়ে এ মরুভূমির চারপাশে পানির অন্বেষণে ঘুরে বেড়াব! আশা করা যায় যে, মহান আল্লাহপাকের অনুগ্রহ ও কৃপার দৃষ্টি আমাদের ওপর পতিত হবে।"[১০৬] সবাই পশুর পিঠে আরোহণ করে হতাশা নিয়ে পথ চলতে লাগল এবং তখন তারা একে অপরের দিকে তাকাচ্ছিল। ঘটনাক্রমে সবাই অল্প কিছুক্ষণের মধ্যে সুমিষ্ট পানির সন্ধান পেয়ে গেল এবং তারা সবাই মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পেল। এরপর তারা যে পথে এসেছিল সে পথেই পবিত্র কাবার দিকে ফিরে গেল এবং পূর্ণ সন্তুষ্টচিত্তে যমযম কূপ খনন করার ব্যাপারে আবদুল মুত্তালিবের অভিমতের সাথে একমত পোষণ করল এবং সম্মত হলো।[১০৭]

আবদুল মুত্তালিব একমাত্র পুত্রসন্তান হারেসকে সাথে নিয়ে কূপ খননে মশগুল হয়ে যান। খনন কার্য চালানোর ফলে কূপের চারদিকে মাটির একটি প্রকাণ্ড ঢিবি তৈরি হয়েছিল। হঠাৎ করে তিনি স্বর্ণনির্মিত দু'টি হরিণ এবং কয়েকটি তলোয়ারের সন্ধান পান। কুরাইশগণ নতুন করে হৈ চৈ শুরু করে দিল এবং সকলেই প্রাপ্ত গুপ্তধনে নিজেদের অংশ আছে বলে দাবি করতে লাগল। তারা তাদের মাঝে লটারী করার সিদ্ধান্ত নিল। ঘটনাক্রমে লটারীতে ঐ দু'টি স্বর্ণনির্মিত হরিণ এবং তরবারিগুলো যথাক্রমে পবিত্র কাবা ও আবদুল মুত্তালিবের নামেই উঠল। কুরাইশদের নামে লটারীতে কিছুই উঠল না এবং এ কারণে তারা উক্ত গুপ্তধন থেকে কোন অংশ পেল না। মহামতি আবদুল মুত্তালিব উক্ত তরবারিগুলো দিয়ে পবিত্র কাবার একটি দরজা নির্মাণ করে হরিণ দু'টি ঐ দরজার ওপর স্থাপন করেছিলেন।

চুক্তি স্বাক্ষরের উদ্দেশ্যে আত্মত্যাগ ও নিষ্ঠা

যদিও অন্ধকার যুগের আরবগণ ছিল চরম নৈতিক অবক্ষয়ের শিকার এবং চরমভাবে অধঃপতিত তবুও তাদের মধ্যে কতিপয় চারিত্রিক গুণ ছিল যা প্রশংসনীয়। যেমন চুক্তি ভ   করা তাদের কাছে সবচেয়ে ঘৃণ্য ও খারাপ কাজ বলে গণ্য হতো। কখনো কখনো আরব গোত্রগুলো নিজেদের মধ্যে অত্যন্ত কঠিন চুক্তি সম্পাদন করত এবং শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সেগুলো মেনে চলত। কখনো কখনো তারা শক্তি নিঃশেষকারী নজর করত এবং চরম কষ্ট ও প্রাণান্তকর পরিশ্রমসহকারে তা বাস্তবায়ন করার ব্যাপারে চেষ্টা করত।

আবদুল মুত্তালিব যমযম কূপ খনন করার সময় উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে, বেশি সন্তান না থাকার কারণে কুরাইশদের মধ্যে তিনি দুর্বল ও অক্ষম। এ কারণেই তিনি নজর করেছিলেন যে, যখনই তিনি দশ সন্তানের পিতা হবেন তখন তিনি কাবা গৃহের সামনে যে কোন একজনকে কোরবানী করবেন। তিনি তাঁর এ নজর সম্পর্কে কাউকে অবহিত করেন নি। কিছুকাল পরে তাঁর সন্তানের সংখ্যা দশ হলে তাঁর নজর পূর্ণ করার সময়ও উপস্থিত হলো। আবদুল মুত্তালিবের জ   এ বিষয়টি চিন্তা করা অত্যন্ত কঠিন ছিল। তবে তাঁর মধ্যে ভয়ও কাজ করছিল যে, পাছে তিনি যদি তাঁর এ নজর আদায় করার ক্ষেত্রে সফল না হন তাহলে এর পরিণতিতে তিনি প্রতিজ্ঞা ভ   কারীদের কাতারে শামিল হয়ে যাবেন। এ কারণেই সন্তানদের সাথে বিষয়টি উত্থাপন ও আলোচনা এবং তাঁদের সম্মতি ও সন্তুষ্টি আদায় করার পর লটারীর মাধ্যমে তাঁদের মধ্য থেকে একজনকে কোরবানীর জ   মনোনীত করবেন।[১০৮]

লটারীর আয়োজন করা হলো। লটারীতে মহানবী (সা.)- এর পিতা হযরত আবদুল্লাহ্- এর নাম উঠলে আবদুল মুত্তালিব তৎক্ষণাৎ তাঁর হাত ধরে তাঁকে কোরবানী করার স্থানে নিয়ে গেলেন। কুরাইশ গোত্রের নর- নারীরা উক্ত নজর ও লটারী সম্পর্কে অবগত হলে যুবকদের চোখ বেয়ে অশ্রু ঝরতে লাগল। এক যুবক তখন বলছিল, “হায় যদি এ যুবকের বদলে আমাকে জবাই করা হতো!”

কুরাইশ দলপতিগণ বলতে লাগল, “যদি আবদুল্লাহর পরিবর্তে সম্পদ উৎসর্গ করা যায় তাহলে আমরা আমাদের ধন-সম্পদ তার অধিকারে ছেড়ে দিতে প্রস্তুত আছি।” আবদুল মুত্তালিব জনতার আবেগ ও অনুভূতির উত্তাল তর মালার সামনে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গেলেন এবং চিন্তা করতে লাগলেন পাছে যদি তাঁর অ ীকার ভ হয়ে যায়, এতদসত্ত্বেও তিনি এর একটি উপায় খুঁজে বের করার চেষ্টা করতে লাগলেন। তাদের মধ্যে থেকে একজন বলল, “এ সমস্যাটি আরবের একজন জ্ঞানী ব্যক্তির কাছে উত্থাপন করুন, তাহলে এ ব্যাপারে তিনি একটি পথ বাতলে দিতে পারবেন।” আবদুল মুত্তালিব এবং কুরাইশ নেতৃবর্গ এ প্রস্তাবে সম্মত হলেন এবং ইয়াসরিবের উদ্দেশে রওয়ানা হলেন। সেখানে ঐ জ্ঞানী ব্যক্তি বসবাস করতেন। সমস্যার সমাধান দেয়ার জ তিনি একদিন সময় চাইলেন। পরের দিন সবাই তাঁর সম্মুখে উপস্থিত হলে তিনি বললেন, “আপনাদের নিকট একজন লোকের রক্তমূল্য কত?” তখন তাঁরা বললেন, “১০টি উট।” গণক বললেন, “দশটি উট ও যে ব্যক্তিকে আপনার কোরবানীর জ মনোনীত করেছেন তার মধ্যে লটারী করবেন। লটারীতে ঐ ব্যক্তির নাম উঠলে উটগুলোর সংখ্যা দ্বিগুণ করবেন এবং পুনরায় উটগুলো ও ঐ ব্যক্তির মধ্যে লটারী করুন। এতে যদি লটারীতে পুনরায় ঐ ব্যক্তির নাম আসে তাহলে উটগুলোর সংখ্যা তিনগুণ করুন এবং পুনরায় ঐ ব্যক্তি ও উটগুলোর মধ্যে লটারী করুন। আর এভাবে লটারীতে উটগুলোর নাম ওঠা পর্যন্ত লটারী করে যান। “

গণকের এ প্রস্তাব জনতার আবেগ-অনুভূতি ও উৎক াকে মুহূর্তের মধ্যে বিলীন করে দিল। কারণ আবদুল্লাহর মতো যুবককে রক্তাক্ত দেখার চাইতে তাদের কাছে শত শত উট কোরবানী করা অপেক্ষাকৃত সহজ ছিল। মক্কায় ফেরার পর একদিন প্রকাশ্যে সকলের মাঝে লটারী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হলো। দশম বারে উটসংখ্যা ১০০-এ উপনীত হলে লটারীতে উটগুলোর নাম উঠল। আবদুল্লাহর জবাই থেকে মুক্তি প্রাপ্তি এক অভিনব আবেগ ও উদ্দীপনার সৃষ্টি করল। কিন্তু আবদুল মুত্তালিব তখন বললেন, “আমার ষ্টা এ কাজে পূর্ণ সন্তুষ্ট আছেন এ বিষয়টি নিশ্চিতরূপে না জানা পর্যন্ত আমি অবশ্যই লটারীটির পুনরাবৃত্তি করব।” তিনি তিন বার লটারী করলেন এবং তিন বারই উটগুলোর নাম উঠল। এভাবে তিনি পূর্ণরূপে নিশ্চিত হতে পারলেন যে, মহান আল্লাহ্

এ ব্যাপারে সন্তুষ্ট আছেন। তিনি তাঁর ব্যক্তিগত উটগুলো থেকে ১০০টি উট কাবাগৃহের সামনে জবাই করার এবং কোন ব্যক্তি বা পশুকে তা ভক্ষণ করা থেকে বাধা না দেয়ার নির্দেশ দিলেন।[১০৯]

হাতির বছরের গোলযোগ

কোন জাতির মধ্যে যে মহাঘটনা সংঘটিত হয় এবং কখনো কখনো যা ধর্মীয় ভিত্তিমূল এবং কখনো কখনো জাতীয় ও রাজনৈতিক ভিত্তিমূলের অধিকারী তা সাধারণ জনগণের আশ্চর্য ও বিস্ময়বোধের কারণে তারিখ ও গণনার সূচনা বা উৎস বলে গণ্য হয়। যেমন ইয়া দী জাতির মুক্তির জ হযরত মূসা (আ.)- এর আন্দোলন, ি ষ্টানদের জ হযরত ঈসা (আ.)- এর জন্ম তারিখ এবং মুসলমানদের ক্ষেত্রে মহানবী (সা.)- এর হিজরত হচ্ছে তারিখ গণনার উৎস যা দিয়ে প্রতিটি ধর্মের অনুসারিগণ তাদের জীবনের ঘটনাসমূহের উদ্ভবের সময়কাল নির্ণয় ও পরিমাপ করে থাকে।

কখনো কখনো কোন জাতি মৌলিক ইতিহাস ও তারিখের অধিকারী হওয়ার কারণে কিছু কিছু ঘটনাকেও তাদের তারিখ গণনার ভিত্তি ও উৎস হিসাবে নির্ধারণ করেছে। যেমন পাশ্চাত্যের দেশসমূহে মহান ফরাসী বি ব এবং সোভিয়েত ইউনিয়নে ১৯১৭ ি ষ্টাব্দের অক্টোবরের কম্যুনিস্ট আন্দোলন ঐ সব দেশে যে সব ঘটনাপ্রবাহের উদ্ভব হয় সেগুলোর অনেক কিছুর তারিখ গণনার ভিত্তি বা উৎস হিসাবে গণ্য করা হযেছে। যে সব অনগ্রসর জাতি এ ধরনের রাজনৈতিক ও ধর্মীয় আন্দোলন থেকে বঞ্চিত সে সব জাতি স্বাভাবিকভাবে অসাধারণ ঘটনাবলীকে তাদের ইতিহাস ও তারিখ গণনার ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করে। এ কারণেই জাহেলী আরবগণ সঠিক কৃষ্টি ও সভ্যতার অধিকারী না হওয়ায় যুদ্ধ, ভূমিকম্প, দুর্ভিক্ষ অথবা অলৌকিক ঘটনাবলীকে নিজেদের ইতিহাস ও তারিখ গণনার উৎস হিসাবে গণ্য করেছে। এ কারণেই ইতিহাসের পাতায় পাতায় আমরা আরব জাতির তারিখ গণনার ভিন্ন ভিন্ন ভিত্তি দেখতে পাই। এসব ভিত্তির মধ্যে সর্বশেষ ভিত্তি হচ্ছে হাতির বছরের ঘটনা এবং পবিত্র কাবাগৃহকে ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে আবরাহার মক্কা আক্রমণের ঘটনা যা অ া ঘটনার তারিখ গণনার ভিত্তি হিসাবে গণ্য হয়েছে। এখন আমরা ৫৭০ ি ষ্টাব্দে সংঘটিত মহাঘটনাটির ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করব এবং এখানে স্মর্তব্য যে, মহানবী (সা.)ও এই একই বছরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

এ ঘটনার উৎস

আসহাবে ফীল অর্থাৎ হস্তিবাহিনীর ঘটনা পবিত্র কোরআনে সংক্ষিপ্তাকারে বর্ণিত হয়েছে। আর আমরা এ ঘটনা বর্ণনা করার পর যে সব আয়াত এ ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে তা উল্লেখ করব। ইতিহাস রচয়িতাগণ এ ঘটনার মূল কারণ সম্পর্কে লিখেছেন : "ইয়েমেনের বাদশাহ্ যূনুওয়াস তার সরকারের ভিত্তি মজবুত করার পর কোন এক সফরে মদীনা অতিক্রম করছিল। তখন মদীনা এক অতি উত্তম ধর্মীয় মর্যাদার অধিকারী ছিল। সে সময় একদল ইয়া দী ঐ শহরে বসতি স্থাপন করে প্রচুর মন্দির ও ইবাদাতগাহ্ নির্মাণ করেছিল। সুযোগসন্ধানী ইয়া দিগণ বাদশার আগমনকে এক সুবর্ণ সুযোগ মনে করে বাদশাহকে ইয়া দী ধর্ম গ্রহণের আমন্ত্রণ জানায়। তাদের এ পদক্ষেপের উদ্দেশ্যে ছিল নব্য ইয়া দী ধর্মে দীক্ষিত বাদশাহ্ যূনুওয়াসের শাসনাধীনে রোমের ি ষ্টান ও পৌত্তলিক আরবের হামলা থেকে নিরাপদ থাকা এবং সুখ- স্বাচ্ছন্দ্যে জীবনযাপন করা। এ ব্যাপারে তাদের প্রচার খুব ফলপ্রসূ হয়েছিল। যূনুওয়াস ইয়া দী ধর্ম গ্রহণ করল এবং এ ধর্ম প্রসার ও প্রচারের ক্ষেত্রে অনেক অবদান রেখেছিল। অনেকেই ভীত হয়ে তার বশ্যতা স্বীকার করে নেয়। সে একদল জনতাকে বিরোধিতা করার জ কঠোর শাস্তি প্রদান করে। তবে নাজরানের অধিবাসিগণ যারা বেশ কিছুদিন আগেই ি ষ্টধর্ম গ্রহণ করেছিল তারা কোনক্রমেই ি ষ্টধর্ম ত্যাগ করে ইয়া দী ধর্মের অনুশাসন অনুসরণ করতে প্রস্তুত ছিল না।ইয়েমেনের বাদশার বিরুদ্ধাচরণ এবং অবজ্ঞা করার পরিণতি অত্যন্ত ভয়াবহ ছিল। বাদশাহ্ যূনুওয়াস এক বিরাট সেনাবাহিনী নিয়ে নাজরানের বিদ্রোহীদেরকে দমন করার জ সিদ্ধান্ত নেয়। সেনাপতি নাজরান শহরের পাশে সেনা শিবির ও তাঁবু স্থাপন করে এবং পরিখা খনন করার পর তাতে আগুন ধরিয়ে দেয়; আর বিদ্রোহীদেরকে ঐ আগুনে জীবন্ত দগ্ধ করার মকি প্রদর্শন করতে থাকে। নাজরানের অকুতোভয় সাহসী জনতা যারা মনে- প্রাণে ি ষ্টধর্ম গ্রহণ করেছিল তারা এতে মোটেও ভীত না হয়ে মৃত্যু ও জীবন্ত দগ্ধ হওয়াকে সানন্দে বরণ করে নেয়। তাদের দেহগুলো সেই আগুনে জীবন্ত দগ্ধ হয়েছিল।[১১০]

ইসলামী ইতিহাসবেত্তা ইবনে আসীর জাযারী লিখেছেন : এ সময় দূস নামক একজন নাজরানবাসী ি ষ্টধর্মের গোঁড়া সমর্থক রোমান সম্রাট কাইসারের কাছে গমন করে তাঁকে পুরো ঘটনা অবহিত করল এবং রক্তপিপাসু যূনুওয়াসকে শাস্তি প্রদান এবং অত্র এলাকায় ি ষ্টধর্মের ভিত মজবুত ও শক্তিশালী করার আবেদন জানাল। রোমের অধিপতি গভীর দুঃখ ও সমবেদনা প্রকাশ করে বলেন, "আপনাদের দেশ থেকে আমার সাম্রাজ্যের রাজধানী অনেক দূরে অবস্থিত বিধায় এ ধরনের অত্যাচারের প্রতিকার বিধানার্থে হাবাশার বাদশাহ্ নাজ্জাশীর কাছে একটি চিঠি লিখছি যাতে করে তিনি ঐ রক্তপিপাসু নরপিশাচের কাছ থেকে নাজরানের নিহতদের প্রতিশোধ নিতে পারেন। ঐ নাজরানবাসী কাইসারের চিঠি নিয়ে যত ত সম্ভব হাবাশার দিকে রওয়ানা হয়ে গেল এবং বাদশাহ্ নাজ্জাশীর কাছে পুরো ঘটনা সবিস্তারে বর্ণনা করল। ফলে বাদশার শিরা ও ধমনীতে তীব্র আত্মসম্মানবোধ ও চেতনাবোধের রক্ত প্রবাহিত হয়ে গেল। তিনি আবরাহাতুল আশরাম নামক এক হাবাশী সেনাপতির নেতৃত্বে ৭০ হাজারের এক বিশাল সেনাবাহিনী ইয়েমেনের দিকে প্রেরণ করেন। হাবাশার উক্ত সুশৃঙ্খল ও সুসজ্জিত সেনাবাহিনীটি সমুদ্রপথে ইয়েমেনের সৈকতে তাঁবু স্থাপন করে। এ ব্যাপারে সচেতন না থাকার কারণে যূনুওয়াসের আর কিছুই করার ছিল না। সে যতই চেষ্টা করল তাতে কোন ফল হলো না। প্রতিরোধ ও যুদ্ধ করার জ যতই গোত্রপতিদের নিকট আহবান জানাল তাতে তাদের পক্ষ থেকে সে কোন সাড়া পেল না। পরিণতিতে আবরাহার এক সংক্ষিপ্ত আক্রমণের মুখে যূনুওয়াসের প্রশাসনের ভিত ধসে পড়ে এবং সমৃদ্ধ ও সম্পদশালী ইয়েমেন হাবাশাহ্ সাম্রাজ্যের অধীন হয়ে যায়।

আবরাহা প্রতিশোধ ও বিজয়ের মদমত্ততায় চূর ও মাতাল হয়েছিল। সে যৌনকামনা ও আমোদ-প্রমোদে নিমজ্জিত হওয়া থেকে মোটেও বিরত থাকত না। সে হাবাশার বাদশার নৈকট্য ও দৃষ্টি আকর্ষণ করার জ ইয়েমেনের রাজধানী সানআ নগরীতে একটি জমকালো গীর্জা নির্মাণ করে যা ছিল ঐ যুগে অতুলনীয়। তারপর সে বাদশাহ্ নাজ্জাশীর কাছে এই মর্মে পত্র লেখে, "গীর্জা নির্মাণ কাজ প্রায় সমাপ্ত হওয়ার পথে। ইয়েমেনের সকল অধিবাসীকে কাবার যিয়ারত করা থেকে বিরত এবং এই গীর্জাকে সাধারণ জনগণের জ তাওয়াফস্থল করার বিষয়টি বিবেচনা করে দেখছি।"

চিঠিটির মূল বক্তব্য প্রচারিত হলে সমগ্র আরব গোত্রগুলোর মধ্যে এর তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিল, এমনকি বনি আফকাম গোত্রের এক মহিলা উক্ত মন্দিরের চত্বরকে নোংরা করে দিল। এ ধরনের কাজ যার মাধ্যমে আবরাহার গীর্জার প্রতি আরবদের পূর্ণ অবজ্ঞা, শত্রুতা ও অবহেলা প্রকাশ পেয়েছে তা তদানীন্তন আবরাহা প্রশাসনকে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ করে তোলে। অ দিকে গীর্জার বাহ্যিক সৌন্দর্য ও সাজ- সজ্জার ক্ষেত্রে যত চেষ্টা চালানো হয়েছে ততই পবিত্র কাবার প্রতি জনগণের আকর্ষণ ও ভালোবাসা তীব্র হতে থাকে। এ সব ঘটনাপ্রবাহের কারণে আবরাহা পবিত্র কাবা ধ্বংস করার শপথ নেয়। এজ আবরাহা এক বিশাল বাহিনী গঠন করে যার সম্মুখভাগে ছিল প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সুসজ্জিত অনেক লড়াকু হাতি। তাওহীদী মতাদর্শের প্রাণপুরুষ হযরত ইবরাহীম খলীল (আ.) যে গৃহটির পুনর্নির্মাণ করেছিলেন আবরাহা তা ধ্বংস করার সিদ্ধান্ত নেয়। পরিস্থিতি যে অত্যন্ত ভয়াবহ ও অতি সংবেদনশীল তা প্রত্যক্ষকরতঃ আরবের গোত্রপতিদের দৃঢ় বি াস জন্মেছিল যে, আরব জাতির স্বাধীনতা ও ব্যক্তিত্ব পতনের সম্মুখীন। কিন্তু আবরাহার অতীত সাফল্যসমূহ তাদেরকে যে কোন উপকারী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা থেকে বিরত রেখেছিল। এতদসত্ত্বেও আবরাহার গমনপথের ওপর অরব গোত্রগুলোর কতিপয় আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন নেতা পূর্ণ বীরত্বসহকারে আবরাহার বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হয় এবং প্রতিরোধ গড়ে তোলে। যেমন যূনাফার যিনি নিজেও এক অভিজাত বংশোদ্ভূত ছিলেন তিনি ালাময়ী বক্তৃতা প্রদান করে তাঁর নিজ গোত্রকে পবিত্র কাবাগৃহ রক্ষা করার উদাত্ত আহবান জানান। কিন্তু অতি অল্পদিনের মধ্যেই আবরাহার বিশাল বাহিনী তাঁদের ব্যুহসমূহ ভেদ করে দেয়। এরপর নুফাইল বিন হাবীব তীব্র প্রতিরোধ ও সংগ্রাম গড়ে তোলে, কিন্তু সেও পরাজয় বরণ করতে বাধ্য হয় এবং আবরাহার বাহিনীর হাতে বন্দী হয়। তাকে ক্ষমা করে দেয়ার জ সে (নুফাইল) আবরাহার কাছে আবেদন জানালে আবরাহা তাকে বলেছিল, "আমাদেরকে মক্কা নগরী অভিমুখে যদি তুমি পথ দেখিয়ে নিয়ে যাও তাহলে আমি তোমাকে ক্ষমা করে দেব।" তাই নুফাইল আবরাহাকে তায়েফ নগরী পর্যন্ত পথ দেখিয়ে নিয়ে যায় এবং পবিত্র মক্কা নগরী পর্যন্ত অবশিষ্ট পথ দেখানোর দায়িত্ব নুফাইল আবু রাগাল নামক তারই এক বন্ধুর ওপর স্ত করে। নতুন পথ- প্রদর্শক আবরাহার সেনাবাহিনীকে

পবিত্র মক্কা নগরীর নিকটবর্তী মাগমাস নামক স্থানে পথ দেখিয়ে নিয়ে যায়। আবরাহার সেনাবাহিনী ঐ স্থানকে সেনা ছাউনি ও তাঁবু স্থাপন করার জ মনোনীত করে। আর আবরাহা তার চিরাচরিত অভ্যাস অনুযায়ী একজন সেনাপতিকে তিহামার উট ও গবাদিপশু লু ন করার দায়িত্ব দেয়। প্রায় ২০০টি উট লু ন করা হয়। লু িত এ সব উটের মালিক ছিলেন মক্কাপ্রধান আবদুল মুত্তালিব। অতঃপর হানাতাহ্ নামীয় এক সেনাপতিকে আবরাহা মক্কার কুরাইশ নেতা ও প্রধানের কাছে তার বাণী পৌঁছে দেয়ার দায়িত্ব অর্পণ করে বলেছিল, "কাবাগৃহ ধ্বংস করার প্রকৃত চিত্র যেন আমার চোখের সামনে ভেসে উঠছে! আর নিশ্চিতভাবে কুরাইশরা প্রাথমিক প্রতিরোধ গড়ে তুলবে। তবে রক্তপাত এড়ানোর জ তাৎক্ষণিকভাবে মক্কার পথ ধরে এগিয়ে যাবে। সেখানে পৌঁছে কুরাইশ প্রধানের খোঁজ করে সরাসরি তার কাছে গিয়ে বলবে : আমাদের মূল লক্ষ্যই হলো কাবাগৃহ ধ্বংস করা। কুরাইশরা যদি প্রতিরোধ না করে তাহলে তারা যে কোন হামলা ও আক্রমণ থেকে নিরাপদ থাকবে।"

আবরাহার প্রেরিত দূত পবিত্র মক্কায় পৌঁছেই কুরাইশদের বিভিন্ন দলকে আবরাহার সামরিক অভিযান সম্পর্কে আলোচনারত দেখতে পেল। মক্কাপ্রধানের খোঁজ করলে তাকে আবদুল মুত্তালিবের গৃহে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাওয়া হলো। আবদুল মুত্তালিব আবরাহার বাণী শোনার পর বললেন, "আমরা কখনই প্রতিরক্ষা ও প্রতিরোধ গড়ে তুলব না। কাবা মহান আল্লাহর গৃহ যার নির্মাতা হযরত ইবরাহীম খলীল (আ.)। মহান আল্লাহ্ যা কল্যাণকর তা-ই করবেন।"

আবরাহার সেনাপতি কুরাইশপ্রধানের এ ধরনের কোমল ও শান্তিপূর্ণ যুক্তি যা প্রকৃত সুমহান আত্মিক ঈমানেরই পরিচায়ক তা শ্রবণ করে সন্তোষ প্রকাশ করল এবং তার সাথে আবরাহার তাঁবুতে আসার আমন্ত্রণ জানাল।

আবরাহার শিবিরে আবদুল মুত্তালিব- এর গমন

আবদুল মুত্তালিব তাঁর কয়েক সন্তানসহ আবরাহার শিবিরের দিকে রওয়ানা হলেন। কুরাইশপ্রধানের মহত্ত্ব, স্থিরতা, ধৈর্য, গাম্ভীর্য ও ব্যক্তিত্ব আবরাহাকে বিস্ময়াভিভূত করে ফেলে। এ কারণেই সে আবদুল মুত্তালিবের প্রতি অত্যন্ত ভক্তি, শ্রদ্ধা এবং সম্মান প্রদর্শন করেছিল। এর প্রমাণস্বরূপ, সে সিংহাসন থেকে নিচে নেমে এসে আবদুল মুত্তালিবের হাত ধরে তাঁকে তার নিজের পাশে বসিয়েছিল। এরপর সে পূর্ণ ভদ্রতা ও শিষ্টাচারসহকারে দোভাষীর মাধ্যমে আবদুল মুত্তালিবকে প্রশ্ন করেছিল যে, তিনি কেন এখানে এসেছেন এবং তিনি কী চাচ্ছেন? আবদুল মুত্তালিব আবরাহার প্রশ্নের জবাবে বলেছিলেন, "তিহামার উটগুলো এবং যে দু'শ ' উটের মালিক আমি সেগুলো আপনার সৈ দের দ্বারা লু ি ত হয়েছে। আপনার কাছে আমার অনুরোধ এটিই যে, অনুগ্রহপূর্বক ঐ সকল উট স্ব স্ব মালিকের কাছে ফেরত দেয়ার আদেশ দিন।" আবরাহা বলল, "আপনার আলোকিত বদনমণ্ডল আপনাকে আমার কাছে এক জগৎ পরিমাণ মহান ও বিরাট করে তুলেছে, অথচ (যখন আমি এসেছি আপনার পূর্বপুরুষদের ইবাদাতগাহ্ ধ্বংস করতে) তখন আপনার ছোট ও অতি সামা আবেদন আপনার মহত্ত্ব, উচ্চ সম্মান ও মর্যাদাকে কমিয়ে দিয়েছে। আমি আশা করেছিলাম যে, আপনি কাবার ব্যাপারে আলোচনা করবেন এবং অনুরোধ জানাবেন যে, আমার যে লক্ষ্য আপনাদের স্বাধীনতা এবং রাজনৈতিক ও ধর্মীয় জীবনের ওপর মারাত্মক আঘাত হানবে তা থেকে অমি যেন বিরত থাকি। না, পক্ষান্তরে আপনি কয়েকটি মূল্যহীন উটের ব্যাপারে আলোচনা করেছেন এবং সেগুলো ছেড়ে দেয়ার জ সুপারিশ করেছেন?" আবদুল মুত্তালিব আবরাহার প্রশ্নের জবাবে একটি বাক্য বলেছিলেন যা আজও তাঁর নিজস্ব মহত্ত্ব, গৌরব এবং মান বজায় রেখেছে। আর ঐ বাক্যটি ছিল :

أنا ربّ الإبل و للبيت ربّ يمنعه

"আমি উটগুলোর প্রতিপালনকারী এবং পবিত্র কাবারও এমন এক প্রভু আছেন যিনি (সব ধরনের আগ্রাসন, আক্রমণ এবং ক্ষয়ক্ষতি থেকে) উক্ত গৃহকে রক্ষা করবেন।" আবরাহা এ কথা

শোনার পর খুবই দাম্ভিকতার সাথে বলেছিল, “এ পথে আমার লক্ষ্য অর্জনে বাধা দেয়ার শক্তি কারো নেই।” এরপর সে লু ি ত সব ধন- সম্পদ প্রকৃত মালিকদের কাছে ফেরত দেয়ার নির্দেশ দিয়েছিল।

অধীর আগ্রহে কুরাইশদের অপেক্ষা

সমগ্র কুরাইশ গোত্র অধীর আগ্রহে আবদুল মুত্তালিবের ফেরার অপেক্ষায় ছিল যাতে করে তারা শত্রুর সাথে তাঁর আলোচনার ফলাফল সম্পর্কে অবগত হতে পারে। যখন আবদুল মুত্তালিব কুরাইশ গোত্রপতিদের মুখোমুখি হলেন তখন তিনি তাদেরকে বললেন, “যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তোমাদের গবাদিপশু নিয়ে উপত্যকা ও পাহাড়- পর্বতে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ কর। এর ফলে তোমরা সবাই যে কোন ধরনের ক্ষতি ও বিপদাপদ থেকে নিরাপদে থাকতে পারবে।” এ কথা শোনার পর অতি অল্প সময়ের মধ্যেই সকল মক্কাবাসী তাদের নিজেদের ঘর- বাড়ী ছেড়ে পাহাড়- পর্বতে গিয়ে আশ্রয় নিল। মধ্যরাত্রিতে শিশু ও নারীদের ক্রন্দনধবনি এবং পশুসমূহের আর্তনাদ সমগ্র পাহাড়- পর্বতে ধ্বনিত- প্রতিধ্বনিত হতে লাগল। ঐ সময় আবদুল মুত্তালিব কয়েকজন কুরাইশসহ পর্বতশৃ থেকে নেমে এসে পবিত্র কাবায় গেলেন। ঐ সময় তাঁর চোখের চারপাশে অশ্রুবি জমেছিল। তিনি ব্যথিত অন্তরে পবিত্র কাবার দরজার কড়া হাতে নিয়ে মহান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করে বলেছিলেন, “হে ইলাহী! তাদের (আবরাহা ও তার বিশাল সেনাবাহিনী) অনিষ্ট সাধন ও ক্ষয়ক্ষতি করা থেকে নিরাপদ থাকার ব্যাপারে কেবল তুমি ছাড়া আর কারো প্রতি আমাদের বি মাত্র আশা নেই। হে প্রভু! তাদেরকে তোমার পবিত্র গৃহের অ ন ও সীমানা থেকে প্রতিহত কর। সে- ই কাবার দুশমন যে তোমার সাথে শত্রুতা পোষণ করে। হে প্রভু! তাদেরকে তোমার পবিত্র ঘর ধ্বংস করার ক্ষেত্রে ব্যর্থ করে দাও। হে প্রভু! তোমার বান্দা নিজের ঘরকে রক্ষা করে। তাই তুমিও তোমার ঘরকে রক্ষা কর। ঐ দিনকে (আমাদের কাছে) আসতে দিও না যে দিন তাদের ক্রুশ জয়যুক্ত হবে, আর তাদের প্রতারণাও সফল ও বিজয়ী হবে।”[১১১]

এরপর তিনি কাবাগৃহের দরজার কড়া ছেড়ে দিয়ে পর্বতশৃ ে ফিরে আসলেন এবং সেখান থেকে পুরো ঘটনা প্রত্যক্ষ করতে লাগলেন। প্রভাতে যখন আবরাহা ও তার সেনাবাহিনী মক্কাভিমুখে

রওয়ানা হল তখন হঠাৎ ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি সমুদ্রের দিক থেকে আকাশে আবির্ভূত হলো যেগুলোর প্রতিটির মুখ ও পায়ে ছিল ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র পাথর। পাখিদের ছায়ায় সৈ   শিবিরের আকাশ কালো হয়ে গিয়েছিল। বাহ্যিকভাবে এগুলোর ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অস্ত্র অতি বিস্ময়কর প্রভাব ও ফলাফল সৃষ্টি করল। মহান আল্লাহর নির্দেশে ঐ সব পাখি আবরাহার বাহিনীর ওপর পাথর বর্ষণ করল যার ফলে তাদের মাথা ভে   চুরমার হয়ে গেল এবং দেহের মাংসগুলো খসে পড়ল। একটি ক্ষুদ্র পাথর আবরাহার মাথায়ও আঘাত করলে সে খুব ভয় পেয়ে গেল এবং তার দেহে কম্পন শুরু হলো। সে নিশ্চিতভাবে বুঝতে পারল যে, মহান আল্লাহর ক্রোধ ও গজব তাকে ঘিরে ফেলেছে। সেনাদলের দিকে তাকালে সে দেখতে পেল যে, তাদের মৃতদেহগুলো গাছের পাতা ঠিক যেভাবে মাটিতে পড়ে থাকে ঠিক সেভাবে মাটিতে পড়ে আছে। কালবিলম্ব না করে তার সেনাবাহিনীর যারা বেঁচে আছে, যে পথ ধরে তারা এসেছিল ঠিক সে পথেই ইয়েমেনের রাজধানী সানাআয় ফিরে যাবার জ   সে নির্দেশ দিল। আবরাহার সেনাদলের মধ্যে থেকে প্রাণে বেঁচে যাওয়া সৈ   রা সানাআর দিকে রওয়ানা হলো। কিন্তু পথিমধ্যে অনেক সৈ ই ক্ষত ও ভীতিজনিত কারণে প্রাণত্যাগ করল, এমনকি আবরাহাও যখন সানাআয় পৌঁছল তখন তার শরীরের মাংস খসে পড়ল এবং আশ্চর্যজনক অবস্থার মধ্যে তার মৃত্যু হলো।

বিস্ময়কর ও ভীতিপ্রদ এ ঘটনাটি পৃথিবীতে আলোড়ন সৃষ্টি করল। হাতিওয়ালাদের কাহিনী পবিত্র কোরআনের সূরা ফীল- এ এভাবে বর্ণিত হয়েছে : "আপনি কি দেখেন নি যে, আপনার প্রভু হাতিওয়ালাদের সাথে কিরূপ আচরণ করেছেন? তাদের ষড়যন্ত্র কি তিনি ব্যর্থ করে দেন নি? তিনি তাদের ওপর এক ঝাঁক পাখি প্রেরণ করেছিলেন যেগুলো তাদের ওপর পোড়ামাটির তৈরি ক র নিক্ষেপকরতঃ তাদেরকে চর্বিত ঘাস ও পাতার মতো পিষ্ট করে দিয়েছিল।"

(بسم الله الرّحمان الرّحيم -ألم تر كيف فعل ربّك بأصحاب الفيل-ألم يجعل كيدهم في تضليل-و أرسل عليهم طيرا أبابيل-ترميهم بحجارة من سجيل-فجعلهم كعصف مأكول)

আমরা এখন যা কিছু আলোচনা করলাম আসলে তা এ ক্ষেত্রে বর্ণিত ইসলামী ঐতিহাসিক বর্ণনাসমূহের সারসংক্ষেপ এবং পবিত্র কোরআনের স্পষ্ট বর্ণনাও ঠিক এটিই। এখন আমরা

প্রখ্যাত মিশরীয় মুফাসসির 'মুহাম্মদ আবদু ' এবং মিশরের ভূতপূর্ব সংস্কৃতিমন্ত্রী প্রখ্যাত পণ্ডিত (ড. হাইকাল) এতৎসংক্রান্ত যা বলেছেন তা পর্যালোচনা করে দেখব।

মুজিযা সংক্রান্ত আলোচনা

প্রকৃতিবিজ্ঞান ও জ্যোতির্বিদ্যায় মানব জাতির সর্বশেষ অগ্রগতিসমূহ এবং ব সংখ্যক বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের ভ্রান্ত প্রমাণিত হওয়ার বিষয়টি পাশ্চাত্যে এক অতি বিস্ময়কর হট্টগোল সৃষ্টি করেছিল, অথচ এ সব পরিবর্তন আসলে ছিল বৈজ্ঞানিক পরিবর্তন এবং তা প্রকৃতিবিজ্ঞান ও জ্যোতির্বিদ্যাকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হতো এবং ধর্মীয় আকীদা- বি াসের সাথে এ সব পরিবর্তনের মোটেও কোন সম্পর্ক ছিল না। এত কিছু সত্ত্বেও এ পরিবর্তন সকল শাস্ত্র ও বংশানুক্রমিক আকীদা- বি াসের প্রতি একদল মানুষের মধ্যে এক আশ্চর্যজনক নৈরাশ্যবাদের উদ্ভবের কারণ হয়েছিল।

এ নৈরাশ্যবাদের মূল রহস্য ছিল এই যে, বিজ্ঞানীরা দেখতে পেলেন, পুরানো তত্ত্বগুলো যা শত শত বছর ধরে মানব- চিন্তাধারা এবং বৈজ্ঞানিক মহলের ওপর একচেটিয়া প্রভুত্ব বিস্তার করে রেখেছিল তা আজ আধুনিক বিজ্ঞান, পরীক্ষা- নিরীক্ষা ও অভিজ্ঞতাভিত্তিক মূল্যায়নে বাতিল ও ভ্রান্ত প্রমাণিত হচ্ছে। পৃথিবীকেন্দ্রিক ন'টি জ্যোতিষ্কমণ্ডল এবং শত শত তত্ত্বের আজ আর কোন খবরই নেই। এ ধরনের পরিস্থিতিতে তাঁরা নিজেরাই নিজেদের কাছে প্রশ্ন করছেন, "কোথা থেকে এবং কিভাবে আমরা বুঝতে ও জানতে পারব যে, আমাদের বাদবাকী ধর্মীয় বি াস ও বৈজ্ঞানিক ধ্যান- ধারণাও ঠিক এমন হবে না?" এ ধরনের ধ্যান- ধারণা একদল বৈজ্ঞানিক ও পণ্ডিতের মধ্যে সকল ধরনের উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত আকীদা- বি াসের ক্ষেত্রে ধীরে ধীরে সন্দেহের বীজ বপন করে দিয়েছে এবং অতি অল্প সময়ের মধ্যে তা বেশ বিস্তৃতি লাভ করেছে এবং সংক্রামক ব্যাধির   ায় বৈজ্ঞানিক মহলগুলোর একাংশের ওপর প্রভাব বিস্তার করেছে।

এছাড়াও আকীদা- বি াস অনুসন্ধানকারী বিচারালয় এবং গীর্জার ধর্মযাজকদের কড়াকড়ি এ নৈরাশ্যবাদের উৎপত্তির মূল কারণ; বরং তা এ ধরনের মতবাদ বিকাশের ক্ষেত্রে পূর্ণ মাত্রায় অবদান রেখেছে। কারণ গীর্জা নিষেধাজ্ঞা ও নির্যাতন করার মাধ্যমে তদানীন্তন বৈজ্ঞানিক ও পণ্ডিতদেরকে, যাঁরা বৈজ্ঞানিক সূত্র ও নিয়ম- নীতি প্রণয়নে সফল হয়েছিলেন পবিত্র বাইবেলের সাথে বিরোধিতা করার অজুহাতে হত্যা করত। বলার অপেক্ষা রাখে না যে, এ ধরনের চাপ ও

কার্যকলাপ প্রতিক্রিয়াবিহীন হতে পারে না। আর সেদিন থেকেই ভবি দ্বাণী ও ধারণা করা হতো যে, বৈজ্ঞানিক ও পণ্ডিত ব্যক্তিবর্গ যদি একদিন ক্ষমতা ফিরে পায়, তাহলে গীর্জার অব্যবস্থাপনা, অদক্ষতা এবং প্রয়োজনীয় পরিচালনাকারী ক্ষমতার অভাববশত সার্বিকভাবে ধর্ম ও ধার্মিকতারই ফাতিহা পাঠ করতে হবে।

ঘটনাচক্রে পুরো ব্যাপারটিই এমন হয়ে গিয়েছিল। বিজ্ঞান যতই উন্নতি লাভ করছিল এবং বৈজ্ঞানিকগণ প্রাকৃতিক বস্তু ও পদার্থসমূহের মধ্যকার বিভিন্ন সম্পর্ক যত (ভালোভাবে) বুঝতে পারছিলেন, আর ব সংখ্যক প্রাকৃতিক প্রপঞ্চ ও বিভিন্ন জরা- ব্যাধির কারণগুলো যে হারে আবিষ্কৃত হচ্ছিল ঠিক সে হারে অতি প্রাকৃতিক ও আধ্যাত্মিক বিষয়াদি, অস্তিত্বের উৎসমূল, পরকাল এবং নবীদের মুজিযা ও অলৌকিক কার্যাবলীর প্রতি সবচেয়ে কম গুরুত্ব দেয়া হচ্ছিল এবং সংশয়বাদী ও নাস্তিকদের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছিল।

বিজ্ঞানীদের মহলে বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি ও সাফল্যকে কেন্দ্র করে যে গর্ব ও অহংকারের উদ্ভব হয়েছিল তার ফলে কতিপয় প্রকৃতিবিজ্ঞানী সকল ধর্মীয় বিষয়কেই তুচ্ছ- তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে দেখতে থাকেন এবং তাওরাত ও ইঞ্জিলের মুজিযাসমূহের কোন একটির নাম পর্যন্ত তাঁরা উচ্চারণ করা থেকে বিরত থাকেন।

তাঁরা হযরত মূসা (আ.)- এর লাঠি ও তাঁর ে তশুভ্র হাতের কাহিনীকে গাঁজাখুরি উপাখ্যান বলে গণ্য করেছেন এবং মহান আল্লাহপাকের অনুমতি নিয়ে ঈসা (আ.)- এর ফুঁ দিয়ে মৃতদেরকে জীবিত করার কাহিনীকেও অবাস্তব কাহিনী বলে অভিহিত করেছেন। তাঁদের এ ধরনের অভিব্যক্তি ও বি াস করার কারণ হচ্ছে, তাঁরা নিজেদের কাছেই প্রশ্ন রেখে বলেন, কোন প্রাকৃতিক কারণ ছাড়াই কি এক টুকরা কাঠ একটি বিরাট অজগর সাপের রূপ ধারণ করতে পারে? একটি প্রার্থনার বদৌলতে কি কোন মৃত জীবিত হতে পারে? বৈজ্ঞানিকগণ যাঁরা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তাঁদের সাফল্য ও কৃতকার্যতার মদমত্ততায় মাতাল হয়ে গিয়েছিলেন তাঁরাই এমন চিন্তা- ভাবনা করতে থাকেন যে, তাঁরা সকল জ্ঞান- বিজ্ঞান, শাস্ত্র ও বিদ্যার চাবিকাঠি পেয়ে গেছেন এবং সকল বস্তু ও ঘটনার মধ্যকার পারস্পরিক সম্পর্কও ভালোভাবে উপলব্ধি করেছেন।

এ কারণেই তাঁরা ভাবতে থাকেন যে, এক টুকরা শুষ্ক কাঠ ও সাপ অথবা এক ব্যক্তির প্রার্থনা ও মনোনিবেশ ও মৃতদের জীবিত হওয়ার মধ্যে কোন সম্পর্কই বিদ্যমান নেই। তাই তাঁরা এ ধরনের বিষয়ের ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করেছেন অথবা তাঁরা কখনো কখনো এগুলো অস্বীকারও করেছেন।

কিছু সংখ্যক বিজ্ঞানীর চিন্তা- ভাবনার ধরন

এ ধরনের চিন্তা- ভাবনা মিশরের কতিপয় বিজ্ঞানী ও সুধীমহলে অনুপ্রবেশ করেছিল এবং তাঁরাই এ ধরনের ধ্যান- ধারণা ও চিন্তাধারার দ্বারা সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত হয়েছিলেন। এ কারণেই তাঁরা ঐতিহাসিক ও বৈজ্ঞানিক বিষয়াদি ব্যাখ্যা- বিশ্লেষণ করার ক্ষেত্রে এ ধরনের পথ ও পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন। মূল বিষয় হচ্ছে এই যে, এ গোষ্ঠীটি সব কিছুর আগে পাশ্চাত্যের বিজ্ঞানী ও পণ্ডিতদের চিন্তাধারা এবং ধ্যান- ধারণার সাথে পরিচিত হয়েছিলেন এবং পাশ্চাত্যের কিছু কিছু চিন্তা- দর্শন তাঁরা ঠিক এ পথেই মুসলিম বি ও ইসলামী দেশসমূহে আমদানী করেছেন।

এদের মধ্যে কেউ কেউ এমন এক পথ বেছে নিয়েছেন যে, সে পথে তাঁরা পবিত্র কোরআন ও নির্ভুল হাদীসের প্রতি যেমন সম্মান প্রদর্শন করতে চান, ঠিক তেমনি নিজেদের প্রতিও প্রকৃতিবিজ্ঞানীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চান। অথবা ন্যূনতম পর্যায়ে তাঁরা এমন কোন তত্ত্ব গ্রহণ করতে চান না যা প্রকৃতিবিজ্ঞানের নিয়ম- কানুনের দ্বারা ব্যাখ্যা করা অসম্ভব।

এ দলটি প্রত্যক্ষ করেন যে, পবিত্র কোরআন কতগুলো মুজিযা বর্ণনা করেছে যা কখনই সাধারণ (প্রকৃতি) বিজ্ঞানের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা যায় না। কারণ বিরাট অজগর সাপে পরিণত হওয়ার সাথে কাঠের সম্পর্ককে বিজ্ঞান নির্ণয় করতে অপারগ। আবার অ দিকে তাঁদের পক্ষে এমন কোন তত্ত্ব মেনে নেয়াও অত্যন্ত কঠিন যা ইন্দ্রিয়ানুভূতি ও পরীক্ষা- নিরীক্ষার মতো বৈজ্ঞানিক উপায়- উপকরণের সাহায্যে প্রমাণ করা সম্ভব নয়।

(ধর্মীয়) বি াস ও বিজ্ঞানের মধ্যে বাহ্যিক এ দ্বন্দ্বের কারণে তাঁরা এমন পথ অবলম্বন করেছেন যার মাধ্যমে এ ধরনের দ্বন্দ্বের নিষ্পত্তি করা সম্ভব। আর এভাবে পবিত্র কোরআন এবং অকাট্য হাদীসসমূহের বাহ্য অর্থসমূহ যেমন সংরক্ষিত হবে, ঠিক তেমনি তাঁদের বক্তব্যও বৈজ্ঞানিক সূত্র

ও নীতিমালার বিরোধী হবে না। আর তা হলো তাঁরা মহান নবীদের সকল মুজিযা ও অলৌকিক কার্যকলাপকে যুগোপযোগী বৈজ্ঞানিক নীতিমালার আলোকে এমনভাবে ব্যাখ্যা করবেন যে, সেগুলো স্বাভাবিক- প্রাকৃতিক বিষয় বলে প্রতিভাত হবে। এমতাবস্থায় পবিত্র কোরআন ও অকাট্য হাদীসসমূহের সম্মান যেমন সংরক্ষিত হলো ঠিক তেমনি তা (মুজিযা সংক্রান্ত ব্যাখ্যা) বিজ্ঞানেরও পরিপন্থী হলো না। আমরা নমুনাস্বরূপ আবরাহার হস্তিবাহিনীর কাহিনী সংক্রান্ত যে ব্যাখ্যা মিশরের প্রসিদ্ধ আলেম শেখ মুহাম্মদ আবদু দিয়েছেন তা এখানে উল্লেখ করব :

পাথুরে মাটি ও ধুলা- বালিবাহিত বসন্ত ও হাম রোগ মশা- মাছির মতো উড়ন্ত কীট- পতঙ্গের মাধ্যমে আবরাহার সেনাবাহিনীর মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছিল। بحجارة من سجّيل [১১২] এর অর্থ প্রস্তরমিশ্রিত বিষাক্ত (দূষিত) কাদা যা বাতাসের মাধ্যমে বিস্তৃত হয়েছিল এবং ছড়িয়ে পড়েছিল। আবরাহার সৈন্যদের হাত ও পা ঐ দূষিত প্রস্তরমিশ্রিত কাদা ও ধুলা- বালি দ্বারা মেখে গিয়েছিল এবং ঐ সকল কীট- পতঙ্গের সংস্পর্শে এসে মানুষের দেহের ত্বকের সূক্ষ্ম রন্ধ্র ও রোমকূপসমূহে রোগজীবাণুর সংক্রমণ হয় যার ফলে দেহে মারাত্মক ক্ষতের সৃষ্টি হয়। এগুলোই হচ্ছে মহান আল্লাহর শক্তিশালী সেনাদল যেগুলোকে বিজ্ঞানের পরিভাষায় 'জীবাণু' নামকরণ করা হয়েছে।

বর্তমান যুগের একজন লেখক উপরিউক্ত আলেমের বক্তব্য সমর্থন করে লিখেছেন, "طين (তীন) যা পবিত্র কোরআনে উল্লিখিত হয়েছে তার অর্থ হচ্ছে উড়ন্ত প্রাণী যা মশা ও মাছিকেও শামিল করে।"

তাঁদের বক্তব্য পর্যালোচনা করার আগে আমাদেরকে বাধ্য হয়েই হস্তিবাহিনী সম্পর্কে যে সূরা অবতীর্ণ হয়েছে সেটি পুনরায় পাঠকবর্গের সামনে উপস্থাপন করতে হবে। মহান আল্লাহ্ সূরা ফীল- এ এরশাদ করেছেন :

(ألَمْ تر كيف فعل ربُّك بأصحاب الفيل، ألَمْ يجعل كيدهم في تضليل، و أرسل عليهم طيراً أبابيل، ترميهم بحجارة من سجّيل، فجعلهم كعصف مأْكول.)

"আপনি কি দেখেন নি যে, আপনার প্রভু হস্তিবাহিনীর সাথে কি আচরণ করেছেন? তিনি কি তাদের চক্রান্ত নস্যাৎ করে দেন নি? তিনি এক ঝাঁক পাখি তাদের (ঐ সেনাবাহিনীর) দিকে

প্রেরণ করেছিলেন যেগুলো পোড়া- মাটিনির্মিত ক র তাদের ওপর নিক্ষেপ করেছিল এবং তিনি তাদের দেহকে চর্বিত ঘাসের   ায় ছিন্ন- ভিন্ন করে ফেলেছিলেন। ”

এ আয়াতগুলোর বাহ্য অর্থ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, আবরাহার জাতি ও সম্প্রদায় মহান আল্লাহর ক্রোধ ও গজবের শিকার হয়েছিল। এ সব ছোট ছোট ক রই ছিল তাদের মৃত্যুর একমাত্র কারণ। এক ঝাঁক পাখি তাদের মাথা, মুখমণ্ডল ও দেহের ওপর এ সব ক র নিক্ষেপ করেছিল। এ আয়াতগুলোর অন্তর্নিহিত অর্থের দিকে গভীরভাবে দৃকপাত করলে প্রতীয়মান হয় যে, আবরাহার বিশাল হস্তিবাহিনীর ধ্বংস ও মৃত্যু কেবল এ অস্বাভাবিক অস্ত্রের দ্বারাই সংঘটিত হয়েছে। (এ অধমের দৃষ্টিতে উপরিউক্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক র ছিল আসলে অত্যন্ত শক্তিশালী এবং ভিত্ উৎপাটনকারী) সুতরাং এ আয়াতগুলোর বাহ্য অর্থের পরিপন্থী যে কোন ব্যাখ্যাই অকাট্য দলিল- প্রমাণ এর পক্ষে প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত গ্রহণযোগ্য হবে না।

উপরিউক্ত ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে প্রণিধানযোগ্য কিছু বিষয়

১. পূর্বোক্ত ব্যাখ্যাটিও সমগ্র ঘটনাকে প্রাকৃতিক ও স্বাভাবিক বলে প্রকাশ করতে পারে নি। উক্ত কাহিনীতে এরপরও এমন কিছু বিষয় ও দিক আছে যেগুলো অদৃশ্য (গায়েবী) কার্যকারণসমূহের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা উচিত। কারণ যদি ধরেও নিই যে, বসন্ত ও টাইফয়েড   রের রোগজীবাণুর দ্বারাই আবরাহার সেনাবাহিনীর মৃত্যু হয়েছে এবং তাদের মৃতদেহ ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে তাহলে এ সব পাখি কোন্ সত্তার কাছ থেকে প্রয়োজনীয় শিক্ষা ও নির্দেশনা পেয়ে বুঝতে পেরেছিল যে, বসন্ত ও টাইফয়েড   রের রোগজীবাণু ঐ সব ক রের মধ্যে স্থান নিয়েছে এবং তখন পাখিগুলো তাদের নিজেদের খাদ্য ও দানা- পানি সংগ্রহ করার পরিবর্তে এক ঝাঁক একত্রে ঐ সব ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ক রের কাছে গিয়েছে এবং চঞ্চুর মধ্যে সেগুলো পুরে এক সুসজ্জিত সেনাবাহিনীর   ায় আবরাহার সেনাবাহিনীর ওপর তা বর্ষণ করেছে? এমতাবস্থায় সমগ্র ঘটনাপ্রবাহকে স্বাভাবিক ও প্রাকৃতিক বলা যাবে কি? এ মহাঘটনার একটি অংশের ব্যাখ্যা যদি গায়েবী কার্যকারণসমূহের মাধ্যমেই করতে হয় এবং মহান আল্লাহর ইচ্ছা এ ক্ষেত্রে যদি কার্যকর থাকে

তাহলে উক্ত ঘটনার আরেক অংশকে স্বাভাবিক ও প্রাকৃতিক বলে দেখানোর কি আর কোন প্রয়োজন আছে?

২. অণুজীব প্রাণীসমূহ যা বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় 'জীবাণু ' নামে অভিহিত এবং মানুষের শত্রু বলে গণ্য, সেদিন (আবরাহার ওপর ক র বর্ষণের দিনে) কোন ব্যক্তির সাথে সেগুলোর কোন আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিল না এতদসত্ত্বেও এ জঘ ভয় র শত্রু কিভাবে কেবল আবরাহার সৈ দেরকেই আক্রান্ত করেছিল এবং মক্কাবাসীদেরকে পুরোপুরি ভুলেই গিয়েছিল? আমাদের যে সব ইতিহাস জানা আছে সে সব কিছু থেকে প্রতীয়মান হয় যে, সকল ক্ষয়ক্ষতি কেবল আবরাহার সেনাবাহিনীরই হয়েছিল, অথচ বসন্ত ও টাইফয়েড হচ্ছে সংক্রামক ব্যাধি এবং বিভিন্ন ধরনের প্রাকৃতিক উপাদান ও পদার্থের মাধ্যমে উক্ত রোগ এক স্থান থেকে অ স্থানে বিস্তৃত ও স্থানান্তরিত হয়। পরিশেষে এ রোগ কখনো কখনো একটি দেশকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংসও করে ফেলে।

তাহলে এরপর কি এ ঘটনাকে একটি স্বাভবিক প্রাকৃতিক ঘটনা বলে গণ্য করা যাবে?

৩. সংক্রামক ব্যাধি সৃষ্টিকারী রোগজীবাণু কি ধরনের ছিল সে ব্যাপারেও এ সব ব্যাখ্যাকারীদের মধ্যে যথেষ্ট মতপার্থক্য রয়েছে। আর এ কারণেই তাঁদের প্রদত্ত তত্ত্বটি আরো বেশি নড়বড়ে ও ভিত্তিহীন হয়ে গেছে। কখনো বলা হয় যে, রোগজীবাণুটি ছিল কলেরার, কখনো বলা হয়েছে তা ছিল টাইফয়েড ও বসন্তের জীবাণু। অথচ এ ধরনের বক্তব্য ও মতপার্থক্যের কোন সঠিক ও নির্ভরযোগ্য দলিল-প্রমাণ আমরা খুঁজে পাই নি। মুফাসসিরদের মধ্যে কেবল ইকরামাহ্ এ সম্ভাবনা সম্পর্কে বলেছেন এবং ইতিহাস লেখকদের মধ্যে কেবল ইবনে আসীর তাঁর ইতিহাস গ্রন্থে একটি দুর্বল বক্তব্য হিসাবে এ সম্ভাবনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন এবং তিনি সাথে সাথে তা রদও করেছেন।[১১৩] এখানে প্রস ত উল্লেখ্য যে, মুফাসসির ইকরামাহ্ সম্পর্কে পণ্ডিতদের মধ্যে যথেষ্ট কথা আছে।

সবচেয়ে আশ্চর্যজনক ব্যাখ্যা হচ্ছে ঐ ব্যাখ্যা যা মিশরের ভূতপূর্ব সংস্কৃতিমন্ত্রী ড. হাইকাল রচিত 'হায়াতু মুহাম্মদ ' অর্থাৎ মুহাম্মদ (সা.)-এর জীবনচরিত গ্রন্থে হস্তিবাহিনীর বিস্তারিত বিবরণ প্রসে এসেছে। সূরা ফীলের আয়াতগুলো উল্লেখ করার পর এবং 'আর তাদের ওপর তিনি প্রেরণ

করলেন এক ঝাঁক পাখি ' - এ আয়াতটিও তার চোখের সামনে থাকা সত্ত্বেও তিনি আবরাহার সৈ দের মৃত্যুর ব্যাপারে লিখেছেন, "সম্ভবত বাতাসের সাথে কলেরার রোগজীবাণু সমুদ্রের দিক থেকে এসেছিল। " রোগজীবাণু আনয়নকারী যদি বাতাসই হয়ে থাকে তাহলে পাখিগুলো কি কারণে আবরাহার সৈ দের মাথার ওপর উড়ছিল এবং এ সব ক র নিক্ষেপ করছিল? আর এ সব ক র আবরাহার সৈ দের মৃত্যু ঘটানোর ক্ষেত্রে কতটুকুই বা প্রভাব রেখেছিল?

সত্যি বলতে কি, আমরা এ ধরনের চিন্তা ও দৃষ্টিভ মেনে নিতে পারি না এবং বিনা কারণে মহান নবী ও ওলীদের বড় বড় মুজিযার অপব্যাখ্যাও করতে পারি না। প্রকৃতিবিজ্ঞানের আলোচ্য বিভিন্ন বিষয় এবং মুজিযা ভিন্ন দু'টি পথ। উপরন্তু প্রকৃতিবিজ্ঞানভিত্তিক বিষয়াদির পরিধি কেবল প্রাকৃতিক প্রপঞ্চ ও পদার্থসমূহের মধ্যকার আন্তঃসম্পর্কসমূহ নির্ণয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। যে সব ব্যক্তির ধর্মসংক্রান্ত জ্ঞান খুবই সামা এবং এ ধরনের বিষয় সংক্রান্ত যাদের কোন জ্ঞান ও ধারণাই নেই তাদেরকে সন্তুষ্ট করার জ আমাদের ধর্মের অকাট্য মূলনীতি ও আকীদা- বি াস বর্জন করা অনুচিত, অথচ আমরা এ ধরনের কাজ বাধ্যতামূলক বলে বি াস করি না। (অর্থাৎ ঐ সব ব্যক্তিকে সন্তুষ্ট করার জ আমাদের ধর্মীয় মৌলিক আকীদা- বি াস যা অকাট্য যুক্তি ও দলিল- প্রমাণের ওপর প্রতিষ্ঠিত তা বর্জন করা অথবা ঐ সকল ব্যক্তির মর্জিমাফিক ব্যাখ্যা ও বিকৃত করা মোটেও বাধ্যতামূলক নয়)।

দু'টি প্রয়োজনীয় বিষয়

এখানে দু'টি বিষয় অবশ্যই উল্লেখ করা উচিত। বিষয়দ্বয় হচ্ছে :

১. বুঝতে যেন ভুল না হয় যে, যে সব কাজ ও ঘটনা জনগণের মুখে মুখে উচ্চারিত এবং মহান নবী ও সৎকর্মশীল বান্দাদের সাথে সম্পর্কিত বলে গণ্য হয়, অথচ যেগুলোর কোন সঠিক দলিল- প্রমাণ নেই এবং কখনো কখনো কুসংস্কারাচ্ছন্ন দিক সম্বলিত আমরা সেগুলোকে এ ধরনের ব্যাখ্যা- বিশ্লেষণের মাধ্যমে সঠিক বলে প্রমাণ করতে চাই না, বরং আমাদের প্রকৃত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হচেছ এই যে, আমাদের হাতে বিদ্যমান অকাট্য দলিল- প্রমাণাদির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করব যে, অতিপ্রাকৃতিক জগতের সাথে নিজেদের সম্পর্ক ও যোগাযোগ প্রমাণ করার জ মহান

নবিগণ অলৌকিক কাজ করে থাকেন যা আধুনিক প্রকৃতিবিজ্ঞানও এর কারণসমূহ উপলব্ধি করতে অপারগ। এ ধরনের মুজিযার ব্যাপারে আমাদের সমর্থনই হচ্ছে আমাদের প্রকৃত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

২. আমরা কখনই বলি না যে, মুজিযার অস্তিত্ব আসলে কার্যকারণ ও ফলাফল থেকে ব্যতিক্রম ও ভিন্ন। আমরা উপরিউক্ত সূত্রের ব্যাপারে সম্মান প্রদর্শন করার পাশাপাশি বি াস করি যে, এ নিখিল বি ে র সকল অস্তিত্ববান সত্তারই কারণ আছে। আর যে কোন অস্তিত্ববান সত্তাই কারণবিহীনভাবে অস্তিত্ববান হতে পারে না। তবে আমরা বলি, এ ধরনের ঘটনাবলীরও (মুজিযাসমূহের) আবার কতগুলো অস্বাভাবিক কারণ আছে। আর এ ধরনের আধ্যাত্মিক (অলৌকিক) কার্যকারণ সম্মানিত সৎকর্মশীল বান্দাদের ইখতিয়ারে। বৈজ্ঞানিক অভিজ্ঞতা ও ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে এখন পর্যন্ত যেহেতু এ ধরনের কার্যকারণসমূহ অনাবিস্কৃত রয়ে গেছে- শুধু এ অজুহাত দেখিয়ে এগুলো অস্বীকার করা যাবে না। এখানে স্মর্তব্য যে, সকল নবীরই অলৌকিক কাজগুলোর কোন না কোন কারণ আছে যা সাধারণ প্রাকৃতিক কার্যকারণাদির দ্বারা ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। আর এগুলো যদি এ পদ্ধতির আলোকে ব্যাখ্যা করা সম্ভব হয় তাহলে তা আর মুজিযা বলে গণ্য হবে না।

আবরাহার পরাজয়ের পর

আবরাহার মৃত্যু এবং পবিত্র কাবা ও কুরাইশদের শত্রুদের জীবন বিনষ্ট ও ধ্বংস হওয়ার কারণে মক্কাবাসিগণ ও পবিত্র কাবা আরবদের দৃষ্টিতে বিরল ও বিপুল মর্যাদার অধিকারী হয়েছিল। এর ফলে কুরাইশদের এলাকা আক্রমণ, তাদেরকে কষ্ট দেয়া এবং তাওহীদের প্রাণকেন্দ্র পবিত্র কাবা ধ্বংস ও বিরান করার কথা কেউ আর ভেবে দেখারও সাহস করে নি। সাধারণ মানুষ ঠিক এমনই অভিমত ব্যক্ত করত যে, মহান আল্লাহ্ তাঁর নিজ ঘর পবিত্র কাবা এবং কুরাইশদের সম্মান ও মর্যাদা রক্ষা করার উদ্দেশ্যেই তাদের প্রধান শত্রুকে সমূলে ধ্বংস করে দিয়েছিলেন। কিন্তু কমসংখ্যক ব্যক্তিই চিন্তা করত যে, এ মহাঘটনা কেবল পবিত্র কাবা হিফাজত করার উদ্দেশ্যেই ঘটেছিল; আর কুরাইশদের বিরাটত্ব ও ক্ষুদ্রতা এ ক্ষেত্রে মোটেও প্রভাব রাখে নি। এর

প্রমাণস্বরূপ, কুরাইশদের ওপর তদানীন্তন অ া গোত্রপতির পক্ষ থেকে সংঘটিত বারংবার আক্রমণসমূহ। এ ক্ষেত্রে লক্ষণীয় যে, আবরাহার আক্রমণের সময় যে অবস্থা ও পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল সে ধরনের অবস্থা ও পরিস্থিতি এ সব আক্রমণের ক্ষেত্রে হয় নি।

বিনা আয়েশে অর্জিত এ বিজয় যা কুরাইশদের ক্ষতি ও রক্তপাত ছাড়াই সংঘটিত হয়েছিল তা কুরাইশদের মাঝে নতুন নতুন চিন্তা- ভাবনার উদ্ভব ঘটিয়েছিল। তাদের গর্ব, অহংকার, উপেক্ষা ও তুচ্ছতাচ্ছিল্য করার মনোবৃত্তি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছিল। তারা অ দের (অ- কুরাইশদের) ব্যাপারে সীমাবদ্ধতা আরোপের কথাও চিন্তা- ভাবনা করতে থাকে। কারণ তারা নিজেদেরকে আরবদের মধ্যে সবচেয়ে সম্ভ্রান্ত, সম্মানিত ও শ্রেষ্ঠ শ্রেণী বলে মনে করত। তারা বি াস করত কেবল তারাই ৩৬০টি প্রতিমা ও বিগ্রহের সুদৃষ্টিতে রয়েছে এবং তাদের দ্বারা সাহায্যপ্রাপ্ত ও আশীর্বাদপুষ্ট।

এ কারণেই তারা নিজেদের আমোদ- প্রমোদ ও ভোগবিলাসের পরিধি আরো ব্যাপক ও বিস্তৃত করার সিদ্ধান্ত নেয়। তাই তারা খেজুরের তৈরি মদের পাত্রগুলো মাথায় করে বয়ে বেড়াত; কখনো কখনো তারা পবিত্র কাবার চারপাশে মদপানের আসর বসাত। তারা মনে করত যে, বিভিন্ন আরব গোত্রের কাঠ ও লৌহনির্মিত প্রতিমাসমূহের পাশে তাদের জীবনের সর্বোত্তম মুহূর্তগুলো কাটাচ্ছে। আর যারাই হীরা নগরীর মুনজেরি, শামের গাসসানীয় এবং ইয়েমেনের গোত্রগুলো সম্পর্কে যে সব গল্প ও কাহিনী শুনেছিল তারা সে সব কাহিনী ও গল্প সে সব আসরে উপস্থিত ব্যক্তিদের কাছে বর্ণনা করত। তারা বি াস করত, তাদের এ মধুর জীবন উক্ত প্রতিমা ও মূর্তিগুলোর সুদৃষ্টির প্রত্যক্ষ ফল যা সর্বসাধারণ আরব জাতিকে তাদের (কুরাইশদের) সামনে হীন ও অপদস্থ করেছে এবং তাদেরকে সকলের ওপর শ্রেষ্ঠত্বের আসনে অধিষ্ঠিত করেছে।

কুরাইশদের কল্পরাজ্য

খোদা না করুন যে, এই মানুষ একদিন তার জীবনের দিকচক্রবাল রেখা পরিষ্কার ও উজ্জ্বল দেখতে পেয়ে নিজের জ এক কাল্পনিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর প্রবক্তা হয়ে যায়। তখনই সে অস্তিত্ব ও জীবনকে কেবল তারই সাথে সংশ্লিষ্ট বলে মনে করবে এবং অ মানুষের জ স্বল্পতম জীবনধারণের ন্যূনতম অধিকার ও সম্মানের স্বীকৃতি দেবে না।

সকলের ওপর নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব ও উচ্চ মর্যাদা প্রমাণ করার জ কুরাইশগণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল যে, তারা মক্কা শরীফের বাইরে নির্ধারিত এলাকার (حل) [১১৪] অধিবাসীদের ন্যূনতম সম্মান ও মর্যাদার স্বীকৃতি দেবে না। কারণ তারা বলত, "সাধারণ আরব আমাদের ইবাদাতগাহের প্রতি মুখাপেক্ষী। আর আরব জাতির সবাই প্রত্যক্ষ করেছে, আমরা কাবার দেব-দেবীদের কৃপাদৃষ্টিতে আছি।" তখন থেকেই কুরাইশদের কড়াকড়ি ও বাড়াবাড়ি শুরু হয়ে যায়। তারা জোরজুলুম চালিয়ে হিল-এর অধিবাসীদেরকে বাধ্য করেছিল যে, হ ও উমরার জ মক্কায় প্রবেশ করলে তারা তাদের নিজেদের সাথে আনা খাদ্য ভক্ষণ করতে পারবে না। হারামের অধিবাসীদের খাবারই তাদের খেতে হবে। তাওয়াফের সময় তাদেরকে মক্কার স্থানীয় পোশাক পরিধান করতে হবে। আর এখানে স্মর্তব্য যে, এ স্থানীয় পোশাকে গোত্রীয় দিক প্রতিফলিত হয়েছিল। কোন ব্যক্তি মক্কার স্থানীয় পোশাক সংগ্রহ করতে না পারলে তাকে অবশ্যই দিগম্বর হয়ে পবিত্র কাবার চারপাশে তাওয়াফ করতে হবে। তবে যে কতিপয় (অ-কুরাইশ) আরব গোত্রপতি এ বিষয়টি মেনে নেয় নি তাদের ব্যাপারে স্থির করা হয় যে, তাওয়াফ শেষ করার পর তারা দেহ থেকে পোশাক পরিচ্ছদ বের করে দূরে ছুঁড়ে ফেলে দেবে। কোন ব্যক্তির হক নেই ঐ সব পোশাকে হাত দেয়ার। তবে সবক্ষেত্রেই মহিলারা বিবস্ত্র হয়ে তাওয়াফ করতে বাধ্য ছিল। তাদেরকে (মহিলাদের) তাওয়াফ করার সময় কেবল নিজেদের মাথা একটি কাপড় দিয়ে ঢেকে বিশেষ ধরনের একটি কবিতা[১১৫] গুনগুন করে পড়তে হতো।

ি ষ্টান আবরাহার আক্রমণের পর কোন ইয়া দী ও ি ষ্টানের পবিত্র মক্কায় প্রবেশাধিকার ছিল না। তবে যে ইয়া দী ও ি ষ্টান কোন মক্কাবাসীর বেতনভূক কর্মচারী হতো সে হতো ব্যতিক্রম (অর্থাৎ সে মক্কা নগরীতে প্রবেশ করতে পারত)। কিন্তু এ ক্ষেত্রে নিজ ধর্ম সম্পর্কে ন্যূনতম কথা বলার অধিকার তার থাকত না।

কুরাইশদের গর্ব ও অহংকার এমন এক পর্যায়ে উপনীত হয়েছিল যে, হ র কিছু কিছু আচার-অনুষ্ঠান যা হারামের বাইরে আঞ্জাম দিতে হয় তা তারা বর্জন করেছিল এবং এ কারণে তারা আরাফাতের ময়দানে[১১৬] অবস্থান করত না (‘আরাফাত’ হারামের বাইরে একটি স্থানের নাম যেখানে হাজীদেরকে অবশ্যই যিলহ মাসের নবম দিবসে যোহর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত অবস্থান করতে হয়।)। অথচ তাদের পূর্বপুরুষগণ (হযরত ইসমাঈল- এর সন্তানগণ) আরাফাতের ময়দানে অবস্থান করাকে হ অনুষ্ঠানের একটি অংশ বলে গণ্য করতেন। আর কুরাইশদের পুরো বাহ্যিক সম্মান ও মর্যাদা পবিত্র কাবা ও হ র এ সব আচার- অনুষ্ঠানের কাছেই ঋণী ছিল। আরব উপদ্বীপের সকল স্থান থেকে জনগণ প্রতি বছর শুষ্ক ও পানিহীন এ মরু এলাকায় হ ব্রত পালনের জ আসতে বাধ্য ছিল। এখানে যদি কোন তাওয়াফ করার স্থান (পবিত্র কাবা) ও মাশআর (হাজীদের নির্দিষ্ট ইবাদাতের স্থান- যেখানে হাজীরা আরাফাহ্ থেকে বের হয়ে রাত্রিযাপন করে ফজরের সময় থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত ফরয অবস্থান করার জ এবং এরপর তারা মীনায় হ র বাকি কাজগুলো আঞ্জাম দেয়ার জ বের হয়ে যায়) না থাকত তাহলে কোন ব্যক্তিই জীবনে একবারের জ ও এ স্থান অতিক্রম করার ইচ্ছা প্রকাশ করত না।

সামাজিক হিসাব- নিকাশের দৃষ্টিতে এ সব দুর্নীতি ও বৈষম্যের উদ্ভব আসলে এড়ানো সম্ভব নয়। একটি মৌলিক বি ব ও শক্তিশালী আন্দোলনের জ বি র প্রস্তুতি সম্পন্ন হওয়া পর্যন্ত পবিত্র মক্কা নগরীর পরিবেশ অবশ্যই সীমাহীন দুর্নীতি ও কল র মধ্যে নিমজ্জিত হতেই হবে।

এ সব বঞ্চনা, আমোদ- প্রমোদ প্রভৃতি পবিত্র মক্কা নগরীর পরিবেশ- পরিস্থিতিকে একজন বি সংস্কারক নেতার আবির্ভাবের জ প্রস্তুত ও উপযুক্ত করে তুলছিল। আর এ বিষয়টি মোটেও অনর্থক ও অসমীচীন হবে না যে, আরবদের পণ্ডিত বলে খ্যাত ওয়ারাকাহ্ ইবনে নওফেল যিনি

তাঁর শেষ জীবনে ি ষ্ট ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন এবং ইঞ্জিল শরীফ সংক্রান্ত জ্ঞানও অর্জন করেছিলেন তিনি যখনই মহান আল্লাহ্ ও নবীদের সম্পর্কে কথা বলতেন তখনই তিনি মক্কার ফিরআউন আবু সুফিয়ানের ক্রোধ ও উষ্মার শিকার হতেন। আবু সুফিয়ান তখন বলত, "এমন   ষ্টা ও নবীর কোন প্রয়োজন আমাদের নেই। কারণ আমরা প্রতিমা ও মূর্তিদের দয়া ও কৃপার মধ্যেেই আছি। "

৬. মহানবীর পিতা আবদুল্লাহ্

যেদিন আবদুল মুত্তালিব তাঁর পুত্র আবদুল্লাহর জীবন মহান আল্লাহর পথে ১০০ উট কোরবানী করার মাধ্যমে পুনঃক্রয় করেছিলেন তখনও তাঁর (আবদুল্লাহর) জীবনের ২৪টি বসন্ত অতিবাহিত হয়নি। এ ঘটনার কারণে আবদুল্লাহ্ কুরাইশ বংশীয়দের মধ্যে প্রশংসনীয় মর্যাদা ও খ্যাতির অধিকারী হওয়া ছাড়াও নিজ বংশে, বিশেষ করে আবদুল মুত্তালিবের কাছে বিশেষ সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী হয়েছিলেন। কারণ যে জিনিসের জ মানুষকে তার জীবনে চড়া মূল্য দিতে হয় এবং বেশি কষ্ট সহ্য করতে হয় সে জিনিসের প্রতি তার টান সবচেয়ে বেশি হয়ে থাকে। এ কারণেই আত্মীয়- স্বজন ও বন্ধু- বান্ধবদের মধ্যে আবদুল্লাহ্ অস্বাভাবিক ধরনের সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী হয়েছিলেন।

যেদিন আবদুল্লাহ্ পিতার সাথে কোরবানী করার স্থানে গমন করছিলেন সেদিন তাঁর মধ্যে পরস্পর ভিন্নধর্মী আবেগ ও অনুভূতির উদ্ভব হয়েছিল। পিতার প্রতি সম্মান প্রদর্শন এবং তাঁর সার্বিক দুঃখ- কষ্ট বরণের জ কৃতজ্ঞতা প্রকাশের অনুভূতি তাঁর গোটা অস্তিত্বকে ঘিরে রেখেছিল; আর এ কারণেই আত্মসমর্পণ করা ব্যতীত তাঁর আর কোন উপায় ছিল না। কিন্তু অ দিকে, যেহেতু ভাগ্যবিধি চাচ্ছিল তাঁর জীবন- বসন্তের ফুলগুলোকে শরৎকালীন পত্রের মতো শুকিয়ে বিবর্ণ ও মলিন করে দিতে সে কারণে তাঁর অন্তরের মধ্যে এক ধরনের অস্থিরতাও দেখা দিয়েছিল।

আবদুল্লাহ্ ঈমান এবং আবেগ- অনুভূতি- এ দু'টি শক্তির পারস্পরিক দ্বন্দ্বের মাঝে পড়ে গিয়েছিলেন এবং এ ঘটনাপ্রবাহ তাঁর অন্তরে বেশ কিছু অপূরণীয় অস্বস্তি ও উদ্বেগের সৃষ্টি করেছিল। তবে যেভাবে বর্ণিত হয়েছে ঠিক সেভাবে সমস্যার সমাধান হলে আবদুল মুত্তালিব আমেনার সাথে আবদুল্লাহর বিবাহের ব্যবস্থা সুসম্পন্ন করার মাধ্যমে এ তিক্ত অনুভূতির তাৎক্ষণিক অবসান ঘটানোর লক্ষ্যে চিন্তা- ভাবনা করতে লাগলেন। আবদুল্লাহর জীবনসূত্র যা ছিন্ন- ভিন্ন হওয়ার দ্বারপ্রান্তে উপনীত হয়েছিল তা জীবনের সবচেয়ে মৌলিক বিষয়ের (অর্থাৎ বিবাহ) সাথে এখন সংযুক্ত হয়ে গেল।

আবদুল মুত্তালিব কোরবানীর স্থল থেকে প্রত্যাবর্তনের সময় পুত্র আবদুল্লাহর হাত ধরে সরাসরি ওয়াহাব ইবনে আবদে মান্নাফ ইবনে যাহরার গৃহে চলে গেলেন। ওয়াহাবের মেয়ে আমেনার সাথে আবদুল্লাহকে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ করলেন। উল্লেখ্য যে, ওয়াহাব- ক া আমেনা ছিলেন পুণ্যবতী ও সচ্চরিত্রা নারী। আর তিনি (আবদুল মুত্তালিব) ঐ একই অনুষ্ঠানে আমেনার চাচাতো বোন দালালাকে বিবাহ করেন। মহানবী (সা.)- এর চাচা হযরত হামযাহ্[১১৭] এই দালালার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। হযরত হামযাহ্ ছিলেন মহানবীর সমবয়সী।

সমসাময়িক ঐতিহাসিক আবদুল ওয়াহহাব (মিশর বি বিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক, যিনি তারীখে ইবনে আসীরের ওপর কিছু মূল্যবান ও উপকারী টীকা লিখেছেন) উপরিউক্ত ঘটনাকে একটি অসাধারণ ঘটনা হিসাবে উল্লেখ করে লিখেছেন, “ঐ দিনই ওয়াহহাবের গৃহে আবদুল মুত্তালিবের গমন, তা- ও আবার দু’টি মেয়ের বিবাহ প্রস্তাব দেয়া- একটি মেয়েকে নিজে বিয়ে করার জ এবং অপর মেয়েকে পুত্র আবদুল্লাহর সাথে বিবাহ দেয়ার জ আসলেই সামাজিক লোকাচার ও রীতিনীতি বহির্ভূত। ঐ ঐতিহাসিক দিনে যা তাঁর জ শোভনীয় ছিল তা হলো বিশ্রাম নেয়া ও ক্লান্তি- অবসাদ দূর করা। তাঁদের নিজেদের ক্লান্তি দূর করে নিজ নিজ কাজে হাত দেয়াটিই ছিল (তাঁদের জ একান্ত) স্বাভাবিক।[১১৮]

কিন্তু আমরা বি াস করি, লেখক যদি বিষয়টিকে অ দৃষ্টিকোণ থেকে অধ্যয়ন করতেন, তাহলে তাঁর পক্ষে তা বি াস করা সহজ হতো।

যা হোক অতঃপর আবদুল মুত্তালিব বধূবরণের জ একটি সময় নির্দিষ্ট করেন। নির্ধারিত সময় উপস্থিত হলে কুরাইশদের প্রচলিত প্রথানুযায়ী হযরত আমেনার পিতৃগৃহে বিবাহ অনুষ্ঠান সুসম্পন্ন হয়। কিছুদিন আমেনার সাথে একত্রে বসবাস করার পর আবদুল্লাহ্ ব্যবসা- বাণিজ্যের জ শামের উদ্দেশে যাত্রা করেন এবং শাম থেকে ফেরার পথে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। আমরা এতৎসংক্রান্ত বিশদ বিবরণ পরে যথাস্থানে উল্লেখ করব।

রহস্যজনক চক্রান্তকারীদের আনাগোনা

এতে কোন সন্দেহ নেই যে, ইতিহাসের পাতায় পাতায় জাতিসমূহের উজ্জ্বল ও অন্ধকারাচ্ছন্ন দিকসমূহ শিক্ষণীয় বিষয় হিসাবে লিপিবদ্ধ হয়েছে। তবে সকল যুগ ও শতাব্দীতে ভালোবাসা ও ঘৃণা, আপোষকামিতা, উপেক্ষা ও শৈথিল্য, সৃজনশীলতা, অভূতপূর্ব বক্তব্য, লেখনী শক্তির বহিঃপ্রকাশ এবং এ ধরনের আরো অনেক কারণ ইতিহাস রচনা ও লিপিবদ্ধ করার ক্ষেত্রে প্রভাব রেখেছে এবং ঐতিহাসিক সত্য ঘটনাগুলোকে মিথ্যা কল্প-কাহিনীর সাথে সংমিশ্রিত করে ফেলেছে। আর এটি হচ্ছে সেই ইতিহাসবেত্তার জ এক বিরাট সমস্যা যিনি ইতিহাসশাস্ত্রের তাত্ত্বিক মূলনীতিসমূহ বাস্তবে প্রয়োগ করে সত্য ও মিথ্যাকে পৃথক করে থাকেন।

উপরিউক্ত কারণসমূহ ইসলামের ইতিহাস রচনা ও লিপিবদ্ধ করার ক্ষেত্রেও কার্যকর ভূমিকা রেখেছে। ঐতিহাসিক সত্য ঘটনাসমূহের বিকৃতি সাধনে অদৃশ্য হাতসমূহ কার্যকর ভূমিকা পালন করেছে। মহানবী (সা.)-এর মর্যাদা বৃদ্ধি করার জ কখনো কখনো বন্ধুদের তরফ থেকে এমন সব শোভাবর্ধনকারী অলংকারিক বক্তব্য প্রদান ও প্রশংসাব্যঞ্জক কথা বলা হয়েছে যেগুলোর মাঝে মিথ্যা ও বানোয়াট হওয়ার নিদর্শন স্পষ্ট বিদ্যমান।

আমরা ইতিহাসে পাঠ করি যে, হযরত আবদুল্লাহর ললাটে সব সময় নবুওয়াতের নূর (আলো) চমকাত।[১১৯] আমরা আরো জেনেছি, অনাবৃষ্টির বছরগুলোতে আবদুল মুত্তালিব তাঁর সন্তান আবদুল্লাহর হাত ধরে পাহাড়ের দিকে চলে যেতেন এবং আবদুল্লাহর ললাটের নূরের উসিলায় মহান আল্লাহর কাছে দয়া ও কৃপা প্রার্থনা করতেন।

এ বিষয়টি (আবদুল্লাহর কপালে নবুওয়াতের নূরের অস্তিত্ব) ব শিয়া-সুন্নী আলেম বর্ণনা করেছেন। আর এ বিষয়টির অসত্য হওয়ার পক্ষে কোন দলিল বিদ্যমান নেই। তবে কতিপয় ইতিহাস গ্রন্থে বিষয়টি এমন এক কল্প-কাহিনী বা উপাখ্যানের উপজীব্য হয়েছে যা আমরা কখনই সুন্দর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও শোভা হিসাবে গ্রহণ করতে পারি না।

ফাতিমা খাসআমীয়ার কাহিনী

ফাতিমা খাসআমীয়াহ্ ছিল ওয়ারাকাহ্ ইবনে নওফেলের ভ ি । ওয়ারাকাহ্ ইবনে নওফেল ছিলেন আরবের অ তম পণ্ডিত ও ভবি দ্বক্তা। তিনি ইঞ্জিল সম্পর্কে বেশ কিছু তথ্য ও জ্ঞান অর্জন করেছিলেন। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)- এর নবুওয়াতের ঘোষণার শুরুতে হযরত খাদীজার সাথে তাঁর কথোপকথন ঐতিহাসিক গ্রন্থাদিতে লিপিবদ্ধ আছে। আমরা তা যথাস্থানে আলোচনা করব।

ওয়ারাকার বোন ভাইয়ের কাছ থেকে শুনেছিল যে, ইসমাঈলের বংশধারায় এক ব্যক্তি নবী হবেন। এ কারণে সে সব সময় তাঁর সন্ধান করত। যেদিন আবদুল মুত্তালিব আবদুল্লাহর হাত ধরে তাঁকে কোরবানীর স্থল থেকে বের হয়ে হযরত আমেনার পিতৃগৃহের দিকে যাচ্ছিলেন তখন ফাতিমা খাসআমীয়াহ্ তার ঘরের পাশে দণ্ডায়মান ছিল। তার চোখ একটি আলোর প্রতি নিবদ্ধ হয় অনেকদিন ধরে সে যার সন্ধান করে এসেছেন। সে বলল, "আবদুল্লাহ্! তুমি কোথায় যাচ্ছ? তোমার পিতা যেসব উট তোমার মুক্তির জ কোরবানী করেছেন তা আমি এক শর্তে দিতে প্রস্তুত। আর তা হলো তুমি আমার সাথে সহবাস করবে।" তখন আবদুল্লাহ্ বললেন, "এখন আমি আমার পিতার সাথে আছি। এটি আমার পক্ষে সম্ভব নয়।" আবদুল্লাহ্ ঐ দিনই আমেনার সাথে বিবাহ- বন্ধনে আবদ্ধ হন এবং একরাত তাঁর সাথে অতিবাহিত করেন। পরের দিন তিনি ফাতিমা খাসআমীয়ার ঘরে ছুটে যান এবং তার পূর্বপ্রদত্ত প্রস্তাবে তিনি যে সম্মত ও প্রস্তুত আছেন তা তাকে জানান। ফাতিমা খাসআমীয়াহ্ বলল, "আজ তোমাকে আমার কোন প্রয়োজন নেই। কারণ তোমার কপালে যে নূর আগে প্রত্যক্ষ করতাম তা এখন আর নেই এবং তোমা থেকে তা চলে গেছে।"[১২০]

কখনো কখনো বলা হয়েছে যে, ফাতিমা তার প্রয়োজনের কথা আবদুল্লাহর কাছে প্রকাশ করলে তিনি (আবদুল্লাহ্) তাৎক্ষণিকভাবে নিম্নোক্ত দু'টি পঙক্তি আবৃত্তি করেন :

أمـــــا الحــــــرام فالممـــــات دونـــــه　　　والحـــــل لأحـــــل فاســـــتبينه

فكيـــــــف بـــــــالأمر الـــــــذي تبغينـــــــه   يحمـــــــي الكـــــــريم عرضـــــــه و دينـــــــه

" যেখানে এ ব্যাপারে আমি ভাবতেও পারি না সেখানে আমার পক্ষে তোমার প্রস্তাবে সাড়া দেয়া কিভাবে সম্ভব? মহৎ ব্যক্তি তার নিজ সম্মান ও ধর্ম সংরক্ষণ করে। "

কিন্তু আমেনার সাথে তাঁর বিবাহের তিন দিন অতিবাহিত হতে না হতেই প্রবৃত্তির কামনা- বাসনা আবদুল্লাহকে ফাতিমা খাসআমীয়ার গৃহপানে তাড়িত করে। ফাতিমা খাসআমীয়াহ্ তখন তাঁকে বলেছিল, "তোমার কপালে যে দ্যুতি ছিল সে কারণেই আমি তোমার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলাম। কিন্তু এখন সেই দ্যুতিটি আর নেই। মহান আল্লাহ্ যে স্থানে তা রাখতে চেয়েছিলেন সেখানেই রেখেছেন। " আবদুল্লাহ্ বললেন, "হ্যাঁ আমি আমেনাকে বিবাহ করেছি।"[১২১]

এ ঘটনাটি বানোয়াট ও মিথ্যা হবার প্রমাণ

এ কাহিনীর জালকারী কিছু কিছু দিক উপেক্ষা করেছে এবং কাহিনীটির মিথ্যা ও কৃত্রিম হওয়ার চিহ্নগুলো দূর করতে পারে নি। যদি সে ঠিক এতটুকু পরিমাণের ওপরই নির্ভর করত যে, একদিন বাজারে অথবা গলিতে আবদুল্লাহর সাথে ফাতিমা খাসআমীয়ার দেখা হলে আবদুল্লাহর কপালে নবুওয়াতের দ্যুতি প্রত্যক্ষ করেছিল; এ দ্যুতি তাকে আবদুল্লাহর সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের ব্যাপারে ভাবতে উদ্বুদ্ধ করেছিল, তাহলে তা বি াস করা যেত। কিন্তু কাহিনীটির মূল ভা অ ভাবে বর্ণিত হয়েছে যা নিম্নোক্ত কারণসমূহের আলোকে গ্রহণযোগ্য নয়:

১. এ কাহিনী থেকে প্রতীয়মান হয় যে, যখন ফাতিমা খাসআমীয়াহ্ তার কামনা- বাসনার কথা প্রকাশ করল তখন আবদুল্লাহর হাত পিতা আবদুল মুত্তালিবের হাতের মধ্যে আবদ্ধ ছিল। এমতাবস্থায় এ মেয়েটির পক্ষে তার মনোবাসনা ব্যক্ত করা কি আসলেই সম্ভব এবং আবদুল মুত্তালিবের মতো কুরাইশপ্রধানের সামনে তার এ কথা বলতে কি মোটেও লজ্জা হলো না? কারণ আবদুল মুত্তালিব ছিলেন ঐ ব্যক্তি যিনি মহান আল্লাহর আনুগত্য ও বন্দেগীর পথে নিজ সন্তানকে পর্যন্ত কোরবানী করতে মোটেও ভীত ও শ িত ছিলেন না। আর যদি আমরা বলি, ফাতিমা

খাসআমীয়ার মনবাসনা ও লক্ষ্য- উদ্দেশ্য বৈধ ছিল (অর্থাৎ সে আবদুল্লাহর কাছে বৈধ বিবাহের প্রস্তাবই পেশ করেছিল) তাহলে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে আবদুল্লাহ্ তাঁকে লক্ষ্য করে যে পঙ্ক্তিদ্বয় আবৃত্তি করেছিলেন সেগুলোর সাথে তা মোটেও খাপ খায় না।

২. এ থেকেও জটিলতর হচ্ছে আবদুল্লাহর পুরো ব্যাপারটা। কারণ যে সন্তান পিতার জ   নিজে নিহত হয়েও অর্থাৎ নিজের জীবন প্রাণ উৎসর্গ করে হলেও সম্মান প্রদর্শন করে সে কিভাবে পিতার সামনে উপরিউক্ত কথাগুলো বলতে পারে? আসলে যে যুবক কয়েক মিনিট আগে তরবারির নিচে জবাই হওয়া থেকে নিস্কৃতি পেয়েছে সে তো তীব্রভাবে আত্মিক- মানসিক অস্থিরতার শিকার। তার পক্ষে কিভাবে এক রমণীর কামনা- বাসনার প্রতি সাড়া দেয়া সম্ভব?! ঐ রমণীর কি তাহলে সময়জ্ঞান বলতে কিছুই ছিল না? অথবা জালকারী কি কাহিনীটির এ সব দুর্বল ও উজ্জ্বল দিকের প্রতি উদাসীন থেকেছে?

কাহিনীর দ্বিতীয় রূপটি আরো বেশি অপমানজনক ও লজ্জাকর। কারণ প্রথমেই আবদুল্লাহ্ (অবৈধ কাজের আহবান শোনামাত্রই) ঐ দুটি পঙ্ক্তি আবৃত্তি করে প্রস্তাব দানকারিণীকে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন এবং বলেছিলেন, “এই অবৈধ কাজ যা ধর্ম ও মানমর্যাদা নষ্ট করে দেয় তা অপেক্ষা মৃত্যুও আমার জ   অপেক্ষাকৃত বেশি সহজ।” অতঃপর আত্মমর্যাদাবোধে উদ্দীপ্ত এ যুবকের পক্ষে এ ধরনের বিচ্যুত চিন্তাধারার কাছে নতি স্বীকার ও আত্মসমর্পণ করা কিভাবে সম্ভব হলো অথচ যার এখনো বিয়ের পর তিন রাতের বেশি সময় অতিবাহিত হয় নি। আর এরই মধ্যে যৌন তাড়না তাকে ফাতিমা খাসআমীয়ার গৃহপানে তাড়িত করেছিল!

আমরা কখনই মেনে নিতে পারব না যে, বনি হাশিম গোত্রে প্রতিপালিত আবদুল্লাহর মতো কোন যুবকের মাথায় এ ধরনের তাকওয়াবহির্ভূত চিন্তাধারার উদ্ভব হতে পারে যেখানে আবদুল্লাহকে মহান আল্লাহ্ একজন শ্রেষ্ঠ মহামানবের পিতা হিসাবে মনোনীত করেছেন। অধিকন্তু শিয়া- সুন্নী আলেমগণ মহানবী (সা.)- এর ঊর্ধ্বতন পিতৃপুরুষ ও গর্ভধারণকারিণীদের চারিত্রিক পবিত্রতার পক্ষে যে সব দলিল- প্রমাণ উপস্থাপন করেছেন তা এ ক্ষেত্রেও সমানভাবে প্রযোজ্য এবং

উপরিউক্ত কাহিনীটি মিথ্যা প্রতিপন্ন হওয়ার জ যথেষ্ট। এ মিথ্যা কল্পকাহিনী যদি অজ্ঞ ব্যক্তিদের হাতের মুঠোয় তুলে দেয়া না হতো তাহলে আমরা মূলত তা আলোচনাই করতাম না।

'কিতাবে পিয়াম্বার'গ্রন্থের প্রতি দৃষ্টিপাত

'কিতাবে পিয়াম্বার'গ্রন্থটিতে যদি দৃষ্টিপাত করুন এবং এ কাহিনীটি লালন করার জ লেখক যে সব অধ্যায়ের অবতারণা করেছেন সেগুলোর ব্যাপারে সূক্ষ্মভাবে চিন্তা- ভাবনা করেন তাহলে এ গ্রন্থের লেখকের আসল উদ্দেশ্যের সাথে আমরা পরিচিত হতে পারব। মহানবী (সা.)- এর জীবনী গল্পাকারে লেখাই হচ্ছে লেখকের মূল উদ্দেশ্য যাতে করে এ গল্পের প্রতি আগ্রহী তরুণগণ মহানবী (সা.)- এর জীবনচরিত অধ্যয়ন করতে আগ্রহী হয়। এটি এরকমই এক মহৎ, পবিত্র ও প্রশংসনীয় লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, তবে এ শর্তে যে, তা অবশ্যই ধর্মীয় নীতিমালার সাথে পূর্ণ সামঞ্জস্যশীল হতে হবে।

কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, উপরিউক্ত গ্রন্থের ভা থেকে প্রমাণিত হয় যে, দুর্বলতম রেওয়ায়েত এবং সবচেয়ে কুসংস্কারাচ্ছন্ন কল্পকাহিনীই হচ্ছে লেখকের মূল দলিল; আবার কখনো কখনো লেখক নিজ থেকেই এগুলোর সাথে কয়েকগুণ বেশি বানোয়াট কথাবার্তা ও ভিত্তিহীন তথ্য যোগ করেছেন।

ফাতিমা খাসআমীয়ার কাহিনীটি ঠিক এমনই যা আমরা ইতোমধ্যে উল্লেখ করেছি। যদি ধরে নেয়া হয় যে, উক্ত গল্পটি একটি মৌলিক গল্প বা কাহিনী, তারপরেও ঘটনাটির মূল বিবরণ ঠিক এটিই যা আদি ঐতিহাসিক সূত্রসমূহ থেকে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।[১২২]

' মহানবী ' (সা.) গ্রন্থের লেখক, এমন সব ঘৃণ্য ও মর্যাদাহানিকর কথা অল ারসূচক গুণ হিসাবে এ ঘটনার সাথে উল্লেখ করেছেন যা বনি হাশিম গোত্রের মান- সম্মান, বিশেষ করে মহানবী (সা.)- এর শ্রদ্ধেয় পিতার খোদাভীরুতা ও পূতঃপবিত্র চরিত্রের ওপর কালিমা লেপন করে। আর এভাবে লেখক চেয়েছেন, যে গল্প বিশেষজ্ঞ পণ্ডিত ও জ্ঞানী ব্যক্তিদের কাছে ভিত্তিহীন তা অধিকতর সুপাঠ্য করতে। লেখক এমনভাবে সরলমতি আরব ললনা ফাতিমা

খাসআমীয়ার চারিত্রিক আচার- আচরণ বর্ণনা করেছেন যেন দীর্ঘকাল অভিনেত্রীর ভূমিকায় অভিনয় করার দায়িত্ব তার ওপর স্ত ছিল।

লেখক এমনভাবে এ রমণীর প্রতি আবদুল্লাহর প্রেমাসক্তি বর্ণনা করেছেন, আবদুল্লাহর সুউচ্চ মর্যাদার সাথে যার ক্ষুদ্রতম সম্পর্কও নেই। আবদুল্লাহর সুমহান মর্যাদার প্রমাণ এটিই যে, মহান আল্লাহ্ তাঁরই ঔরসে নবুওয়াত ও তাকওয়ার নূর আমানতস্বরূপ স্থাপন করেছিলেন।

‘মহানবী ’ গ্রন্থের পাঠকবর্গের মনে রাখা উচিত যে, এ গ্রন্থের কিছু কিছু বিষয় ঐতিহাসিক দলিল- প্রমাণের ভিত্তিতে লেখা হয়েছে এবং এ গ্রন্থের বেশ কিছু আলোচ্য বিষয়ের কাহিনীভিত্তিক ও ঔপ াসিক দিকও আছে। এ গ্রন্থের অনেক আলোচ্য বিষয়ই পাশ্চাত্যের লেখকদের থেকে ধার করা হয়েছে যেগুলোর কোন স্পষ্ট যুক্তি ও দলিল- প্রমাণ আমাদের সামনে নেই। যেমন উক্ত গ্রন্থের ১০২ পৃষ্ঠায় আবদুল্লাহর বিয়ের রাতের ঘটনাপ্রবাহ ও আরবীয় নৃত্যপদ্ধতি সম্পর্কে এবং আমেনার সাথে আবদুল্লাহর বিয়ের রাতে আবদুল্লাহর প্রতি প্রেম ও ভালোবাসার কারণে ২০০ কুমারী মেয়ে হিংসার আগুনে দগ্ধ হয়ে প্রাণত্যাগ করেছিল- এ উপাখ্যানটি গীবন লিখিত ‘রোমান সাম্রাজ্যের পতন ’ গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত হয়েছে। তাই এ গ্রন্থের পাঠকদের কাছে সবিনয় অনুরোধ করছি তাঁরা যেন এ গ্রন্থ পাঠ করার সময় এর দুর্বল ও শক্তিশালী দিকগুলো বেশি বেশি বিবেচনায় আনেন।

ইয়াসরিবে আবদুল্লাহর মৃত্যু

আমেনার সাথে বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ হওয়ার মাধ্যমে আবদুল্লাহর জীবনের নব অধ্যায়ের সূচনা হয় এবং আমেনার মতো স্ত্রী লাভ করার কারণে তাঁর জীবন আলোকিত হয়ে যায়। কিছুদিন অতিবাহিত হলে পবিত্র মক্কা থেকে একটি বাণিজ্যিক কাফেলার সাথে ব্যবসা উপলক্ষে তিনি শামের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। যাওয়ার ঘণ্টা বেজে উঠলে কাফেলা যাত্রা শুরু করে এবং শত শত দয়কেও যেন সেই সাথে নিয়ে যায়। এ সময় হযরত আমেনা গর্ভবতী ছিলেন। কয়েক মাস পরে দূর থেকে কাফেলার নিশান দেখা গেলে কিছু ব্যক্তি ঐ কাফেলায় তাদের নিজেদের আত্মীয়-স্বজনদের অভ্যর্থনা জানানোর জ শহরের বাইরে গমন করল।

হযরত আবদুল মুত্তালিব তাঁর পুত্র আবদুল্লাহর অপেক্ষায় ছিলেন। পুত্রবধু আমেনার অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি কাফেলার মাঝে আবদুল্লাহকে তন্ন তন্ন করে খুঁজে ফিরছিল। কিন্তু কাফেলার মাঝে তাঁর কোন চিহ্নই পাওয়া গেল না। খোঁজাখুঁজির পর তাঁরা জানতে পারলেন, আবদুল্লাহ্ ফেরার পথে ইয়াসরিবে (মদীনায়) অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাই বিশ্রাম ও সফরের ক্লান্তি দূর করার জ তিনি তাঁর আত্মীয়- স্বজনদের মধ্যে কিছুদিন অতিবাহিত করতে চেয়েছেন। এ খবর শোনার পর আবদুল মুত্তালিব ও আমেনার মুখমণ্ডলে দুশ্চিন্তা ও বিষাদের ছায়া বিস্তার করল এবং তাঁদের নয়ন বেয়ে অশ্রু ঝরতে লাগল।

আবদুল মুত্তালিব জ্যেষ্ঠ পুত্র হারেসকে ইয়াসরিবে গিয়ে আবদুল্লাহকে মক্কায় নিয়ে আসার আদেশ দিলেন। হারেস ইয়াসরিবে পৌঁছে জানতে পারলেন যে, বাণিজ্য কাফেলা প্রস্থানের এক মাস পরে যে অসুস্থতার কারণে আবদুল্লাহ্ যাত্রাবিরতি করেছিলেন সেই অসুস্থতায় মৃতুবরণ করেছেন। হারেস মক্কায় ফিরে এসে পুরো ঘটনা হযরত আবদুল মুত্তালিবকে জানালেন এবং হযরত আমেনাকেও তাঁর স্বামীর মৃত্যু সম্পর্কে অবহিত করলেন। আবদুল্লাহ্ মৃত্যুর আগে যা কিছু উত্তরাধিকার হিসাবে রেখে গিয়েছিলেন তা ছিল নিম্নরূপ : পাঁচটি উট, এক পাল দুম্বা এবং উম্মে আইমান নাম্নী এক দাসী যিনি পরবর্তীকালে মহানবী (সা.)- কে প্রতিপালন করেছিলেন ।[১২৩]

পঞ্চম অধ্যায় : বিশ্বনবী মুহাম্মদ মুস্তাফা) সা -(.এর শুভ জন্ম

"এক মহান তারা ঝিলমিল করল ও সভার মধ্যমণি হলো

আমাদের ব্যথিত অন্তরের অন্তর বন্ধু ও সু দ হলো।"

জাহেলিয়াতের কালো মেঘ সমগ্র আরব উপদ্বীপের ওপর ছায়া মেলে রেখেছিল। অসৎ ও ঘৃণ্য কার্যকলাপ, রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ- বিগ্রহ, লুটতরাজ ও সন্তান হত্যা সব ধরনের নৈতিক গুণের বিলুপ্তি ঘটিয়েছিল। তাদের জীবন- মৃত্যুর মধ্যকার ব্যবধান মাত্রাতিরিক্তভাবে সংক্ষিপ্ত হয়ে গিয়েছিল। এহেন পরিস্থিতিতে সৌভাগ্যরবি উদিত হলো এবং সমগ্র আরব উপদ্বীপ মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)- এর শুভ জন্মোপলক্ষে আলোকোজ্জ্বল হয়ে গেল। আর এ পথেই একটি অনগ্রসর জাতির সৌভাগ্যের ভিত্তিও স্থাপিত হলো। অনতিবিলম্বে এ নূরের বিচ্ছুরণে সমগ্র জগৎ আলোকোদ্ভাসিত হলো এবং সমগ্র বি এক সুমহান মানব সভ্যতার ভিত্তিও নির্মিত হয়ে গেল।

মহান মনীষীদের শৈশব

প্রত্যেক মহামানব ও মনীষীর জীবনের প্রতিটি অধ্যায় গভীরভাবে অধ্যয়ন করা উচিত। কখনো কখনো কোন ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব এতটা মহান ও ব্যাপক যে, তাঁর জীবনের সমস্ত অধ্যায়, এমনকি তাঁর শৈশব ও মাতৃস্ত পান করার সময়কালের প্রতিও বিশেষ দৃষ্টি দেয়া হয়। যুগের প্রতিভাবান ব্যক্তিবর্গ, সমাজের নেতৃবৃন্দ ও সভ্যতার কাফেলার অগ্রবর্তীদের জীবন সাধারণত আকর্ষণীয়, সংবেদনশীল ও আশ্চর্যজনক পর্যায় ও দিক সম্বলিত। তাঁদের জীবনের প্রতিটি ছত্র যেদিন তাঁদের ভ্রূণ মাতৃজঠরে স্থাপিত হয় সেদিন থেকে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত রহস্যাবৃত। আমরা বি র মহামানবদের শৈশব ও বাল্যকাল অধ্যয়ন করলে দেখতে পাই যে, তা আশ্চর্যজনক ও অলৌকিক বিষয়াদি দিয়ে ভরপুর। আর আমরা যদি এ ধরনের বিষয় বি র সেরা ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে মেনে নিই তাহলে মহান আল্লাহর প্রিয় নবী ও ওলীদের ক্ষেত্রে এতদসদৃশ বিষয়াদি মেনে নেয়াও খুব সহজ হবে।

পবিত্র কোরআন হযরত মূসা (আ.)- এর শৈশব ও বাল্যকাল অত্যন্ত রহস্যময় বলে ব্যাখ্যা করেছে এবং এ প্রসংে বলেছে : মূসা (আ.) যাতে জন্মগ্রহণ করতে না পারে সেজ ফিরআউন সরকারের নির্দেশে শত শত নিষ্পাপ শিশুর শিরোচ্ছেদ করা হয়েছিল। মূসা (আ.)- এর জন্মগ্রহণ ও এ পৃথিবীতে আগমনের সাথেই মহান আল্লাহর ঐশী ইচ্ছা জড়িত হয়েছিল বিধায় শত্রুরা তাঁর ক্ষতিসাধন তো করতে পারেই নি, বরং তাঁর সবচেয়ে বড় শত্রুও (ফিরআউন) তাঁর প্রতিপালনকারী ও পৃষ্ঠপোষকে পরিণত হয়েছিল। পবিত্র কোরআন এরশাদ করেছে : "আমরা মূসার মাকে ওহী করেছিলাম যে, সন্তানকে একটি বাক্সে রেখে সমুদ্রে ফেলে দাও, তাহলে সমুদ্রের তর ওকে মুক্তির সৈকতে পৌঁছে দেবে। আমার ও তার শত্রু তার প্রতিপালন করবে; আমি শত্রুর বুকে তার প্রতি গভীর ভালোবাসা ও মমত্ববোধের উদ্ভব ঘটাব। আর এভাবে আমি পুনরায় তোমার সন্তানকে তোমার কাছেই ফিরিয়ে দেব।"

মূসার বোন ফিরআউনের দেশে গিয়ে বলল, "আমি এক মহিলার সন্ধান দেব যে আপনাদের প্রিয় এ শিশুটির লালন- পালনের দায়িত্ব নিতে পারে। তাই ফিরআউন- সরকারের পক্ষ থেকে মূসার মা তাদের (ফিরআউনের) প্রিয় শিশুর (মূসার) লালন- পালনের দায়িত্বভারপ্রাপ্ত হলেন।"[১২৪]

হযরত ঈসা (আ.)- এর মাতৃগর্ভে বিকাশ, জন্মগ্রহণ এবং লালন- পালনকাল হযরত মূসা (আ.)- এর চেয়েও অধিকতর আশ্চর্যজনক। পবিত্র কোরআন হযরত ঈসা (আ.)- এর জন্ম ও শৈশব কাল বর্ণনা করে বলেছে, "ঈসার মা মরিয়ম নিজ সম্প্রদায় থেকে পৃথক হয়ে গেলেন। পবিত্র আত্মা (জিবরাইল) মানুষের আকৃতি ধারণ করে তাঁর সম্মুখে প্রকাশিত হলেন এবং তাঁকে সুসংবাদ দিলেন যে, আপনাকে একটি পবিত্র সন্তান দানের জ আমাকে আদেশ দেয়া হয়েছে।" মরিয়ম তখন আশ্চর্যান্বিত হয়ে বললেন, "কেউ আমাকে স্পর্শ করে নি এবং আমিও তো ব্যভিচারিণী নই।" আমাদের দূত তখন বললেন, "এ কাজ মহান আল্লাহর কাছে অত্যন্ত সহজ।" পরিশেষে মহান আল্লাহর নির্দেশে ঈসা মসীহর নূর হযরত মরিয়মের গর্ভে স্থাপিত হলো। প্রসববেদনা তাঁকে খেজুর গাছের দিকে নিয়ে গেল। তিনি তাঁর নিজ অবস্থার ব্যাপারে দুঃখভারাক্রান্ত ছিলেন। আমরা বললাম, "খেজুর গাছ বাঁকাও, তাহলে তাজা খেজুর নিচে পড়বে।

" সন্তান জন্মগ্রহণ করলে মরিয়ম নবজাতক সন্তানসহ নিজ সম্প্রদায়ের কাছে ফিরে আসলেন। আশ্চর্যান্বিত হয়ে জনগণের মুখের ভাষা যেন থেমে গিয়েছিল। এরপর মরিয়মের উদ্দেশ্যে তীব্র প্রতিবাদ, আপত্তি ও অসন্তোষের ঝড় উঠেছিল। মরিয়মকে পূর্বেই মহান আল্লাহ্ নির্দেশ দিয়েছিলেন যাতে করে তিনি বুঝিয়ে দেন যে, তারা যেন এই শিশুকে তাদের সকল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে। তারা বলেছিল, "যে দুগ্ধপো শিশু দোলনায় শায়িত সে কি কথা বলতে সক্ষম?" তখন হযরত ঈসা (আ.) ঠোঁট খুলে বলে উঠলেন, "আমি মহান আল্লাহর বান্দা (দাস)। তিনি আমাকে কিতাব (ঐশী গ্রন্থ) দিয়েছেন এবং আমাকে নবীদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন।"[১২৫]

পবিত্র কোরআন, তাওরাত ও হযরত ঈসার অনুসারিগণ যখন এ দু'মহান উলূল আযম নবী সংক্রান্ত যাবতীয় উল্লিখিত বিষয়ের সত্যতা সম্পর্কে সাক্ষ্য প্রদান করে তখন ইসলামের মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)- এর শুভ জন্মোপলক্ষে যেসব আশ্চর্যজনক বিষয় ঘটেছিল সে সব ব্যাপারে বিস্মিত হওয়া এবং সেগুলোকে ভাসাভাসা ও অগভীর বলে বিবেচনা করা অনুচিত। আমরা হাদীস ও ইতিহাস গ্রন্থসমূহে দেখতে পাই :

মহানবীর জন্মগ্রহণের মুহূর্তে সম্রাট খসরুর প্রাসাদের দ্বারমণ্ডপ (ايوان) ফেটে গিয়েছিল এবং এর কয়েকটি স্তম্ভ ধসে পড়েছিল। ফারস প্রদেশের অি উপাসনালয়ের প্র লিত অি নিভে গিয়েছিল। ইরানের সাভেহর হরদ শুকিয়ে গিয়েছিল। পবিত্র মক্কার প্রতিমালয়সমূহে রক্ষিত মূর্তি ও প্রতিমাসমূহ মাটিতে পড়ে গিয়েছিল। তাঁর দেহ থেকে নূর (আলো) বের হয়ে তা আকাশের দিকে উত্থিত হয়েছিল যার রশ্মি ফারসাখের পর ফারসাখ (মাইলের পর মাইল) পথ আলোকিত করেছিল। সম্রাট আনুশিরওয়ান ও পুরোহিতগণ অতি ভয় র স্বপ্ন দর্শন করেছিলেন।

মহানবী (সা.) খতনাকৃত ও নাভি কর্তিত অবস্থায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন। ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর তিনি বলেছিলেন :

الله أكبر و الحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة و أصيلا

" আল্লাহ্ মহান, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, সকাল- সন্ধ্যায় তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করছির। "

এ সব বিষয় ও তথ্য সকল মৌলিক নির্ভরযোগ্য হাদীস ও ইতিহাস গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে।[১২৬] হযরত মূসা ও হযরত ঈসার ব্যাপারে যে সব বিষয় আমরা বর্ণনা করেছি সেগুলো বিবেচনায় আনলে এ ধরনের ঘটনাসমূহ মেনে নেয়ার ক্ষেত্রে সন্দেহ করার কোন অবকাশ থাকে না।

এখন প্রশ্ন করা যায় যে, এ ধরনের অলৌকিক ও অসাধারণ ঘটনাবলীর প্রকৃত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যই বা কি ছিল? এ প্রশ্নের জবাবে সংক্ষেপে অবশ্যই বলতে হয় : যেমনভাবে আমরা আলোচনা করেছি ঠিক তেমনি এ ধরনের অস্বাভাবিক ও অলৌকিক ঘটনাবলী কেবল মহানবী (সা.)- এর সাথেই বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট নয়, বরং অ া নবী- রাসূলের জন্মগ্রহণের সাথেও সম্পর্কযুক্ত ছিল। পবিত্র কোরআন ছাড়াও অ সকল জাতি, বিশেষ করে ইয়া দী ও ি ষ্টান জাতির ইতিহাস তাদের নিজেদের নবীদের ব্যাপারে এ ধরনের ব অলৌকিক ঘটনা বর্ণনা করেছে।

এ ছাড়াও এ ধরনের ঘটনাবলী ঐ সব অত্যাচারী ও স্বৈরাচারী শাসকের অনুভূতিকে জাগ্রত করে যারা বিভিন্ন জাতিকে দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ করে রেখেছে। এ সব অত্যাচারী ক্ষমতাধর শাসক এ সব ঘটনা সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করে নিজেদের বিবেকের কাছে প্রশ্ন করতে উদ্বুদ্ধ হবে যে, কি হয়েছিল যে, একজন বৃদ্ধা রমণীর মাটি নির্মিত ঘরে চির ধরে নি, অথচ সম্রাট খসরু পারভেজের রাজপ্রাসাদের বৃহৎ বৃহৎ স্তম্ভ ধ্বসে পড়েছিল? ইরানের ফারস প্রদেশের অি মন্দিরের আগুন (অি প্র লিত থাকার) সকল উপকরণ বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও কেন নিভে গিয়েছিল, অথচ তখন সব জিনিসই স্ব স্ব স্থানে বহাল ছিল? তারা এ ধরনের ঘটনার কারণ কি হতে পারে সে ব্যাপারে যদি চিন্তা- ভাবনা করত তাহলে বুঝতে পারত এ সব ঘটনা মূর্তিপূজার যুগের অবসান সম্পর্কে এবং খুব শীঘ্রই যে সকল শয়তানী শক্তি ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে সে ব্যাপারেও সুসংবাদ প্রদান করছে।

মূলনীতিগতভাবে ঐ একই দিনে ঘটে যাওয়া অলৌকিক ঘটনাবলী যে অত্যাচারী শাসকদের উপলব্ধি ও শিক্ষাগ্রহণের কারণ হতেই হবে এমনটি বোধ হয় জরুরী নয়, বরং যে ঘটনাটি কোন এক বছরে সংঘটিত হয়েছে তা বছরের পর বছর শিক্ষণীয় হতে পারে এবং তার কার্যকারিতা বহাল থাকতে পারে; আর এতটুকুই যথেষ্ট।

মহানবী (সা.) যে রাতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন সে রাতে ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলো ঠিক এ রকমই। কারণ এ সব ঘটনার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল ঐ সব মানুষের অন্তরে প্রচণ্ড ঝাঁকুনি দেয়া ও মনোযোগ সৃষ্টি করা যারা মূর্তিপূজা, অ ায় ও জুলুমের মধ্যে নিমজ্জিত হয়ে পড়েছিল।

মহানবীর রিসালাত বা নবুওয়াতী মিশনের সমসাময়িক জনগোষ্ঠী এবং এর পরবর্তী প্রজন্মসমূহ এমন একজন মানুষের আহবান শুনতে পাবে যিনি তাঁর সকল শক্তি প্রয়োগ করে মূর্তিপূজা ও অ ায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছেন। যখন তারা তাঁর জীবনের প্রথম দিকের ঘটনাসমূহ অধ্যয়ন করবে তখন প্রত্যক্ষ করবে যে, এ ব্যক্তির জন্মগ্রহণের রাতে এমন সব ঘটনা ঘটেছিল যা তাঁর দাওয়াহ্ বা প্রচার কার্যক্রমের সাথে পূর্ণ সংগতিশীল। স্বাভাবিকভাবে এ ধরনের ঘটনার একই সাথে সংঘটিত হওয়ার বিষয়টি আসলে তাঁর সত্যবাদী হওয়ারই নিদর্শনস্বরূপ বলে তারা গ্রহণ করবে এবং এ কারণে তারা তাঁর প্রতিও বি াস স্থাপন করবে।

এ ধরনের ঘটনাবলী হযরত ইবরাহীম, হযরত মূসা, হযরত ঈসা ও হযরত মুহাম্মদ (সা.)- এর মতো মহান নবীদের জন্মগ্রহণের সময় সংঘটিত হওয়া তাঁদের নবুওয়াত ও রিসালাতের যুগে ঐ সব অলৌকিক ঘটনা সংঘটিত হওয়ার চেয়ে কোন অংশে কম নয়; আর এ সব কিছু আসলে মহান আল্লাহর ঐশী কৃপা থেকেই উৎপত্তি লাভ করেছে এবং মানব জাতির হেদায়েত ও তাদেরকে মহান নবীদের দীন প্রচার কার্যক্রমের প্রতি আকৃষ্ট করার জ ই সংঘটিত হয়েছে।

মহানবীর জন্মের দিন, মাস ও বছর

সাধারণ সীরাত রচয়িতাগণ ঐকমত্য পোষণ করেন যে, মহানবী হাতির বছর (عام الفيل) অর্থাৎ ৫৭০ িষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। কারণ তিনি অকাট্যভাবে ৬৩২ িষ্টাব্দে ইন্তেকাল করেছিলেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬২ অথবা ৬৩ বছর। অতএব, তিনি ৫৭০ িষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

অধিকাংশ ঐতিহাসিক ঐকমত্য পোষণ করেছেন যে, মহানবী (সা.) রবিউল আউয়াল মাসে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তবে তাঁর জন্মদিন সম্পর্কে মতভেদ আছে। শিয়া মুহাদ্দিসদের মধ্যে

প্রসিদ্ধ অভিমত হচ্ছে, মহানবী ১৭ রবিউল আউয়াল, শুক্রবার ফজরের সময় (ঊষালগ্নে) জন্মগ্রহণ করেছিলেন। আর আহলে সুন্নাতের মধ্যে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ অভিমত হচ্ছে তিনি ১২ রবিউল আউয়াল, সোমবার জন্মগ্রহণ করেন।[১২৭]

এ দু'অভিমতের মধ্যে কোনটি সঠিক?

একটি দুঃখজনক ব্যাপার হচ্ছে এই যে, ইসলাম ধর্মের মহান নেতার জন্ম ও মৃত্যুদিবস, বরং আমাদের অধিকাংশ ধর্মীয় নেতার জন্ম ও মৃত্যুদিবস সুনির্দিষ্ট নয়। এ অস্পষ্টতার কারণেই আমাদের বেশিরভাগ উৎসব ও শোকানুষ্ঠানের তারিখ অকাট্যভাবে জানা যায় নি। ইসলামের পণ্ডিত ও আলেমগণ বিগত শতাব্দীগুলোতে যেসব ঘটনা ঘটেছে সেগুলো এক বিশেষ পদ্ধতিতে লিপিবদ্ধ করতেন। কিন্তু কি কারণে তাঁদের অধিকাংশেরই জন্ম ও মৃত্যুর তারিখ খুব সূক্ষ্মভাবে লিপিবদ্ধ করা সম্ভব হয়নি তা (আজও) জানা যায় নি।

আমি ভুলব না ঐ সময়ের কথা যখন ভাগ্যবিধি আমাকে (লেখক) কুর্দিস্তানের একটি সীমান্ত শহরে টেনে নিয়ে গিয়েছিল; ঐ এলাকার একজন আলেম এ বিষয়টি (অর্থাৎ ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর সঠিক তারিখ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে আলেমদের মধ্যে মতবিরোধ) উত্থাপন করেন এবং এজন্য তিনি অনেক দুঃখ প্রকাশও করেছিলেন। তিনি এ ব্যাপারে আলেমদের উদাসীনতা ও শৈথিল্য প্রদর্শন করার কারণে অত্যন্ত আশ্চর্যান্বিত হয়েছিলেন। তিনি আমাকে বলেছিলেন, "এ ধরনের বিষয়ের ক্ষেত্রে কিভাবে তাঁদের মধ্যে এ রকম মতবিরোধ বিরাজ করা সম্ভব?" তখন আমি তাঁকে বললাম, "এ বিষয়টির কিছুটা সমাধান করা সম্ভব। আপনি যদি এ শহরের একজন আলেমের জীবনী রচনা করতে চান এবং আমরা ধরেও নিই যে, এ আলেম ব্যক্তি বেশ কিছুসংখ্যক সন্তান এবং অনেক আত্মীয়- স্বজন রেখে গেছেন তাহলে উক্ত আলেমের শিক্ষিত সন্তান- সন্ততি এবং বিরাট পরিবার যারা স্বাভাবিকভাবেই তাঁর জীবনের যাবতীয় বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জ্ঞাত তারা উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও তাঁর আত্মীয় যারা নয় তাদের থেকে কি আপনি তাঁর জীবনের প্রয়োজনীয় তথ্যাবলী সংগ্রহ করবেন? নিশ্চিতভাবে আপনার বিবেক এ ধরনের কাজের অনুমতি দেবে না।

মহানবী (সা.) জনগণের মধ্য হতে বিদায় নিয়েছেন। মৃত্যুর সময় তিনি উম্মাহর মাঝে তাঁর আহলে বাইত ও অ া সন্তান- সন্ততি রেখে গেছেন। তাঁর নিকটাত্মীয়গণের বক্তব্য : মহানবী (সা.) যদি আমাদের শ্রদ্ধেয় পিতা হয়ে থাকেন এবং আমরাও যদি তাঁর ঘরে বয়ঃপ্রাপ্ত এবং তাঁর কোলে প্রতিপালিত হয়ে থাকি, তাহলে আমরাই সকলের চেয়ে এ বিষয়ে অধিক জ্ঞাত যে, আমাদের বংশের প্রধান (মহানবী) অমুক দিন অমুক সময় জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

এমতাবস্থায় তাঁর সন্তান- সন্ততি ও বংশধরদের বক্তব্য উপেক্ষা করে দূর সম্পর্কের আত্মীয় ও প্রতিবেশীদের বক্তব্যকে কি তাঁদের বক্তব্যের ওপর প্রাধা দেয়া সম্ভব হবে?”

উপরোল্লিখিত আলেম আমার এ কথা শোনার পর মাথা নিচু করে বললেন, “আপনার কথা আসলে أهل البيت أدرى بما في البيت (ঘরের লোক ঘরে যা আছে সে সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি জ্ঞাত)- এ প্রবাদ বাক্যের অন্তর্নিহিত অর্থের অনুরূপ। আর আমিও মনে করি যে, মহানবী (সা.)- এর জীবনের যাবতীয় বিশেষত্ব ও খুঁটিনাটি দিক সম্বন্ধে শিয়া ইমামীয়াহ্ মাজহাবের বক্তব্য যা তাঁর সন্তান- সন্ততি, বংশধর ও নিকটাত্মীয়দের থেকে সংগৃহীত তা সত্যের নিকটবর্তী।” এরপর আমাদের মধ্যকার আলোচনা অ া বিষয় পর্যন্ত সম্প্রসারিত হলো যা এখানে উল্লেখ করার কোন সুযোগ নেই।

গর্ভধারণকাল

প্রসিদ্ধি আছে যে, হযরত মুহাম্মদ (সা.)- এর পবিত্র অস্তিত্বের নূর তাশরীকের (হ র মাসের ১১, ১২ ও ১৩ তারিখকে আইয়ামে তাশরীক অর্থাৎ তাশরীকের দিনসমূহ বলে অভিহিত করা হয়) দিনগুলোতে হযরত আমেনার জরায়ুতে স্থাপিত হয়েছিল।[১২৮] তবে ১৭ রবিউল আউয়ালে যে হযরত মুহাম্মদ (সা.) জন্মগ্রহণ করেছিলেন এতৎসংক্রান্ত ঐতিহাসিকদের মধ্যে প্রচলিত প্রসিদ্ধ অভিমতের সাথে এ বিষয়টির মিল নেই। কারণ এমতাবস্থায় হযরত আমেনার গর্ভধারণকাল ৩ মাস অথবা ১ বছর ৩ মাস বলে ধরতে হবে। আর এ বিষয়টি স্বয়ং প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মের পরিপন্থী। আর কোন ঐতিহাসিক বা আলেম তা মহানবীর অ তম বৈশিষ্ট্য বলে উল্লেখ করেন নি।[১২৯]

প্রখ্যাত গবেষক আলেম শহীদে সানী (৯১১- ৯৬৬ হি.) উপরিউক্ত আপত্তিটির এভাবে সমাধান করেছেন : ইসমাঈলের বংশধরগণ তাদের নিজ পূর্বপুরুষদের অনুকরণে যিলহজ্জ মাসেই হজ্জ ব্রত পালন করত। কিন্তু পরবর্তীকালে বিশেষ কিছু কারণে তারা প্রতি দু'বছর একই মাসে হজ্জ ব্রত পালনের চিন্তা- ভাবনা করে। অর্থাৎ দুই বছর তারা যিলহজ্জ মাসে, এর পরের দু'বছর মুহররম মাসে এবং এ ধারাক্রমানুসারে হজ্জ ব্রত পালন করার চিন্তা করেছিল। তাই ২৪ বছর গত হওয়ার মাধ্যমে পুনরায় হজ্জের দিনগুলো স্বস্থানে অর্থাৎ যিলহজ্জ মাসে ফিরে আসত। আরবদের রীতিনীতি এ ধারার ওপরই বহাল ছিল। অবশেষে ১০ হিজরীতে প্রথম বারের মতো হজ্জের দিবসগুলো যিলহজ্জ মাসে ফিরে আসে। মহানবী (সা.) একটি ভাষণ দানের মাধ্যমে (হজ্জ সংক্রান্ত) যে কোন ধরনের পরিবর্তন জোরালোভাবে নিষিদ্ধ করেন। তিনি যিলহজ্জ মাসকে হজ্জের মাস হিসাবে অভিহিত করেন।[১৩০] আর নিম্নোক্ত এ আয়াতটি নিষিদ্ধ মাসগুলো পিছিয়ে দেয়ার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞাস্বরূপ অবতীর্ণ হয়েছিল; আর নিষিদ্ধ মাসসমূহ পিছিয়ে দেয়া ছিল জাহেলী আরবদের অন্যতম প্রচলিত প্রথা। আয়াতটি নিম্নরূপ :

(إنّما النّسيئ في زيادة الكفر يُضلّ به الذين كفروا و يُحلّونه عاما و يحرّمونه عاما)

"হারাম মাসসমূহ পরিবর্তন করা হচ্ছে কুফর বৃদ্ধির নিদর্শন মাত্র। যারা কাফির তারা এ কাজের দ্বারা পথভ্রষ্ট হয়। তারা এক বছর ঐ কাজকে হালাল করে এবং আরেক বছর তা হারাম করে।" (সূরা তাওবাহ্ : ৩৭)

এই পরিস্থিতিতেই প্রতি দু'বছর তাশরীকের দিবসগুলো পরিবর্তিত হতো। যদি হাদীসে বর্ণিত হয়ে থাকে যে, হযরত মুহাম্মদ (সা.)- এর নূর তাশরীকের দিবসগুলোতে হযরত আমেনার গর্ভে স্থাপিত হয়েছিল এবং তিনি ১৭ রবিউল আউয়াল জন্মগ্রহণ করেছিলেন তাহলে এ দু'ব্যাপারে কোন স্ববিরোধিতা নেই। কারণ ঐ অবস্থায় স্ববিরোধিতার উদ্ভব হতে পারে যখন তাশরীকের দিবসগুলো বলতে যিলহজ্জ মাসের ১১, ১২ ও ১৩ তারিখ বোঝাবে। তবে যেভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে তদনুযায়ী তাশরীকের দিনগুলো সর্বদা পরিবর্তিত হয়েছে এবং চিন্তা- ভাবনা ও গবেষণা করার পর এ বিষয়ে আমরা পৌঁছেছি যে, মহানবী (সা.)- এর ভ্রূণ হযরত আমেনা কর্তৃক গর্ভে

ধারণ এবং তাঁর জন্মগ্রহণের বছরে হ র দিবসগুলো জমাদিউল উলা মাসে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। আর যেহেতু মহানবীর জন্ম রবিউল আউয়াল মাসেই হয়েছিল এমতাবস্থায় হযরত আমেনার গর্ভধারণকাল প্রায় ১০ মাস হয়েছিল।[১৩১]

এ বক্তব্যের ব্যাপারে আপত্তিসমূহ

মর ম শহীদে সানী এ অভিমত থেকে যে ফলাফলে উপনীত হয়েছেন তা সঠিক নয়। তিনি نسيء (নাসি) শব্দের যে অর্থ ব্যক্ত করেছেন মুফাসসিরদের মধ্যে কেবল মুজাহিদই উক্ত অর্থ গ্রহণ করেছেন। অ া মুফাসসির তা ভিন্নভাবে ও ভিন্ন অর্থে ব্যাখ্যা করেছেন। আর উপরিউক্ত ব্যাখ্যাটি ততটা দৃঢ় ও শক্তিশালী নয়। কারণ :

প্রথমত মক্কা নগরী সকল সমাজ ও গোত্রের কেন্দ্রস্থল ছিল এবং সমগ্র আরব জাতির একটি সাধারণ ইবাদাতগাহ্ বলে গণ্য হতো। বলার অপেক্ষা রাখে না যে, প্রতি দু'বছর অন্তর হ র দিন- ক্ষণ পরিবর্তন করা স্বাভাবিকভাবে আপামর জনতাকে ভুলের মধ্যে ফেলে দেবে এবং হ ব্রতের মহান সমাবেশ ও সামষ্টিক ইবাদাতের বিরল সম্মান ও মর্যাদাকেও সমূলে বিনষ্ট করে দেবে। এ দৃষ্টিকোণ থেকে যা কিছু তাদের জ   গৌরব ও সম্মানের ভিতস্বরূপ তা প্রতি দু'বছর অন্তর পরিবর্তিত হয়ে যাক, হ র সময় হারিয়ে যাক এবং উক্ত মহাসমাবেশ ধ্বংস হয়ে যাক- এ ব্যাপারে স্বাভাবিকভাবে মক্কাবাসীদের সম্মত হওয়ার প্রশ্নই আসে না।

দ্বিতীয়ত খুব সূক্ষ্মভাবে যদি হিসাব- নিকাশ করা হয় তাহলে শহীদে সানীর বক্তব্যের অপরিহার্য অর্থ দাঁড়ায় এটি যে, নবম হিজরীর হ র দিবসগুলো যিলক্বদ মাসে পড়েছিল, অথচ ঐ বছরেই হযরত আলী (আ.) মহানবীর পক্ষ থেকে হ র দিনগুলোতে মুশরিকদের উদ্দেশ্যে সূরা তাওবাহ্ পাঠ করার দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়েছিলেন। মুফাসসির ও মুহাদ্দিসগণ ঐকমত্য পোষণ করেছেন যে, হযরত আলী উক্ত সূরা ১০ যিলহ   পাঠ করেন এবং মুশরিকদের ৪ মাসের সুযোগ দেন। আর সকল মুফাসসির ও মুহাদ্দিস ১০ যিলহ কে সেই সুযোগের শুরু বলেই জানেন এবং তাঁদের মধ্য থেকে কেউ বলেন নি যে, সেটি ছিল যিলক্বদ মাসে।

তৃতীয়ত نسيء শব্দের অর্থ হচ্ছে এই যে, যেহেতু জীবিকা নির্বাহের কোন সঠিক পথ ও পদ্ধতি ছিল না তাই তারা প্রধানত লুটতরাজ ও রাহাজানির মাধ্যমে তাদের জীবিকা নির্বাহ করত। এ কারণেই যিলক্বদ, যিলহ ও মুহররম এ তিন মাস যুদ্ধ- বিগ্রহ বন্ধ রাখা তাদের জ খুবই কঠিন ছিল। তাই মুহররম মাসে যুদ্ধ করা এবং তৎপরিবর্তে সফর মাসে যুদ্ধ বন্ধ রাখার অনুমতি দেয়ার জ কখনো কখনো তারা পবিত্র কাবার দায়িত্বশীলদের কাছে আবেদন করত। نسيء শব্দের অর্থও ঠিক এটিই। আর মুহররম ব্যতীত অ কোন মাসের ক্ষেত্রে কখনই نسيء ছিল না। তাই এ ব্যাপারে স্বয়ং আয়াতটিতেও ইি ত রয়েছে : يُحلّونه عاما و يحرّمونه عاما "তারা এক বছর যুদ্ধ হালাল করত এবং আরেক বছর যুদ্ধ হারাম করত।"

আমরা মনে করি সমস্যা সমাধানের পথ হচ্ছে এই যে, আরবগণ বছরের দু'টি সময়- একটি যিলহ মাসে ও একটি রজব মাসে- হ করত। এমতাবস্থায় হযরত আমেনা হে র মাসে অথবা তাশরীকের দিবসগুলোতে রাসূলে খোদা (সা.)- এর নূর গর্ভে ধারণ করেছিলেন- এর উদ্দেশ্য সম্ভবত রজব মাসও হতে পারে। মহানবী (সা.) যদি ১৭ রবিউল আউয়াল জন্মগ্রহণ করে থাকেন তাহলে গর্ভধারণকাল ৮ মাস ও কয়েকদিন হয়ে থাকবে।

মহানবী (সা.)- এর নামকরণ

মহানবী (সা.)- এর জন্মগ্রহণের পর সপ্তম দিবস উপস্থিত হলো। আবদুল মুত্তালিব মহান আল্লাহ্‌র দরবারে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার জ   একটি দুম্বা যবেহ করলেন। মহানবীর নাম রাখার জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠানে সকল কুরাইশ নিমন্ত্রণ পেয়েছিলেন। দাদা আবদুল মুত্তালিব তাঁর নাম 'মুহাম্মদ ' রাখলেন। যখন তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো, "আপনি কেন আপনার নাতির নাম 'মুহাম্মদ ' রাখলেন, অথচ আরবদের মধ্যে এ নামটি অত্যন্ত বিরল?" তখন তিনি বললেন, "আমি চেয়েছিলাম যে, সে আকাশ ও পৃথিবীতে প্রশংসিত হোক।" এ সম্পর্কে কবি হাসসান ইবনে সাবিত লিখেছেন :

فشـــــق لـــــه مـــــن اسمـــــه ليبجلـــــه　　　فـــذو العـــرش محمـــود و هـــذا محمّـــد

"নবীর সম্মান ও মর্যাদার জ   ষ্টা তাঁর নিজ নাম থেকে তাঁর (নবীর) নাম নিষ্পন্ন করেছেন; তাই আরশের অধিপতি (মহান আল্লাহ্) মাহমুদ (প্রশংসিত) এবং ইনি (তাঁর নবী) মুহাম্মদ (অর্থাৎ প্রশংসিত)।"

আর এ দু'টি শব্দই (মাহমুদ ও মুহাম্মদ) একই উৎসমূল (হাম্দ) থেকে উৎসারিত এবং উক্ত শব্দদ্বয়ের অর্থও একই। নিঃসন্দেহে এ নাম চয়ন করার ক্ষেত্রে ঐশী অনুপ্রেরণা কাজ করেছে। কারণ মুহাম্মদ নামটি যদিও আরবদের মধ্যে প্রসিদ্ধ ছিল, কিন্তু সে সময় খুব অল্পসংখ্যক ব্যক্তির নামই মুহাম্মদ রাখা হয়েছিল। কতিপয় ঐতিহাসিক যে সূক্ষ্ম পরিসংখ্যান দিয়েছেন তদনুযায়ী ঐ দিন পর্যন্ত সমগ্র আরবে কেবল ১৬ ব্যক্তির নাম 'মুহাম্মদ ' রাখা হয়েছিল। তাই এতৎসংক্রান্ত কবির উক্তি প্রণিধানযোগ্য :

أنّ الّـــــذين سمـــــوا باســـــم محمّـــــد　　　مـــن قبـــل خـــير النّـــاس ضـــعف ثمـــان

“মহানবীর আগে যাদের নাম মুহাম্মদ রাখা হয়েছিল তাদের সংখ্যা ছিল ৮- এর দ্বিগুণ অর্থাৎ ষোল।”[১৩২]

বলার আর অপেক্ষা রাখে না যে, একটি শব্দের বাস্তব নমুনা যত কম হবে এতে ভুলভ্রান্তিও তত কমে যাবে। আর যেহেতু পূর্ববর্তী আসমানী গ্রন্থসমূহ তাঁর নাম, চিহ্ন এবং আত্মিক ও দৈহিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ভবি দ্বাণী করেছিল তাই মহানবীর শনাক্তকারী নিদর্শন অবশ্যই এতটা উজ্জ্বল হতে হবে যে, তাতে কোন ভুলভ্রান্তির অবকাশই থাকবে না। তাঁর অ তম নিদর্শন তাঁর নাম। এ নামের বাস্তব নমুনা অর্থাৎ যাদের নাম মুহাম্মদ বাস্তবে তাদের সংখ্যা এতটা কম হবে যে, ব্যক্তি মহানবীকে শনাক্ত করার ক্ষেত্রে কোন ধরনের সন্দেহ আর বিদ্যমান থাকবে না। বিশেষ করে যখন তাঁর পবিত্র নামের সাথে তাঁর যাবতীয় বৈশিষ্ট্য সংযোজিত হবে। এমতাবস্থায় তাওরাত ও ইঞ্জিলে যে ব্যক্তির আবির্ভাব সম্পর্কে ভবি দ্বাণী করা হয়েছে তাকে খুব স্বচ্ছ ও স্পষ্টভাবে শনাক্ত করা সম্ভব হবে।

প্রাচ্যবিদদের ভুলভ্রান্তি

পবিত্র কোরআন মহানবী (সা.)- কে দু’বা ততোধিক নামে পরিচিত করিয়েছে।[১৩৩] সূরা আলে ইমরান, সূরা মুহাম্মদ, সূরা ফাতহ ও সূরা আহযাবের ১৩৮, ২, ২৯ ও ৪০ নং আয়াতে তাঁকে ‘মুহাম্মদ ’ নামে এবং সূরা সাফের ৬ নং আয়াতে তাঁকে ‘আহমদ ’ নামে অভিহিত করা হয়েছে। তাঁর এ দু’নাম থাকার কারণ হচ্ছে এই যে, মহানবীর মা হযরত আমেনা দাদা আবদুল মুত্তালিবের আগেই তাঁর নাম ‘আহমদ ’ রেখেছিলেন। আর এ বিষয়টি ইতিহাসেও উল্লিখিত হয়েছে।[১৩৪] অতএব, কতিপয় প্রাচ্যবিদ যে দাবি করেছেন, সূরা সফের ৬ নং আয়াতে পবিত্র কোরআনের স্পষ্ট উক্তি অনুযায়ী ইঞ্জিল শরীফ যে নবীর আবির্ভাবের সুসংবাদ দিয়েছে তাঁর নাম আহমদ, তিনি মুহাম্মদ নন; আর মুসলমানগণ যে ব্যক্তিকে তাদের নিজেদের নেতা বলে বি াস করে তিনি মুহাম্মদ, তিনি আহমদ নন ” - তাঁদের এ দাবি সর্বৈব ভিত্তিহীন। কারণ পবিত্র কোরআন আমাদের নবীকে ‘আহমদ ’ নামেও পরিচিত করিয়েছে এবং কতিপয় স্থানে তাঁকে ‘মুহাম্মদ ’ নামে অভিহিত করেছে। যদি এ নবীর নাম সুনির্দিষ্টভাবে নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে তাঁদের দলিল পবিত্র

কোরআনই হয়ে থাকে (আর এ ক্ষেত্রে প্রকৃত ব্যাপার ঠিক এটিই) তাহলে এ ক্ষেত্রে বলতে হয়, পবিত্র কোরআন তাঁকে এ দু'টি নামেই অভিহিত করেছে অর্থাৎ একস্থানে তাঁকে 'মুহাম্মদ ' এবং অ স্থানে 'আহমদ ' নামে অভিহিত করেছে। এ আপত্তিটির মূলোৎপাটন করার জ আমরা নিচে আরো বেশি ব্যাখ্যা দেব।

আহমদ মহানবী (সা.)- **এর নামসমূহের একটি**

মহানবী (সা.)- এর জীবনেতিহাস সম্পর্কে যাঁদের সংক্ষিপ্ত তথ্য ও জ্ঞান রয়েছে তাঁরা জানেন যে, হযরত মুহাম্মদ (সা.) শৈশব ও বাল্যকাল থেকেই 'আহমদ ' ও 'মুহাম্মদ ' এ দু'নামে পরিচিত ছিলেন। জনগণের কাছে তিনি এ দু'নামে পরিচিত ও প্রসিদ্ধ ছিলেন। দাদা আবদুল মুত্তালিব তাঁর জ 'মুহাম্মদ ' এবং তাঁর মা আমেনা 'আহমদ ' নামটি মনোনীত করেছিলেন। এ বিষয়টি ইসলামের ইতিহাসের অকাট্য বিষয়াদির অন্তর্ভুক্ত এবং সকল সীরাত রচয়িতা এ বিষয়টি বর্ণনা করেছেন এবং এতৎসংক্রান্ত বিশদ বর্ণনা সীরাতে হালাবীতে রয়েছে যা পাঠকবর্গ পড়ে দেখতে পারেন।[১৩৫]

দাদা আবদুল মুত্তালিবের মৃত্যুর পর পিতৃব্য আবু তালিব হযরত মুহাম্মদ (সা.)- এর লালন-পালনের দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। তিনি বর্ণনাধিক ভালোবাসা, মমতা ও স্নেহ দিয়ে পুরো ৪২ বছর মহানবীর পবিত্র অস্তিত্ব প্রদীপের চারদিকে পতঙ্গের মতো লেগে থেকেছেন। তিনি মহানবীর প্রাণ রক্ষা করার জ তাঁর নিজ জান- মাল উৎসর্গ করতে কু াবোধ করেন নি। তিনি তাঁর ভাতিজা মহানবীর শানে যে কবিতা আবৃত্তি করেছেন তাতে তিনি কখনো তাঁকে 'মুহাম্মদ ' নামে আবার কখনো 'আহমদ ' নামে অভিহিত করেছেন। আর সে সাথে এ বিষয়টি থেকে প্রতীয়মান হয়ে যায় যে, তখন থেকেই 'আহমদ ' নামটি তাঁর অ তম প্রসিদ্ধ নাম হিসাবেই প্রচলিত ছিল।

এখন আমরা নিচে নমুনাস্বরূপ আরো কতিপয় পঙ্ক্তির উদ্ধৃতি দেব যেগুলোতে তিনি মহানবী (সা.)- কে 'আহমদ ' নামে অভিহিত করেছিলেন।

إن يكـــن مـــا أتـــى بـــه أحمـــد اليـــوم   ســـــناء و كـــــان في الحشـــــر دينـــــا

“ আজ আহমদ যা আনয়ন করেছেন তা আসলে নূর (আলো) এবং কিয়ামত দিবসের পুরস্কার। ”

و قوله لأحمد أنت أمرء   خلوف الحديث ضعيف النسب

“ শত্রুরা বলছে : আহমদের বাণী ও কথাগুলো নিরর্থক এবং সে নিম্নবংশীয় অর্থাৎ দুর্বল বংশমর্যাদার অধিকারী। ”

و ان كان أحمد قد جاء هم   بحق و لم يأتهم بالكذب

“ নিঃসন্দেহে আহমদ তাদের কাছে সত্যধর্ম সহকারে এসেছেন, তিনি কোন মিথ্যা ধর্ম নিয়ে আসেন নি। ”

ارادو قتل أحمد ظالموه   و ليس بقتلهم فيهم زعيم

“ যারা আহমদের ওপর জুলুম করেছে তারা চেয়েছিল তাঁকে হত্যা করতে, কিন্তু এ কাজে তাদের নেতৃত্ব দেয়ার মতো কেউ ছিল না। ”

ইতিহাস ও হাদীসশাস্ত্রের গবেষক, পণ্ডিত ও আলেমগণ যে সব কবিতা আবু তালিবের সাথে সম্পর্কিত বলে উল্লেখ করেছেন সেগুলোতে তিনি তাঁর ভাতিজা মহানবী (সা.)- কে ‘আহমদ ’ নামে অভিহিত করেছেন। যা কিছু এখন আমরা বর্ণনা করেছি তার সব কিছুই আমরা তাঁর দিওয়ান (কাব্যসমগ্র)- এর ১৯, ২৫ ও ২৯ পৃষ্ঠা হতে নিয়েছি। এ ব্যাপারে আগ্রহী পাঠকবর্গকে আমরা নিম্নোক্ত দু’টি গ্রন্থ অধ্যয়ন করার অনুরোধ করছি। গ্রন্থদ্বয় হলো :

১. আহমাদ, মওউদুল ইঞ্জিল (ইঞ্জিলের প্রতিশ্রুত নবী আহমদ), পৃ. ১০১- ১০৭;

২. মাফাহীমুল কোরআন।

মহানবীর স্তন্যপানের সময়কাল

নবজাতক শিশু মুহাম্মদ (সা.) কেবল তিনদিন মাতৃস্ত পান করেছিলেন। এরপর দু'জন মহিলা মহানবীর স্ত দানকারিণী দাই মা হওয়ার গৌরব লাভ করেছিলেন। তাঁরা হলেন :

১. আবু লাহাবের দাসী সাভীবাহ্ : তিনি তাঁকে চার মাস স্ত দান করেছিলেন। তাঁর এ কাজের জ জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত মহানবী (সা.) ও তাঁর স্ত্রী হযরত খাদীজাহ্ তাঁর প্রশংসা ও তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন।

তিনি পূর্বে মহানবীর চাচা হযরত হামযাকেও স্ত দান করেছিলেন। নবুওয়াতের দায়িত্বপ্রাপ্ত হওয়ার পর মহানবী (সা.) আবু লাহাবের কাছ থেকে তাঁকে ক্রয় করার জ এক ব্যক্তিকে পাঠিয়েছিলেন, কিন্তু আবু লাহাব তাঁকে বিক্রয় করতে সম্মত হয় নি। কিন্তু মহানবী তাঁকে তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত সাহায্য করেছেন। মহানবী যখন খাইবার যুদ্ধ থেকে মদীনায় প্রত্যাবর্তন করছিলেন তখন তিনি সাভীবার মৃত্যু সংবাদ পান এবং তাঁর পবিত্র মুখমণ্ডলে গভীর শোক ও বেদনার চিহ্ন ফুটে ওঠে। তিনি সওবিয়ার সন্তান সম্পর্কে খোঁজ- খবর নেয়ার চেষ্টা করলেন যাতে করে তাঁর ব্যাপারে তিনি ইহসান করতে পারেন। কিন্তু তিনি জানতে পারলেন যে, সেও তার মায়ের আগে মৃত্যুবরণ করেছে।[১৩৬]

২. হালীমাহ্ বিনতে আবি যূইযাব : তিনি ছিলেন সা'দ বিন বকর বিন হাওয়াযিন গোত্রীয়। তাঁর সন্তানদের নাম ছিল আবদুল্লাহ্, আনীসাহ্ ও শাইমা; তাঁর সর্বকনিষ্ঠ সন্তান মহানবীর সেবা- যত্ন করেছে। আরবের সম্ভ্রান্ত পরিবারবর্গের প্রথা ছিল তারা তাদের নবজাতক সন্তানদের ধাত্রী মায়েদের কাছে অর্পণ করত। এ সব দাই সাধারণত শহরের বাইরে বসবাস করত। যাতে করে মরুর নির্মল মুক্ত হাওয়া ও পরিবেশে কুরাইশদের নবজাতক শিশুরা সুষ্ঠুভাবে প্রতিপালিত হয় ও সুস্থ- সবলভাবে বেড়ে ওঠে এবং তাদের অস্থি দৃঢ় ও শক্তিশালী হয়, শহরের বিভিন্ন সংক্রামক ব্যাধি ও কলেরা যা নবজাতক শিশুদের জ ছিল সবচেয়ে বিপজ্জনক তা থেকে নিরাপদ থাকে সেজ কুরাইশরা তাদের নবজাতক সন্তানদের ঐ সব দাইয়ের হাতে তুলে দিত। কুরাইশ

নবজাতকগণ দাই মায়েদের কাছে (আরব গোত্রসমূহের মাঝে প্রতিপালিত হওয়ার কারণে) বিশুদ্ধ আরবী ভাষা রপ্ত করে ফেলত। বনি সা'দ গোত্রের দাইগণ এ ক্ষেত্রে খুবই খ্যাতি লাভ করেছিল। তারা নির্দিষ্ট সময় অন্তর পবিত্র মক্কায় আসত এবং কোন নবজাতককে পেলেই নিজেদের সাথে নিয়ে যেত।

হযরত মুহাম্মদ (সা.) জন্মগ্রহণ করার ৪ মাস পরে বনি সা'দের দাইগণ মক্কায় আসে এবং ঐ সময় ভয় র দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল বলেই তারা সম্ভ্রান্ত বংশীয়দের সাহায্যের প্রতি আগের চেয়ে বেশি মুখাপেক্ষী হয়ে পড়েছিল।

কিছুসংখ্যক ঐতিহাসিক বলেন : কোন দাই হযরত মুহাম্মদকে দুধ দিতে রাজী হয় নি। তারা ইয়াতিম নয় এমন শিশুদের অগ্রাধিকার দিচ্ছিল। কারণ ঐ সব শিশুর পিতারা দাইদের বেশি সাহায্য করতে পারবে। তাই তারা অনাথ শিশুদের নিতে চাইত না, এমনকি হালীমাও নবজাতক হযরত মুহাম্মদকে নিয়ে যেতে অস্বীকার করেছিলেন। তবে তিনি শারীরিকভাবে দুর্বল ছিলেন বলে কোন ব্যক্তিই তাঁর কাছে নিজ সন্তান অর্পণ করে নি। তিনি আবদুল মুত্তালিবের নাতিকেই অবশেষে গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। হালীমাহ্ তাঁর স্বামীকে বলেছিলেন, "চল, খালি হাতে বাসায় না ফিরে এ অনাথ শিশুকেই গ্রহণ করি। আশা করা যায় যে, মহান আল্লাহর দয়া আমাদেরকেও শামিল করবে।" ঘটনাচক্রে তাঁর অনুমানই সত্য হলো। যে সময় থেকে তিনি অনাথ শিশু মহানবীর লালন- পালনের দায়িত্ব নিলেন সেদিন থেকেই মহান আল্লাহর কৃপা ও অনুগ্রহ তাঁর জীবনকে ঘিরে রেখেছিল।[১৩৭]

এ ঐতিহাসিক বর্ণনাটির প্রথম অংশ কাল্পনিক উপাখ্যান ব্যতীত আর কিছুই নয়। কারণ বনি হাশিম বংশের সুমহান মর্যাদা এবং আবদুল মুত্তালিব- যাঁর দানশীলতা, পরোপকার এবং অভাবী- বিপদগ্রস্তদের সাহায্য প্রদানের বিষয়টি আপামর জনতার মুখে মুখে ফিরত তাঁর মতো ব্যক্তিত্বের কারণে দাইগণ তো নবজাতক শিশু মুহাম্মদকে লালন- পালনের জ গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকবেই না, বরং তাঁকে নেয়ার জ তাদের মধ্যে তীব্র প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে যাওয়ার কথা। এ কারণেই উপরিউক্ত ঐতিহাসিক বর্ণনার এ অংশ উপাখ্যান ব্যতীত আর কিছুই নয়।

অ   দাইয়ের কাছে হযরত মুহাম্মদ (সা.)- কে না দেয়ার কারণ ছিল তিনি স্ত দানকারী কোন মহিলার স্তন মুখেই দিচ্ছিলেন না। অবশেষে হালীমাহ্ সাদীয়াহ্ এলে তিনি তাঁর স্তন মুখে দিয়েছিলেন। তাই তখন আবদুল মুত্তালিবের পরিবারে আনন্দের ব া বয়ে গিয়েছিল।[১৩৮]

আবদুল মুত্তালিব হালীমার দিকে তাকিয়ে বললেন, "তুমি কোন্ গোত্রের?" তিনি বললেন, "আমি বনি সা'দ গোত্রের।" আবদুল মুত্তালিব বললেন, "তোমার নাম কি?" তিনি উত্তরে বললেন, "হালীমাহ্।" আবদুল মুত্তালিব হালীমার নাম ও গোত্রের নাম শুনে অত্যন্ত খুশী হলেন এবং বললেন, بخّ بخّ سعد و حلم. خصلتان فيهما خير الدهر و عز الأبد يا حليمة "বাহবা, বাহবা! হে হালীমাহ্ ! দু'টি যথাযথ ও সুন্দর গুণ; একটি সৌভাগ্য [সাআদাত (سعادت)- যা থেকে হালীমার গোত্রের নাম বনি সা'দ- এর উৎপত্তি)] এবং অপরটি ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা [হিলমুন (حلم)- যা থেকে হালীমাহ্ নামের উৎপত্তি)] যেগুলোর মধ্যে রয়েছে যুগের কল্যাণ এবং চিরস্থায়ী সম্মান ও মর্যাদা।"[১৩৯]"

ষষ্ঠ অধ্যায় : মহানবী) সা -(.এর শৈশবকাল

ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, ইসলাম ও মুসলমানদের মহান নেতা হযরত মুহাম্মদ (সা.)- এর সমগ্র জীবনটাই- শৈশবের শুরু থেকে যে দিন তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে নবুওয়াতপ্রাপ্ত হয়েছিলেন সেই দিন পর্যন্ত আশ্চর্যজনক ঘটনাসমূহের সমন্বয়ে গঠিত। আর এ সব আশ্চর্যজনক ঘটনা অলৌকিকত্বের প্রমাণ বহন করে। এ সব কিছু থেকে প্রতীয়মান হয় যে, মহানবী (সা.)- এর জীবন ছিল একটি অসাধারণ জীবন।

মহানবীর এ সব অলৌকিক ঘটনা ব্যাখ্যা করার ক্ষেত্রে সীরাত রচয়িতাগণ দু'ধরনের দৃষ্টিভি পোষণ করেছেন :

১ .**বস্তুবাদী ও কতিপয় প্রাচ্যবিদের দৃষ্টিভঙ্গি**: বস্তুবাদী বৈজ্ঞানিকগণ বস্তুবাদী ভূয়োদর্শন পোষণ করেন এবং অস্তিত্বকে কেবল বস্তুর মধ্যেই সীমাবদ্ধ বলে মনে করেন। তাঁরা সকল প্রপঞ্চ ও ঘটনাকে বস্তুগত প্রপঞ্চ ও ঘটনা বলে বি াস করেন এবং প্রতিটি ঘটনা ও প্রপঞ্চেরই প্রাকৃতিক (বস্তুগত) কারণ নির্ধারণ করেন। তাঁরা এ সব অলৌকিক ঘটনা ও প্রপঞ্চের প্রতি মোটেও গুরুত্ব দেন না। কারণ বস্তুবাদী নীতিমালা অনুসারে এ ধরনের ঘটনা ও প্রপঞ্চের উৎপত্তি অসম্ভব; আর ইতিহাসের পাতায় পাতায় এ ধরনের ঘটনা প্রত্যক্ষ করলেই তাঁরা এগুলোকে ধর্মের অনুসারীদের কল্পনা এবং ভক্তি- ভালোবাসাপ্রসূত বলে বিবেচনা করেন।

একদল প্রাচ্যবিদ যাঁরা নিজেদেরকে বাহ্যত তাওহীদবাদী ও খোদায় বি াসী বলে অভিহিত করেন এবং অতি প্রাকৃতিক (আধ্যাত্মিক) জগতের অস্তিত্বেও বি াস করেন, কিন্তু তাঁদের ঈমানী দুর্বলতা ও জ্ঞানগত গর্ব এবং তাঁদের চিন্তা- চেতনা ও ধ্যান- ধারণার ওপর বস্তুবাদিতার প্রাধা থাকার কারণে ঘটনা বিশ্লেষণ করার সময় তাঁরা বস্তুবাদী মূলনীতিসমূহের অনুসরণ করেন। আমরা বারবার তাঁদের বক্তব্য ও আলোচনার মধ্যে এ সব বাক্য লক্ষ্য করেছি যে, 'নবুওয়াত আসলে এক ধরনের মানবীয় প্রতিভা', 'নবী হচ্ছেন একজন সামাজিক প্রতিভাবান ব্যক্তিত্ব যিনি তাঁর নিজের আলোকিত চিন্তাধারা দিয়ে মানব জীবনের গতিধারা ও পথকে আলোকিত করেন ' . . . ।

প্রাচ্যবিদদের এ ধরনের বক্তব্য আসলে বস্তুবাদী চিন্তাধারা ও দৃষ্টিভি থেকে উদ্ভূত যা সকল ধর্মকে মানব চিন্তা ও কল্পনাপ্রসূত বলে বিবেচনা করে। অথচ আস্তিক জ্ঞানী ও পণ্ডিত ব্যক্তিগণ সাধারণ নবুওয়াত সংক্রান্ত আলোচনায় প্রমাণ করেছেন যে, নবুওয়াত মহান আল্লাহর ঐশী দান ও অনুগ্রহ যা সকল আধ্যাত্মিক অনুপ্রেরণা (ইলহাম) ও যোগাযোগের উৎস। মহান নবীদের পরিকল্পনাসমূহ, তাঁদের চিন্তা, ধারণা ও প্রতিভা প্রসূত নয়; বরং অবস্তুগত আধ্যাত্মিকজগৎ থেকে প্রেরিত ইলহাম ও প্রত্যাদেশ ব্যতীত তাঁদের এ সব পরিকল্পনা ও কর্মসূচীর আর কোন উৎসমূল নেই। কিন্তু যখন ি ষ্ট ধর্মাবলম্বী প্রাচ্যবিদগণ বস্তুবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে এ সব বিষয়ে দৃকপাত করেন এবং সমস্ত ঘটনা ও প্রপঞ্চকে পরীক্ষা- নিরীক্ষা ও অভিজ্ঞতালব্ধ বৈজ্ঞানিক মূলনীতি ও সূত্রের আলোকে পরিমাপ করেন তখন যে সব ঘটনা ও প্রপঞ্চের অলৌকিকত্বের দিক রয়েছে অর্থাৎ মুজিযা সেগুলোর কঠোর সমালোচনা করেন এবং মূল থেকে সেগুলো অস্বীকার করেন।

২ .**স্রষ্টা পূজারিগণ** : ঐ সব ব্যক্তি মহান আল্লাহর উপাসনাকারী যারা বি াস করে যে, বস্তুজগতের বৈশিষ্ট্য ও চিহ্নসমূহ অ জগতের পরিচালনাধীন এবং অতি প্রাকৃতিক অবস্তুগতজগৎ এ প্রাকৃতিক ও বস্তুগত বি ের সার্বিক শৃঙ্খলা ও ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করছে। অ ভাবে বলা যায়, বস্তুজগৎ স্বাধীন ও সার্বভৌম নয়। সকল ব্যবস্থা এবং এগুলোর প্রাকৃতিক ও বৈজ্ঞানিক সূত্র উচ্চতর অস্তিত্বময় সত্তাসমূহ, বিশেষ করে মহান আল্লাহর ইচ্ছার সৃষ্টি। মহান আল্লাহ্ বস্তুর অস্তিত্ব প্রদান করেছেন। তিনি বস্তুর বিভিন্ন অংশের মাঝে কতগুলো সুষ্ঠু নিয়ম প্রবর্তন করেছেন এবং বস্তুর অস্তিত্বের স্থায়িত্বকে কতগুলো প্রাকৃতিক নিয়মের ওপর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

যদিও এই গোষ্ঠী বৈজ্ঞানিক নিয়ম- কানুন ও সূত্রসমূহের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে এবং প্রাকৃতিক বস্তুনিচয়ের মধ্যকার সম্পর্কসমূহ যেগুলো বিজ্ঞান কর্তৃক সমর্থিত ও স্বীকৃত হয়েছে সে সব ব্যাপারে বৈজ্ঞানিকদের বক্তব্যও আন্তরিকভাবে মেনে নিয়েছে, তারপরও তারা বি াস করে যে, এ ধরনের প্রাকৃতিক নিয়মাবলী ধ্রুব নয়। তারা বি াস করে যে, শ্রেষ্ঠ ও উচ্চতর জগৎ (যা বস্তুজগৎ থেকে উন্নত ও শ্রেষ্ঠ) যখনই চাইবে ঠিক তখনই কতিপয় মহান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করার

জ   প্রাকৃতিক নিয়ম- কানুনের প্রয়োগ ও রেওয়াজের পথ পরিবর্তন করে দিতে সক্ষম; শুধু তা- ই নয় বরং কতিপয় ক্ষেত্রে উচ্চতর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করার জ   তা
বাস্তবে কার্যকরও করেছে।

অ   ভাবে বলতে গেলে অলৌকিক কাজসমূহ আসলে কারণহীন নয়; তবে এগুলোর সাধারণ প্রাকৃতিক কারণ নেই; আর স্বাভাবিক প্রাকৃতিক কারণ না থাকা কারণের অনস্তিত্ব নির্দেশ করে না। সৃষ্টিজগতের নিয়ম, সূত্র ও বিধানসমূহও এমন নয় যে, সেগুলো মহান   ষ্টার ইচ্ছায় পরিবর্তিত হয় না।

তারা বলে যে, মহান নবিগণের অলৌকিক ও আশ্চর্যজনক কার্যাবলী যা স্বাভাবিক প্রাকৃতিক নিয়ম- কানুনের সীমারেখার বাইরে, সেগুলো এ পথেই (স্বাভাবিক প্রাকৃতিক নিয়মে) সংঘটিত ও বাস্তবায়িত হয়। এ গোষ্ঠীটি অতি প্রাকৃতিক কার্যসমূহ (মুজিযা ও কারামত) যেগুলো পবিত্র কোরআন ও হাদীসসমূহে অথবা বিশুদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য ইতিহাসে বর্ণিত হয়েছে তা স্বাভাবিক বৈজ্ঞানিক ও প্রাকৃতিক নিয়ম- কানুনের সাথে খাপ খায় না বলে প্রত্যাখ্যান করেছে বা এ সব ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করেছে।

এখন আমরা মহানবী (সা.)- এর শৈশবকালের আশ্চর্যজনক ও রহস্যময় ঘটনাবলী উল্লেখ করব। এ বক্তব্য ও ব্যাখ্যাটি যদি আমরা বিবেচনায় রাখি, তাহলে এ ধরনের ঘটনাবলীর ক্ষেত্রে আমাদের আর কোন সংশয় থাকবে না।

১. ইতিহাস রচয়িতাগণ হালীমার কথা বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, “যখন আমি আমেনার নবজাতক শিশুর (মহানবী) প্রতিপালনের দায়িত্ব গ্রহণ করি তখন তার মায়ের উপস্থিতিতে তাকে স্ত   দান করতে চাইলাম। আমার বাম স্তন যা দুধে পরিপূর্ণ ছিল তা তার মুখে রাখলাম, কিন্তু নবজাতক শিশুটি আমার ডান স্তনের প্রতি যেন বেশি আগ্রহান্বিত ছিল। কিন্তু আমি যে দিন সন্তান প্রসব করেছিলাম সে দিন থেকেই আমার ডান স্তনে দুধ ছিল না। নবজাতক শিশুর পীড়াপীড়িতে আমি আমার দুধবিহীন ডান স্তনটি তার মুখে রাখলাম। তখনই সে তা চুষতে লাগল এবং স্তনের

শুষ্ক দুগ্ধগ্রন্থিগুলো দুধে পরিপূর্ণ হয়ে গেল। এ ঘটনা উপস্থিত সকল ব্যক্তিকে আশ্চর্যান্বিত করেছিল।”[১৪০]

২. তাঁর নিকট থেকে আরো বর্ণিত আছে : “যে দিন আমি শিশু মুহাম্মদকে আমার গৃহে আনলাম সে দিন থেকে আমার ঘরে কল্যাণ ও বরকত দিনের পর দিন বৃদ্ধি পেতে লাগল। আমার সম্পদ ও গবাদিপশুও বৃদ্ধি পেতে লাগল।”[১৪১]

নিশ্চিতভাবে বলতে গেলে বস্তুবাদীরা এবং যারা তাদের মূলনীতি ও বি াসের অনুসরণ করে তারা এ সব বিষয়ে তাওহীদপন্থী ষ্টায় বি াসীদের সাথে দ্বিমত পোষণ করে। বস্তুবাদী নীতিমালা ও দৃষ্টিভ ি র অনুসারীরা যেহেতু এ ধরনের বিষয়াদি প্রকৃতিবিজ্ঞানের আলোকে ব্যাখ্যা করতে অক্ষম সেহেতু তারা তাৎক্ষণিকভাবে বলে যে, এ সব ঘটনা ও বিষয় মানুষের কল্পনাপ্রসূত। যদি তারা খুব ভদ্র ও মার্জিত হয় তাহলে বলে যে, মহানবী এ সব অলৌকিক কাজের মুখাপেক্ষী ছিলেন না। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, তিনি এ সব বিষয়ের মুখাপেক্ষী ছিলেন না। তবে অমুখাপেক্ষিতা একটি বিষয় এবং কোন একটি বিষয় সত্য ও মিথ্যা হওয়ার ব্যাপারে ফায়সালা করা আরেকটি বিষয়। কিন্তু যে ব্যক্তি প্রকৃতিজগতে বিরাজমান ব্যবস্থাকে বি -ব্রহ্মাণ্ডের মহান ষ্টার ইচ্ছাশক্তির পূর্ণ নিয়ন্ত্রণাধীন বলে জানে এবং বি াস করে যে, সবচেয়ে ক্ষুদ্র অস্তিত্ববান সত্তা (পরমাণু) থেকে শুরু করে সর্ববৃহৎ সৃষ্টি (নীহারিকাপুঞ্জ) পর্যন্ত সমগ্র বি -ব্রহ্মাণ্ড তাঁর (ষ্টা) প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হচ্ছে। তাই এ সব ঘটনা যাচাই- বাছাই এবং এগুলোর দলিল প্রমাণিত ও প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরই সে এ সব ঘটনা ও বিষয়ের প্রতি যথার্থ সম্মান প্রদর্শন করে; আর যদি সে এ সব ঘটনা যাচাই- বাছাই এবং এগুলোর দলিল- প্রমাণের ক্ষেত্রে নিশ্চিত হতে না- ও পারে তবুও সে এ সব বিষয় ও ঘটনাকে নিশ্চিতভাবে প্রত্যাখ্যান করে না।

আমরা পবিত্র কোরআনে হযরত ঈসা ইবনে মরিয়মের ক্ষেত্রে এ ধরনের অলৌকিক ঘটনা প্রত্যক্ষ করি। যেমন পবিত্র কোরআনে বর্ণিত হয়েছে : যখন হযরত মরিয়মের সন্তান প্রসবের সময় নিকটবর্তী হলো তখন তিনি একটি খেজুর গাছের কাছে আশ্রয় নিলেন এবং তিনি (তীব্র

ব্যথা, একাকিত্ব ও দুর্নামের ভয়ে) মহান আল্লাহর কাছে মৃত্যু কামনা করলেন। ঐ সময় তিনি একটি আহবান ধ্বনি শুনতে পেলেন :

(لا تحزني قد جعل ربّك تحتك سريّا و هزّي إليك بجذع النّخلة تساقط عليك رطبا جنيّا)

"দুঃখভারাক্রান্ত হয়ো না। তোমার প্রভু তোমার পায়ের তলদেশে পানির ঝরনা প্রবাহিত করেছেন এবং (শুষ্ক) খেজুর গাছটি ঝাঁকি দাও তাহলে তাজা খেজুর তোমার ওপর পতিত হবে।" (সূরা মরিয়ম : ২৪- ২৫)

আমরা পবিত্র কোরআনে হযরত মরিয়ম সম্পর্কে অ া বিষয়ও জানতে পারি। তাঁর নিষ্পাপ হওয়া ও তাকওয়া তাঁকে এমন এক সুমহান স্থানে উন্নীত করেছিল যে, যখনই হযরত যাকারিয়া (আ.) হযরত মরিয়মের ইবাদাত- বন্দেগী করার স্থানে প্রবেশ করতেন তখনই তিনি তাঁর কাছে বেহেশতের খাবার দেখতে পেতেন। যখন তিনি এ ব্যাপারে তাঁকে জিজ্ঞেস করতেন, "এ রুজী (খাবার) কোথা থেকে এসেছে?" হযরত মরিয়ম তাঁকে জবাবে বলতেন, "মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে।"[১৪২]

অতএব, এ ধরনের অলৌকিক বিষয়ের ক্ষেত্রে সন্দেহ পোষণ করা এবং এগুলো অসম্ভব বলে মনে করা অনুচিত।

মরুভূমিতে পাঁচ বছর

আবদুল মুত্তালিবের অনাথ নাতি মহানবী (সা.) বনি সা'দ গোত্রের মাঝে পাঁচ বছর অতিবাহিত করলেন। এ সময় তিনি ভালোভাবে বেড়ে ওঠেন। এ দীর্ঘ পাঁচ বছর হযরত হালীমাহ্ তাঁকে দু'তিন বার মা আমেনার কাছে এনেছিলেন এবং শেষ বারে তিনি তাঁকে তাঁর মায়ের কাছে অর্পণ করেছিলেন।

দুগ্ধপানকাল শেষ হওয়ার পর বিবি হালীমাহ্ তাঁকে প্রথম বারের মতো পবিত্র মক্কায় এনেছিলেন। জোরাজুরি করে হালীমাহ্ তাঁকে পুনরায় বনি সা'দ গোত্রে ফিরিয়ে নিয়ে যান। ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে জোর করার কারণ ছিল এই যে, এ অনাথ শিশুর উসিলায় তাঁর প্রভূত কল্যাণ ও

বরকত হয়েছিল এবং পবিত্র মক্কা নগরীতে কলেরা রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দেয়ায় হযরত আমেনাও হালীমাহ্‌র অনুরোধ গ্রহণ করেছিলেন।

একদল আবিসিনীয় আলেম একবার হিজাযে এসেছিলেন। তখন তাঁরা বনি সা'দ গোত্রে শিশু মহানবীকে দেখতে পেলেন। তাঁরা দেখতে পেলেন যে, হযরত ঈসা (আ.)- এর পরবর্তী নবীর নিদর্শনাদি যা আসমানী গ্রন্থসমূহে বর্ণিত আছে তা এ শিশুটির সাথে মিলে যাচ্ছে। এ কারণে তাঁরা সিদ্ধান্ত নিলেন যে, যেভাবেই হোক তাঁরা এ শিশুকে অপহরণ করে আবিসিনিয়ায় নিয়ে যাবেন এবং এ হবে তাঁদের গৌরবের বিষয়। তাই এ সব ব্যক্তির হাত থেকে শিশু হযরত মুহাম্মদ (সা.)- কে নিরাপদ রাখার জ বিবি হালীমাহ্ তাঁকে দ্বিতীয় বারের মতো পবিত্র মক্কা নগরীতে নিয়ে আসেন।[১৪৩]

এ ব্যাপারটি মোটেও অসম্ভব ও কাল্পনিক নয়। কারণ পবিত্র কোরআনের স্পষ্ট বক্তব্য অনুসারে মহানবীর নিদর্শনসমূহ ইঞ্জিল শরীফে বর্ণিত হয়েছে। সে সময়ের আসমানী গ্রন্থাদির বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিগণ যে পূর্ববর্তী আসমানী গ্রন্থসমূহে বর্ণিত নিদর্শনসমূহের ভিত্তিতে উক্ত নিদর্শনসমূহের অধিকারী ব্যক্তিকে শনাক্ত করতে পেরেছিলেন এতে কোন সন্দেহ নেই। পবিত্র কোরআনে বর্ণিত হয়েছে :

(و إذا قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إنّي رسول الله إليكم مصدّقا لما بين يديّ من التّوراة و مبشّرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد فلمّا جاءهم بالبيّنات قالوا هذا سحر مبين)

"আর স্মরণ করুন তখনকার কথা যখন ঈসা ইবনে মরিয়ম (বনি ইসরাইলকে) বলেছিল : নিশ্চয়ই আমি তোমাদের কাছে মহান আল্লাহর রাসূল। আমার সামনে বিদ্যমান আসমানী গ্রন্থ তাওরাতের সত্যায়নকারী এবং আমি তোমাদেরকে আমার পরে যে রাসূল আগমন করবে তার সুসংবাদ প্রদান করছি। উক্ত রাসূলের নাম হবে আহমাদ। অতঃপর সেই (প্রতিশ্রুত) রাসূল তাদের কাছে (নিদর্শন ও মুজিযাসহ) আগমন করল। তখন তারা বলল : এ (এ সব মুজিযা ও পবিত্র কোরআন) তো স্পষ্ট যাদু।" (সূরা সাফ : ৬)

এতৎসংক্রান্ত আরো ব   আয়াত রয়েছে যা থেকে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)- এর চিহ্ন ও নিদর্শনাদি পূর্ববর্তী আসমানী গ্রন্থসমূহে স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে এবং পূর্ববর্তী নবীদের উম্মতগণ এ ব্যাপারে অবগত ছিল।[১৪৪]

সপ্তম অধ্যায় : মাতৃক্রোড়ে প্রত্যাবর্তন

মহান আল্লাহ্ প্রত্যেক ব্যক্তিকে কোন না কোন দায়িত্ব পালনের জ   সৃষ্টি করেছেন। কাউকে জ্ঞানার্জনের জ , কাউকে আবিষ্কার ও উদ্ভাবন করার জ , আবার কাউকে কর্ম ও পরিশ্রম করার জ , কোন কোন মানুষকে পরিচালনা ও নেতৃত্ব দান করার জ , আবার কিছু সংখ্যক মানুষকে শিক্ষা- প্রশিক্ষণ কার্য সম্পাদন করার জ   এবং এভাবে তিনি বিভিন্ন মানুষকে জগতের বিভিন্ন কার্য সম্পাদন করার জ   সৃষ্টি করেছেন।

আন্তরিক ও দয়বান প্রশিক্ষকগণ যাঁরা ব্যক্তি ও সমাজের উন্নতি কামনা করেন তাঁরা কোন কাজের জ   কোন ব্যক্তিকে নিযুক্ত করার আগেই তার অভিরুচি পরীক্ষা ও যাচাই- বাছাই করে থাকেন। আর যে ব্যক্তির যে কাজের প্রতি ঝোঁক এবং সামর্থ্য রয়েছে তাঁরা তাকে কেবল সেই কাজেরই দায়িত্ব দেন। কারণ এর অ থা হলে সমাজের দু'টি ভয় র ক্ষতি হতে পারে :

ক. যে কাজ ঐ ব্যক্তি সম্পন্ন করতে পারত তা সে সম্পন্ন করতে পারবে না এবং

খ .যে কাজ সে আঞ্জাম দিয়েছে তা নিষ্ফল হতে বাধ্য।

বলা হয় যে, প্রতিটি রহস্যে একটি আনন্দ ও উদ্দীপনা আছে। ঐ ব্যক্তি সৌভাগ্যবান যে তার নিজ আনন্দ ও উদ্দীপনা উপলব্ধি করে।

এক শিক্ষক তাঁর এক অলস ছাত্রকে উপদেশ প্রদান করতেন এবং আলস্যের অনিষ্ট এবং যে সব ব্যক্তি জ্ঞানার্জন করেনি ও নিজেদের জীবনের বসন্তকাল অর্থাৎ যৌবনকে আলস্য ও প্রবৃত্তির পূজায় নিঃশেষ করেছে তাদের জীবনের করুণ পরিণতি সবিস্তারে ব্যাখ্যা করতেন। তিনি দেখতে পেলেন যে, ঐ ছাত্রটি তাঁর কথা শ্রবণরত অবস্থায় মাটির ওপর পড়ে থাকা এক টুকরা কয়লার দিকে তাকিয়ে আছে। তিনি হঠাৎ করে উপলব্ধি করতে পারলেন এ ছেলেটি লেখাপড়া শেখা ও জ্ঞানার্জন করার জ   সৃষ্ট হয়নি; বরং ষ্টা তাকে চিত্রা ন করার মনোবৃত্তি ও রুচি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। এ কারণেই উক্ত শিক্ষক ছাত্রটির পিতা- মাতাকে ডেকে বলেছিলেন, "জ্ঞানার্জন ও লেখা- পড়া শেখার ব্যাপারে আপনাদের সন্তানের আগ্রহ অত্যন্ত কম, কিন্তু চিত্রা ন করার রুচি ও

ঝোঁক তার মধ্যে বেশ ভালোভাবেই আছে এবং এ ব্যাপারে তার স্পৃহা ও আগ্রহ অত্যন্ত আশ্চর্যজনক।” শিক্ষকের পরামর্শ ছাত্রের পিতা-মাতার কাছে মনোঃপুত হলে অতি অল্প দিনের মধ্যে ছাত্রটি চিত্রা ন ও শিল্পকলা বেশ ত আয়ত্ত করে ফেলে এবং এ ক্ষেত্রে সে যুগশ্রেষ্ঠ শিল্পীতে পরিণত হয়।

শৈশবকাল শিশুদের অভিভাবকদের জ সন্তানদের রুচিবোধ ও সামর্থ্য পরীক্ষা এবং তাদের কাজ-কর্ম, আচার-আচরণ, চিন্তা ও ধ্যান-ধারণা থেকে তাদের ব্যক্তিগত অভিরুচি সম্পর্কে ধারণা লাভ করার সবচেয়ে উপযুক্ত সময়। কারণ শিশুর চিন্তা-ভাবনা, কার্যকলাপ এবং মিষ্টি-মধুর কথা-বার্তা আসলে তার যোগ্যতা ও সামর্থ্যরেই আয়নাস্বরূপ। স্মর্তব্য যে, তার সামর্থ্য বিকাশের যাবতীয় পূর্বশর্ত ও ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়ে গেলে তা সর্বোত্তম পন্থায় কাজে লাগানো সম্ভব।

নবুওয়াত ঘোষণা পর্যন্ত হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর জীবনচরিত, আচার-আচরণ ও কার্যকলাপ তাঁর জীবন এবং তাঁর মহৎ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহের পটভূমি আমাদের মানসপটে চিত্রিত করে। তাঁর শৈশবের ইতিহাস অধ্যয়ন ও গভীর চিন্তা-ভাবনা করলে আমরা কেবল তাঁর উজ্জ্বল ভবি ৎ সম্পর্কেই অবগত হব না; বরং যে দিন তাঁর নবুওয়াত ঘোষিত হয়েছিল এবং তিনি নিজেকে সমাজের নেতা ও পথ-প্রদর্শক বলে ঘোষণা করেছিলেন সে দিন পর্যন্ত তাঁর সংক্ষিপ্ত জীবনেতিহাস তাঁর উজ্জ্বল ভবি ৎ সম্পর্কে আমাদের অবগত করে এবং এ থেকে প্রতীয়মান হয়ে যায় যে, এ ব্যক্তি কোন্ কাজের জ সৃষ্ট হয়েছেন? আর তাঁর রিসালাত ও নেতৃত্বের দাবি কি তাঁর জীবন-কাহিনীর সাথে পূর্ণ সামঞ্জস্যশীল? চল্লিশ বছর বয়স পর্যন্ত তাঁর জীবনেতিহাস, তাঁর আচার-আচরণ, চরিত্র, কর্ম, কথা এবং জনগণের সাথে দীর্ঘদিন মেলামেশা তাঁর সত্য নবী ও রাসূল হওয়ার বিষয়টি সমর্থন করে কি?

এ দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা এখানে মহানবীর জীবনের প্রথম দিনগুলো (শৈশব, কৈশোর ও যৌবন) সম্পর্কে আলোচনা করব।

হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর দাই-মা হযরত হালীমাহ্ তাঁকে পাঁচ বছর লালন-পালন করেছিলেন। এ সময় তিনি খাঁটি বলিষ্ঠ আরবী ভাষা রপ্ত করেছিলেন। সে কারণে তিনি পরবর্তীকালে

গৌরববোধ করতেন। পাঁচ বছর পর হযরত হালীমাহ্ তাঁকে পবিত্র মক্কা নগরীতে নিয়ে আসেন। মক্কায় প্রত্যাবর্তন করার পর বেশ কিছুদিন তিনি মাতৃস্নেহ লাভ করেছিলেন এবং এ সময় তিনি দাদা আবদুল মুত্তালিবের তত্ত্বাবধান ও অভিভাবকত্বে লালিত- পালিত হন। হযরত মুহাম্মদ (সা.) ছিলেন মক্কাধিপতি হযরত আবদুল মুত্তালিবের কাছে পুত্র আবদুল্লাহর একমাত্র স্মৃতি।[১৪৫]

ইয়াসরিবে সফর

যে দিন আবদুল মুত্তালিবের পুত্রবধু (আমেনা) তাঁর যুবক স্বামীকে হারালেন সে দিন থেকে তিনি সর্বদা ইয়াসরিব গমন করে স্বামীর কবর যিয়ারত এবং সে সাথে ইয়াসরিবস্থ নিজ আত্মীয়-স্বজনদের সাথে দেখা- সাক্ষাৎ করার উপযুক্ত মুহূর্তের অপেক্ষায় ছিলেন।

তিনি চিন্তা করে দেখলেন যে, একটি সঠিক সুযোগ এসে গেছে এবং তাঁর প্রাণাধিক পুত্রসন্তান (মুহাম্মদ)ও এখন বড় হয়েছে এবং সেও এ পথে তাঁর শোকের অংশীদার হতে পারবে। তাঁরা উম্মে আইমানকে সাথে নিয়ে ইয়াসরিবের উদ্দেশে যাত্রা করেন এবং পূর্ণ এক মাস সেখানে অবস্থান করেন। শিশু মহানবীর জ এ সফর শোক ও বেদনা বয়ে এনেছিল। কারণ প্রথম বারের মতো তাঁর দৃষ্টি যে ঘরে তাঁর পিতা হযরত আবদুল্লাহ্ ইন্তেকাল করেছিলেন এবং চির নিদ্রায় শায়িত হয়েছিলেন সেই ঘরের দিকে নিবদ্ধ হয়েছিল।[১৪৬]

শিশু মহানবীর অন্তরে পিতৃশোক স্তিমিত হতে না হতেই হঠাৎ আরেকটি দয়বিদারক ঘটনা ঘটে গেল। এর ফলে শোক আরো বেড়ে গিয়েছিল। কারণ পবিত্র মক্কায় প্রত্যাবর্তনকালে মহানবীর স্নেহময়ী মা হযরত আমেনা পথিমধ্যে আবওয়া নামক স্থানে ইন্তেকাল করেন।[১৪৭]

এ ঘটনা বনি হাশিম ও আত্মীয়- স্বজনদের মাঝে শিশু মহানবীকে স্নেহভাজন করেছিল এবং তাঁর প্রতি তাদের সহানুভূতি ও মমতাবোধের উদ্ভব ঘটিয়েছিল। তিনি ছিলেন হযরত আবদুল্লাহ্ ও হযরত আমেনার পুষ্পোদ্যানের একমাত্র পুষ্প- তাঁদের পুণ্যস্মৃতি। এ কারণেই শিশু মহানবী দাদা হযরত আবদুল মুত্তালিবের অশেষ ভালোবাসা ও স্নেহ পেয়েছিলেন। তিনি ছিলেন পিতামহের প্রাণাধিক প্রিয় নাতি। আবদুল মুত্তালিব তাঁকে তাঁর সকল সন্তান অপেক্ষা বেশি ভালোবাসতেন। তিনি সকলের ওপর তাঁকেই অগ্রাধিকার প্রদান করতেন।

কাবার চারদিকে কুরাইশপ্রধান আবদুল মুত্তালিবের জ কার্পেট বিছানো হতো। কুরাইশ নেতৃবৃন্দ এবং তাঁর সন্তানগণ তাঁর কার্পেটের চারপাশে বসত। আবদুল্লাহর কথা স্মরণ হলেই তিনি (আবদুল

মুত্তালিব) যে কার্পেটের ওপর উপবিষ্ট থাকতেন সে কার্পেটে প্রয়াত পুত্র আবদুল্লাহর একমাত্র স্মৃতি- চিহ্ন শিশু হযরত মুহাম্মদকে এনে তাঁর পাশে বসানোর নির্দেশ দিতেন।[১৪৮]

পবিত্র কোরআনের সূরা দোহায় মহানবী (সা.)- এর শৈশব ও ইয়াতিম অবস্থার কথা উল্লিখিত হয়েছে। পবিত্র কোরআনে মহান আল্লাহ্ বলেছেন,

(أ لم يجدك يتيما فآوى)

"তিনি কি আপনাকে ইয়াতিম পাওয়ার পর (প্রথমে পিতামহ আবদুল মুত্তালিব ও পরে পিতৃব্য হযরত আবু তালিবের) আশ্রয় দেন নি?" (সূরা দোহা : ৬)

মহানবীর ইয়াতিম হওয়ার অন্তর্নিহিত মূল রহস্য আমাদের কাছে খুব একটা স্পষ্ট নয়। তবে আমরা এতটুকু জানি যে, ঘটনাসমূহ যা সংঘটিত হয়েছে তা প্রজ্ঞাবিহীন নয়। এতদসত্ত্বেও আমরা ধারণা করতে পারি যে, মহান আল্লাহ্ চেয়েছিলেন মানব জাতি ও বি র মহান নেতা মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) সকল দায়িত্বভার গ্রহণ এবং নেতৃত্বদান শুরু করার আগেই যেন জীবনের সুখ, শান্তি, মাধুর্য ও তিক্ততার স্বাদ আস্বাদন করেন এবং জীবনের উত্থান- পতনের সাথে পরিচিত হন। এর ফলে তিনি মহান আত্মা এবং অত্যন্ত ধৈর্যশীল দয়ের অধিকারী হতে পারবেন, দুঃখ- কষ্ট ও বিপদাপদ সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় অভিজ্ঞতা অর্জন এবং নিজেকে কঠিন বিপদাপদ, কষ্ট এবং বঞ্চনার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার জ প্রস্তুত করতে পারবেন।

মহান আল্লাহ্ চেয়েছিলেন যেন কারও আনুগত্য তাঁর স্কন্ধের ওপর না থাকে; আর তিনি জন্মগ্রহণের পরপর অর্থাৎ জীবনের শুরু থেকেই যেন স্বাধীন থাকেন। তিনি যেন আত্মগঠনে নিয়োজিত মনীষীদের ায় তাঁর আত্মিক- আধ্যাত্মিক উৎকর্ষের ভিত্তিসমূহ নিজ হাতে গঠন করতে সক্ষম হন। যার ফলে স্পষ্ট হয়ে যাবে যে, তাঁর প্রতিভা আসলে সাধারণ মানবীয় প্রতিভা নয় এবং তাঁর ভাগ্য নির্মাণের ক্ষেত্রে তাঁর পিতা- মাতার কোন ভূমিকাই ছিল না। তাঁর সকল মর্যাদা আসলে ওহীর উৎসমূল থেকেই উৎসারিত হয়েছিল।

আবদুল মুত্তালিবের মৃত্যু

দয়বিদারক ঘটনাসমূহ সব সময় মানব জীবনের পথ- পরিক্রমণে আবির্ভূত হয়। সেগুলো সমুদ্রের পর্বত প্রমাণ উত্থাল তর মালার ায় একের পর এক উত্থিত হয়ে মানুষের জীবন-তরীকে আক্রমণের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করে এবং মানব মনের ওপর প্রচণ্ড আঘাত হানে।

মহানবী (সা.)- এর অন্তঃকরণে (মায়ের মৃত্যুতে) শোক ও দুঃখ তখনও বিরাজ করছিল ঠিক এমতাবস্থায় তৃতীয় বারের মতো এক বড় বিপদ তাঁর ওপর আপতিত হয়েছিল। তাঁর জীবনের অষ্টম বসন্তকাল অতিবাহিত হতে না হতেই অভিভাবক ও পিতামহ হযরত আবদুল মুত্তালিবকে তিনি হারিয়েছিলেন। আবদুল মুত্তালিবের মৃত্যু তাঁর কোমল আত্মার ওপর এতটা গভীর দাগ কেটেছিল যে, দাদা আবদুল মুত্তালিব যে দিন মৃত্যুবরণ করেছিলেন সে দিন তিনি সমাধিস্থলে তাঁকে চিরনিদ্রায় শায়িত করা পর্যন্ত অশ্রুপাত করেছিলেন এবং তিনি কখনই পিতামহ আবদুল মুত্তালিবকে ভুলেন নি।[১৪৯]

আবু তালিবের অভিভাবকত্ব

আবু তালিবের মহান ব্যক্তিত্ব ও মর্যাদা প্রসংে আমরা এ গ্রন্থের একটি বিশেষ অংশে (নবুওয়াতের ১০ম বর্ষের ঘটনাবলী সংক্রান্ত অধ্যায়) আলোচনা করব। সেখানে আমরা বিশুদ্ধ দলিল ও সূত্রের ভিত্তিতে মহানবী (সা.)- এর প্রতি তাঁর ঈমান এবং আত্মসমর্পণের বিষয়েও আলোচনা করব। কিন্তু এখন আমরা মহানবীর অভিভাবক হিসাবে হযরত আবু তালিবের সাথে সংশ্লিষ্ট কিছু ঘটনা উল্লেখ করব।

কতিপয় গৌরবোজ্জ্বল কারণে হযরত আবু তালিব মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)- এর অভিভাবকত্বের দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়েছিলেন। কারণ আবু তালিব ছিলেন মহানবীর পিতা হযরত আবদুল্লাহর সহোদর ভ্রাতা।[১৫০] তিনি দানশীলতা, বদা তা, পরোপকার ও জনহিতকর কাজে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। এ কারণেই হযরত আবদুল মুত্তালিব তাঁর অনাথ নাতির লালন- পালন করার জ আবু তালিবকে মনোনীত করেছিলেন। স্বর্ণোজ্জ্বল ইতিহাস তাঁর অতীব মূল্যবান অবদানের সাক্ষী যা আমরা পর্যায়ক্রমে আলোচনা করব।

কথিত আছে যে, মহানবী (সা.) দশ বছর বয়সে পিতৃব্য আবু তালিবের সাথে একটি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। আর যেহেতু এ যুদ্ধ নিষিদ্ধ মাসসমূহে সংঘটিত হয়েছিল সেহেতু উক্ত যুদ্ধের নামকরণ করা হয়েছিল ‘ফিজার’। ইতিহাসে ফিজার যুদ্ধ সংক্রান্ত বিশদ বর্ণনা এসেছে।[১৫১]

শামদেশ (সিরিয়া) সফর

কুরাইশ বংশীয় বণিকগণ যথারীতি প্রতি বছর অন্তত একবার শামদেশে গমন করত। হযরত আবু তালিব কুরাইশদের বাৎসরিক এ বাণিজ্যিক সফরে অংশগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নেন। যে ভ্রাতুষ্পুত্রকে তিনি মুহূর্তের জ নিজের কাছ থেকে পৃথক হতে দিতেন না তাঁকে কার কাছে রেখে যাবেন এতৎসংক্রান্ত সমস্যাটির এভাবে সমাধান করলেন যে, তিনি তাঁকে মক্কায় রেখে যাবেন এবং কতিপয় ব্যক্তিকে তাঁর দেখাশোনার দায়িত্ব দেবেন। কিন্তু কাফেলার প্রস্থানের মুহূর্তে মহানবীর চোখ অশ্রুজলে সিক্ত হয়ে গেল এবং তাঁর অভিভাবক আবু তালিবের কাছ থেকে (কিছুদিনের জ হলেও) এ বিচ্ছেদ তাঁর কাছে অত্যন্ত কঠিন বলে গণ্য হলো। মহানবীর দুঃখভারাক্রান্ত মুখমণ্ডল হযরত আবু তালিবের অন্তরে আবেগ- অনুভূতির প্রলয় র তুফানের সৃষ্টি করল। তিনি অবশেষে কষ্ট সংবরণ করে হলেও হযরত মুহাম্মদ (সা.)- কে নিজের সাথে নিলেন।[১৫২]

মহানবীর বারো বছর বয়সের এ সফর ছিল তাঁর অ তম আনন্দঘন ভ্রমণ। কারণ এ সফরে তিনি মাদইয়ান, ওয়াদী- উল কুরা ও সামুদ জাতির আবাসস্থল অতিক্রম করেছিলেন। তিনি শাম দেশের মনোজ্ঞ প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলীও অবলোকন করেছিলেন। কুরাইশ কাফেলাটি তখনও গন্তব্যস্থলে পৌঁছে নি ঠিক তখন বুসরা নামক স্থানে এমন এক ঘটনা সংঘটিত হয় যার জ হযরত আবু তালিবের সফর সংক্রান্ত কর্মসূচীর মধ্যে এক ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়। নিচে এতৎসংক্রান্ত বিশদ বিবরণ প্রদান করা হলো :

অনেক বছর যাবৎ বাহীরা নামের একজন ি ষ্টান পাদরী বুসরা নামক স্থানে একটি বিশেষ ধর্মীয় উপাসনালয়ে উপাসনা করতেন এবং তিনি সেখানকার ি ষ্টানদের কাছে অত্যন্ত সম্মানিত ছিলেন। বাণিজ্যিক কাফেলাসমূহ যাত্রাপথে ঐ স্থানে বিশ্রামের জ যাত্রাবিরতি করত এবং কল্যাণ ও বরকত লাভের জ তাঁর কাছে যেত। সৌভাগ্যবশত বাহীরা কুরাইশ বাণিজ্য কাফেলার মুখোমুখি হন। তাঁর দৃষ্টি আবু তালিবের ভ্রাতুষ্পুত্রের ওপর পড়লে তিনি খুবই আকৃষ্ট হন। শিশু মহানবীর

দৃষ্টিতে এমন এক রহস্যের নিদর্শন ছিল যা তাঁর অন্তরে লুক্কায়িত ছিল। বেশ কিছুক্ষণ তিনি মহানবীর দিকে বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে তাকিয়েছিলেন। হঠাৎ তিনি নীরবতা ভ করে বললেন, “এ শিশুটি আপনাদের মধ্যে কার সন্তান?” ঐ কাফেলার কতিপয় ব্যক্তি আবু তালিবের দিকে ইি ত করে বলল, “(শিশুটি) আবু তালিবের আত্মীয়।” আবু তালিব তখন বললেন, “সে আমার ভ্রাতুষ্পুত্র।” বাহীরা বললেন, “এ শিশুর এক অতি উজ্জ্বল ভবি ৎ আছে। এ সেই প্রতিশ্রুত নবী যাঁর সর্বজনীন নবুওয়াত ও বিশাল কুমত (রাজত্ব) সম্পর্কে আসমানী গ্রন্থসমূহে ভবি দ্বাণী করা হয়েছে। এ সেই নবী যাঁর নাম এবং যাঁর পিতা ও পরিবারের নামও আমি ধর্মীয় গ্রন্থাদিতে পড়েছি এবং আমি জানি তিনি কোথা থেকে উত্থিত হবেন এবং কিভাবে তিনি তাঁর নব্য প্রতিষ্ঠিত ধর্মকে পৃথিবীতে বিস্তৃত করবেন[১৫৩], তবে আপনাদের কর্তব্য হচ্ছে তাঁকে ইয়া দীদের চোখের আড়ালে রাখা। কারণ তারা যদি বুঝতে পারে, তাহলে তারা তাঁকে হত্যা করবে।”

অধিকাংশ ইতিহাসবেত্তা বি াস করেন যে, শামদেশ সফরকালে আবু তালিবের ভ্রাতুষ্পুত্র ঐ স্থানটিই আসলে অতিক্রম করেন নি। তবে একটি বিষয় পরিষ্কার নয় যে, মুহাম্মদ (সা.)- এর চাচা আবু তালিব তাঁকে কোন ব্যক্তির সাথে পবিত্র মক্কায় ফেরত পাঠিয়ে ছিলেন কি না? আর এ বিষয়টি অসম্ভব বলেই মনে হয় যে, সন্ন্যাসীর কথা শোনার পর আবু তালিব তাঁকে নিজের কাছ থেকে পৃথক করে দেবেন অথবা তিনি শামদেশ যাওয়ার পরিকল্পনা বাতিল করে ভ্রাতুষ্পুত্র মুহাম্মদের সাথে পবিত্র মক্কার পথে রওয়ানা হয়ে যেতে পারেন। আবার কখনো বলা হয় যে, আবু তালিব বাহীরার কাছ থেকে শোনার পরও হযরত মুহাম্মদকে নিজের সাথে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে শামদেশে নিয়ে গিয়েছিলেন।

প্রাচ্যবিদদের মিথ্যাচার

আমরা মহান আল্লাহর অনুগ্রহে এ গ্রন্থে পাশ্চাত্যের প্রাচ্যবিদদের ভুল- ভ্রান্তি এবং কখনো কখনো তাঁদের অবৈধ মিথ্যাচার ও অপবাদের ওপরও হাত দেব। যার ফলে স্পষ্ট হয়ে যাবে যে, তাঁরা

কতটা জেনে- শুনে ও ইচ্ছা প্রণোদিত হয়ে সরল ব্যক্তিদের মন- মানসিকতা ও চিন্তা- চেতনায় বিভ্রান্তি সৃষ্টি করার প্রয়াস চালিয়েছেন!

পাদ্রী বাহীরার সাথে শিশু মহানবীর সাক্ষাৎ আসলে একটি অত্যন্ত সাদামাটা ঘটনা। কিন্তু প্রাচ্যবিদরা ব শতাব্দী পরে এ ঘটনাকে তাঁদের বক্তব্যের দলিল হিসাবে উত্থাপন করে জোর দিয়ে বলতে চান যে, হযরত মুহাম্মদ (সা.) তাঁর উন্নত ও মহান শিক্ষামালা যা তিনি ২৮ বছর পরে জনসমক্ষে প্রকাশ ও প্রচার করেছিলেন এবং আবে হায়াতের (অমৃত) মতো মৃতপ্রায় আরব জাতিকে উজ্জীবিত করেছিলেন আসলে তা তিনি উপরিউক্ত সফরেই বাহীরা থেকে শিখেছিলেন। এ ব্যাপারে তাঁরা বলতে চান যে, হযরত মুহাম্মদ (সা.) যেহেতু নির্মল, পবিত্র, স্বচ্ছ দয়, পুণ্য আত্মা এবং প্রকৃতি প্রদত্ত অসাধারণ স্মরণশক্তির অধিকারী এবং সূক্ষ্মভাবে চিন্তা- ভাবনা করতে সক্ষম ছিলেন তাই তিনি উক্ত সাক্ষাতেই পূর্ববর্তী নবী ও আদ- সামূদের মতো ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতিসমূহের কাহিনী এবং তাঁর ধর্মের অধিকাংশ প্রাণসঞ্জীবনী শিক্ষা ও বিধান এ ি ষ্টান পাদ্রীর কাছ থেকে গ্রহণ করেছিলেন।

নিঃসন্দেহে উপরিউক্ত বক্তব্য অলীক কল্পনা বৈ আর কিছুই নয় এবং মহানবীর জীবনেতিহাসের সাথে তা বি মাত্র খাপ খায় না। আর বুদ্ধিবৃত্তিক মাপকাঠি ও নীতিমালাও তা প্রত্যাখ্যান করে। আমাদের এ বক্তব্যের পক্ষে দলিলগুলো নিচে তুলে ধরা হলো :

১. হযরত মুহাম্মদ (সা.) সকল ঐতিহাসিকের মতে নিরক্ষর (উম্মী) ছিলেন। তিনি লিখতে- পড়তে জানতেন না। আর শামদেশ সফরের সময় তাঁর বয়স ১২ বছরও পূর্ণ হয় নি। এমতাবস্থায় কোন বিবেকবান ব্যক্তি কি বি াস করতে পারবে যে, যে শিশু লেখাপড়া করে নি এবং যার বয়সের বারোটি বসন্তও অতিক্রান্ত হয় নি সে কি তাওরাত ও ইঞ্জিল থেকে বেশ কিছু বিষয় শিখে নিয়ে ৪০ বছর বয়সে তা ওহী হিসাবে প্রচার এবং এক নতুন শরীয়তের প্রবর্তন করেছে? এ ধরনের বিষয় স্বাভাবিক নিয়ম- নীতিমালার বাইরে এবং মানুষের সামর্থ্য ও ক্ষমতা বিবেচনা করলে তা অসম্ভব বলেই গণ্য করা যায়।

২. যে সময়ের মধ্যে হযরত মুহাম্মদ (সা.) তাওরাত ও ইঞ্জিল সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে পারবেন এ সফরের সময়কাল তার চেয়েও অতি সংক্ষিপ্ত ছিল। কারণ এ সফর ছিল বাণিজ্যিক সফর। যাওয়া-আসা এবং বিদেশে অবস্থানকাল সর্বসাকুল্যে ৪ মাসের বেশি লাগত না। কারণ কুরাইশগণ বছরে দু'বার সফরে বের হতো। শীতকালে তারা ইয়েমেনের দিকে এবং গ্রীষ্মকালে শামদেশের দিকে সফর করত। তাই এত অল্প সময়ের মধ্যে যে, তাদের পুরো সফর কাল ৪ মাসের বেশি হতে পারে এ কথা কল্পনা করা যায় না। আর পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত ব্যক্তিগণও এত অল্প সময়ের মধ্যে এ দু'বৃহৎ ধর্মীয় গ্রন্থ শিক্ষা ও আয়ত্ত করতে সক্ষম হবেন না। একজন নিরক্ষর শিশুর পক্ষে তো এ কাজ মোটেও সম্ভব নয়। এ ছাড়াও তিনি পুরো এ চার মাস পাদ্রী বাহীরার সাথে ছিলেন না; বরং শামদেশ যাওয়ার পথে কোন এক স্থানে এ সাক্ষাৎটি হয়েছিল। আর গোটা সাক্ষাৎকাল বড় জোর কয়েক ঘণ্টা স্থায়ী হয়েছিল।

৩. ঐতিহাসিক তথ্য ও বিবরণাদি থেকে প্রমাণিত হয় যে, শিশু মহানবীকে নিজের সাথে শামদেশে নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারেই আবু তালিব সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। তাঁদের প্রকৃত গন্তব্যস্থল বুসরা ছিল না; বরং বুসরা ছিল শামে যাওয়ার পথে অবস্থিত একটি এলাকা যেখানে বাণিজ্যিক কাফেলাসমূহ বিশ্রাম করার জ   কখনো কখনো যাত্রাবিরতি করত। তাই এটি কিভাবে সম্ভব যে, মহানবী সেখানে অবস্থান করে তাওরাত ও ইঞ্জিল শিক্ষায় ব্রত হবেন? আর যদি বলি যে, আবু তালিব তাঁকে নিজের সাথে শামে নিয়ে গিয়েছিলেন অথবা সেখান থেকে তাঁকে নিয়ে মক্কায় ফিরে গিয়েছিলেন অথবা অ   কোন ব্যক্তির সাথে তিনি তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রকে মক্কায় পাঠিয়ে দিয়েছিলেন তাহলে কোন অবস্থায়ই বুসরা আবু তালিবের বাণিজ্যিক কাফেলার প্রকৃত গন্তব্যস্থল ছিল না। যার ফলে কাফেলা উক্ত অঞ্চলে ব্যবসা-বাণিজ্যে ব্যস্ত হয়ে পড়বে আর মহানবীও সেখানে লেখাপড়ায় মনোনিবেশ করবেন।

৪. যদি মহানবী উক্ত পাদ্রীর কাছ থেকে কতিপয় বিষয় শিখে থাকেন তাহলে তা অবশ্যই কুরাইশদের মধ্যে খ্যাতি লাভ করত এবং সকলেই ফেরার পর তা বর্ণনা করত। তা ছাড়া মহানবীও তাঁর সম্প্রদায়ের কাছে দাবি করতে পারতেন না যে, "হে লোকসকল! আমি নিরক্ষর ও

লেখাপড়া শিখি নি।" অথচ মহানবী তাঁর রিসালাত ও নবুওয়াত উক্ত শিরোনামেই শুরু করেছিলেন। আর তখন মক্কার কোন ব্যক্তি তাঁকে বলেনি যে, "হে মুহাম্মদ! তুমি তোমার বারো বছর বয়সে বুসরায় এক পাদরীর কাছে পাঠ নিয়েছিলে (তাওরাত ও ইঞ্জিল শিখেছিলে)। আর এ সব উজ্জ্বল সত্যসমূহ তাঁর কাছ থেকেই আয়ত্ত করেছ।"

মক্কার মুশরিকগণ তাঁর প্রতি সকল প্রকার অপবাদ আরোপ করেছিল। যাতে করে তারা মহানবীর বিরুদ্ধে কোন দলিল- প্রমাণ পেতে পারে সেজ তারা পবিত্র কোরআনের ব্যাপারে গভীরভাবে চিন্তা- ভাবনা করত। এমনকি তারা যখন দেখতে পেত যে, মহানবী কখনো কখনো মারওয়া পাহাড়ের একজন ি ষ্টান দাসের পাশে বসে রয়েছেন তখন তারা এ সুযোগের সদ্ব্যবহার করে বলত, "মুহাম্মদ তার বাণী এ গোলামটির কাছ থেকে শিখেছে।" তাই পবিত্র কোরআন তাদের এ অযৌক্তিক অপবাদ খণ্ডন করে বলেছে :

(و لقد نعلم أنّهم يقولون إنّما يعلّمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجميّ و هذا لسان عربيّ مبين)

"তাদের এ বক্তব্যের ব্যাপারে আমরা অবগত আছি। তারা বলে যে, এক মানুষ তাকে এ কোরআন শিক্ষা দেয়, কিন্তু যে ব্যক্তির (ি ষ্টান দাস) প্রতি তারা ই ি ত করেছে তার ভাষা তো অনারবীয় (আজামী) আর এ গ্রন্থটি পরম বিশুদ্ধ আরবী ভাষায় অবতীর্ণ।" (সূরা নাহল : ১০৩)

কিন্তু প্রাচ্যবিদদের এ অপবাদ না পবিত্র কোরআনে উল্লিখিত হয়েছে, আর না কোন সুযোগসন্ধানী কুরাইশ তা মহানবীর বিরুদ্ধে দলিল হিসাবে ব্যবহার করেছে। আর এ থেকে সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয় যে, এ অপবাদ আসলে আমাদের সমসাময়িক কালের প্রাচ্যবিদদের মস্তিষ্কপ্রসূত।

৫. পবিত্র কোরআনে পূর্ববর্তী নবী- রাসূলদের যে সব কাহিনী ব্যাপকভাবে বর্ণিত হয়েছে সেগুলো তাওরাত ও ইঞ্জিলে বর্ণিত কাহিনীগুলোর সম্পূর্ণ পরিপন্থী। এ দু'গ্রন্থে নবী- রাসূলদের কাহিনী অত্যন্ত জঘ ও ঘৃণ্যভাবে বর্ণিত হয়েছে যা কখনই বুদ্ধিবৃত্তিক ও যৌক্তিক নীতিমালার সাথে খাপ খায় না। পবিত্র কোরআনের সাথে এ দু'গ্রন্থের তুলনা করলে প্রমাণিত হয়ে যাবে যে, পবিত্র কোরআনের বিষয়বস্তু এ দু'গ্রন্থ থেকে নেয়া হয় নি। আর যদি ধরেও নেয়া হয় যে, হযরত মুহাম্মদ (সা.) পূর্ববর্তী জাতি ও উম্মতদের কাহিনী সংক্রান্ত তথ্য ও জ্ঞান বাইবেলের পুরাতন ও নতুন

নিয়ম অর্থাৎ তাওরাত ও ইঞ্জিলের বিভিন্ন গ্রন্থ ও অধ্যায় হতে গ্রহণ করেছেন তাহলে অবশ্যই তাঁর বক্তব্য ও বাণীর সাথে কুসংস্কার ও কল্পকাহিনী মিশ্রিত হয়ে যাবে।[১৫৫]

৬. শামদেশ গমনের পথে অবস্থিত বুসরা এলাকার খ্রিষ্টান পাদরী যদি মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)- এর মতো একজন নবীকে প্রশিক্ষিত করে সমাজকে উপহার দেয়ার মতো এতটা ধর্মীয় ও তাত্ত্বিক জ্ঞান ও তথ্যাবলীর অধিকারী হতেন তাহলে কেন তিনি খ্যাতি অর্জন করেন নি? কেন তিনি অজ্ঞাত রয়ে গেলেন? কেন তিনি মুহাম্মদ (সা.) ছাড়া অন্য কোন ব্যক্তিকে প্রশিক্ষিত করেন নি, অথচ তাঁর আশ্রম ও উপাসনালয়ে সর্বদা জনতা যিয়ারত করতে আসত?

৭. খ্রিষ্টান লেখকগণও মহানবী হযরত মুহাম্মদকে একজন বিশ্বস্ত ও সত্যবাদী ব্যক্তি হিসাবেই জানেন। আর পবিত্র কোরআনের বক্তব্য অনুযায়ী পূর্ববর্তী নবী- রাসূল এবং জাতিসমূহের কাহিনী ও ইতিহাস সম্পর্কে তাঁর কোন তথ্যই জানা ছিল না। ঐ সব নবী- রাসূল এবং জাতি সংক্রান্ত জ্ঞান তিনি কেবল ওহী মারফত লাভ করেছেন- অন্য কোন সূত্র থেকে পান নি। সূরা কাসাসের ৪৪ নং আয়াতে বর্ণিত হয়েছে :

(و ما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر و ما كنت من الشّاهدين)

“যখন আমি মূসাকে রিসালাতের দায়িত্বভার প্রদান করেছিলাম তখন আপনি তুর পাহাড়ের পশ্চিম প্রান্তে ছিলেন না এবং আপনি তা প্রত্যক্ষও করেন নি।”

সূরা হুদের ৪৯ নং আয়াতে হযরত নূহ (আ.)- এর কাহিনী বর্ণনা করার পর বলা হয়েছে :

(تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت و لا قومك من قبل هذا)

“এগুলো হচ্ছে অদৃশ্যজগতের সংবাদ যা আমরা আপনার প্রতি ওহী করেছি। না আপনি এর আগে এ সব সংবাদ ও কাহিনী সম্পর্কে জ্ঞাত ছিলেন, আর না আপনার সম্প্রদায় (এগুলো জানত)।”

এ সব আয়াত থেকে প্রতীয়মান হয়ে যায় যে, মহানবী এ সব ঘটনা ও কাহিনী সম্পর্কে জ্ঞাত ছিলেন না। সূরা আলে ইমরানের ৪৪ নং আয়াতে বর্ণিত হয়েছে :

(ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك و ما كنت لديهم إذ يُلقون أقلامهم أيّهم يكفل مريم و ما كنت لديهم إذ يختصمون)

" এটি হচ্ছে অদৃশ্য জগতের সংবাদ যা আপনার প্রতি আমরা ওহী করেছি; আর আপনি তাদের কাছে ছিলেন না যখন তারা লটারী করছিল যে, কে তাদের মধ্য থেকে মরিয়মের অভিভাবকত্ব গ্রহণ করবে? (তাদের প্রত্যেকেই চাচ্ছিল যে, সে এ গৌরবের অধিকারী হবে) এবং তারা যখন এ ব্যাপারে পরস্পর বিবাদ করছিল তখনও আপনি তাদের নিকট ছিলেন না। "

তাওরাত গ্রন্থ সম্পর্কে একটি পর্যালোচনা

নবী- রাসূলদের কাহিনী বর্ণনা করার ক্ষেত্রে এ গ্রন্থ এতটা অসংল কথাবার্তা, আলোচনা ও বক্তব্যে ভরপুর যে, তা কখনই ওহীর সাথে সম্পর্কিত করা সম্ভব নয়। আমরা এতৎসংক্রান্ত তাওরাত থেকে কিছু নমুনা পেশ করব যার ফলে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হবে যে, মহানবী (সা.) যদি ি ষ্টান পাদ্রী বাহীরার কাছ থেকেই পবিত্র কোরআন শিখে থাকবেন তাহলে পবিত্র কোরআনে কেন তাওরাতে বর্ণিত জঘ   ও ঘৃণ্য বিষয়সমূহের কোন অস্তিত্ব নেই? যেমন :

১. তাওরাতের 'সৃষ্টি ' সংক্রান্ত পুস্তিকার ৩২ নং অধ্যায়ের ২৫- ৩০ নং বাক্যে বর্ণিত আছে, মহান আল্লাহ্ এক রাতে প্রভাত হওয়া পর্যন্ত হযরত ইয়াকুব (আ.)- এর সাথে কুস্তি লড়েছিলেন!

২. মহান আল্লাহ্ হযরত আদম (আ.)- কে মিথ্যা বলেছিলেন, "যদি এ গাছের ফল খাও তাহলে তুমি মারা যাবে?" অথচ যদি তাঁরা ঐ বৃক্ষের ফল ভক্ষণ করতেন তাহলে মহান আল্লাহর   ায় ভালো- মন্দ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতেন! যেহেতু তাঁরা (ঐ নিষিদ্ধ গাছের ফল) খেয়েছিলেন তাই তাঁরা (ভালো- মন্দ সম্পর্কে) জ্ঞাত হয়েছিলেন![১৫৬]

৩. তাওরাত হযরত ইবরাহীম (আ.)- এর ওপর দু'জন ফেরেশতার অবতীর্ণ হওয়ার বিষয়টি এভাবে বর্ণনা করেছে : খোদা দু'জন ফেরেশতার সাথে নিচে (ভূপৃষ্ঠে) অবতরণ করলেন যাতে করে তিনি মানব জাতির ব্যাপারে যাচাই করতে পারেন যে, যা কিছু তাঁর কাছে পৌঁছায় তা সত্য না মিথ্যা। এ কারণেই তিনি ইবরাহীমের কাছে প্রকাশিত হলেন। ইবরাহীম বললেন, "আপনাদের

পা ধুয়ে দেয়ার জ   কি পানি আনব?” খোদা ও ফেরেশতাদ্বয় ক্লান্ত ছিলেন। তাই তাঁরা বিশ্রাম করলেন এবং খাদ্য গ্রহণ করলেন।[১৫৭]

সম্মানিত পাঠকবর্গ! আপনারা পবিত্র কোরআনের কাহিনীগুলো অধ্যয়ন করে বিচার করুন যে, এ কথা বলা কি সম্ভব, পবিত্র কোরআন যা এত বড় সম্মানের অধিকারী সে গ্রন্থটি নবী- রাসূলদের সাথে সংশ্লিষ্ট কাহিনীগুলো তাওরাত থেকে ধার করেছে? যদি তাওরাত থেকেই নিয়ে থাকে তাহলে তাওরাতের উপরিউক্ত কুসংস্কারগুলোর লেশমাত্রও কেন পবিত্র কোরআনের মধ্যে নেই?

ইঞ্জিলের প্রতি দৃষ্টিপাত

আমরা এখানে ইঞ্জিল থেকে তিনটি বিষয় বর্ণনা করব যার ফলে আমাদের কাছে প্রতীয়মান হবে যে, মুসলমানদের পবিত্র ধর্মীয় গ্রন্থ কোরআনের উৎস কি এ ইঞ্জিল না অ   কোথাও?

হযরত ঈসা মসীহ্ (আ.)- এর মুজিযা

হযরত ঈসা (আ.) মা এবং শি   দের সাথে একটি বিয়ের অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়েছিলেন। ইত্যবসরে মদ শেষ হয়ে গেলে তিনি সাত মশক পানি অলৌকিকভাবে মদে রূপান্তরিত করে দিলেন।[১৫৮] ঈসা (আ.) একটি পেয়ালা নিয়ে তাদের হাতে দিয়ে বললেন, “পান কর। কারণ এটি হচ্ছে আমার রক্ত।”[১৫৯]

কিন্তু সম্মানিত পাঠকবর্গ! আপনার ইতোমধ্যে জেনেছেন যে, মদ্যপান সংক্রান্ত পবিত্র কোরআনের যুক্তি এতৎসংক্রান্ত ইঞ্জিলের বক্তব্যের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। পবিত্র কোরআনে বর্ণিত হয়েছে, “হে লোকসকল! মদ ও জুয়া যে কোন ধরনেরই হোক না কেন- তা অপবিত্র এবং শয়তানের কর্ম। তাই এগুলো থেকে দূরে থাক। তাহলে তোমরা সফলকাম হবে।”[১৬০] তাই এমতাবস্থায় হযরত মুহাম্মদ (সা.) কি পবিত্র কোরআন বুসরার ি ষ্টান পাদ্রী বাহীরার কাছ থেকে গ্রহণ করেছিলেন?

বর্তমানে বিদ্যমান ইঞ্জিল হযরত ঈসাকে একজন ‘দুর্ভাগা ব্যক্তি ’ হিসাবে পরিচিত করিয়ে দেয় যিনি ছিলেন তাঁর মায়ের প্রতি নির্দয়।[১৬১] অথচ পবিত্র কোরআন ঈসা (আ.)- এর ব্যাপারে ইঞ্জিলের উপরিউক্ত বক্তব্যের ঠিক বিপরীতটিই উল্লেখ করেছে :

(وبرّا بوالدتي و لم يجعلني جبّارا شقيّا)

“ . . . আমাকে আমার জন্মদাত্রী মায়ের প্রতি পুণ্য করার আদেশ দিয়েছেন এবং তিনি আমাকে দুর্ভাগা, অত্যাচারী ও অবাধ্য করেন নি। ” (সূরা মরিয়ম : ৩২)

ায়পরায়ণ এবং সকল গোঁড়ামি ও সংকীর্ণতা থেকে মুক্ত ব্যক্তিগণ পবিত্র কোরআনের কাহিনী ও বিধি- বিধানসমূহ যদি তাওরাত ও ইঞ্জিলের সাথে তুলনা করেন তাহলে স্পষ্টভাবে অনুধাবন করবেন যে, তাওরাত ও ইঞ্জিল পবিত্র কোরআনের ক্ষুদ্রতম প্রামাণিক উৎস হওয়ারও যোগ্যতা রাখে না।[১৬২]

সমাজপতি ও নেতাদের অবশ্যই ধৈর্যশীল, শক্তিশালী, সাহসী, বীর এবং সুমহান উদার আত্মার অধিকারী হতে হবে।

ভীরু, কাপুরুষ, দুর্বল চিত্তের অধিকারী, ইচ্ছাহীন ও ঢিলাঢালা ব্যক্তিগণ কিভাবে সমাজকে আঁকা- বাঁকা পথ অতিক্রম করিয়ে (ইপ্সিত লক্ষ্যপানে) নিয়ে যেতে পারবে? তারা কিভাবে শত্রুর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ করতে সক্ষম হবে? তারা কিভাবে তাদের নিজ অস্তিত্ব ও ব্যক্তিত্বকে অ দের বিকৃতি সাধন করা থেকে রক্ষা করবে?

নেতার দয় ও আত্মার উদারতা ও মহত্ত্ব এবং তাঁর শারীরিক ও মানসিক শক্তি তাঁর অনুসারীদের ওপর আশ্চর্যজনক ইতিবাচক প্রভাব বিস্তার করে। যখন আমীরুল মুমিনীন আলী (আ.) তাঁর সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তিকে মিশরের প্রাদেশিক শাসনকর্তা হিসাবে নিযুক্ত করেন তখন তিনি মিশরের মজলুম জনগণের কাছে একটি চিঠি লিখেছিলেন। এখানে উল্লেখ্য যে, তদানীন্তন স্বৈরাচারী প্রশাসনের অত্যাচারে মিশরের জনগণ অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছিল। তিনি উক্ত চিঠিতে তাঁর নিযুক্ত প্রাদেশিক শাসনকর্তাকে আত্মিকভাবে সাহসী ও বীর বলে অভিহিত করেছিলেন। এখন আমরা উক্ত চিঠি থেকে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য অংশ বর্ণনা করছি। হযরত আলী (আ.) এ চিঠিতে একজন দায়িত্বশীল নেতার প্রয়োজনীয় গুণাবলী বর্ণনা করেছেন :

أمّا بعد فقد بعثت إليكم عبدا من عباد الله لا ينام أيّام الخوف و لا ينكل عن الأعداء ساعات الرّوع. أشدّ على الفجّار من حريق النّار و هو مالك بن الحارث أخو مذحج فاسمعوا له و اطيعوا أمره فيما طابق الحقّ,فإنّه سيف من سيوف الله لا كليل الظّبة و لا نابي الضّريبة.

“আমি তোমাদের কাছে মহান আল্লাহর একজন বান্দাকে প্রেরণ করেছি যে ভয়ের দিনগুলোতে ঘুমায় না এবং ভীতিপ্রদ মুহূর্তগুলোতে শত্রুদের থেকে বিরত থাকে না (পলায়ন করে না); অপরাধীদের প্রতি আগুনের দহন ক্ষমতার চেয়ে সে অধিকতর কঠোর। এ ব্যক্তিটি মাযহাজ গোত্রভুক্ত মালেক ইবনে হারেস (আল আশতার)। তোমরা তার কথা শুনবে এবং তার আদেশ

পালন করবে যদি তা সত্য ও   ায়সংগত হয়; কারণ সে হচ্ছে মহান আল্লাহর তরবারি যার ধার কখনই নষ্ট হবে না এবং যার আঘাত কখনই ব্যর্থ হবে না।”[১৬৩]

মহানবীর আধ্যাত্মিক শক্তি

কুরাইশদের প্রিয়ভাজন ব্যক্তিটির (মুহাম্মদ) ললাটে শৈশব ও কৈশোর থেকেই শক্তি, সাহস ও দৃঢ়তার নিদর্শন স্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয়েছিল। তিনি ১৫ বছর বয়সে হাওয়াযিন গোত্রের বিরুদ্ধে কুরাইশদের একটি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন যা ফিজারের যুদ্ধ নামে খ্যাতি লাভ করেছিল। যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁর দায়িত্ব ছিল চাচাদের কাছে তীর সরবরাহ করা। ইবনে হিশাম তাঁর সীরাত গ্রন্থে এ বাক্যটি মহানবীর নিকট থেকে উদ্ধৃত করে বলেছেন : মহানবী (সা.) বলেছেন,

كنت أنبّل على أعمامي

“ আমি আমার চাচাদের কাছে তীর পৌঁছে দিতাম যাতে করে তাঁরা তা নিক্ষেপ করেন।”[১৬৪]

ঐ অতি অল্প বয়সে মহানবীর যুদ্ধে যোগদান আমাদেরকে তাঁর অসীম সাহসের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয় এবং এ থেকে প্রমাণিত হয়ে যায় যে, কেন আমীরুল মুমিনীন আলী (আ.) মহানবীর ব্যাপারে বলেছেন,

كنّا إذا احمرّ البأس اتّقينا برسول الله (ص) فلم يكن أحد منّا أقرب إلى العدوّ منه

“ যখনই যুদ্ধের বিভীষিকা তীব্র হয়ে যেত তখনই আমরা রাসূল (সা.)- এর কাছে আশ্রয় গ্রহণ করতাম। কারণ আমাদের মধ্য হতে কোন ব্যক্তি তাঁর চেয়ে শত্রুর অধিকতর নিকটবর্তী ছিল না।”[১৬৫]

আমরা ইনশাল্লাহ্ ‘মুশরিকদের সাথে মুসলমানদের জিহাদ ’ সংক্রান্ত অধ্যায়ে ইসলামের সমরনীতির দিকে ইি ত করব। আর সেখানে আমরা মুসলমানদের যুদ্ধ ও সংগ্রাম করার পদ্ধতি নিয়েও আলোচনা করব। এ সব যুদ্ধ ও সামরিক অভিযান মহানবী (সা.)- এর নির্দেশেই বাস্তবায়িত হয়েছে। আর ঠিক এ বিষয়টিই ইসলামের ইতিহাসের অত্যন্ত আকর্ষণীয় আলোচ্য বিষয়াদির অন্তর্ভুক্ত।

ফিজারের যুদ্ধসমূহ

এ ধরনের ঘটনাসমূহের ব্যাখ্যা প্রদান করা আমাদের আলোচনার গণ্ডির বাইরে। শ্রদ্ধেয় পাঠকবর্গ যাতে করে এ সব যুদ্ধের সাথে অপরিচিত না থাকেন তাই এ সব যুদ্ধের কারণ ও পদ্ধতির ওপর সামা আলোকপাত করব। এখানে উল্লেখ্য যে, কেবল একদল ঐতিহাসিকের মতে ফিজারের যুদ্ধগুলোর কোন একটিতে মহানবী (সা.) যোগদান করেছিলেন।

জাহেলিয়াতের যুগে আরবরা পুরো বছরই যুদ্ধ ও লুটপাট করে কাটিয়ে দিত। আর এ ধরনের পরিস্থিতি অব্যাহত থাকার জ আরবদের জাতীয় জীবন মারাত্মকভাবে ব্যাহত ও কার্যত অচল হয়ে গিয়েছিল। এ কারণেই সমগ্র বছরের মধ্যে রজব, যিলক্বদ, যিলহ ও মুহররম- এ চার মাস আরবদের মধ্যে যুদ্ধ বন্ধ রাখা হতো। যার ফলে তারা বাজার বসিয়ে ব্যবসা- বাণিজ্য চালাতে এবং আপন পেশায় নিয়োজিত থাকতে সক্ষম হতো।[১৬৬]

এর ওপর ভিত্তি করেই এ দীর্ঘ চার মাসে উকায, মাজনাহ্ এবং যিল মাজাযের বাজারগুলোতে বিশাল সমাবেশের আয়োজন করা হতো। শত্রু- মিত্র নির্বিশেষে সকলেই একে অপরের পাশে বসে লেন- দেন করতো। একে অপরের বিপরীতে গর্ব ও অহংকারও প্রকাশ করা হতো। আরবের নামীদামী ক শিল্পী ও কবি তাদের স্বরচিত কবিতা, গান ও কাসীদাহ্ ঐ সব মাহফিলে পরিবেশন করত। প্রসিদ্ধ বক্তাগণ ঐসব স্থানে বক্তৃতা করত। শত্রুদের আক্রমণের হাত থেকে নিরাপদ হওয়ার ব্যাপারে সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিত হয়েই ইয়া দী, ি ষ্টান এবং মূর্তিপূজকগণ এ সব স্থানে আরব বি র জনগণের কাছে নিজ নিজ আকীদা- বি াস ও ধর্মমত প্রচার করত।

কিন্তু আরব জাতির ইতিহাসে এ নিষিদ্ধ মাস চতুষ্টয়ের সম্মান চার বার লঙ্ঘিত হয়েছিল। এর ফলে কতিপয় আরব গোত্র পরস্পরের ওপর আক্রমণ করেছিল। যেহেতু এ সব যুদ্ধ নিষিদ্ধ (হারাম) মাসগুলোতে সংঘটিত হয়েছিল তাই এ সব যুদ্ধের নামকরণ করা হয়েছিল 'ফিজারের যুদ্ধ ' । এখন আমরা সংক্ষেপে এ যুদ্ধগুলোর ব্যাপারে আলোচনা করব।

ফিজারের প্রথম যুদ্ধ

এ যুদ্ধে বিবদমান পক্ষদ্বয় ছিল কিনানাহ্ ও হাওয়াযিন গোত্র। এ যুদ্ধের কারণ সম্পর্কে বলা হয়েছে বদর বিন মাশা'র নামক এক ব্যক্তি উকাযের বাজারে নিজের জ একটি স্থান তৈরি করে সেখানে প্রতিদিন জনগণের সামনে নিজের গৌরব জাহির করত। একদিন হাতে তলোয়ার নিয়ে বলল, "হে লোকসকল! আমি সবচেয়ে সম্মানিত ব্যক্তি। যে আমার কথা শুনবে না সে অবশ্যই এ তরবারি দ্বারা নিহত হবে।" ঐ সময় এক ব্যক্তি তার পায়ে তরবারি দিয়ে আঘাত করে তার পা কেটে ফেলে। এ কারণেই দু'টি গোত্র সংঘর্ষে জড়িয়ে যায়, তবে কেউ নিহত হওয়া ব্যতিরেকেই তারা সংঘর্ষ করা থেকে বিরত হয়।

ফিজারের দ্বিতীয় যুদ্ধ

এ যুদ্ধের কারণ ছিল এই যে, বনি আ'মের গোত্রের একজন সুন্দরী মহিলা এক যুবকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে- মহিলাদের প্রতি দৃষ্টি দেয়াই ছিল যার অভ্যাস। যুবকটি তার মুখমণ্ডল উন্মুক্ত করার জ অনুরোধ করলে ঐ রমণী তা প্রত্যাখ্যান করে। প্রবৃত্তির পূজারী যুবকটি রমণীর পেছনে বসে তার লম্বা গাউনের প্রান্তগুলো গাছের কাটা দিয়ে এমনভাবে পরস্পর গেঁথে দিয়েছিল যে, বসা অবস্থা থেকে দাঁড়ানোর সময় ঐ রমণীর মুখমণ্ডল অনাবৃত হয়ে যায়। এ সময় ঐ রমণী ও যুবক তাদের নিজ নিজ গোত্রকে আহবান করলে সংঘর্ষ বেঁধে যায় এবং কিছুসংখ্যক লোকের প্রাণহানির মধ্য দিয়ে অবশেষে সংঘর্ষের অবসান ঘটে।

ফিজারের তৃতীয় যুদ্ধ

কিনান গোত্রের এক ব্যক্তির কাছে বনি আ'মের গোত্রের এক ব্যক্তির কিছু পাওনা ছিল। ঐ ঋণগ্রস্ত লোকটি আজ দেব, কাল দেব বলে পাওনাদার লোকটিকে ঘুরাচ্ছিল। এতে এ দু'ব্যক্তির মধ্যে তুমুল ঝগড়া শুরু হয়ে যায়। অতি অল্প সময়ের মধ্যে ব্যক্তিদ্বয়ের নিজ নিজ গোত্রও

পরস্পরকে হত্যা করার জ   সম্পূর্ণ প্রস্তুত হয়ে যায়। কিন্তু শান্তির ব্যাপারে পারস্পরিক সমঝোতার মাধ্যমে উভয় গোত্র সংঘর্ষে লিপ্ত হওয়া থেকে বিরত থাকে।

ফিজারের চতুর্থ যুদ্ধ

এ যুদ্ধে মহানবী (সা.) অংশগ্রহণ করেছিলেন। যুদ্ধ শুরু হওয়ার সময় তাঁর বয়স কত ছিল সে সম্পর্কে মতপার্থক্য রয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন, তখন মহানবীর বয়স ছিল ১৪ অথবা ১৫ বছর। আবার কোন কোন ঐতিহাসিক উল্লেখ করেছেন, তখন তাঁর বয়স ছিল ২০ বছর। যেহেতু এ যুদ্ধ ৪ বছর স্থায়ী হয়েছিল তাই এতৎসংক্রান্ত বিদ্যমান সকল বর্ণনা বিশুদ্ধ হতে পারে।[১৬৭]

এ যুদ্ধের মূল কারণ সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, নূমান বিন মুনযির প্রতি বছর একটি বাণিজ্যিক কাফেলা প্রস্তুত করে ব্যবসায়িক পণ্য- সামগ্রী ঐ কাফেলার সাথে উকাযের মেলায় পাঠাত। ঐ সব পণ্যের বিনিময়ে চামড়া, দড়ি এবং স্বর্ণের কারুকাজ করা কাপড় ক্রয় করে আনার নির্দেশ দিত। উরওয়াতুর রিজাল নামক হাওয়াযিন গোত্রের এক ব্যক্তিকে কাফেলার রক্ষণাবেক্ষণ ও দেখাশোনার দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল। কিন্তু বারাদ বিন কাইস (কিনান গোত্রের) হাওয়াযিন ব্যক্তিটির উন্নতির কারণে অত্যন্ত ঈর্ষান্বিত ও ক্রুদ্ধ হয়ে পড়ল। সে নূমান বিন মুনযিরের কাছে গিয়ে প্রতিবাদ জানাল, কিন্তু তার প্রতিবাদে কোন ফল হলো না। তার ভেতরে ক্রোধ ও হিংসার অি প্র লিত হয়ে উঠল। সে সর্বদা উরওয়াতুর রিজালকে পথিমধ্যে হত্যা করার সুযোগ খুঁজছিল। অবশেষে বনি মুররা গোত্রের নিয়ন্ত্রিত অঞ্চলে সে তাকে হত্যা করে। আর এভাবে হাওয়াযিন লোকটির রক্তে তার হাত রঞ্জিত হয়।

ঐ দিনগুলোতে কুরাইশ ও কিনানাহ্ গোত্র পরস্পর মৈত্রী বন্ধনে আবদ্ধ ছিল। আর এ ঘটনাটি ঐ সময় সংঘটিত হয় যখন আরব গোত্রগুলো উকাযের বাজারগুলোতে কেনা- বেচা ও লেন- দেনে ব্যস্ত ছিল। এক লোক কুরাইশ গোত্রকে এ ঘটনা সম্পর্কে অবহিত করে। হাওয়াযিন গোত্র ঘটনা সম্পর্কে অবগত হওয়ার আগেই কুরাইশ ও কিনানাহ্ গোত্র নিজেদের গুটিয়ে নিয়ে হারাম শরীফে আশ্রয় নেয়। কিন্তু হাওয়াযিন গোত্র তাৎক্ষণিকভাবে তাদের পিছু নেয় ও ধাওয়া করে। হারাম

শরীফে পৌঁছানোর আগেই এ দু'দলের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। অবশেষে আবহাওয়া অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে গেলে যুদ্ধরত গোত্রগুলো যুদ্ধ বন্ধ করে দেয়। আর এটি ছিল আঁধারের মধ্যে হারাম শরীফের দিকে অগ্রসর এবং কুরাইশ ও কিনানাহ্ গোত্রের জ শক্রর হাত থেকে নিরাপদ হওয়ার সুবর্ণ সুযোগ। ঐ দিন থেকে কুরাইশ ও তাদের মিত্ররা মাঝে- মধ্যে হারাম শরীফ থেকে বের হয়ে এসে শক্রদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হতো। চাচাদের সাথে মহানবীও কিছু দিন যেভাবে বর্ণিত হয়েছে ঠিক সেভাবে এ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। এ অবস্থা চার বছর স্থায়ী হয়েছিল। অবশেষে যুদ্ধে হাওয়াযিন গোত্রের মধ্যে থেকে যারা নিহত হয়েছিল তাদের রক্তপণ পরিশোধ করার মাধ্যমে ফিজারের চতুর্থ যুদ্ধের যবনিকাপাত হয়। উল্লেখ্য যে, এ যুদ্ধে কুরাইশদের চেয়ে হাওয়াযিন গোত্রের নিহতদের সংখ্যা বেশি ছিল।

হিলফুল ফুযূল (প্রতিজ্ঞা- সংঘ)

অতীতকালে ‘হিলফুল ফুযূল ’ নামে একটি প্রতিজ্ঞা ও চুক্তি জুর ম গোত্রের মধ্যে বিদ্যমান ছিল। এ প্রতিজ্ঞার মূল ভিত্তি ছিল অত্যাচারিত ও পতিতদের অধিকার সংরক্ষণ। এ চুক্তির স্থপতি ছিলেন ঐ সব ব্যক্তি যাদের প্রত্যেকের নাম ছিল ফযল ধাতু থেকে নিষ্পন্ন। প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ইমাদুদ্দীন ইবনে কাসীরের বর্ণনা অনুযায়ী হিলফুল ফুযূলের প্রতিষ্ঠাতাদের নাম ছিল ফযল বিন ফাযালাহ্ (فضل بن فضالة), ফযল বিন আল হারেস (فضل بن الحارث) এবং ফযল বিন ওয়াদাআহ্

(فضل بن وداعة) ।[১৬৮]

যেহেতু কয়েকজন কুরাইশ যে চুক্তি নিজেদের মধ্যে সম্পাদন করেছিলেন, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের দিক থেকে তা হিলফুল ফুযূলের অনুরূপ ছিল সেহেতু এ ঐক্য ও চুক্তির নামও ‘হিলফুল ফুযূল ’ দেয়া হয়েছিল।

মহানবীর নবুওয়াত ঘোষণার ২০ বছর পূর্বে যিলক্বদ মাসে এক ব্যক্তি পবিত্র মক্কা নগরীতে বাণিজ্যিক পণ্যসহ প্রবেশ করে। ঘটনাক্রমে আ’স ইবনে ওয়ায়েল তা ক্রয় করে। কিন্তু যে মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছিল সে ঐ লোকটিকে তা পরিশোধ না করলে তাদের মধ্যে তীব্র ঝগড়া বেঁধে যায়। যে সব কুরাইশ বংশীয় ব্যক্তি পবিত্র কাবার পাশে বসা ছিল তাদের প্রতি (হতভাগ্য) পণ্য বিক্রেতার দৃষ্টি পড়ল এবং তার আহাজারি ও ক্রন্দনধ্বনিও তীব্র ও উচ্চ হলো। সে কিছু কবিতা আবৃত্তি করল যা ঐ সব লোকের অন্তঃকরণে প্রচণ্ডভাবে নাড়া দিল যাদের ধমণীতে পৌরুষ ও শৌর্য- বীর্যের রক্ত প্রবাহমান ছিল। ইত্যবসরে যুবাইর ইবনে আবদুল মুত্তালিব উঠে দাঁড়ালেন এবং তাঁর সাথে আরো কতিপয় ব্যক্তিও আবদুল্লাহ্ ইবনে জাদআনের গৃহে একত্রিত হলেন। তাঁরা পরস্পর প্রতিজ্ঞা করলেন এবং বিদ্যমান পরিস্থিতিতে যতদূর সম্ভব অত্যাচারীর কাছ থেকে অত্যাচারিতের অধিকার আদায় করার ক্ষেত্রে ঐক্যবদ্ধ থাকার ব্যাপারে শপথ করলেন। প্রতিজ্ঞা ও

চুক্তি সম্পন্ন হলে তাঁরা আস ইবনে ওয়ায়েলের কাছে আসলেন এবং সে যে পণ্য কিনে মূল্য পরিশোধ করে নি তা তার থেকে নিয়ে মালিকের কাছে ফিরিয়ে দিলেন।

আরবের কবি- সাহিত্যিক ও গীতিকারগণ এ চুক্তির প্রশংসায় বেশ কিছু কবিতাও রচনা করেছেন।[১৬৯]

মহানবী (সা.) উক্ত হিলফুল ফুযূলে অংশগ্রহণ করেছিলেন। কারণ তা মজলুমের জীবন রক্ষার নিশ্চয়তা প্রদান করত। মহানবী এ চুক্তি ও প্রতিজ্ঞার ব্যাপারে বেশ কিছু কথা বলেছেন যেগুলোর মধ্য থেকে এখানে কেবল দু'টি বাণীর উদ্ধৃতি দেব :

لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفا لو دعيت به في الأسلام لأجبت

"আবদুল্লাহ্ ইবনে জাদআনের ঘরে এমন একটি প্রতিজ্ঞা সম্পাদিত হবার বিষয় প্রত্যক্ষ করেছিলাম যদি এখনও (নবুওয়াত ঘোষণার পরেও) আমাকে উক্ত প্রতিজ্ঞার দিকে আহবান জানানো হয় তাহলেও আমি এতে সাড়া দেব।"

ইবনে হিশাম বর্ণনা করেছেন : মহানবী (সা.) হিলফুল ফুযূল চুক্তির ব্যাপারে পরবর্তীকালে বলেছেন,

ما أحب أن لي به حمر النعم

"লাল পশম বিশিষ্ট উটের বদলেও এ চুক্তি ভ   করতে আমি মোটেও প্রস্তুত নই।"

হিলফুল ফুযূল এতটা দৃঢ় ও প্রতিষ্ঠিত ছিল যে, ভবি   ৎ প্রজন্মও এ চুক্তির অন্তর্নিহিত মূল বিষয় মেনে চলার ব্যাপারে নিজেদের দায়িত্ব আছে বলে বি াস করত। মুয়াবিয়ার পক্ষ থেকে নিযুক্ত ওয়ালীদ ইবনে উতবাহ্ ইবনে আবু সুফিয়ানের পবিত্র মদীনা নগরীর প্রশাসক থাকাকালীন যে ঘটনাটি ঘটেছিল তা এ বিষয়ের উৎকৃষ্ট দলিল। শহীদদের নেতা ইমাম   সাইন ইবনে আলী (আ.) জীবনে কখনই অ ায়ের কাছে মাথা নত করেন নি। একবার একটি সম্পত্তিকে কেন্দ্র করে মদীনার তৎকালীন শাসনকর্তার সাথে তাঁর মতপার্থক্য হয়েছিল। ইমাম   সাইন অত্যাচার ও অ ায়ের ভিত্তি ধ্বংস করা এবং জনগণকে   ায্য অধিকার আদায় করার প্রক্রিয়ার সাথে পরিচিত করানোর জ   ঐ জালেম শাসনকর্তাকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন, "মহান আল্লাহর শপথ, যদি তুমি

আমার ওপর অ   ায় ও জোরজবরদস্তি কর তাহলে আমি আমার তরবারি কোষমুক্ত করে মহানবী (সা.)- এর মসজিদে দাঁড়িয়ে ঐ চুক্তি ও প্রতিজ্ঞার দিকে সবাইকে আহবান করব যা তাদের পূর্ব পুরুষগণই সম্পাদন করেছিলেন। ” তখন আবদুল্লাহ্ ইবনে যুবাইর দণ্ডায়মান হয়ে এ কথারই পুনরাবৃত্তি করলেন এবং আরো বললেন, “আমরা সবাই রুখে দাঁড়াব এবং তাঁর   ায্য অধিকার আদায় করব অথবা এ পথে আমরা সবাই নিহত হব। ” ইমাম   সাইন (আ.)- এর এ উদাত্ত আহবান ধীরে ধীরে আল মিসওয়ার ইবনে মিখরামাহ্ ও আবদুর রহমান ইবনে উসমানের মতো সকল আত্মসম্মানবোধসম্পন্ন ব্যক্তির কর্ণগোচর হলে সবাই ইমাম   সাইনের আহ্বানে সাড়া দিয়ে তাঁর দিকে ছুটে গেলেন। ফলে ঐ অত্যাচারী শাসনকর্তা উদ্ভূত এ পরিস্থিতিতে ভয় পেয়ে যায় এবং ইমামের ওপর অত্যাচার করা থেকে বিরত থাকে।[১৭০]

নবম অধ্যায় : মেষ পালন থেকে বাণিজ্য

আধ্যাত্মিক নেতাদের অনেক মহান দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে। এ দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে তাঁদের বঞ্চনা, নির্যাতন এবং হত্যাকাণ্ড অর্থাৎ বিভিন্ন ধরনের বিপদাপদের সম্মুখীন হতে হয়। আর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য যত মহৎ হবে তা অর্জন করার পথে বিপদাপদও তত বেশি ভয় র হবে।

এ হিসাবে আধ্যাত্মিক নেতাদের সফলকাম হওয়ার পূর্ব শর্তই হচ্ছে ধৈর্য ও সহনশীলতা। অর্থাৎ যে কোন ধরনের অপবাদ, তিরস্কার এবং উৎপীড়ন ও নির্যাতনের মোকাবিলায় ধৈর্যধারণ। কারণ সংগ্রামের সকল পর্যায়ে ধৈর্য ও সহনশীলতা কাঙ্ক্ষিত উদ্দেশ্য অর্জনের প্রকৃত শর্ত। এ কারণেই একজন প্রকৃত নেতার পক্ষে শত্রুদের আধিক্য দেখে ভয় পাওয়া এবং পশ্চাদপসরণ করা অনুচিত। অনুসারীদের স্বল্পতাও যেন তাকে ক্লান্ত ও অবসাদগ্রস্ত না করে। যে কোন ধরনের অনভিপ্রেত ঘটনা ঘটার ব্যাপারে ভীত- সন্ত্রস্ত হওয়া ও ঘাবড়ে যাওয়া অনুচিত।

নবীদের জীবনেতিহাসে এমন সব বিষয় রয়েছে যেগুলো চিন্তা করা আমাদের মতো সাধারণ মানুষের জ অত্যন্ত কষ্টকর ও কঠিন। হযরত নূহ (আ.)- এর জীবনী অধ্যয়ন করে জানতে পারি যে, তিনি ৯৫০ বছর (জনগণকে মহান আল্লাহর দীনের দিকে) আহবান করেছিলেন। তাঁর এ দীর্ঘ সংগ্রাম ও প্রচেষ্টার ফলাফল ছিল এই যে, মাত্র ৭১ জন লোক তাঁর প্রতি ঈমান এনেছিলেন। অর্থাৎ প্রতি বারো বছরে তিনি মাত্র একজন ব্যক্তিকে হেদায়েত করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

মানুষের মাঝে ধৈর্য ও সহনশীলতা ধীরে ধীরে গড়ে ওঠে। অবশ্যই অনভিপ্রেত ঘটনাবলী ঘটতে হবে। তাহলে মানবাত্মা কঠিন ও কষ্টকর বিষয়াদির সাথে পরিচিত হতে পারবে।

মহান নবীরা নবুওয়াত ও রিসালতের মর্যাদায় আনুষ্ঠানিকভাবে অধিষ্ঠিত হওয়ার আগেই তাঁদের জীবনের একটি অংশ পশুচারণ ও পশুপালনে ব্যয় করেছেন। তাঁরা বেশ কিছু সময় মরু- প্রান্তরে পশুপালনে ব্যস্ত ছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল এর মাধ্যমে মানব জাতিকে প্রকৃত মানব হিসাবে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে ধৈর্যশীল হওয়া এবং সব ধরনের বিপদাপদ ও দুঃখ- কষ্টকে সহজ বলে গণ্য করা। কারণ বুদ্ধি ও অনুধাবন করার ক্ষমতার দিক থেকে পশু মানুষের সাথে তুলনার পুরোপুরি

অযোগ্য। পশুপালন করার ক্লেশ যে ব্যক্তি সহ্য করতে পারবে অবশ্যই সে পথভ্রষ্টদের সুপথ প্রদর্শনের দায়িত্বভারও গ্রহণ করতে পারবে। আর এ সব পথভ্রষ্ট ব্যক্তির স্বভাবপ্রকৃতির (ফিতরাত) মূল ভিত মহান আল্লাহর প্রতি বি াস দ্বারা গঠিত (অর্থাৎ মুমিন- কাফির নির্বিশেষে সকল মানুষের ফিতরাতে ষ্টার প্রতি বি াস লুক্কায়িত রয়েছে। মুমিনদের মাঝে এ বি াস বিকশিত হয় আর কাফিরদের মাঝে এ বি াস কুফরের কারণে সুপ্ত ও অবিকশিত থেকে যায়।) এ কারণেই একটি হাদীসে বর্ণিত আছে :

ما بعث الله نبيّا قطّ حتّى يسترعيه الغنم ليعلّمه بذلك رعيّة للنّاس

"মহান আল্লাহ্ এমন কোন নবীকে প্রেরণ করেন নি যাঁকে পশুচারণ করার কাজে নিয়োজিত করেন নি। পশুচারণ কাজে সকল নবীকে নিযুক্ত করার উদ্দেশ্যই হচ্ছে এর মাধ্যমে মানব জাতির সুষ্ঠু প্রশিক্ষণ ও প্রতিপালন পদ্ধতি শেখা ও আয়ত্ত করা।"[১৭১]

মহানবী (সা.)ও তাঁর জীবনের একটি অংশ এ পথেই অতিবাহিত করেছেন। অনেক সীরাত রচয়িতা উল্লেখ করেছেন যে, মহানবী (সা.) বলেছেন,

ما من نبيّ إلّا و قد رعى الغنم قيل و أنت يا رسول الله؟ فقال : أنا رعيتها لأهل مكّة بالقراريط

"নবুওয়াত ও রিসালাতের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হওয়ার আগেই সকল নবী ও রাসূল বেশ কিছুকাল পশুচারণ ও পালন করেছেন।" তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো : আপনিও কি পশুচারণ করেছেন? তিনি তখন বললেন, "হ্যাঁ, আমিও বেশ কিছুদিন কারারীত উপত্যকায় মক্কাবাসীদের পশুগুলো চড়িয়েছি।"[১৭২]

যে ব্যক্তি আবু জাহল ও আবু লাহাবদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করবেন এবং অধঃপতিত ব্যক্তিবর্গ যাদের চিন্তা- চেতনা, বিবেক- বুদ্ধি ও বোধশক্তির দৌড় এতটুকুই ছিল যে, তারা যে কোন পাথর ও কাঠ নির্মিত প্রতিমার সামনে শ্রদ্ধাবনত হয়ে যেত, এ ধরনের হীন- নীচ ব্যক্তিদের মধ্য থেকে যিনি এমন সব ব্যক্তিকে গড়ে তুলবেন যারা একমাত্র মহান ষ্টার ইচ্ছা ব্যতীত আর কারো ইচ্ছার কাছে আত্মসমর্পণ করবে না, তাঁকে তো অবশ্যই বিভিন্নভাবে ও পদ্ধতিতে ধৈর্য ও সহনশীলতার শিক্ষা নিতেই হবে।

অন্য কারণ

এ স্থলে এ কাজের আরো একটি কারণও উল্লেখ করা যেতে পারে। আর তা হলো যে, একজন স্বাধীনচেতা ব্যক্তি যার ধমনীতে আত্মসম্ভ্রমবোধ, শৌর্যবীর্য ও সাহসিকতার রক্ত প্রবাহমান, অশালীনতা এবং লাম্পট্যের দৃশ্য অবলোকন স্বাভাবিকভাবে তার কাছে অত্যন্ত কষ্টকর হবে। পরম সত্য মহান আল্লাহর ইবাদাত থেকে মক্কাবাসীদের বিমুখতা এবং নি প্রাণ প্রতিমাসমূহের চারপাশে তাদের প্রদক্ষিণ সব কিছুর চেয়ে বেশি একজন বোধসম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষে অপ্রীতিকর হবে। এ কারণেই মহানবী (সা.) বেশ কিছুদিন উন্মুক্ত মরু- প্রান্তরে ও পাহাড়ে কাটিয়ে দেয়ার মধ্যে কল্যাণ প্রত্যক্ষ করলেন। কারণ উন্মুক্ত মরু- প্রান্তর, উপত্যকা, পাহাড়- পর্বত স্বাভাবিকভাবেই ঐ সময়কার দূষিত সমাজ ও পরিবেশ থেকে মুক্ত ছিল। আর এর মাধ্যমে মহানবী তদানীন্তন সামাজিক পরিবেশের নাজুক অবস্থা দর্শন করে যে আত্মিক কষ্ট পেতেন তা থেকে খানিকটা হলেও নিস্কৃতি পেয়েছিলেন (এবং তাঁর চিত্ত প্রসন্নতা অর্জন করেছিল)।

অবশ্য এ কথার অর্থ এ নয় যে, দুর্নীতি ও অপরাধের সামনে একজন খোদাভীরু ব্যক্তি নীরবতা অবলম্বন করবেন এবং তাঁর নিজ জীবনকে অধঃপতিত ব্যক্তিদের থেকে পৃথক করে নেবেন। বরং যেহেতু মহানবী (সা.) মহান আল্লাহর কাছ থেকে নীরবতা অবলম্বনের জ   আদিষ্ট হয়েছিলেন এবং তখনও নবুওয়াতের ক্ষেত্র প্রস্তুত ছিল না, তাই তিনি এ ধরনের পদ্ধতি (মক্কার কোলাহলপূর্ণ দূষিত ও দুর্নীতিগ্রস্ত পরিবেশ থেকে মুক্ত হয়ে কিছুকাল নির্মল উন্মুক্ত মরু- প্রান্তর, পাহাড়- পর্বত এবং উপত্যকায় অবস্থান) তাঁর জ   মনোনীত করেছিলেন।

তৃতীয় কারণ

এ কাজটি (পশুচারণ) ছিল আকাশের সুন্দর দৃশ্যাবলী, তারকারাজির অবস্থা, প্রকৃতিজগৎ ও মনোজগতের নিদর্শনাবলী অধ্যয়ন ও গভীরভাবে চিন্তা- ভাবনা করার জ   এক বিরাট সুযোগ। আর এর সবই হচ্ছে মহান ষ্টার অস্তিত্বের নিদর্শন।

নবীদের অন্তঃকরণ তাঁদের সৃষ্টি ও জন্মের শুরু থেকেই তাওহীদের প্র লিত আলোকবর্তিকা দ্বারা উজ্জ্বল হওয়া সত্ত্বেও মহান আল্লাহর নিদর্শন এবং অস্তিত্বজগৎসমূহ নিয়ে গভীরভাবে ধ্যান ও

অধ্যয়ন করার প্রতি তাঁরা অমুখাপেক্ষী নন। তাঁরা এ পথেই ঈমানের সর্বোচ্চ পর্যায়ে উপনীত হয়েছেন এবং আকাশসমূহ ও পৃথিবীর চেয়ে উন্নত মালাকুত বা উর্ধ্বলোক অর্থাৎ মহান আল্লাহর মহিমা ও আধ্যাত্মিক জগতে প্রবেশের অধিকার পেয়েছেন।[১৭৩]

আবু তালিবের প্রস্তাব

আবু তালিব যিনি ছিলেন কুরাইশদের প্রধান এবং দানশীলতা, মহত্ত্ব, ঔদার্য ও চারিত্রিক দৃঢ়তার ক্ষেত্রে প্রসিদ্ধ তিনি নিজ ভ্রাতুষ্পুত্র হযরত মুহাম্মদ (সা.)- এর কষ্টকর জীবনযাপন অবলোকন করে তাঁর পেশা নিয়ে চিন্তা- ভাবনা করতে বাধ্য হলেন। তাই তিনি তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রকে প্রস্তাব দিলেন, "ধনাঢ্য কুরাইশ রমণী এবং ব্যবসায়ী খাদীজাহ্ বিনতে খুওয়াইলিদ একজন বি স্ত ব্যক্তির সন্ধান করছেন যে তাঁর ব্যবসায়ের দায়িত্বভার গ্রহণ করবে এবং তাঁর পক্ষ থেকে কুরাইশদের বাণিজ্য কাফেলায় অন্তর্ভুক্ত হয়ে তাঁর ব্যবসায়িক পণ্য শামদেশে নিয়ে বিক্রি করবে। হে মুহাম্মদ! তুমি যদি তাঁর কাছে নিজেকে এ কাজের জ প্রার্থী হিসাবে উপস্থাপন কর তাহলে কতই না উত্তম হবে!"[১৭৪]

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) যেহেতু উচ্চ দয়ের অধিকারী ছিলেন সেহেতু কোন পূর্ব প্রেক্ষাপট ও আবেদন ব্যতীত হযরত খাদীজার কাছে গিয়ে সরাসরি এ ধরনের প্রস্তাব করতে তাঁর বাধছিল। এ কারণেই তিনি চাচা আবু তালিবকে বলেছিলেন, "সম্ভবত খাদীজাহ্ নিজেই আমার কাছে লোক পাঠাবেন।" কারণ তিনি জানতেন, তিনি জনগণের মাঝে 'আল আমীন' উপাধিতে ভূষিত ও প্রসিদ্ধ। ঘটনাও ঠিক এমনই ঘটেছিল। যখন খাদীজাহ্ মহানবীর সাথে আবু তালিবের উক্ত আলোচনা সম্পর্কে অবহিত হলেন তখন তাৎক্ষণিকভাবে এক ব্যক্তিকে মহানবীর কাছে প্রেরণ করে জানালেন, "আপনার সত্যবাদিতা, বি স্ততা এবং উত্তম চরিত্র আমাকে আপনার ব্যাপারে খুবই আগ্রহী করেছে। অ দের আমি যা দিই তার চেয়ে আপনাকে দ্বিগুণ দিতে এবং আপনার সাথে আমার দু'জন দাসকে পাঠাতে আমি প্রস্তুত যারা সফরের সকল পর্যায়ে আপনার আদেশ পালন করবে।"[১৭৫]

মহানবী এ ঘটনা চাচা আবু তালিবকে অবহিত করলেন। তিনি বললেন,

إنّ هذا الرزق ساقة الله إليك

" এ ঘটনা হচ্ছে যে জীবন মহান আল্লাহ্ তোমার কাছে পাঠিয়েছেন সেই জীবনের একটি মাধ্যম (উসিলা)। "

এখানে একটি বিষয় উল্লেখ না করে পারছি না, আর তা হলো মহানবী (সা.) কি কুরাইশ বাণিজ্য কাফেলায় হযরত খাদীজার কর্মচারী হিসাবে গিয়েছিলেন, না বিষয়টি অ রকম ছিল? অর্থাৎ মহানবী কি খাদীজার সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়েছিলেন যে, তিনি বাণিজ্যিক পণ্যসমূহের বিক্রয়লব্ধ মুনাফায় শরীক হবেন এবং তাঁদের মধ্যে 'মুদারাবাহ্ ' (ব্যবসায়িক) চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল? হাশিমী বংশের উচ্চ মর্যাদা এবং স্বয়ং মহানবীর আত্মিক ও চারিত্রিক দৃঢ়তা ও মর্যাদাবোধের কারণে তিনি কাফেলার সাথে খাদীজার কর্মচারী হিসাবে নয়, বরং মুদারাবাহ্ চুক্তির ভিত্তিতে তাঁর ব্যবসায়ে অংশীদার হিসাবে শামদেশে গমন করেছিলেন। আর দু'টি জিনিস এ বিষয়টিকে সমর্থন করে।

প্রথমত আবু তালিবের প্রস্তাবে এমন কোন শব্দ নেই যা তাঁর ভাতিজার কর্মচারী হওয়ার বিষয়টি নির্দেশ করে, বরং তিনি এর আগে তাঁর অ া ভাইয়ের সাথে আলাপ- আলোচনা করে বলেছিলেন,

امضوا بنا إلى دار خديجة بنت خويلد حتّى نسألها أن تعطي محمّدا مالا يتجربه

" চল আমরা খাদীজার গৃহে গমন করে তাঁকে প্রস্তাব দিই যে, তিনি কিছু মূলধন মুহাম্মদকে প্রদান করুন যাতে করে সে তা দিয়ে ব্যবসা- বাণিজ্য করতে পারে।"[১৭৬]

দ্বিতীয়ত ইয়াকুবী তাঁর ইতিহাস গ্রন্থে লিখেছেন, "মহানবী (সা.) তাঁর জীবনে কারো বেতনভুক কর্মচারী হন নি।"[১৭৭]

কুরাইশ কাফেলা যাত্রা শুরু করার জ প্রস্তুত হয়ে গেল। খাদীজার ব্যবসায়িক পণ্যসমূহও উক্ত কাফেলার মধ্যে ছিল। ঐ সময় হযরত খাদীজাহ্ পথ চলতে সক্ষম এমন একটি উট এবং কিছু মূল্যবান বাণিজ্যিক পণ্য তাঁর ব্যবসায়িক প্রতিনিধি ও অংশীদার মুহাম্মদ (সা.)- এর যিম্মায় প্রদান

করলেন। তিনি তাঁর দু'জন দাসকে আদেশ দিলেন তারা যেন সকল সময় পূর্ণ শিষ্টাচার রক্ষা করে, তিনি যা আদেশ দেবেন তা পালন করে এবং সকল অবস্থায় তাঁর অনুগত থাকে।

অবশেষে বাণিজ্য কাফেলা গন্তব্যস্থলে পৌঁছল। সবাই এ সফরে লাভবান হয়েছিল। কিন্তু মহানবী (সা.) সবার চেয়ে বেশি মুনাফা অর্জন করেছিলেন। তিনি তিহামার বাজারে বিক্রি করার জ আরো কিছু পণ্য ক্রয় করেছিলেন।

কুরাইশ বাণিজ্য কাফেলা পূর্ণ ব্যবসায়িক সাফল্য অর্জন করার পর মক্কাভিমুখে রওয়ানা হলো। যুবক মহানবী মক্কা প্রত্যাবর্তন কালে পুনরায় ধ্বংসপ্রাপ্ত আদ ও সামুদ জাতির আবাসস্থল অতিক্রম করেছিলেন। মৃত্যুপুরীর নীরবতা যা অবাধ্য ঐ জনপদকে আচ্ছন্ন করেছিল তা তাঁর দৃষ্টিকে বস্তুজগতের ঊর্ধ্বে বিরাজমান জগৎসমূহের দিকেই বেশি নিবদ্ধ করছিল। পূর্ববর্তী সফরের স্মৃতি মহানবীর মধ্যে পুনরায় জাগ্রত হলো। ঐ দিনের কথা তাঁর স্মরণ হলো যে দিন চাচা আবু তালিবের সাথে এ সব মরু- প্রান্তর ও উপত্যকা পাড়ি দিয়েছিলেন। কুরাইশ বাণিজ্য কাফেলা পবিত্র মক্কা নগরীর নিকটবর্তী হলে হযরত খাদীজার দাস মাইসারাহ্ মহানবীকে বলল, "কতই না উত্তম হবে যদি আপনি আমাদের আগে মক্কায় প্রবেশ করে হযরত খাদীজাকে এবারের বাণিজ্যিক সফরের ঘটনা এবং যে অভূতপূর্ব মুনাফা অর্জিত হয়েছে সে সম্পর্কে অবহিত করেন!" হযরত খাদীজাহ্ যখন নিজ কক্ষে বসেছিলেন তখন মহানবী মক্কায় প্রবেশ করলেন। খাদীজাহ্ তাঁকে অভ্যর্থনা জানানোর জ ত অগ্রসর হলেন এবং তাঁকে তাঁর বাসগৃহে নিয়ে আসলেন। মহানবী খুব চমৎকার ভাষায় পণ্যসমূহ বিক্রয় করার ঘটনা ব্যাখ্যা করলেন। আর ঠিক তখনই মাইসারাহ্ মক্কা নগরীতে প্রবেশ করল।[১৭৮]

খাদীজার দাস মাইসারাহ্ এ সফরে যা কিছু প্রত্যক্ষ করেছিল তার সবই মহানবীর উন্নত চরিত্র ও নীতি- নৈতিকতার পরিচায়ক ছিল। সে এ সব বিষয় খাদীজাকে জানিয়েছিল। যেমন এক ব্যাপারে এক ব্যবসায়ীর সাথে হযরত মুহাম্মদ (সা.)- এর মতবিরোধ হলে ঐ লোকটি তাঁকে বলেছিল, "লাত ও উয্যার নামে শপথ কর তাহলে আমিও তোমার কথা মেনে নেব।" তখন ঐ ব্যক্তির কথার জবাবে তিনি বলেছিলেন, "আমার কাছে সবচেয়ে নিকৃষ্ট ও ঘৃণ্য বস্তু হচ্ছে এই লাত

ও উয্যা যাদের তোমরা পূজা কর।"[১৭৯] এরপর মাইসারাহ্ আরো বলল, "বুসরায় মুহাম্মদ বিশ্রামের জ একটি গাছের ছায়ায় বসেছিলেন। ঠিক তখনই গির্জার মধ্যে বসে থাকা একজন পাদ্রীর দৃষ্টি তাঁর ওপর পড়লে সে সেখান হতে বের হয়ে এসে তাঁর নাম জিজ্ঞাসা করেছিল। এরপর সে বলেছিল : এই ব্যক্তি যিনি এ গাছের ছায়ায় বসে আছেন তিনি ঐ নবী যাঁর ব্যাপারে তাওরাত ও ইঞ্জিলে প্রচুর সুসংবাদ আমি নিজে অধ্যয়ন করেছি। " [১৮০]

ইসলামের মহীয়সী নারী হযরত খাদীজাহ্

ঐ দিন পর্যন্ত মহানবী (সা.)- এর আর্থিক অবস্থা ভালো ও সুবি স্ত ছিল না। তখনও তিনি চাচা আবু তালিবের আর্থিক সাহায্য ও দানের মুখাপেক্ষী ছিলেন। তাঁর কাজ ও পেশার অবস্থাও বাহ্যত খুব একটা দৃঢ় ছিল না বলেই বিবাহ করে সাংসারিক জীবনযাপন করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হচ্ছিল না। শামদেশে তাঁর সর্বশেষ (বাণিজ্যিক) সফর যা তিনি কুরাইশ বংশীয়া একজন ধনাঢ্য মহিলার পক্ষ থেকে প্রতিনিধি হয়ে আঞ্জাম দিয়েছিলেন সেই সফরের বদৌলতে তাঁর আর্থিক অবস্থা বেশ কিছুটা সচ্ছল হয়েছিল। যুবক মহানবীর সাহসিকতা ও দক্ষতা খাদীজাকে বিস্ময়াভিভূত করেছিল। তিনি তাঁকে চুক্তির মাধ্যমে নির্ধারিত পরিমাণের চেয়েও বেশি অর্থ পুরস্কারস্বরূপ প্রদান করার ইচ্ছা করলেন। কিন্তু মহানবী (সা.) যে পারিশ্রমিক কাজের শুরুতেই নির্ধারণ করা হয়েছিল কেবল সেটিই গ্রহণ করলেন। এরপর তিনি চাচা আবু তালিবের গৃহের দিকে রওয়ানা হলেন এবং এ সফরে যা কিছু লাভ করেছিলেন তার পুরোটাই আবু তালিবের সংসারে সচ্ছলতা ফিরিয়ে আনার জ চাচার হাতে অর্পণ করলেন।

তাঁকে দেখেই অধীর আগ্রহে ভ্রাতুষ্পুত্রের জ অপেক্ষমান চাচার চোখ বেয়ে আনন্দাশ্রু ঝরতে লাগল। এই ভ্রাতুষ্পুত্র ছিল তাঁর পিতা আবদুল মুত্তালিব ও ভ্রাতা আবদুল্লাহর একমাত্র স্মৃতি। ভ্রাতুষ্পুত্রের ব্যবসায়িক সাফল্য এবং যে প্রচুর লাভ তিনি অর্জন করেছিলেন সে সম্পর্কে যখন তিনি অবগত হলেন তখন তিনি খুবই আনন্দিত হয়েছিলেন। তিনি দু'টি ঘোড়া ও দু'টি উট ভ্রাতুষ্পুত্রের হাতে অর্পণ করতে চাইলেন যাতে করে তিনি তাঁর ব্যবসা- বাণিজ্য নির্বিঘ্নে চালিয়ে যেতে সক্ষম হন।

মহানবী এ সফরে যে অর্থ উপার্জন করেছিলেন তার পুরোটাই চাচা আবু তালিবের হাতে তুলে দেন যাতে তিনি তাঁর বিবাহের ব্যবস্থা ও আয়োজন করতে পারেন।

শামে বাণিজ্যিক সফর থেকে ফেরার পর আর্থিক সচ্ছলতা এলে মহানবী জীবনস নী হিসাবে একজন উপযুক্ত স্ত্রী গ্রহণ করার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু কিভাবে হযরত

খাদীজাকে তিনি কাঙ্ক্ষিত স্ত্রী হিসাবে পেলেন, অথচ উকবাহ্ ইবনে আবি মুয়ীত, আবু জাহল ও আবু সুফিয়ানের মতো ধনাঢ্য ও প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গের বিবাহের প্রস্তাব তিনি ইতোমধ্যে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন? কোন্ কোন্ কারণ এ দু'জনকে পরস্পরের নিকটবর্তী করেছিল যাঁদের জীবনযাপন পদ্ধতি ছিল সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী এবং তাঁদের মধ্যে এমন দৃঢ় সম্পর্ক, মায়া-মমতা, প্রেম- ভালোবাসা ও আধ্যাত্মিকতার বন্ধন সৃষ্টি করেছিল যার ফলে হযরত খাদীজাহ্ তাঁর যাবতীয় ঐ র্য ও ধন- সম্পদ স্বামী মুহাম্মদ (সা.)- এর হাতে অর্পণ করেছিলেন যা ইসলাম ধর্ম, কলেমা- ই তাইয়্যেবাহ্ এবং তাওহীদের পতাকা চির উন্নত ও বুলন্দ করার পথে ব্যয় করা হয়েছিল? যে গৃহের চারদিক ও অভ্যন্তরভাগ হাতীর দাঁতনির্মিত ও মুক্তাখচিত অতি মূল্যবান চেয়ার ও আসবাবপত্র দিয়ে পূর্ণ ছিল এবং যা ভারতীয় রেশমী বস্ত্র এবং কারুকাজ করা ইরানী পর্দা দিয়ে সুশোভিত ছিল তা কিভাবে অসহায় মুসলমানদের আশ্রয়স্থলে পরিণত হয়েছিল?

এ সব ঘটনার উৎস সন্ধান করতে হলে অবশ্যই হযরত খাদীজার জীবনেতিহাস অধ্যয়ন করতে হবে। যে বিষয়টি নিশ্চিত তা হলো, যে ব্যক্তি দৃঢ়, পবিত্র ও আধ্যাত্মিক উৎসমূলের অধিকারী না হবে তার পক্ষে এ ধরনের আত্মত্যাগ করা কখনই সম্ভব হবে না।

ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, এ বিবাহ মহানবীর খোদাভীতি, চরিত্র, সততা এবং বি স্ততার প্রতি খাদীজার বি াস থেকে উৎসারিত। হযরত খাদীজার জীবনচরিত এবং যে সব কাহিনী তাঁর উচ্চ মর্যাদা প্রসে বর্ণিত হয়েছে সেগুলো থেকেও এ বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যায়।

হযরত খাদীজাহ্ ছিলেন সচ্চরিত্রা রমণী। তিনি সব সময় খোদাভীরু ও চরিত্রবান স্বামীর সন্ধান করছিলেন। আর এ কারণেই মহানবী তাঁর ব্যাপারে বলেছেন, "খাদীজাহ্ বেহেশতের উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন রমণীদের অন্তর্ভুক্ত।" তিনিই প্রথম মহিলা যিনি মুহাম্মদ (সা.)- এর প্রতি ঈমান এনেছিলেন। আমীরুল মুমিনীন আলী (আ.) মহানবীর নবুওয়াতের সূচনালে ইসলাম ধর্মের নিঃস তার দিকে ই ত করে একটি ভাষণে বলেছেন,

لم يجمع بيت واحد يومئذ في الإسلام غير رسول الله و خديجة و أنا ثالثهما

“সে দিন রাসূলুল্লাহ্ ও খাদীজার গৃহ ব্যতীত ইসলামে বি াসী আর কোন ঘর ছিল না; আমি ছিলাম তাঁদের পর ইসলামে বি াসী তৃতীয় ব্যক্তি।”[১৮১]

ইবনে আসীর লিখেছেন, “আফীফ নামের একজন ব্যবসায়ী মসজিদুল হারামে প্রবেশ করে তিন ব্যক্তির ইবাদাত- বন্দেগীর দৃশ্য অবলোকন করে অত্যন্ত আশ্চর্যান্বিত হয়েছিল। সে দেখতে পেল যে, মহানবী (সা.) খাদীজাহ্ ও আলীর সাথে সেই মহান আল্লাহর ইবাদাতে মশগুল ঐ এলাকার অধিবাসীরা যার ইবাদাত- বন্দেগী ত্যাগ করে মিথ্যা উপাস্য ও দেব- দেবীর পূজা- অর্চনায় লিপ্ত হয়েছে। ঘটনা যাচাই করার জ সে মহানবীর চাচা আব্বাসের সাথে যোগাযোগ করে যা সে দেখেছে তা তাঁর কাছে বর্ণনা করে এবং তাঁকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করে। মহানবীর চাচা আব্বাস তাঁকে বলেছিলেন : প্রথম ব্যক্তিটি নবুওয়াতের দাবিদার; আর ঐ মহিলা তার স্ত্রী খাদীজাহ্ এবং ঐ তৃতীয় ব্যক্তিটি আমার ভ্রাতুষ্পুত্র আলী। এরপর তিনি বললেন :

ما علمت على ظهر الأرض كلّها على هذا الدين غير هؤلاء الثّلاثة

এ তিন ব্যক্তি ব্যতীত পৃথিবীর বুকে এ ধর্মের আর কোন অনুসারী আছে কি না তা আমার জানা নেই।”[১৮২]

যে সব হাদীস ও রেওয়ায়েতে হযরত খাদীজার মর্যাদা বর্ণিত হয়েছে আসলে তা বর্ণনা করা আমাদের এ গ্রন্থের সীমিত কলেবরে সম্ভব নয়। তাই এ ঐতিহাসিক ঘটনার অন্তর্নিহিত কারণগুলো এখন ব্যাপকভাবে আলোচনা করাই আমাদের জ সমীচীন হবে।

বিবাহের প্রকাশ্য ও গুপ্ত কারণসমূহ

বস্তুবাদীরা যারা সকল বিষয় ও জিনিসকে বস্তুবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করে তারা হয়তো ভাবতে পারে যে, যেহেতু খাদীজাহ্ ধনাঢ্যা মহিলা ও ব্যবসায়ী ছিলেন সেহেতু তাঁর ব্যবসায়িক কাজ- কর্ম দেখাশোনা করার জ অ কিছুর চেয়ে একজন বি স্ত ব্যক্তির প্রয়োজন ছিল সবচেয়ে বেশি। এ কারণে তিনি হযরত মুহাম্মদ (সা.)- কে বিবাহ করেন। আর যেহেতু হযরত

মুহাম্মদও খাদীজার মর্যাদাসম্পন্ন জীবন সম্পর্কে অবগত ছিলেন, যদিও তাঁদের মধ্যে বয়সের দিক থেকে কোন মিল ছিল না তারপরও তিনি তাঁর বিবাহের প্রস্তাব গ্রহণ করেছিলেন।

কিন্তু ইতিহাস থেকে প্রতীয়মান হয় যে, কুরাইশদের শ্রেষ্ঠ সত্যবাদী ও বি স্ত ব্যক্তি হযরত মুহাম্মদ (সা.)- এর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে তাঁকে যে সব বিষয় উদ্বুদ্ধ করেছিল তা ছিল কতগুলো আধ্যাত্মিক ও নৈতিক বিষয়- কতগুলো বস্তুগত দিক ও বিষয় নয়। নিচে আমরা এর সপক্ষে প্রমাণ পেশ করছি :

১. যখন হযরত খাদীজাহ্ মাইসারার কাছ থেকে হযরত মুহাম্মদ (সা.)- এর শাম সফরের বিবরণ জানতে চেয়েছিলেন তখন সে ঐ সফরে যে সব অলৌকিক ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছিল এবং শামের ি ষ্টান পাদ্রীর কাছ থেকে যা শুনেছিল সব কিছু খাদীজার কাছে বিস্তারিত বর্ণনা করেছিল। খাদীজাহ্ তাঁর নিজের মধ্যে যে তীব্র ভালোবাসা, আকাঙ্ক্ষা ও আকর্ষণ অনুভব করেছিলেন এর উৎস ছিল হযরত মুহাম্মদ (সা.)- এর নীতি- নৈতিকতা ও আধ্যাত্মিকতার প্রতি আগ্রহ। তাই তিনি স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাকে বলেই ফেললেন, "মাইসারাহ্! যথেষ্ট, মুহাম্মদের প্রতি আমার টান ও আগ্রহকে ব গুণ বাড়িয়ে দিয়েছ। যাও আমি তোমাকে ও তোমার স্ত্রীকে দাসত্ব থেকে মুক্ত করে দিলাম এবং তোমাকে দু'শ দিরহাম, দু'টি ঘোড়া এবং কিছু মূল্যবান পোশাক দিয়ে দিলাম।"

এরপর তিনি মাইসারার কাছ থেকে যা কিছু শুনেছিলেন তা আরবের পণ্ডিত ওয়ারাকাহ্ ইবনে নওফেলের কাছে বর্ণনা করলেন। তিনি শোনার পর বললেন, "এ সব অলৌকিক ঘটনা সংঘটনকারী ব্যক্তি হচ্ছেন আরবীয় নবী।"[১৮৩]

২. একদিন খাদীজাহ্ তাঁর ঘরে বসেছিলেন। তাঁর চারপাশ ঘিরে রেখেছিল দাস- দাসীরা। একজন ইয়া দী পণ্ডিতও উক্ত মাহফিলে উপস্থিত ছিলেন। ঘটনাক্রমে যুবক মহানবী (সা.) এ ঘরের পাশ দিয়ে গমন করলেন। ঐ পণ্ডিতের দৃষ্টি মহানবীর ওপর পড়লে তৎক্ষণাৎ তিনি হযরত খাদীজাকে বলেন, যাতে করে তিনি তাঁকে কিছুক্ষণের জ উক্ত মাহফিলে যোগদান করার জ অনুরোধ করেন। মহানবী ইয়া দী পণ্ডিতের আবেদনে সাড়া দিলেন এবং মাহফিলে অংশগ্রহণ করলেন। উল্লেখ্য যে, মহানবী (সা.)- এর মধ্যে নবুওয়াতের বিদ্যমান লক্ষণগুলো দেখেই ইয়া দী পণ্ডিত

তাঁকে মাহফিলে অংশগ্রহণ করার জ   আবেদন জানিয়েছিলেন। এ সময় হযরত খাদীজাহ্ ঐ ইয়া দী পণ্ডিতকে লক্ষ্য করে বললেন, "যদি তাঁর চাচারা আপনার আগ্রহ ও অনুসন্ধানের ব্যাপারে অবগত হন তাহলে তাঁরা তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করবেন। কারণ তাঁরা ইয়া দীদের অনিষ্ট থেকে তাঁদের ভ্রাতুষ্পুত্রের ব্যাপারে শ ত।" এ কথা শুনে ইয়া দী পণ্ডিত বললেন, "মুহাম্মদের অনিষ্ট সাধন করা কি কারো পক্ষে সম্ভব, অথচ মহান আল্লাহ্ তাঁকে নবুওয়াত ও রিসালাতের পরিসমাপ্তি ও মানব জাতির হেদায়েতের জ   প্রতিপালিত করেছেন?" খাদীজাহ্ তখন জিজ্ঞেস করলেন, "আপনি কোথা থেকে জেনেছেন যে, তিনি এ ধরনের মর্যাদার অধিকারী হবেন?" এ প্রশ্ন শুনে তিনি বললেন, "আমি তাওরাত গ্রন্থে সর্বশেষ নবীর চিহ্ন ও নিদর্শনসমূহ অধ্যয়ন করেছি। তাঁর নিদর্শনাদির মধ্যে এও যে, তাঁর পিতা- মাতা মৃত্যুবরণ করবেন। তাঁর দাদা ও পিতৃব্য তাঁকে সাহায্য ও পৃষ্ঠপোষকতা করবেন। তিনি কুরাইশদের মধ্য থেকে এমন এক নারীকে বিবাহ করবেন যিনি কুরাইশদের নেত্রী।" এরপর তিনি খাদীজার দিকে ই ত করে বললেন, "ঐ রমণীকে অভিনন্দন যিনি তাঁর স্ত্রী হবার মর্যাদা ও গৌরব অর্জন করবেন।"[১৮৪]

৩. খাদীজার চাচা ওয়ারাকাহ্ ছিলেন আরবের অ তম পণ্ডিত ব্যক্তি। তিনি নতুন ও পুরাতন নিয়মের বিভিন্ন গ্রন্থাদি সম্পর্কে প্রচুর জ্ঞান ও তথ্যের অধিকারী ছিলেন। তিনি প্রায়শঃই বলতেন, "মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে কুরাইশদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি মানব জাতির হেদায়েতের জ   প্রেরিত ও মনোনীত হবেন এবং কুরাইশ বংশীয়া সর্বশ্রেষ্ঠা ধনাঢ্য রমণীদের মধ্য থেকে একজনকে তিনি বিবাহ করবেন।" আর যেহেতু খাদীজাহ্ ছিলেন কুরাইশ রমণীদের মধ্যে সবচেয়ে ধনাঢ্য সেহেতু তিনি প্রায়শ হযরত খাদীজাকে বলতেন, "এমন একদিন আসবে যে দিন তুমি পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মানবের সাথে শুভ পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হবে।"

৪. খাদীজাহ্ (আ.) এক রাতে স্বপ্ন দেখলেন, মক্কা নগরীর ওপর সূর্য ঘুরপাক খেয়ে ধীরে ধীরে নিচের দিকে নেমে আসল এবং তাঁর ঘরেই উপস্থিত হলো। তিনি তাঁর এ স্বপ্নের কথা ওয়ারাকাহ্ ইবনে নওফেলকে বললেন। তিনি এ স্বপ্নের বিবরণ শুনে বললেন, "তুমি একজন মহান ব্যক্তিকে বিবাহ করবে যার খ্যাতি সমগ্র বি ছড়িয়ে পড়বে।"

এগুলো হচ্ছে এমন সব ঘটনা যা কোন কোন ঐতিহাসিক উল্লেখ করেছেন এবং অনেক ইতিহাস গ্রন্থেও লিপিবদ্ধ হয়েছে। এ সব ঘটনা থেকে মহানবীর প্রতি হযরত খাদীজার আকর্ষণের কারণ স্পষ্ট হয়ে যায়। এ সব ঘটনা থেকে প্রমাণিত হয় যে, যুবক মহানবীর আধ্যাত্মিক মর্যাদা ও সম্মানের প্রতি হযরত খাদীজার বি াস ও আস্থা থেকেই প্রধানত মহানবীর প্রতি তাঁর এ আকর্ষণের উৎপত্তি। আর যেহেতু মহানবী (অর্থাৎ কুরাইশদের সর্বশ্রেষ্ঠ বি াসী ও সত্যবাদী) খাদীজার ব্যবসা- বাণিজ্য দেখাশোনা ও পরিচালনা করার জ   সবচেয়ে বেশি উপযুক্ত ছিলেন সেহেতু তা খুব সম্ভবত এ বৈবাহিক সম্পর্ক সৃষ্টির ক্ষেত্রে ন্যূনতম প্রভাবও রাখে নি।

হযরত খাদীজার বিবাহের প্রস্তাব

এটিই সন্দেহাতীতভাবে প্রতিষ্ঠিত বিষয় যে, হযরত খাদীজার পক্ষ থেকেই প্রথমে বিবাহের প্রস্তাব দেয়া হয়েছিল, এমনকি ইবনে হিশামও[১৮৫] বর্ণনা করেছেন যে, খাদীজাহ্ স্বয়ং এ বিবাহের ব্যাপারে আগ্রহ প্রদর্শন করেন। তিনি মহানবীকে বলেছিলেন, "হে পিতৃব্যপুত্র! আমার ও আপনার মধ্যে যে আত্মীয়তার সম্পর্ক আছে এবং আপনার সম্প্রদায়ের মাঝে আপনার যে উচ্চ সম্মান ও মর্যাদা রয়েছে এবং আপনার বি স্ততা এবং সত্যবাদিতার কারণে আপনার সাথে বিবাহ্ বন্ধনে আবদ্ধ হতে আমি গভীরভাবে আগ্রহী। আপনার সত্যবাদিতা আপনা থেকে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে।" তখন মহানবী (সা.) তাঁকে জবাব দিয়েছিলেন, "এ বিষয় সম্পর্কে আমার চাচাদেরকে অবগত করা এবং তাঁদের পরামর্শে এ কাজ সম্পন্ন করা প্রয়োজন।"

অধিকাংশ ঐতিহাসিক বি াস করেন যে, আলীয়ার ক া নাফীসাহ্ খাদীজার প্রস্তাব ঠিক এভাবে মহানবীর কাছে পৌঁছে দিয়েছিলেন :

"মুহাম্মদ! কেন আপনি আপনার জীবনকে প্রদীপসদৃশ উপযুক্ত স্ত্রী অর্থাৎ জীবনসি নীর দ্যুতি দ্বারা আলোকিত করছেন না? আপনাকে যদি রূপসী নারী, ধন- দৌলত, সম্মান ও মর্যাদার দিকে আহবান করি, তাহলে কি আপনি সাড়া দেবেন না?" মহানবী বললেন, "আপনার আসল উদ্দেশ্য কি?" তখন নাফীসাহ্ খাদীজার কথা উত্থাপন করলেন। মহানবী বললেন, "খাদীজাহ্ কি এতে সম্মত হবেন? কারণ তাঁর জীবনের সাথে আমার জীবনের অনেক পার্থক্য রয়েছে।" নাফীসাহ্ বললেন, "তাঁকে রাজী করার ভার আমার ওপর। আপনি একটি সময় নির্ধারণ করুন। ঠিক সে সময় তাঁর প্রতিনিধি আমর বিন আসাদ[১৮৬] আপনার ও আপনার আত্মীয়- স্বজনদের সাথে সাক্ষাৎ করে বিয়ের আকদ ও অনুষ্ঠানের আয়োজন করবেন।"

মহানবী (সা.) তাঁর চাচাদের সাথে (বিশেষ করে আবু তালিবের সাথে) বিবাহের ব্যাপারে আলোচনা করলেন। কুরাইশ বংশীয় শীর্ষস্থানীয় ও সম্মানিত ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতিতে একটি গৌরবোজ্জ্বল অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। প্রথমে হযরত আবু তালিব একটি ভাষণ দেন যার

শুরুতে তিনি মহান আল্লাহর প্রশংসা করার পর নিজ ভ্রাতুষ্পুত্রের পরিচিতি সবার সামনে তুলে ধরেন :

" আমার ভ্রাতুষ্পুত্র মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহকে যদি সকল কুরাইশ বংশীয় পুরুষের সাথে তুলনা করা হয় তাহলে তিনি তাদের সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। যদিও তিনি সব ধরনের সম্পদ থেকে বঞ্চিত; কিন্তু অর্থ- সম্পদ ইত্যাদি ছায়া বৈ আর কিছুই নয় যা ক্ষণস্থায়ী। আর উচ্চ বংশমর্যাদা ও কৌলি হচ্ছে এমন এক বিষয় যা স্থায়ী...।"[১৮৭]

হযরত আবু তালিবের ভাষণ শেষ হলে হযরত খাদীজার আত্মীয় ওয়ারাকাহ্ ইবনে নওফেল ইবনে আসাদ ভাষণ দিলেন। হযরত আবু তালিবের উক্ত ভাষণের উদ্দেশ্য ছিল কুরাইশ ও বনি হাশিমের পরিচিতি তুলে ধরা। ওয়ারাকাহ্ ইবনে নওফেল বললেন, "কোন কুরাইশই আপনাদের শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা অস্বীকার করতে অক্ষম। আমরা আন্তরিকতার সাথে আপনাদের সুমহান মর্যাদার রজ্জুকে আঁকড়ে ধরতে চাই।"[১৮৮]

বিবাহের আকদ সম্পন্ন হলো এবং মোহরানা ৪০০ দীনার নির্ধারণ করা হলো। তবে কোন কোন ঐতিহাসিক বলেছেন, মোহরানা ছিল ২০টি উট।

হযরত খাদীজার বয়স

এটিই প্রসিদ্ধ যে, এ বিয়ের সময় খাদীজার বয়স ছিল ৪০ বছর। তিনি হস্তি সালেরও ১৫ বছর আগে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু কোন কোন ঐতিহাসিক তাঁর বয়স এর চেয়েও কম ছিল বলে উল্লেখ করেছেন। মহানবীর সাথে এ বিয়ের আগে আতীক ইবনে আ'য়েয এবং আবু হালাহ্ মালেক বিন বান্নাশ আত তামীমী নামক দু'ব্যক্তির সাথে খাদীজার বিবাহ হয়েছিল, কিন্তু বৈবাহিক জীবনেই উক্ত স্বামীদ্বয় মৃত্যুমুখে পতিত হন।

দশম অধ্যায় :বিবাহ্ থেকে নবুওয়াত প্রাপ্তি পর্যন্ত

মানব জীবনের সবচেয়ে সংবেদনশীল মুহূর্ত হচ্ছে তাঁর যৌবনকাল। কারণ এ সময় যৌন প্রবৃত্তি ও চাহিদা পূর্ণতা লাভ করে; প্রবৃত্তির পূজারী যে কোন ধরনের কামনা- বাসনাকে লালন করে; জৈবিক চাহিদা ও প্রবৃত্তির কামনা- বাসনার ঝড় মানুষের বিবেক- বুদ্ধিকে তিমিরাচ্ছন্ন করে ফেলে; বস্তুগত রিপুসমূহের কর্তৃত্ব ও আধিপত্য সুদৃঢ় হয় এবং এর ফলে প্রদীপতুল্য বুদ্ধিবৃত্তি নিষ্প্রভ হয়ে পড়ে। দিবা- রাত্রি সময়- অসময় আকাশকুসুম আকাঙ্ক্ষার এক সুরম্য অট্টালিকার চিত্র যুবকের চোখের সামনে ভেসে উঠতে থাকে।

এ সময় যদি মানুষের হাতের মুঠোয় কোন সম্পদ থাকে তাহলে তার জীবন এক ভয়াবহ বিভীষিকায় পরিণত হয়। একদিকে পাশবিক ঝোঁক ও প্রবণতাসমূহ, শারীরিক সুস্থতা, অ দিকে বিবিধ বস্তুগত সুযোগ- সুবিধা, উপায়- উপকরণ এবং মোটা অংকের উপার্জন সম্মিলিতভাবে মানুষকে ভবি ৎ সম্পর্কে উদাসীন এবং প্রবৃত্তির কামনা- বাসনায় আক নিমজ্জিত রাখে। এ সময় মানুষ তার রিপুর তাড়না ও জৈবিক প্রবণতাসমূহ মেটাতেই ব্যস্ত হয়ে যায়।

চিন্তাশীল শিক্ষকগণ এ যুগসন্ধিক্ষণকে সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্যের সীমারেখা বলে চিহ্নিত করেছেন। খুব কমসংখ্যক যুবকই তাদের নিজেদের জ যুক্তিপূর্ণ জীবনযাপন পদ্ধতি, উন্নত চারিত্রিক গুণাবলী এবং পবিত্র আত্মিক শক্তি অর্জন করার উদ্দেশ্যে এমন এক পথ বেছে নিতে সক্ষম হয় যা তাদেরকে সব ধরনের বিপদাপদ থেকে রক্ষা করে।

আত্মসংযম এ সময় অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার। এ সময় যদি কোন যুবক পারিবারিক অ ন থেকে সঠিক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ লাভ না করে তাহলে তার জীবনের জ দুর্ভাগ্যের অপেক্ষাই করতে হবে।

মহানবীর যৌবনকাল

যুবক মহানবী যে সাহসী, নির্ভীক, দৈহিকভাবে শক্তিশালী ও সুস্থ- সবল ছিলেন এতে কোন সন্দেহ নেই। কারণ তিনি এমন এক নির্মল পরিবেশে প্রতিপালিত হয়েছিলেন যা ছিল নগর জীবনের কোলাহল ও জটিলতা থেকে মুক্ত। আর তিনি এমন এক বংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন যাঁরা প্রত্যেকেই ছিলেন সাহস ও বীরত্বের দীপ্ত প্রতীক। ধনাঢ্য রমণী খাদীজার বিপুল ধন- সম্পদ ও বিত্ত- বৈভব তাঁর করায়ত্তে ছিল। এর ফলে যে কোন ধরনের স্ফূর্তি ও আমোদ- প্রমোদে লিপ্ত হওয়ার যাবতীয় উপায়- উপকরণ তাঁর জ   প্রস্তুত ছিল। কিন্তু এখন আমাদের দেখা উচিত তিনি এ সব উপায়- উপকরণ কিভাবে ও কোন্ কাজে ব্যবহার করেছেন? তিনি কি স্ফূর্তি ও আমোদ- প্রমোদের দস্তরখান বিছিয়েছিলেন এবং অধিকাংশ যুবকের   ায় প্রবৃত্তির তাড়না ও কামনা- বাসনা চরিতার্থ করার চিন্তায় ম   থেকেছেন? অথবা তিনি কি এমন কোন পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন যা থেকে তাঁর সুমহান আধ্যাত্মিক- নৈতিক জীবনের চিত্র স্পষ্ট ও প্রতিফলিত হয়ে যায়? ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, তিনি বুদ্ধিমান ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের   ায় জীবনযাপন করতেন। তিনি সর্বদা আমোদ- প্রমোদ ও উদাসীনতা বর্জন করেছেন। তাঁর পবিত্র মুখমণ্ডলে সর্বদা গভীর মনন ও চিন্তাশীলতার চিহ্ন বিদ্যমান থাকত। সমাজের নৈতিক অধঃপতন থেকে দূরে থাকার জ   কখনো কখনো তিনি দীর্ঘক্ষণ পাহাড়ের পাদদেশে ও গুহায় নিভৃতে জীবনযাপন এবং অস্তিত্বজগতের সৃষ্টি ও বি - ব্রহ্মাণ্ডের মহান   ষ্টার বিদ্যমান শক্তির নিদর্শনাদি নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা- ভাবনা করতেন।

যৌবনকালীন আবেগ ও অনুভূতিসমূহ

মক্কার বাজারে একবার এমন একটি ঘটনা ঘটেছিল যা তাঁর সুকুমার মানবীয় আবেগ ও অনুভূতিকে মারাত্মকভাবে আহত করেছিল। তিনি বাজারে গিয়ে দেখতে পেলেন যে, এক জুয়ারী জুয়া খেলায় ম । ভাগ্য খারাপ হওয়ায় সে প্রথমে তার উটটি হারালো। এরপর তার নিজ বসত

বাড়িটিও হারালো। এরপর খেলাটা এমন ভয় র পর্যায়ে উপনীত হলো যে, সে তার জীবনের দশ বছরও হারালো (অর্থাৎ যার কাছে জুয়ায় হেরেছে তার কাছে দশ বছর সে ক্রীতদাসের মতো কাজ- কর্ম করবে। এ দশ বছর তার কোন স্বাধীনতাই থাকবে না)। এ দৃশ্য দেখে যুবক মহানবী এতটা ব্যথিত হলেন যে, তিনি ঐ দিন আর মক্কায় থাকতে পারলেন না। তিনি মক্কার পাশের পাহাড়ে চলে গেলেন এবং রাত হওয়ার পরেও বেশ কিছুক্ষণ সেখানে কাটিয়ে ঘরে প্রত্যাবর্তন করলেন। তিনি সত্যিই এ ধরনের দয়বিদারক দৃশ্য দেখে খুব ব্যথিত হতেন। তিনি এ সব পথভ্রষ্টের নির্বুদ্ধিতা প্রত্যক্ষ করে অত্যন্ত আশ্চর্যান্বিত ও চিন্তিত হতেন।

হযরত মুহাম্মদ (সা.)- এর সাথে হযরত খাদীজার বিবাহ- বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার আগেও তাঁর বাড়ি ছিল দুঃস্থ, সহায়- সম্বলহীন জনগণের আশার কাবা ও আশ্রয়স্থল। আর ঠিক তেমনি মহানবীর সাথে তাঁর বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার পরেও তাঁর গৃহের এ অবস্থার বি মাত্র পরিবর্তন হয় নি।

দুর্ভিক্ষ ও অনাবৃষ্টির সময় কখনো কখনো তাঁর দুধ মা হযরত হালীমাহ্ মহানবীর কাছে আসতেন। মহানবী মাটিতে নিজ চাদর বিছিয়ে তাঁকে বসতে দিতেন। তখন মহানবীর মানসপটে নিজ মায়ের কথা এবং শৈশবের সেই অনাড়ম্বর জীবনের স্মৃতি ভেসে উঠত। তিনি হযরত হালীমার কথা মনোযোগ দিয়ে শুনতেন। চলে যাওয়ার সময় তিনি হযরত হালীমাকে সাধ্যমত সাহায্য করতেন।[১৮৯]

খাদীজার গর্ভজাত সন্তানগণ

সন্তানের অস্তিত্ব বৈবাহিক জীবন ও বন্ধনকে দৃঢ় করে, জীবনকে করে আলোকিত; আর এক বিশেষ ধরনের দ্যুতি বয়ে এনে জীবন থেকে আঁধারকে করে বিতাড়িত। হযরত খাদীজার গর্ভে মহানবীর ছয়টি সন্তানের জন্ম হয়। এদের দু'টি ছিল পুত্রসন্তান; বড় ছেলের নাম ছিল কাসেম, এরপর আবদুল্লাহ্। কাসেম ও আবদুল্লাহকে যথাক্রমে তাহের ও তাইয়্যেবও বলা হতো। ৪ জন ছিল ক   াসন্তান। ইবনে হিশাম লিখেছেন, "জ্যেষ্ঠ ক   ার নাম ছিল রুকাইয়াহ্। পরবর্তীতে যয়নাব, উম্মে কুলসুম এবং ফাতিমা জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর পুত্রসন্তানদ্বয় তাঁর নবুওয়াতপ্রাপ্তির আগেই মৃত্যুবরণ করেছিলেন। কিন্তু তাঁর মেয়েরা তাঁর নবুওয়াতকাল প্রত্যক্ষ করেছেন।"[১৯০]

যে কোন অবস্থা ও পরিস্থিতিতে মহানবীর ধৈর্য তখন সকলের মুখে মুখে আলোচিত হতো। এতদসত্ত্বেও সন্তানদের মৃত্যুতে কখনো কখনো তাঁর অন্তরের বেদনা অশ্রুতে পরিণত হয়ে তাঁর চোখ থেকে পবিত্র গণ্ডদেশের ওপর ঝরে পড়ত। মারিয়ার গর্ভজাত তাঁর সন্তান ইবরাহীমের মৃত্যুতে মহানবী সবচেয়ে বেশি শোকাভিভূত হয়েছিলেন। তাঁর অন্তর তখন পুত্রবিয়োগের শোক ও বেদনায় মুহ্যমান ছিল, কিন্তু তাঁর ক   ছিল মহান আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশে ব্যস্ত, এমনকি এক মরুচারী আরব ইসলাম ধর্মের নীতিমালা ও মৌলিক আকীদা- বি   াস সম্পর্কে অজ্ঞ থাকার কারণে যখন তাঁর কাঁদার ব্যাপারে আপত্তি করেছিল তখন মহানবী বলেছিলেন, "এ ধরনের ক্রন্দন এক ধরনের রহমত।" এরপর তিনি বলেছিলেন,

و من لا يَرحم لا يُرحم

"যে দয়া করে না তার প্রতিও দয়া প্রদর্শন করা হয় না।"[১৯১]

ভিত্তিহীন ধারণা

ড. হাসানাইন হাইকাল 'মুহাম্মদের জীবন'[১৯২] গ্রন্থে লিখেছেন, "নিঃসন্দেহে খাদীজাহ্ এদের প্রত্যেকের মৃত্যুকালে মূর্তিগুলোর দিকে মুখ করে সেগুলোকে জিজ্ঞাসা করতেন : খোদাগণ কেন তাঁর প্রতি দয়া ও অনুগ্রহ প্রদর্শন করছেন না?"

ড. হাইকাল কর্তৃক বর্ণিত হযরত খাদীজার এ উক্তির ক্ষুদ্রতম ঐতিহাসিক দলিল- প্রমাণ বা ভিত্তি নেই। এ ধরনের বক্তব্যের উৎস হচ্ছে এই যে, ঐ সময় অধিকাংশ লোকই মূর্তিপূজক ছিল; অতএব, খাদীজাও তাদের মতোই (নাউযুবিল্লাহ্) মুশরিক ও মূর্তিপূজারী ছিলেন! অথচ মহানবী (সা.) যৌবনকালের শুরু থেকেই মূর্তিপূজা ও শিরককে তীব্রভাবে ঘৃণা করতেন এবং যে সফরে তিনি শাম গিয়েছিলেন সেই সফরে এ বিষয়টি আরো স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল। কারণ এক ব্যবসায়ীর সাথে যখন তাঁর হিসাব নিয়ে মতপার্থক্য হয়েছিল তখন ঐ ব্যবসায়ী লাত ও উয্যার নামে শপথ করেছিল। মহানবী তাকে বলেছিলেন, "আমার কাছে সবচেয়ে ঘৃণ্য বিষয় হচ্ছে এগুলোই (অর্থাৎ লাত, উয্যা এবং সকল প্রকার প্রতিমা ও মূর্তি যেগুলোর পূজা- অর্চনা করা হয়)।"

এমতাবস্থায় বলা যায় কি খাদীজার মতো নারী যাঁর নিজ স্বামীর প্রতি টান, ভালোবাসা ও ভক্তি সম্পর্কে কোন সন্দেহই নেই তিনি তাঁর সন্তানদের মৃত্যুতে মূর্তি ও প্রতিমা অর্থাৎ মিথ্যা দেব- দেবীর আশ্রয় নেবেন যেগুলো ছিল তাঁর স্বামীর কাছে সবচেয়ে ঘৃণার পাত্র? অধিকন্তু হযরত মুহাম্মদ (সা.)- কে বিবাহ করার ব্যাপারে তাঁর আগ্রহের কারণ ও ভিত্তি ছিল প্রধানত মহানবীর উত্তম চারিত্রিক গুণাবলী ও আধ্যাত্মিকতা। কারণ তিনি শুনেছিলেন যে, তিনিই শেষ নবী। এমতাবস্থায় এ ধরনের আকীদা- বি াস পোষণ করে তিনি যে পুত্রশোকে মুহ্যমান হয়ে মূর্তি ও প্রতিমাসমূহের কাছে তাঁর অন্তরের দুঃখ প্রকাশ করবেন তা কিভাবে সম্ভব?

মহানবীর পালক পুত্র

মহানবী (সা.) যাইদ ইবনে হারেসাকে হাজারুল আসওয়াদের কাছে নিজ পুত্র বলে সম্বোধন করেছিলেন। আরবের মরু- দস্যুরা যাইদকে শামের সীমান্তবর্তী এলাকা থেকে অপহরণ করে খাদীজার এক আত্মীয় হাকীম বিন হিযামের কাছে বিক্রি করে দেয়। তবে খাদীজাহ্ কিভাবে তাঁকে ক্রয় করেছিলেন তা স্পষ্ট নয়।

'মুহাম্মদের জীবনী' গ্রন্থের রচয়িতা বলেন, "মহানবী (সা.) পুত্রদের মৃত্যুতে শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়েছিলেন বলেই তাঁকে (যাইদকে) ক্রয় করার জ খাদীজাকে অনুরোধ করেছিলেন যাতে পুত্রবিয়োগের শোক ও দুঃখ কিছুটা লাঘব হয়। হযরত খাদীজাহ্ যাইদকে ক্রয় করলে মহানবী তাঁকে দাসত্ব থেকে মুক্ত করে দেন এবং সন্তান হিসাবে গ্রহণ করেন।

কিন্তু অধিকাংশ সীরাত রচয়িতা ও ঐতিহাসিক উল্লেখ করেছেন যে, মহানবীর সাথে হযরত খাদীজার বিবাহের সময় হাকীম বিন হিযাম যাইদকে হিবা বা উপহারস্বরূপ ফুফী খাদীজার হাতে অর্পণ করেছিলেন। যেহেতু যাইদ ছিলেন সব দিক থেকেই পবিত্র (চরিত্রবান) ও বুদ্ধিমান যুবক সেজ তিনি মহানবীর স্নেহভাজন হয়েছিলেন। আর হযরত খাদীজাহ্ও তাঁকে মহানবীর হাতে অর্পণ করেন। বেশ কিছুদিন পর যাইদের পিতা খোঁজ করতে করতে অপ ত সন্তানের সন্ধান পেয়ে গেলেন। তিনি মহানবীকে অনুরোধ করলেন যেন তিনি তাঁকে পিতার সাথে নিজ এলাকায় ফেরার অনুমতি দেন। মহানবীও তাঁকে তাঁর নিজ এলাকায় প্রত্যাবর্তন অথবা মক্কা নগরীতে থেকে যাওয়ার মধ্য থেকে যে কোন একটি বেছে নেয়ার স্বাধীনতা দিলেন। মহানবীর স্নেহ ও দয়া তাঁকে মহানবীর কাছে থেকে যেতে আগ্রহী করে তোলে। এ কারণেই মহানবী তাঁকে দাসত্ব থেকে মুক্ত করে সন্তান হিসাবে গ্রহণ করেন এবং তাঁর সাথে যয়নাব বিনতে জাহাশের বিবাহ দেন।[১৯৩]

মূর্তিপূজারীদের মধ্যে বিরোধের সূত্রপাত

মহানবী (সা.)- এর নবুওয়াত কুরাইশদের মধ্যে ব্যাপক মতপার্থক্যের সৃষ্টি করেছিল; কিন্তু সুদূর অতীত থেকেই তাদের মধ্যে এ বিরোধের নিদর্শনসমূহ ছড়িয়ে পড়েছিল। মহানবীর নবুওয়াতপ্রাপ্তির আগেই কতিপয় ব্যক্তি আরবদের ধর্মের প্রতি তাদের ঘৃণা প্রকাশ্যে ব্যক্ত করেছিলেন এবং আরব বি র আনাচে- কানাচে সর্বত্র এক আরবী নবীর আবির্ভাবের বিষয় সর্বদা আলোচিত হতে থাকে যে, তিনি অতি শীঘ্রই আত্মপ্রকাশ করবেন এবং তাওহীদ ও এক- অদ্বিতীয় ষ্টার উপাসনাকে পুনরুজ্জীবিত ও পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করবেন। ইয়া দীরা বলত, "আমরা তাঁর অনুসারী হব। কারণ আমাদের ধর্মের মূল ভিত্তি ও উক্ত আরব নবীর ধর্মের মূল ভিত্তি একই। তাঁর শক্তি ও ক্ষমতা ব্যবহার করে আমরা সকল প্রতিমা ভে ফেলব এবং মূর্তিপূজার ভিত ধ্বংস করব।"

ইবনে হিশাম লিখেছেন, "ইয়া দীরা মূর্তিপূজারী আরব সমাজকে আরবীয় নবীর আবির্ভাবকাল নিকটবর্তী বলার মাধ্যমে মকি প্রদর্শন করত। এ সব বক্তব্য মূর্তিপূজার যুগ যে অচিরেই গত হতে চলেছে তার একটি পটভূমি তাদের চোখের সামনে তুলে ধরত। ব্যাপারটি এতদূর গড়ায় যে, ইয়া দীদের পূর্ববর্তী প্রচারণার ফলে মহানবী (সা.) যখন ইসলাম ধর্মের প্রচার কার্যক্রম শুরু করেন তখন আরবের কয়েকটি গোত্র ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিল। কতিপয় কারণবশত ইয়া দীরা তাদের কুফরের ওপরই বহাল থাকে। নিম্নোক্ত আয়াতটি থেকেও তাদের অবস্থা পরিষ্কার হয়ে যায় :

(و لما جاء هم كتاب من عند الله مصدّق لما معهم و كانوا من قبل يستفتحون على الّذين كفروا فلمّا جاءهم ما عرفوا به فلعنة الله على الكافرين)

"যখন ঐশী গ্রন্থ (পবিত্র কোরআন) মহান আল্লাহর তরফ থেকে তাদের কাছে আসল যা তাদের কাছে বিদ্যমান গ্রন্থ তাওরাতের সত্যায়নকারী এবং তারা ইতিপূর্বে (মহানবীর নবুওয়াতপ্রাপ্তির পূর্বে) সর্বশেষ নবীর আবির্ভাবের মাধ্যমে কাফিরদের ওপর বিজয় লাভের জ অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিল, কিন্তু যখন তিনি (প্রতিশ্রুত শেষ নবী) তাদের কাছে আসলেন তখন তারা তাঁকে চিনল না, বরং তাঁকে অস্বীকার করল (অর্থাৎ তাঁর অস্তিত্ব যে মহানেয়ামত ছিল সেই নেয়ামতের

প্রতি তারা অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করল)। তাই মহান আল্লাহর লানত (ক্রোধ ও গজব) কাফির সম্প্রদায়ের ওপর বর্ষিত হোক।" (সূরা বাকারাহ্ : ৮৯)

মূর্তিপূজার ভিতসমূহ নড়বড়ে হয়ে গেল

একবার কুরাইশদের এক উৎসবে একটি অদ্ভুত ঘটনা ঘটে গেল। সূক্ষ্মদর্শী ব্যক্তিদের দৃষ্টিতে ঐ ঘটনা ঘটার মাধ্যমে আসলে মূর্তিপূজকদের কর্তৃত্ব নির্মূল হওয়ার বিপদ ঘণ্টাই যেন বেজে উঠেছিল।

একদিন যখন মূর্তিপূজকরা একটি প্রতিমার চারপাশে সমবেত হয়ে তাদের কপাল সেটার সামনে মাটির ওপর রেখেছিল তখন তাদের নেতাদের মধ্য থেকে চার ব্যক্তি যাঁরা জ্ঞান ও বিদ্যা- বুদ্ধিতে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন তাঁরা তাদের এ কাজকে পছন্দ করলেন না এবং এক কোণে গিয়ে পরস্পর আলোচনায় লিপ্ত হলেন। তাঁদের বক্তব্য ও আলোচনা ছিল নিম্নরূপ :

"আমাদের জাতি হযরত ইবরাহীমের পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে গেছে। এই পাথর যার চারপাশে আমাদের লোকেরা তাওয়াফ করে, আসলে তো তা শোনে না, দেখে না এবং উপকার বা ক্ষতিসাধনও করতে পারে না।"[১৯৪]

এই চার ব্যক্তি হলেন :

১. ওয়ারাকাহ্ ইবনে নওফেল যিনি ব্যাপক অধ্যয়ন করার পর িষ্টধর্ম গ্রহণ করেছিলেন এবং বাইবেলের পুরাতন ও নতুন নিয়ম সংক্রান্ত প্রচুর জ্ঞান ও তথ্য অর্জন করেছিলেন;

২. আবদুল্লাহ্ ইবনে জাহাশ যিনি ইসলাম ধর্মের আবির্ভাবের পর ঈমান এনেছিলেন এবং মুসলমানদের সাথে হাবাশায় হিজরত করেছিলেন;

৩. উসমান ইবনে ওয়াইরিস যিনি রোম সম্রাটের দরবারে আশ্রয় নিয়ে িষ্টধর্মাবলম্বী হয়ে যান এবং

৪. যাইদ ইবনে আমর ইবনে নুফাইল যিনি অনেক অধ্যয়ন ও গবেষণা করে হযরত ইবরাহীম (আ.)- এর ধর্মের অনুসারী হয়েছিলেন।

মূর্তিপূজাবিরোধী এ ধরনের দৃষ্টিভি র উদ্ভব এ বিষয়ের প্রমাণ হতে পারে না যে, মহানবী (সা.)-এর ইসলাম প্রচার কার্যক্রম ছিল প্রকৃতপক্ষে মুষ্টিমেয় ক্ষুদ্র এ দলটির আহ্বানেরই ফল। কারণ মহানবীর নবুওয়াত সংক্রান্ত এ ধরনের বিশ্লেষণ আসলে পবিত্র ইসলাম ধর্মের মর্মবাণী ও অন্তর্নিহিত বিষয়বস্তু সম্পর্কে বিশ্লেষকের অজ্ঞতা থেকেই উদ্ভূত।

এ বিবাদ আসলে মূর্তিপূজা ত্যাগ ও এক ষ্টার উপাসনা ব্যতীত আর কিছুই ছিল না। আর এ ধরনের দৃষ্টিভি র অন্তর্নিহিত বিষয় এর চেয়ে বেশি কিছু ছিল না যা এখন আমরা উল্লেখ করেছি। তাই মহানবী (সা.)- এর বি জনীন আহবান যা এক ভুবন পরিমাণ বিশাল তত্ত্বজ্ঞান ও বিধানসমেত উদিত হয়েছিল তাকে কিভাবে এ ধরনের কলহের ফল বলে অভিহিত করা যাবে?

মহানবীর নবুওয়াতপ্রাপ্তির সময় ইবরাহীম (আ.)- এর সুন্নাত (রীতিনীতি) বলে পরিচিত ‘দীনে হানীফ ’ তখনও হিজায থেকে পুরোপুরি বিলীন হয়ে যায় নি। হিজাযের এখানে- সেখানে দীনে হানীফের কিছু অনুসারী ছিল। তবে তাদের সংখ্যা এতটা ছিল না যে, যার ফলে তারা জনসমক্ষে নিজেদের শক্তি প্রদর্শন অথবা একটি সামাজিক বি বের নেতৃত্ব দিতে সক্ষম হবে অথবা কতিপয় ব্যক্তিকে প্রশিক্ষিত করে গড়ে তুলবে অথবা হযরত মুহাম্মদ (সা.)- এর মতো কোন ব্যক্তিত্বের প্রবর্তিত ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষামালার প্রামাণিক উৎস হবে।

দীনে হানিফের অনুসারীদের নিকট থেকে এক- অদ্বিতীয় ষ্টায় বি াস, পারলৌকিক জীবনের প্রতি ঈমান এবং কখনো কখনো দু’একটি নৈতিক শিক্ষা ও প্রবচন ব্যতীত আর কিছুই বর্ণিত হয় নি। আর যে তাওহীদী কাব্যসমূহ তাদের থেকে বর্ণিত বলে উল্লিখিত হয়েছে তা যে আসলে তাদের সাথেই সংশ্লিষ্ট অর্থাৎ তাদেরই রচিত তা সম্পূর্ণ অস্বীকার করা না গেলেও এখনও তা নিশ্চিতভাবে জানা যায় নি।[১৯৫]

এমতাবস্থায় কি সুমহান ইসলামী সংস্কৃতি, এ ধর্মের যুক্তিসংগত মৌলিক আকীদা- বি াস, নিয়ম-নীতি এবং এ ধর্মের নৈতিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ব্যবস্থা এ সব কিছুকে হিজাযের এখানে-সেখানে ছড়িয়ে থাকা গুটিকতক একে রবাদী দীনে হানীফের অনুসারীর সৃষ্টি ও কীর্তি বলে গণ্য

করা সম্ভব? কারণ মহান আল্লাহ্, পারলৌকিক জীবন ও দু'একটি নৈতিক প্রবচন ছাড়া আর কোন বিষয়ে তাদের (দীনে হানীফের অনুসারীদের) কোন বক্তব্য ছিল না।

কুরাইশদের অন্তর্নিহিত দুর্বলতার বহিঃপ্রকাশ

মহানবীর বয়স তখনও ৩৫ বছর অতিক্রম করে নি, ঠিক এ সময় কুরাইশদের মধ্যে তীব্র বিরোধ দেখা দেয়। মহানবীর দক্ষ হাতেই এ মহাবিরোধের নিষ্পত্তি হয়েছিল। এ ঘটনা থেকে প্রমাণিত হয় যে, মহানবী (সা.) আপামর জনতার কাছে তখন কত সম্মানের পাত্র ছিলেন! আর সবাই তাঁর বি স্ততা ও সত্যবাদিতায় আস্থাশীল ছিল। নিচে ঘটনাটির বিস্তারিত বিবরণ প্রদান করা হলো :

একবার এক ভয় র ব ার ঢল পবিত্র মক্কা নগরীর উঁচু উঁচু পাহাড় থেকে পবিত্র কাবার দিকে নেমে এসেছিল। যার ফলে মক্কা নগরীর কোন বাসগৃহ, এমনকি পবিত্র কাবাও অক্ষত থাকে নি। পবিত্র কাবার দেয়ালে বড় বড় ফাটল দেখা দেয়। কুরাইশরা পবিত্র কাবাগৃহ মেরামত করার সিদ্ধান্ত নেয়, তবে তারা তা (কাবার ক্ষতিগ্রস্ত দেয়াল) ভাঙতে ভয় পাচ্ছিল। ওয়ালীদ ইবনে মুগীরাই সর্বপ্রথম গাইতি হাতে নিয়ে কাবার দু'টি স্তম্ভ ভে ফেলে। তখন এক অব্যক্ত ভীতি তার পুরো শরীরকে ঘিরে ধরেছিল। মক্কার লোকেরা (কাবাগৃহ ভে ফেলার কারণে) এক মারাত্মক অশুভ ঘটনা ঘটার অপেক্ষা করছিল। কিন্তু যখন তারা দেখতে পেল যে, ওয়ালীদ ইবনে মুগীরাহ্ মূর্তিসমূহের ক্রোধের শিকার হয় নি তখন তারা নিশ্চিত হলো যে, তার এ কাজে প্রতিমা ও মূর্তিগুলো অসন্তুষ্ট হয় নি। তাই পুরো কুরাইশ গোত্র পবিত্র কাবাগৃহ ভে পুনঃনির্মাণ করার কাজে অংশগ্রহণ করল। ঘটনাক্রমে ঐ দিনই এক রোমান ব্যবসায়ীর জাহাজ যা মিশর থেকে আসছিল তা মক্কার কাছে জেদ্দায় এক ঝড়ে বিধ্বস্ত হয়ে যায়। কুরাইশগণ এ ঘটনা জানতে পেরে কয়েকজন লোককে ধ্বংসপ্রাপ্ত ঐ জাহাজের কাঠ কেনার জ জেদ্দায় প্রেরণ করে। আর পবিত্র কাবার কাঠের কাজ মক্কা নগরীতে বসবাসরত এক কিবতী কাঠমিস্ত্রীর হাতে সোপর্দ করা হয়। পবিত্র কাবার দেয়াল একজন মানুষের দেহের উচ্চতা সমান উঁচু করা হলে হজরে আসওয়াদ (কৃষ্ণ পাথর) যথাস্থানে স্থাপন করার সময় হয়ে যায়। এ সময় কুরাইশের শাখা গোত্রগুলোর

গোত্রপতিদের মধ্যে তীব্র বিরোধ দেখা দেয় (কৃষ্ণ পাথরটি যথাস্থানে স্থাপন করাকে কেন্দ্র করে)। বনি আবদুর দার ও বনি আদী গোত্রদ্বয় পরস্পর চুক্তি ও প্রতিজ্ঞাই করে বসে যে, তারা অ   দের এ বিরল মর্যাদার অধিকারী হতে দেবে না। তারা তাদের চুক্তি ও অ ীকারকে আরো মজবুত করার জ   একটি পাত্র রক্ত দিয়ে পূর্ণ করে তাতে তাদের হাত ডুবিয়ে রঞ্জিত করেছিল।

এ ঘটনার কারণে পাঁচ দিন কাবাগৃহের নির্মাণ কাজ স্থগিত থাকে। কুরাইশ গোত্রের অবস্থা অত্যন্ত সংকীর্ণ ও শোচনীয় হয়ে গিয়েছিল। কুরাইশগণ বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে মসজিদুল হারামে অবস্থান নিয়ে একটি ভয়াবহ রক্তপাতের আশংকায় প্রমাদ গুণতে থাকে। অবশেষে আবু উমাইয়্যাহ্ বিন মুগরীহ্ আল মাখযুমী নামক কুরাইশ বংশোদ্ভূত এক বৃদ্ধ লোক কুরাইশ গোত্রপতিদের একত্র করে প্রস্তাব করল যে, সাফার দরজা (কিছু কিছু ঐতিহাসিক বর্ণনায় সালাম দরজা) দিয়ে প্রথম যে ব্যক্তি প্রবেশ করবে তাকেই তারা তাদের এ বিরোধ নিষ্পত্তি করার জ   মধ্যস্থতাকারী হিসাবে গ্রহণ করবে। ঐ বৃদ্ধের এ প্রস্তাব সবাই গ্রহণ করল। হঠাৎ মহানবী (সা.) ঐ দরজা দিয়ে মসজিদুল হারামে প্রবেশ করলেন। তখন সবাই একসাথে বলে উঠল, "এ ব্যক্তিই তো মুহাম্মদ যিনি সকলের আস্থাভাজন ও বি স্ত। আমরা তাঁর মধ্যস্থতা মেনে নিতে রাজী।" মহানবী (সা.) বিরোধ নিষ্পত্তি করার জ   একটি কাপড় আনতে বললেন। কাপড় আনা হলে তিনি নিজ হাতে হাজারে আসওয়াদ ঐ কাপড়ের মাঝখানে বসালেন। এরপর তিনি মক্কার চার গোত্রপতিকে এ কাপড়ের চার প্রান্ত ধরতে বললেন। যখন হাজারে আসওয়াদকে স্তম্ভের কাছে বহন করে আনা হলো তখন মহানবী (সা.) তাঁর পবিত্র হাত দিয়ে তা যথাস্থানে রাখলেন। আর এভাবে তিনি কুরাইশদের ঝগড়া- বিবাদ সুন্দরভাবে মিটিয়ে দিলেন যা কুরাইশদের এক ভয় র রক্তপাতের দিকে ঠেলে দিয়েছিল।[১৯৬]

মহানবী হযরত আলীকে নিজ গৃহে নিয়ে আসেন

কোন এক বছর মক্কা ও এর আশেপাশের জায়গায় দুর্ভিক্ষ ও পানীয় জলের অভাব দেখা দিয়েছিল। মহানবী (সা.) সিদ্ধান্ত নিলেন যে, শ্রদ্ধেয় চাচা আবু তালিব (রা.)- এর কাছে তাঁকে সাহায্য করার প্রস্তাব দেবেন এবং এভাবে তিনি তাঁর যাবতীয় সাংসারিক খরচ ও ব্যয়ভার কমিয়ে আনবেন। তাই তিনি তাঁর আরেক চাচা আব্বাস- এর কাছে বিষয়টি উত্থাপন করলেন। সিদ্ধান্ত নেয়া হলো যে, তাঁদের প্রত্যেকেই আবু তালিবের এক- একজন সন্তানকে নিজেদের ঘরে নিয়ে প্রতিপালন করবেন। তাই মহানবী (সা.) আলীকে এবং আব্বাস জাফরকে নিজ নিজ গৃহে নিয়ে যান।

প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক আবুল ফারাজ ইসফাহানী লিখেছেন : "আব্বাস তালিবকে, হামযাহ্ জাফরকে এবং মহানবী (সা.) আলীকে নিজ নিজ ঘরে নিয়ে গেলেন। তখন মহানবী বলেছিলেন : আমি তাকেই পছন্দ ও গ্রহণ করেছি যাকে মহান আল্লাহ্ আমার জ মনোনীত করেছেন।"[১৯৭]

যদিও দুর্ভিক্ষের সময় আবু তালিবকে সাহায্য করাই ছিল বাহ্যিক ব্যাপার, তবে চূড়ান্ত লক্ষ্য ছিল ভিন্ন একটি বিষয়। আর তা হলো মহানবীর ক্রোড়ে আলী (আ.)- এর প্রতিপালিত হওয়া এবং মহানবীর উন্নত চরিত্র তাঁর জীবনে বাস্তবায়ন করা।

আমীরুল মুমিনীন আলী (আ.) নাহজুল বালাগায় এ ব্যাপারে বলেছেন,

" তোমাদের সবাই মহানবীর সাথে আমার নিকট সম্পর্ক ও অবস্থান সম্পর্কে জ্ঞাত আছ। তিনি আমাকে তাঁর ক্রোড়ে প্রতিপালন ও বড় করেছেন এবং যখন আমি ছোট ছিলাম তখন তিনি আমাকে তাঁর বুকে টেনে নিতেন এবং আমাকে তাঁর পাশে তাঁর বিছানায় শোয়াতেন। আমি তাঁর সুঘ্রাণ নিতাম এবং প্রতিদিন তাঁর চরিত্র থেকে এক একটি বিষয় শিক্ষাগ্রহণ করতাম।"[১৯৮]

নবুওয়াতের পূর্বে তাঁর ধর্ম

যে মুহূর্তে তিনি ভূমিষ্ঠ হয়েছিলেন তখন থেকে যে দিন তিনি মৃত্যুবরণ করলেন সে দিন পর্যন্ত তিনি ছিলেন এক আল্লাহতে বি াসী। অর্থাৎ এক ইলাহ্ ব্যতীত আর কারো উপাসনা করেন নি। তাঁর অভিভাবকগণও, যেমন আবদুল মুত্তালিব ও আবু তালিব সবাই একত্ববাদী ছিলেন। আপনাদের হয়তো স্মরণ আছে যে, হাতি বাহিনীর আক্রমণকালে আবদুল মুত্তালিব পবিত্র কাবার কড়া ধরে নিজ ষ্টার সাথে একান্ত নিভৃতে একজন এক খোদায় বি াসীর ায় প্রার্থনা করে বলেছিলেন, "হে আল্লাহ্! একমাত্র তুমি ব্যতীত অ কারো প্রতি আমি আশা রাখি না...।"

ঠিক একইভাবে হযরত আবু তালিব (আ.) দুর্ভিক্ষ ও অনাবৃষ্টির সময় ভাতিজা হযরত মুহাম্মদকে নিয়ে ময়দানের দিকে যান এবং তাঁর উসীলায় আল্লাহর নামে শপথ করে বৃষ্টি প্রার্থনা করেন। এতৎসংক্রান্ত বেশ কিছু প্রসিদ্ধ কবিতাও আছে যা ইতিহাসের গ্রন্থাবলীতে বর্ণিত হয়েছে। এমনকি মহানবী বুসরার পুরোহিত বাহীরার সাথে আলাপকালে আরবের প্রসিদ্ধ সব প্রতিমার ব্যাপারে তাঁর ঘৃণা প্রকাশ করেছিলেন। যখন পুরোহিত বাহীরা তাঁর দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন, "লাত ও উয্যার শপথ, তোমাকে যা কিছু জিজ্ঞাসা করব আমাকে তার উত্তর দিবে", তখন মহানবী তাঁকে তিরস্কার করে বলেছিলেন, "আমার সামনে কখনই লাত ও উয্যার নামে শপথ করবেন না। এ পৃথিবীতে এতদুভয়ের উপাসনার ায় আর কোন কিছুই আমার কাছে এত ঘৃণ্য নয়।" তখন বাহীরা বলেছিলেন, "মহান আল্লাহর শপথ, আমি তোমাকে যা কিছু প্রশ্ন করব সে সম্পর্কে আমাকে অবগত করবে।" তখন মহানবী বলেছিলেন, "আপনার যা ইচ্ছা তা আমাকে জিজ্ঞাসা করতে পারেন।"[১৯৯]

এ সব কিছু থেকে প্রতীয়মান হয় যে, মহানবী (সা.) ও আবুদল মুত্তালিবের সন্তানগণ সবাই মহান আল্লাহর উপাসক এবং একত্ববাদী ছিলেন। আর তাঁর একত্ববাদী হবার সর্বোত্তম দলিল হচ্ছে হিরা গুহায় নবুওয়াতের আগে তাঁর নিভৃতে মহান আল্লাহর ইবাদাত ও ধ্যান। সীরাত রচয়িতাগণ

ঐকমত্য পোষণ করেছেন যে, মহানবী (সা.) প্রতি বছর কয়েক মাস হিরা গুহায় মহান আল্লাহর ইবাদাত- বন্দেগী করতেন। এ ব্যাপারে আমীরুল মুমিনীন আলী (আ.) বলেছেন,

و لقد كان يُجاور في كلّ سنة بحراء فأراه و لا يراه غيره

"মহানবী প্রতি বছর হিরা গুহায় নিভৃতে অবস্থান করতেন; তাই কেবল আমিই (সেখানে) তাঁকে দেখতাম এবং অ   কেউ তাঁকে দেখতে পেত না।"[২০০]

এমনকি যে দিন তিনি নবুওয়াতপ্রাপ্ত হলেন সে দিন তিনি হিরা গুহায় ইবাদাতে মশগুল ছিলেন। আমীরুল মুমিনীন আলী (আ.) মহানবীর জীবনের এ অধ্যায় প্রস   বলেছেন, "যে দিন থেকে মহানবী (সা.) দুধপান করা থেকে বিরত হলেন সে দিন থেকে মহান আল্লাহ্ তাঁর শিক্ষা ও প্রতিপালনের জ   সবচেয়ে বড় ফেরেশতাকে নিযুক্ত করেছিলেন এবং সে ফেরেশতাই দিবারাত্রি তাঁর দেখাশোনা করতেন এবং তাঁকে সুন্দর চরিত্র ও শিষ্টাচার শিক্ষা দিতেন।"[২০১]

সুতরাং এমন মহান পরিবারের মধ্যে প্রতিপালিত ব্যক্তি যিনি স্ত পান কালোত্তর সময় থেকে জগতের সবচেয়ে বড় ফেরেশতার তত্ত্বাবধানে প্রশিক্ষিত হয়েছেন তিনি অবশ্যই একত্ববাদী ছিলেন এবং মুহূর্তের জ   ও তিনি তাওহীদের পথ থেকে সামা   তম বিচ্যুত হন নি।

এ ব্যাপারে আর কোন কথা নেই। তবে একটি বিষয়ে কথা আছে, আর তা হলো যে, তিনি এ সময় অর্থাৎ নবুওয়াতের ঘোষণা দেয়ার আগে কোন্ আসমানী ধর্ম অনুসরণ করতেন? তিনি কি হযরত ইবরাহীম (আ.)- এর ধর্মের ওপর ছিলেন, না হযরত ঈসা মসীহর ধর্ম অথবা নিজ ধর্ম ও শরীয়তের ওপর বহাল ছিলেন? এ ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের অভিমত রয়েছে যে, এ ব্যাপারে আলোচনা করা আমাদের এ ক্ষুদ্র ও সীমিত পরিসরে সম্ভব নয়।[২০২]

হযরত ঈসা মসীর সাথে তুলনা

নিঃসন্দেহে সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) সব দিক থেকেই অতীতের সকল নবী- রাসূলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। আর কতিপয় নবী- রাসূলের ক্ষেত্রে পবিত্র কোরআন বলেছে, "কিছু কিছু নবী শৈশবেই নবুওয়াতপ্রাপ্ত হয়েছিলেন এবং তাঁদের ওপর ঐশী গ্রন্থ অবতীর্ণ হয়েছিল।" যেমন হযরত ইয়াহ্ইয়া (আ.) সম্পর্কে পবিত্র কোরআনের বক্তব্য নিম্নরূপ :

(يا يحيى خذ الكتاب بقوّة و آتيناه الحكم صبيّا)

" হে ইয়াহ্ইয়া! (খোদায়ী) শক্তির দ্বারা ঐশী গ্রন্থ দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধর এবং আমরা তাকে শৈশব অবস্থায় বিচার করার ক্ষমতা দিয়েছিলাম। "

যখন ঈসা ইবনে মরিয়ম দোলনায় ছিলেন তখন বনি ইসরাইলের নেতা ও গোত্রপতিগণ তাঁর মা মরিয়মকে চাপের মধ্যে রেখে তাঁর কাছ থেকে জানতে চেয়েছিলেন যে, তিনি কিভাবে সন্তানের জননী হয়েছেন। হযরত মরিয়ম দোলনার দিকে নির্দেশ করে তাদের বুঝিয়ে দিলেন যেন তারা তাদের প্রশ্নের উত্তর দোলনায় শায়িত নবজাতক শিশু ঈসার কাছ থেকে জেনে নেয়। নবজাতক শিশু হযরত ঈসা (আ.) প্রাঞ্জল ও বলিষ্ঠ ভাষায় তাদেরকে সম্বোধন করে বলেছিলেন,

(إنّي عبد الله آتاني الكتاب و جعلني نبيّا، و جعلني مباركا أينما كنت و أوصاني بالصّلوة و الزّكوة ما دمت حيّا)

"আমি মহান আল্লাহর বান্দা। তিনি আমাকে ঐশী গ্রন্থ দিয়েছেন, আমাকে নবী করেছেন এবং আমি যেখানেই থাকি না কেন তিনি আমাকে বরকতময় করেছেন এবং যে পর্যন্ত আমি জীবিত আছি তত দিন পর্যন্ত তিনি আমাকে নামায পড়তে ও যাকাত আদায় করতে নির্দেশ দিয়েছেন। " (সূরা মরিয়ম : ৩১)

হযরত ঈসা ইবনে মরিয়ম তাঁর ধর্মের যাবতীয় মৌল ও শাখাগত বিষয় একদম সেই শৈশব ও মাতৃস্ত   পানকালীন সময় জনতার কাছে স্পষ্ট করে ব্যক্ত করেছেন এবং তাদের কাছে তিনি যে তাওহীদের অনুসারী এবং মহান আল্লাহর দাস তা প্রকাশ্যে বলে দিয়েছেন। এখন আমরা আপনাদের বিবেককে সাক্ষী হিসাবে গ্রহণ করছি। আপনারাই বিচার করুন যেখানে ইয়াহ্ইয়া (আ.) ও ঈসা (আ.) শৈশব ও মাতৃস্ত   পানকালীন সময় থেকেই আন্তরিকভাবে মুমিন (বি াসী) ছিলেন এবং তাঁদের মুখে বাস্তব মানবপ্রকৃতি বা স্বভাবধর্ম ঐ অতটুকু বয়সেই উচ্চারিত হয়েছে সেখানে আমরা কি বলতে পারি যে, বি াসীদের একমাত্র নেতা ও বি র সর্বোত্তম মানব ৪০ বছর বয়স পর্যন্ত মুমিন ছিলেন না, অথচ তিনিই হিরা গুহায় ওহী অবতীর্ণ হওয়ার সময় মহান আল্লাহর ইবাদাত- বন্দেগী ও প্রার্থনায় রত ছিলেন!

একাদশ অধ্যায় : সত্যের প্রথম প্রকাশ

ইসলামের প্রকৃত ইতিহাসের শুভ সূচনা ঐ দিন থেকে হয়েছিল যে দিন মহানবী (সা.) রিসালাত ও নবুওয়াতের দায়িত্ব লাভ করেন। এর ফলে অনেক স্মরণীয় ঘটনার উদ্ভব হয়। যে দিন মহানবী মানব জাতির হেদায়েতের দায়িত্বপ্রাপ্ত হলেন এবং ওহীর ফেরেশতার মাধ্যমে

إنّك لرسول الله ‘নিশ্চয়ই আপনি আল্লাহর রাসূল ’ - এ আহবানধ্বনি শুনতে পেলেন সে দিন তিনি এক গুরুদায়িত্ব গ্রহণ করলেন যা অ । নবী- রাসূলও গ্রহণ করেছিলেন। ঐ দিন কুরাইশদের কাছে ‘আল আমীন ’ (বি স্ত) উপাধিতে ভূষিত হযরত মুহাম্মদ (সা.)- এর নীতি এবং তাঁর মিশনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অধিকতর স্পষ্ট হয়ে গেল। নবুওয়াত ও রিসালাতের প্রাথমিক ঘটনাবলী ব্যাখ্যা করার আগে দু’টি বিষয় সম্পর্কে কিছু ব্যাখ্যা- বিশ্লেষণ অপরিহার্য। বিষয়দ্বয় নিম্নরূপ :

১. নবীদের রিসালাত ও বে’সাতের (প্রেরণের) প্রয়োজনীয়তা।

২. সমাজ সংস্কারের ক্ষেত্রে নবীদের ভূমিকা।

মহান আল্লাহ্ প্রতিটি অস্তিত্ববান সত্তার বিকাশ, উন্নতি ও পূর্ণতার সকল উপায়- উপকরণ ঐ সত্তার মাঝেই দিয়েছেন। আর পূর্ণতার বিভিন্ন পথ পরিক্রমণ করার উদ্দেশ্যে প্রতিটি অস্তিত্ববান সত্তাকে তিনি বিভিন্ন ধরনের উপায়- উপকরণ দ্বারা সজ্জিত করেছেন। একটি ক্ষুদ্র উদ্ভিদকে বিবেচনা করুন। বেশ কিছু নিয়ামক এ উদ্ভিদের বিকাশ ও পূর্ণতা বিধানের ক্ষেত্রে ক্রিয়াশীল রয়েছে। চারাটির মূল ঐ চারার খাদ্য সরবরাহ ও পুষ্টি বিধানের লক্ষ্যে সর্বোচ্চ মাত্রায় তৎপর হয়ে থাকে এবং চারাটির পুষ্টিজনিত সকল চাহিদা পূরণ করে। বিভিন্ন মূল, শিকড় ও চ্যানেলসমূহ অত্যন্ত ভারসাম্যতার সাথে মাটি থেকে আহরিত রস (গাছের) চারার সকল শাখা- প্রশাখা ও পত্রপল্লবে পৌঁছে দেয়।

(একটি) ফুলের গঠন নিয়ে চিন্তা করুন। উদ্ভিদের অ   সকল অংশের গঠন থেকে এর গঠন স্বতন্ত্র ও বিস্ময়কর।

পুষ্পবৃতির কাজ হচ্ছে মুকুল বা কুঁড়ির তল ও উপরিভাগকে ঢেকে রাখা এবং ফুলের পাপড়ি ও অভ্যন্তরীণ অংশের সংরক্ষণ। এভাবে ফুলের বিভিন্নাংশ যা একটি জীবিত অস্তিত্ববান সত্তার (উদ্ভিদ) বিকাশের জ   প্রস্তুত ও তৈরি করা হয়েছে তা খুব ভালোভাবে নিজ দায়িত্ব সম্পন্ন করে। যদি আমরা আরো একটু এগিয়ে যাই এবং জীবজগতের আশ্চর্যজনক ব্যবস্থার দিকে দৃকপাত করি তাহলে আমরা উপলব্ধি করতে পারব যে, জীবজগৎ (উদ্ভিদ ও প্রাণী) এমন কতিপয় নিয়ামক দ্বারা সজ্জিত যা এ জীবজগতকে পূর্ণতার দিকে পৌঁছে দিচ্ছে।

যখনই আমরা এ বিষয়টিকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে উপস্থাপন করব তখন আমাদেরকে অবশ্যই বলতে হবে যে, হেদায়েতে তাকভীনী[২০৩] যা আসলে অস্তিত্বজগতে মহান   ষ্টার সর্বজনীন নেয়ামত ও অনুগ্রহ তা আসলে উদ্ভিদ, প্রাণী ও মানুষ নির্বিশেষে এ নিখিল- বি র সকল মাখলুক অর্থাৎ সৃষ্ট অস্তিত্ববান সত্তাসমূহকে অন্তর্ভুক্ত করে।

الّذي أعطى كلّ شيء خلقه ثمّ هدى

‘যিনি (মহান আল্লাহ্) সকল বস্তু ও পদার্থকে সৃষ্টি করে (জীবনযাপন করার) পথ প্রদর্শন করেছেন ’- পবিত্র কোরআনের এ আয়াতটি থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ক্ষুদ্র পরমাণু থেকে শুরু করে নীহারিকাপুঞ্জ পর্যন্ত বি র সকল অস্তিত্ববান সত্তা মহান আল্লাহর এ সর্বজনীন অনুগ্রহ থেকে প্রতিনিয়ত উপকৃত ও ধ   হচ্ছে। মহান আল্লাহ্- সৃষ্ট অস্তিত্ববান সত্তার সঠিক সূক্ষ্ম পরিমাপ ও প্রয়োজনীয় সব কিছু নির্ধারণ করার পর পূর্ণতাপ্রাপ্তি, সুষ্ঠু বিকাশ, প্রতিপালন ও প্রশিক্ষণের পথ দেখিয়েছেন এবং প্রত্যেকের সুষ্ঠু প্রতিপালন এবং বিকাশের জ   বিভিন্ন ধরনের নিয়ামক ব্যবহার করেছেন। এটিই সর্বজনীন সৃষ্টিগত হেদায়েত যা ব্যতিক্রম ছাড়াই সমগ্র সৃষ্টিজগতে ক্রিয়াশীল রয়েছে।

তবে এ সৃষ্টিজগৎ ও স্বভাবগত পথ প্রদর্শন কি সকল সৃষ্টির সেরা মানুষের মতো অস্তিত্ববান সত্তার জ   যথেষ্ট? নিশ্চিতভাবে বলা যায়, ‘না ’। কারণ পার্থিব জীবন ছাড়াও মানুষের আরো একটি

জীবন আছে যা তার প্রকৃত জীবন। উদ্ভিদ ও প্রাণীজগতের মতো মানুষের যদি কেবল একটি পার্থিব ও শুষ্ক জীবনই থাকত তাহলে তার পূর্ণতার জ   বস্তুগত নিয়ামকসমূহই যথেষ্ট ছিল, অথচ মানুষ দু'ধরনের জীবনের অধিকারী। এতদুভয়ের পূর্ণতা বিধানই তার সৌভাগ্য ও উন্নতির প্রতীক।

যেহেতু সহজ- সরল আদি গুহাবাসী এবং নির্মল স্বভাব ও প্রকৃতির অধিকারী মানুষের সত্তায় ক্ষুদ্রতম বিচ্যুতিরও উদ্ভব হয় নি সেহেতু সমাজবদ্ধ হয়ে বসবাসকারী মানুষের মতো তার (আদি গুহাবাসী) শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের প্রয়োজন ছিল না। তবে মানুষ যখন আরো এগিয়ে গেল (উন্নত হতে লাগল), সংঘবদ্ধ জীবনযাপন শুরু করল এবং তার মধ্যে সহযোগিতা ও সমবায়ধর্মী চিন্তাধারার বিকাশ ঘটল ঠিক তখন থেকেই সামাজিক দ্বন্দ্ব- সংঘাত ও ঘাত- প্রতিঘাতের অনিবার্য পরিণতিস্বরূপ তার আত্মার মধ্যে বিভিন্ন ধরনের বিচ্যুতিও শুরু হয়ে গেল। মন্দ চরিত্র ও স্বভাব এবং ভুল চিন্তাধারা তার স্বভাবগত চিন্তাধারাকে পরিবর্তিত করে দেয় এবং সমাজকে সাম্যাবস্থা থেকে বের করে আনে। এ সব বিচ্যুতির কারণে নিখিল বি র   ষ্টা মানব সমাজের কর্মসূচী সুশৃঙ্খল ও সুবি স্তকরণ এবং মানুষের সামাজিক হওয়ার প্রত্যক্ষ ফলস্বরূপ যে সব দুর্নীতি ও বিচ্যুতির উদ্ভব হয়েছে তা হ্রাস করার জ   প্রশিক্ষকদের প্রেরণ করার সিদ্ধান্ত নেন। যাতে করে তাঁরা ওহীর প্র লিত প্রদীপের দ্বারা সমাজকে সঠিক পথ অর্থাৎ যে পথ তাদের সার্বিক সৌভাগ্য বিধান করবে সে পথে পরিচালিত করতে সক্ষম হন।

এ ক্ষেত্রে কোন কথার অবকাশ নেই যে, উপকারী হওয়া সত্ত্বেও সামাজিক জীবনের আরো কিছু ক্ষতিকর দিক আছে এবং তা ব্যাপক বিচ্যুতি বয়ে আনে। এ কারণেই মহান আল্লাহ্ যুগে যুগে এমন সব শিক্ষক- প্রশিক্ষককে প্রেরণ করেছেন যাঁরা যতটা সম্ভব বিচ্যুতি ও বিকৃতি অপসারণ এবং স্পষ্ট ঐশী বিধি- বিধান প্রবর্তন করার মাধ্যমে মানব সমাজকে সঠিক পথ ও ধারায় পরিচালিত করেছেন।[২০৪]

মহান নবীদের প্রেরণের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আরো বেশি ব্যাখ্যা ও বিবরণের জ মৎ প্রণীত রিসালাতে জাহানী- ই পিয়াম্বারান (মহান নবীদের বি জনীন রিসালাত) নামক গ্রন্থটি অধ্যয়ন করুন।

সমাজ সংস্কারের ক্ষেত্রে নবীদের ভূমিকা

সাধারণত মনে করা হয় যে, নবীরা হচ্ছেন ঐশী শিক্ষক যাঁরা মানব জাতিকে শিক্ষা দেয়ার জ প্রেরিত হয়েছেন। যেমনিভাবে একটি শিশু প্রাথমিক বিদ্যালয়, মাধ্যমিক ও উচ্চ- মাধ্যমিক বিদ্যালয়, কলেজ এবং বি বিদ্যালয়ে শিক্ষা অর্জন করার সময় প্রাথমিক বিদ্যালয়, মাধ্যমিক ও উচ্চ- মাধ্যমিক স্কুলশিক্ষক, প্রভাষক ও অধ্যাপকদের কাছে বিভিন্ন বিষয় শিক্ষা লাভ ও জ্ঞানার্জন করে ঠিক তেমনি মানব জাতি নবীদের আদর্শিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করে এবং মহান নবীদের শিক্ষামালার সমান্তরালে তাদের নৈতিক চরিত্র এবং সামাজিক আচরণাদিও পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়ে থাকে।

কিন্তু আমরা মনে করি যে, নবিগণ মানব জাতির প্রশিক্ষক। তাঁদের মৌলিক কাজ ও দায়িত্ব হচ্ছে মানব জাতিকে প্রশিক্ষিত করে গড়ে তোলা, তবে তা মানব জাতিকে শিক্ষা ও জ্ঞান দান নয়। তাঁদের প্রবর্তিত শরীয়তের মূল ভিত কোন নতুন কথা ও কোন নতুন অবদান নয়। মানবপ্রকৃতি বিচ্যুতির শিকার হলেই এবং অজ্ঞতার অশুভ কালো মেঘ তাদের ওপর ছায়া বিস্তার করলেই ঐশী ধর্ম ও বিধি- বিধানের মূল নির্যাস মানব জাতির কাছে স্পষ্ট করে দেয়া হতো।

তবে এ ধরনের কথা ও অভিমতের ভিত হচ্ছে ইসলাম ধর্মের সুমহান ইমামদের বক্তব্য ও বাণী। আমীরুল মুমিনীন ইমাম আলী (আ.) নাহজুল বালাগায় নবীদের প্রেরণের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলেছেন :

أخذ على الوحي ميثاقهم و على تبليغ الرّسالة أمانتهم... ليستأدوهم ميثاق فطرته، و يذكّروهم منسيّ نعمته، و يحتجّوا عليهم بالتّبليغ و يثيروا لهم دفائن العقول

"মহান আল্লাহ্ মানব জাতির মধ্য থেকে মহান নবীদের মনোনীত করেছেন এবং তাঁদের কাছ থেকে ওহী এবং মহান আল্লাহর রিসালাত (জনগণের কাছে) পৌঁছে দেয়ার প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেছেন যাতে করে তাঁরা মানব জাতির কাছ থেকে তাদের ফিতরাত অর্থাৎ মানবপ্রকৃতি ও স্বভাবভিত্তিক প্রতিশ্রুতি ও অ ীকারের পুনঃদাবি করেন, আল্লাহপ্রদত্ত যে সব নেয়ামত (মানব

জাতি) ভুলে গেছে সেগুলো তাদের পুনরায় স্মরণ করিয়ে দেন, তাদের কাছে দীন প্রচার করার মাধ্যমে তাদের ওপর মহান আল্লাহর দলিল- প্রমাণ পূর্ণ করেন এবং তাদের বিবেক- বুদ্ধি যা চাপা পড়ে গিয়েছিল তা বের করে আনেন।"[২০৫]

একটি জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত

আমরা যদি বলি যে, একটি চারার পরিচর্যার ক্ষেত্রে একজন মালীর যে ভূমিকা আছে, মানুষের অন্তরাত্মার প্রশিক্ষণ ও সংশোধনের ক্ষেত্রে মহান নবীদেরও ঐ একই ভূমিকা ও দায়িত্ব রয়েছে অথবা মানব জাতির প্রকৃতিগত অনুভূতিসমূহের সুষ্ঠু পরিচালনার ক্ষেত্রে মহান নবীদের উপমা হচ্ছে একজন প্রকৌশলীর ভূমিকার ায় যিনি পাহাড়- পর্বতের অভ্যন্তর থেকে মহামূল্যবান খনিজ পদার্থ উত্তোলন করেন, তাহলে আমাদের এ বক্তব্য বৃথা বলে গণ্য হবে না।

এ বিষয়টি একটু ব্যাখ্যা করতে চাই। একটি ক্ষুদ্র চারা গাছ দানা বা বীজের গঠনের সময় থেকে বিকশিত হয়ে পূর্ণা গাছে রূপান্তরিত হওয়ার সমুদয় সামর্থ্য ও সম্ভাবনার অধিকারী। যখন এ চারাটি শক্তিশালী শিকড় এবং বিভিন্ন ধরনের তন্ত্রসমেত উন্মুক্ত বাতাস এবং পর্যাপ্ত আলোয় ক্রিয়াশীল হয় অর্থাৎ জৈবিক কর্মতৎপরতা শুরু করে ঠিক তখন ঐ চারাটির সমগ্র অস্তিত্বের মাঝে এক অভিনব গতি ও আন্দোলনের সঞ্চার হয়। এ সময় মালীর দু'টি কাজ আছে :

প্রথম কাজ: সুপ্ত সম্ভাবনাময় শক্তি যেন বিকশিত হয় সেজ চারা গাছটির মূল বা শিকড় দৃঢ় ও শক্তিশালী করার সমুদয় শর্ত ও পরিবেশ পূরণ করা।

দ্বিতীয় কাজ: যখন চারা গাছটির অন্তর্নিহিত শক্তিসমূহ উক্ত চারা গাছটির সুষ্ঠু বিকাশ ও প্রবৃদ্ধির বিপরীতে ভূমিকা রাখবে ঠিক তখনই সব ধরনের বিচ্যুতি প্রতিহত করা। এ কারণেই একজন মালীর কাজ উদ্ভিদের অঙ্কুরোদগম ঘটানো নয়, বরং উদ্ভিদ যাতে করে গুপ্ত ও সুপ্ত পূর্ণতা লাভ করতে পারে সেজ সতর্ক দৃষ্টি রাখা এবং যাবতীয় প্রয়োজনীয় শর্ত পূরণ করা।

নিখিল বি র মহান ষ্টা মানুষকে সৃষ্টি করেছেন এবং তার প্রকৃতির মাঝে বিভিন্ন ধরনের শক্তি এবং প্রচুর ঝোঁক ও প্রবণতা আমানত হিসাবে স্থাপন ও সৃষ্টি করেছেন; মানবসত্তা ও ব্যক্তিত্বের মূল নির্যাসকে ষ্টান্বেষণ, ষ্টা পরিচিতি ও দর্শন, সত্যকামিতা ও সত্যান্বেষী

অনুভূতি, ায়পরায়ণ হওয়ার অনুভূতি, ায়বিচার ও পৌরুষের অনুভূতি এবং কর্মচাঞ্চল্য ও কর্মতৎপরতার ঝোঁক ও প্রবণতার সাথে সংমিশ্রিত করেছেন। এ সব পবিত্র বীজ মানব দয়ের মধ্যে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হতে থাকে, তবে সামাজিক জীবন মানুষের অস্তিত্বের মধ্যে কিছু কিছু বিচ্যুতি এনে দেয়। যেমন মানুষের মধ্যকার কর্মতৎপরতা ও পরিশ্রম করার ঝোঁক ও প্রবণতা লোভ-লালসাকারে, সৌভাগ্যবান ও চিরস্থায়ী হওয়ার ভালোবাসা একগুঁয়েমিপূর্ণ মনোবৃত্তি ও পদলিপ্সায় এবং তাওহীদ ও ইবাদাত- বন্দেগী মূর্তিপূজার আদলে আবির্ভূত হয়।

এ সময়েই ঐশী প্রশিক্ষকগণ ওহীর নূর এবং সঠিক পরিকল্পনা ও কর্মসূচীর মাধ্যমে বিকাশের যাবতীয় শর্ত ও পূর্বপ্রস্তুতিমূলক পদক্ষেপের আয়োজন করেন এবং প্রকৃতিগত ঝোঁক ও প্রবণতাসমূহের সমুদয় বিচ্যুতি ও সীমা লঙ্ঘনকে প্রতিহত করে সেগুলোকে ভারসাম্যপূর্ণ করেছেন।

আমীরুল মুমিনীন ইমাম আলী (আ.) বলেছেন, “ ষ্টা সৃষ্টির প্রাক্কালে (মানুষের কাছ থেকে) ‘সৃষ্টিগত প্রতিজ্ঞা ’ (অর্থাৎ ফিতরাত বা স্বভাব- প্রকৃতিভিত্তিক প্রতিজ্ঞা) নামে একটি প্রতিশ্রুতি নিয়েছেন। এই প্রতিজ্ঞা ও প্রতিশ্রুতির প্রকৃত উদ্দেশ্যই বা কি? এর প্রকৃত তাৎপর্য হচ্ছে যে, মহান আল্লাহ্ অগণিত উত্তম চারিত্রিক গুণের সাথে মানুষের স্বভাব ও প্রকৃতি সংমিশ্রিত করে তার (মানুষের) উপকারী ঝোঁক ও প্রবণতাসমূহ সৃষ্টি করে তার থেকে ফিতরাতভিত্তিক প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেছেন যেন সে ভালো ও উপকারী ঝোঁক ও প্রবণতা এবং চারিত্রিক গুণাবলীর অনুসরণ করে।“

চক্ষু (দৃষ্টিশক্তি) প্রদান করা যদি মানুষের কাছ থেকে এক ধরনের প্রতিশ্রুতি গ্রহণ হয়ে থাকে (অর্থাৎ এ প্রতিশ্রুতি হচ্ছে মানুষের গর্ত বা কুয়ার মধ্যে পতিত না হওয়া) তাহলে একইভাবে ষ্টার পরিচিতি অর্জন এবং ায়পরায়ণ হবার অনুভূতি ইত্যাদি প্রদানের অর্থ হবে মানুষের কাছ থেকে মহান আল্লাহর প্রতিশ্রুতি গ্রহণ অর্থাৎ এ সব অনুভূতি প্রদান করে মানুষের কাছ থেকে আল্লাহ্ প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেছেন যেন সে মহান ষ্টা সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান ও পরিচিতি লাভ করে এবং ায়পরায়ণ হয়। মহান নবীদের দায়িত্ব হচ্ছে মানব জাতিকে তাদের সৃষ্টিপ্রকৃতিভিত্তিক

প্রতিশ্রুতি ও অ ীকার অনুযায়ী কাজ ও আচরণ করতে উদ্বুদ্ধ করা এবং যে সব অন্তরায় মানবপ্রকৃতির ওপর অশুভ কালো ছায়া বিস্তার করেছে তা অপসারণ ও বিদীর্ণ করা। এ কারণেই বলা হয় যে, সকল আসমানী ধর্ম ও শরীয়তের মূল ভিতই হচ্ছে মানবপ্রকৃতি এবং এতৎসংক্রান্ত বিষয়াদি।

মানুষের সম্পূর্ণ অস্তিত্ব যেন ঐ পাহাড়তুল্য যার অভ্যন্তরে মূল্যবান পাথর এবং স্বর্ণের আকরিক লুক্কায়িত আছে। ঠিক ত প মানবপ্রকৃতির অভ্যন্তরে উত্তম ও মহৎ গুণাবলী, জ্ঞান- বিজ্ঞান এবং প্রগাঢ় তত্ত্বজ্ঞান বিভিন্ন রূপ ও অবয়বে লুক্কায়িত আছে।

নবিগণ ছিলেন মানব জাতির মনস্তাত্ত্বিক প্রশিক্ষক। তাঁরা আমাদের আত্মা ও মন নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা- ভাবনা করার সময় ভালোভাবে অবগত আছেন যে, আমাদের আত্মা ও মন কতগুলো উচ্চতর বৈশিষ্ট্য, পবিত্র আবেগ ও অনুভূতি এবং মানসিক শক্তির সাথে মিলেমিশে একাকার হয়ে আছে। তাঁরা তাঁদের শিক্ষা- দীক্ষা, কর্মসূচী ও পরিকল্পনার দ্বারা এই মানব আত্মা ও মনকে সহজাত মানবপ্রকৃতির কাঙ্ক্ষিত ও বাঞ্ছিত অবস্থার দিকে ফিরিয়ে নিয়ে যান। তাঁরা বিবেক ও সহজাত মানবপ্রকৃতির বিধানসমূহ বর্ণনা করেন এবং মানুষকে তার নিজ সত্তার মধ্যে তার যে ব্যক্তিত্ব এবং যে সব বৈশিষ্ট্য নিহিত রয়েছে সে সব সম্পর্কে অবগত করান।

হিরা পর্বতে মহানবী (সা.)

হিরা পর্বত পবিত্র মক্কা নগরীর উত্তরে অবস্থিত। আধা ঘন্টার ব্যবধানে এ পর্বতের শৃঙ্গে আরোহণ করা যায়। বাহ্যত এ পর্বত কৃষ্ণ প্রস্তর দ্বারা গঠিত এবং জীবনের সামান্যতম চিহ্নও এ পর্বতে দৃষ্টিগোচর হয় না। এ পর্বতের উত্তরাংশে একটি গুহা আছে। অনেক পাথর অতিক্রম করে অবশেষে সেখানে পৌঁছানো যায়। এ গুহার উচ্চতা একজন মানুষের উচ্চতার সমান। এ গুহার একটি অংশ সূর্যের আলোয় আলোকিত হয় এবং অন্য অংশ সব সময় অন্ধকারাচ্ছন্ন থাকে।

কিন্তু এ গুহাটিই এমন সব (ঐতিহাসিক) ঘটনার সাক্ষী যে, আজও ঐ গুহার অব্যক্ত ভাষা থেকে এ সব ঘটনা শোনার তীব্র আকর্ষণ মানুষকে এ গুহার কাছে টেনে নিয়ে যায় এবং প্রচুর কষ্ট ও পরিশ্রম করে আগ্রহী দর্শনার্থী এ গুহার দ্বারপ্রান্তে পৌঁছতে সক্ষম হয়। এ গুহায় পৌঁছেই মানুষ ওহী অবতীর্ণ হওয়ার মহাঘটনা এবং বিশ্ব মানবতার মহান নেতা হযরত মুহাম্মদ (সা.)- এর জীবনের অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি অংশ জানার আগ্রহ প্রকাশ করে। ঐ গুহাটি যেন তার অব্যক্ত ভাষায় (দর্শনার্থীদের) বলতে থাকে : এ স্থানটি কুরাইশ বংশের সর্বাধিক প্রিয় ব্যক্তিটির ইবাদাতগাহ্। তিনি নবুওয়াতের সুমহান মর্যাদায় সমাসীন হবার আগে বেশ কিছু দিবারাত্রি এখানে অতিবাহিত করেছিলেন। তিনি এ স্থানটি ইবাদাত- বন্দেগী করার জন্য পছন্দ ও মনোনীত করেছিলেন যা ছিল নগর জীবনের সকল কোলাহল থেকে মুক্ত। তিনি পুরো রামাযান মাস এখানেই কাটাতেন। অন্যান্য মাসেও তিনি কখনো কখনো এখানে অবস্থান করতেন। এমনকি তাঁর স্ত্রী খাদীজাহ্ও জানতেন, যখনই কুরাইশদের সর্বাধিক প্রিয় ব্যক্তি ঘরে আসতেন না তখন তিনি নিশ্চিত থাকতেন যে, তাঁর স্বামী হিরা গুহায় গভীর ধ্যান ও ইবাদাত- বন্দেগীতে লিপ্ত আছেন। তাই যখন তিনি কাউকে তাঁর সন্ধানে পাঠাতেন তখন তারা এ গুহায় এসে তাঁকে গভীর চিন্তা, ধ্যান ও ইবাদাত- বন্দেগীতে লিপ্ত দেখতে পেত।

নবুওয়াতের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হবার আগে মহানবী (সা.) দু'টি বিষয়ে সবচেয়ে বেশি ভাবতেন। বিষয় দু'টি ছিল :

১. তিনি পৃথিবী ও আকাশে বিদ্যমান ঐ রিক শক্তি ও মহিমা নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করতেন। তিনি প্রতিটি সৃষ্ট অস্তিত্ববান সত্তার মুখাবয়বে মহান আল্লাহর নূর (আলো) এবং তাঁর সীমাহীন ক্ষমতা ও জ্ঞান প্রত্যক্ষ করতেন। আর এ পথেই অবস্তুগত ঊর্ধ্বলোক ও আধ্যাত্মিক জগতের প্রবেশদ্বারসমূহ তাঁর সামনে উন্মুক্ত হয়ে যেত।

২. যে গুরুদায়িত্ব তাঁর কাছে অর্পণ করা হবে সে ব্যাপারেও তিনি চিন্তা করতেন। এতসব নৈতিক অধঃপতন, বিশৃঙ্খলা ও ফিতনা- ফাসাদ থাকা সত্ত্বেও তাঁর দৃষ্টিতে তদানীন্তন সমাজের (কাঙ্ক্ষিত) সংস্কার ও সংশোধন কোন অসম্ভব কাজ বলে গণ্য হয় নি। তবে সঠিক সংস্কারমূলক কর্মসূচী ও পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করাও ছিল অত্যন্ত কষ্টসাধ্য ও দুরূহ। এ দৃষ্টিকোণ থেকেই তিনি মক্কাবাসীদের পাপাচার ও বিলাসব ল জীবনকে দেখেছেন এবং তাদের সংশোধন প্রক্রিয়ার ব্যাপারেও তিনি গভীরভাবে চিন্তা- ভাবনা করেছেন।

তিনি নি প্রাণ ইচ্ছাশক্তিহীন প্রতিমা ও বিগ্রহসমূহের সামনে মক্কাবাসীদের নতজানু হওয়া ও ইবাদাত- বন্দেগী করার দৃশ্য দেখে খুবই মর্মাহত হতেন এবং তাঁর পবিত্র মুখমণ্ডলে এ ব্যাপারে তীব্র অসন্তোষ ও ক্ষোভের চিহ্ন স্পষ্টরূপে ফুটে উঠত। কিন্তু যেহেতু তাঁকে জনসমক্ষে সত্য প্রকাশ করার অনুমতি তখনও দেয়া হয় নি সেজ তিনি তা প্রকাশ্যে বর্ণনা করা থেকে বিরত থেকেছেন।

ওহী অবতরণের শুভ সূচনা

মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে একজন ফেরেশতা সৌভাগ্য ও হেদায়েতের গ্রন্থের (আল কোরআন) প্রারম্ভক ও শুভ সূচনা হিসাবে কিছু আয়াত মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)- এর কাছে পাঠ করেন। আর এ কয়েকটি আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার মধ্য দিয়ে হযরত মুহাম্মদ (সা.) নবুওয়াতের মর্যাদাপূর্ণ স্থানে অধিষ্ঠিত হলেন (এ ঘটনার মধ্য দিয়ে হযরত মুহাম্মদ (সা.)- এর নবুওয়াত আনুষ্ঠানিকভাবে মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হয়)। ঐ ফেরেশতা ছিলেন হযরত জিবরাইল (আ.)। আর ঐ দিনটি ছিল মহানবী (সা.)- এর নবুওয়াতের অভিষেক (মাবআ'স) দিবস। এ দিবসটির তারিখ নির্ধারণ করার ব্যাপারে আমরা সামনে বিস্তারিত আলোচনা করব।

নিঃসন্দেহে ফেরেশতার মুখোমুখি হওয়ার জ এক বিশেষ ধরনের প্রস্তুতি আবশ্যক। যতক্ষণ পর্যন্ত কোন ব্যক্তির আত্মা মহান ও আধ্যাত্মিকভাবে শক্তিশালী না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত নবুওয়াতের ভারী বোঝা বহন এবং ফেরেশতার সাথে সাক্ষাৎ করার ক্ষমতা তার হবে না। মহানবী মুহাম্মদ (সা.) দীর্ঘ ইবাদাত- বন্দেগী, চিন্তা ও ধ্যান এবং মহান আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ ও আনুকূল্যের দ্বারা এ বিশেষ যোগ্যতা ও প্রস্তুতি অর্জন করেছিলেন। অধিকাংশ সীরাত রচয়িতার উদ্ধৃতি অনুযায়ী মাবআ'স দিবসের আগে তিনি এমন সব স্বপ্ন দেখতেন যা ছিল আলোকোজ্জ্বল দিনের মতো বাস্তব।[২০৬]

দীর্ঘদিন তাঁর জীবনের সর্বোৎকৃষ্ট ও সবচেয়ে উপভোগ্য মুহূর্তগুলো ছিল তাঁর হিরা গুহায় একাকী নির্জনবাস ও ইবাদাত- বন্দেগীর মুহূর্ত। এ অবস্থার মধ্য দিয়ে তাঁর সময় ও মুহূর্তগুলো অতিবাহিত হচ্ছিল। অবশেষে এক বিশেষ দিবসে এক ফেরেশতা একটি ফলকসহ অবতীর্ণ হয়ে ঐ ফলকটি তাঁর সামনে তুলে ধরে বলেছিলেন, "পড়ুন।"যেহেতু তিনি উম্মী (নিরক্ষর) ছিলেন এবং কখনই কোন বই পাঠ করেন নি সেহেতু তিনি বলেছিলেন, "আমি তো পড়তে পারি না।"ওহী বহনকারী ফেরেশতা তাঁকে জড়িয়ে ধরে খুব শক্তভাবে চাপ দিলেন। এরপর তাঁকে পুনরায় পড়তে বললে তিনি ঐ একই উত্তর দিয়েছিলেন। ঐ ফেরেশতা পুনরায় তাঁকে জড়িয়ে ধরে খুব শক্তভাবে

চাপ দেন। এভাবে তিন বার চাপ দেয়ার পর মহানবী (সা.) নিজের মধ্যে অনুভব করলেন যে, ফেরেশতার হাতে যে ফলকটি আছে তা তিনি পড়তে পারছেন। এ সময় তিনি ঐ আয়াতসমূহ পাঠ করলেন যা ছিল বাস্তবে মানব জাতির সৌভাগ্যদানকারী গ্রন্থের অবতরণিকাস্বরূপ। নিচে ঐ আয়াতগুলো পেশ করা হলো :

(إقرأ باسم ربّك الّذي خلق، خلق الإنسان من علق، إقرأ و ربّك الأكرم، الّذي علّم بالقلم، علّم الإنسان ما لم يعلم)

" পড়ুন আপনার প্রভুর নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টি করেছেন মানুষকে এক বি   জমাট রক্ত থেকে। পড়ুন আর আপনার প্রভু মহান (অত্যন্ত সম্মানিত)। যিনি কলম দ্বারা শিক্ষা দিয়েছেন। মানুষ যা জানত না তা তিনি তাকে শিক্ষা দিয়েছেন।"(সূরা আলাক : ১- ৫)

জিবরাইল (আ.) স্বীয় দায়িত্ব পালন করলেন। আর মহানবীও ওহী অবতীর্ণ হবার পর হিরা পর্বত থেকে নিচে নেমে আসলেন এবং হযরত খাদীজার গৃহের দিকে গমন করলেন।[২০৭]

উপরিউক্ত আয়াতসমূহ মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)- এর সংক্ষিপ্ত কর্মসূচী ও পরিকল্পনা স্পষ্ট করে দেয় এবং প্রকাশ্যে প্রমাণ করে যে, তাঁর ধর্মের মূল ভিতই হচ্ছে অধ্যয়ন, জ্ঞান ও বিজ্ঞান এবং কলমের ব্যবহার।

একজন বস্তুবাদী ব্যক্তির বিশ্বদৃষ্টি

প্রকৃতিবিজ্ঞানের উত্তরোত্তর উন্নতি ও অগ্রগতি অনেক বিজ্ঞানীর কাছ থেকেই আধ্যাত্মিক ও প্রকৃতিবিজ্ঞানের সীমা- পরিসীমার ঊর্ধ্বে বিদ্যমান বিষয়াদি সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করার শক্তি ছিনিয়ে নিয়েছে এবং তাদের চিন্তা- ভাবনার সীমা- পরিসীমাকে অত্যন্ত সীমিত করে দিয়েছে। এঁরা চিন্তা করেন যে, বি জগৎ বলতে আসলে এ বস্তুজগতকেই বুঝায় এবং বস্তু ও পদার্থের বাইরে আর কোন কিছুর অস্তিত্বই নেই। আর যে সব বিষয় বস্তুবাদের মূলনীতি ও বিধানের দ্বারা ব্যাখ্যা করা যাবে না সেগুলোই হচ্ছে অলীক ও বাতিল।

এ গোষ্ঠীটি ওহী এবং অতি প্রাকৃতিক (আধ্যাত্মিক- অবস্তুগত) বিষয়াদি সম্পর্কে অগ্রিম অভিমত (কোন চিন্তা- ভাবনা ও গবেষণা না করেই) ব্যক্ত এবং পরিচিতি ও জ্ঞান লাভের উপায়- উপকরণ ও মাধ্যমকে পঞ্চেন্দ্রিয় ও অভিজ্ঞতার মধ্যে সীমাবদ্ধ করার কারণেই ওহীর জগৎ অর্থাৎ আধ্যাত্মিক অবস্তুগত জগতের অস্তিত্বকে অস্বীকার করেছে। আর যেহেতু ইন্দ্রিয়ানুভূতি, অভিজ্ঞতা এবং বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা- নিরীক্ষা তাদেরকে ওহীর জগৎ অর্থাৎ আধ্যাত্মিক অবস্তুগত জগতের দিকে পরিচালিত (করে না) এবং এ ধরনের (অবস্তুগত) অস্তিত্ববান সত্তার অস্তিত্ব সম্পর্কে কোন তথ্য জ্ঞাপন করে না, যেহেতু তারা তাদের অ ব্যবচ্ছেদকারী ছুরি ও অণুবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে এ ধরনের অবস্তুগত অস্তিত্ববান সত্তাকে দেখতে পায় না অথবা ল্যাবরেটরীতে যেহেতু এ সব অস্তিত্ববান সত্তার কোন নিদর্শন দৃষ্টিগোচর হয় না সেহেতু তারা অবস্তুগত আধ্যাত্মিক জগৎ ও ওহীর অস্তিত্বই সরাসরি অস্বীকার করেছে। পরিণামে যেহেতু পরিচিতি ও জ্ঞান লাভের বিদ্যমান উপায়- উপকরণ ও মাধ্যমসমূহ (ইন্দ্রিয়ানুভূতি ও অভিজ্ঞতা) তাদেরকে এ সব অবস্তুগত আধ্যাত্মিক বিষয়ের দিকে পরিচালিত করে না, সেহেতু তাদের দৃষ্টিতে অবশ্যই এ সব বিষয়ের বাহ্য কোন অস্তিত্বই নেই।

আসলে এ ধরনের চিন্তা- ধারা অত্যন্ত সীমিত, অপূর্ণা এবং অহংকার ও গর্বমিশ্রিত চিন্তাধারা বৈ আর কিছুই নয়। আর এ ক্ষেত্রে অপ্রাপ্তিকে ভুলক্রমে অনস্তিত্ব বলে চালিয়ে দেয়া হয়েছে। আর

যেহেতু বর্তমানে বিদ্যমান উপায়- উপকরণ ও মাধ্যম ব্যবহার করে যে সব সত্য বিষয়ে মহান স্রষ্টার উপাসক জ্ঞানী ও পণ্ডিতগণ বি াস করেন সে সব বিষয়ে তারা পৌঁছতে পারে না সেহেতু তারা (তাদের নিজেদের এ অপারগতা থেকে) সিদ্ধান্ত নেয় যে, এ সব আধ্যাত্মিক অবস্তুগত বিষয় সম্পূর্ণরূপে ভিত্তিহীন।

এতে কোন সন্দেহ নেই যে, বস্তুবাদীরা অতি প্রাকৃতিক আধ্যাত্মিক জগৎসমূহের কথা বাদ দিলেও এমনকি স্রষ্টার অস্তিত্ব প্রমাণ করার ব্যাপারে স্রষ্টায় বি াসী জ্ঞানী- পণ্ডিতদের বক্তব্যের প্রকৃত অর্থ ও তাৎপর্য মোটেও উপলব্ধি করতে পারে নি। যদি সব ধরনের সংকীর্ণ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং গোঁড়ামি পরিহার করে সুষ্ঠু পরিবেশে আস্তিক ও নাস্তিক গোষ্ঠী পারস্পরিক আলোচনা- পর্যালোচনায় অংশগ্রহণ করে তাহলে ধারণা করা সম্ভব হবে যে, বস্তুবাদী ও আস্তিকের মধ্যকার ব্যবধান অচিরেই দূর হয়ে যাবে। যে মতবিরোধ জ্ঞানী- পণ্ডিত ব্যক্তিদেরকে দু'দলে বিভক্ত করে ফেলেছে তা আর বিদ্যমান থাকবে না।

আস্তিক পণ্ডিতবর্গ মহান আল্লাহর অস্তিত্ব অকাট্যভাবে প্রমাণকারী অগণিত দলিল- প্রমাণ উপস্থাপন করেছেন। তন্মধ্যে এ প্রকৃতিবিজ্ঞানই (পদার্থবিদ্যা, রসায়ন ও জীববিদ্যা) আমাদেরকে এক জ্ঞানী- ক্ষমতাবান স্রষ্টার অস্তিত্বের দিকে পরিচালিত করে। সকল বস্তুগত অস্তিত্ববান সত্তার ভিতরে ও বাইরে যে আশ্চর্যজনক ব্যবস্থা ক্রিয়াশীল তা এ ব্যবস্থার অস্তিত্বদানকারীর অস্তিত্বেরই অকাট্য দলিল- প্রমাণস্বরূপ। নীহারিকাপুঞ্জ থেকে নিয়ে পরমাণু পর্যন্ত এ সমগ্র বস্তুজগৎ সুশৃঙ্খল ও সুবি স্ত নিয়ম ও বিধানসমূহের ওপর নির্ভর করেই পূর্ণতা প্রাপ্তির পথে অগ্রযাত্রা অব্যাহত রেখেছে। আর অন্ধ ও বধির প্রকৃতির পক্ষে কখনই এ অনিন্দ্য সুন্দর ব্যবস্থার অস্তিত্ব দান সম্ভব নয়। আর এটাই হচ্ছে অস্তিত্বের শৃঙ্খলাভিত্তিক প্রমাণ যে ব্যাপারে অগণিত গ্রন্থ রচনা করা হয়েছে। সৃষ্টির শৃঙ্খলা নির্দেশক দলিল- প্রমাণটি সকল স্তর ও শ্রেণীর মানুষের জ বোধগম্য। সাধারণত সর্বসাধারণ বই- পুস্তক ও লিখিত প্রবন্ধসমূহে এ দলিলটির ওপরই নির্ভর করা হয়। আর প্রত্যেক ব্যক্তি কোন এক দিক থেকে এ দলিল- প্রমাণ উত্থাপন ও আলোচনা করে থাকে। আর যে সব দলিল- প্রমাণ এতটা সর্বজনীন নয় সেগুলো সম্পর্কে দর্শন ও কালামশাস্ত্রের গ্রন্থসমূহে

বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

সূক্ষ্ম, অবস্তুগত আত্মা এবং অতি প্রাকৃতিক জগৎসমূহের ব্যাপারে যে সব দলিল-প্রমাণ ও আলোচনা রয়েছে সেগুলোর মধ্য থেকে কয়েকটির ব্যাপারে আমরা এখানে আলোকপাত করব।

অবস্তুগত আত্মা

রুহ অর্থাৎ আত্মায় বি াস অ তম জটিল ও দুরূহ বিষয় যা জ্ঞানী ব্যক্তিদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। যারা সব কিছু বস্তুবাদী বিশ্লেষণের দৃষ্টিতে দেখতে ও পর্যালোচনা করতে চায় তারাই আত্মার অস্তিত্ব অস্বীকার করেছে। তারা কেবল এমন মানবিক মন ও মানসে বি াসী যার বস্তুগত দিক ও পর্যায় রয়েছে এবং যার কার্যকারিতা প্রাকৃতিক নিয়ম-কানুনের প্রভাবাধীন।

অবস্তুগত আত্মা ও মনের অস্তিত্ব ঐ সব বিষয়ের অন্তর্গত যেগুলো আস্তিক ও আধ্যাত্মিক জগৎসমূহের অস্তিত্বে বি াসীদের পক্ষ থেকে খুব সূক্ষ্মভাবে আলোচিত হয়েছে। তারা এ ধরনের অবস্তুগত অস্তিত্ববান সত্তার অস্তিত্বের ব্যাপারে অগণিত দলিল-প্রমাণ উত্থাপন করেছেন। যদি কোন উপযুক্ত ক্ষেত্র ও পরিবেশে ঐশী দলিল-প্রমাণসমূহের মূলনীতিসমূহ সংক্রান্ত পূর্ণজ্ঞান ও পরিচিতিসহকারে এ সব দলিল-প্রমাণ আলোচনা করা হয় তাহলে তা সম্পূণরূপে গৃহীত হবে। ফেরেশতা, আত্মা, ওহী ও ইলহাম সম্পর্কে আস্তিক পণ্ডিত ও জ্ঞানিগণ যা কিছু বলেছেন তা সবই এমন এক ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত যা পূর্ব থেকেই মজবুত দলিল-প্রমাণ দ্বারা তাঁরা প্রমাণিত ও প্রতিষ্ঠিত করেছেন।[২০৮]

ওহী অথবা গোপন রহস্যাবৃত অনুভূতি

ওহী বা ঐশী প্রত্যাদেশে বি াস সকল আসমানী ধর্ম ও রিসালাতের মূল ভিত্তি। আর এর ভিত্তি হচ্ছে শক্তিশালী আত্মার অস্তিত্ব যা ফেরেশতার মাধ্যমে অথবা ফেরেশতার মাধ্যম ছাড়াই সরাসরি ঐশী জ্ঞান ও শিক্ষা লাভ করে। জ্ঞানী ব্যক্তিবর্গ ওহীর ব্যাপারে বলেছেন,

الوحي تعليمه تعالى من اصطفاه من عباده كلّ ما أراد اطّلاعه عليه من ألوان الهداية و العلم و لكن بطريقة خفيّة غير معتادة للبشر

" ওহী হচ্ছে এই যে, মহান আল্লাহ্ তাঁর মনোনীত কোন বান্দার কাছে হেদায়েতের পথসমূহ এবং বিভিন্ন প্রকার ঐশী (আধ্যাত্মিক) জ্ঞান স্বাভাবিক প্রচলিত পথ ও পদ্ধতির বাইরে ভিন্ন এক রহস্যাবৃত গোপনীয় পদ্ধতিতে শিখান। "

নিঃসন্দেহে প্রত্যেক মানুষের জীবন অজ্ঞতা বা জ্ঞানশূ তা থেকে শুরু হয়ে ধীরে ধীরে জ্ঞান ও পরিচিতির বলয়ে প্রবেশ করে। ধীরে ধীরে মানুষের সামনে তার মনোজগতের বাইরে অবস্থিত জগৎসমূহে প্রবেশদ্বার ও পথসমূহ উন্মুক্ত হতে থাকে।

প্রথমে বাহ্য পঞ্চেন্দ্রিয়ের মাধ্যমে মানুষ বেশ কিছু বাস্তবতার সাথে পরিচিত হয়। এরপর তার চিন্তা ও অনুধাবন ক্ষমতার পূর্ণতাপ্রাপ্তির কারণে ধীরে ধীরে এমন সব বাস্তবতা উপলব্ধি করতে সক্ষম হয় যা স্পর্শ, ইন্দ্রিয়ানুভূতি ও ধরা- ছোঁয়ার বাইরে। এর ফলে সে একজন মননশীল যুক্তিবাদী মানুষে পরিণত হয় এবং কতগুলো সর্বজনীন অর্থ ও তাৎপর্য এবং সর্বজনীন তাত্ত্বিক নিয়ম- কানুন সম্পর্কে পর্যাপ্ত জ্ঞান ও ধারণা লাভ করতে সক্ষম হয়।

কখনো কখনো মানব জাতির মাঝে এমন সব শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী ব্যক্তিকে দেখা যায় যাঁরা ইলহামের (অভ্যন্তরীণ অনুপ্রেরণা) মাধ্যমে প্রাপ্ত এক বিশেষ ধরনের দিব্যলোক ও দৃষ্টির দ্বারা এমন সব বিষয় সম্পর্কে জ্ঞাত ও পরিচিত হন যা কখনই যুক্তি ও বুদ্ধিবৃত্তির দ্বারা অর্জন করা সম্ভব নয়।

এ কারণেই পণ্ডিতগণ মানুষের অনুধাবন ও উপলব্ধি করার ক্ষমতাকে :

১. আপামর জনতার অনুধাবন ও উপলব্ধি,

২. চিন্তাশীল যুক্তিবাদীদের অনুধাবন ও উপলব্ধি

এবং ৩. আধ্যাত্মিক তত্ত্বজ্ঞানী সাধক এবং দিব্যদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিদের অনুধাবন ও উপলব্ধি- এ তিন ভাগে বিভক্ত করেছেন।

যেন বলা যায়, অগভীর বাহ্য দৃষ্টিশক্তির অধিকারিগণ পঞ্চেন্দ্রিয়ের মাধ্যমে, বুদ্ধিজীবী ও যুক্তিবাদিগণ যুক্তি- বুদ্ধির মাধ্যমে এবং দিব্যজ্ঞানসম্পন্ন আধ্যাত্মিক সাধকগণ ঊর্ধ্বলোক থেকে ইলহাম ও ইশরাক অর্থাৎ ঐশী অনুপ্রেরণা ও আধ্যাত্মিকতার ঔজ্জ্বল্য বিচ্ছুরণের মাধ্যমে প্রকৃত বাস্তবতা উদঘাটনে রত হয়।

নীতিশাস্ত্রের প্রতিভাধর দিকপালগণ এবং বিজ্ঞানী ও দার্শনিকগণ স্বীকার করেন যে, তাঁদের অভূতপূর্ব আবিষ্কারসমূহ বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এক ধরনের আধ্যাত্মিক অনুপ্রেরণাদায়ক আলোক-স্ফুলি ে র প্রভাবেই তাদের মানসপটে প্রতিফলিত ও প্রস্ফুটিত হয়েছে। এরপর তাঁরা বিভিন্ন ধরনের চাক্ষুষ ও পরীক্ষামূলক (ব্যবহারিক) পদ্ধতি ও প্রক্রিয়াসমূহের সাহায্য নিয়ে ঐ সব আবিস্কৃত বিষয়াদির পূর্ণতা বিধানের প্রয়াস চালিয়েছেন।

জ্ঞান অর্জনের উৎসত্রয়

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জনের জ (অর্থাৎ জ্ঞানার্জনের ক্ষেত্রে) মানুষের করায়ত্তে তিনটি প্রধান পথ বা উৎস আছে। সাধারণ মানুষ প্রধানত প্রথম পদ্ধতি, দ্বিতীয় গোষ্ঠীটি দ্বিতীয় পদ্ধতি এবং অতি মুষ্টিমেয় ব্যক্তি আত্মিক পূর্ণতা অর্জন করে তৃতীয় পদ্ধতি ব্যবহার করেন।

১ .**ইন্দ্রিয়ানুভূতিলব্ধ পথ ও পদ্ধতি**: এ পদ্ধতির প্রকৃত ও কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য হচ্ছে ঐ সব অনুভূতি ও উপলব্ধি যা বাহ্য পঞ্চেন্দ্রিয়ের মাধ্যমে মানুষের মন ও মানসপটে অনুপ্রবেশ করে। যেমন সব ধরনের দৃষ্টিগোচরীভূত বস্তু, (সব ধরনের) স্বাদ ও খাদ্যবস্তু, সুগন্ধি দ্রব্য ইত্যাদি বিশেষ ধরনের অ - প্রত্য এবং মাধ্যমের দ্বারা আমাদের অনুভূতি ও উপলব্ধির মূল অক্ষে স্থাপিত হয়। আজ টেলিস্কোপ, অণুবীক্ষণ যন্ত্র, রেডিও, টেলিভিশন ইত্যাদির আবিষ্কার মানুষের ইন্দ্রিয়ানুভূতিলব্ধ উপলব্ধি ও অনুধাবন ক্ষমতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে প্রশংসাব্যঞ্জক অবদান রেখেছে এবং তাকে কাছের ও দূরের বিষয়াদি ও বস্তুসামগ্রীর ওপর কর্তৃত্বশীল করেছে।

২ .**বুদ্ধিবৃত্তিক পথ ও পদ্ধতি**: বি র চিন্তাশীল ব্যক্তিবর্গ বুদ্ধিবৃত্তি ও চিন্তাশক্তিকে কাজে লাগিয়ে ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞান- বিজ্ঞানে কতগুলো স্বতঃসিদ্ধ, স্পষ্ট ও প্রতিষ্ঠিত পূর্বপ্রস্তুতিমূলক বিষয় থেকে ইন্দ্রিয়ের সীমারেখা বহির্ভূত কতগুলো সর্বজনীন নিয়ম- কানুন আবিষ্কার করেন এবং এভাবে জ্ঞান ও পরিচিতি এবং পূর্ণতার বেশ কিছু শৃ তাঁরা পদানত করেন। জ্ঞান- বিজ্ঞানের সর্বজনীন নিয়ম- কানুন, দার্শনিক বিষয়াদি এবং মহান ষ্টার গুণ ও ক্রিয়ার সাথে সংশ্লিষ্ট জ্ঞান ও তথ্যাবলী এবং যে সব বিষয় আকীদা- বি াস ও ধর্মশাস্ত্রে আলোচিত হয় সেগুলো সব কিছুই আসলে মানব চিন্তা এবং তার বুদ্ধিবৃত্তিক ক্ষমতা ও শক্তির ক্রিয়াশীলতা ও কার্যকারিতার প্রত্যক্ষ ফলস্বরূপ।

৩ .**ঐশী অনুপ্রেরণার পথ ও পদ্ধতি**: এটিই হচ্ছে সত্য চেনার তৃতীয় পথ যা পঞ্চেন্দ্রিয়, এমনকি বুদ্ধিবৃত্তিরও ঊর্ধ্বে এবং এগুলোর চেয়ে উন্নত। এটি প্রকৃত বাস্তব চেনার এমন এক পথ ও পদ্ধতি যা বিজ্ঞানের দৃষ্টিতেও অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। অবশ্য সংকীর্ণ বস্তুবাদী বি দৃষ্টি

বুদ্ধিবৃত্তি ও পঞ্চেন্দ্রিয়ের বলয় বহির্ভূত এ ধরনের উপলব্ধি, অনুধাবন ও অনুভূতি মেনে নিতে পারে না। তবে বৈজ্ঞানিক নীতিমালার আলোকে এ ধরনের অনুভূতি ও উপলব্ধি অস্বীকার করার কোন পথ বিদ্যমান নেই।

বস্তুবাদী বি দৃষ্টিতে বহিঃজগৎ সংক্রান্ত জ্ঞান ও পরিচিতি এবং প্রকৃত বাস্তবতাসমূহ সংক্রান্ত জ্ঞান ও পরিচিতি অর্জনের পথ কেবল প্রথম দু'টি পথ ও পদ্ধতির মাঝেই সীমাবদ্ধ। অথচ বড় বড় ঐশী ধর্ম ও শরীয়তভিত্তিক বি দৃষ্টি, দার্শনিক ও অধ্যাত্ম তত্ত্বজ্ঞানভিত্তিক বি দৃষ্টিতে (জ্ঞান ও পরিচিতির) তৃতীয় পথ ও পদ্ধতিটিও বিদ্যমান আছে যা হচ্ছে সকল আসমানী ধর্ম ও শিক্ষামালার মূল ভিত। কেবল জ্ঞানার্জনের তৃতীয় এ পথটি অস্বীকার করার যেমন কোন দলিল- প্রমাণ বিদ্যমান নেই, ঠিক তেমনি ওহী বিষয়ক যে সব দলিল- প্রমাণ উপস্থাপন করা হয়েছে তদনুযায়ী জ্ঞানার্জনের তৃতীয় এ পথটি একটি বাস্তব সত্য হিসাবে বিদ্যমান ও দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত এবং যে সব ব্যক্তি নিজেদেরকে ঐশী নেতা এবং মহান আল্লাহর মনোনীত বান্দা বলে জানে এবং যাঁদের আত্মা এক বিশেষ ধরনের নির্মল পবিত্রতা ও সতেজতার অধিকারী হয়েছে তাঁদের মাঝে তৃতীয় এ পথটি ব্যাপকভাবে দেখতে পাওয়া যায়।

যখনই মহান আল্লাহর সাথে কোন মানুষের সম্পর্ক ব্যক্তিগতভাবে গড়ে ওঠে তখনই তার অন্তঃকরণে বাহ্য পঞ্চেন্দ্রিয় ও বুদ্ধিবৃত্তির ব্যবহার ব্যতিরেকেই কোন এক নিগুঢ় বাস্তব সত্যেরই প্রতিফলন ও প্রক্ষেপ হতে থাকে। এ ধরনের প্রক্ষেপ ও অর্জনকেই 'ইলহাম' (ঐশী অনুপ্রেরণা) এবং কখনো কখনো 'ইশরাক' (আধ্যাত্মিক আলোর বিচ্ছুরণ) বলা হয়।

তবে যদি অতি প্রাকৃতিক (আধ্যাত্মিক) জগতের সাথে মানুষের সম্পর্ক এমন এক রূপ লাভ করে যার পরিণতি হচ্ছে কতগুলো সাধারণ শিক্ষা- দীক্ষা এবং সর্বজনীন বিধি- বিধান লাভ, তাহলে এ ধরনের প্রাপ্তিকেই 'ওহী' (ঐশী প্রত্যাদেশ), ওহী আনয়নকারীকে ওহীর ফেরেশতা এবং ওহীর গ্রহীতাকে 'নবী' বলা হয়।

ইলহাম কেবল এর গ্রহীতার কাছেই নিশ্চয়তাব্যঞ্জক হতে পারে, অথচ ঠিক একই সময় তা অ দেরকে তৃপ্ত ও সন্তুষ্ট নাও করতে পারে।[২০৯]

এ কারণেই জ্ঞানী ও পণ্ডিতগণ একমাত্র ঐ ওহীকেই সর্বজনীন তত্ত্বজ্ঞানের নির্ভরযোগ্য উৎসমূল বলে বিবেচনা করেন যা নবীদের ওপর অবতীর্ণ হয় যাঁদের নবুওয়াত অভ্রান্ত দলিল- প্রমাণ, যেমন মুজিযা ইত্যাদির দ্বারা প্রমাণিত ও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

ওহীর শ্রেণীবিভাগ

আত্মার যে সব পূর্ণতা আছে সেগুলোর কারণে বিভিন্ন পথে ও ভাবে আধ্যাত্মিক জগৎসমূহের সাথে সে (আত্মা) যোগাযোগ ও সম্পর্ক স্থাপন করতে পারে। আমরা এখানে এ সব পথ ও পদ্ধতি সংক্ষেপে আলোচনা করব। আর ইসলাম ধর্মের পবিত্র ইমামদের রেওয়ায়েত ও হাদীসসমূহে আধ্যাত্মিক জগৎসমূহের সাথে যোগসূত্র এবং সম্পর্ক স্থাপনের পথ ও পদ্ধতিসমূহ বর্ণিত হয়েছে।[২১০]

এ পথ ও পদ্ধতিগুলো নিম্নরূপ :

১. আত্মা কখনো কখনো ঐ রিক বাস্তবতা ও তাৎপর্যসমূহ ইলহাম আকারে গ্রহণ করে এবং যা কিছু তার দয়ের ওপর প্রক্ষিপ্ত হয় তা স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানের রূপ পরিগ্রহ করে যে, এগুলোতে কোন সন্দেহ ও সংশয়ের লেশ থাকে না।

২. মানুষ কোন বস্তু (যেমন পাহাড়- পর্বত ও গাছ) থেকে বিভিন্ন বাক্য ও শব্দ শুনতে পায়; যেমন হযরত মূসা (আ.) মহান আল্লাহর বাণী বৃক্ষ থেকে শুনেছিলেন।

৩. রৌদ্রোজ্জ্বল দিবসের ায় নিগুঢ় সত্য ও তাৎপর্যসমূহ স্বপ্নে মানুষের কাছে উন্মোচিত হয়।

৪. মহান আল্লাহর কাছ থেকে একজন ফেরেশতা বিশেষ বাণী পৌঁছে দেয়ার জ দায়িত্বপ্রাপ্ত হন। পবিত্র কোরআন এ পদ্ধতিতেই মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)- এর ওপর অবতীর্ণ হয়েছে। আর পবিত্র কোরআনের সূরা শুআরায় স্পষ্ট এরশাদ হচ্ছে : "রু ল আমীন (জিবরাইল) এ কোরআন পরিচ্ছন্ন আরবী ভাষায় আপনার অন্তঃকরণের ওপর অবতীর্ণ করেছে যাতে করে আপনি ভয় প্রদর্শনকারীদের অন্তর্ভুক্ত হন।"[২১১]

মিথ্যা কল্প- কাহিনীসমূহ

যে সব ব্যক্তি ও মনীষীর ব্যক্তিত্ব বি জনীন, ঐতিহাসিক ও জীবনী রচয়িতাগণ যতদূর সম্ভব তাঁদের জীবনী গ্রন্থাকারে লিখে সংরক্ষণ করার প্রয়াস চালিয়েছেন। এমনকি তাঁদের রচনা পূর্ণা

করার জ   তাঁরা বিভিন্ন স্থান সফর করেছেন। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)- এর মতো কোন ব্যক্তিত্বের সন্ধান পাওয়া যাবে না ইতিহাসে যার জীবনের যাবতীয় বিশেষত্ব ও খুঁটিনাটি দিক তাঁর মতো লিপিবদ্ধ করা হয়েছে; উল্লেখ্য যে, তাঁর সাহাবিগণ তাঁর জীবনের সমুদয় খুঁটিনাটি দিক ও ঘটনা যত্নসহকারে লিপিবদ্ধ ও সংরক্ষণ করেছেন।

এই অনুরাগ, আকর্ষণ ও ভালোবাসা যেমনি মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)- এর জীবনের যাবতীয় খুঁটিনাটি দিক ও ঘটনা লিপিবদ্ধ ও সংরক্ষণ করার ক্ষেত্রে সাহায্য করেছে ঠিক ত প তা কখনো কখনো মহানবীর জীবনী গ্রন্থে বাড়তি অলংকার ও সজ্জা (যা ভিত্তিহীন) সংযোজনের কারণও হয়েছে। অবশ্য এ সব কাজ (ভিত্তিহীন কাহিনী ও বানোয়াট ঘটনাসমূহ) যেখানে অজ্ঞ বন্ধুদের দ্বারা সম্পন্ন হওয়া অসম্ভব নয় সেখানে জ্ঞানী শত্রুদের দ্বারা তা সম্পন্ন হওয়া মোটেও অসম্ভব নয়। এ কারণেই কোন মনীষী বা ব্যক্তিত্বের জীবনী রচয়িতার ওপর অত্যাবশ্যকীয় দায়িত্ব হচ্ছে ঐ মনীষী বা ব্যক্তিত্বের জীবনের ঘটনাবলী বিশ্লেষণ করার ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত দৃঢ়তা ও সতর্কতা অবলম্বন এবং সূক্ষ্ম ঐতিহাসিক মানদণ্ডে তার জীবনের ঘটনাসমূহ যাচাই বাছাই ও বিচার-বিশ্লেষণ করার ক্ষেত্রে উদাসীনতা ও অমনোযোগিতা পরিহার। এখন আমরা ওহী নাযিল হবার পরবর্তী ঘটনাসমূহের প্রতি দৃকপাত করছি।

মহানবী (সা.)- এর মহান আত্মা ওহীর আলোয় আলোকিত হয়ে যায়। ওহীর ফেরেশতা যা কিছু তাঁকে শিখিয়েছিলেন তা তাঁর   দয়ে সুগ্রথিত হয়ে যায়। এ ঘটনার পর ঐ ফেরেশতাই তাঁকে সম্বোধন করে বলেছিলেন, "হে মুহাম্মদ! আপনি মহান আল্লাহর রাসূল (প্রেরিত দূত)। আর আমি জিবরাইল।"কখনো কখনো বলা হয় যে, তিনি এ আহবানটি ঐ সময় শুনতে পেয়েছিলেন যখন তিনি হিরা পর্বত থেকে নিচে নেমে এসেছিলেন। এ দু'টি ঘটনা তাঁকে তীব্র ভয়ভীতি ও অস্থিরতার মধ্যে ঠেলে দিয়েছিল। তিনি এক মহাদায়িত্বপ্রাপ্ত হয়েছিলেন বিধায় তাঁর মধ্যে এ ভীতি ও অস্থিরতার উদ্ভব হয়েছিল।

অবশ্য এ অস্থিরতা ও বিচলিত ভাব একটা মাত্রা ও পর্যায় পর্যন্ত ছিল নিতান্ত স্বাভাবিক। যা তাঁর দৃঢ় বি াস ও আস্থার মোটেও পরিপন্থী ছিল না। নিশ্চয়ই যা কিছু তাঁর কাছে পৌঁছানো হয়েছে তা

তাঁর ছিল না। কারণ আত্মা, তা যতই সক্ষম হোক না কেন, অদৃশ্য আধ্যাত্মিক জগৎসমূহের সাথে আত্মার যতই যোগসূত্র ও সম্পর্ক থাকুক না কেন, কাজের সূচনালে যে ফেরেশতার সাথে তাঁর অদ্যাবধি সাক্ষাৎ হয় নি তিনি যদি তাঁর মুখোমুখি হন তাও আবার পাহাড়ের ওপর তখন তাঁর মধ্যে এ ধরনের অস্থিরতা ও ভয়- বিহ্বলতার উদ্ভব হবেই। আর তাই পরে এ অস্থিরতা তাঁর থেকে দূর হয়ে যায়।

অস্বাভাবিক ধরনের এ অস্থিরতা ও ক্লান্তি মহানবীকে হযরত খাদীজাহ্ (আ.)- এর গৃহাভিমুখে নিয়ে যায়। তিনি যখন ঘরে প্রবেশ করলেন তখন তাঁর সহধর্মিনী অস্থিরতা ও গভীর চিন্তার ছাপ তাঁর পবিত্র বদনমণ্ডলে প্রত্যক্ষ করলেন। তাই তিনি মহানবীর কাছে এর কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। হিরা পর্বতের গুহায় যা ঘটেছিল মহানবী তা হযরত খাদীজার কাছে বর্ণনা করলেন। হযরত খাদীজাহ্ও গভীর ভক্তি ও শ্রদ্ধাসহকারে তাঁর দিকে তাকালেন এবং তাঁর জ দোয়া করে বললেন, "মহান আল্লাহ্ আপনাকে সাহায্য করুন।"

এরপর মহানবী (সা.) ক্লান্তি অনুভব করে খাদীজাহ্ (আ.)- এর দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন, دثّريني "আমাকে ঢেকে দাও।"হযরত খাদীজাহ্ তাঁকে ঢেকে দিলেন এবং তিনি কিছুক্ষণ ঘুমালেন।

হযরত খাদীজাহ্ ওয়ারাকাহ্ ইবনে নওফেলের কাছে গেলেন। এর আগের পৃষ্ঠাগুলোতে আমরা ওয়ারাকাহ্ ইবনে নওফেলের পরিচিতি তুলে ধরেছিলাম এবং বলেছিলাম, তিনি আরবের অ তম জ্ঞানী ব্যক্তিত্ব ছিলেন। ইঞ্জিল পড়ার পর বেশ দীর্ঘদিন ধরে তিনি ি ষ্টধর্ম পালন করছিলেন। তিনি হযরত খাদীজার চাচাতো ভাই ছিলেন। মহানবী (সা.)- এর স্ত্রী হযরত খাদীজাহ্ মহানবীর কাছ থেকে যা শুনেছিলেন তা বলার জ ওয়ারাকাহ্ ইবনে নওফেলের কাছে গেলেন এবং মহানবী তাঁকে যা বলেছিলেন তিনি তা ব বর্ণনা করলেন। ওয়ারাকাহ্ চাচাতো বোনের কথা শোনার পর বলেছিলেন,

إنّ ابن عمّك لصادق و إنّ هذا لبدء النّبوّة و إنّه ليأتيه النّاموس الأكبر

"তোমার চাচার ছেলে (মহানবী) সত্য বলেছেন। যা তাঁর ক্ষেত্রে ঘটেছে আসলে তা নবুওয়াতের শুভ সূচনা মাত্র। আর ঐ মহান ঐশী পদ ও দায়িত্ব তাঁর ওপর অবতীর্ণ হচ্ছে...।"

যা কিছু এখন আপনাদের কাছে বর্ণনা করা হলো তা মুতাওয়াতির (অকাট্য সূত্রে বর্ণিত) ঐতিহাসিক বিবরণসমূহেরই সার সংক্ষেপ যা সকল গ্রন্থেই লিপিবদ্ধ হয়েছে। তবে এ বর্ণনাটির ফাঁকে ফাঁকে এমন সব বিষয় দৃষ্টিগোচর হয় যা মহান নবীদের ব্যাপারে আমাদের জ্ঞান ও পরিচিতির সাথে মোটেও খাপ খায় না। এছাড়াও এতক্ষণ পর্যন্ত তাঁর জীবনী থেকে যা কিছু আমরা পাঠ করেছি তার সাথেও এ সব বিষয়ের ব্যাপক ব্যবধান ও অসংগতি পরিলক্ষিত হয়। এখন আমরা আপনাদের সামনে যা বর্ণনা করব তা আসলে অলীক কল্পকাহিনী ছাড়া আর কিছুই নয় অথবা অন্ততঃপক্ষে এর একটি মনগড়া ব্যাখ্যা দাঁড় করাতে হবে।

আমরা প্রখ্যাত মিশরীয় সাহিত্যিক ও লেখক ড. হাইকালের লেখা থেকে সবচেয়ে বেশি আশ্চর্যান্বিত হয়েছি। কারণ তিনি তাঁর গ্রন্থের ভূমিকায় যে দীর্ঘ বক্তব্য দিয়েছেন সেখানে বলেছেন যে, একদল লোক শত্রুতা বা বন্ধুত্বশত মহানবীর জীবনচরিত রচনা ও বর্ণনা করার ক্ষেত্রে অনেক মিথ্যার অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছে, কিন্তু তিনি নিজেই এ স্থলে এসে এমন সব বিষয় বর্ণনা করেছেন যা নিশ্চিতভাবে ভিত্তিহীন, অথচ মর ম আল্লামা তাবারসীর মতো কতিপয় শিয়া আলেম এ ব্যাপারে বেশ কিছু উপকারী বিষয় স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন।[২১২] এখন সেই সব মিথ্যা ও ভিত্তিহীন কল্প- কাহিনীর কিয়দংশ উল্লেখ করা হলো : (অবশ্য উদাসীন মিত্র এবং জ্ঞানী শত্রুগণ যদি এগুলো তাঁদের গ্রন্থসমূহে উল্লেখ না করতেন তাহলে আমরা এগুলো কখনই উল্লেখ করতাম না।)

১. মহানবী (সা.) যখন হযরত খাদীজার ঘরে প্রবেশ করলেন তখন তিনি চিন্তা করছিলেন যে, তিনি যা দেখেছেন সে ব্যাপারে কি তিনি ভুল করেছেন অথবা তিনি কি যাদুগ্রস্ত হয়ে গিয়েছেন! ‘আপনি সব সময় অনাথদের আদর- যত্ন করতেন এবং নিজ আত্মীয়- স্বজন ও জ্ঞাতি- গোত্রের সাথে সদাচরণ করতেন ’ - এ কথা বলার মাধ্যমে হযরত খাদীজাহ্ তাঁর অন্তর থেকে সব ধরনের সন্দেহ ও সংশয় দূর করে দিলেন। তাই মহানবী তাঁর দিকে একজন কৃতজ্ঞ ব্যক্তির   ায় তাকিয়ে একটি কম্বল এনে তাঁকে ঢেকে দিতে বললেন।[২১৩]

২. তাবারী ও অ । ঐতিহাসিক লিখেছেন, “মহানবী (সা.) যখন إنّك لرسول الله ‘নিশ্চয়ই আপনি মহান আল্লাহর রাসূল ’ - এ আহবান শুনতে পেলেন তখন তাঁর সমস্ত দেহ কাঁপতে লাগল। তিনি পাহাড় থেকে নিচে লাফিয়ে পড়ার সিদ্ধান্তও নিয়ে ফেললেন। অতঃপর ফেরেশতা তাঁর সামনে আবির্ভূত হয়ে তাঁকে এ কাজ করা থেকে বিরত রাখলেন।”[২১৪]

৩. ঐ দিবসের পরে হযরত মুহাম্মদ (সা.) পবিত্র কাবা তাওয়াফ করতে গেলেন। ওয়ারাকাহ্ ইবনে নওফেলকে দেখে তাঁর কাছে তিনি নিজের এ ঘটনাটি বর্ণনা করলেন। ওয়ারাকাহ্ তা শুনে বলেছিলেন, “মহান আল্লাহর শপথ, আপনি এ জাতির নবী। আর প্রধান ফেরেশতা যিনি হযরত মূসা (আ.)- এর কাছে আসতেন তিনিই আপনার ওপর অবতীর্ণ হয়েছেন। কতিপয় লোক আপনাকে প্রত্যাখ্যান করবে, আপনাকে অনেক কষ্ট ও যাতনা দেবে, আপনাকে আপনার শহর (মক্কা) থেকে বহিষ্কার করবে এবং আপনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে।”তখন হযরত মুহাম্মদ (সা.) অনুভব করলেন যে, ওয়ারাকাহ্ সত্য কথা বলছেন।[২১৫]

বর্ণনার অসারত্ব ও ভিত্তিহীনতা

আমরা বি াস করি যে, এ সব ঘটনা যা ইতিহাস ও তাফসীরে বর্ণিত হয়েছে তার সবই ভিত্তিহীন, বানোয়াট ও মিথ্যা ।

প্রথমত এ সব বক্তব্য মূল্যায়ন করার জ আমাদের উচিত অতীতের মহান নবী- রাসূলদের জীবনেতিহাসের দিকে দৃষ্টি দেয়া। পবিত্র কোরআনে তাঁদের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে এবং তাঁদের পবিত্র জীবনের বর্ণনাসমেত প্রচুর বিশুদ্ধ রেওয়ায়েত ও হাদীস বর্ণিত হয়েছে। আমরা তাঁদের মধ্য থেকে কোন একজনের জীবনেও এ ধরনের অমর্যাদাকর ঘটনা দেখতে পাই না। পবিত্র কোরআনে হযরত মূসা (আ.)- এর ওপর ওহী অবতীর্ণ হওয়ার সূচনা সংক্রান্ত পূর্ণ বিবরণ এসেছে এবং তাঁর জীবনেতিহাসের সকল বৈশিষ্ট্য স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। আর কখনই ঐ ধরনের ভয়- ভীতি ও অস্থিরতার কথা উল্লেখ করা হয় নি যার ফলে ওহী অবতীর্ণ হওয়ার সময় তিনি আত্মহত্যা করার সিদ্ধান্ত নেবেন। অথচ মূসা (আ.)- এর জ ভয় পাওয়ার প্রেক্ষাপট ঢের বেশি

ছিল। কারণ আঁধার রাতে নির্জন মরু- প্রান্তরে তিনি একটি বৃক্ষ থেকে আহবান শুনতে পেয়েছিলেন এবং এভাবেই তাঁর নবুওয়াত ও রিসালাতের ঘোষণা দেয়া হয়েছিল।

পবিত্র কোরআনের বক্তব্য অনুযায়ী হযরত মূসা (আ.) এ সময় তাঁর শান্তি ও স্বস্তি বজায় রেখেছিলেন। তাই মহান আল্লাহ্ যখন তাঁকে সম্বোধন করে বললেন, "হে মূসা! তোমার লাঠি নিক্ষেপ কর " , তিনি তৎক্ষণাৎ তা নিক্ষেপ করেছিলেন। মূসা (আ.)- এর ভয় ছিল লাঠিটির দিক থেকে যা একটি বিপজ্জনক প্রাণীতে পরিণত হয়েছিল। তাহলে কি বলা যায় যে, ওহী অবতরণের শুভ সূচনালে মূসা (আ.) শান্ত ও ধীরস্থির ছিলেন, অথচ যে ব্যক্তি সকল নবী ও রাসূলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ তিনি ওহীর ফেরেশতার বাণী শুনে এতটা অস্থির হয়ে পড়েছিলেন যে, পাহাড়ের ওপর থেকে নিচে লাফিয়ে আত্মহত্যা করতে চেয়েছিলেন? এ কথা কি যুক্তিসংগত?

নিঃসন্দেহে যতক্ষণ পর্যন্ত নবীর আত্মা যে কোন দিক থেকে মহান আল্লাহর ঐশী রহস্য গ্রহণ করার জ উপযুক্ত না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত প্রজ্ঞাময় আল্লাহ্ তাঁকে নবুওয়াতের মাকামে অধিষ্ঠিত করবেন না। কারণ মহান নবীদের প্রেরণের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হচ্ছে জনগণকে সুপথ প্রদর্শন। যে ব্যক্তির আত্মিক (আধ্যাত্মিক) শক্তি এতটুকু যে, ওহী শোনামাত্রই আত্মহত্যা করতে প্রস্তুত হয়ে যান তাহলে তিনি কিভাবে জনগণের মধ্যে প্রভাব বিস্তার করবেন?

দ্বিতীয়ত এটি কিভাবে সম্ভব হলো যে, মূসা (আ.) মহান আল্লাহর ঐশী আহবান শুনে নিশ্চিত হয়েছিলেন যে, তা মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে এবং তৎক্ষণাৎ তিনি মহান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করেছিলেন তিনি যেন তাঁর ভাই হারুনকে তাঁর সহকারী নিযুক্ত করেন? কারণ হারুন (আ.) তাঁর চেয়ে অধিকতর প্রাঞ্জলভাষী ও বাকপটু ; [২১৬] অথচ নবীদের নেতা দীর্ঘক্ষণ সন্দেহ ও সংশয়ের মধ্যেই থেকে যান। যখন ওয়ারাকাহ্ ইবনে নওফেল তাঁর অন্তঃকরণ থেকে সন্দেহ- সংশয়ের ধুলো দূর করে দেন তখন তা দূরীভূত হয়ে যায়।

তৃতীয়ত নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, ওয়ারাকাহ্ ি ষ্টধর্মাবলম্বী ছিলেন। যখন তিনি মহানবীর অস্থিরতা ও সন্দেহ- সংশয় দূর করতে চাইলেন তখন তিনি কেবল মূসা (আ.)- এর নবুওয়াত

প্রাপ্তির ঘটনা উল্লেখ করে বলেছিলেন, “এটি এমনই এক পদ যা হযরত মূসাকে দেয়া হয়েছিল।”[২১৭]

তাহলে এ থেকে কি প্রমাণিত হয় না যে, জালকারী ইয়া দী চক্র এ ক্ষেত্রে সক্রিয় ছিল এবং তারা গল্পের নায়ক ওয়ারাকার ধর্ম সম্পর্কে অমনোযোগী থেকে গিয়েছে এবং এমতাবস্থায় তারা এ ধরনের গল্প ও উপাখ্যান তৈরি (জাল) করেছে?

এ ছাড়াও মহানবীর যে মহত্ত্ব ও উচ্চ মর্যাদার কথা আমরা জানি এ ধরনের কার্যকলাপ তার সাথে মোটেও খাপ খায় না। ‘হায়াতু মুহাম্মদ’ গ্রন্থের রচয়িতা একটি পর্যায় পর্যন্ত এ সব গল্প ও উপাখ্যানের বানোয়াট ও মিথ্যা হবার ব্যাপারে অবগত ছিলেন। তাই তিনি কখনো কখনো পূর্বোক্ত বিষয়াদি ‘যেমন বলা হয়েছে ঠিক তেমনি’ - এ বাক্যসহকারে উদ্ধৃত করেছেন।

এ সব গল্প ও উপাখ্যানের বিপক্ষে শিয়া ধর্মীয় নেতৃবর্গ সর্বশক্তি নিয়োগ করে প্রতিরোধ করেছেন এবং সব কিছু বাতিল প্রমাণ করেছেন। উদাহরণস্বরূপ যুরারাহ্ ইমাম জাফর সাদিক (আ.)- কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, “যখন হযরত জিবরাইল (আ.) মহানবী (সা.)- এর ওপর অবতীর্ণ হয়েছিলেন তখন তিনি কেন ভয় পান নি এবং ওহীকে শয়তানের ওয়াসওয়াসাহ্ (প্ররোচনা) বলে মনে করেন নি?” তখন ইমাম সাদিক (আ.) বলেছিলেন, “মহান আল্লাহ্ তাঁর নবীর ওপর প্রশান্তি ও স্বস্তি অবতীর্ণ করেছিলেন এবং যা কিছু মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর কাছে পৌঁছত তা এমনই ছিল যেন তিনি তা প্রত্যক্ষ করছেন।”[২১৮]

শিয়া মাজহাবের প্রখ্যাত ও বড় আলেম মর ম আল্লামা তাবারসী তাঁর তাফসীর গ্রন্থে[২১৯] এ অংশে বলেছেন, “উজ্জ্বল দলিল- প্রমাণ প্রেরণ করা ব্যতীত মহান আল্লাহ্ তাঁর নবীর ওপর কোন ওহী অবতীর্ণ করতেন না। তিনি উজ্জ্বল দলিল- প্রমাণ এজ প্রেরণ করতেন যাতে করে মহানবী (সা.) নিশ্চিত হন যে, তাঁর কাছে যা কিছু ওহী হয় তা মহান আল্লাহর পক্ষ থেকেই হয়।”

দ্বাদশ অধ্যায় :প্রথম ওহী

কোন্ দিন প্রথম ওহী অবতীর্ণ হয়েছিল

মহানবী (সা.)- এর নবুওয়াত দিবস তাঁর জন্ম ও ওফাত দিবসের মতোই ঐতিহাসিকদের দৃষ্টিতে নিশ্চিত ও চূড়ান্ত নয়। শিয়া আলেমগণ প্রায় ঐকমত্য পোষণ করেন যে, মহানবী (সা.) ২৭ রজব নবুওয়াতের পদ লাভ করেন। ঐ দিন থেকেই তাঁর নবুওয়াত শুরু হয়েছিল। কিন্তু সুন্নী আলেমদের প্রসিদ্ধ অভিমত হচ্ছে এই যে, মহানবী (সা.) পবিত্র রামযান মাসে এ সুমহান মর্যাদা লাভ করেছিলেন এবং পবিত্র বরকতময় এ মাসেই তিনি নিখিল বি র ষ্টা মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে জনগণকে পথ প্রদর্শন করার জ দায়িত্বপ্রাপ্ত এবং রিসালাত ও নবুওয়াতের পদে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন।

যেহেতু শিয়ারা নিজেদেরকে মহানবীর ইতরাত ও আহলে বাইতের অনুসারী বলে বিবেচনা করে এবং হাদীসে সাকালাইন অনুসারে তাদের ইমামদের বক্তব্য ও বাণীকে সব দিক থেকে অকাট্য ও শুদ্ধ বলে বি াস করে এ কারণেই মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)- এর নবুওয়াতপ্রাপ্তির দিবস নির্ধারণ করার ব্যাপারে ঐ অভিমতের অনুসারী- যা মহানবী (সা.)- এর আহলে বাইত থেকে নির্ভুলভাবে বর্ণিত হয়েছে। তাঁর সন্তানগণ (আহলে বাইত) বলেছেন, "আমাদের বংশের প্রধান ব্যক্তিটি (মহানবী) ২৭ রজব নবুওয়াতপ্রাপ্ত হয়েছিলেন।" এ সব পূর্ব প্রস্তুতিমূলক পদক্ষেপ ও ভূমিকার ওপর ভিত্তি করে উপরিউক্ত বক্তব্য ও অভিমতের সত্যতা ও নির্ভুল হওয়ার ক্ষেত্রে তাদের বি মাত্র সন্দেহ ও সংশয় পোষণ করা অনুচিত।

যে বিষয়টি (মহানবীর নবুওয়াতপ্রাপ্তির দিবস নির্ধারণ করার ব্যাপারে প্রচলিত) অপর একটি অভিমতের দলিল হিসাবে বিবেচিত তা হচ্ছে পবিত্র কোরআনের ঐ সকল আয়াত যেগুলোতে উল্লিখিত হয়েছে যে, এ গ্রন্থ (পবিত্র কোরআন) পবিত্র রামযান মাসে অবতীর্ণ হয়েছিল। যেহেতু নবুওয়াত দিবস ওহীর সূচনা এবং পবিত্র কোরআন অবতীর্ণ হওয়ার দিবস ছিল অতএব, অবশ্যই বলা উচিত যে, নবুওয়াত দিবস যে মাসে পবিত্র কোরআন অবতীর্ণ হয়েছিল সে মাসেই হতে হবে। আর ঐ মাসটি হচ্ছে পবিত্র রামযান মাস। এখন যে সব আয়াতে পবিত্র রামযান মাসে

পবিত্র কোরআন অবতীর্ণ হওয়ার বিষয়টি স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে সেগুলোর অনুবাদসহ নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

(شهر رمضان الّذي أنزل فيه القرآن)

রামযান মাসেই পবিত্র কোরআন অবতীর্ণ হয়েছিল। (সূরা বাকারাহ্ : ১৮৫)

(حم و الكتاب المبين إنّا أنزلناه في ليلة مباركة)

হা মীম স্পষ্ট বর্ণনাকারী গ্রন্থের (পবিত্র কোরআন) শপথ, নিশ্চয়ই আমরা এ গ্রন্থকে একটি বরকতময় রাত্রিতে অবতীর্ণ করেছি। (সূরা দুখান : ২ ও ৩)

(إنّا أنزلناه في ليلة القدر)

আর উক্ত বরকতময় রজনী হচ্ছে ঐ শবে কদর (মহিমাময় রাত্রি) যা সূরা কদরে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এরশাদ হচ্ছে : "আমরা পবিত্র কোরআনকে কদরের রাতে অবতীর্ণ করেছি।"(সূরা কদর : ১)

শিয়া আলেমদের জবাব

শিয়া মুহাদ্দিস ও মুফাসসিরগণ বিভিন্ন উপায়ে উপরিউক্ত যুক্তি ও দলিল- প্রমাণ খণ্ডন করেছেন। আমরা তন্মধ্যে কেবল কয়েকটি এখানে উল্লেখ করব :

প্রথম উত্তর : উপরিউক্ত আয়াতসমূহ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, পবিত্র কোরআন রমযান মাসের একটি বরকতময় রাতে অবতীর্ণ হয়েছিল। আর উক্ত রজনী পবিত্র কোরআনে 'শবে কদর ' অর্থাৎ ভাগ্য রজনী নামে পরিচিত হয়েছে। আর এ সব আয়াত থেকে প্রতীয়মান হয় না যে, ঐ রাতেই পবিত্র কোরআন মহানবী (সা.)- এর পবিত্র দয়ের ওপর অবতীর্ণ হয়েছিল, বরং পবিত্র কোরআনের বিভিন্ন ধরনের নুযূল থাকার সম্ভাবনাই বেশি। এ সব নুযূলের অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে মহানবীর ওপর পবিত্র কোরআনের ধারাবাহিক ও পর্যায়ক্রমিক নুযূল। আরেক ধরনের নুযূল হচ্ছে একত্রে একবারে সম্পূর্ণ কোরআনের নুযূল। লওহে মাহফূয (সংরক্ষিত ফলক) থেকে বাইতুল মামূরে সম্পূর্ণ কোরআন একত্রে একবারে অবতীর্ণ (নাযিল) হয়েছিল।[২২০] সুতরাং ২৭ রজব যদি মহানবী (সা.)- এর ওপর সূরা আলাকের কয়েকটি আয়াত এবং পবিত্র রমযান মাসে যদি (পবিত্র

কোরআনের ভাষায়) লওহে মাহফূয নামক একটি স্থান থেকে অ   এক স্থান যা রেওয়ায়েতসমূহে বাইতুল মামূর নামে অভিহিত (হয়েছে) সেখানে সম্পূর্ণ কোরআন একত্রে একবারে অবতীর্ণ হয়, তাহলে কি এতে কোন অসুবিধা ও আপত্তি থাকতে পারে?

এ বক্তব্য ও অভিমতের পক্ষে প্রমাণ হচ্ছে সূরা দুখানের ৩ নং আয়াতটি যাতে এরশাদ হচ্ছে: আমরা পবিত্র কিতাবটি (কোরআন) একটি বরকতময় রজনীতে অবতীর্ণ করেছি। [যে সর্বনামটি 'কিতাব '   (গ্রন্থ)- এর দিকে প্রত্যাগমন করে সেই সর্বনামটি প্রমাণস্বরূপ উপস্থাপন করলে] এ আয়াতটির স্পষ্ট প্রকাশিত অর্থ হচ্ছে এই যে, সম্পূর্ণ কিতাবটি পবিত্র রমযানের একটি বরকতময় রজনীতে অবতীর্ণ হয়েছে। অবশ্যই এ নুযূলটি ঐ নুযূল থেকে ভিন্ন ও স্বতন্ত্র যা মহানবীর নবুওয়াতের মাকামে অভিষেকের দিবসে বাস্তবায়িত হয়েছিল। কারণ নবুওয়াতের মাকামে অভিষেক দিবসে গুটিকতক আয়াতই (সূরা আলাকের প্রথম ৫ আয়াত) অবতীর্ণ হয়েছিল।

সার সংক্ষেপ

যে সব আয়াত থেকে প্রতীয়মান হয় যে, পবিত্র কোরআন রামযান মাসের কদরের পুণ্যময় রাতে অবতীর্ণ হয়েছিল সেগুলো থেকে প্রমাণিত হয় না যে, যে দিবসে মহানবী (সা.) নবুওয়াতের পদে অভিষিক্ত হয়েছিলেন এবং সর্বপ্রথম কয়েকটি আয়াতও অবতীর্ণ হয়েছিল সে দিবসটি ছিল পবিত্র রামযান মাসে। কারণ উপরিউক্ত আয়াতসমূহ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, সম্পূর্ণ ঐশী গ্রন্থটি ঐ মাসে (রামযান মাসে) অবতীর্ণ হয়েছিল, অথচ মহানবীর নবুওয়াতের অভিষেক দিবসে কেবল গুটিকতক আয়াতই অবতীর্ণ হয়েছিল। এমতাবস্থায় পবিত্র কোরআনের সম্পূর্ণ অবতীর্ণ হওয়াটাই ঐ মাসে (রামযান মাসে) লওহে মাহফূয থেকে বাইতুল মামূরে সমগ্র পবিত্র কোরআনের অবতীর্ণ হওয়াকেই সম্ভবত বুঝিয়ে থাকবে। শিয়া ও সুন্নী আলেমগণ এতদপ্রসে   বেশ কিছু হাদীসও বর্ণনা করেছেন। বিশেষ করে আল আযহার বি বিদ্যালয়ের অধ্যাপক মুহাম্মদ আবদুল আযীম আয- যারকানী 'মানাহিলুল ইরফান ফী উলূমুল কোরআন ' নামক গ্রন্থে ঐ সব রেওয়ায়েত বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন।[২২১]

দ্বিতীয় উত্তর

সবচেয়ে শক্তিশালী ও দৃঢ় উত্তর যা এখন পর্যন্ত আলেমদের পক্ষ থেকে দেয়া হয়েছে তা হচ্ছে এই দ্বিতীয় উত্তর। আল্লামা তাবাতাবাঈ তাঁর মূল্যবান তাফসীর গ্রন্থ 'আল মীযান ' - এ বিষয়টি ব্যাখ্যা করার জ অনেক পরিশ্রম করেছেন।[২২২] এ উত্তরটির সার সংক্ষেপ নিচে উল্লেখ করা হলো :

' আমরা এ গ্রন্থকে রামযান মাসে অবতীর্ণ করেছিলাম ' - পবিত্র কোরআনের এ আয়াতটির প্রকৃত অর্থ কি? এ আয়াতটির প্রকৃত ও যথার্থ অর্থ হচ্ছে সম্পূর্ণ কোরআনের প্রকৃত স্বরূপ ও হাকীকত রামযান মাসে মহানবী (সা.)- এর পবিত্র অন্তঃকরণের ওপর অবতীর্ণ হয়েছিল। কারণ পর্যায়ক্রমিক (ধারাবাহিক) অস্তিত্ব ছাড়াও পবিত্র কোরআনের এমন এক প্রকৃত বাস্তব স্বরূপ আছে যার সাথে মহান আল্লাহ্ তাঁর প্রিয় রাসূলকে রামযান মাসের কোন একটি নির্দিষ্ট রজনীতে পরিচিত করিয়ে দিয়েছিলেন।

যেহেতু মহানবী সম্পূর্ণ পবিত্র কোরআন সম্পর্কে অবগত ছিলেন তাই যতক্ষণ পর্যন্ত পবিত্র কোরআনের ধারাবাহিক নুযূলের বিধান বাস্তবে জারী করা না হয়েছে ততক্ষণ পর্যন্ত তাঁর প্রতি মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে পবিত্র কোরআনের ব্যাপারে ত্বরা না করার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল।[২২৩]

এ উত্তরটির সার সংক্ষেপ

পবিত্র কোরাআনের যেমন একটি সার্বিক তাত্ত্বিক ও প্রকৃত বাস্তব অস্তিত্ব আছে যা একযোগে একত্রে (একবারেই) পবিত্র রামযান মাসে অবতীর্ণ হয়েছিল ঠিক তেমনি এ গ্রন্থের আরেকটি অস্তিত্ব আছে যা পর্যায়ক্রমিক (ধারাবাহিক)- যার সূচনা মহানবী (সা.)- এর নবুওয়াতে অভিষেক দিবসে কয়েকটি আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার মাধ্যমেই বাস্তবায়িত হয়েছে এবং মহানবীর জীবন সায়াহ্ন পর্যন্ত বলবৎ ছিল (অর্থাৎ পবিত্র কোরআনের ধারাবাহিক অবতরণ মহানবীর নবুওয়াতে অভিষেক দিবসে শুরু হয়ে তাঁর ওফাত পর্যন্ত বলবৎ ছিল।)

তৃতীয় উত্তর

পবিত্র কোরআন অবতীর্ণ হওয়ার সাথে মহানবী (সা.)- এর নবুওয়াতের দায়িত্বে অভিষিক্ত হওয়ার বিষয়টি যুগপৎ ছিল না।

ওহীর শ্রেণীবিভাগ বর্ণনা করার সময় সার সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে যে, ওহীরও বেশ কিছু পর্যায় আছে। ওহীর প্রথম পর্যায় : সত্য স্বপ্নদর্শন (এ পর্যায়ে নবী কেবল সত্য স্বপ্ন দর্শন করেন।) ওহীর দ্বিতীয় পর্যায় : নবী কর্তৃক গায়েবী ও ঐশী আহবান শুনতে পাওয়া (অর্থাৎ এ পর্যায়ে নবী অদৃশ্য ঐশী আহবান শুনতে পান), তবে এ ক্ষেত্রে তিনি কোন ফেরেশতাকে প্রত্যক্ষ করেন না; ওহীর চূড়ান্ত ও সর্বশেষ পর্যায় হচ্ছে নবী ফেরেশতার কাছ থেকে মহান আল্লাহর বাণী শোনেন যাঁকে তিনি দেখেন এবং যাঁর মাধ্যমে তিনি অ া জগতের প্রকৃত অবস্থা ও বাস্তবতাসমূহের সাথেও পরিচিত হন।

যেহেতু মানবাত্মার একেবারে প্রাথমিক পর্যায় ওহীর বিভিন্ন পর্যায় ধারণ করতে অক্ষম সেহেতু অবশ্যই ওহী ধারণ করার বিষয়টি পর্যায়ক্রমিকভাবে বাস্তবায়িত হতে হবে। সুতরাং নির্দ্বিধায় বলা উচিত মহানবীর নবুওয়াতে অভিষেক দিবসে (২৭ রজব) এবং এর পরেও আরো বেশ কিছুদিন পর্যন্ত তিনি স্বর্গীয় ঐশী আহবানই শুনতে পেতেন। তিনি শুনতে পেতেন যে, তিনি মহান আল্লাহর রাসূল। নবুওয়াত দিবসে তাঁর ওপর কোন আয়াতই অবতীর্ণ হয় নি। অতঃপর বেশ কিছুদিন পর পবিত্র রামযান মাসে পবিত্র কোরআনের ধারাবাহিক নুযূল শুরু হয়।

সুতরাং সংক্ষেপে বলা যায় যে, রজব মাসে মহানবীর নবুওয়াতে অভিষিক্ত হওয়ার বিষয়টি ঐ মাসেই পবিত্র কোরআন অবতীর্ণ হওয়ার সাথে মোটেও সংশ্লিষ্ট নয়। এ বক্তব্যের ভিত্তিতে মহানবীর যদি রজব মাসে নবুওয়াতে অভিষিক্ত এবং পবিত্র কোরআন যদি একই বছরের রমযান মাসে অবতীর্ণ হয় তাহলে কি কোন অসুবিধা আছে?

উপরিউক্ত উত্তরটি যদিও অনেক ঐতিহাসিক বর্ণনা ও বিবরণের সাথে খাপ খায় না (কারণ ঐতিহাসিকগণ স্পষ্ট বলেছেন যে, সূরা আলাকের কতিপয় আয়াত নবুওয়াতে অভিষিক্ত হওয়ার দিবসেই অবতীর্ণ হয়েছিল।) কিন্তু এতদসত্ত্বেও এমন কিছু রেওয়ায়েত আছে যেগুলোতে মহানবীর নবুওয়াতে অভিষিক্ত হওয়ার দিবসের ঘটনাটি বলতে কেবল গায়েবী অর্থাৎ অদৃশ্য (ঐশী) আহবানের কথাই উল্লিখিত হয়েছে এবং পবিত্র কোরআন অথবা কতিপয় আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার

বিষয়টি বর্ণিত হয় নি; বরং নবুওয়াত দিবসের ঘটনা ঠিক এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, ঐ দিন মহানবী একজন ফেরেশতাকে দেখতে পেয়েছিলেন যিনি তাঁকে সম্বোধন করে বলেছিলেন, يا محمّد أنّك لرسول الله "হে মুহাম্মদ! নিশ্চয়ই আপনি মহান আল্লাহর রাসূল।" আবার কিছু সংখ্যক বর্ণনায় কেবল গায়েবী আহবান ও সম্বোধনধ্বনি শোনার কথাই বর্ণিত হয়েছে এবং কোন ফেরেশতাকে দেখার বিষয় উল্লিখিত হয় নি। এ ব্যাপারে বিস্তারিত জানতে হলে বিহারুল আনওয়ার অধ্যয়ন করুন।[২২৪]

অবশ্য তৃতীয় এ উত্তরটি চতুর্থ উত্তর থেকে ভিন্ন ও স্বতন্ত্র। চতুর্থ উত্তরে বলা হয়েছে যে, মহানবীর বেসাত (নবুওয়াতে অভিষিক্ত হওয়া) রজব মাসেই হয়েছিল এবং গোপনে দাওয়াত অর্থাৎ গোপনে ইসলাম প্রচারের পর্যায় যা বেসাতের পর থেকে দীর্ঘ তিন বছর স্থায়ী হয়েছিল তা অতিবাহিত হওয়ার পরই পবিত্র কোরআনের অবতরণ (নুযূল) শুরু হয়। (অর্থাৎ বে'সাতের পর দীর্ঘ তিন বছর গোপনে ইসলাম প্রচারের পর্যায় অতিবাহিত হওয়ার পরপরই পবিত্র কোরআন অবতীর্ণ হতে থাকে।)

ত্রয়োদশ অধ্যায় : সর্বপ্রথম যে পুরুষ ও মহিলা মহানবীর প্রতি ঈমান এনেছিলেন

সমগ্র বিে   ইসলাম ধর্মের প্রসার ধীরে ধীরেই হয়েছিল। পবিত্র কোরআনের পরিভাষায় যে সব ব্যক্তি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ এবং এ ধর্মের প্রচার করার ক্ষেত্রে অগ্রগামী ছিলেন তাঁদেরকে السّابقون (অগ্রগামিগণ) বলা হয়েছে। আর ইসলামের প্রাথমিক যুগে মহানবী (সা.)- এর পবিত্র ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার ক্ষেত্রে অগ্রগামিতা শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি বলে গণ্য হতো। অতএব, বিশুদ্ধ ঐতিহাসিক দলিল- প্রমাণের ভিত্তিতে পূর্ণ নিরপেক্ষতা বজায় রেখে এ বিষয়টি (ইসলাম ধর্ম গ্রহণের ক্ষেত্রে অগ্রগামিতা) আলোচনা করা উচিত। তাহলে আমরা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার ক্ষেত্রে সবচেয়ে অগ্রগামী মহিলা ও পুরুষকে চিনতে পারব।

মহিলাদের মধ্যে হযরত খাদীজাহ্

ইসলামের ইতিহাসের অকাট্য বিষয়াদির মধ্যে অ   তম বিষয় হচ্ছে এই যে, হযরত খাদীজাহ্ (আ.) ছিলেন প্রথম নারী যিনি মহানবী (সা.)- এর প্রতি ঈমান এনেছিলেন। আর এ ব্যাপারে কোন মতপার্থক্যও নেই।[২২৫] আমরা বর্ণনা সংক্ষেপ করার জ   একটি গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক দলিল এখানে উল্লেখ করব যা ঐতিহাসিকগণ মহানবী (সা.)- এর একজন স্ত্রীর কাছ থেকে বর্ণনা করেছেন।

হযরত আয়েশা বলেন, "আমি খাদীজাকে কখনই দেখি নি বলে সব সময় আফসোস করতাম এবং তাঁর প্রতি মহানবী (সা.) সব সময় যে টান ও ভালোবাসা প্রদর্শন করতেন তাতে আমি খুব আশ্চর্যান্বিত হতাম। কারণ মহানবী তাঁকে খুব বেশি স্মরণ করতেন। যদি কখনো কোন দুম্বা জবাই করতেন তখন তিনি হযরত খাদীজার বান্ধবীদের খোঁজখবর নিয়ে তাঁদের কাছে জবাইকৃত দুম্বার মাংস প্রেরণ করতেন। একদিন মহানবী ঘর থেকে বের হওয়ার সময় খাদীজার কথা স্মরণ করে তাঁর প্রশংসা করছিলেন। অবশেষে অবস্থা এমন হলো যে, আমি আর নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারলাম না। পূর্ণ স্পর্ধা সহকারে আমি বলেই বসলাম : তিনি তো একজন বৃদ্ধা নারী বৈ আর কিছুই ছিলেন না। মহান আল্লাহ্ আপনাকে তাঁর চেয়ে উত্তম ভালো ভালো স্ত্রী দিয়েছেন! আমার এ কথা মহানবী (সা.)- এর মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করল। তাঁর মুখমণ্ডলে ক্রোধ ও অসন্তোষের চিহ্ন স্পষ্ট ফুটে উঠল। তিনি বললেন : কখনই এমন হয় নি। তাঁর চেয়ে উত্তম স্ত্রী আমি পাই নি। তিনি ঐ সময় আমার প্রতি ঈমান এনেছিলেন যখন সবাই শিরক ও কুফরে লিপ্ত ছিল। তিনি সবচেয়ে কঠিন সময় তাঁর সমুদয় ধন- সম্পদ আমার হাতে অর্পণ করেছিলেন। মহান আল্লাহ্ তাঁর মাধ্যমে আমাকে সন্তান- সন্ততি দিয়েছেন যা আমার অ   কোন স্ত্রীকে দেন নি।"

ঈমান আনয়ন করার ক্ষেত্রে বি   র সকল নারীর চেয়ে হযরত খাদীজার শ্রেষ্ঠত্ব ও অগ্রগামিতার আরেকটি দলিল হচ্ছে ওহীর শুভ সূচনা ও পবিত্র কোরআনের অবতীর্ণ হওয়ার প্রস । কারণ যখন মহানবী (সা.) হিরা গুহা থেকে নিচে নেমে আসলেন এবং বে'সাতের (নবুওয়াতের

অভিষেকের) পুরো ঘটনাটি খাদীজার কাছে সবিস্তারে বর্ণনা করলেন তখন সাথে সাথে তিনি স্পষ্টভাবে ও ই তে স্ত্রী খাদীজার ঈমানের সাথে পরিচিত হলেন। এছাড়া হযরত খাদীজাহ্ (আ.) আরবের ভবি দ্বক্তা ও জ্ঞানী ব্যক্তিদের কাছ থেকে তাঁর স্বামীর নবুওয়াতের ব্যাপারে অনেক কথা শুনেছিলেন। আর এ সব কথা ও বাণী এবং হযরত মুহাম্মদ (সা.)- এর সত্যবাদিতা ও বি স্ততার কারণেই হযরত খাদীজাহ্ তাঁর সাথে বিবাহ- বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন।

ঈমানের ক্ষেত্রে সবচেয়ে অগ্রগামী ছিলেন আলী

শিয়া ও সুন্নী নির্বিশেষে সকল ঐতিহাসিকের মধ্যে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, পুরুষদের মধ্য থেকে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)- এর প্রতি প্রথম যে ব্যক্তি ঈমান এনেছিলেন তিনি ছিলেন হযরত আলী (আ.)। আর এ প্রসিদ্ধ অভিমতের বিপক্ষে ইতিহাসে আরো কিছু বিরল অভিমতও আছে যেগুলোর বর্ণনাকারিগণ উক্ত প্রসিদ্ধ অভিমতটির বিপরীতটি বর্ণনা করেছেন। যেমন বলা হয়ে থাকে যে, প্রথম যে ব্যক্তি পুরুষদের মধ্য থেকে মহানবী (সা.)- এর প্রতি ঈমান এনেছিলেন তিনি ছিলেন মহানবী (সা.)- এর পালক পুত্র যায়েদ ইবনে হারিসা অথবা হযরত আবু বকর। তবে অগণিত দলিল এ দুই অভিমতের বিপক্ষে বিদ্যমান আছে; আমরা এ সব দলিল থেকে মাত্র কয়েকটি সংক্ষেপে নিচে উল্লেখ করছি :

১. হযরত আলী মহানবী (সা.)- এর তত্ত্বাবধানে প্রতিপালিত হয়েছিলেন

হযরত আলী বাল্যকাল থেকেই মহানবী (সা.)- এর গৃহে প্রতিপালিত হয়েছিলেন এবং মহানবীও একজন স্নেহময় পিতার মতোই তাঁর লালন- পালনের ব্যাপারে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন। সকল সীরাত রচয়িতা এ ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করে লিখেছেন :

“মহানবী (সা.)- এর নবুওয়াতে অভিষিক্ত হবার আগেই পবিত্র মক্কায় একবার এক মারাত্মক দুর্ভিক্ষ ও অনাবৃষ্টি দেখা দিয়েছিল। মহানবী (সা.)- এর চাচা আবু তালিবের পরিবার বেশ বড় হওয়ার কারণে এবং যেহেতু তাঁর আয় তাঁর সাংসারিক ব্যয় ও খরচের সাথে সামঞ্জস্যশীল ছিল না এবং ভাই আব্বাসের তুলনায় তিনি বিস্তর সম্পদ ও বিত্তের অধিকারী ছিলেন না সেহেতু এ ধরনের দুর্ভিক্ষের সময় তাঁর আর্থিক অবস্থা সংকটজনক হয়ে পড়লে মহানবী (সা.) চাচা আব্বাসের সাথে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নিলেন যে, হযরত আবু তালিবের আর্থিক সংকট ও অসচ্ছলতা কিছুটা লাঘব করার জ তাঁরা তাঁর কতিপয় সন্তানকে নিজেদের তত্ত্বাবধানে প্রতিপালন করবেন। যার ফলে তাঁরা আবু তালিবের সাংসারিক খরচ ও ব্যয় নির্বাহ করার ক্ষেত্রে সাহায্য করতে সক্ষম

হবেন। এ সিদ্ধান্তের ফলশ্রুতিতে মহানবী (সা.) আলীকে এবং আব্বাস জাফরকে নিজেদের তত্ত্বাবধানে নিয়ে আসেন।"[২২৬]

এ ধরনের পরিস্থিতিতে অবশ্যই বলতে হয় যে, যখন হযরত আলী (আ.) মহানবী (সা.)- এর গৃহে আসলেন তখন তাঁর বয়স ৮ বছরের চেয়ে কম ছিল না। কারণ হযরত আলীকে নিয়ে যাবার উদ্দেশ্য ছিল মক্কা নগরীর প্রধান হযরত আবু তালিবের সংসারে সচ্ছলতা আনয়ন। আর যে শিশুর বয়স ৮ বছরেরও কম তাকে তার পিতা- মাতা থেকে পৃথক করা খুবই কঠিন কাজ। এ ছাড়াও হযরত আবু তালিবের জীবনে এ ধরনের শিশু ততটা প্রভাব রাখবে না।

অতএব, হযরত আলী (আ.)- এর বয়সের ব্যাপারে আমাদের অবশ্যই এমনভাবে চিন্তা করা উচিত যে, তাঁকে নিয়ে যাওয়ার ফলে হযরত আবু তালিবের জীবনে লক্ষণীয় প্রভাব পড়ে। তাই এমতাবস্থায় কিভাবে বলা সম্ভব যে, যায়েদ ইবনে হারিসা ও অ ব্যক্তিবর্গ ওহীর গুপ্তভেদ ও রহস্য সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ছিলেন, অথচ তাঁরই পিতৃব্যপুত্র যিনি ছিলেন অ সকলের চেয়ে তাঁর সবচেয়ে নিকটবর্তী এবং সর্বদা তাঁরই সাথে থেকেছেন তিনি মহানবী (সা.)- এর ওপর অবতীর্ণ ঐশী রহস্যাবলী সম্পর্কে অজ্ঞ থাকবেন?!

হযরত আলীকে প্রতিপালন করার উদ্দেশ্য ছিল তাঁর প্রতি চাচা হযরত আবু তালিবের খেদমত ও অবদান একটি পর্যায় পর্যন্ত পূরণ করা। কোন ব্যক্তিকে সুপথে পরিচালিত করার চেয়ে আর কোন কাজ বা বিষয় মহানবী (সা.)- এর কাছে এত বেশি প্রিয় ও মর্যাদাসম্পন্ন ছিল না। এতদসত্ত্বেও এ কথা কিভাবে বলা সম্ভব যে, মহানবী (সা.) নিজ চাচাত ভাই যিনি ছিলেন আলোকিত মন ও দয় এবং বিবেক- বুদ্ধির অধিকারী তাঁকে এ বিরাট নেয়ামত থেকে বঞ্চিত করবেন? স্বয়ং আলী (আ.)- এর বাণী থেকেই এ কথা শোনা উত্তম :

وقد علمتم موضعي من رسول الله بالقرابة القريبة والمنزلةِ الخصيصةِ وضعني في حجره وأنا وليدٌ يضمُّني إلى صدره ويكنفني في فراشهِ ويمسُّني جسدَه ويُشِمُّني عرفَه ... ولقد كنتُ أتّبِعُه اتّباع الفصيل أثر أمّه، يرفع لي في كلّ يومٍ من أخلاقه علماً ويأمرني بالإقتداءِ به، ولقد كان يجاورُ في كلّ سنةٍ بِحراءَ فأراه لا يراه غيري، ولم يجمعْ بيتٌ واحدٌ يومئذٍ في الإسلامِ غيرَ رسولِ اللهِ وخديجةَ وأنا ثالثهما! أرى نورَ الوحْيِ والرِّسالةَ وأشُمُّ ريحَ النُّبُوَّةِ...

“আর তোমরা সবাই রাসূলুল্লাহ্ (সা.)- এর কাছে আমার নিকটাত্মীয়তা জনিত অবস্থান এবং বিশেষ মর্যাদার কথা জান; আমি যখন শিশু তখন তিনি আমাকে তাঁর কোলে বসাতেন। তিনি আমাকে তাঁর বুকে টেনে নিতেন এবং তাঁর বিছানায় আমাকে শোয়াতেন। তাঁর দেহ তখন আমার দেহে স্পর্শ করত; তিনি আমাকে তাঁর দেহের সুঘ্রাণ নেওয়াতেন; . . . যেমন করে উট- শাবক তার মাকে অনুসরণ করে ঠিক তেমনি আমিও তাঁকে অনুসরণ করতাম; তিনি আমাকে প্রতিদিন তাঁর (মার্জিত) চারিত্রিক গুণাবলী থেকে একটি নিদর্শন আমার সামনে উপস্থাপন করতেন এবং আমাকে তা অনুসরণ করার আদেশ দিতেন। তিনি প্রতি বছর হিরা গুহায় নির্জনে বাস করতেন; অতঃপর আমি তাঁকে দেখতাম এবং আমি ব্যতীত তাঁকে অ   কোন ব্যক্তি প্রত্যক্ষ করত না। তখন (ওহী অবতীর্ণ হওয়ার পরবর্তী দিনগুলোতে) রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ও খাদীজাহ্ (আ.)- এর পরিবার ছাড়া ইসলামে বি াসী আর কোন পরিবার ছিল না; আর আমি ছিলাম তাঁদের (পরিবারের) তৃতীয় সদস্য। আমি ওহী ও রিসালাতের আলো প্রত্যক্ষ করি এবং নবুওয়াতের সুঘ্রাণ পাই...।”[২২৭]

২. আলী ও খাদীজাহ্ মহানবীর সাথে নামায পড়তেন

ইবনে আসীর ‘উ দুল গাবা’য়, ইবনে হাজর ‘আল- ইসাবা’য় আফীফ কিন্দীর জীবন বৃত্তান্তে এবং ব ঐতিহাসিক তাঁর (আফীফ) থেকে নিম্নোক্ত ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন : “একবার জাহেলিয়াতের যুগে আমি পবিত্র মক্কা নগরীতে প্রবেশ করে হযরত আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিবের আতিথেয়তা গ্রহণ করলাম। আমরা দু’জন পবিত্র কাবার পাশে ছিলাম। হঠাৎ দেখতে পেলাম একজন পুরুষ আসল এবং পবিত্র কাবামুখী হয়ে দাঁড়াল; এরপর একটি ছেলেকে দেখলাম- যে এসে ঐ লোকটির ডানপাশে দাঁড়াল। এর পরপরই একজন মহিলাকে দেখলাম যে এসে এদের পেছনে দাঁড়াল। আমি দেখলাম যে, এ দু’ব্যক্তি (ছেলেটি ও স্ত্রীলোকটি) ঐ লোকটিকে অনুসরণ করে রুকু ও সিজদাহ্ করছে। এ অভূতপূর্ব দৃশ্য আমাকে অনুসন্ধান করতে উদ্বুদ্ধ করল। তাই আমি আব্বাসকে ঘটনা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি আমাকে বলেছিলেন : ঐ লোকটি মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ্; ঐ ছেলেটি তার পিতৃব্যপুত্র এবং ঐ স্ত্রীলোকটি যে এদের

দু’জনের পেছনে দাঁড়িয়েছিল সে মুহাম্মদের স্ত্রী। অতঃপর তিনি বললেন : আমার ভাতিজা (মুহাম্মদ) বলে : এমন একদিন আসবে যে দিন পারস্যসম্রাট খসরু ও রোমানসম্রাট কায়সারের সকল ধনভাণ্ডার তার করায়ত্তে আসবে। তবে মহান আল্লাহর শপথ! একমাত্র এ তিনজন ব্যতীত পৃথিবীর বুকে এ ধর্মের আর কোন অনুসারী নেই।”এরপর রাবী বলেন, “আমিও আশা করছিলাম যে, হায় যদি আমি তাদের চতুর্থ ব্যক্তি হতাম। ”

এমনকি যে সব ব্যক্তি হযরত আলী (আ.)- এর গুণ বর্ণনা করার ক্ষেত্রে অবহেলা প্রদর্শন করেছেন তাঁরাও উপরিউক্ত ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন। আগ্রহী পাঠকবর্গ উপরিউক্ত ঘটনা বিস্তারিত জানার জ   নিম্নোক্ত গ্রন্থগুলো অধ্যয়ন করতে পারেন।[২২৮]

৩. আমিই সিদ্দীকে আকবর

হযরত আলী (আ.)- এর বাণী ও ভাষণসমূহের মধ্যে এ বাণী এবং এতদসদৃশ অনেক বাণী রয়েছে। যেমন তিনি বলেছেন,

أنا عبدُ اللهِ وأخو رسولِ اللهِ وأنا الصّدّيقُ الأكبرُ لا يقولها بعدي إلّا كاذبٌ مفترٍ ولقد صلَّيتُ مع رسولِ اللهِ قبل النّاسِ بِسبعِ سنينَ وأنا أوّلُ مَنْ صلّى

" আমি মহান আল্লাহর বান্দা এবং রাসূলুল্লাহ্ হযরত মুহাম্মদ (সা.)- এর ভ্রাতা। আমিই সিদ্দীকে আকবার (সবচেয়ে বড় সত্যবাদী)। একমাত্র অপবাদ আরোপকারী মিথ্যাবাদী ব্যতীত আর কোন ব্যক্তি আমার পরে এ ধরনের দাবি করবে না। আমি মহানবী (সা.)- এর সাথে সকল মানুষের নামায পড়ারও ৭ বছর আগে নামায পড়েছি। যারা তাঁর সাথে নামায পড়েছেন তাঁদের মধ্যে আমিই সর্বপ্রথম।"[২২৯]

মহানবী (সা.) থেকে বিভিন্ন ধরনের বাক্য ও বাচনভি সহকারে বেশ কিছু মুতাওয়াতির হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেছেন,

أوَّلُكم وارداً عليَّ الحوضَ أوّلُكم إسلاماً عليٌّ ابن أبي طالبٍ

" তোমাদের মধ্য থেকে আমার কাছে হাউযে কাউসারে আগমনকারী সর্বপ্রথম ব্যক্তিটি হচ্ছে তোমাদের মধ্যে সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণকারী আলী ইবনে আবি তালিব। "

এ হাদীসের সনদ ও দলিল- প্রমাণ জানার জ আল গাদীর গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডের ৩২০ পৃষ্ঠা (নাজাফ সংস্করণ) অধ্যয়ন করুন।

যখন কোন ব্যক্তি পূর্ণ নিরপেক্ষতা বজায় রেখে এ সব হাদীস অধ্যয়ন করবেন তখন তাঁর কাছে ইসলাম ধর্মে হযরত আলীর অগ্রবর্তী হওয়ার বিষয়টি সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়ে যাবে। আর তখন তিনি অ দু'টি বক্তব্য ও অভিমত যা আসলেই স্বল্প সূত্রে বর্ণিত অর্থাৎ সংখ্যায় নগণ্য তা কখনই গ্রহণ করবেন না। ৬০ জনের বেশি সাহাবী ও তাবেয়ী[২৩০] 'আলী ছিলেন সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণকারী ' - এ বক্তব্য ও অভিমতের সমর্থক। এমনকি তাবারীই হচ্ছে সেই ব্যক্তি যিনি

বিষয়টিকে সন্দেহযুক্ত করেছেন এবং কেবল অ র বক্তব্য ও অভিমত উদ্ধৃত করার ওপর নির্ভর করেছেন। তিনি দ্বিতীয় খণ্ডের **২১৫** পৃষ্ঠায় বর্ণনা করেছেন, "নিজ পিতাকে ইবনে সাঈদ জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "হযরত আবু বকরই কি সর্বপ্রথম ঈমান এনেছিলেন?" তিনি (সাঈদ) বলেছিলেন, "না, তার আগে ৫০ জনেরও অধিক ব্যক্তি মহানবী (সা.)-এর প্রতি ঈমান এনেছিলেন। তবে তাঁর ইসলাম অ দের ইসলামের চেয়ে শ্রেষ্ঠ ছিল।"

ইসহাকের সাথে খলীফা মামুনের কথোপকথন

ইবনে আবদে রাব্বিহ্ ‘ইকদুল ফরীদ’[২৩১] গ্রন্থে একটি চমৎকার কাহিনী বর্ণনা করেছেন যার সারসংক্ষেপ নিম্নরূপ : খলীফা মামুন একবার একটি বিতর্ক সভার আয়োজন করেন এবং প্রসিদ্ধ আলেম ইসহাককে ঐ সভার সভাপতি নিয়োগ করেন। ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার ক্ষেত্রে অ দের ওপর হযরত আলীর অগ্রবর্তিতা প্রমাণিত হওয়ার পর ইসহাক বললেন, “যখন আলী ঈমান এনেছিলেন তখন তিনি শিশু ছিলেন, তবে তখন আবু বকর পূর্ণবয়স্ক পুরুষ ছিলেন; এ কারণেই তাঁর ঈমান আলীর ঈমানের চেয়ে শ্রেষ্ঠ ছিল। ”

মামুন সাথে সাথে তাঁর কথার উত্তর দিলেন, “মহানবী (সা.) কি আলীকে তাঁর বাল্যকালে ঈমান আনয়ন করার ব্যাপারে আহবান করেছিলেন নাকি তাঁর ঈমান মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে ইলহামের (আত্মিক- আধ্যাত্মিক প্রেরণা) মাধ্যমে হয়েছিল?” কখনই বলা যাবে না যে, তাঁর ঈমান ইলহামপ্রসূত ছিল। কারণ মহানবী (সা.)- এর ঈমানও ইলহামপ্রসূত ছিল না, বরং তা মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে হযরত জিবরাইল (আ.)- এর মাধ্যমেই হয়েছিল। আর এ ক্ষেত্রে আলীর কথা তো বাদই দিলাম। সুতরাং যে দিন মহানবী (সা.) তাঁকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণের আহবান জানালেন সে দিন কি তিনি নিজ থেকে এ কাজটি (আলীকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণের আহবান জানানো) আঞ্জাম দিয়েছিলেন নাকি মহান আল্লাহ্ তাঁকে নির্দেশ দিয়েছিলেন? আমরা কখনই ভাবতেই পারব না যে, মহানবী (সা.) আল্লাহপাকের আদেশ ব্যতীত নিজেকে এবং অ কে কষ্টের মধ্যে ফেলবেন। তাই বাধ্য হয়ে অবশ্যই বলতে হবে যে, মহানবী (সা.) মহান আল্লাহর আদেশের ভিত্তিতেই ইসলাম ধর্ম গ্রহণের আহবান জানিয়েছিলেন। তাই মহান জ্ঞানী আল্লাহ্ কি মহানবীকে নির্দেশ দিতে পারেন যে, তিনি একজন অনুপযুক্ত শিশুকে- যার ঈমান ও ঈমানশূ তার মধ্যে কোন পার্থক্যই নেই তাকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণের আহবান জানাবেন? কাজেই নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, মহাজ্ঞানী প্রজ্ঞাময় আল্লাহপাক থেকে এ ধরনের কাজ অসম্ভব।

অতএব, আমরা অবশ্যই এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করব যে, হযরত আলী (আ.)- এর ঈমান সহীহ ও দৃঢ় ছিল যা অ দের ঈমান থেকে কোন অংশেই কম ছিল না। আর অগ্রগামীরাই অগ্রগামী তারাই মহান আল্লাহর নিকটবর্তী السّابقونَ السّابقونَ أولئك المقرّبون)) - এ আয়াতটির সর্বোৎকৃষ্ট বাস্তব নমুনা হচ্ছেন স্বয়ং আলী ইবনে আবি তালিব (আ.)। ”

ওহী অবতীর্ণ বন্ধ থাকা প্রসঙ্গ

ওহীর আলোয় মহানবী (সা.)- এর আত্মা ও মন আলোকিত হয়ে গিয়েছিল; তিনি অত্যন্ত ভারী ও গুরুদায়িত্ব সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করতেন যা মহান আল্লাহ্ তাঁর ওপর অর্পণ করেছিলেন। বিশেষ করে ঐ সময় যখন মহান আল্লাহ্ তাঁকে সম্বোধন করে বলেছিলেন,

(يا أيّها المدَّثّرُ قُمْ فأنذرْ وربَّك فكبِّرْ)

"হে চাদরাবৃত, উঠুন, সতর্ক করুন, আপন পালনকর্তার মাহাত্ম্য ঘোষণা করুন" - এ স্থলে এসে ঐতিহাসিকগণ, বিশেষ করে ঐতিহাসিক তাবারী যাঁর ইতিহাসগ্রন্থ ইয়া দী ও ি ষ্টানদের কল্পকাহিনী ও উপাখ্যান দিয়ে সজ্জিত নয় তিনি انقطاع وحي অর্থাৎ 'ওহী অবতীর্ণ বন্ধ থাকা' শীর্ষক একটি বিষয়ের অবতারণা করে বলেছেন, "ওহীর ফেরেশতাকে দেখা এবং পবিত্র কোরআনের কয়েকটি আয়াত শ্রবণ করার পর মহানবী (সা.) মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে আরো বাণী অবতীর্ণ হওয়ার জ অপেক্ষা করতে থাকেন, কিন্তু না ঐ সুদর্শন ফেরেশতার কোন খবর ছিল, না আর কোন গায়েবী বার্তা তিনি শুনতে পেলেন।

রিসালাতের সূচনালে যদি প্রত্যাদেশ বন্ধ থাকার বিষয় সত্য হয়ে থাকে তাহলে তা পবিত্র কোরআনের ধারাবাহিক অবতরণ ব্যতীত অ কিছু ছিল না। নীতিগতভাবে মহান আল্লাহর ঐশী ইচ্ছা এটিই ছিল যে, বিশেষ কল্যাণের ভিত্তিতে তিনি তাঁর ওহী ধারাবাহিক ও পর্যায়ক্রমিকভাবে অবতীর্ণ করবেন। আর যেহেতু ওহীর সূচনালে মহান আল্লাহর ওহী পরপর অর্থাৎ অবিরামভাবে অবতীর্ণ হয় নি তাই এ বিষয়টি অর্থাৎ ওহী অবতরণ বিচ্ছিন্ন হওয়ার অর্থে আলোচিত হয়েছে; আর কখনই প্রকৃত অর্থে ওহী অবতীর্ণ হওয়া বিচ্ছিন্ন ও বন্ধ থাকে নি।

যেহেতু এ বিষয়টি (ওহী অবতরণ বন্ধ ও বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া) স্বার্থান্বেষী মতলববাজ লেখকদের (অসদুদ্দেশ্য চরিতার্থ করার) দলিল- প্রমাণে পরিণত হয়েছে তাই আমরা এ ব্যাপারে এমনভাবে আলোচনা করতে চাই যার ফলে স্পষ্ট হয়ে যাবে যে, ওহী অবতরণ বন্ধ ও বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার শিরোনামে যে বিষয়টি উল্লিখিত হয়েছে তা বাস্তবতাবর্জিত এবং এ ভ্রান্ত বিষয়ের সমর্থনে পবিত্র

কোরআনের যে কয়টি আয়াত ব্যবহার করা হয়েছে আসলে এ সব আয়াতের এ ধরনের প্রয়োগ ও ব্যবহারেরও কোন বাস্তবতা নেই।

বিষয়টি স্পষ্ট করার জ   যে ঘটনাটি তাবারী বর্ণনা করেছেন তা আমরা এখানে উল্লেখ করব এবং এরপর আমরা তা খণ্ডন করব। তিনি লিখেছেন : "যখন ওহীর পরম্পরা বিচ্ছিন্ন ও বন্ধ হয়ে গেল, নবুওয়াতের অভিষেকের সূচনালে মহানবী (সা.)- এর মধ্যে যে অস্থিরতা, সন্দেহ ও সংশয় দেখা দিয়েছিল তার পুনরাবৃত্তি হলো। হযরত খাদীজা ' ও তাঁর মতো অস্থির হয়ে তাঁকে বলেছিলেন : আমি অনুমান করছি, আল্লাহ্ আপনার সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করেছেন।"তিনি এ কথা শোনার পর হিরা পর্বতের দিকে চলে গেলেন। ঠিক তখনই পুনরায় তাঁর কাছে ওহী অবতীর্ণ হলো এবং তাঁকে নিম্নোক্ত এ কয়টি আয়াতের মাধ্যমে সম্বোধন করে বলা হলো :

(والضّحى واللّيل إذا سجى ما وَدَّعكَ ربُّك وما قلى و للآخرةُ خيرٌ لك من الأولى ولسوف يعطيك ربُّك فترضى، ألم يجدك يتيماً فآوى ووجدك ضالاًّ فهدى ووجدك عائلاً فأغنى فأمّ اليتيمَ فلا تقْهر وأمَّ السّائل فلا تنهر وأمّا بنعمة ربِّك فحدِّثْ)

"মধ্যাহ্নের শপথ, আর রাতের শপথ যার আঁধার (সব কিছুকে) ছেয়ে ফেলে; আপনার প্রভু আপনাকে ত্যাগ করেন নি এবং (আপনার প্রতি) শত্রুতায় লিপ্ত হন নি। নিশ্চয়ই দুনিয়া অর্থাৎ পার্থিবজগৎ থেকে আখেরাত আপনার জ   উত্তম। অতি শীঘ্রই আপনার প্রভু আপনাকে এমন সব জিনিস দেবেন যে, এর ফলে আপনি সন্তুষ্ট ও খুশী হবেন। আপনি স্মরণ করুন, যখন আপনি অনাথ ছিলেন তখন তিনি আপনাকে আশ্রয় দিয়েছিলেন। যখন আপনি অস্থির ও দিশেহারা ছিলেন তখন আপনাকে তিনি পথ- প্রদর্শন করেছেন, যখন আপনি দরিদ্র ও রিক্তহস্ত ছিলেন তখন তিনি আপনাকে অভাবশূ , বিত্তশালী করেছেন। তাই কখনই কোন অনাথকে কষ্ট দিবেন না এবং ভিক্ষুকের প্রতি রাগ করবেন না। আর আপনার প্রভুর নেয়ামতের ব্যাপারে আলোচনা করুন।"(সূরা দুহা : ১- ১১)

এ সব আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার কারণে মহানবী (সা.)- এর অন্তরে অস্বাভাবিক ধরনের আনন্দ ও প্রশান্তির উদ্ভব হয় এবং তখন তিনি বুঝতে পারলেন যে, যা কিছু তাঁর ব্যাপারে বলা হয়েছে তা সবই ভিত্তিহীন ও মিথ্যা।

এটি 'ইতিহাস ' হতে পারে না, বরং মিথ্যা কল্প- কাহিনী

হযরত খাদীজাহ্ (আ.)- এর জীবনেতিহাস ইতিহাসের পাতায় পাতায় সুগ্রথিত হয়ে আছে। খাদীজার দৃষ্টিপটে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)- এর উত্তম চারিত্রিক গুণাবলী এবং সৎ কর্মসমূহ ছিল প্রাণবন্ত ও জীবন্ত। তিনি মহান আল্লাহকে ায়পরায়ণ বলে বি াস করতেন। তাই তাঁর মধ্যে কিভাবে মহান আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের ব্যাপারে এ ধরনের অদ্ভুত ও ভুল ধারণার সৃষ্টি হতে পারে?

এমন ব্যক্তিকেই নবুওয়াতে অভিষিক্ত করা হয় যিনি প্রশংসিত ও উচ্চা র চারিত্রিক গুণাবলীর অধিকারী। আর স্বয়ং মহানবী (সা.) যতক্ষণ পর্যন্ত এ ধরনর উন্নত চারিত্রিক গুণাবলী এবং বিশেষ যোগ্যতার অধিকারী না হবেন ততক্ষণ পর্যন্ত তাঁকে এ পদও দেয়া হবে না। এ সব চারিত্রিক গুণের শীর্ষে রয়েছে ইসমাত (পবিত্রতা), আত্মিক প্রশান্তি ও স্থিরতা এবং মহান ষ্টার ওপর নির্ভরশীলতা; আর এ ধরনের গুণাবলীর অধিকারী হওয়ার কারণে তাঁর মনে এ ধরনের অলীক ধ্যান- ধারণার উদ্ভব হওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব ও অবাস্তব। পণ্ডিতগণ বলেছেন, মহান নবীদের পূর্ণতাপ্রাপ্তির প্রক্রিয়া তাঁদের শৈশব ও বাল্যকাল থেকেই শুরু হয় এবং তাঁদের দৃষ্টির সামনে থেকে পর্দা ও অন্তরায়সমূহ একের পর এক বিদূরিত হতে থাকে এবং তাঁদের জ্ঞানগত যোগ্যতা পূর্ণতার পর্যায়ে উপনীত হয়। এর ফলে তাঁরা যা শোনেন এবং দেখেন সে সম্পর্কে সামা তম সন্দেহ তাঁদের মধ্যে দেখা দেয় না। যে ব্যক্তি এ সব পর্যায় আয়ত্ত করতে সক্ষম হবেন, মানুষের বিভিন্ন কথাবার্তা ও মন্তব্য তাঁর অন্তরে বি মাত্র সন্দেহ ও সংশয়ের সৃষ্টি করতে পারবে না।

সূরা আদ- দুহার আয়াতসমূহ, বিশেষ করে ما ودّعك ربّك وما قلى)) অর্থাৎ 'আপনার প্রভু আপনাকে ত্যাগ করেন নি এবং (আপনার বিরুদ্ধে) শত্রুতায় লিপ্ত হন নি ' - এ আয়াতটি থেকে এতটুকু প্রতীয়মান হয় যে, কোন এক ব্যক্তি মহানবী (সা.)- কে এ কথা বলেছিল। তবে কে

বলেছিল এবং তার এ কথা কতখানি মহানবী (সা.)- এর মন- মানসিকতার ওপর (নেতিবাচক) প্রভাব বিস্তার করেছিল এ ব্যাপারে কোন কিছুই উক্ত আয়াতে বর্ণিত হয় নি।

কোন কোন মুফাসসির বলেছেন, "কয়েকজন মুশরিক মহানবীকে এ কথা বলেছিল। আর এ সম্ভাবনার ভিত্তিতেই সূরা আদ- দুহার সকল আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার সূচনাল র সাথে সংশ্লিষ্ট হতে পারে না। কারণ নবুওয়াতের অভিষেকের সূচনাল একমাত্র খাদীজাহ্ ও আলী ব্যতীত আর কোন ব্যক্তিই ওহী সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ছিল না- যার ফলে তার পক্ষে এ ব্যাপারে বিরূপ মন্তব্য ও কটুক্তি করা সম্ভব হবে। এমনকি পুরো তিন বছর মহানবী (সা.)- এর রিসালাত ও নবুওয়াত অধিকাংশ মুশরিক থেকে গোপন রাখা হয়েছিল। আমরা এ ব্যাপারে পরে বিস্তারিত আলোচনা রাখব। এ সময় তিনি সাধারণ মানুষের কাছে ইসলাম ধর্ম প্রচারের আদেশ পান নি। অতঃপর فاصدع بما تؤمر)) 'আপনি যে ব্যাপারে আদিষ্ট হচ্ছেন তা প্রকাশ্যে প্রচার করুন ' - এ আয়াত অবতীর্ণ হলে তিনি প্রকাশ্যে ইসলাম ধর্ম গ্রহণের জ জনগণকে আহবান জানিয়েছিলেন অর্থাৎ প্রকাশ্যে মহানবীর দাওয়াতী কর্মকাণ্ড শুরু হয় উপরিউক্ত আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার পরপরই।

ওহী অবতরণ বন্ধ ও বিচ্ছিন্ন হওয়ার ব্যাপারে সীরাত রচয়িতাদের মধ্যে মতপার্থক্য

পবিত্র কোরআনে কোথাও ওহী অবতরণ বন্ধ ও বিচ্ছিন্ন থাকার কথা বর্ণিত হয় নি। এমনকি এতৎসংক্রান্ত সামা তম ঈ িতও দেয়া হয় নি। এ বিষয়টি কেবল সীরাত ও তাফসীরের গ্রন্থসমূহেই দেখা যায়। আর ওহী অবতরণ বন্ধ ও বিচ্ছিন্ন হওয়ার কারণ ও সময়কালের ব্যাপারে সীরাত রচয়িতা ও মুফাসসিরদের এতটা মতপার্থক্য রয়েছে যে, এর ফলে তাঁদের কারো বক্তব্য ও অভিমতের ওপর মোটেও নির্ভর করা যায় না। আমরা নিচে তাঁদের অভিমত ও বক্তব্যসমূহ উত্থাপন করছি :

১. ইয়া দীরা মহানবী (সা.)- কে আত্মা, গুহাবাসীদের অর্থাৎ আসহাবে কাহাফের কাহিনী এবং যুলকারনাইন- এ তিনটি বিষয় সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিল। মহানবী (সা.) 'ইনশাআল্লাহ্ অর্থাৎ আল্লাহপাক যদি চান ' না বলে বলেছিলেন, 'আগামীকাল আমি তোমাদের প্রশ্নগুলোর উত্তর

দেব।' এ কারণে মহান আল্লাহর ওহী অবতীর্ণ হওয়া বন্ধ হয়ে গেল। মুশরিকরা ওহী অবতীর্ণ হতে বিলম্ব হওয়ায় খুব আনন্দিত হয়ে বলতে লাগল, "মহান আল্লাহ্ মুহাম্মদকে ত্যাগ করেছেন।"মুশরিকদের এ অমূলক চিন্তা খণ্ডন করার জ ই সূরা দুহা অবতীর্ণ হয়।"[২৩২]

সুতরাং উপরিউক্ত বর্ণনার ভিত্তিতে সূরা আদ- দুহা মহানবী (সা.)- এর নবুওয়াত ও রিসালাতে অভিষেকের সূচনাল র সাথে সংশ্লিষ্ট তা বলা যায় না। কারণ ইয়া দী আলেমগণ মহানবী (সা.)- এর কাছে উপরিউক্ত বিষয় তিনটি সম্পর্কে নবুওয়াতে অভিষেকের আনুমানিক ৭ম বর্ষে প্রশ্ন করেছিল যখন মহানবী (সা.)- এর রিসালাতের বাস্তবতা ইয়া দী আলেমদের কাছে উত্থাপন করে তা আসলে সত্য কিনা তা জানার জ কুরাইশদের পক্ষ থেকে একটি প্রতিনিধিদল মদীনা সফরে গিয়েছিল। ঐ সময় ইয়া দী পণ্ডিতগণ উক্ত প্রতিনিধি দলটিকে উপরিউক্ত তিনটি বিষয়ে মহানবী (সা.)- কে প্রশ্ন করার পরামর্শ দিয়েছিল।[২৩৩]

২. মহানবী (সা.)- এর খাটের নিচে একটি কুকুরের বাচ্চা মারা গেলে কেউ তা প্রত্যক্ষ করে নি। মহানবী (সা.) ঘর থেকে বাইরে গেলে খাওলা ঘর ঝাড়ু দেয়ার সময় তা বাইরে ফেলে দেয়। ঐ সময় ওহীর ফেরেশতা সূরা আদ দুহাসহ আগমন করেন। মহানবী (সা.)- কে ফেরেশতা বলেছিলেন, إنّا لا ندخل بيتاً فيه كلبٌ "যে গৃহে কুকুর আছে সেই গৃহে আমরা (ফেরেশতাগণ) প্রবেশ করি না।"[২৩৪]

৩. মুসলমানগণ ওহী অবতীর্ণ হওয়ার ক্ষেত্রে বিলম্ব হওয়ার কারণ সম্পর্কে প্রশ্ন করলে মহানবী (সা.) বলেছিলেন, "যখন তোমরা তোমাদের নখ ও গোঁফ ছোট করো না তখন কিভাবে ওহী অবতীর্ণ হবে?"[২৩৫]

৪. হযরত উসমান একবার কিছু আ ুর অথবা রসালো খেজুর হাদিয়াস্বরূপ মহানবী (সা.)- এর কাছে পাঠিয়েছিলেন। ভিক্ষুক এলে মহানবী তা তাকে দিয়ে দেন। হযরত উসমান ঐ আ ুর বা খেজুর ঐ ভিক্ষুকের কাছ থেকে কিনে তা পুনরায় মহানবীর কাছে প্রেরণ করেন। আবারও ঐ ভিক্ষুক মহানবী (সা.)- এর কাছে যায় এবং এ কাজ তিনবার সংঘটিত হয়। অবশেষে মহানবী (সা.) দয়ার্দ্র কে তাকে জিজ্ঞাসা করেন, "তুমি ভিক্ষুক না ব্যবসায়ী।"ঐ ভিক্ষুকটি মহানবী (সা.)-

এর কথায় খুব মর্মাহত হয় এবং এ কারণেই মহানবীর ওপর ওহী অবতীর্ণ হওয়ার ক্ষেত্রে বিলম্ব ঘটে।[২৩৬]

৫. মহানবী (সা.)- এর কোন এক স্ত্রীর অথবা আত্মীয়ের কুকুরশাবক মহানবী (সা.)- এর কাছে জিবরাইল (আ.)- এর অবতীর্ণ হওয়ার ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল।[২৩৭]

৬. মহানবী (সা.) ওহী অবতরণে বিলম্ব হওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করলে জিবরাইল (আ.) বলেছিলেন, "এ ব্যাপারে আমার কোন ইখতিয়ার নেই। "

এরপরও এ ক্ষেত্রে আরো কিছু অভিমত ও বক্তব্য আছে। আগ্রহী পাঠকবর্গ বিভিন্ন তাফসীর অধ্যয়ন করে দেখতে পারেন।[২৩৮]

কিন্তু ইত্যবসরে তাবারী এমন একটি দিক ও কারণ উদ্ধৃত করেছেন এতৎসংক্রান্ত বিভিন্ন কারণ ও দিকের মধ্যে কেবল এ দিকটির প্রতিই অর্বাচীন লেখকগণ যাঁরা কোন বিবেচনা ও যাচাই না করে অভিমত ব্যক্ত করেন তাঁরা আকৃষ্ট হয়েছেন; আর তাঁরা একে মহানবী (সা.)- এর অন্তরে সন্দেহ ও সংশয়ের উদ্রেক হওয়ার নিদর্শন বলে গণ্য করেছেন। সেই দিক বা কারণ হচ্ছে, হিরা পর্বতের গুহায় ওহী অবতরণ ও নবুওয়াতে অভিষেকের ঘটনার পর মহানবী (সা.)- এর ওপর ওহী অবতরণ হওয়া বন্ধ হয়ে যায়। হযরত খাদীজাহ্ (আ.) তখন মহানবীকে বলেছিলেন, "আমি ধারণা করছি, মহান আল্লাহ্ আপনার ওপর অসন্তুষ্ট ও ক্রুদ্ধ হয়েছেন এবং আপনার প্রতি শত্রুভাবাপন্ন হয়েছেন।"আর ঠিক তখনই ওহী অবতীর্ণ হলো :

(ما ودّعك ربُّك وما قلى)

" আপনার প্রভু আপনাকে ত্যাগ করেন নি এবং আপনার প্রতি শত্রুভাবাপন্নও হন নি।"[২৩৯]

এ সব অর্বাচীন লেখকের দুরভিসন্ধি পোষণ অথবা যাচাই বাছাই ও গবেষণা না করার প্রমাণ হচ্ছে এই যে, এ ব্যাপারে এত সব বর্ণনা, বক্তব্য ও অভিমত থাকতে তাঁরা কেবল এ বর্ণনাটি গ্রহণ করে তা এমন এক ব্যক্তিত্বের ব্যাপারে তাঁদের ফায়সালা ও মতামতের ভিত্তি হিসাবে দাঁড় করিয়েছেন যাঁর সমগ্র জীবনে সন্দেহ ও সংশয়ের কোন নিদর্শনই খুঁজে পাওয়া যাবে না। নিম্নোক্ত

দিকগুলো বিবেচনা করলে উপরিউক্ত বর্ণনার ভিত্তিহীনতা ও মিথ্যা হওয়ার বিষয়টি সুস্পষ্ট হয়ে যাবে। দিকগুলো হলো :

১. হযরত খাদীজাহ্ (আ.) এমন এক মহীয়সী নারী ছিলেন যিনি সর্বদা মহানবীকে ভালোবাসতেন এবং জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি স্বামীর পথে আত্মত্যাগ করে গেছেন। তিনি তাঁর সমুদয় ধন- সম্পদ মহানবী (সা.)- এর সুমহান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করার জ ওয়াকফ্ করে দিয়েছিলেন। মহানবী (সা.)- এর নবুওয়াতে অভিষেকের বর্ষে তাঁদের বৈবাহিক জীবনের ১৫টি বছর অতিবাহিত হয়েছিল। এ দীর্ঘ সময় হযরত খাদীজাহ্ (আ.) মহানবী (সা.) থেকে কেবল পবিত্রতা ব্যতীত আর কিছুই প্রত্যক্ষ করেন নি। তাই মহানবী (সা.)- এর প্রতি অনুরক্ত ও নিবেদিতা এমন নারীর পক্ষে এ ধরনের কর্কশ ও নিষ্ঠুর কথা বলা কখনই সম্ভব নয়।

২. (ما ودَّعك ربُّك وما قلى) (আপনার প্রভু আপনাকে ত্যাগ করেন নি এবং আপনার বিরুদ্ধে শত্রুতায় লিপ্ত হন নি)- এ আয়াত থেকে প্রতীয়মান হয় না যে, হযরত খাদীজাহ্ এ ধরনের (জঘ) উক্তি করে থাকতে পারেন, বরং এ আয়াতটি থেকে এতটুকু প্রমাণিত হয় যে, মহানবী (সা.)- এর ব্যাপারে কোন ব্যক্তি এ ধরনের কথা বা মন্তব্য করেছিল। তবে এ উক্তি কে করেছিল এবং কেনই বা সে এ ধরনের উক্তি করেছিল তা স্পষ্ট নয়।

৩. এ ঘটনা বা কাহিনীর বর্ণনাকারী যিনি একদিন খাদীজাহ্ (আ.)- কে মহানবী (সা.)- এর ভরসা ও সান্ত্বনা দানকারী হিসাবে এভাবে পরিচিত করিয়ে দেন যে, তিনি এমনকি মহানবী (সা.)- কে আত্মহত্যা করা থেকে বিরত রেখেছিলেন, অথচ আরেকদিন সে একই ব্যক্তি আবার হযরত খাদীজার চেহারা এমনভাবে তুলে ধরেছেন যে, তিনি (নাউযুবিল্লাহ্) নাকি মহানবীকে বলেছিলেন, “মহান আল্লাহ্ আপনার শত্রুতায় লিপ্ত হয়েছেন।” তাহলে আমরা কি এ কথা বলতে পারি না যে, মিথ্যাবাদীর স্মৃতিশক্তি নেই? (যে ব্যক্তি মিথ্যাবাদী সে আগে কি কথা বলেছে পরে তা স্মরণ রাখতে পারে না। তাই তার পূর্বের বক্তব্যের সাথে পরবর্তী উক্তি ও বক্তব্যের পার্থক্য স্পষ্ট হয়।)

৪. হিরা পর্বতের গুহার ঘটনা অর্থাৎ নবুওয়াতের অভিষেক এবং সূরা আলাকের কয়েকটি আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর সূরা দুহা অবতীর্ণ হওয়া পর্যন্ত যদি ওহী অবতরণ বন্ধ থাকে এমতাবস্থায় সূরা দুহাকেই কোরআন অবতরণের ধারাবাহিকতার দৃষ্টিকোণ থেকে পবিত্র কোরআনের ২য় সূরা বলে গণ্য করতে হবে, অথচ পবিত্র কোরআন অবতীর্ণ হওয়ার ধারাবাহিকতা অনুসারে এ সূরাটি পবিত্র কোরআনের দশম সূরা।[২৪০]

সূরা দুহা অবতীর্ণ হওয়া পর্যন্ত যে সব সূরা অবতীর্ণ হয়েছিল সেগুলো নিচে বর্ণিত হলো :

১. সূরা আল আলাক, ২. সূরা আল কলম, ৩. সূরা আল মুয্যাম্মিল, ৪. সূরা আল মুদ্দাসসির, ৫. সূরা লাহাব, ৬. সূরা আত তাকভীর, ৭. সূরা আল ইনশিরাহ্, ৮. সূরা আল আসর, ৯. সূরা আল ফাজর এবং ১০. সূরা আদ দুহা।

ইতোমধ্যে ইয়াকূবী তাঁর ইতিহাস গ্রন্থে সূরা দুহা অবতীর্ণ হওয়ার তারিখের দৃষ্টিতে পবিত্র কোরআনের ৩য় সূরা হিসাবে গণ্য করেছেন। আর এ অভিমতটিও উপরিউক্ত বর্ণনার সাথে সামঞ্জস্যশীল নয়।

ওহী অবতরণ কতদিন বন্ধ ছিল এতৎসংক্রান্ত মতপার্থক্য

ওহী অবতরণ বন্ধ থাকার সময়কাল অত্যন্ত অস্পষ্ট এবং বিভিন্নভাবে তা বর্ণিত হয়েছে। আর তাফসীরের গ্রন্থসমূহে ওহী অবতরণ কতদিন বন্ধ ছিল সে ব্যাপারে নিম্নোক্ত বক্তব্যসমূহ পরিলক্ষিত হয়। যেমন ৪ দিন, ১২ দিন, ১৫ দিন, ১৯ দিন, ২৫ দিন ও ৪০ দিন।

তবে পবিত্র কোরআনের ধারাবাহিক অবতরণের অন্তর্নিহিত দর্শন নিয়ে যদি আমরা পর্যালোচনা করি তাহলে দেখতে পাব যে, ওহী অবতরণ বন্ধ থাকার বিষয়টি কোন বিচ্ছিন্ন ও ব্যতিক্রমধর্মী ঘটনা ছিল না। কারণ পবিত্র কোরআন প্রথম দিন থেকেই ঘোষণা করেছে যে, মহান আল্লাহ্ এ গ্রন্থটি (কোরআন) ধীরে ধীরে (পর্যায়ক্রমে) নাযিল করার ইচ্ছা করেছেন। পবিত্র কোরআনে এতদপ্রসে এরশাদ হয়েছে :

(وقرآناً فرقْناه لتقرأه على النّاسِ على مكْثٍ)

“আর এ কোরআনকে ধাপে ধাপে নাযিল করেছি যাতে করে আপনি তা ধীরে ধীরে বিরতিসহকারে জনগণের কাছে পাঠ করেন।”(সূরা আল ইসরা : ১০৬)

পবিত্র কোরআনের অ ত্র এ গ্রন্থের পর্যায়ক্রমিক অবতরণের মূল রহস্য উন্মোচন করে বলা হয়েছে :

(وقال الذين كفروا لولا نزّل عليه القرآن جملةً واحدةً كذالك لنثبّت به فؤادك ورتّلناه ترتيلاً)

“আর কাফিররা বলেছে : কেন কোরআনকে একবারে অবতীর্ণ করা হয় নি; আর আমরা তা এভাবেই অবতীর্ণ করেছি যাতে করে আমরা আপনার অন্তঃকরণকে দৃঢ় ও স্থির রাখতে পারি এবং আমরা এ গ্রন্থকে এক ধরনের বিশেষ শৃঙ্খলা দান করেছি।”(সূরা ফুরকান :৩২)

আমরা যদি পবিত্র কোরআনের অবতীর্ণ হওয়ার ব্যাপারে একটু গভীরভাবে চিন্তা করি, তাহলে কখনই এটি আশা করা উচিত নয় যে, প্রতিদিন প্রতিটি মুহূর্তে হযরত জিবরাইল (আ.) মহানবী (সা.)- এর সাথে যোগাযোগ রাখবেন এবং আয়াত অবতীর্ণ হবে; বরং পবিত্র কোরআনের পর্যায়ক্রমিক অবতরণের যে সব অন্তর্নিহিত রহস্য ও কারণ বিদ্যমান আছে এবং মুসলিম গবেষক আলেমগণ যেগুলো বিশদ ব্যাখ্যা করেছেন[২৪১] সেগুলোর জ ই পবিত্র কোরআন চাহিদা ও প্রয়োজন মাফিক বিভিন্ন সময়গত ব্যবধানে প্রশ্নকারীদের প্রশ্নসমূহের ভিত্তিতে অবতীর্ণ হয়েছে। প্রকৃত

প্রস্তাবে কখনই ওহী অবতরণ বন্ধ থাকে নি, বরং ওহী তাৎক্ষণিক অবতরণের কোন কারণই আসলে তখন বিদ্যমান ছিল না।

চতুর্দশ অধ্যায় : গোপনে দাওয়াত

নিকটাত্মীয়দেরকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণের আহবান

মহানবী (সা.) পুরো তিন বছর গোপনে ইসলাম ধর্ম প্রচার করেছিলেন এবং এ সময় তিনি জনসাধারণের দিকে মনোযোগ না দিয়ে ব্যক্তিবিশেষকে গড়ার দিকেই বেশি মনোনিবেশ করেছিলেন। ঐ সময়ের চাহিদা ও প্রয়োজন অবধারিত করে দেয় যে, তিনি যেন প্রকাশ্যে দাওয়াত অর্থাৎ ইসলাম ধর্ম প্রচার কার্যে লিপ্ত না হন। গোপন যোগাযোগের মাধ্যমে একদল ব্যক্তিকে তিনি ইসলাম ধর্মের দিকে আহবান করেছিলেন; আর এই গোপন প্রচার কার্যক্রমের কারণেই একদল লোক ইসলাম ধর্ম ও তাওহীদী মতাদর্শের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে এ ধর্ম গ্রহণ করেছিল। ইতিহাসে এ সব ব্যক্তির নাম লিপিবদ্ধ আছে যাঁরা মহানবীর রিসালাত বা মিশনের এ পর্যায়ে এ ধর্মের প্রতি বি াস এনেছিলেন। এঁদের মধ্য থেকে কতিপয় ব্যক্তির নাম নিচে বর্ণিত হলো :

হযরত খাদীজাহ্, আলী ইবনে আবি তালিব (আ.), যায়েদ ইবনে হারেসা, যুবাইর ইবনুল আওয়াম, আবদুর রহমান ইবনে আওফ, সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস, তালহা ইবনে উবাইদুল্লাহ্, আবু উবাইদাহ্ ইবনে জাররাহ্, আবু সালামাহ্, আরকাম ইবনে আবিল আরকাম, কুদামাহ্ ইবনে মাযউন, আবদুল্লাহ্ ইবনে মাযউন, উবাইদাহ্ আল- হারিস, সাঈদ ইবনে যায়েদ, খুবাব ইবনে আরত, আবু বকর ইবনে আবু কুহাফাহ্, উসমান ইবনে আফফান প্রমুখ।[২৪২]

কুরাইশ নেতৃবর্গ দীর্ঘ এ তিন বছর আমোদ- প্রমোদ, আরাম- আয়েশ ও বিলাস- ব্যসনে ম ছিল; অথচ ঐ অবস্থায় তারা মহানবী (সা.)- এর গোপনে ইসলাম প্রচার কার্যক্রম সম্পর্কে কম- বেশি তথ্য পেয়েছিল। কিন্তু তারা সামা প্রতিক্রিয়াও ব্যক্ত করে নি এবং বি মাত্র ঔদ্ধত্যও প্রদর্শন করে নি।

এ তিনটি বছর যা ছিল ব্যক্তিগঠনের পর্যায় বা কাল এ সময় মহানবী (সা.) কতিপয় সাহাবীকে সাথে নিয়ে কুরাইশদের দৃষ্টি থেকে দূরে পবিত্র মক্কার গিরি- উপত্যকাসমূহে গিয়ে নামায আদায়

করতেন। একদিন যখন পবিত্র মক্কায় কোন এক উপত্যকায় মহানবী (সা.) ও কতিপয় সাহাবী নামায আদায় করছিলেন তখন কতিপয় মুশরিক তাঁদের এ কাজে আপত্তি এবং তাঁদের তীব্র ভর্ৎসনাও করেছিল। এর ফলে মহানবীর সাহাবী ও কতিপয় মুশরিকদের মধ্যে ছোটখাটো সংঘর্ষ বেঁধে যায়। সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাসের দ্বারা একজন মুশরিক এ সময় আহত হয়েছিল।[২৪৩] এ কারণে মহানবী (সা.) আরকামের গৃহকেই ইবাদাতস্থল হিসাবে নির্ধারণ করেন।[২৪৪] তিনি সেখানে ইবাদাত ও প্রচার কার্যক্রম পরিচালনা করতেন। যার ফলে মহানবীর কর্মতৎপরতা মুশরিকদের দৃষ্টির অন্তরালে থেকে যায়। আম্মার ইবনে ইয়াসির ও সুহাইব ইবনে মিনান ঐ সব ব্যক্তির অন্তর্ভুক্ত যাঁরা এ গৃহে মহানবী (সা.)- এর প্রতি ঈমান এনেছিলেন।

জ্ঞানী ব্যক্তিগণ ব্যাপক কর্মসূচীসহ কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। তবে তাঁদের কাজ তাঁরা ক্ষুদ্র স্থান থেকেই শুরু করেন। আর যখনই তাঁরা কোন সাফল্য অর্জন করেন তখনই তাৎক্ষণিকভাবে এর ব্যাপক প্রসার ও বিস্তৃতির জ   চেষ্টা করেন; আর সাফল্যের পরিপ্রেক্ষিতে কর্মক্ষেত্রকে তাঁরা আরো বিস্তৃত করেন এবং তাঁদের কর্মকাণ্ডের পূর্ণতা বিধানের জ   আপ্রাণ চেষ্টা করেন।

একজন জ্ঞানী ব্যক্তি[২৪৫] আজকের একটি বিরাট উন্নত দেশের এক নেতাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "সামাজিক কর্মকাণ্ডে আপনাদের সাফল্যের অন্তর্নিহিত রহস্যটা কি?" তখন তিনি বলেছিলেন, "আমাদের অর্থাৎ পাশ্চাত্যের অধিবাসীদের চিন্তা- ভাবনা আপনাদের অর্থাৎ প্রাচ্যের অধিবাসীদের থেকে ভিন্ন। আমরা সব সময় ব্যাপক কর্মসূচী ও পরিকল্পনাসহ কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করি। তবে ছোট জায়গা থেকে আমাদের কাজ শুরু করি এবং সাফল্য অর্জনের পর আমরা ঐ কাজটি ব্যাপকভাবে করার চেষ্টা করি। আর যদি আমরা মাঝপথেই টের পেয়ে যাই যে, আমাদের কর্মসূচী ও পরিকল্পনা সঠিক নয় তখন আমরা সাথে সাথেই কাজের ফর্মুলা বা প্যাটার্ন পরিবর্তন করে ফেলি এবং অ   একটি কাজ শুরু করে দিই। কিন্তু আপনারা ব্যাপক পরিকল্পনাসহ কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করে বৃহৎ পরিসরে কাজ শুরু করেন এবং পুরো কর্মসূচী ও পরিকল্পনাটি আপনারা মাত্র একটি জায়গায় বাস্তবায়ন করেন; আর আপনারা যদি মাঝপথে অচলাবস্থায়

উপনীত হন তাহলে বিরাট ক্ষতি স্বীকার করা ব্যতীত প্রত্যাবর্তনের আর কোন পথ অবশিষ্ট থাকে না।

এ ছাড়াও আপনাদের অর্থাৎ প্রাচ্য দেশীয়দের মন-মানসিকতা তাড়া ড়া করার স্বভাব বা বৈশিষ্ট্যের সাথে মিলেমিশে একাকার হয়ে আছে। আর আপনারা সব সময় চাষের প্রথম দিনেই ফসল পেতে চান। আপনারা প্রথম দিনগুলোতেই সর্বশেষ ফলাফল অর্জন করতে চান। আর এটিই হচ্ছে এমন এক ভুল সামাজিক চিন্তাধারা যা মানুষকে এক আশ্চর্যজনক অচলাবস্থার মধ্যে ঠেলে দেয়।”

আমরা বি াস করি যে, এ ধরনের চিন্তাধারা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সাথে সংশ্লিষ্ট নয়। যাঁরা অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এবং জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান তাঁরা সব সময় তাঁদের অভীষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে পৌঁছানোর জ ঠিক এ পদ্ধতিটি ব্যবহার করেছেন এবং করছেন। মহানবীও অকাট্য এ মূলনীতিটি মেনে চলতেন এবং দীর্ঘ তিন বছর তাড়া ড়া না করেই তিনি গোপনে ইসলাম ধর্ম প্রচার করেছেন। তিনি যে ব্যক্তিকে চিন্তাশক্তির অধিকারী ও যোগ্যতাসম্পন্ন পেতেন তাঁর কাছেই তিনি তাঁর ধর্ম তুলে ধরতেন। একটি বিরাট আন্তর্জাতিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে পৃথিবীর সকল মানুষকে একই পতাকাতলে (তাওহীদের পতাকাতলে) একত্র করার দৃঢ় ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও তিনি পুরো এ তিনটি বছর জনগণের মাঝে ব্যাপকভাবে ইসলাম ধর্ম প্রচারের উদ্যোগ নেন নি। এমনকি তিনি তাঁর নিকটাত্মীয়দেরকেও বিশেষভাবে ইসলাম ধর্ম গ্রহণের আহবান জানান নি। তিনি বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির সাথেই কেবল ব্যক্তিগত যোগাযোগ গড়ে তুলতেন এবং যদি কোন ব্যক্তিকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার জ যোগ্য ও প্রস্তুত দেখতেন কেবল তাঁকেই ইসলাম ধর্ম গ্রহণের আহবান জানাতেন। এর ফলে এই তিন বছরে একদল লোক তাঁর অনুসারী হয়েছিলেন এবং তিনি তাঁদেরকে সৎ পথ প্রদর্শন করেছিলেন।

কুরাইশ গোত্রপতিগণ এ তিন বছর আমোদ-প্রমোদ ও স্ফূর্তি করেই কাটিয়েছে। মক্কার ফিরআউন আবু সুফিয়ান ও তার সা পা রা যখনই মহানবী (সা.)-এর নবুওয়াতের দাবি এবং ইসলাম ধর্ম গ্রহণের আহবানের যথার্থ রূপের সাথে পরিচিত হতো তখনই তারা বি পাত্মক হাসি

হেসে নিজেদেরকে সান্ত্বনা দিয়ে বলত, "মুহাম্মদের দাবি ও আহবান ওয়ারাকাহ্ ইবনে নওফেল এবং উমাইয়্যার আহবানের ায় অতি সত্বর নি প্রভ ও ম্লান হয়ে যাবে। আর অচিরেই সেও বিস্মৃতির অতল গহ্বরে বিলীন হয়ে যাবে।"(এই ওয়ারাকাহ্ ইবনে নওফেল এবং উমাইয়্যা ইঞ্জিল ও তাওরাত অধ্যয়ন করার ফলে ি ষ্টধর্ম গ্রহণ করে আরবদের মাঝে ি ষ্টধর্মের কথা বলতেন।)

কুরাইশ নেতৃবর্গ এ তিন বছর মহানবী (সা.)- এর প্রতি সামা তম ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করে নি, বরং তারা এ সময় তাঁর সম্মান ও মর্যাদা বজায় রেখেছে। আর মহানবীও এ সময় মুশরিকদের প্রতিমা ও দেব- দেবীসমূহের ব্যাপারে প্রকাশ্যে কোন সমালোচনা করেন নি। এ সময় তিনি কেবল আলোকিত মন ও অন্তরের অধিকারী ব্যক্তিদের সাথেই বিশেষ সম্পর্ক ও যোগাযোগ গড়ে তুলেছিলেন।

কিন্তু যেদিন থেকে বিশেষ প্রচার কার্যক্রম (অর্থাৎ নিকটাত্মীয়দের ইসলাম গ্রহণের আহবান) এবং সর্বসাধারণ পর্যায়ে প্রচার কার্যক্রমের (অর্থাৎ জনসাধারণকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণের আহবান) কাজ শুরু হলো সেদিন থেকেই মুশরিক কুরাইশগণও জাগ্রত ও সচেতন হয়ে গেল এবং তারা বুঝতে পারল যে, উমাইয়্যা ও ওয়ারাকার সাথে তাঁর আহবান ও প্রচার কার্যক্রমের স্পষ্ট মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। অতএব, এ কারণেই মহানবীর ইসলাম ধর্ম প্রচার কার্যক্রমের প্রকাশ্যে ও গোপনে বিরোধিতা ও সংগ্রাম শুরু হয়ে যায়। মহানবী (সা.) নিকটাত্মীয়দের মাঝেই (ইসলাম ধর্ম গ্রহণের আহবান জানিয়ে) সর্বপ্রথম নীরবতার সীলমোহর ভ করেন। আর এর পরপরই তিনি সাধারণ মানুষকে ইসলাম ধর্মের প্রতি আহবান জানান।

নিঃসন্দেহে যে সব সুগভীর ও মৌলিক সংস্কার ও সংশোধন জনগণের জীবনের সর্বক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করে এবং সমাজের গতিপথের আমূল পরিবর্তন ও সংস্কার সাধন করে সেগুলো অ সব কিছুর চেয়ে দু'ধরনের মজবুত শক্তিরই সবচেয়ে বেশি মুখাপেক্ষী হয়ে থাকে। উক্ত শক্তিদ্বয় হলো:

১. কথা বলা ও বক্তব্য প্রদানের ক্ষমতা : যে মানুষ এ ক্ষমতার অধিকারী হবে সে খুব চমৎকার ও আকর্ষণীয়ভাবে বাস্তবতা ও সত্যসমূহ বর্ণনা করতে সক্ষম হবে এবং সে তার নিজ ব্যক্তিগত

চিন্তাধারা, ধ্যান- ধারণা এবং যা কিছু ওহীর জগৎ থেকে লাভ করে তা জনতার মন- মানসিকতা ও চিন্তাধারায় প্রবেশ করাতে সক্ষম হবে।

২. প্রতিরক্ষামূলক শক্তি যা শত্রুদের আক্রমণের মুখে বিপজ্জনক অবস্থায় প্রতিরক্ষামূলক ব্যূহ গড়ে তোলে এবং এ অবস্থার অ থা হলে সকল সংস্কারমূলক আন্দোলনের প্রচার কার্যক্রমের অ শিখা ঐ প্রথম দিনগুলোতেই নিভে যাবে।

মহানবী (সা.)- এর বক্তব্য ও কথা ছিল পরিপূর্ণ। তাঁর বক্তব্য ও ভাষণ ছিল একজন দক্ষ সুবক্তার বক্তব্যের অনুরূপ। তিনি পরম প্রাঞ্জলতা এবং বলিষ্ঠতা সহকারে তাঁর ধর্মের ব্যাখ্যা- বিশ্লেষণ করেছেন; তবে প্রচার কার্যক্রমের একদম সূচনালে তাঁর ইসলাম ধর্ম প্রচার কার্যক্রম দ্বিতীয় প্রকার শক্তির অধিকারী ছিল না। কারণ এ তিন বছরে মহানবী (সা.) মাত্র ৪০ জনকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করেছিলেন এবং ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় দিয়েছিলেন। নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, এ ক্ষুদ্র দলটি শত্রুর অনিষ্ট ও ক্ষতি সাধন থেকে মহানবী (সা.)- কে রক্ষা করতে সক্ষম ছিল না।

এ কারণেই মহানবী (প্রচার কার্যক্রমের) একটি প্রতিরক্ষা ব্যূহ ও একটি শক্তিশালী কেন্দ্র গড়ে তোলার জ সাধারণ মানুষের পর্যায়ে দাওয়াতী কর্মকাণ্ড শুরু করার আগেই নিকটাত্মীয়দের ইসলাম ধর্ম গ্রহণের আহবান জানিয়েছিলেন এবং তিনি এ পথে দ্বিতীয় প্রকার শক্তির যে ঘাটতি ছিল তা পূরণ এবং সম্ভাব্য যে কোন ধরনের বিপজ্জনক পরিস্থিতি মোকাবিলা করার মতো প্রয়োজনীয় গুরুত্বপূর্ণ নিরাপত্তা বেষ্টনী তৈরি করতে সক্ষম হয়েছিলেন। নিকটাত্মীয়দের ইসলাম ধর্ম গ্রহণের আহবানের ন্যূনতম ফায়দা ছিল এই যে, যদি ধরেও নেয়া হয় যে, তাঁর নিকটাত্মীয় ও জ্ঞাতিরা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করবে না, কিন্তু অন্ততপক্ষে গোত্রীয় টান ও আত্মীয়তার কারণে তারা তাঁকে বিভিন্ন ধরনের শত্রুতা ও বিপদের হাত থেকে রক্ষা করতে উদ্বুদ্ধ হবে। আর ঐ সময় তাঁর দাওয়াতী কার্যক্রম মুষ্টিমেয় গোত্রপতির ওপর ইতিবাচক প্রভাব বিস্তার করেছিল এবং বেশ কিছু সংখ্যক ব্যক্তিকে ইসলাম ধর্মের প্রতি আগ্রহী করে তুলেছিল।

অধিকন্তু তিনি বি াস করতেন যে, সকল সংস্কার ও সংশোধন প্রক্রিয়ার মূল ভিত- ই হচ্ছে অভ্যন্তরীণ সংস্কার। অর্থাৎ যতক্ষণ পর্যন্ত কোন ব্যক্তি (সংস্কারক) তাঁর নিজ সন্তান- সন্ততি এবং জ্ঞাতি ও নিকটাত্মীয়দেরকে মন্দ কাজ করা থেকে বিরত রাখবেন না ততক্ষণ পর্যন্ত অ দের ক্ষেত্রে তাঁর প্রচার কার্যক্রম মোটেও প্রভাব ফেলতে পারবে না। কারণ এমতাবস্থায় তাঁর প্রতিপক্ষ তাঁর মুখের ওপর তাঁর নিকটাত্মীয় ও জ্ঞাতি গোত্রের কার্যকলাপের তীব্র প্রতিবাদ ও নিন্দা করার সুযোগ পেয়ে যাবে।

তাই এ কারণেই মহান আল্লাহ্ নিকটাত্মীয়দের ইসলাম ধর্ম গ্রহণের আহবান জানানোর ব্যাপারে মহানবীকে ওহীর মাধ্যমে সম্বোধন করে বলেছিলেন,

(وأنذر عشيرتك الأقربِينَ)

"আর আপনি আপনার নিকটাত্মীয়দেরকে (পরকালের ভয় র শাস্তি সম্পর্কে) ভয় প্রদর্শন করুন।"(সূরা আশ- শুয়ারা : ২১৪)

আর সাধারণ জনগণের পর্যায়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণের আহবান জানানোর ব্যাপারে মহান আল্লাহ্ পবিত্র কোরআনের নিম্নোক্ত আয়াতের মাধ্যমে তাঁকে আদেশ দিয়েছিলেন :

(فاصْدعْ بما تُؤمر وأعْرِضْ عن الْمُشركين إنّا كفيناك المستهزئين)

"আপনাকে যে ব্যাপারে আদিষ্ট করা হয়েছে তা প্রকাশ করুন এবং মুশরিকদের থেকে দূরে অবস্থান করুন। নিশ্চয়ই আমরা আপনাকে বি পকারীদের হাত থেকে রক্ষা করার জ যথেষ্ট।"[২৪৬]

নিকটাত্মীয়দের ইসলাম ধর্ম গ্রহণের আহবান পদ্ধতি

নিকটাত্মীয়দেরকে মহানবী (সা.) যে পদ্ধতিতে ইসলাম ধর্মের আহবান জানিয়েছিলেন তা ছিল অত্যন্ত আকর্ষণীয়। ঐ দিন যে সত্য প্রকাশিত হয়েছিল তাতে পরবর্তীকালে এ দাওয়াতের রহস্যসমূহ উজ্জ্বলতর হয়েছিল।

(وأنذر عشيرتك الأقربين)

'আর আপনি আপনার নিকটাত্মীয়দের ভয় প্রদর্শন করুন ' - এ আয়াতটির ব্যাখ্যায় মুফাসসিরগণ এবং একইভাবে ঐতিহাসিকগণ প্রায় ঐকমত্য পোষণ করে লিখেছেন, "মহান আল্লাহ্ তাঁকে নিকটাত্মীয়দেরকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণের আহবান জানানোর ব্যাপারে আদেশ দিয়েছিলেন। মহানবীও বিভিন্ন দিক বিবেচনা ও চিন্তা- ভাবনা করার পর হযরত আলী ইবনে আবি তালিব (আ.) যাঁর বয়স তখন ১৩ কিংবা ১৫ বছরের বেশি ছিল না তাঁকে দুধসহ খাবার তৈরি করার আদেশ দিয়েছিলেন। এরপর বনি হাশিমের নেতৃবর্গের মধ্য থেকে ৪৫ জনকে নিমন্ত্রণ করলেন। তিনি অতিথিদের জ খাদ্য পরিবেশনকালে লুক্কায়িত রহস্য প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত নিলেন। কিন্তু পরিতাপের বিষয় ছিল এই যে, খাবার পরিবেশন করার পর মহানবী (সা.)- এর বক্তব্য শুরু করার আগেই তাঁর একজন চাচা (আবু লাহাব) অত্যন্ত হালকা ও ভিত্তিহীন কথা বলে মহানবীর রিসালাত ও নবুওয়াতের ব্যাপারে ঐ নিমন্ত্রণ অনুষ্ঠানে আগত ব্যক্তিদের মহানবীর বক্তব্য শোনার আগ্রহ নষ্ট করে দেয়। মহানবী (সা.) এ ব্যাপারে বক্তব্য রাখার বিষয়টি পরের দিন পর্যন্ত স্থগিত রাখাই সমীচীন ও কল্যাণকর বলে বিবেচনা করলেন। পরের দিন একই কর্মসূচী ও পরিকল্পনার পুনরাবৃত্তি করলেন। খাদ্য পরিবেশন করার পর মহানবী (সা.) বনি হাশিম গোত্রের নেতাদের দিকে দৃষ্টিপাত করে বক্তব্য দেয়া শুরু করলেন। তিনি বললেন,

إنّ الرّائدَ لا يكذبُ أهله واللهِ الذي لا إله إلّا هو إنّي رسولُ اللهِ إليكم خاصَّةً و إلى النّاس عامّةً والله لتموتنَّ كما تنامون و لتُبْعَثُنَّ كما تستيقظون، ولَتُحاسبنَّ بما تعملون وإنّما الجنّةُ أبداً والنّارُ أبداً.

“ নিঃসন্দেহে কোন দল বা কাফেলার পথ- প্রদর্শক তার দলের বা কাফেলার লোকদেরকে মিথ্যা বলে না। যে মহান আল্লাহ্ ব্যতীত আর কোন উপাস্য নেই তাঁর শপথ, নিশ্চয়ই আমি বিশেষ করে তোমাদের কাছে এবং সাধারণভাবে মানব জাতির কাছে মহান আল্লাহর প্রেরিত দূত (রাসূল)। মহান আল্লাহর শপথ, তোমরা যেমন ঘুমাও ঠিক তেমনি তোমরা অবশ্য অবশ্যই মৃত্যুবরণ করবে আর ঠিক যেমনভাবে তোমরা নিদ্রা থেকে জাগ্রত হও ঠিক ত প মৃত্যুর পর তোমরা অবশ্যই পুনরুত্থিত হবে এবং তোমাদের কৃতকর্মের জ তোমাদেরকে অবশ্যই হিসাব দিতে ও জবাবদিহি করতে হবে। আর নিশ্চয়ই (সৎকর্মশীল বান্দাদের জ আছে) মহান আল্লাহর চিরস্থায়ী জান্নাত এবং (অসৎকর্মশীলদের জ আছে) চিরস্থায়ী জাহান্নাম।”[২৪৭]

এরপর তিনি আরো বললেন;

فأيُّكم يوازرني على هذا الأمر على أنْ يكون أخي و وَصِيِّي و خليفتي فيكم

“ আমি যা তোমাদের জ নিয়ে এসেছি তা আর কোন ব্যক্তি তার নিজ সম্প্রদায়ের জ কখনই আনয়ন করে নি। আমি তোমাদের জ দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ এনেছি। আমার প্রভু মহান আল্লাহ্ তোমাদেরকে তাঁর দিকে আহবান করতে আমাকে আদেশ করেছেন। অতএব, তোমাদের মধ্য থেকে কোন্ ব্যক্তি আমার ভাই, ওয়াসী (নির্বাহী) ও খলীফা হওয়ার শর্তে আমাকে এ ব্যাপারে সাহায্য করবে?”

যখন মহানবীর বক্তব্য এ স্থলে উপনীত হলো তখন সমগ্র মজলিস জুড়ে নীরবতা বিরাজ করছিল। উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের প্রত্যেকেই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের মহত্ত্ব এবং তাদের নিজেদের কাজের পরিণতি সম্পর্কে চিন্তার সমুদ্রে নিমজ্জিত হয়েছিল। হযরত আলী (আ.) ঐ সময় মাত্র ১৫ বছরের কিশোর ছিলেন। তিনি এবারে মজলিসের নীরবতা ভ করে উঠে দাঁড়িয়ে অত্যন্ত দৃঢ়কে বলেছিলেন, “হে মহান আল্লাহর রাসূল! হে মহানবী! আমি আপনাকে সহায়তা ও সাহায্য প্রদানের জ প্রস্তুত।”মহানবী (সা.) তাঁকে বসতে বললেন। এরপর তিনি তাঁর উপরিউক্ত কথা তিনবার পুনরাবৃত্তি করলেন। এ ১৫ বছরের কিশোর আলী ব্যতীত আর কেউ তাঁর আহবানে সাড়া দিল না। এমতাবস্থায় তিনি তাঁর নিকটাত্মীয়দের প্রতি মুখ ফিরিয়ে বলেছিলেন,

إنَّ هذا أخي و وصِيِّي و خليفتي عليكم فاسمعوا له و أطيعوه

"হে লোকসকল! এ যুবকটি তোমাদের মাঝে আমার ভাই, ওয়াসী এবং খলীফা। তার কথা তোমরা মনোযোগ সহকারে শুনবে এবং তার অনুসরণ করবে।"এ সময় মজলিস সমাপ্ত হলো। উপস্থিত ব্যক্তিবর্গ মুচকি হাসি দিয়ে আবু তালিব (আ.)- কে সম্বোধন করে বলেছিল, "মুহাম্মদ নির্দেশ দিয়েছে যে, তুমি তোমার ছেলের অনুসরণ করবে এবং তার আদেশ পালন করবে! সে তাকে তোমার মুরব্বী বানিয়ে দিয়েছে।"[২৪৮]

যা কিছু ওপরে লেখা হয়েছে তা এমন এক বিস্তারিত বিষয়ের নির্যাস যা অধিকাংশ মুফাসসির ও ঐতিহাসিক বিভিন্ন ধরনের বিবরণের উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেছেন। (একমাত্র ইবনে তাইমিয়াহ্ যিনি মহানবী (সা.)- এর আহলে বাইত সম্পর্কে এক বিশেষ ধরনের আকীদা পোষণ করতেন তিনি ব্যতীত আর কোন ব্যক্তি এ হাদীসটির বিশুদ্ধতা সম্পর্কে সন্দেহ ও সংশয় প্রকাশ করেন নি। আর সবাই ঘটনাটিকে ইতিহাসের সুনিশ্চিত ও তর্কাতীত বিষয়াদির অন্তর্গত বলে বি াস করেছেন।)

অপরাধ ও বিশ্বাসঘাতকতা

সত্য ঘটনা ও বিষয়াদির বিকৃতিসাধন, উল্টো করে উপস্থাপন এবং পর্দাবৃত রাখাই হচ্ছে বি াসঘাতকতা ও অপরাধের স্পষ্ট নিদর্শন। ইতিহাসে যুগে যুগে একদল গোঁড়া লেখক এ পথ পরিক্রমণ করে তাঁদের তাত্ত্বিক লেখা ও রচনাবলী কতগুলো বিকৃতি ও বিচ্যুতি দিয়ে ভর্তি করে মূল্যহীন করেছেন। তবে সময় অতিবাহিত হওয়া এবং জ্ঞানের পূর্ণতা (সাধন) এ সব গোঁড়া- অন্ধ লেখককে রচনা ও লিখন কার্য থেকে বিরত রেখেছে এবং একদল (সত্যান্বেষী) কলমের খোঁচায় পর্দা ও অন্তরায় বিদীর্ণ করে বাস্তবতাসমূহকে পর্দার অন্তরাল থেকে বের করতে উদ্বুদ্ধ হয়েছে। এখানে এ ধরনের খেয়ানত ও বি াসঘাতকতার একটি নমুনা তুলে ধরা হলো :

১. মুহাম্মদ ইবনে জরীর তাবারী (মৃ. ৩১০ হি.) তাঁর ইতিহাস গ্রন্থে নিকটাত্মীয়দের আহবান করার ঘটনাটি আমরা যেভাবে আলোচনা করেছি ঠিক সেভাবেই বিস্তারিত আলোচনা করেছেন; কিন্তু এই একই লেখক তাঁর তাফসীর গ্রন্থে যখন وَأَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الأَقْرَبِيْنَ (আর আপনার নিকটাত্মীয়দেরকে

আপনি ভয় প্রদর্শন করুন)- এ আয়াতটির ব্যাখ্যা করেছেন তখন তিনি তাঁর ইতিহাস গ্রন্থে যা লিখেছেন তা মূল পাঠ (মতন) ও সূত্র (সনদ) সহ সেখানে উল্লেখ করেছেন, কিন্তু যখন তিনি على أنْ يكون أخي و وصيّي و خليفتي 'আমার ভাই, ওয়াসী এবং খলীফা হওয়ার শর্তে'- এ বাক্যাংশে উপনীত হন, তখন তিনি এ বাক্যাংশটিকে পরিবর্তিত করে লিখেছেন-

على أن يكون أخي كذا و كذا 'আমার ভাই এরূপ, এরূপ'! নিঃসন্দেহে و وصيّي و خليفتي 'আমার ওয়াসী ও আমার খলীফা ' - এ শব্দসমূহ বাদ দিয়ে তদস্থলে 'এরূপ, এরূপ ' উল্লেখ করা দুরভিসন্ধি পোষণ ও বি াসঘাতকতা করা বৈ আর কিছুই নয়। তিনি এতটুকু বিকৃতি সাধন করে ক্ষান্ত হন নি। তিনি শুধু মহানবী (সা.)- এর প্রশ্নবোধক বাক্যটি বাদ দেন নি, এমনকি বনি হাশিমের নেতৃবর্গের নীরব থাকার পর হযরত আলী (আ.) সম্পর্কে মহানবী (সা.) যে বাক্যটি বলেছিলেন, 'নিশ্চয়ই এ আমার ভাই, ওয়াসী এবং খলীফা ' - তাতেও বিকৃতি সাধন করেছেন এবং 'এরূপ এরূপ ' - এ সব শব্দ ব্যবহার করেছেন।

ঐতিহাসিকের অবশ্যই সত্য ঘটনা ও বিষয়াদি লেখার ব্যাপারে মুক্ত ও সংস্কারমুক্ত হতে হবে। তাকে বিরল সাহসিকতার সাথে নির্ভীক হয়ে যা সত্য ঠিক তা- ই লিখতে হবে। বলার অপেক্ষা রাখে না যে, যে বিষয়টি তাবারীকে এ দু'টি শব্দ 'আমার ওয়াসী ও খলীফা ' বাদ দিয়ে তদস্থলে 'এরূপ এরূপ ' এ শব্দদ্বয় আনতে উদ্বুদ্ধ করেছে তা তাঁর মাজহাবী গোঁড়ামি এবং ধর্মীয় আকীদা- বি াস। কারণ তিনি হযরত আলী (আ.)- কে মহানবী (সা.)- এর পরপরই তাঁর ওয়াসী ও স্থলাভিষিক্ত বলে বি াস করতেন না। আর যেহেতু উক্ত শব্দদ্বয় মহানবীর ওফাতের পরপরই হযরত আলীর ওয়াসী (নির্বাহী প্রতিনিধি) এবং খলীফা (স্থলাভিষিক্ত) হওয়ার বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছে সেহেতু তিনি আয়াতটির শানে নুযূলে বিকৃতি সাধন করে তাঁর নিজ ধর্মীয় দৃষ্টিভ , আকীদা- বি াস এবং মাজহাব সংরক্ষণ করতে বাধ্য হয়েছেন।

২. ইবনে কাসীর শামী (মৃ. ৭৩২ হি.) 'আল- বিদায়াহ্ ওয়ান নিহায়াহ্ ' নামক গ্রন্থে এবং তাঁর তাফসীর গ্রন্থের ৩য় খণ্ডের ৩৫১ পৃষ্ঠায় ঐ পথ অনুসরণ করেছেন যা তাঁর আগে ঐতিহাসিক

তাবারীও অনুসরণ করেছিলেন। আমরা কখনই ইবনে কাসীরকে এ ব্যাপারে নির্দোষ গণ্য করতে পারি না। কারণ তাঁর গ্রন্থের মূল ভিত তারিখে তাবারী থেকে নেয়া। আর সুনিশ্চিতভাবে তিনি এ অংশটি লিপিবদ্ধ করার সময় তারিখে তাবারীর শরণাপন্ন হয়েছেন। এতদসত্ত্বেও অনেক বিষয় বর্ণনা করার ক্ষেত্রে তিনি তারীখে তাবারীতে বর্ণিত বিষয়াদি বর্ণনা করা থেকে বিরত থেকেছেন এবং আশাতীতভাবে এ ঘটনাটি আবার তাফসীরে তাবারী থেকে বর্ণনা করেছেন।

৩. মিশরের ভূতপূর্ব সংস্কৃতিমন্ত্রী ‘হায়াতু মুহাম্মদ ’ (সা.) গ্রন্থের প্রণেতা ড. হাইকাল কর্তৃক কৃত অপরাধ; আর এভাবে তিনি বর্তমান প্রজন্মের সামনে প্রকৃত বিষয় ও ঘটনাসমূহ বিকৃত করার পদ্ধতি পুনঃপ্রবর্তন করেছেন। অত্যন্ত আশ্চর্যজনক ব্যাপার হচ্ছে এই যে, তিনি তাঁর গ্রন্থের ভূমিকায় প্রাচ্যবিদদের কঠোর সমালোচনা ও আক্রমণ করেছেন এবং সত্যের বিকৃতি সাধন ও ইতিহাস জাল করার জ তাঁদের তীব্র নিন্দাও করেছেন, অথচ তিনি এ ক্ষেত্রে তাঁদের চেয়ে কম করেন নি। কারণ :

প্রথমত উক্ত গ্রন্থের প্রথম সংস্করণে তিনি উক্ত ঘটনাটি বেশ কাটছাঁট করে বর্ণনা করেছেন এবং দু’টি সংবেদনশীল বাক্যের মধ্যে কেবল একটি [মহানবী (সা.) বনি হাশিমের নেতৃবর্গের প্রতি মুখ করে বললেন, “আমার ভাই, আমার ওয়াসী এবং স্থলাভিষিক্ত প্রতিনিধি হওয়ার শর্তে আপনাদের মধ্য থেকে কোন্ ব্যক্তি আমাকে এ ব্যাপারে পৃষ্ঠপোষকতা করবে?”] তিনি ঐ গ্রন্থে উদ্ধৃত করেছেন; তবে আরেকটি বাক্য যা মহানবী (সা.) হযরত আলী (আ.)-এর পৃষ্ঠপোষকতা ও সহযোগিতা করার ঘোষণা দেয়ার পর তাঁর ব্যাপারে বলেছিলেন তা তিনি সম্পূর্ণরূপে বাদ দিয়েছেন এবং মহানবী (সা.) যে হযরত আলীর ব্যাপারে বলেছিলেন ‘এ কিশোর আমার ভাই, ওয়াসী এবং স্থলাভিষিক্ত প্রতিনিধি ’ তা তিনি আদৌ উল্লেখ করেন নি।

দ্বিতীয়ত দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংস্করণসমূহে তিনি আরো ব দূর এগিয়ে গিয়ে পুরো ঘটনা বাদ দিয়েছেন এবং এভাবে তিনি তাঁর নিজের ও তাঁর গ্রন্থের মর্যাদার অপূরণীয় ক্ষতিসাধন করেছেন।

নবুওয়াত ও ইমামত পরস্পর নিত্যসঙ্গী

রিসালাতের সূচনালে ই হযরত আলী (আ.)- এর স্থলাভিষিক্ত ও নেতৃত্বের ঘোষণা থেকে প্রমাণিত হয় যে, এ দু'টি পদ পরস্পর বিচ্ছিন্ন ও আলাদা নয়। যে দিন মহানবী (সা.) জনগণের কাছে নবী হিসাবে পরিচিত হলেন তাঁর স্থলাভিষিক্ত- প্রতিনিধিও সে দিনই মনোনীত ও ঘোষিত হলেন। আর স্বয়ং এ ঘটনাটি থেকে প্রমাণিত হয় যে, নবুওয়াত ও ইমামতের মূল ভিত্তি আসলে একই জিনিস। আর এ দু'টি ঐশী পদ শিকলের বলয়ের মতো পরস্পর যুক্ত এবং এতদুভয়ের মধ্যে কোন ব্যবধান নেই।

এ ঘটনা থেকে হযরত আমীরুল মুমিনীন আলী (আ.)- এর আত্মিক সাহস অত্যন্ত স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়ে যায়। কারণ যে সভায় অভিজ্ঞ বৃদ্ধ ও বয়স্ক নেতৃবর্গ গভীর চিন্তাম এবং উৎক ার মধ্যে ছিল সেই সভায় তিনি পূর্ণ সাহসিকতার সাথে পৃষ্ঠপোষকতা ও আত্মত্যাগ করার বিষয়টি ঘোষণা করেন এবং রক্ষণশীল ও পরিণতির ব্যাপারে চিন্তাশীল রাজনীতিবিদদের পথ অনুসরণ না করেই মহানবী (সা.)- এর শত্রুদের সাথে তাঁর নিজ শত্রুতার কথা প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছিলেন। যদিও হযরত আমীরুল মুমিনীন আলী (আ.) ঐ সভায় উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে বয়সের দিক থেকে সর্বকনিষ্ঠ ছিলেন তবুও দীর্ঘদিন ধরে মহানবীর সাথে তাঁর সম্পর্ক ও চলাফেরার কারণে তাঁর অন্তঃকরণ ঐ সব সত্য ও বাস্তবতা মেনে নিতে সম্পূর্ণ প্রস্তুত ছিল যেগুলো মেনে নেবার ব্যাপারে গোত্রের বয়ঃবৃদ্ধগণ সন্দিহান ছিল।

আবু জাফর ইসকাফী এ ঘটনার ব্যাপারে যথার্থ কথা বলেছেন। সম্মানিত পাঠকবর্গকে নাহজুল বালাগার নতুন ব্যাখ্যাগ্রন্থ পাঠ করার অনুরোধ জানানো হচ্ছে।[২৪৯]

পঞ্চদশ অধ্যায় : প্রকাশ্যে দাওয়াত

মহানবী (সা.)- এর নবুওয়াতের দায়িত্ব পাবার তিন বছর অতিবাহিত হলে নিকটাত্মীয়দের (বনি হাশিম) কাছে ইসলাম ধর্মের দাওয়াত দেয়ার পর তিনি সর্বসাধারণের কাছে ইসলামের দাওয়াত প্রদান ও প্রচারের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তিনি তিন বছর ব্যক্তিগত যোগাযোগের মাধ্যমে একদল লোককে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করেছিলেন। তবে এবার তিনি বলিষ্ঠ কে সাধারণ জনতাকে একত্ববাদী ধর্মের দিকে আহবান করেন। একদিন তিনি সাফা পাহাড়ের পাশে একটি উঁচু পাথরের ওপর দাঁড়িয়ে উচ্চকে বললেন, يا صباحاه "ইয়া সাবাহাহ্!" (আরবরা বিপদঘণ্টার স্থলে এ শব্দটি ব্যবহার করত এবং কোন ভয় র লোমহর্ষক সংবাদ তারা মূলত সর্বপ্রথম এ শব্দটি বলার মাধ্যমেই শুরু করত)

মহানবী (সা.)- এর আহবান সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। বিভিন্ন কুরাইশ গোত্র থেকে একদল লোক তাঁর দিকে ছুটে গেল। এরপর মহানবী (সা.) তাদের দিকে মুখ করে বললেন, "হে জনতা! আমি যদি তোমাদেরকে বলি, এ পাহাড়ের পেছনে তোমাদের শত্রুরা অবস্থান গ্রহণ করেছে এবং তোমাদের জান ও মালের ওপর আক্রমণ করতে চায়, তাহলে কি তোমরা আমার এ কথা বি াস করবে?" তখন সবাই বলেছিল, "হ্যাঁ, কারণ আমরা কখনই তোমাকে মিথ্যা কথা বলতে দেখি নি।"এরপর তিনি বললেন, "হে কুরাইশ গোত্র! নিজেদেরকে তোমরা দোযখের আগুন থেকে বাঁচাও। কারণ আমি মহাপ্রভু আল্লাহর কাছে তোমাদের জ কিছুই করতে পারব না। আমি তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির ব্যাপারে ভয় প্রদর্শন করছি।"এরপর তিনি বললেন, "আমার অবস্থান ও দায়িত্ব হচ্ছে ঐ পর্যবেক্ষণকারীর অবস্থান ও দায়িত্বেরই অনুরূপ যে দূর থেকে শত্রুদের দেখে তৎক্ষণাৎ নিজ সম্প্রদায়কে শত্রুর হাত থেকে রক্ষা করার জ তাদের দিকে ত ছুটে যায় এবং يا صباحاه - এ বিশেষ ধ্বনি তুলে তাদেরকে উদ্ভূত পরিস্থিতি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল করে।"[২৫০]

কুরাইশরা মহানবী (সা.)- এর ধর্ম সম্পর্কে কম- বেশি অবগত ছিল। তাই তারা এ কথা শোনার পর এতটা ভীত- সন্ত্রস্ত হয়ে গিয়েছিল যে, কুফর ও শিরকের এক নেতা (আবু লাহাব) পীনপতন

নীরবতা ভেে   মহানবীকে লক্ষ্য করে বলেই বসল, “তোমার জ   আক্ষেপ! তুমি কি আমাদেরকে এ কাজের জ   ই আহবান করেছ?” এরপর জনগণ সেখান থেকে চলে গেল।

লক্ষ্য অর্জনের পথে দৃঢ়তা

প্রত্যেক ব্যক্তির সাফল্য কেবল দু'টি শর্ত সাপেক্ষে অর্জিত হয়। শর্তদ্বয় নিম্নরূপ :

ক. লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের প্রতি আস্থা ও বি াস;

খ. উক্ত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে দৃঢ়তা, অবিচলতা ও প্রচেষ্টা।

ঈমান হচ্ছে মানুষের চালিকাশক্তি যা তাকে তার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যস্থলের দিকে পরিচালিত করে এবং যে কোন ধরনের কঠিন সমস্যাকেই তার কাছে সহজ করে তোলে। এই ঈমান দিবারাত্র তাকে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের দিকেই আহবান করতে থাকে। কারণ এ ধরনের ব্যক্তিই কেবল দৃঢ় আস্থা পোষণ করে যে, তার সৌভাগ্য, সফলতা এবং সুপরিণতি কেবল উক্ত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সাথেই জড়িত। আরেকভাবে বলা যায় যে, যখনই কোন ব্যক্তির বি াস হবে যে, নির্দিষ্ট কোন লক্ষ্যের ওপরই কাঙ্ক্ষিত সৌভাগ্য নির্ভর করছে তখনই স্বাভাবিক ও স্বয়ংক্রিয়ভাবে তার এ ঈমানী শক্তি তাকে তার সমুদয় সমস্যা থাকা সত্ত্বেও উক্ত লক্ষ্যের দিকেই টেনে নিয়ে যাবে। উদাহরণস্বরূপ অসুস্থ রোগী যদি জানতে পারে যে, তার রোগমুক্তি বা আরোগ্য তিতা ঔষধ খাওয়ার ওপর নির্ভরশীল তাহলে সে ঐ ঔষধটি খুব সহজেই খেয়ে নেবে। যদি কোন ডুবুরির জানা থাকে যে সমুদ্রগর্ভে অনেক মূল্যবান মণিমুক্তা ও জহরত বিদ্যমান রয়েছে, তাহলে সে ইতস্তত না করেই সমুদ্রের উত্তাল তর মালার মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়বে এবং কয়েক মিনিট পরেই সে সাফল্যের সাথে তর মালা ভেদ করে তীরে উঠে আসবে।

আর রোগী ও ডুবুরির যদি তাদের কাজের ব্যাপারে সন্দেহ থাকে অথবা যদি তারা তাদের কাজের সাফল্যের ব্যাপারে মোটেও আস্থাবান না হয়, তাহলে হয় তারা কোন কার্যকরী পদক্ষেপ ও উদ্যোগ একদম গ্রহণ করবে না অথবা যদি তারা কোন পদক্ষেপ নেয়ও তাহলে তারা এ ক্ষেত্রে অত্যন্ত কষ্টের সম্মুখীন হবে। সুতরাং আসলে মানুষের মধ্যকার আত্মিক ও ঈমানী শক্তিই সকল কঠিন সমস্যা ও জটিলতাকে সহজসাধ্য করে দেয়।

তবে এতে কোন সন্দেহ নেই যে, লক্ষ্যে পৌঁছানোর ক্ষেত্রে বেশ কিছু সমস্যা ও জটিলতা থাকতেই পারে। তাই বাধা- বিপত্তি দূর করার জ   চেষ্টা ও পরিশ্রম করা উচিত। প্রাচীনকাল থেকে একটি প্রবাদ প্রচলিত আছে : 'যেখানেই কোন ফুল থাকবে সেখানেই কাঁটাও থাকবে'। তাই এমনভাবে ফুল তুলতে হবে যাতে করে মানুষের হাত ও পায়ে কাঁটা ফুটে না যায়। কবির ভাষায় :

"এ মনোরম পুষ্পোদ্যানে নেই এমন কোন ফুল
যে তা তুলতে গিয়ে চয়নকারী হয় নি কাঁটাবিদ্ধ।"

পবিত্র কোরআন এ বিষয়টি (অর্থাৎ বি াস এবং তা অর্জনের পথে দৃঢ়তাই হচ্ছে সাফল্যের চাবিকাঠি) একটি ছোট বাক্যের মাধ্যমে ব্যক্ত করেছে। আয়াতটি নিম্নরূপ :

(إنّ الذّين قالوا ربّنا الله ثمّ استقاموا تتنزّل عليهم الملائكة ألّا تخافوا و لا تحزنوا و أبشروا بالجنّة التي كنتم توعدون)

"যারা বলেছে : আমাদের প্রভু মহান আল্লাহ, অতঃপর এ কথার ওপর (এ পথে) দৃঢ়পদ থাকে, তাদের ওপর ফেরেশতাকুল অবতীর্ণ হয়ে বলতে থাকে : তোমরা ভয় পেয়ো না ও দুঃখ করো না, বরং তোমাদের কাছে যে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে সে ব্যাপারে তোমরা সুসংবাদ গ্রহণ (কর) ও আনন্দিত হও।"(সূরা ফুসসিলাত : ১০)

মহানবী (সা.)- এর ধৈর্য ও দৃঢ়তা

সাধারণ জনতাকে ইসলামের দাওয়াত দেয়ার পূর্বে মহানবী (সা.)- এর ব্যক্তিগত যোগাযোগ এবং সাধারণ আহবান জানানোর পর তাঁর নিরলস কর্মতৎপরতার কারণে কাফির- মুশরিকদের মোকাবিলায় মুসলমানদের একটি নিবিড় শ্রেণী সৃষ্টি হয়েছিল; যারা সর্বসাধারণ আহবান জানানোর পূর্বেই গোপনে ঈমান ও ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিল তারা ঐ সকল নব্য মুসলমান যারা নবুওয়াতের সাধারণ ঘোষণা দেয়ার পর মহানবীর আহবানে সাড়া দিয়েছিল তাদের সাথে পূর্ণরূপে পরিচিত হয় এবং এ কারণেই মক্কার কাফির ও মুশরিকদের সকল মহলে বিপদ- ঘণ্টা বেজে উঠল। অবশ্য শক্তিশালী ও সুসজ্জিত কুরাইশদের পক্ষে একটি নব প্রতিষ্ঠিত আন্দোলন দমন করা ছিল অতি সহজ বিষয়।

কিন্তু এ আন্দোলনের সকল সদস্য একই গোত্রভুক্ত না হওয়াই ছিল কুরাইশদের ভয়ের কারণ যাতে তারা সকল শক্তি প্রয়োগ করে তাদের গুঁড়িয়ে দেয়ার চেষ্টা করবে, প্রতিটি গোত্র থেকেই কিছু কিছু ব্যক্তি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিল। তাই এ ধরনের গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের ব্যাপারে সুস্পষ্ট ও কঠিন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করাটিই ছিল তাদের জ অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার।

অবশেষে কুরাইশ গোত্রপতি ও নেতৃবৃন্দ আলোচনা ও পরামর্শের পর নব প্রতিষ্ঠিত এ মতাদর্শের মূল ভিত ও প্রতিষ্ঠাতাকে বিভিন্ন উপায়ে নির্মূল করার সিদ্ধান্ত নেয়। তারা সিদ্ধান্ত নিয়েছিল কখনো কখনো লোভ দেখিয়ে এবং বিভিন্ন প্রকার অ ীকার ও প্রতিশ্রুতি দেয়ার মাধ্যমে তাঁকে ইসলাম প্রচার কার্যক্রম থেকে বিরত রাখবে। আর তারা কখনো কখনো মকি, ভয়- প্রদর্শন এবং কষ্ট ও যাতনা দিয়ে তাঁর ধর্ম প্রচার ও প্রসারের পথ রুদ্ধ করারও সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। এটিই ছিল কুরাইশদের দশসালা পরিকল্পনা। অবশেষে কুরাইশ গোত্র তাঁকে হত্যার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। আর মদীনায় তাঁর হিজরত করার মাধ্যমে ইসলামের শত্রুদের পরিকল্পনা ও ষড়যন্ত্র সব ভণ্ডুল হয়ে যায়।

ঐ সময় বনি হাশিম গোত্রের নেতা ছিলেন আবু তালিব। তিনি ছিলেন পূতঃপবিত্র চিত্তের অধিকারী এবং অত্যন্ত সাহসী। তাঁর গৃহ ছিল সমাজের আশ্রয়হীন, নিপীড়িত ও অনাথদের আশ্রয়স্থল। মক্কার প্রধানের দায়িত্ব এবং কাবার কতকগুলো পদ ছাড়াও তদানীন্তন আরব সমাজে তাঁর বিরাট মর্যাদা ও প্রভাব-প্রতিপত্তি ছিল। আবদুল মুত্তালিবের মৃত্যুর পর যেহেতু শিশু মহানবী (সা.)-এর দেখাশুনা ও তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব তাঁর ওপর স্ত ছিল তাই কুরাইশ নেতৃবর্গ[২৫১] একত্রে তাঁর কাছে আগমন করে তাঁকে নিম্নোক্ত ভাষায় সম্বোধন করে বলেছিল :

"হে আবু তালিব! আপনার ভ্রাতুষ্পুত্র আমাদের উপাস্য ও দেব-দেবীদেরকে গালি দিয়েছে। সে আমাদের ধর্মের বিরূপ সমলোচনা করেছে এবং আমাদের চিন্তাধারা ও আকীদা-বি াস নিয়ে উপহাস করেছে। সে আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে বিচ্যুত ও গোমরাহ্ বলেছে। হয় তাকে আপনি আমাদের ওপর থেকে তার হাত গুটিয়ে নেয়ার আদেশ দিন নতুবা তাকে আমাদের হাতে অর্পণ করুন এবং তাকে সাহায্য করা থেকে আপনি বিরত থাকুন।"[২৫২]

কুরাইশপ্রধান ও বনি হাশিম গোত্রপতি আবু তালিব এক বিশেষ বিচক্ষণতার সাথে তাদের সাথে কথা বললেন এবং তাদেরকে এমনভাবে নমনীয় করলেন যে, তারা তাদের পশ্চাদ্ধাবন করা থেকে বিরত থাকে। কিন্তু ইসলাম ধর্মের প্রভাব ও প্রসার দিনের পর দিন বৃদ্ধি পেতে থাকে। মহানবী (সা.)-এর ধর্মের আধ্যাত্মিক আকর্ষণশক্তি, তাঁর আকর্ষণীয় বাচনভ ি ও ভাষা এবং বলিষ্ঠ, সাবলীল এবং বাক্যালংকারসমৃদ্ধ পবিত্র কোরআন এ ধর্ম প্রচার ও প্রসারের ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা রেখেছিল। বিশেষ করে নিষিদ্ধ মাসগুলোতে যখন পবিত্র মক্কায় আরবের বিভিন্ন জায়গা ও জনপদ থেকে হাজিগণের আগমন হতো তখন হযরত মুহাম্মদ (সা.) তাদের কাছে তাঁর আনীত ধর্ম উপস্থাপন করতেন। তাঁর বলিষ্ঠ, সাবলীল ও মধুর ভাষা এবং দয়গ্রাহী ধর্ম অনেক মানুষের ওপর সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করেছিল। এহেন পরিস্থিতিতে হঠাৎ করেই মক্কার ফিরআউনেরা বুঝতে পারল যে, হযরত মুহাম্মদ (সা.) সকল গোত্রের দয় জুড়ে নিজের অবস্থান গড়ে তুলেছেন এবং আরবের অনেক গোত্রের মধ্য থেকে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক অনুসারী ও সমর্থক খুঁজে পেয়েছেন। তারা আবার মহানবী (সা.)-এর একমাত্র সাহায্যকারী ও পৃষ্ঠপোষকের অর্থাৎ আবু

তালিবের কাছে উপস্থিত হয়ে ইশারা- ইঙ্গিতে ও স্পষ্ট ভাষায় মক্কাবাসীদের স্বাধীনতা এবং তাদের ধর্মের ওপর ইসলামের আধিপত্যের বিপদ সম্পর্কে তাঁকে অবহিত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। এ কারণেই তারা আবার দলবেঁধে একসাথে হযরত আবু তালিবের কাছে গেল এবং তাদের সেই পুরানো বক্তব্য পুনরায় ব্যক্ত করল :

يا أبا طالب إنّ لك سنّا و شرفا و إنّا قد استنهيناك ان تنهى ابن أخيك فلم تفعل و إنّا و الله لا نصبر على هذا من شتم آلهتنا و آباءنا سفّه احلامنا حتّى تكفه عنّا أو ننازله و إيّاك في ذلك حتّى يهلك أحد الفريقين

"হে আবু তালিব! কৌলীন্য ও বয়সের দিক থেকে আপনি আমাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। কিন্তু আমরা আপনাকে পূর্বেই বলেছিলাম যে, আপনার ভাতিজাকে নতুন ধর্ম প্রচার করা থেকে বিরত রাখবেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় আপনি আমাদের কথায় কর্ণপাত করেন নি। এখন আমাদের ধৈর্যের সকল বাঁধ ভেঙ্গে গেছে এবং যখন আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, এক ব্যক্তি আমাদের উপাস্য ও দেব- দেবীর ব্যাপারে কটুক্তি করছে এবং আমাদেরকে বিবেক- বুদ্ধিহীন এবং আমাদের চিন্তা- চেতনাকে হীন ও নীচ মনে করছে তখন আমরা এর চেয়ে বেশি আর সহ্য করব না। আপনার দায়িত্ব ও কর্তব্য হচ্ছে তাকে সব ধরনের কর্মতৎপরতা থেকে বিরত রাখা। আর যদি তা না করেন তাহলে তার ও আপনার বিরুদ্ধে আমরা যুদ্ধ করব কারণ আপনি তার একমাত্র সাহায্যকারী ও পৃষ্ঠপোষক। আর যতক্ষণ পর্যন্ত উভয় দলের (আমরা এবং আপনি ও মুহাম্মদ) অবস্থা সুস্পষ্ট না হবে এবং এ দলদ্বয়ের মধ্য থেকে যে কোন একটি ধ্বংস না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত আপনার ও মুহাম্মদের বিরুদ্ধে আমাদের যুদ্ধ ও প্রতিরোধ অব্যাহত থাকবে।"

মহানবী (সা.)- এর একমাত্র সাহায্যকারী ও পৃষ্ঠপোষক তাঁর পূর্ণ বুদ্ধিমত্তা ও বিচক্ষণতা দিয়ে বুঝতে পারলেন যে, যে গোষ্ঠীটির অস্তিত্ব ও স্বার্থ বিপন্ন হয়েছে তাদের সামনে অবশ্যই ধৈর্যাবলম্বন করা উচিত। এজন্য এদের সাথে শান্তভাবে বুঝিয়ে শুনিয়ে কথা বলা এবং প্রতিশ্রুতি দেয়া উচিত যে, তিনি কুরাইশ নেতৃবৃন্দের বক্তব্য তাঁর ভাতিজার কাছে পৌঁছে দেবেন। অবশ্য এ ধরনের উত্তর ঐ সকল ক্রুদ্ধ ব্যক্তির ক্রোধাগ্নি নির্বাপণ করার জন্যই তিনি বলেছিলেন যাতে করে পরে সমস্যা সমাধানের জন্য অপেক্ষাকৃত সঠিক পথ অবলম্বন করা সম্ভব হয়। এ কারণেই

কুরাইশ নেতৃবর্গ চলে গেলে তিনি হযরত মুহাম্মদ (সা.)- এর সাথে যোগাযোগ করেন এবং তাদের বক্তব্য পৌঁছে দেন এবং ইত্যবসরে তিনি লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের প্রতি নিজ ভ্রাতুষ্পুত্রের ঈমান ও আস্থা পরীক্ষা করার লক্ষ্যে তাঁর উত্তরের জ অপেক্ষা করতে লাগলেন। মহানবী (সা.) উত্তর দিতে গিয়ে এমন একটি কথা বলেছিলেন যা তাঁর জীবনেতিহাসের সবচেয়ে লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হিসাবে গণ্য হয়েছে। তাঁর উত্তরটি ছিল নিম্নরূপ :

و الله يا عمّاه لو وضعوا الشّمس في يميني و القمر في شمالي على أن أترك هذا الأمر حتّى يُظهره الله أو اهلك فيه ما تركته

" হে পিতৃব্য! মহান আল্লাহর শপথ, যদি আমার ডান হাতে সূর্য এবং বাম হাতে চন্দ্র স্থাপন করা হয় (অর্থাৎ সমগ্র বি -ব্রহ্মাণ্ডের বাদশাহীও যদি আমার কাছে অর্পণ করা হয়) এ শর্তে যে, আমি ইসলাম ধর্ম প্রচার এবং আমার লক্ষ্য অর্জন করা থেকে বিরত থাকব, তবুও আমার লক্ষ্য অর্জন করা থেকে বিরত থাকব না। মহান আল্লাহ্ এ ধর্মকে বিজয়ী করা পর্যন্ত অথবা এ পথে আমার প্রাণ ধ্বংস না হওয়া পর্যন্ত আমি কখনই এ কাজ থেকে বিরত থাকব না। "

এরপর স্বীয় লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের প্রতি আগ্রহ ও মহব্বতের অশ্রু তার চোখে দেখা গেল এবং পিতৃব্য আবু তালেবের কাছ থেকে তিনি উঠে চলে গেলেন। মহানবীর প্রভাব বিস্তারকারী ও আকর্ষণীয় বাণী মক্কাপ্রধান আবু তালিবের অন্তরে এতটা বিস্ময়কর প্রভাব রেখেছিল যে, স্বতঃস্ফূর্তভাবে এবং শত বিপদ থাকা সত্ত্বেও তিনি ভ্রাতুষ্পুত্র হযরত মুহাম্মদ (সা.)- কে লক্ষ্য করে বলেছিলেন, "মহান আল্লাহর শপথ, আমি কখনই তোমাকে সাহায্য করা থেকে বিরত থাকব না এবং এ ক্ষেত্রে তোমার যে দায়িত্ব ও কর্তব্য আছে তা তুমি আঞ্জাম দাও।"[২৫৩]

তৃতীয় বারের মতো কুরাইশ গোত্রের আবু তালিবের কাছে গমন

ইসলাম ধর্মের উত্তরোত্তর প্রচার ও প্রসার কুরাইশ গোত্রকে চিন্তিত করে তোলে এবং এ থেকে উদ্ধার পাওয়ার পথ খুঁজে বের করার চেষ্টা করতে থাকে। তারা পুনরায় একত্র হয়ে বলল, "যেহেতু আবু তালিব মুহাম্মদকে সন্তান হিসাবে গ্রহণ করেছেন তাই তিনি তাকে সাহায্য করছেন।

এমতাবস্থায় সবচেয়ে সুন্দর একটি যুবক তার কাছে নিয়ে গিয়ে আমরা তাঁকে বলতে পারি যে, তিনি যেন ঐ যুবককে পুত্র হিসাবে গ্রহণ করেন।" এ বিষয়টি বিবেচনা করে তারা আম্মারাহ্ ইবনে ওয়ালীদ ইবনে মুগীরাকে তাদের নিজেদের সাথে নিয়ে গেল। এই আম্মারাহ্ ইবনে ওয়ালীদ ইবনে মুগীরাহ্ ছিল মক্কার সবচেয়ে সুদর্শন যুবকদের একজন। তারা হযরত আবু তালিবের কাছে তৃতীয়বাবের মতো অভিযোগ করে বলল, "হে আবু তালিব! ওয়ালীদপুত্র একজন কবি, বাগ্মী, সুদর্শন ও বুদ্ধিমান যুবক। আমরা তাকে আপনার কাছে সোপর্দ করতে রাজি আছি এক শর্তে, আর তা হলো যে, আপনি তাকে সন্তান হিসাবে গ্রহণ করবেন এবং আপনার নিজ ভাতিজার প্রতি সমর্থন ও তাকে সাহায্য করা থেকে বিরত থাকবেন।" এ কথা শোনার পর আবু তালিবের শিরা- উপশিরা ও ধমনীতে আত্মমর্যাদাবোধের রক্ত প্রবাহিত হতে লাগল। তিনি অত্যন্ত উজ্জ্বল বদনমণ্ডলে তাদের কাছে উচ্চৈঃস্বরে বলে উঠলেন, "তোমরা আমার সাথে একটি জঘ লেনদেন করতে চাইছ। আমি তোমাদের সন্তানকে আমার সান্নিধ্যে প্রতিপালন করব। আর আমার সন্তান ও কলিজার টুকরাকে তোমাদের হাতে তুলে দেব যাতে করে তোমরা তাকে হত্যা করতে সক্ষম হও? মহান আল্লাহর শপথ, এটি কখনই বাস্তবায়িত হবে না।"[২৫৪] মুতইম বিন আদি ইত্যবসরে দাঁড়িয়ে বলল, "কুরাইশদের প্রস্তাব আসলে খুবই ায়ভিত্তিকই ছিল, তবে আপনি কখনই তা মেনে নেবেন না।"আবু তালিব তখন বললেন, "তুমি কখনই ইনসাফপূর্ণ আচরণ কর নি। আর আমি নিশ্চিতভাবে জানি, তুমি আমার অপদস্থ হওয়াটিই কামনা করছ এবং কুরাইশদেরকে আমার বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলার চেষ্টা করছ। তবে তোমার যা করার ক্ষমতা আছে তা করো তো দেখি।"

মহানবী (সা.)- কে কুরাইশদের প্রলোভন

কুরাইশগণ নিশ্চিত হতে পেরেছিল যে, তারা কখনই আবু তালিবের সন্তুষ্টি ও সম্মতি অর্জন করতে পারবে না। তবে তিনি গোপনে তাঁর নিজ ভাতিজার প্রতি এক অপরিসীম ভালোবাসা ও বি াস পোষণ করতেন। এজ তারা (কুরাইশ) সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল যে, তারা তাঁর সাথে যে কোন ধরনের আলোচনা করা থেকে বিরত থাকবে। তবে আরেকটি পরিকল্পনা ও ষড়যন্ত্র তাদের মাথায় খেলে গেল। আর তা হলো হযরত মুহাম্মদ (সা.) যাতে করে তাঁর ইসলাম প্রচার কার্যক্রম থেকে হাত গুটিয়ে নেন সেজ তারা তাঁকে উচ্চ সামাজিক পদমর্যাদা ও বিস্তর ধন- সম্পদের প্রস্তাব, মূল্যবান উপঢৌকন এবং অনিন্দ্য সুন্দরী রমণী প্রদানের প্রলোভন দেখাবে। তাই তারা সদলবলে আবু তালিবের ঘরের দিকে গমন করল। ঐ সময় হযরত মুহাম্মদ (সা.) চাচার পাশেই বসা ছিলেন। কুরাইশ নেতৃবর্গের মুখপাত্র আবু তালিবকে লক্ষ্য করে কথা বলা শুরু করল, “হে আবু তালিব! মুহাম্মদ আমাদের ঐক্যবদ্ধ কুরাইশ গোত্রকে বিভক্ত করে ফেলেছে এবং আমাদের মাঝে অনৈক্যের বীজ বপন করেছে। সে আমাদের বিবেক- বুদ্ধি নিয়ে হাসাহাসি করেছে এবং আমাদেরকে ও আমাদের প্রতিমাদেরকে বি প করেছে। যদি তার এ ধরনের কাজ করার কারণ তার অভাব, দারিদ্র্য ও কপর্দকহীনতাই হয়ে থাকে তাহলে আমরা তাকে বিস্তর ধনসম্পদ তার হাতে প্রদান করব। আর তার এ কাজ করার কারণ যদি উচ্চ সামাজিক মর্যাদা লাভ করার আকাঙ্ক্ষা হয়ে থাকে তাহলে আমরা তাকে আমাদের নেতা ও অধিপতি করব। আমরা তখন তার কথা শুনব। আর যদি সে অসুস্থ হয়ে থাকে এবং তার সুচিকিৎসার প্রয়োজন হয় তাহলে আমরা তার সুচিকিৎসার জ সবচেয়ে দক্ষ চিকিৎসক আনব।...”

আবু তালিব তখন হযরত মুহাম্মদ (সা.)- এর দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন, “তোমার সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দ এসেছে এবং তোমাকে অনুরোধ করে বলেছে, তুমি প্রতিমাসমূহের বিরুদ্ধে মন্দ বলা ও কটুক্তি করা থেকে বিরত থাক, তাহলে তারাও তোমাকে ছেড়ে দেবে।”এ কথা শোনার পর মহানবী (সা.) চাচা আবু তালিবকে লক্ষ্য করে বললেন, “আমি তাদের কাছ থেকে কিছুই চাই না।

আর এ চারটি প্রস্তাবের মধ্যে অন্তত আমার একটি কথা তো তারা গ্রহণ করতে পারে, তাহলে তারা এর ফলে সমগ্র আরব জাতির ওপর কর্তৃত্ব করতে পারবে এবং অনারবগণকেও তাদের আজ্ঞাবহ করতে পারবে।"[২৫৫] ঐ সময় আবু জাহল নিজের স্থান ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, ''আমরা তোমার দশটি কথা শুনতে আগ্রহী।" তখন হযরত মুহাম্মদ (সা.) বললেন, ''আমার বক্তব্য একটিই। আর তা হলো : তোমরা সবাই সাক্ষ্য দেবে যে, মহান আল্লাহ্ ব্যতীত আর কোন উপাস্য নেই।"[২৫৬] মহানবী (সা.)- এর অপ্রত্যাশিত এ বক্তব্য ঠাণ্ডা পানির মতোই ছিল যা তাদের তপ্ত ও উষ্ণ আশার ওপর পতিত হলো। প্রচণ্ড বিস্ময়, নীরবতা এবং একই সাথে হতাশা ও নিরাশা তাদের সমগ্র অস্তিত্বকে এতটাই আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল যে, তারা অনিচ্ছাকৃতভাবে বলেই ফেলল, "আমরা ৩৬০ ইলাহকে বাদ দিয়ে কেবল এক ইলাহর উপাসনা করব?"[২৫৭]

এ কথা শুনে কুরাইশদের চোখে ও মুখে ক্রোধের অি শিখা প্র লিত হয়ে উঠল।[২৫৮] তারা হযরত আবু তালিবের ঘর থেকে বের হয়ে গেল। সে সময় তারা তাদের কৃতকর্মের পরিণতির ব্যাপারে গভীরভাবে চিন্তা করতে লাগল। নিচের আয়াতগুলো এ প্রস ই অবতীর্ণ হয়েছিল :

(وعجبوا ان جاءهم منذر منهم و قال الكافرون هذا ساحر كذّاب-أجعل الآلهة إلها واحدا إنّ هذا لشيء عجاب و انطلق الملأ منهم ان امشوا واصبروا على آلهتكم إنّ هذا لشيء يراد-ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلّا اختلاق)

"তারা এ ব্যাপারে আশ্চর্যান্বিত হয়েছে যে, তাদের মধ্য থেকেই একজন ভয়প্রদর্শনকারী এসেছে। আর কাফিররা বলেছে : এ (এই ভয় প্রদর্শনকারী) অতি মিথ্যাবাদী যাদুকর। সে কিভাবে ব উপাস্য ও খোদাকে এক উপাস্য করে ফেলেছে, আর এটি তো অত্যন্ত আশ্চর্যজনক বিষয়। তাদের (কাফির- মুশরিকদের) নেতৃবর্গ উঠে প্রস্থান করল এবং বলছিল : চলে যাও এবং তোমাদের নিজেদের উপাস্যদের পূজা ও উপাসনার ওপর দৃঢ়তার সাথে বহাল থাক। আর এটিই হচ্ছে সবচেয়ে কাঙ্ক্ষিত পথ ও কাজ। আমরা অ কোন জাতি থেকে এ ধরনের কথা কখনই শুনি নি, আর এটি মিথ্যাচার ছাড়া আর কিছুই নয়।"(সূরা সাদ : ৪- ৭)

কুরাইশ বংশের উৎপীড়নের একটি নমুনা

একদিন মহানবী (সা.) নীরবতা ভ   করলেন এবং কুরাইশ গোত্রপতিদেরকে তাঁর প্রসিদ্ধ উক্তির মাধ্যমে তাদের কোন প্রস্তাব গ্রহণ করার ব্যাপারে হতাশ করে দিলেন। তাঁর সেই প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক উক্তি, "খোদার শপথ, যদি সূর্যকে আমার ডান হাতে এবং চন্দ্রকে আমার বাম হাতে বসানো হয় এ শর্তে যে, আমি ইসলাম প্রচার কার্যক্রম থেকে বিরত থাকব, তাহলে মহান আল্লাহ্ যে পর্যন্ত আমার ধর্ম ইসলামকে জয়যুক্ত ও প্রচারিত না করবেন অথবা এ পথে আমার জীবন নিঃশেষ না হবে সে পর্যন্ত আমি এ কাজ থেকে বিরত থাকব না।"আর এরই সাথে তাঁর জীবনের সবচেয়ে কঠিন অধ্যায় শুরু হয়ে যায়। কারণ ঐ দিন পর্যন্ত কুরাইশ গোত্র তাদের সকল আচার-আচরণে মহানবী (সা.)- এর সম্মান বজায় রাখত এবং তখনও তাদের ধৈর্যচ্যুতি ঘটে নি। কিন্তু যখন তারা দেখলো যে, তাদের সংশোধন পরিকল্পনাসমূহ ভেস্তে গেছে তখন তারা তাদের কর্মসূচী ও পরিকল্পনা পরিবর্তন করে ফেলে এবং হযরত মুহাম্মদ (সা.)- এর ধর্মের প্রভাব ও বিস্তারকে যেভাবেই হোক বন্ধ করার উদ্যোগ নেয়। তারা এ পথে যে কোন ধরনের উপায় ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকে নি। এ কারণেই কুরাইশ গোত্রপতিগণ সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত নেয় যে, তারা ব্য - বি প, নির্যাতন ও উৎপীড়ন এবং ভীতি প্রদর্শনের মাধ্যমে তাঁকে ইসলাম ধর্ম প্রচার ও প্রসার কার্যক্রম থেকে বিরত রাখবে।

বলার অপেক্ষা রাখে না যে, সংস্কারক নেতা যিনি বি বাসীকে পথ- প্রদর্শন করার চিন্তা- ভাবনা করছেন তিনি অবশ্যই সকল অগ্রহণযোগ্য কার্যক্রম ও আচরণ, শারীরিক ও মানসিক আঘাত ও ক্ষতির বরাবরে ধৈর্যাবলম্বন করবেন যাতে করে তিনি ধীরে ধীরে সকল সমস্যা ও জটিলতা সমাধান করতে সক্ষম হন। আর অ ়া সকল সংস্কারকের কর্মপদ্ধতিও ঠিক এমনই ছিল। আমরা এ কয়টি পাতায় কুরাইশদের অত্যাচার ও নির্যাতনের কিছু ঘটনা ও কাহিনী বর্ণনা করব। আর এর ফলে আমাদের সামনে মহানবী (সা.)- এর ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা স্পষ্ট হয়ে যাবে।

মহানবী (সা.) এক আত্মিক ও আধ্যাত্মিক শক্তি (অর্থাৎ তাঁর বি াস, ধৈর্য, দৃঢ়তা এবং অবিচলতা) যা তাঁকে ভেতর থেকে সাহায্য করত তা ছাড়াও এক বাহ্য শক্তির অধিকারী ছিলেন যা তাঁকে শত্রুদের হাত থেকে রক্ষা করত। আর সে শক্তি ছিল বনি হাশিমের সাহায্য ও সমর্থন যার শীর্ষে ছিলেন হযরত আবু তালিব। কারণ আবু তালিব যখন তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রকে কষ্ট ও যাতনা দেয়া সংক্রান্ত মারাত্মক সিদ্ধান্ত সম্পর্কে অবহিত হয়েছিলেন তখন তিনি বনি হাশিম গোত্রের সকল ব্যক্তিকে ডেকে হযরত মুহাম্মদকে রক্ষা করার জ উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। তাঁদের মধ্য হতে একদল ঈমানদার হওয়ার কারণে, আবার কেউ কেউ আত্মীয়তা ও রক্তসম্পর্ক থাকার কারণে হযরত মুহাম্মদকে রক্ষা ও সমর্থনের দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে থেকে কেবল আবু লাহাব এবং আরো দু'ব্যক্তি যারা মুহাম্মদ (সা.)- এর শত্রুদের মধ্যে গণ্য হয়েছে তারাই আবু তালিবের এ ধরনের সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেছে এবং তা বাস্তবায়ন করা থেকে বিরত থেকেছে। কিন্তু বনি হাশিম গোত্রের এ প্রতিরক্ষা ব্যূহ মহানবী (সা.)- কে কতিপয় অনভিপ্রেত ঘটনা থেকে নিরাপদ রাখতে পারে নি। কারণ কুরাইশরা যেখানেই মহানবীকে একাকী পেত সেখানেই তারা তাঁর অনিষ্ট সাধন করা থেকে বিরত থাকত না। এখানে কুরাইশদের নির্যাতন ও যন্ত্রণা দেয়ার কয়েকটি নমুনা উল্লেখ করা হলো :

ক. আবু জাহল একদিন মহানবী (সা.)- কে সাফা পর্বতে দেখে অশালীন ও কটূক্তি করল এবং তাঁকে নির্যাতন ও কষ্ট দিল। মহানবী (সা.) তার সাথে কোন কথা বললেন না এবং সোজা বাড়ির দিকে গমন করলেন। আবু জাহল পবিত্র কাবার পাশে কুরাইশদের সভায় রওয়ানা হলো। হামযাহ্, যিনি রাসূলের চাচা ও দুধ ভ্রাতা ছিলেন, তিনি ঐ দিনই যখন শিকার থেকে ধনুক কাঁধে ঝুলিয়ে প্রত্যাবর্তন করছিলেন তখন তিনি তাঁর পুরানো অভ্যাসবশত মক্কায় প্রবেশ করার পর নিজ সন্তান ও পরিবার- পরিজনের সাথে সাক্ষাৎ করার পূর্বেই পবিত্র কাবা তাওয়াফ ও যিয়ারত করতে গেলেন। এরপর কাবার চারপাশে কুরাইশদের যে বিভিন্ন সভা বসত সেখানে গেলেন এবং তাদের সাথে সালাম ও কুশলাদি বিনিময় করলেন।

তিনি এ সব আনুষ্ঠানিকতা শেষ করার পর নিজ ঘরের দিকে প্রত্যাবর্তন করলেন। ঘটনাক্রমে আবদুল্লাহ্ ইবনে জাদআনের দাসী যে আবু জাহল কর্তৃক মহানবী (সা.)- কে নির্যাতন করার বিষয়টি প্রত্যক্ষ করেছিল সে হযরত হামযাকে বলল, "হে আবু আম্মারাহ্ (হযরত হামযার কুনিয়াহ্)! হায় যদি কয়েক মিনিট পূর্বে এ স্থান থেকে আমি যেমনভাবে ঘটনাটি ঘটতে দেখেছি ঠিক তেমনভাবে আপনি দেখতেন যে, আবু জাহল কিভাবে আপানার ভ্রাতুষ্পুত্রকে গালিগালাজ ও কটুক্তি করেছে এবং তাকে কষ্ট ও যাতনা দিয়েছে!" ঐ দাসীর কথাগুলো হযরত হামযার মনে বিস্ময়কর প্রভাব ফেলেছিল এবং তিনি পরিণতির কথা চিন্তা- ভাবনা না করে আবু জাহল থেকে নিজ ভ্রাতুষ্পুত্রের প্রতিশোধ গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেন।

এ কারণেই যে পথে তিনি এসেছিলেন সেপথেই ফিরে গেলেন। আবু জাহলকে তিনি কুরাইশ গোত্রের মিলনায়তনে দেখতে পেলেন এবং তার কাছে গেলেন। কারো সাথে কোন কথা বলার পূর্বেই তিনি তাঁর ধনুক উঠিয়ে আবু জাহলের মাথার ওপর এমনভাবে আঘাত করতে লাগলেন যার ফলে তার মাথা ফেটে গেল। তিনি বললেন, "তুমি মুহাম্মদের বিরুদ্ধে কটুক্তি ও কুৎসা করছ, অথচ আমি তার প্রতি ঈমান এনেছি এবং যে পথে তিনি গিয়েছেন সে পথে আমিও যাব। যদি তোমার কোন কিছু করার ক্ষমতা থাকে তাহলে আমার সাথে লড়াই করে দেখ।"[২৫৯]

ঐ সময় বনি মাখযূম গোত্রের একদল ব্যক্তি আবু জাহলের সাহায্যার্থে অগ্রসর হলো। কিন্তু যেহেতু সে একজন সুযোগ- সন্ধানী ও রাজনৈতিকভাবে বিচক্ষণ ছিল তাই সে সব ধরনের যুদ্ধ ও সংঘর্ষ এড়িয়ে গেল এবং বলল, "আমি মুহাম্মদের সাথে খারাপ আচরণ করেছি এবং হামযারও অধিকার রয়েছে অসন্তুষ্ট হওয়ার।"[২৬০]

অকাট্য সত্য ঐতিহাসিক বর্ণনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, হামযার মতো সাহসী বীর পুরুষের অস্তিত্ব মহানবী (সা.)- এর জীবন রক্ষা এবং মুসলমানদের আত্মিক মনোবলের ওপর যথোপযুক্ত প্রভাব ফেলেছিল। উল্লেখ্য যে, হযরত হামযাহ্ পরবর্তীকালে ইসলামের অ তম প্রধান সেনাপতি ও সমরবিদ ছিলেন। ইবনে আসীর এতদপ্রস লিখেছেন : "কুরাইশগণ হযরত হামযার ইসলাম ধর্ম গ্রহণের বিষয়কে মুসলমানদের উন্নতি ও মনোবল বৃদ্ধির কারণ বলে বিবেচনা করত।"[২৬১]

ইবনে কাসীর শামীর মতো কতিপয় ঐতিহাসিক[২৬২] জোর দিয়ে বলেছেন, "হযরত আবু বকর ও হযরত উমরের ইসলাম ধর্ম গ্রহণের প্রভাব হযরত হামযার ইসলাম গ্রহণের প্রভাবের চেয়ে কোন অংশে কম ছিল না। এ দুই খলীফার ইসলাম ধর্ম গ্রহণ মুসলমানদের মান- মর্যাদা ও মনোবল বৃদ্ধি এবং তাদের স্বাধীনতা ও মুক্তির উপায় হয়েছিল।"তবে নিঃসন্দেহে প্রতিটি ব্যক্তি তাঁর যোগ্যতা অনুসারে ইসলাম ধর্মের প্রচার ও প্রভাব বিস্তার করার ক্ষেত্রে ভূমিকা রেখেছেন। তবে কখনই এ কথা বলা সম্ভব নয় যে, হযরত হামযার ইসলাম ধর্ম গ্রহণের প্রভাব ও ফলাফল যে মাত্রায় দৃষ্টিগোচর হয়েছিল ঠিক সেই মাত্রায় এ দু'খলীফার ইসলাম ধর্ম গ্রহণের প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়েছে। কারণ হামযাহ্ ছিলেন ঐ ব্যক্তি যখন তিনি জানতে পারলেন যে, কুরাইশ নেতা আবু জাহল মহানবী সম্পর্কে অশালীন উক্তি করেছে তখন তিনি কোন ব্যক্তিকে তাঁর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে সম্পর্কে অবহিত না করেই হযরত মুহাম্মদ (সা.)- এর ওপর আঘাতকারী ব্যক্তির কাছে সরাসরি গিয়েছেন এবং তীব্র প্রতিশোধ গ্রহণ করেছেন। তখন কোন ব্যক্তি তাঁর সাথে দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষে লিপ্ত হওয়ার সাহস পর্যন্ত করে নি। কিন্তু ইবনে হিশামের মতো বড় বড় সীরাত রচয়িতাগণ আবু বকর সম্বন্ধে এমন বিষয়ও বর্ণনা করেছেন যে, যে দিন হযরত আবু বকর মুসলমানদের পরামর্শস্থলে উপস্থিত হয়েছিলেন সেদিন না তিনি নিজেকে রক্ষা করতে পেরেছিলেন, না তিনি মহানবী (সা.)- কে রক্ষা করতে পেরেছিলেন। নিম্নে আমরা ঘটনাটি বর্ণনা করব :

একদিন মহানবী (সা.) কুরাইশদের সমাবেশের পাশ দিয়ে গমন করছিলেন। হঠাৎ একত্রে কুরাইশগণ চতুর্দিকে থেকে তাঁকে ঘিরে ধরল এবং সবাই ব্য ছলে মহানবীর সাথে প্রতিমা ও কিয়ামত দিবসের ব্যাপারে কথা বলা শুরু করে এবং বলতে থাকে, "তুমিই কি এরকম কথা বল?" মহানবী (সা.) তাদের কথার প্রত্যুত্তরে বলেছিলেন, نعم أنا الّذي أقول ذلك "হ্যাঁ, আমিই এসব কথা বলি।"যেহেতু কুরাইশগণ দেখতে পেল যে, মহানবী (সা.)- কে রক্ষা করবে এমন কোন ব্যক্তি ময়দানে নেই তখন তারা মহানবীকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলে। তাদের মধ্য থেকে এক

ব্যক্তি সামনে এসে মহানবীর পোশাকের প্রান্ত ধরলে পাশে দণ্ডায়মান আবু বকর মহানবীর সাহায্যার্থে কাঁদতে কাঁদতে ছুটে গেলেন এবং তিনি বলেছিলেন,

أ تقتلون رجلا أن يقول ربّي الله "তোমরা কি এমন এক ব্যক্তিকে 'আমার প্রভু আল্লাহ্' - এ কথা বলার জ   হত্যা করতে চাও?" এরপর (বিভিন্ন কারণবশত) তারা মহানবীকে হত্যার পরিকল্পনা বাদ দেয়। মহানবী (সা.) নিজ পথে গমন করলেন এবং হযরত আবু বকর ঐ অবস্থায় নিজ গৃহমুখে রওয়ানা হলেন যখন তাঁর মাথা ফেটে গিয়েছিল।[২৬৩]

এ ঐতিহাসিক বর্ণনা যতটা মহানবীর প্রতি খলীফা আবু বকরের ভক্তি, ভালোবাসা ও আবেগের সাক্ষ্য দেয় তার চেয়ে ঢের বেশি খলীফা আবু বকরের অক্ষমতা ও দুর্বলতাকে বলিষ্ঠভাবে তুলে ধরে। এ ঘটনা থেকে যে বিষয়টি প্রমাণিত হয় তা হলো : ঐ দিন খলীফা আবু বকর না শক্তি ও ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন, আর না তিনি তেমন কোন সামাজিক ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন। আবার যেহেতু মহানবী (সা.)- এর বিরুদ্ধে যে কোন পদক্ষেপ গ্রহণের পরিণতি খুব খারাপ ছিল এ কারণেই কুরাইশগণ তাঁকে ছেড়ে দিয়ে তাঁর সহযোগীকে তীব্রভাবে মারধর করেছিল এবং তাঁর মাথা ফাটিয়ে দিয়েছিল। যখনই আপনারা হযরত হামযাহ্ ও তাঁর সাহস, বিক্রম ও বীরত্বের ঘটনাটি এ ঘটনার পাশাপাশি তুলনা করবেন তখন আপনারাই ফায়সালা করতে পারবেন যে, ইসলামের প্রাথমিক যুগে আসলে এ দু'ব্যক্তির মধ্যে কার ইসলাম ধর্ম গ্রহণের ফলে ইসলাম ধর্মের সম্মান ও শক্তি এবং কাফিরদের ভয়- ভীতি ও দুশ্চিন্তার উদ্ভব হয়েছিল।

অতিসত্বর আপনারা হযরত উমরের ইসলাম ধর্ম গ্রহণের ঘটনাটি পড়বেন। তাঁর ইসলাম ধর্ম গ্রহণ তাঁর পুরানো বন্ধুর (আবু বকর) ইসলাম ধর্ম গ্রহণের মতোই মুসলমানদের প্রতিরক্ষা ক্ষমতা বৃদ্ধি করে নি এবং তাদেরকে শক্তিশালী করে নি। যে দিন তিনি (উমর) ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন সে দিন যদি আস ইবনে ওয়ায়েল না থাকত তাহলে খলীফা উমরের প্র ত ও নিহত হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল। কারণ যে দলটি হযরত উমরের প্রাণনাশ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল তিনি তাদেরকে সম্বোধন করে বলেছিলেন,

رجل اختار لنفسه أمرا فماذا تريدون؟ أترون بني عدي بن كعب يسلمون لكم صاحبه هكذا؟

" যে ব্যক্তি নিজের জ   একটি ধর্ম পছন্দ ও গ্রহণ করেছে তার কাছে তোমরা কি চাও? তোমরা কি ভাবছ যে, আদী বিন কাবের গোত্র তাকে এত সহজেই তোমাদের কাছে সোপর্দ করবে?"[২৬৪]

এ কথা থেকে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, তাঁর গোত্রকে ভয় পাওয়ার কারণে কুরাইশগণ তাঁর ওপর থেকে হাত তুলে নিয়েছিল এবং নিজেদের আত্মীয়- স্বজনকে গোত্রসমূহ কর্তৃক রক্ষা করার বিষয়টি একটি স্বভাব- প্রকৃতিগত সাধারণ আনুষ্ঠানিকতায় পরিণত হয়েছিল যে ক্ষেত্রে ছোট- বড় সকল মানুষই সমান।

হ্যাঁ, মুসলমানদের প্রতিরক্ষার প্রকৃত ঘাঁটি বা কেন্দ্র ছিল বনি হাশিম গৃহ এবং এ গুরুদায়িত্বভার হযরত আবু তালিব ও তাঁর পরিবারের ওপরই   স্ত ছিল। আর যদি তা না হয় তাহলে যে সব ব্যক্তি মুসলমানদের সাথে যোগ দিয়েছিল এবং ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিল নিজেদেরকে রক্ষা করার মতো তাদের প্রচুর শক্তি ও ক্ষমতা ছিল না। আর তাদের ইসলাম ধর্ম গ্রহণ কিভাবে মুসলমানদের সম্মান ও মর্যাদা বৃদ্ধির কারণ হতে পারে?

মহানবী (সা.)- এর পিছনে আবু জাহলের ওঁৎ পেতে থাকা

ইসলাম ধর্মের উত্তরোত্তর প্রসার ও উন্নতি কুরাইশদেরকে তীব্রভাবে অসন্তুষ্ট করেছিল। প্রতিদিনই কুরাইশ বংশীয় কোন না কোন ব্যক্তির ইসলাম ধর্ম গ্রহণের সংবাদ তাদের কাছে পৌঁছত। এর ফলে তাদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভ ও ক্রোধের অি শিখা ছড়িয়ে পড়তে থাকে। মক্কা নগরীর ফিরআউন বলে খ্যাত আবু জাহল একদিন কুরাইশদের সমাবেশে বলেই ফেলল,

إنّ محمّدا قد أتى ما ترون من عيب ديننا و شتم أبائنا و تسفيه أحلامنا و شتم آلهتنا

“ (হে কুরাইশগণ!) তোমরা কি দেখছ না যে, মুহাম্মদ কিভাবে আমাদের ধর্মকে মন্দ বলে বিবেচনা করছে। আমাদের বাপ- দাদা অর্থাৎ পূর্বপুরুষদের ধর্ম এবং তাদের দেবতাদেরকে মন্দ বলছে এবং আমাদেরকে নির্বোধ ও বুদ্ধিহীন বলে গণ্য করছে। মহান আল্লাহর শপথ, আমি আগামীকালই তার জ ওঁৎ পেতে বসে থাকব এবং আমার পাশে একটি পাথর রাখব। মুহাম্মদ যখন সিজদাহ্ করবে তখন ঐ পাথরটি দিয়ে তার মাথা ফাটিয়ে দেব।”[২৬৫]

পরের দিন মহানবী (সা.) নামায পড়ার জ মসজিদুল হারামে আসলেন এবং রুকনে ইয়েমেনী ও হাজারে আসওয়াদের মাঝখানে নামাযে দাঁড়ালেন। একদল কুরাইশ আবু জাহলের দুরভিসন্ধি সম্পর্কে জ্ঞাত ছিল। আবু জাহল কি এ প্রতিরোধ সংগ্রামে শেষ পর্যন্ত সফল ও বিজয়ী হতে পারবে- এ ব্যাপারে তারা চিন্তাম হয়েছিল। মহানবী সিজদাহ্ করার জ মাটির ওপর মাথা রাখলেন। ঐ পুরানো শত্রু লুকিয়ে ওঁৎ পেতে থাকার স্থান থেকে বেরিয়ে আসল এবং মহানবীর দিকে এগিয়ে গেল। তবে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই তার অন্তরের মধ্যে এক আশ্চর্যজনক ভীতির সঞ্চার হলো। সে ভয় পেয়ে কাঁপতে কাঁপতে পাংশুটে মুখ নিয়ে কুরাইশদের কাছে ফিরে গেল। সবাই দৌঁড়ে এসে জিজ্ঞাসা করল, “হে আবুল হাকাম! কী খবর?” সে খুব দুর্বল কে বলল, “এমন এক দৃশ্য আমার সামনে ফুটে উঠেছিল যা আমি আমার সমগ্র জীবনেও দেখি নি। এ কারণে আমি আমার সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করেছি।” আবু জাহলের এ উক্তিটি থেকে প্রমাণিত হয় যে, সে এ ক্ষেত্রে কতটা ভীত ও আতংকগ্রস্ত হয়েছিল!

এ ক্ষেত্রে কোন সন্দেহ নেই যে, মহান আল্লাহর আদেশে একটি গায়েবী শক্তি মহানবীর সাহায্যার্থে অগ্রসর হয়ে এ ধরনের ভীতিকর দৃশ্যের অবতারণা করেছিল এবং মহানবী (সা.)- এর অস্তিত্বকে মহান আল্লাহরই প্রদত্ত অকাট্য ঐশী অ ীকার অনুযায়ী শত্রুদের দংশন থেকে হেফাজত করেছিল। এ ক্ষেত্রে মহান আল্লাহ্ কর্তৃক ওয়াদাটি أنّا كفيناك المستهزئين 'আমরা ব্য - বি পকারীদের অনিষ্ট থেকে তোমাকে রক্ষা করব ' - এ আয়াতে উল্লিখিত হয়েছে।

কুরাইশদের অকথ্য উৎপীড়ন ও নির্যাতনের কাহিনীর নমুনাগুলো ইতিহাসের পাতায় লিপিবদ্ধ হয়েছে। ইবনে আসীর[২৬৬] এ প্রস েএকটি স্বতন্ত্র অধ্যায়ের অবতারণা করেছেন। তিনি মক্কায় মহানবীর ভীষণ একগুঁয়ে শত্রুদের নাম এবং তাদের বিভিন্ন ধরনের উৎপীড়ন ও নির্যাতনপদ্ধতির একটি বর্ণনা দিয়েছেন। যা কিছু ওপরে উল্লিখিত হয়েছে তা ছিল আসলে কয়েকটি নমুনা মাত্র। তবে মহানবী (সা.) প্রতিদিনই নতুন করে বিশেষ ধরনের উৎপীড়ন ও নির্যাতনের শিকার হতেন। যেমন একদিন উকবা ইবনে আবু মুঈত মুহাম্মদ (সা.)- কে তাওয়াফরত অবস্থায় দেখে বেশ গালিগালাজ করল। তাঁর মাথার পাগড়ি তাঁর গর্দানে পেঁচিয়ে তাঁকে মসজিদুল হারামের বাইরে আনলে বনি হাশিমের ভয়ে একদল লোক মহানবী (সা.)- কে তার হাত থেকে মুক্ত করেছিল।[২৬৭]

মহানবী (সা.) তাঁর নিজ চাচা আবু লাহাব ও তার স্ত্রী উম্মে জামীলের পক্ষ থেকে যে উৎপীড়ন ও নির্যাতনের শিকার হয়েছিলেন তা ছিল সত্যিই বেদনাদায়ক। মহানবী (সা.)- এর বাড়ি তাদের বাড়ির পাশেই ছিল। তারা মহানবীর পবিত্র মাথা ও বদনমণ্ডলে ময়লা- আবর্জনা ফেলতে দ্বিধাবোধ করত না। একদিন তারা তাঁর মাথার ওপর একটি দুম্বার জরায়ু নিক্ষেপ করেছিল। অবশেষে অবস্থা এমন এক পর্যায়ে উপনীত হয়েছিল যে, হযরত হামযাহ্ প্রতিশোধ গ্রহণের জ ঠিক ঐ জিনিসই আবু লাহাবের মাথার ওপর ফেলেছিল।

মুসলমানদের ওপর উৎপীড়ন ও নির্যাতন

নবুওয়াতের শুরুতেই ইসলামের যে অগ্রগতি সাধিত হয়েছিল তার পেছনে বেশ কিছু কারণ ছিল। তন্মধ্যে একটি কারণ হচ্ছে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এবং তাঁর স ী- সাথী ও সমর্থকদের দৃঢ়তা। আপনারা ইতোমধ্যে মুসলমানদের নেতৃবর্গের ধৈর্য ও সহনশীলতার কতিপয় উদাহরণের সাথে পরিচিত হয়েছেন। পবিত্র মক্কায় (যা ছিল শিরক ও মূর্তিপূজার কেন্দ্রবি) তাঁর যে সব সমর্থক জীবনযাপন করতেন তাঁদের ধৈর্য ও সহনশীলতাও ছিল বেশ প্রশংসনীয়। হিজরতোত্তর ঘটনাবলীর অধ্যায়সমূহে আপনারা তাঁদের ত্যাগ ও দৃঢ়তার কথা শুনবেন। এখন পবিত্র মক্কার অসহায় পরিবেশে মহানবী (সা.)- এর যে কয়জন ত্যাগী স ী অবর্ণনীয় কষ্ট ভোগ করেছেন অথবা নির্যাতন ভোগ করার পর ধর্ম প্রচারের জ পবিত্র মক্কা নগরী ত্যাগ করেছেন তাঁদের জীবনী আমরা বিশ্লেষণ করব :

১ .**বিলাল হাবাশী**: তাঁর পিতামাতা ঐ ব্যক্তিবর্গের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন যাঁদেরকে হাবাশাহ্ (আবিসিনিয়া) থেকে জাযীরাতুল আরব অর্থাৎ আরব উপদ্বীপে বন্দী করে আনা হয়েছিল। বিলাল যিনি পরে মহানবী (সা.)- এর মুয়াযযিন হয়েছিলেন তিনি উমাইয়্যা বিন খালাফের ক্রীতদাস ছিলেন। উমাইয়্যা হযরত মুহাম্মদ (সা.)- এর খুব বড় ভয় র শত্রু ছিল। যেহেতু বনি হাশিম মহানবী (সা.)- এর নিরাপত্তা ও রক্ষার দায়িত্বভার গ্রহণ করেছিল, তাই সে প্রতিশোধপরায়ণ হয়ে তার সদ্য ইসলাম ধর্ম গ্রহণকারী ক্রীতদাসকে প্রকাশ্যে নির্যাতন করত। সে তাঁকে সবচেয়ে তপ্ত দিনগুলোতে খালি শরীরে তপ্ত বালুর ওপর শুইয়ে তাঁর বুকের ওপর একটি প্রকাণ্ড তপ্ত পাথর চাপা দিয়ে রাখত এবং তাকে নিম্নোক্ত কথাগুলো বলত :

لا تزالُ هكذا حتّى تموت أوْ تكفرَ بمُحمّدٍ و تعبدَ اللاّتَ و العُزّى

" তোমার মৃত্যু হওয়া পর্যন্ত অথবা মুহাম্মদের ষ্টায় অবি াস অথবা লাত ও উজ্জার ইবাদাত না করা পর্যন্ত তুমি এ অবস্থায় থাকবে। "

কিন্তু বিলাল এতসব উৎপীড়ন ও নির্যাতন সত্ত্বেও দু'টি কথার মাধ্যমে উত্তর দিয়েছিলেন যা ছিল তাঁর দৃঢ় ঈমানী শক্তি ও প্রবল প্রতিরোধের পরিচায়ক। তিনি বলতেন, أحدٌ أحدٌ "আহাদ! আহাদ (অর্থাৎ মহান আল্লাহ্ এক ও অদ্বিতীয়)! আমি কখনই শিরক ও মূর্তিপূজার দিকে প্রত্যাবর্তন করব না।" এ কৃষ্ণা দাস যিনি পাষণ্ড দয় উমাইয়্যার হাতে বন্দী ছিলেন তাঁর দৃঢ়তা ও তীব্র প্রতিরোধ অ দেরকে আশ্চর্যান্বিত করেছিল, এমনকি ওয়ারাকাহ্ ইবনে নওফেল তাঁর অতি দুরবস্থা দর্শন করে কেঁদেছিলেন এবং উমাইয়্যাকে বলেছিলেন, "মহান আল্লাহর শপথ, যদি তুমি তাকে (বিলাল) এ অবস্থায় হত্যা করে ফেল তাহলে আমি তার সমাধিকে যিয়ারত গাহে (মাযার) পরিণত করব।"[২৬৮]

কখনো কখনো উমাইয়্যা অতি নিষ্ঠুর আচরণ প্রদর্শন করত। সে বিলালের ঘাড়ে মোটা রশি বেঁধে তাকে বালকদের হাতে তুলে দিত। আর ঐসব বালক তাকে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরাত।[২৬৯]

ইসলামের প্রথম যুদ্ধ বদরে উমাইয়্যা তার পুত্রসহ বন্দী হয়েছিল। কতিপয় মুসলমান উমাইয়্যার হত্যার পক্ষে মত না দিলে বিলাল বলেছিলেন, সে কুফর ও কাফিরদের নেতা। তাই তাকে হত্যা করা উচিত। আর তাঁর পীড়াপীড়ি করার কারণে উমাইয়্যা ও তৎপুত্রকে তাদের নিজেদের অত্যাচারমূলক কার্যকলাপের শাস্তিস্বরূপ হত্যা করা হয়।

২ .**আম্মার ইবনে ইয়াসির ও তাঁর পিতা -মাতা**: আম্মার ও তাঁর পিতামাতা (ইয়াসির ও সুমাইয়া) ইসলাম গ্রহণকারী অগ্রবর্তীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)- এর দীন প্রচার কেন্দ্র যখন আরকাম ইবনে আবি আরকামের বাড়িতে ছিল তখন তাঁরা (আম্মার ও তাঁর পিতা-মাতা) ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। মুশরিকরা যেদিন তাঁদের ঈমান আনয়ন ও ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার বিষয়টি জানতে পারল তখন তারা তাঁদের ওপর নির্যাতন ও উৎপীড়ন চালাতে মোটেও কু াবোধ করল না। ইবনে আসীর লিখেছেন, "মুশরিকরা এ তিন ব্যক্তিকে দিনের সবচেয়ে উত্তপ্ত মুহূর্তে তাঁদের নিজেদের বাড়ী ঘর ছেড়ে মরুভূমির তপ্ত উষ্ণ বাতাস ও প্রখর রৌদ্রতাপের মধ্যে অবস্থান করতে বাধ্য করত। এ সব শারীরিক নির্যাতনের এতটা পুনরাবৃত্তি করা হতো যে, এর ফলে ইয়াসির প্রাণত্যাগ করেন। একদিন ইয়াসিরের স্ত্রী সুমাইয়া এ ব্যাপারে আবু

জাহলের সাথে ঝগড়া করেছিলেন। তখন ঐ পাষণ্ড দয় ব্যক্তিটি বর্শা নিয়ে সুমাইয়ার বক্ষে আঘাত করে তাঁকে হত্যা করে। এ নারী ও পুরুষের অতি শোচনীয় এ অবস্থা মহানবীকে তীব্রভাবে দুঃখভারাক্রান্ত করেছিল। একদিন মহানবী (সা.) এ দৃশ্য দেখে অশ্রুসিক্ত নয়নে তাঁদের দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন, "হে ইয়াসির পরিবার! ধৈর্যধারণ কর। কারণ তোমাদের স্থান হচ্ছে বেহেশত। "

ইয়াসির ও তাঁর স্ত্রীর মৃত্যুর পর আম্মারের সাথে তারা অত্যন্ত কঠোর আচরণ করে এবং তাঁকেও বিলালের মত নির্যাতন করতে থাকে। তিনি তাঁর প্রাণ রক্ষা করার জ   বাহ্যত ইসলাম ত্যাগ করতে বাধ্য হন। কিন্তু সাথে সাথে তিনি অনুতপ্ত হন এবং অশ্রুসিক্ত নয়নে মহানবী (সা.)- এর কাছে ছুঁটে আসেন। ঐ সময় তিনি অত্যন্ত দুঃখভারাক্রান্ত ছিলেন। তিনি মহানবীর কাছে গিয়ে পুরো ঘটনা সবিস্তারে বর্ণনা করেন। রাসূলে আকরাম (সা.) তাঁকে তখন জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "তখন তোমার অভ্যন্তরীণ (আত্মিক) ঈমানে কি সামা তম দ্বিধা দেখা দিয়েছিল?" তিনি বললেন, "আমার দয় তখন ঈমানে পরিপূর্ণ ছিল।"রাসূল বললেন, "একটুও ভয় পেয়ো না। আর তাদের অনিষ্ট থেকে বাঁচার জ   তোমার ঈমান গোপন রেখ।"তখন এ আয়াতটি আম্মারের ঈমান প্রসে অবতীর্ণ হয়েছিল,

(إِلّا مَنْ أُكرِهَ و قلبُهُ مطمئنٌ بالأيمان)

"তবে যাকে বাধ্য করা হয়েছে, অথচ যার অন্তর ঈমানে পূর্ণ ছিল সে ব্যতীত।"(সূরা নাহল : ১০৬)

এটিই প্রসিদ্ধ যে, ইয়াসির পরিবার যাঁরা ছিলেন সবচেয়ে অসহায় তাঁদের ব্যাপারে আবু জাহল নির্যাতন ও উৎপীড়ন করার সিদ্ধান্ত নিল। এ কারণে সে আগুন ও চাবুক প্রস্তুত করার নির্দেশ দিল। তখন ইয়াসির, সুমাইয়া ও আম্মারকে টেনে- হিঁচড়ে সেখানে নিয়ে যাওয়া হলো এবং খঞ্জরের আঘাত দিয়ে, প্র লিত আগুনে পুড়িয়ে এবং চাবুক মেরে তাঁদেরকে শাস্তি দেয়া হলো। এ ঘটনার এতবার পুনরাবৃত্তি করা হয় যে, এর ফলে সুমাইয়া ও ইয়াসির প্রাণত্যাগ করেন।

কুরাইশ যুবকগণ যারা এ ধরনের ভয় র লোমহর্ষক দৃশ্য প্রত্যক্ষ করেছিল তারা ইসলাম ধর্মের ধ্বংস সাধন করার ব্যাপারে তাদের যত অভিন্ন স্বার্থ ছিল তা সত্ত্বেও আম্মারকে ক্ষত- বিক্ষত দেহে আবু জাহলের নির্যাতন ও শাস্তি থেকে মুক্তি দিয়েছিল যাতে করে তিনি তাঁর নিহত পিতা- মাতার মৃতদেহ দাফন করতে পারেন।

৩ .**আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ**: যে সব মুসলমান ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিল তারা পরস্পর আলাপ- আলোচনা করছিল যে, কুরাইশরা পবিত্র কোরআন সম্পর্কে শোনে নি। যদি আমাদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি মসজিদুল হারামে গিয়ে যত উচ্চকে সম্ভব পবিত্র কোরআনের গুটিকতক আয়াত তেলাওয়াত করে তাহলে সেটি খুব ভালো হবে। আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ অত্যন্ত সুললিত ও বলিষ্ঠ কে (সূরা আর রাহমানের) নিম্নোক্ত আয়াতগুলো তেলাওয়াত করেন,

(بسم اللهِ الرَّحمان الرَّحيم، الرَّحْمانُ علّمَ الْقُرْآنَ خَلَقَ الإنْسان علّمهُ البَيانَ...)

" পরম করুণাময় ও পরম দাতা মহান আল্লাহর নামে। পরম করুণাময় (মহান আল্লাহ্) পবিত্র কোরআন শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। মানুষকে তিনি ভাষা ও কথা বলা শিক্ষা দিয়েছেন ...।"

এ সূরার বলিষ্ঠ ও সাবলীল বাক্যগুলো কুরাইশ নেতৃবৃন্দের মধ্যে এক আশ্চর্যজনক ভীতির সঞ্চার করল। একজন অসহায় ব্যক্তির মাধ্যমে যে আসমানী আহবান তাদের কর্ণকুহরে পৌঁছেছিল তার প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া প্রতিহত করার জ সকলে তাদের স্থান ছেড়ে উঠে দাঁড়াল এবং তাঁকে এতটা প্রহার করল যে, তাঁর সমগ্র দেহ থেকে রক্ত প্রবাহিত হতে লাগল এবং তিনি খুব মর্মান্তিক অবস্থার মধ্য দিয়ে মহানবী (সা.)- এর সাহাবীদের কাছে ফিরে গেলেন। তবে তাঁরা সবাই সন্তুষ্ট ছিলেন এ কারণে যে, অবশেষে পবিত্র কোরআনের জীবনসঞ্জীবনী আহবান শত্রুদের কর্ণে প্রবেশ করল।[২৭০]

ইসলাম ধর্মের যে সব ত্যাগী সৈনিক নবুওয়াতের সূচনালে অত্যন্ত কঠিন অবস্থার মধ্যে থেকে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের পথে দৃঢ়তার পরিচয় দিয়েছিলেন তাঁদের সংখ্যা আসলে এর চেয়ে অনেক বেশি। কিন্তু সংক্ষেপে এতটুকুই যথেষ্ট।

৪ .**আবু যার**: আবু যার ছিলেন চতুর্থ অথবা পঞ্চম মুসলমান।[২৭১] অতএব, তিনি ইসলাম ধর্মের আবির্ভাবের প্রথম দিনগুলোতেই ইসলাম ধর্ম কবুল করেছিলেন এবং ইসলাম ধর্ম গ্রহণের ক্ষেত্রে অগ্রবর্তীদের অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য হয়েছেন।

পবিত্র কোরআনের স্পষ্ট বর্ণনা অনুসারে, মহানবী (সা.)- এর নবুওয়াত ও রিসালাতের সূচনালগ্নে যাঁরা ঈমান এনেছেন ইসলামে তাঁদের বিরাট মর্যাদা রয়েছে।[২৭২] আর যাঁরা পবিত্র মক্কা বিজয়ের আগে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছেন, আধ্যাত্মিক ফজীলত, মর্তবা ও মর্যাদার দিক থেকে তাঁরা যে সব ব্যক্তি ইসলামের প্রসার ও শক্তি অর্জনের পরে অর্থাৎ পবিত্র মক্কা বিজয়ের পরে ঈমান এনেছে তারা এক নয়। পবিত্র কোরআন এ সত্যটি বর্ণনা করেছে নিম্নোক্ত এ আয়াতে:

(لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين انفقوا من بعدُ وقاتلوا)

"তোমাদের মধ্য থেকে যারা মক্কা বিজয়ের আগে (মহান আল্লাহর পথে) দান করেছে এবং জিহাদ করেছে তারা ঐ সব ব্যক্তি অপেক্ষা অধিকতর উচ্চ মর্যাদার অধিকারী যারা মক্কা বিজয়ের পরে দান করেছে এবং জিহাদ করেছে।"(সূরা হাদীদ : ১০)

ইসলামের প্রথম আহবানকারী

আবু যার যখন ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন তখন মহানবী (সা.) জনগণকে গোপনে ইসলাম ধর্মের দিকে আহবান করতেন। তখনও ইসলামের প্রকাশ্য দাওয়াতের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয় নি। সে সময় ইসলামের অনুসারীদের সংখ্যা মহানবী (সা.) এবং যে পাঁচজন তাঁর প্রতি ঈমান এনেছিলেন তাঁদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। এ সব পরিস্থিতি বিচার করে বাহ্যত আবু যারের কাছে তাঁর নিজ ঈমান গোপন রাখা এবং নীরবে পবিত্র মক্কা নগরী ত্যাগ করে নিজ গোত্রের দিকে প্রত্যাবর্তন করা ব্যতীত আর কোন পথই খোলা ছিল না।

কিন্তু আবু যার ছিলেন বি বী আবেগ ও সংগ্রামী মনোবৃত্তির অধিকারী; যেন তাঁকে সৃষ্টিই করা হয়েছে এতদুদ্দেশ্যে যে, তিনি যেখানেই থাকবেন সেখানেই মিথ্যার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করবেন এবং বিচ্যুতি ও পথভ্রষ্টতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করবেন। কতগুলো নি প্রাণ কাঠ ও পাথর নির্মিত প্রতিমাসমূহের সামনে মানুষের কুর্নিশ ও সিজদাবনত হওয়ার চেয়ে বড় আর কোন মিথ্যা থাকতে পারে কি?

আবু যার এ অবস্থা মেনে নিতে পারছিলেন না। এ কারণেই পবিত্র মক্কায় সংক্ষিপ্ত (সময়ের জ) অবস্থান করার পর একদিন তিনি মহানবী (সা.)- কে বললেন, "আমি কি করব এবং আমার জ আপনি কোন দায়িত্ব নির্ধারণ করে দেবেন কি?"

মহানবী বললেন, "তুমি তোমার গোত্রের ইসলামের একজন মুবাল্লিগ (প্রচারক) হতে পার। এখন তুমি তোমার নিজ গোত্রের কাছে ফিরে যাও এবং আমার পক্ষ থেকে পরবর্তী নির্দেশ আসা পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করতে থাক।"

আবু যার বললেন, "মহান আল্লাহর শপথ, আমার গোত্রের কাছে প্রত্যাবর্তনের আগেই এ দেশের জনগণের কানে ইসলামের আহবানধ্বনি পৌঁছে দেব এবং এই বাধাটা অর্থাৎ মক্কায় ইসলাম ধর্ম ও একত্ববাদের মর্মবাণী প্রচার ও প্রসারের পথে বিদ্যমান বাধা অবশ্যই ভে দেব।"

একদিন কুরাইশগণ যখন মসজিদুল হারামে কথাবার্তায় মশগুল ছিল তখন তিনি এ সিদ্ধান্ত মোতাবেক মসজিদুল হারামে প্রবেশ করে অতি উচ্চ ও বলিষ্ঠ কে বললেন,

أشهد أنْ لا إله إلّا اللهُ وأشهدُ أنَّ محمَّداً رسولُ اللهِ

"আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মহান আল্লাহ্ ব্যতীত আর কোন ইলাহ নেই এবং আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, হযরত মুহাম্মদ (সা.) মহান আল্লাহর রাসূল।"

যেহেতু ইসলামের ইতিহাস থেকে প্রতীয়মান হয়ে যায় যে, এ আহবানধ্বনি আসলেই ছিল (জনসমক্ষে ইসলাম ও তাওহীদের) সর্বপ্রথম আহবানধ্বনি যা প্রকাশ্যে কুরাইশদের মর্যাদা ও সম্মানের প্রতি চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছিল। এ আহবান এমন এক আগন্তুক ব্যক্তির মুখ দিয়ে বের হয়েছিল পবিত্র মক্কা নগরীতে যার না ছিল কোন সমর্থক, না ছিল কোন জ্ঞাতি ও আত্মীয়।

ঘটনাক্রমে, মহানবী (সা.) যা ভবি দ্বাণী করেছিলেন বাস্তবে তা- ই ঘটল। আবু যারের এ ধ্বনি মসজিদুল হারামে ধ্বনিত- প্রতিধ্বনিত হলে কুরাইশগণ তাদের সমাবেশস্থল বা আসর থেকে উঠে এসে তাঁর ওপর চড়াও হয়। তাঁকে তারা নির্দয়ভাবে প্রহার করতে থাকে। তারা তাঁকে এতটা মেরেছিল যে, এর ফলে তিনি অজ্ঞান হয়ে মাটিতে পড়ে যান।

মহানবী (সা.)- এর চাচা হযরত আব্বাসের কানে এ সংবাদ পৌঁছলে তিনি ত মসজিদুল হারামে চলে যান এবং তিনি আবু যারের ওপর লুটিয়ে পড়েন। আবু যারকে মুশরিকদের হাত থেকে উদ্ধার করার জ তিনি একটি সুন্দর চালাকির আশ্রয় নেন। তিনি কুরাইশদের লক্ষ্য করে বললেন, "তোমরা সবাই ব্যবসায়ী ও বণিক। তোমাদের বাণিজ্যিক রুট গিফার গোত্রের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করেছে। এ যুবকটি গিফার গোত্রের। সে যদি নিহত হয় তাহলে কুরাইশদের ব্যবসা- বাণিজ্য বিপদগ্রস্ত হয়ে যাবে। তখন আর কোন বাণিজ্যিক কাফেলাই এ গোত্রের মধ্য দিয়ে যাতায়াত করতে পারবে না।"

আব্বাসের এ পরিকল্পনা কাজে আসল। কুরাইশগণ আবু যারকে ছেড়ে দিল। তবে আবু যার ছিলেন অসাধারণ সাহসী ও সংগ্রামী যুবক। পরের দিন তিনি মসজিদুল হারামে প্রবেশ করে পুনরায় ইসলাম ও তাওহীদের স্লোগান দেন। আবারও কুরাইশগণ তাঁর ওপর হামলা করে তাঁকে

মারতে মারতে মৃতবৎ করে ফেলে। এবারও আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব পূর্ব দিনের একই কৌশল অবলম্বন করে তাঁকে কুরাইশদের হাত থেকে রক্ষা করলেন।[২৭৩]

যেভাবে ইতিহাসে বর্ণিত হয়েছে তদনুযায়ী আব্বাস যদি না থাকতেন তাহলে আবু যার মুশরিকদের হাত থেকে রক্ষা পেতেন কি না তা জানা যেত না। কিন্তু আবু যারও এমন ব্যক্তি ছিলেন না যিনি অতি সত্বর ইসলাম ধর্মের বিজয়ের পথে সংগ্রামস্থল থেকে পশ্চাদপসরণ করবেন। এ কারণেই কিছুদিন পর আবু যার নতুন করে সংগ্রাম শুরু করলেন। অর্থাৎ একদিন এক রমণীকে দেখলেন যে, সে কাবাগৃহ তাওয়াফ করার সময় আসাফ (أساف) ও নায়েলাহ্ (نائلة) নামের আরবদের যে দু'টি প্রকাণ্ড মূর্তি পবিত্র কাবার চারপাশে স্থাপন করা হয়েছিল সেগুলো লক্ষ্য করে অন্তরের আর্জি পেশ করছে এবং বিশেষ ধরনের আবেগ ও ভক্তিসহকারে তাদের কাছে হাজত প্রার্থনা করছে।

আবু যার উক্ত নারীর মূর্খতা দেখে খুবই ব্যথিত হলেন। ঐ দু'টি মূর্তির যে কোন অনুভূতি নেই তা ঐ নারীকে বুঝানোর জ   আবু যার তাকে বললেন, "এ দু'টি মূর্তিকে পরস্পর বিবাহ দিয়ে দাও।"

ঐ মহিলাটি আবু যারের কথায় খুবই রাগান্বিত হলো। সে চিৎকার করে বলে উঠল, "তুমি সায়েবী।"[২৭৪] ঐ মহিলার চিৎকার শুনে কুরাইশ বংশীয় যুবকগণ আবু যারের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাঁকে নির্মমভাবে প্রহার করতে লাগল। বনি বকর গোত্রের একদল লোক তাঁর সাহায্যার্থে ছুটে আসল এবং তাঁকে কুরাইশদের হাত থেকে মুক্ত করল।[২৭৫]

গিফার গোত্রের ইসলাম ধর্ম গ্রহণ

মহানবী (সা.) তাঁর নতুন এ শি র যোগ্যতা এবং মিথ্যার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার ক্ষেত্রে তাঁর চোখ ধাঁধানো শক্তি খুব ভালোভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। তবে তখনও তীব্র সংগ্রাম ও প্রতিরোধের সময় হয় নি বলে তিনি আবু যারকে তাঁর নিজ গোত্রে ফিরে গিয়ে তাদের মাঝে ইসলাম ধর্ম প্রচারের নির্দেশ দেন।

আবু যার তাঁর গোত্রের কাছে ফিরে গেলেন। যে নবী মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত হয়েছেন এবং জনগণকে এক- অদ্বিতীয়   ষ্টার ইবাদাত ও উত্তম গুণাবলী অর্জন করার দিকে আহবান জানাচ্ছেন তাঁর আবির্ভাবের ব্যাপারে ধীরে ধীরে তাদের সাথে আলোচনা করলেন।

প্রথমে আবু যারের ভাই ও মা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। পরে গিফার গোত্রের অর্ধেক লোকই মুসলমান হয়ে গেল। মহানবী (সা.)- এর মদীনায় হিজরত করার পর গিফার গোত্রের অবশিষ্ট অর্ধেক লোকও ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। আসলাম গোত্রও গিফার গোত্রের পদা   অনুসরণ করে মদীনায় মহানবীর সান্নিধ্যে উপস্থিত হয়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিল।

হযরত আবু যার বদর ও উ দ যুদ্ধের পর মদীনায় মহানবী (সা.)- এর সাথে মিলিত হন এবং সেখানেই তিনি বসবাস করতে লাগলেন।[২৭৬]

হযরত মুহাম্মদ (সা.)- এর শত্রুগণ

হিজরতোত্তর যে সব ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল সে সব ঘটনার মধ্যে গুটিকতক ঘটনার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করার ক্ষেত্রে মহানবী (সা.)- এর কতিপয় শত্রুর পরিচিতি গুরুত্বহীন হবে না। আমরা এখানে সংক্ষেপে কতিপয় শত্রুর নাম ও বিশেষত্বগুলো তুলে ধরব :

১ .**আবু লাহাব** : মহানবী (সা.)- এর প্রতিবেশী ছিল। সে কখনই মহানবী ও মুসলমানদের প্রত্যাখ্যান ও নির্যাতন করা থেকে বিরত থাকত না।

২ .**আসওয়াদ ইবনে আবদ ইয়াঘূস** : সে ছিল একজন ভাঁড়। যখনই সে কোন নিঃস্ব ও সহায়- সম্বলহীন মুসলমানকে দেখতে পেত তখনই সে ভাঁড়ামিবশত বলত, "এসব নিঃস্ব সহায়- সম্বলহীন নিজেদেরকে পৃথিবীর বুকে বাদশাহ্ বলে মনে করে এবং ভাবছে যে, তারা শীঘ্রই ইরানের শাহের রাজমুকুট ও সিংহাসন দখল করে নেবে।" তবে মৃত্যু তাকে দেখার সুযোগ দেয় নি যে, মুসলমানরা কিভাবে কায়সার (রোমসম্রাট) ও কিসরার (পারস্যসম্রাট) রাজত্ব ও সাম্রাজ্যের অধিপতি হয়েছে!

৩ .**ওয়ালীদ ইবনে মুগীরাহ্**: সে ছিল কুরাইশ বংশীয় বৃদ্ধ ধনাঢ্য ব্যক্তি যার ছিল অঢেল সম্পত্তি। মহানবী (সা.)- এর সাথে তার আলোচনা আগামী অধ্যায়ে আমরা বর্ণনা করব।

৪ .**উমাইয়্যা ইবনে খালাফ এবং উবাই ইবনে খালাফ**: একদিন উবাই নরম ও পঁচে যাওয়া হাড় গুলো হাতে নিয়ে মহানবীকে উদ্দেশ্য করে বলেছিল, إنَّ ربَّك يُحيي هذه العظامَ "তোমার প্রভু কি এ সব অস্থি পুনরুজ্জীবিত করবেন?" তখন মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহী অবতীর্ণ হলো :

(قل يحييها الّذي أنشأها أوّل مرّةٍ)

"আপনি বলে দিন, প্রথমবার যিনি তা সৃষ্টি করেছেন তিনিই তা পুনরুজ্জীবিত করবেন।"(সূরা ইয়াসীন : ৭৮- ৭৯)

এ দু'ভ্রাতা বদর যুদ্ধে নিহত হয়েছিল।

৫ .**আবুল হাকাম বিন হিশাম**: ইসলাম ধর্মের প্রতি তার অযৌক্তিক শত্রুতা ও বিদ্বেষের কারণে মুসলমানরা আবুল হাকাম ইবনে হিশামকে আবু জাহল (মূর্খের পিতা) বলে অভিহিত করেছিল। সেও বদর যুদ্ধে নিহত হয়েছিল।

৬ .**আস ইবনে ওয়ায়েল**: সে আমর ইবনে আসের পিতা যে মহানবীকে আবতার বা নির্বংশ বলেছিল।

৭ .**উকবাহ্ ইবনে আবি মুঈত**: সে মহানবী (সা.)- এর ভয় র শত্রুদের মধ্যে অ তম ছিল। সে মহানবী ও মুসলমানদের ওপর জুলুম করা থেকে মুহূর্তের জ ও বিরত থাকত না।[২৭৭]

আবু সুফিয়ানের মতো আরো একদল ব্যক্তি রয়েছে যাদের সকল চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ঐতিহাসিকগণ লিপিবদ্ধ করেছেন। আর আমরা বর্ণনা সংক্ষেপ করার জ তা এখানে উল্লেখ করা থেকে বিরত থাকলাম।

দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমরের ইসলাম গ্রহণ

প্রত্যেক মুসলমানের ইসলাম ধর্ম গ্রহণের পেছনে কোন না কোন কারণ ছিল। কখনো কখনো ছোট একটি ঘটনা কোন ব্যক্তি বা দলের ইসলাম ধর্ম গ্রহণের কারণ হয়েছে। ইত্যবসরে দ্বিতীয় খলীফার ইসলাম ধর্ম গ্রহণের ঘটনাও অত্যন্ত আকর্ষণীয়। যদিও ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর ক্রমধারাবাহিকতার দৃষ্টিকোণ থেকে দ্বিতীয় খলীফা উমরের ইসলাম ধর্ম গ্রহণের বিষয়টি হাবাশায় মহানবী (সা.)- এর সাহাবীদের হিজরত করার পরে উল্লেখ করা প্রয়োজন ছিল, কিন্তু যেহেতু এ ক্ষেত্রে মহানবীর সাহাবীদের কথা উত্থাপিত হয়েছে তাই ইসলামের দিকে দ্বিতীয় খলীফা উমর কিভাবে ঝুঁকলেন সেই কাহিনীটিই আমরা এখানে উল্লেখ করব।

ইবনে হিশাম লিখেছেন : হযরত উমরের পিতা খাত্তাবের পরিবারে কেবল তার মেয়ে ফাতিমা এবং তাঁর স্বামী সাঈদ ইবনে যাইদ ঈমান এনেছিলেন। ইসলামের সূচনালে ই মুসলমানদের সাথে উমরের সম্পর্ক এতটা তিমিরাচ্ছন্ন ছিল যে, তিনি মহানবীর ভয়ানক শত্রু হিসাবে গণ্য হতেন। এ কারণেই খলীফার বোন ও তাঁর স্বামী সব সময় তাঁদের মুসলমান হওয়ার বিষয়টি তাঁর কাছে গোপন রাখতেন। এতদসত্ত্বেও খুবাব বিন আরত কতগুলো সময় ও উপলক্ষে তাঁদের বাড়িতে আসতেন এবং তাঁদের দু’জনকে পবিত্র কোরআন শিখাতেন।

মক্কা নগরীর ভেঙে পড়া অবস্থা ও পরিস্থিতি উমরকে তীব্রভাবে অসন্তুষ্ট ও ক্রুদ্ধ করে তুলেছিল। কারণ তিনি দেখতে পেতেন যে, মক্কাবাসীদের মধ্যে দ্বিধাবিভক্তি ও অনৈক্য প্রভাব বিস্তার করেছে এবং কুরাইশদের আলোকিত দিন যেন আঁধার রাতে পরিণত হয়েছে।

এ কারণেই তিনি চিন্তা করে দেখেন যে, মহানবীকে হত্যা করলেই এ মতবিরোধের উৎস কর্তিত হয়ে যাবে। এ লক্ষ্য বাস্তবায়ন করার জ তিনি মহানবীর বাসগৃহ কোথায় তা অনুসন্ধান করে দেখতে থাকেন। তাঁকে বলা হয়েছিল যে, সাফা বাজারের পাশে যে একটি ঘর আছে সেখানেই তিনি অবস্থান করছেন। তবে হামযাহ্, আবু বকর ও আলী (আ.) প্রমুখের মতো ৪০ জন তাঁর নিরাপত্তার জ সর্বদা নিয়োজিত আছেন।

নাঈম ইবনে আবদুল্লাহ্ উমরের একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিল। সে বর্ণনা করেছে : উমরকে দেখলাম সে তার খোলা তলোয়ার হাতে নিয়ে কোথাও যাচ্ছে। আমি তার গন্তব্যস্থল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। সে আমাকে বলল,

أريد محمّداً الّذي فرّق أمر قريشٍ وسفّه احلامها وعاب دينها وسبّ آلهتها فأقتله

"আমি মুহাম্মদকে খুঁজছি, যে কুরাইশ গোত্রকে দু'দলে বিভক্ত করেছে; তাদের বুদ্ধিমত্তা নিয়ে ব্য -বি প করেছে; তাদের ধর্মকে ভিত্তিহীন এবং তাদের দেবতাদের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করেছে। তাঁকে খুন করার জ ই আমি যাচ্ছি।"

নাঈম বলল, "আমি তাকে বললাম : তুমি নিজেকেই প্রতারিত করেছ তুমি কি ভাব নি যে, (যদি তুমি মুহাম্মদকে হত্যা কর তাহলে) আবদে মান্নাফের বংশধরগণ কি তোমাকে জীবিত রাখবে? যদি তুমি আসলেই শান্তি অন্বেষী হয়ে থাক তাহলে প্রথমে নিজের আত্মীয়- স্বজনদের সংশোধন কর। কারণ তোমার বোন ফাতিমা ও তার স্বামী মুসলমান হয়ে গেছে এবং মুহাম্মদের ধর্ম পালন করছে।"

নাঈমের এ কথায় যেন দ্বিতীয় খলীফার অস্তিত্বের মধ্যে ক্রোধের ঝড় বইতে লাগল। যার ফলে তিনি তাঁর কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের [হযরত মুহাম্মদ (সা.)- কে হত্যা] পরিকল্পনা বাতিল করে ভ পতির গৃহাভিমুখে রওয়ানা হলেন। যখনই তিনি তাঁদের ঘরের কাছাকাছি আসলেন তখন তিনি কারো নিচু শব্দের ধ্বনি শুনতে পেলেন যে খুব আকর্ষণীয় ও দয়গ্রাহী কে হযরত মুহাম্মদ (সা.)- এর পবিত্র কোরআন পাঠ করছে। নিজ বোনের ঘরে উমরের প্রবেশ এমনভাবে হয়েছিল যে, এর ফলে তাঁর বোন ও তাঁর স্বামী বুঝতে পারল যে, উমর ঘরে প্রবেশ করেছে। এ কারণেই তাঁরা পবিত্র কোরআনের শিক্ষককে ঘরের এমন একটি স্থানে লুকিয়ে রাখলেন যাতে করে উমরের দৃষ্টি তাঁর ওপর না পড়ে। ফাতিমাও যে কাগজ বা পত্রে পবিত্র কোরআন লিখিত ছিল তা লুকিয়ে রাখলেন।

উমর সালাম ও (সৌজ মূলক কথাবার্তা) কুশলাদি বিনিময় করা ছাড়াই তাঁদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, "নিচু স্বরে তোমাদের গুঞ্জণ ধ্বনি যা আমার কানে পৌঁছেছে তা কি ছিল?" তাঁরা

বললেন, “কোথায়, আমরা তো কিছুই শুনি নি।” উমর বললেন, “আমাকে বলা হয়েছে যে, তোমরা মুসলমান হয়ে গেছ এবং তোমরা মুহাম্মদের ধর্ম অনুসরণ করছ।”তিনি এ কথা খুবই রাগত স্বরে বললেন এবং নিজ ভি পতিকে আক্রমণ করলেন। তাঁর বোনও স্বামীকে সাহায্য করার জ উঠে দাঁড়ালেন। উমর নিজ বোনকেও তরবারির আগা দিয়ে মাথায় তীব্রভাবে আঘাত করলেন এবং তাঁকে আহত করলেন। যখন তাঁর মাথা থেকে অনবরত রক্ত ঝরছিল তখন সেই অসহায় মহিলাটি পূর্ণ ঈমান ও আস্থা সহকারে উমরকে বললেন, “হ্যাঁ, আমরা মুসলমান হয়ে গেছি এবং মহান আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান এনেছি। এখন আমাদের ব্যাপারে তোমার যা ইচ্ছা তা করার ক্ষমতা থাকলে করতে পার।” রক্তে রঞ্জিত মুখে এবং রক্তাক্ত নয়নে ভাইয়ের সামনে দণ্ডায়মান বোনের এ দয়বিদারক দৃশ্য খলীফা উমরের সমগ্র দেহে কম্পন সৃষ্টি করেছিল এবং তিনি যা করেছেন সে ব্যাপারে অনুতপ্ত হলেন।

এরপর উমর তাঁর বোনকে যা তাঁরা তিলাওয়াত করছিলেন তা তাঁকে দেখানোর জ অনুরোধ করলেন যাতে করে তিনি মুহাম্মদ (সা.)- এর বাণীসমূহের ব্যাপারে গভীরভাবে ভাবতে পারেন। যাতে উমর তা ছিঁড়ে না ফেলেন এই ভয়ে ফাতিমা তাঁকে শপথ করালেন। আর উমরও তাঁকে কথা দিলেন এবং শপথ করলেন যে, পাঠ করার পর তিনি তা তাঁদের কাছে ফিরিয়ে দেবেন। এরপর তাঁকে একটি ফলক দেয়া হলো যার মধ্যে সূরা ত্বাহার কয়েকটি আয়াত লিপিবদ্ধ ছিল। আর এগুলোর ব ানুবাদ নিচে দেয়া হলো :

১. ত্বাহা, আপনার ওপর আমরা এ কোরআন এ জ অবতীর্ণ করি নি যে, আপনি নিজেকে কষ্টের মধ্যে ফেলবেন;

২. এ কোরআন ঐ ব্যক্তিদের জ স্মরণ যারা ভয় করে;

৩. (এ কোরআন) ঐ পবিত্র সত্তা যিনি পৃথিবী ও আসমানসমূহ সৃষ্টি করেছেন তাঁর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে;

৪. ষ্টা আরশ অর্থাৎ সমগ্র সৃষ্টিজগতের ওপর কর্তৃত্বশীল; যা কিছু আসমান ও যমীনের মাঝে আছে সে সব কিছু তাঁরই। তিনি প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত সকল বিষয় সম্পর্কে জ্ঞাত।

অতি বলিষ্ঠ ও প্রাঞ্জল ভাষাশৈলী সমৃদ্ধ ও গভীর তাৎপর্যমণ্ডিত এ সব আয়াত উমরকে তীব্রভাবে আলোড়িত ও প্রভাবিত করল। যে ব্যক্তি মাত্র কয়েক সেকেণ্ড আগেও পবিত্র কোরআন ও ইসলামের এক নাম্বার শত্রু ছিল সে তার নিজ পদ্ধতি পরিবর্তন করার সিদ্ধান্ত নিল। এ কারণেই যে গৃহে হযরত মুহাম্মদ (সা.) অবস্থান করছিলেন বলে তিনি আগে থেকেই জানতে পেরেছিলেন সে গৃহের দিকেই রওয়ানা হলেন। সেখানে পৌঁছে ঘরের দরজায় টোকা দিলেন। মহানবীর সাহাবীদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি উঠে এসে দরজার ফাঁক দিয়ে তাকালেন এবং উমরকে তরবারি হাতে দণ্ডায়মান দেখতে পেলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ মহানবীর কাছে গিয়ে তাঁকে বিস্তারিত জানালেন। হামযাহ্ ইবনে আবদুল মুত্তালিব বললেন, "তাকে আসতে দাও। যদি সে সদুদ্দেশ্যে এসে থাকে তাহলে আমরা তার আগমনকে স্বাগত জানাব। আর যদি এর অ থা হয় তাহলে তাকে আমরা হত্যা করব।"

মহানবী (সা.)- এর সাথে উমরের আচরণে সেখানে উপস্থিত সাহাবিগণ আ স্ত ও নিশ্চিত হলেন। এদিকে উমরের প্রশস্ত বদনমণ্ডল এবং পূর্বেকার কৃত কার্যকলাপের ব্যাপারে তাঁর অনুতাপ প্রকাশ তাঁর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যাপারে তাঁকে দৃঢ়পদ করেছিল এবং অবশেষে তিনি মহানবী (সা.)- এর একদল সাহাবীর সামনে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলেন এবং মুসলমানদের কাতারে শামিল হলেন।

ইবনে হিশাম তাঁর সীরাত গ্রন্থের ১ম খণ্ডের ৩৬৮ পৃষ্ঠায় উমরের ইসলাম ধর্ম গ্রহণের বিষয়টি একটু অ ভাবে বর্ণনা করেছেন। আগ্রহী পাঠকবর্গ তা জানার জ উক্ত গ্রন্থটি অধ্যয়ন করে দেখতে পারেন।

ষোড়শ অধ্যায় : কোরআন সম্পর্কে কুরাইশদের অভিমত

নিরঙ্কুশ ও সার্বিকভাবে মুজিযার স্বরূপ সংক্রান্ত আলোচনা এবং প্রকৃত প্রস্তাবে পবিত্র কোরআনের বিশেষ অলৌকিকত্ব সংক্রান্ত আলোচনা আমাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের বাইরে। আমরা আমাদের আকীদা-বি াস সংক্রান্ত লিখিত বই-পুস্তকে এ দু'টি বিষয় সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছি।[২৭৮]

কিন্তু ঐতিহাসিক আলোচনা-পর্যালোচনাসমূহ থেকে আমরা জানতে পারি যে, এ পবিত্র আসমানী গ্রন্থ (কোরআন) মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর সবচেয়ে বড় ও কার্যকর হাতিয়ার ছিল। উদাহরণস্বরূপ বড় বড় বাগ্মী এবং কবি-সাহিত্যিক পবিত্র কোরআনের আয়াত, বাক্য ও শব্দাংশসমূহের অলংকার, ভাষার প্রাঞ্জলতা, মাধুর্য, আকর্ষণ ক্ষমতা ও লালিত্য প্রত্যক্ষ করে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যেতেন এবং তাঁদের সবাই স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন যে, পবিত্র কোরআন অলংকার, প্রাঞ্জলতা ও অনুপম ভাষাশৈলীর সর্বোচ্চ স্তরে রয়েছে। আর কখনই এ ধরনের বাচনভি ও বাকরীতি মানব জাতির মধ্যে প্রচলিত ছিল না। পবিত্র কোরআনের প্রভাব অথবা আকর্ষণ শক্তি এমনই ছিল যে, মহানবীর সবচেয়ে কঠিন শত্রুও পবিত্র কোরআনের কিছু আয়াত শোনার পর কাঁপতে থাকত এবং কখনো কখনো তারা এতটা বেসামাল হয়ে যেত যে, দীর্ঘক্ষণ তারা বিস্ময়াভিভূত হয়ে নিজ স্থান থেকে নড়া-চড়া করার শক্তি হারিয়ে ফেলত। নিচে আমরা কয়েকটি উদাহরণ পেশ করছি :

ওয়ালীদের রায়

ওয়ালীদ আরব ছিল। আরবদের অনেক সমস্যার সমাধান তার হাতেই হয়েছে। তার অঢেল ধন-সম্পদ ছিল। পবিত্র মক্কা নগরীর ঘরে ঘরে ইসলামের প্রবেশ ও প্রভাবজনিত সমস্যা সমাধানের জ একদল কুরাইশ তার কাছে গমন করে পুরো বিষয়টি আদ্যোপান্ত তাকে অবহিত করে পবিত্র কোরআনের ব্যাপারে তার মতামত জানতে চায় এবং বলে, "মুহাম্মদের কোরআন যাদু- টোনা অথবা গণকদের ভবি দ্বাণীর অনুরূপ অথবা তা এমন এক ধরনের বক্তৃতা, সম্বোধন ও বাণীসমূহের সমষ্টি যা সে রচনা করেছে।" পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত শ্রবণ করার পর এ গ্রন্থ সম্পর্কে নিজের অভিমত ব্যক্ত করার জ আরবদের এ জ্ঞানী ব্যক্তি কুরাইশ প্রতিনিধি দলের কাছে সময় চাইল। এরপর সে তার বাড়ি থেকে বের হয়ে হাজারে ইসমাঈলে মহানবীর পাশে বসে তাঁকে বলল, "(হে মুহাম্মদ!) তোমার কবিতা থেকে কিছু আবৃত্তি করে শোনাও তো।" মহানবী (সা.) বললেন, "যা কিছু আমি এখন পাঠ করব তা কবিতা নয়, বরং তা মহান আল্লাহর বাণী যা তোমাদের হেদায়েতের জ তিনি অবতীর্ণ করেছেন।"এরপর ওয়ালীদ কোরআন পাঠ করার জ বারবার অনুরোধ করতে থাকলে মহানবী সূরা ফুসসিলাতের প্রথম দিকের ১৩টি আয়াত পাঠ করলেন। যখন তিনি

(فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد و ثمود)

'অতঃপর যদি তারা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে তাহলে তাদেরকে আপনি বলে দিন, আদ ও সামুদ জাতিদ্বয়ের বজ্রপাতের ায় আমিও তোমাদের একটি বজ্রপাতের ব্যাপারে ভয় প্রদর্শন করছি' - এ আয়াতটিতে উপনীত হলেন তখন ওয়ালীদ ভীষণভাবে কেঁপে উঠল; তার দেহের পশমগুলো দাঁড়িয়ে গেল, বিস্ময়ে হতবাক হয়ে তার নিজ স্থান ছেড়ে উঠে দাঁড়াল এবং সোজা নিজ বাসভবন অভিমুখে চলে গেল। কয়েকদিন সে ঘর থেকেই বের হলো না। এর ফলে কুরাইশরা তার সম্পর্কে ব্য করে বলতে লাগল : ওয়ালীদ পূর্বপুরুষদের পথ ত্যাগ করে মুহাম্মদের পথ অবলম্বন করেছে।[২৭৯]

প্রখ্যাত মুফাসসির তাবারসী বলেছেন, “যে দিন সূরা গাফির মহানবী (সা.)- এর ওপর অবতীর্ণ হলো সে দিন মহানবী খুবই আকর্ষণীয় কণ্ঠে উক্ত সূরার আয়াতসমূহ জনগণের কাছে প্রচার করার জন্য তেলাওয়াত করছিলেন। ঘটনাক্রমে ওয়ালীদ মহানবীর পাশে বসেছিল এবং আনমনে নিম্নোক্ত আয়াতগুলো শুনছিল। আয়াতগুলো হলো :

(حم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذّنب و قابل التّوب شديد العقاب ذي الطّول لا إله إلا هو إليه المصير ما يجادل في آيات الله إلّا الّذين كفروا فلا يغررك تقلّبهم في البلاد)

“হামীম। এ গ্রন্থটি মহাপরাক্রমশালী সর্বজ্ঞ মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ। তিনিই পাপসমূহ ক্ষমাকারী, অনুশোচনা গ্রহণকারী, কঠোর শাস্তিদাতা, অফুরন্ত নেয়ামত দানকারী। তিনি ব্যতীত আর কোন উপাস্য নেই। সব কিছুর চূড়ান্ত পরিণতি একমাত্র তাঁর দিকেই। একমাত্র যারা কুফর করেছে কেবল তারাই মহান আল্লাহর নিদর্শনসমূহ নিয়ে তর্ক- বিতর্ক করে। তাই নগর ও শহরসমূহে তাদের জীবনযাপন ও কর্মতৎপরতা যেন আপনাকে বিমোহিত ও প্রতারিত না করে...।”

এ আয়াতগুলোর মধ্যে যে কয়টির এখানে উদ্ধৃতি দিয়েছি এবং অনুবাদ করেছি সেগুলো আরবের জ্ঞানী ব্যক্তিকে তীব্রভাবে প্রভাবিত করেছিল। যখন বনি মাখযুম গোত্র তাকে চারদিক থেকে ঘিরে তার কাছ থেকে পবিত্র কোরআনের ব্যাপারে অভিমত জানতে চেয়েছিল তখন সে পবিত্র কোরআন সম্পর্কে বলেছিল, “আজ আমি মুহাম্মদের নিকট থেকে এমন কথা শুনেছি যা মানুষ ও জ্বিন জাতির বাণী নয়। সে বাণীর এক বিশেষ মাধুর্য ও সৌন্দর্য রয়েছে। এর ডাল- পালাগুলো ফলদানকারী এবং এর শিকড় খুবই কল্যাণকর। এটি এমন এক ধরনের বাণী যা বলিষ্ঠ, শ্রেষ্ঠ ও উন্নত যার চেয়ে অন্য কোন বাণী শ্রেষ্ঠ ও উন্নত হতে পারে না।”[২৮০]

و إنّ له لحلاوة و إنّ عليه لطلاوة و إنّ أعلاه لمثمر و إنّ أسفله لمغدق و إنّه يعلو و لا يُعلى عليه

একজন বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতের[২৮১] মতে ওয়ালীদের উপরিউক্ত উক্তিটি ছিল পবিত্র কোরআন সম্পর্কে মানুষের পক্ষ থেকে প্রথম নিরপেক্ষ সমালোচনামূলক মূল্যায়ন। তার এ কথা যদি আমরা গভীরভাবে চিন্তা করি তাহলে সে যুগে পবিত্র কোরআনের অলৌকিকত্বের স্বরূপ আমাদের সামনে

স্পষ্ট হয়ে যাবে এবং সে সাথে জানা যাবে যে, তখনকার জনগণের কাছে পবিত্র কোরআনের অলৌকিকত্বের কারণ উক্ত গ্রন্থটির অসাধারণ ও অলৌকিক আকর্ষণক্ষমতা, মাধুর্য ও লালিত্য যা পবিত্র কোরআন ব্যতীত অ   কোন গ্রন্থ ও সাহিত্য- কর্মে সম্পূর্ণরূপে অনুপস্থিত।

অপর একটি উদাহরণ

উতবাহ্ ইবনে রাবীয়াহ্ : সে ছিল কুরাইশদের একজন গণ্যমা   ব্যক্তি। যে দিন হামযাহ্ ইবনে আবদুল মুত্তালিব ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলেন সে দিন কুরাইশদের গোটা সভাস্থলের ওপর দুঃখ ও বেদনার ছায়া বিস্তার করেছিল এবং ইসলাম ধর্ম যে আরো বেশি বিস্তৃতি লাভ করবে এ কথা ভেবে কুরাইশ নেতৃবর্গ ভয়ে দিশাহারা হয়ে গিয়েছিল। সে সময় উতবাহ্ প্রস্তাব করল, "আমি মুহাম্মদের কাছে যাব এবং কয়েকটি বিষয় সম্পর্কে তাকে প্রস্তাব দেব। আশা করা যায় যে, সে এগুলোর মধ্য থেকে অন্তত একটি গ্রহণ করবে এবং তার নতুন ধর্ম প্রচার করা থেকে বিরত থাকবে। কুরাইশ নেতৃবৃন্দ উতবার বক্তব্য মেনে নিল। সে উঠে মহানবী (সা.)- এর কাছে গমন করল। তিনি তখন মসজিদুল হারামের পাশে বসেছিলেন। উতবাহ্ মহানবীর কাছে গিয়ে পবিত্র মক্কা নগরীর কর্তৃত্ব ও নেতৃত্ব এবং প্রচুর ধন- দৌলত তাঁর হাতে অর্পণ এবং ইসলাম ধর্ম প্রচার কার্যক্রম বন্ধ করে দেয়ার প্রস্তাব দিল। যখন উতবাহ্ তার কথা শেষ করল তখন মহানবী (সা.) বললেন, "হে আবু ওয়ালীদ! তোমার বক্তব্য কি শেষ হয়েছে?" সে বলল, "হ্যাঁ।"তখন মহানবী বললেন, "এ আয়াতগুলো মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ কর। তাহলে তুমি তোমার যাবতীয় প্রশ্নের উত্তর পেয়ে যাবে :

(بسم الله الرّحمان الرّحيم، حم تنزيل من الرّحمان الرّحيم، كتاب فصّلت آياته قرآنا عربيّا لقوم يعلمون، بشيرا و نذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون)

" পরম করুণাময় দাতা ও দয়ালু মহান আল্লাহর নামে। হামীম, এ গ্রন্থটি যেহেতু পরম করুণাময় দাতা ও দয়ালুর কাছে থেকে অবতীর্ণ তাই এটি এমন এক গ্রন্থ যার আয়াতসমূহ ঐ জাতি বা সম্প্রদায়ের জ   বিস্তারিত বর্ণিত হয়েছে যারা জ্ঞানী। এ গ্রন্থটি হচ্ছে আরবী ভাষায় অবতীর্ণ

সুপাঠ্য গ্রন্থ। সুসংবাদদাতা ও ভয় প্রদর্শনকারী। অতঃপর তাদের অধিকাংশের নিকট থেকে মুখ ফিরিয়ে নিন। কারণ তারা (সত্য বাণী) শ্রবণ করে না। ”

মহানবী (সা.) এ সূরা থেকে কিছু আয়াত তেলাওয়াত করলেন। যখন ৩৭ নং আয়াতে পৌঁছলেন তখন তিনি সিজদাহ্ করলেন। সিজদাহ্ সমাপন করার পর উতবাকে লক্ষ্য করে বললেন, “হে আবু ওয়ালীদ! মহান আল্লাহর বাণী কি শুনেছ?” উতবাহ্ মহান আল্লাহর বাণী দ্বারা এতটা প্রভাবিত ও অভিভূত হয়ে গিয়েছিল যে, সে নিজ হাতের ওপর ভর দিয়ে বেশ কিছুক্ষণ মহানবীর দিকে তাকিয়েছিল যেন কেউ তার বাকশক্তি কেড়ে নিয়েছে। এরপর সে সেখান থেকে উঠে কুরাইশদের সভাস্থলের দিকে গমন করল। কুরাইশ নেতৃবৃন্দ তার মুখের অভিব্যক্তি থেকে মনে করল যে, সেও হযরত মুহাম্মদ (সা.)- এর কথা দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে এবং নিরাশ ও পরাজিত হয়ে ফিরে এসেছে। তখন সকলের দৃষ্টি উতবার মুখমণ্ডলের দিকে নিবদ্ধ ছিল। সকলেই বলে উঠল, “ব্যাপার কি, কি হলো?” উতবাহ্ বলল, “মহান আল্লাহর শপথ, না তা কবিতা, না তা যাদু, আর না তা গণকের ভবি দ্বাণী (و الله ما هو بالشعر و لا بالسّحر و لا بالكهانة)। তাকে ছেড়ে দেয়াই আমি কল্যাণকর বলে মনে করি যাতে করে সে নির্বিঘ্নে আরব গোত্রসমূহের মাঝে তার প্রচার কার্যক্রম চালাতে পারে। যদি সে সফলকাম ও বিজয়ী হয় এবং রাজ্য, নেতৃত্ব ও শাসনক্ষমতার অধিকারী হয় তাহলে তা তোমাদের জ গর্বের বিষয় বলে গণ্য হবে এবং তোমরাও তাতে তোমাদের অংশ পাবে। আর যদি সে নিহত হয় তাহলে তো তোমরা তখন এমনিতেই তার থেকে স্বস্তি লাভ করবে। ”

কুরাইশরা উতবার এ অভিমত প্রকাশের কারণে বেশ ব্য করে বলল, “তুমিও মুহাম্মদের কথা দ্বারা প্রভাবিত ও অভিভূত হয়েছ। ”

উপরিউক্ত বর্ণনাদ্বয় পবিত্র কোরআন সংক্রান্ত জাহেলী যুগের প্রখ্যাত বাক্যবাগীশদের অভিমতের নমুনা। আরো নমুনা বিদ্যমান আছে। আগ্রহী পাঠকবর্গের আরো অবগতির জ তাঁদেরকে তাফসীর গ্রন্থগুলো পাঠ করার অনুরোধ জানাচ্ছি।

কুরাইশদের অদ্ভুত অজুহাত

একদিন সূর্যাস্তের পর উতবাহ্, শাইবাহ্, আবু সুফিয়ান, নযর বিন হারিস, আবদুল বুহতুরী, ওয়ালীদ বিন মুগীরাহ্, আবু জাহল, আস ইবনে ওয়ায়েল প্রমুখ কুরাইশ নেতৃবৃন্দ পবিত্র কাবার পাশে একটি সভার আয়োজন করে মহানবী (সা.)- কে ডেকে তাঁর সাথে কথা বলার সিদ্ধান্ত নিল। তারা এক ব্যক্তিকে হযরত মুহাম্মদ (সা.)- এর কাছে পাঠাল যাতে সে তাঁকে তাদের সভায় যোগ দেয়ার জ অনুরোধ করে। মহানবী (সা.) ব্যাপারটি জানার পর তাদের হেদায়েত প্রাপ্তির আশায় ত্বরা করে উক্ত সভায় চলে আসেন। কোন একটি প্রস কথা শুরু হলেই কুরাইশরা তাদের অভিযোগগুলো বলতে থাকল। কুরাইশদের মাঝে যে বিভেদের সৃষ্টি হয়েছে সে সম্পর্কে তারা অনুযোগের সুরে কথা বলল এবং যে কোন ধরনের ত্যাগ স্বীকার করার ব্যাপারে তাদের প্রস্তুতির কথা ঘোষণা করল। শেষে তারা মহানবীর কাছে এমন সব আবেদন পেশ করেছিল যেগুলোর বর্ণনা পবিত্র কোরআনের সূরা ইসরার ৯০- ৯৩ নং আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। আমরা ঐ আয়াতসমূহের অনুবাদ নিচে তুলে ধরলাম[২৮২] :

" হে মুহাম্মদ! নিম্নোক্ত কাজগুলো আঞ্জাম দেয়া ব্যতীত আমরা তোমার প্রতি ঈমান আনব না:

১. আমাদের দেশ শুষ্ক ও পানিবিহীন। তাই আল্লাহর কাছে প্রার্থনা কর যাতে করে তিনি বালুকাময় এ মরু দেশের বুক চিরে নদী ও নহরসমূহ প্রবাহিত করেন;

২. তোমার হাতে অবশ্যই এমন এক উদ্যান থাকতে হবে যার ফলসমূহ আমরা ভক্ষণ করব এবং ঐ উদ্যানের মধ্য দিয়ে ঝরনা ও নহর প্রবাহমান থাকবে;

৩. তোমাকে অবশ্যই এ আকাশ চূর্ণ- বিচূর্ণ করে আমাদের ওপর ফেলতে হবে;

৪. মহান আল্লাহ্ ও ফেরেশতাদেরকে (আমাদের সামনে) উপস্থিত কর;

৫. তোমাকে স্বর্ণপ্রাসাদের অধিকারী হতে হবে;

৬. তোমাকে আকাশের দিকে উড়ে যেতে হবে। তোমার প্রতি আমরা কখনই ঈমান আনব না যদি না তুমি আকাশ থেকে একটি চিঠি আন যাতে লিখিত আকারে তোমার নবুওয়াতের সত্যায়ন করা হয়েছে।

যেহেতু পবিত্র কোরআনের এ আয়াতসমূহের অর্থ এবং কুরাইশদের এ সব আহবানের প্রতি মহানবীর (ইতিবাচক) সাড়া না দেয়ার বিষয়টি ইসলাম ও মহানবীর বিরুদ্ধে ি ষ্টান প্রাচ্যবিদদের মোক্ষম দলিলে পরিণত হয়েছে তাই এখন আমরা এ আয়াতগুলোর অন্তর্নিহিত অর্থ ও তাৎপর্য ব্যাখ্যা করব এবং কুরাইশদের এ সব দাবির প্রতি মহানবীর সাড়া না দেয়ার পেছনে বিদ্যমান যুক্তিপূর্ণ কারণগুলো স্পষ্ট করে দেব।

যে কোন অবস্থা ও প্রেক্ষাপটে মহান নবিগণ মুজিযা প্রদর্শন করেন না, বরং মুজিযা প্রদর্শনের ক্ষেত্রেও কতগুলো শর্ত রয়েছে যেগুলো এ সব দাবির ক্ষেত্রে অনুপস্থিত।

প্রথমত যে সব বিষয় আসলেই সত্তাগতভাবে অবাস্তব ও অসম্ভব সেগুলো শক্তি ও সামর্থ্যরে বাইরে এবং সেগুলো কখনই মহান আল্লাহ্ ইচ্ছা করেন না এবং কোন ইচ্ছাশক্তির অধিকারী সত্তাও এ সব ব্যাপারে ইচ্ছা পোষণ করেন না। অতএব, জনগণ মহান নবীদের কাছে কোন অসম্ভব বিষয় বা কাজ সম্পাদন করার আহবান জানালে নবিগণ যদি তা অগ্রাহ্য করেন তাহলে তা কখনই নবীদের মুজিযা অস্বীকার করার দলিল বলে গণ্য হবে না।

অথচ এ শর্তটি তাদের কতিপয় দাবির (চতুর্থ দাবির) ক্ষেত্রে বিদ্যমান নেই। কারণ তারা মহানবীর কাছে দাবি করেছিল যেন তিনি তাদেরকে মহান আল্লাহর মুখোমুখি দাঁড় করান যাতে করে তারা তাঁকে নিকট থেকে প্রত্যক্ষ করতে পারে। অথচ চর্মচোখে মহান আল্লাহকে দেখা অসম্ভব ও অবাস্তব বিষয়াদির অন্তর্ভুক্ত। কারণ তাঁকে দেখার অনিবার্য পরিণতি হচ্ছে এই যে, তিনি স্থান- কালের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে যাবেন এবং তিনি আকার- আকৃতি ও বর্ণের অধিকারী হবেন; (আর স্থান- কালের মধ্যে সীমাবদ্ধ হওয়া এবং নির্দিষ্ট আকার- আকৃতি ও বর্ণবিশিষ্ট হওয়া আসলে বস্তু ও পদার্থ হওয়ার লক্ষণস্বরূপ) মহান আল্লাহ্ বস্তু ও বস্তুর অবিচ্ছেদ্য বিষয়াদি ও গুণাবলী থেকে মুক্ত ও পবিত্র।

এমনকি তাদের তৃতীয় দাবির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য যদি এটিই হয়ে থাকে যে, তাদের ওপর আসমান পতিত হোক (তবে আকাশ থেকে টুকরা পাথর তাদের ওপর বর্ষিত হয়ে তারা সবাই ধ্বংসপ্রাপ্ত হোক এটি উদ্দেশ্য নয়), তাহলে তাদের এ দাবি অবাস্তব ও অসম্ভব বলে গণ্য হবে। কারণ মহান আল্লাহর ঐশী ইচ্ছা অবধারিত করেছে যে, তিনি এ কাজটি বি ব্রহ্মাণ্ডের আয়ুষ্কাল যখন সমাপ্ত হবে তখন আঞ্জাম দেবেন। আর মহান নবিগণও মুশরিকদেরকে এ ব্যাপারে অবগত করেছেন। (كما زعمت) তুমি যেমন ভেবেছ ঠিক তেমন- এ বাক্য থেকেও উক্ত বিষয়টি প্রতীয়মান হয়ে যায়।

সৌরমণ্ডল ও মহাকাশীয় বস্তুসমূহের পতন যদিও সত্তাগতভাবে অসম্ভব নয় তবুও তা এ পৃথিবীর বুকে মানব প্রজন্মসমূহের অস্তিত্ব বজায় থাকুক এবং কাঙ্ক্ষিত মানবীয় পূর্ণতার দিকে তারা অগ্রসর হোক- এতৎসংক্রান্ত মহান আল্লাহর যে প্রজ্ঞাময় ইচ্ছা রয়েছে সেই ইচ্ছার প্রেক্ষাপটে অসম্ভব বলে গণ্য হবে। আর যে কোন প্রজ্ঞাবান সত্তা কখনই তাঁর কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের পরিপন্থী কোন কাজ সম্পাদন করেন না।

দ্বিতীয়ত যেহেতু মুজিযা প্রদর্শের আহবানের প্রকৃত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হচ্ছে নবীর কথা বা বাণীর সত্যতা প্রতিপন্ন করা এবং মুজিযা প্রদর্শনের মাধ্যমে অতি প্রাকৃতিক) ঊর্ধ্বতন ও আধ্যাত্মিক অবস্তুগত (জগতের সাথে তাঁর যোগসূত্র ও সম্পর্কের দৃঢ় ও শক্তিশালী দলিল অর্জিত হয় তাই যখনই কোন নবীর কাছে জনতার অলৌকিক বিষয় প্রদর্শনের দাবি এ ধরনের বৈশিষ্ট্য বিবর্জিত হবে) অর্থাৎ যদি ধরেও নেয়া হয় যে, নবী তাদের এ ধরনের আহবানে সাড়া দেবেন এবং মুজিযা প্রদর্শন করতে সম্মত হবেন তবুও (তখন আর তা অদৃশ্য অবস্তুগত জগতের সাথে তাঁর যোগসূত্র ও সম্পর্কের দলিল বলে গণ্য হবে না। এমতাবস্থায় কোন নবীই এমন কোন কাজ করবেন না যা তাঁর নবুওয়াতের মর্যাদার বিরোধী। আর এ ধরনের কাজ করার পক্ষে কোন যৌক্তিকতাও নেই। ঘটনাচক্রে তাদের কিছু কিছু আহবান, যেমন নবী (সা.) কর্তৃক তাদের সামনে জমিনের বুকে ঝরনা ও নহর প্রবাহিত করা, আ ুর ও খেজুর বাগান এবং স্বর্ণনির্মিত বাসগৃহের অধিকারী হওয়া ইত্যাদি আসলে উপরোল্লিখিত দাবি ও আহবানসমূহের অন্তর্ভুক্ত (যা অযৌক্তিক(। কারণ জমির

বুকে নহর খনন করা অথবা খেজুর ও আ ুর বাগানের মালিক হওয়া যার তলদেশ নিয়ে নহরসমূহ বয়ে যাচ্ছে অথবা স্বর্ণনির্মিত প্রাসাদ ও বাসগৃহের অধিকারী হওয়া এগুলোর স্বত্বাধিকারীর নবী হওয়ার দলিল হতে পারে না। কারণ অনেক লোকই এ সব সম্পত্তির মধ্যে কোন না কোনটির মালিক এবং তারা কখনই নবী নয়। বরং কখনো কখনো এমন সব ব্যক্তি পাওয়া যাবে যারা এর চাইতেও ধনবান, অথচ তাদের মধ্যে নবুওয়াত তো দূরের কথা ঈমানের বি মাত্র সৌরভও নেই। এখন যখন নবুওয়াতের সুউচ্চ মাকামের সাথে এ সব বিষয়ের অস্তিত্বের সামা তম যোগসূত্র নেই এবং এ সব বিষয় নবুওয়াতের দাবিদারের সত্যবাদিতার দলিল হতে পারে না তখন এ সব কাজ আঞ্জাম দেয়া ফালতু কাজ বলেই গণ্য হবে। আর নবুওয়াতের সুউচ্চ মাকাম এ ধরনের কাজ বা বিষয়সমূহ আঞ্জাম দেয়া হতে অতি উচ্চ ও মহান।

কখনো কখনো বলা হয় যে, কাফের- মুশরিকদের উপরিউক্ত প্রস্তাব তিনটি (ঝরনা, বাগান ও স্বর্ণনির্মিত প্রাসাদ) ঐ ক্ষেত্রে নবীর বাণী ও কথার সত্যতার দলিল হবে না যদি তিনি এ সব বিষয় স্বাভাবিক কারণ ও মাধ্যম ব্যবহার করে তৈরি করেন, তবে যদি তিনি অতি প্রাকৃতিক উপায়ে এ সব কাজে হাত দেন তখন নিঃসন্দেহে তা মুজিযা বলে গণ্য হবে এবং তা অবশ্যই নবুওয়াতের দাবিদারের সত্যবাদিতার দলিল বলেও গণ্য হবে।

কিন্তু বাহ্যত এ ধরনের চিন্তা- ভাবনা ঠিক নয়। কারণ মুশরিকদের এ ধরনের আহবানের প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল নবীর অবশ্যই বস্তুগত শক্তি ও ক্ষমতার অধিকারী হওয়া। মহান আল্লাহর নবী যে একজন দরিদ্র ব্যক্তি হতে পারেন তা তাদের দৃষ্টিতে অসম্ভব বলে গণ্য হতো। তারা বি াস করত যে, মহান আল্লাহর ওহী অবশ্যই একজন ধনাঢ্য ব্যক্তির ওপর অবতীর্ণ হবে। তাই তারা বলত :

(و قالوا لولا نزّل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم)

“ কেন এ কোরআন দু’জনপদ অর্থাৎ মক্কা ও তায়েফের কোন ধনাঢ্য ব্যক্তির ওপর অবতীর্ণ করা হয় নি।”(সূরা যুখরুফ : ৩১)

সুতরাং তাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল নবী (সা.)- এর বাহ্যিক (বস্তুগত) ক্ষমতা ও শক্তি এবং বিত্ত- বৈভব, এমনকি তা যদি স্বাভাবিক পন্থায়ও অর্জিত হয়।

যে কোন পন্থায় এমনকি স্বাভাবিক প্রাকৃতিক পন্থায় হলেও নবীর এ ধরনের কাজ সম্পন্ন করাই যদি মুশরিকদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হয়ে থাকে তাহলে এতৎসংক্রান্ত বিষয়ের দলিল হচ্ছে এই যে, বাগান ও স্বর্ণনির্মিত বাড়িঘর তারা স্বয়ং নবীর জ   চাইত। তাই তারা বলত :

(أو يكون لك بيت من زخرف)

"যতক্ষণ পর্যন্ত না তুমি স্বর্ণনির্মিত গৃহের স্বত্বাধিকারী হবে সে পর্যন্ত আমরা তোমার প্রতি ঈমান আনব না।"(সূরা ইসরা : ৯৩)

অর্থাৎ এ সব মুশরিক বলত : যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি বাগান ও স্বর্ণনির্মিত বাড়ির মালিক না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা তোমার প্রতি ঈমান আনব না। আর তাদের এ বক্তব্যের লক্ষ্য যদি এটিই হতো যে, তিনি উপরিউক্ত বিষয়দ্বয় (বাগান ও স্বর্ণনির্মিত বাসগৃহের অধিকারী হওয়া) অবস্তুগত অতি প্রাকৃতিক শক্তি দ্বারা অর্জন করবেন, তাহলে এ কথা বলার অবশ্যই কোন যুক্তি থাকত না যে, যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি স্বর্ণনির্মিত বাড়ি ও বাগান নির্মাণ না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা তোমার প্রতি ঈমান আনয়ন করব না। "

কিন্তু যেহেতু প্রথম প্রস্তাবে তারা বলেছিল, تفجرلنا من الأرض ينبوعا 'আমাদের জ   ভূপৃষ্ঠের ওপর একটি ঝরনা প্রবাহিত কর'[২৮৩], তাই তাদের এ কথার উদ্দেশ্য এটিই ছিল না যে, তিনি তাদের জ   ঝরনা প্রবাহিত করবেন যাতে করে তারা তা ব্যবহার করতে পারে। বরং তিনি তাদের ঈমান আনয়ন করার জ   ই এ ধরনের কাজ করতেন।

তৃতীয়ত মুজিযা প্রদর্শনের আহবান জানানোর প্রকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে এর আলোকে তাঁর দাবির সত্যতা উপলব্ধি করা এবং তাঁর নবুওয়াতে বি াস স্থাপন। তাই যারা নবীর কাছে মুজিযা প্রদর্শন করার আহবান জানায় তাদের মধ্যে যদি এমন এক দল থাকে যারা মুজিযা প্রদর্শন করার কারণে নবীর প্রতি ঈমান আনয়ন করবে তাহলে ঠিক এমতাবস্থায় মুজিযা প্রদর্শন বুদ্ধিবৃত্তিক দৃষ্টিকোণ থেকে নির্দোষ ও শোভন বলে গণ্য হবে। তবে মুজিযা প্রদর্শন করার আহবানকারী যদি একগুঁয়ে ও ভাঁড় গোছের ব্যক্তিবর্গ হয় এবং তাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য যাদুকরদের খেল- তামাসার মতো

এক ধরনের বিনোদন ও ক্রীড়া- কৌতুক করাই হয়ে থাকে, তাহলে এমতাবস্থায় তাদের আহবানে ইতিবাচক সাড়া দেয়া মহানবী (সা.)- এর জ   আবশ্যক বিষয় বলে গণ্য হবে না।

ঠিক একইভাবে যেহেতু তারা বলেছে, 'হে নবী! আপনি আকাশে উ   য়ন করুন ' , আর এতটুকুও তারা যথেষ্ট মনে করে নি, বরং এরপরও তারা বলেছে, 'আপনি অবশ্যই আকাশ থেকে আমাদের জ   গ্রন্থ আনয়ন করবেন', সেহেতু বলা যায় যে, এ সব আহবানের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সত্য উন্মোচন করা ছিল না। কারণ তারা যদি সত্যের সন্ধানী হতো কেন তারা তাঁর আকাশে উ   য়নকেই যথেষ্ট মনে করে নি এবং জোর দিয়ে বলেছে এর সাথে আরো কিছু (আকাশ থেকে গ্রন্থ আনয়ন) সংযোজন করতে হবে?

এ দু'টি আয়াত ছাড়াও আরো কতিপয় আয়াত থেকে প্রতীয়মান হয় যে, আকাশ থেকে গ্রন্থ প্রেরণ করার পরও তারা তাদের একগুঁয়েমী পরিত্যাগ করবে না এবং সত্য অস্বীকার করার প্রবণতা অব্যাহত থাকবে। উদাহরণস্বরূপ নিম্নোক্ত আয়াতটি প্রকাশ্যভাবে এ সত্য প্রমাণ করেছে:

(و لو نزّلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الّذين كفروا إن هذا إلّا سحر مّبين)

"আর যদি আমরা আপনার ওপর কাগজে লিখিত গ্রন্থ অবতীর্ণ করতাম, অতঃপর তা তারা নিজেদের হাতে স্পর্শও করত তাহলে যারা কুফর করেছে তারা বলত : এটি একটি স্পষ্ট যাদু ব্যতীত আর কিছুই নয়।"(সূরা আনআম : ৭)

উপরিউক্ত আয়াতে কাগজে লিখিত গ্রন্থ অবতীর্ণ হওয়ার কাঙ্ক্ষিত অর্থ যে মুশরিকদের এ আহবান এতে কোন সন্দেহ নেই। আর মুশরিকদের এ আহবান সূরা ইসরার প্রাগুক্ত আয়াতসমূহে বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ মহানবী (সা.) আকাশের দিকে উ   য়ন করুন এবং তাদের জ   (আকাশ থেকে) একটি গ্রন্থ আনয়ন করুন। মহান আল্লাহ্ এ আয়াতে বলেছেন, "এ ধরনের কাজও যদি সম্পাদিত হয় তবু তারা ঈমান আনবে না।

চতুর্থত মুজিযা প্রদর্শনের আহবান এ জ   করা হয় যে, মুজিযার আলোকে আহবানকারীরা ঈমান আনয়ন করবে এবং মহানবীর রিসালাতে বি াসীদের অন্তর্ভুক্ত হবে। যদি মুজিযা প্রদর্শনের পরিণতি আহবানকারীদের অস্তিত্ব বিলোপ করাই হয়ে থাকে তাহলে তা পরিণামে উদ্দেশ্যের

পরিপন্থী হবে। 'তাদের মাথার ওপর আকাশ ভেঙে পড়ুক'- তাদের এ কথার কাঙ্ক্ষিত অর্থ এই যে, আসমানী পাথরসমূহ তাদেরকে ধ্বংস করুক। এ আহবান মুজিযা প্রদর্শনের লক্ষ্যের সাথে মোটেও খাপ খায় না এবং এটি হবে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের পরিপন্থী হওয়ার উজ্জ্বল নমুনা।

শেষে এ বিষয়টি উল্লেখ না করেই পারছি না যে, মহানবী যুক্তি উপস্থাপনকারীর চিন্তার বিপক্ষে কখনই নিজেকে অক্ষম বলে পেশ করেন নি, বরং سبحان ربّي هل كنت إلّا بشرا رسولا 'আমার প্রভু পবিত্র, আমি কি একজন সংবাদ আনয়নকারী মানুষ ব্যতীত আর কিছু ' - এ আয়াতটি দ্বারা তিনি দু'টি বিষয় পরিষ্কার বুঝিয়ে দিয়েছেন। বিষয় দু'টি হলো :

১. মহান আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা : 'আমার প্রভু পবিত্র ' - এ বাক্যটি দিয়ে তিনি মহান আল্লাহকে সব ধরনের দুর্বলতা, অক্ষমতা ও দর্শন (চর্মচক্ষু দিয়ে দেখা) থেকে মুক্ত ও পবিত্র বলেছেন এবং তাঁকে সব ধরনের সম্ভব কাজ আঞ্জাম দেবার ব্যাপারে ক্ষমতাবান বলেছেন।

২. মহানবীর শক্তির সীমাবদ্ধতা : 'আমি একজন সংবাদ আনয়নকারী মানুষ হওয়ার চাইতে আর বেশি কিছু নই ' - এ বাক্যটি দ্বারা তিনি বুঝাতে চেয়েছেন যে, তিনি একজন আদেশপ্রাপ্ত ব্যক্তি ব্যতীত আর কিছুই নন। তিনি মহান আল্লাহর আদেশের আজ্ঞাবহ। মহান আল্লাহ্ যা কিছু ইচ্ছা করেন তিনি সেটাই আঞ্জাম দেন। সকল কাজ আসলে মহান আল্লাহর হাতে। এমন নয় যে, মহানবী যে কোন আহবানের সামনে তাঁর নিজ ইচ্ছাশক্তিসমেত আত্মসমর্পণ করতে পারেন।

অ ভাবে বলা যায় প্রাগুক্ত আয়াতটি উত্তর দেয়ার পর্যায়ে (সব ধরনের) দোষ- ত্রুটি, দুর্বলতা ও অক্ষমতা, চর্মচোখে দর্শন এবং পর্যবেক্ষণ করা থেকে মহান আল্লাহকে পবিত্র বলে ঘোষণা করার পর 'মানুষ ' ও 'রাসূল ' এ শব্দদ্বয়ের ওপর সবিশেষ জোর দিয়েছে। লক্ষ্য হচ্ছে এটিই যে, যেহেতু আমি একজন মানুষ সেহেতু এ দৃষ্টিকোণ থেকে তোমরা যদি এ সব কাজ আমা থেকে আহবান কর তাহলে এ ধরনের আহবান আসলে সঠিক আহবান হবে না। কারণ এ ধরনের কাজ ও বিষয়াদি মহান আল্লাহর শক্তির মুখাপেক্ষী এবং মানুষের শক্তি ও সামর্থ্যরে বাইরে। যেহেতু আমি একজন নবী সেহেতু একজন নবী হিসাবে যদি তোমরা এ আহবান করে থাক তাহলে জেনে রাখ যে, নবী একজন আদেশপ্রাপ্ত ও আজ্ঞাবহ হওয়ার চেয়ে বেশি কিছু নন। মহান আল্লাহ্ তাঁকে

যা আদেশ দেন তিনি তা আঞ্জাম দেন; আর এ ক্ষেত্রে তাঁর নিজের কোন ইচ্ছাশক্তি ও চাওয়া-পাওয়াই নেই।

কুরাইশ নেতৃবর্গের বিরুদ্ধাচরণের কারণ

এ অংশটি ইসলামের ইতিহাসের অ তম আলোচ্য বিষয়। কারণ মানুষ চিন্তা করে দেখে যে, যদিও হযরত মুহাম্মদকে সকল কুরাইশ সত্যবাদী ও বি স্ত জানত এবং নবুওয়াতের ঘোষণা দেয়া পর্যন্ত তাঁর নিকট থেকে তারা এমনকি ছোট- খাটো স্খলনও প্রত্যক্ষ করে নি; তাঁর প্রাঞ্জল, সাবলীল ও বলিষ্ঠ বাণী (পবিত্র কোরআন) যা অন্তরসমূহকে আকৃষ্ট করত তারা তা শুনত; কখনো কখনো তারা তাঁর কাছ থেকে অলৌকিক কার্যাবলীও প্রত্যক্ষ করত যা স্বাভাবিক প্রাকৃতিক নিয়মবহির্ভূত ছিল। এত কিছু সত্ত্বেও তারা তাঁর বিরুদ্ধে কেন এতটা তীব্র বিরোধিতা করেছে?

তাদের বিরুদ্ধাচরণের কারণসমূহ নিম্নোক্ত কয়েকটি বিষয় হতে পারে :

১. মহানবীর প্রতি ঈর্ষা : একদল কুরাইশ মহানবীর প্রতি ঈর্ষা ও হিংসা পোষণ করার কারণে তাঁর অনুসরণ করতে পারে নি। আর তারা নিজেরাই নবুওয়াতের মতো ঐশী পদ ও দায়িত্ব লাভ করার দুরাশা পোষণ করত।

(و قالوا لولا نزّل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم)

" আর তারা বলত : দু'জনপদ অর্থাৎ মক্কা ও তায়েফের কোন একজন ধনাঢ্য ব্যক্তির ওপর যদি এ কোরআন অবতীর্ণ হতো "[২৮৪]- এ আয়াতটির শানে নুযূল প্রসে মুফাসসিরগণ বলেছেন, "ওয়ালীদ ইবনে মুগীরাহ্ মহানবীর সাথে দেখা করে বলেছিল : আমি তোমার চেয়ে নবুওয়াতের জ অধিকতর উপযুক্ত। কারণ আমি বয়স, ধন- সম্পদ এবং সন্তান- সন্ততির দিক থেকে তোমার চেয়ে অগ্রগামী ও শ্রেষ্ঠ।"[২৮৫]

উমাইয়্যাহ্ ইবনে আবীস সাল্ত ঐ সব ব্যক্তির অন্তর্ভুক্ত ছিল যারা ইসলাম ধর্মের আগেও মহানবীর ব্যাপারে আলোচনা করত। সে নিজেও এতটা আশাবাদী ছিল যে, সে নিজেই এ বিরাট পদমর্যাদা অর্থাৎ নবুওয়াতের মাকামের অধিকারী হবে। সে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত মহানবীর অনুসরণ করে নি এবং জনগণকে মহানবীর বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলত।

আখনাস ছিল মহানবীর আরেক শত্রু। সে আবু জাহলকে জিজ্ঞাসা করেছিল, "মুহাম্মদ সম্পর্কে তোমার অভিমত কি?" তখন সে বলেছিল, "আমরা এবং আবদে মান্নাফ কৌলী ও বংশগৌরবকে কেন্দ্র করে পরস্পর ঝগড়া করেছি। তাদের সাথে আমরা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছি। আমরা বেশ কিছু পদ্ধতি অবলম্বন করে তাদের সমকক্ষতা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছি। এখন যখন আমরা তাদের সমকক্ষ হয়েছি তখন তারা দাবি করছে যে, আমাদের গোত্রভুক্ত এক ব্যক্তির ওপর ওহী নাযিল হচ্ছে। খোদার শপথ, আমরা কখনই তার প্রতি ঈমান আনব না।"[২৮৬]

এ সব উদাহরণ থেকে হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রতি কুরাইশ নেতৃবৃন্দের হিংসা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যায়। ইতিহাসের পাতায় পাতায় আরো উদাহরণ রয়েছে যা আমরা এখানে উল্লেখ করলাম না।

২. শেষ বিচার দিবস অর্থাৎ কিয়ামত দিবসের ভীতি : এ বিষয়টি কুরাইশদের বিরুদ্ধাচরণের ক্ষেত্রে অ সকল কারণের চেয়ে অধিকতর কার্যকর ভূমিকা রেখেছিল। কারণ তারা ছিল স্ফূর্তিবাজ, আমোদ-প্রমোদপ্রিয় ও বন্ধনহীন। এ সব ব্যক্তি বছরের পর বছর অবাধ স্বাধীনতা ভোগ করে আসছিল। তারা হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর ইসলাম ধর্মের প্রতি আহবানকে তাদের চিরাচরিত পুরানো অভ্যাসের পরিপন্থী বলে শনাক্ত করে। তাই নিজেদের পুরানো অভ্যাস যা তাদের প্রবৃত্তির তাড়না ও প্রবণতার সাথে পূর্ণরূপে খাপ খেত তা ত্যাগ করা ছিল তাদের জ অত্যন্ত কষ্টকর।

৩. পরকালের শাস্তির ভয় : পবিত্র কোরআনের পারলৌকিক শাস্তি সংক্রান্ত আয়তসমূহ যা স্ফূর্তিবাজ, আমোদ-প্রমোদ ও বিলাস-ব্যসনে লিপ্ত, অত্যাচারী এবং উদাসীন লোকদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির ভয় দেখায় তা শোনার কারণে কুরাইশদের অন্তরে এক অদ্ভুত ভীতি ও শ ার উদ্ভব হতো এবং তাদের চিন্তাধারা বিক্ষিপ্ত ও বিড়ম্বিত হয়ে যেত। যখন মহানবী (সা.) সুললিত ক পরকাল সংক্রান্ত আয়াতগুলো কুরাইশদের সাধারণ সভা ও সমাবেশগুলোতে তেলাওয়াত করতেন তখন এত বেশি হৈ চৈ পড়ে যেত যে, তাদের আমোদ-প্রমোদের আসরগুলো ভণ্ডুল হয়ে যেত। আরবগণ নিজেদেরকে যে কোন ধরনের অনাকাঙ্ক্ষিত অবস্থা প্রতিহত করার জ প্রস্তুত

করে রাখত। জীবিকা নির্বাহের ব্যাপারে নিশ্চয়তা অর্জন করার জ   তীর নিক্ষেপ করে লটারী করত, পাথর দিয়ে শুভ- অশুভ নির্ণয় করত এবং পাখিদের আনাগোনাকে ভবি   ৎ ঘটনাসমূহের নিদর্শন বলে কল্পনা করত। এ সব কুসংস্কারাচ্ছন্ন আরব নিরাপত্তা নিশ্চিত করা ব্যতিরেকে হযরত মুহাম্মদ (সা.) যে শাস্তি সম্পর্কে তাদের ভয় দেখাতেন সে শাস্তি সম্পর্কে ধীরস্থির ও প্রশান্তভাবে বসে থাকতে মোটেও প্রস্তুত ছিল না। এ কারণেই তারা হযরত মুহাম্মদ (সা.)- এর বিরুদ্ধে তীব্র বিরোধিতায় লিপ্ত হয়। তারা জনগণের মাঝে প্রচার করত যাতে করে মুহাম্মদ (সা.)- এর সুসংবাদ ও ভীতি প্রদর্শনের প্রতি কর্ণপাত না করে। যে আয়াতগুলো কুরাইশদের আমোদ- প্রমোদপ্রিয় উদাসীন নেতৃবর্গের চিন্তা- চেতনা ও মন- মানসিকতাকে ভীষণভাবে নাড়া দিয়েছিল তন্মধ্যে কয়েকটি আয়াত নিচে উল্লেখ করছি :

(فإذا جاءت الصّاخّة يوم يفرّ المرء من أخيه و أمّه و أبيه و صاحبته و بنيه لكلّ امرئ مّنهم يومئذ شأن يُغنيه)

“ যে দিন পুনরুত্থান সংঘটিত হবে সে দিন মানুষ তার ভাই, মা, পিতা, স্ত্রী ও সন্তানদের থেকে পালিয়ে বেড়াবে। সকল মানুষ সে দিন নিজেকে নিয়েই মহাব্যস্ত হয়ে যাবে।”(সূরা আবাসা : ৩৩- ৩৭)

যখন তারা পবিত্র কাবার পাশে মদের পানপাত্রগুলো নিয়ে ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করত তখন এ আহবান তাদের কর্ণকুহরে প্রবেশ করত :

(كلّما نضجت جلودهم بدّلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب)

“ যখনই আগুনের উত্তাপে তাদের দেহের চামড়াগুলো নষ্ট হয়ে যাবে তখন তা আমরা পরিবর্তন করে দেব যাতে করে তারা শাস্তির স্বাদ আস্বাদন করে।”(সূরা নিসা : ৫৬)

উক্ত আহবান শোনামাত্রই তারা মানসিকভাবে এতটা অস্থির হয়ে যেত যে, অনিচ্ছাকৃতভাবে তারা তাদের পানপাত্রগুলো ছুঁড়ে ফেলে দিত এবং ভয়, শ   া ও কম্পন তাদের পুরো দেহকে আচ্ছন্ন করে রাখত।

৪. আরব মুশরিক সমাজের ভীতি : হারেস বিন নওফেল ইবনে আবদে মান্নাফ মহানবীর সান্নিধ্যে উপস্থিত হয়ে আরজ করেছিল, “আমরা জানি যে, তুমি যে ব্যাপারে ভয় প্রদর্শন করছ তা সত্য ও

সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর স্থাপিত। তবে যখনই আমরা ঈমান আনব তখনই মুশরিক আরবগণ আমাদেরকে আমাদের দেশ থেকে বিতাড়িত করবে।”এ ধরনের লোকদের বক্তব্যের জবাবে মহানবী (সা.)- এর ওপর নিম্নোক্ত আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছিল :

(و قالوا إن نتّبع الهدى معك نتخطّف من أرضنا أولم نمكّن لّهم حرما آمنا يُجبى إليه ثمرات كلّ شيء رّزقا مّن لّدنّا)

“ তারা বলে যে, যখনই আমরা এ হেদায়েতের অনুসরণ করব তখনই আমাদেরকে আমাদের দেশ ও জনপদ থেকে বিতাড়িত করা হবে। তাদের কথার জবাবে আপনি বলে দিন : আমরা কি নিরাপদ হারাম (সংরক্ষিত অঞ্চল) অর্থাৎ পবিত্র মক্কা নগরী তাদের কর্তৃত্বে দেই নি যেখানে আমাদের পক্ষ থেকে সব ধরনের ফল জীবিকাস্বরূপ সরবরাহ করা হয়।”(সূরা কাসাস : ৫৭)

মুশরিকদের কতিপয় আপত্তি

কখনো কখনো মুশরিকগণ বলত, শামদেশ এমনই এক দেশ যেখানে নবিগণ আবির্ভূত ও প্রেরিত হয়েছেন, অথচ এখন পর্যন্ত এ বালুকাময় মরু অঞ্চলে (মক্কায়) কোন নবী আবির্ভূত হয়েছেন তা প্রত্যক্ষ করা যায় নি।

ইয়া দীদের প্ররোচনায় প্ররোচিত হয়ে আরবের অনেক মুশরিক বলত যে, মুহাম্মদের ওপর কোরআন কেন পর্যায়ক্রমে অর্থাৎ ধাপে ধাপে অবতীর্ণ হয়? কেন তা তাওরাত ও ইঞ্জিলের মতো একত্রে একবারে অবতীর্ণ হয় না? পবিত্র কোরআন তাদের এ আপত্তিকে ব উল্লেখ করে বলেছে:

(و قال الّذين كفروا لولا نزّل عليه القرآن جملة واحدة كذالك لنثبّت به فؤادك و رتّلناه ترتيلا)

"কাফেররা বলে : এ কোরআন কেন তার ওপর একত্রে একবারে অবতীর্ণ হয় না? তাদের এ কথার জবাবে আপনি বলে দিন : আর এভাবেই আমরা এর মাধ্যমে (অর্থাৎ ধীরে ধীরে পর্যায়ক্রমে অবতীর্ণ করার মাধ্যমে) আপনার অন্তঃকরণকে প্রশান্ত ও সুদৃঢ় রাখব।"(সূরা ফুরকান : ৩২)

মুশরিকদের এ আপত্তির প্রতি পূর্ণ দৃষ্টি দিয়ে পবিত্র কোরআনের পর্যায়ক্রমিক অবতরণের বিষয়টি স্পষ্ট করে দেয়া হয়েছে। পবিত্র কোরআনের উপরিউক্ত বক্তব্য অসদুদ্দেশ্য পোষণকারী প্রাচ্যবিদদেরকে শক্তিশালী যুক্তি উপস্থাপন করার মাধ্যমে সম্পূর্ণরূপে নিরস্ত্র ও পরাভূত করেছে। এখন আমরা এ বিষয়টি একটু ব্যাখ্যা করব :

পবিত্র কোরআনের পর্যায়ক্রমিক অবতীর্ণ হওয়া

পবিত্র কোরআন অবতীর্ণ হওয়ার (নুযূল) অকাট্য ইতিহাস এবং এ গ্রন্থের সূরাসমূহের আয়াতগুলোর অন্তর্নিহিত অর্থ থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, এ ঐশী গ্রন্থের আয়াত ও সূরাসমূহ ধাপে ধাপে অবতীর্ণ হয়েছে। পবিত্র মক্কা ও মদীনা নগরীর পরিবেশ- পরিস্থিতির বৈশিষ্ট্যাবলী অধ্যয়ন করলে মাক্কী আয়াতসমূহকে মাদানী আয়াতসমূহ থেকে পৃথক ও শনাক্ত করা সম্ভব। শিরক ও মূর্তিপূজার বিরুদ্ধে সংগ্রাম, এক- অদ্বিতীয় মহান আল্লাহ্ এবং কিয়ামত দিবসে বি াস স্থাপনের প্রতি জনগণকে আহবান জানানো সংক্রান্ত আয়াতসমূহকে আবশ্যিকভাবে মাক্কী এবং বিধি- বিধান ও জিহাদের আহবান সংক্রান্ত আয়াতসমূহকে অবশ্যই মাদানী বলে গণ্য করতে হবে। কারণ পবিত্র মক্কা নগরীতে মহানবী (সা.)- এর বক্তব্য ও আহবানের উপলক্ষ ছিল মূর্তিপূজারী মুশরিকরা যারা মহান আল্লাহর একত্ব এবং কিয়ামত দিবসকে অস্বীকার করত। যে সব আয়াত এ সব বিষয় নিয়ে আলোচনা করে তা পবিত্র মক্কার পরিবেশে অবতীর্ণ হয়েছে। অথচ পবিত্র মদীনা নগরীতে ঈমানদার ব্যক্তিবর্গ, ইয়া দী ও ি ষ্টানরা ছিল মহানবী (সা.)- এর আহবান ও সম্বোধনের পাত্র এবং মহান আল্লাহর পথে জিহাদ ছিল মহানবীর অ তম গুরুত্বপূর্ণ কাজ। এ কারণেই শরীয়তের বিধি- বিধান, ইয়া দী- নাসারাদের ধর্ম এবং মহান আল্লাহর পথে জিহাদ ও আত্মোৎসর্গ করার আহবান সম্বলিত আয়াতসমূহই হচ্ছে মাদানী আয়াত।

পবিত্র কোরআনের ব আয়াত মহানবী (সা.)- এর সময় যে সব ঘটনা ঘটেছে সেগুলোর সাথে সরাসরি সম্পর্কিত। এ সব ঘটনাই ‘শানে নুযূল ’ নামে পরিচিত। এ সব শানে নুযূল সংক্রান্ত জ্ঞান সংশ্লিষ্ট আয়াতসমূহের অন্তর্নিহিত অর্থ ও তাৎপর্যের স্বচ্ছতার কারণ। আর এ সব ঘটনা ঘটার কারণেই পবিত্র কোরআনের আয়াতসমূহ ঐ সব প্রেক্ষাপটে অবতীর্ণ হয়েছে।

কিছু কিছু আয়াত প্রশ্নকারীদের প্রশ্নসমূহের উত্তর হিসাবে অবতীর্ণ হয়েছে এবং সেগুলো জনগণের প্রয়োজন ও চাহিদা মিটিয়েছে। কিছুসংখ্যক আয়াত ষ্টাতত্ত্ব জ্ঞান এবং শরীয়তের বিধি- বিধান

বর্ণনা ও ব্যাখ্যা করার জ   অবতীর্ণ হয়েছে। সুতরাং এ বিষয়টি বিবেচনা করে বলা যায় যে, মহানবী (সা.)- এর ওপর পবিত্র কোরআন ধাপে ধাপে অবতীর্ণ হয়েছে।

পবিত্র কোরআনও বেশ কিছু ক্ষেত্রে এ বিষয়টি স্পষ্ট করে দিয়েছে। এরশাদ হচ্ছে :

(و قرآنا فرقناه لتقرأه على النّاس على مكث)

"আমরা এ কোরআনকে ধাপে ধাপে অবতীর্ণ করেছি যাতে করে আপনি ধীরস্থিরভাবে জনগণের উদ্দেশে তা পড়ে শোনাতে পারেন।"(সূরা ইসরা : ১০৬)

এখন হয়তো এ প্রশ্নটি উত্থাপিত হতে পারে যে, পুরো কোরআন কেন একসে   মহানবীর ওপর অবতীর্ণ হয় নি? কেন এ গ্রন্থটি তাওরাত ও ইঞ্জিলের   ায় মহানবী (সা.)- এর হাতে সঁপে দেয়া হয় নি? উল্লেখ্য যে, পুরো তাওরাত ও ইঞ্জিল একবারেই অবতীর্ণ হয়েছিল।

বর্তমানেই কেবল এ প্রশ্নটি উত্থাপন করা হয় নি, বরং মহানবী (সা.)- এর সমসাময়িক বিরোধী ও শত্রুরাও রিসালাতের যুগে সমালোচনার দৃষ্টিকোণ থেকে উক্ত প্রশ্ন উত্থাপন করেছে। তারা বলত, لولا نزّل عليه القرآن جملة واحدة " তার ওপর কেন সম্পূর্ণ কোরআন একত্রে একবারে অবতীর্ণ করা হয় নি?"

এদের প্রতিবাদ ও আপত্তিটিকে দু'ভাবে ব্যাখ্যা করা যায় :

১. যদি ইসলাম ধর্ম ঐশী ধর্ম এবং এ গ্রন্থ ঐশী গ্রন্থ হয়ে থাকে যা মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে হযরত মুহাম্মদ (সা.)- এর ওপর অবতীর্ণ হয়েছে তাহলে অবশ্যই এটি একটি পূর্ণা   ধর্ম হবে। আর মহান আল্লাহ্ অবশ্যই এ ধরনের একটি পূর্ণা   ধর্ম ওহীর ফেরেশতাদের মাধ্যমে একত্রে একবারে মহানবী (সা.)- এর ওপর অবতীর্ণ করবেন। তাই কখনো এ গ্রন্থের আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হওয়ার ক্ষেত্রে বিরতি থাকা বাঞ্ছনীয় নয়। কারণ যে ঐশী ধর্ম সমুদয় মৌলিক আকীদা- বি াস (উসূল), খুঁটিনাটি শাখাগত দিক (ফুরু), বিধি- বিধান, ফরয, সুন্নাহর দৃষ্টিকোণ থেকে পূর্ণতাপ্রাপ্ত তা ২৩ বছরে বিভিন্ন উপলক্ষ ও প্রেক্ষাপটে ধাপে ধাপে অবতীর্ণ হওয়ার কোন কারণই থাকতে পারে না। যেহেতু পবিত্র কোরআন বিক্ষিপ্তভাবে কতগুলো প্রশ্ন এবং বিশেষ কতগুলো ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে তাই ধারণা করা যায় যে, এ ধর্মটি মৌলিক আকীদা- বি াস ও

খুঁটিনাটি শাখাগত বিধি- বিধানের দৃষ্টিকোণ থেকে পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয় নি এবং ধীরে ধীরে তা নিজেকে পূর্ণতার রঙে রাি য়েছে। আর এ ধরনের অপূর্ণা ধর্ম যা ধীরে ধীরে পূর্ণতাভিমুখে অগ্রসর হয়েছে তা ঐশী ধর্ম বলে অভিহিত করা সমীচীন ও যুক্তিসংগত নয়।

২. পবিত্র কোরআনের আয়াতসমূহ এবং তাওরাত, ইঞ্জিল ও যবুরের অকাট্য ইতিহাস থেকে প্রতীয়মান হয় যে, উক্ত ঐশী গ্রন্থত্রয় লিখিত ফলক আকারে নবীদের ওপর অবতীর্ণ হয়েছিল। তাই পবিত্র কোরআন কেন এভাবে অবতীর্ণ হয় নি? যেমন পবিত্র কোরআন কেন তাওরাতের মতো কতগুলো ফলকে উৎকীর্ণ করে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)- এর হাতে দেয়া হয় নি?

যেহেতু কুরাইশ বংশীয় মুশরিকগণ এ ধরনের আসমানী গ্রন্থসমূহে বি াস করত না এবং এ সব গ্রন্থের নুযূল সম্পর্কে তাদের সম্যক জ্ঞান ও ধারণা ছিল না তাই বলা যায় যে, এ আপত্তির ক্ষেত্রে তাদের দৃষ্টিভি ছিল সেই প্রথম দৃষ্টিভি র অনুরূপ যা ইতোমধ্যে বর্ণিত হয়েছে। আর এ দৃষ্টিভি টির সারসংক্ষেপ : কেন ওহীর ফেরেশতা কোরআনের সমুদয় আয়াত একত্রে একবারে তাঁর ওপর অবতীর্ণ করেন নি, বরং এ সব আয়াত সময়ের ব্যবধানে বিভিন্ন উপলক্ষে তাঁর ওপর অবতীর্ণ হয়েছে?

ধাপে ধাপে অবতীর্ণ হওয়ার অন্তর্নিহিত মূল রহস্য

এ সব ব্যক্তির আপত্তির জবাবস্বরূপ পবিত্র কোরআন পর্যায়ক্রমে ধাপে ধাপে আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হওয়ার পেছনে লুক্কায়িত কারণগুলো প্রকাশ্যে বর্ণনা করেছে। এখন আমরা এ অংশটি একটু বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করব যার প্রতি পবিত্র কোরআন একটি ছোট বাক্যের মাধ্যমে ইি ত করেছে :

১. মহানবী (সা.)- এর অনেক বড় বড় দায়িত্ব ছিল। রিসালাতের বিবিধ দায়িত্ব পালন করার পথে তাঁকে অনেক ভয় র সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে।

আত্মা ও মন (আত্মিক ও মানসিক মনোবল) যত বড়ই হোক না কেন এ ধরনের সমস্যাসমূহ কর্মচাঞ্চল্য ও উদ্দীপনায় ভাটা পড়ার কারণ হয়। তাই এ সময় অতিপ্রাকৃতিক জগতের সাথে পুনরায় সম্পর্ক স্থাপন ও যোগাযোগ এবং মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে ফেরেশতার ওহীসহ অবতরণের পুনরাবৃত্তি মানুষের আত্মায় শক্তি জোগায় এবং তার চিত্ত ও মনকে কর্মচাঞ্চল্য ও আধ্যাত্মিকতায় পরিপূর্ণ করে দেয়। আর মহান আল্লাহর বিশেষ সুদৃষ্টি এবং তাঁর অফুরন্ত ভালোবাসা ও দয়াও ওহী অবতরণের পুনরাবৃত্তি ঘটার মাধ্যমে নবায়িত হয়।

পবিত্র কোরআন এ ধরনের মনস্তাত্ত্বিক বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেছে :

(كذالك لنثبّت به فؤادك)

"আপনার অন্তঃকরণ শক্তিশালী ও দৃঢ় করার জ   আমরা ধাপে ধাপে পবিত্র কোরআন অবতীর্ণ করেছি।"

২. উক্ত আয়াতটি উপরিউক্ত দিকটি ছাড়াও আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ দিকের প্রতিও লক্ষ্য স্থির করেছে বলে মনে করা যায়; আর তা হলো শিক্ষামূলক কল্যাণ ও উপকারিতার জ   পবিত্র কোরআনের যে ধাপে ধাপে অবতীর্ণ হওয়া বাঞ্ছনীয় তা অবধারিত করে দেয় এবং তা এভাবেই মানব জাতির হেদায়েতের জ   অবতীর্ণ হয়েছে। কারণ মহানবী (সা.) ছিলেন তাঁর উম্মতের আদর্শ শিক্ষক ও আত্মিক চিকিৎসক। তাই ঐশী সমাধানসহ মানব জাতির শিক্ষা- প্রশিক্ষণ এবং

সামাজিক সমস্যা ও দুঃখ- কষ্টের সুষ্ঠু সমাধান করার লক্ষ্যে এ গ্রন্থ ধাপে ধাপে অবতীর্ণ হওয়ার জ মনোনীত হয়েছে। মহান আল্লাহর বিধি- বিধান বাস্তবে প্রয়োগ করার মাধ্যমে তাদের রোগ উপশম ও আরোগ্য করার জ ও তা (এ গ্রন্থটি) মনোনীত হয়েছে।

ঐ শিক্ষাপদ্ধতি হচ্ছে সবচেয়ে কার্যকর ও শক্তিশালী যার জ্ঞানগত দিকগুলো ব্যবহারিক দিকগুলোর সাথে মিলেমিশে আছে। শিক্ষক ছাত্রদেরকে যা কিছু শিখান তাৎক্ষণিকভাবে তিনি তা তাদেরকে হাতে- কলমে (ব্যবহারিকভাবে) দেখিয়েও দেন। তিনি তাঁর তত্ত্বসমূহকে ব্যবহারিক গবেষণায় রূপ দান করেন। তাঁর চিন্তাধারা ও তত্ত্বগুলো যেন নিছক অবাস্তব তত্ত্ব ও প্রকল্পের রঙে রঞ্জিত না হয় সে দিকেও তিনি খুব সতর্ক দৃষ্টি রাখেন।

চিকিৎসাশাস্ত্রের অধ্যাপক যদি কেবল চিকিৎসাবিজ্ঞানের সর্বজনীন সূত্র এবং মূলনীতিসমূহের ওপর তাত্ত্বিক পাঠ দান করেন তাহলে তা তেমন কোন ফল বয়ে আনবে না। তবে তিনি যদি ছাত্রদের চোখের সামনে একটি রোগীর ক্ষেত্রে ঐ সব নিয়ম, সূত্র ও মূলনীতিসমূহ প্রয়োগ করেন এবং তাঁর বক্তব্যকে ব্যবহারিক শিক্ষায় রূপান্তরিত করেন তাহলে তিনি বেশি ফল লাভ করতে পারবেন।

পবিত্র কোরআনের আয়াতসমূহ যদি একত্রে একবারে অবতীর্ণ হতো (যদিও মুসলিম সমাজ তখনও এগুলোর অনেকগুলোর প্রতি মুখাপেক্ষী ছিল না তবুও) এ ক্ষেত্রে পবিত্র কোরআন ঐ ধরনের শ্রেষ্ঠত্ব বিবর্জিত হতো যা আমরা ইতোমধ্যে উল্লেখ করেছি। জনগণ যে সব আয়াত শিক্ষা করা অর্থাৎ যেগুলো সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করার ব্যাপারে তেমন কোন প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে না সে সব আয়াতের বর্ণনা ও ব্যাখ্যা মানুষের অন্তরে তেমন লক্ষণীয় প্রভাব ফেলত না। তবে ওহীর ফেরেশতা যদি পবিত্র কোরআনের ঐ আয়াতসমূহ অবতীর্ণ করেন জনতা যেগুলো শেখা ও যেগুলো সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে তাহলে নিঃসন্দেহে ও তর্কাতীতভাবে এ সব আয়াত জনগণের দয়ে অধিক ইতিবাচক প্রভাব রাখবে এবং মানুষের অন্তরের অন্তস্তলে এগুলো সুগ্রথিত হয়ে যাবে। আর তারাও ঐ সব আয়াতের শব্দ ও অর্থ শেখার ব্যাপারে অধিক প্রস্তুতি গ্রহণ করবে ও মনোযোগী হবে। এ সব কিছুর চেয়েও বড় কথা

হচ্ছে, তারা এ সব শিক্ষার পরিণতি ও ফলাফলসমূহকে প্রকৃতপ্রস্তাবে মহানবীর শিক্ষা বলেই উপলব্ধি করবে। এখানেই প্রশিক্ষকের বক্তব্য ও বাণী ফলাফলের সাথে একীভূত হয়ে যায়। আর সকল তত্ত্বও ব্যবহারিক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হয়।

এখানে একটি প্রশ্নের উত্তর এখনও অবশিষ্ট থেকে যাচ্ছে। আর তা হলো পবিত্র কোরআনের আয়াতসমূহের অবতীর্ণ হওয়া যদি ধাপে ধাপে এবং বিভিন্ন ধরনের প্রয়োজন ও ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সম্পন্ন হয়ে থাকে তাহলে আয়াতসমূহের অন্তর্নিহিত সম্পর্ক নষ্ট হয়ে যাবে। মানুষ এ সব আয়াতের অন্তর্নিহিত জ্ঞান শিক্ষা,আয়ত্তকরণ,মুখস্থকরণ ও সংরক্ষণের ব্যাপারে মোটেও আগ্রহ প্রদর্শন ও উদ্যোগ গ্রহণ করবে না। তবে সম্পূর্ণ পবিত্র কোরআন যদি একত্রে একবারে অবতীর্ণ হয় এবং ওহীর ফেরেশতা যদি কোরআনের সকল আয়াত একত্রে একবারে (মহানবীর কাছে) তেলাওয়াত করেন তাহলে মহান আল্লাহর ওহীর (সাথে সংশ্লিষ্ট) সকল বিষয়ের আন্তঃসম্পর্ক সম্পূর্ণরূপে অটুট ও সংরক্ষিত থাকবে। আর এ সব আয়াতের অন্তর্নিহিত অর্থ ও জ্ঞান শেখার ব্যাপারে বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যকার ঝোঁক,আগ্রহ ও উদ্যোগ ব গুণ বৃদ্ধি পাবে। পবিত্র কোরআন খুব ছোট একটি বাক্যের দ্বারা এ প্রশ্নের উত্তরও দিয়েছে। এরশাদ হচ্ছে : কোরআনের আয়াতসমূহ যে ধীরে ধীরে এবং বেশ কিছু উপলক্ষ ও কারণের পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে তা ঠিক,তবে এ ধরনের পর্যায়ক্রমিক অবতরণ এ গ্রন্থের বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যকার পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে কোন বাধাই নয়। মহান আল্লাহ্ এ গ্রন্থের আয়াতসমূহের মধ্যে এমন এক বিশেষ সামঞ্জস্যতা দান ও আন্তঃসম্পর্ক সৃষ্টি করেছেন যে,এর ফলে মানুষের উচ্চাশা ও সাহস তাকে পবিত্র কোরানের আয়াত শিখতে ও মুখস্থ করতে সক্ষম করে তোলে। এ বিষয়টি নিম্নোক্ত আয়াতটিতেও উল্লিখিত হয়েছে : (و رتّلناه ترتيلا) "আর আমরা কোরআনের আয়াতসমূহে এক বিশেষ শৃঙ্খলা দান করেছি।"

কোরআন ধাপে ধাপে অবতীর্ণ হওয়ার অন্যান্য কারণ

৩. মহানবী (সা.) তাঁর রিসালাত অর্থাৎ ইসলাম ধর্ম প্রচারের দায়িত্ব পালনকালে বিভিন্ন ধরনের গোষ্ঠী, যেমন মূর্তিপূজক, ইয়া দী এবং ি ষ্টধর্মাবলম্বীদের সম্মুখীন হয়েছিলেন। এ সব গোষ্ঠীর প্রতিটি স্বতন্ত্র মতাদর্শের অনুসারী ছিল এবং প্রতিটি গোষ্ঠী ষ্টা, পরকাল এবং অ । বুদ্ধিবৃত্তিক জ্ঞানের ব্যাপারে স্বতন্ত্র আকীদা- বি াস পোষণ করত। এ সব সাক্ষাৎ, কথাবার্তা ও আলাপ-আলোচনা অনুষ্ঠিত হওয়ার কারণেই ঐশী বাণী ঐ সব ধর্মীয় গোষ্ঠীর আকীদা- বি াস এবং অভিমতের বস্তুনিষ্ঠ সমালোচনা ও ব্যাখা- বিশ্লেষণ (করেছে) এবং তাদের ধর্মসমূহ অপনোদন করার যুক্তি ও প্রমাণের অবতারণা করেছে (যদিও বিধর্মীদের পক্ষ থেকে কোন আবেদনও জানানো হয় নি)। এ ধরনের দেখা- সাক্ষাৎ, আলাপ- আলোচনা ও কথোপকথন বিভিন্ন সময় অনুষ্ঠিত হয়েছে; এ কারণেই বিভিন্ন সময় ও উপলক্ষে ধাপে ধাপে অবতীর্ণ ওহীর মাধ্যমে বিধর্মীদের আকীদা- বি াসের ভিত্তিহীনতা বর্ণনা করা এবং ইসলামধর্ম বিরোধীদের উত্থাপিত বিভিন্ন আপত্তি ও সন্দেহ- সংশয়ের সঠিক উত্তর দেয়া ছাড়া আর কোন উপায়ও ছিল না।

কখনো কখনো এ ধরনের সাক্ষাৎ, আলোচনা এবং কথোপকথনের কারণে বিধর্মীরা মহানবীর কাছে বিভিন্ন ধরনের প্রশ্ন করত এবং মহানবীও তাদের ঐ সব প্রশ্নের সঠিক জবাব দিতেন। যেহেতু বিভিন্ন সময় ও উপলক্ষে তাদের এ সব প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে তাই বিভিন্ন সময় ধাপে ধাপে ওহী অবতীর্ণ হওয়া ছাড়া এর আর কোন বিকল্পও ছিল না।

এ ছাড়াও মহানবীর জীবন ছিল একটি ঘটনাব ল বি বী জীবন। তিনি এমন বিপুল সংখ্যক ঘটনার সম্মুখীন হয়েছিলেন যেগুলোর বিধি- বিধান এবং ধর্মীয় দায়িত্ব ঐশী বাণীর মাধ্যমে স্পষ্ট হওয়া বাঞ্ছনীয়।

কখনো কখনো সাধারণ মানুষ তাদের দৈনন্দিন জীবনে এমন কিছু ঘটনা প্রবাহের সম্মুখীন হতো যার কারণে মহানবীর শরণাপন্ন হয়ে এ ধরনের ঘটনার ক্ষেত্রে মহান আল্লাহর বিধান কি হবে সে

ব্যাপারে প্রশ্ন করত; আর যেহেতু বিভিন্ন সময় এ ধরনের ঘটনা ঘটত ও এ সব প্রশ্ন উত্থাপিত হতো তাই ওহীর মাধ্যমে এ সব প্রশ্নের পর্যায়ক্রমে উত্তর দেয়া ছাড়া আর কোন উপায়ও ছিল না। পবিত্র কোরআনের নিম্নোক্ত আয়াতে এ সব বিষয় ও অ া বিষয়ের দিকে ই ি ত করে বলা হয়েছে:

(و لا يأتونك بمثل إلّا جئناك بالحقّ و أحسن تفسيرا)

"আপনার ওপর তারা কোন খুঁত ধরতে সক্ষম নয়; (তারা যা কিছুই উত্থাপন করুক না কেন) আমরা আপনার কাছে সত্য এনে দিয়েছি এবং সর্বোত্তম পন্থায় (সব বিষয়ের) ব্যাখ্যা প্রদান করেছি।"(সূরা ফুরকান : ৩৩)

৪. এ সব কিছু ছাড়াও পবিত্র কোরআনের পর্যায়ক্রমিক অবতরণের আরো একটি অন্তর্নিহিত রহস্য বা কারণ আছে, যে বিষয়ে জনগণ ছিল অমনোযোগী। আর তা হলো মানব জাতিকে পবিত্র কোরআনের উৎসের (মহান আল্লাহর) দিকে এবং এ বিষয়ের দিকে পরিচালিত করা যে, এ গ্রন্থটি মহান আল্লাহর ঐশী গ্রন্থ। আর তা কখনই মানবরচিত নয়। কারণ পবিত্র কোরআন দীর্ঘ ২২ বছর ধরে বিভিন্নধর্মী ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে। আর এ সব ঘটনা দুঃখ, যন্ত্রণা, হাসি-আনন্দ ও সফলতামণ্ডিত ছিল (অর্থাৎ কোন কোন ঘটনা ছিল বিষাদময়, আবার কতিপয় ঘটনা ছিল আনন্দঘন ও সাফল্যমণ্ডিত)। নিশ্চিতভাবে এ ধরনের বিভিন্ন অবস্থা এবং পরস্পর বিপরীত আবেগ- অনুভূতি মানুষের আত্মা ও মন- মানসিকতার ওপর গভীর প্রভাব বিস্তার করে। এ ধরনের পরস্পর বিপরীত অবস্থায় কোন মানুষের পক্ষেই সব সময় এক ধাঁচে কথা বলা কখনই সম্ভব নয়; কারণ আনন্দ ও প্রফুল্লতার মধ্যে মানুষের ক ধ্বনিত ও লিখনীর মাধ্যমে প্রকাশিত কথা ও বাণী এবং দুঃখ, অবসাদ, ক্লান্তি এবং ব্যথা- বেদনার মধ্যে মানুষের ক নিঃসৃত কথা ও বাণীর মধ্যে ভাষার প্রাঞ্জলতা, সাবলীলতা, শব্দের সৌন্দর্য এবং গভীর অর্থ ও তাৎপর্যের দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাপক পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। যদিও পবিত্র কোরআন মহানবীর ওপর বিভিন্ন ঘটনা ও পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয়েছে তবুও এ গ্রন্থের বিভিন্ন আয়াতে শব্দ ও অর্থের দৃষ্টিতে ছোট- খাটো পার্থক্যও বিদ্যমান নেই। আর এ সব আয়াত এমন এক ভাষাগত মান ও পর্যায়ে

অধিষ্ঠিত যে, এ গ্রন্থের কোন একটি আয়াত ও সূরার সমমানের অনুরূপ কোন কিছু রচনা করা কোন মানুষের পক্ষেই সম্ভব নয়। যেন পবিত্র কোরআন এমন এক গলিত রৌপ্যসদৃশ যা একবারেই ছাঁচ থেকে বের করে আনা হয়েছে।

এ গ্রন্থের আয়াতসমূহের মাঝে কোন দুর্বলতা ও পার্থক্য বিদ্যমান নেই বরং এক অন রত্ন ও রাজোচিত মুক্তার ায় যার শেষাংশ প্রথমাংশের ায়।

আর সম্ভবত নিচের আয়াতটি যা পবিত্র কোরআনে যে কোন ধরনের পার্থক্যের অস্তিত্ব প্রত্যাখ্যান করে বলে, 'যদি তা আল্লাহ্ ছাড়া অ কোন পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হতো তাহলে এতে অনেক পার্থক্য থাকত ' , তা অন্তর্নিহিত এ কারণ বা রহস্যটির দিকেই ইি তস্বরূপ। আয়াতটি হলো :

(و لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا)

"আর যদি তা আল্লাহ্ ব্যতীত অ কোন সত্তার কাছ থেকে অবতীর্ণ হতো তাহলে তারা এতে প্রচুর পার্থক্য ও বৈপরীত্য খুঁজে পেত।"(সূরা নিসা : ৮২)

তাফসীরকারগণ এ আয়াতটিকে কোরআনের আয়াতসমূহের অন্তর্নিহিত অর্থের পার্থক্য ও বৈপরীত্যের সাথেই সংশ্লিষ্ট বলে মনে করেন, অথচ এ আয়াতটি এ ধরনের কোন পার্থক্য দূরীভূত করে না, বরং পবিত্র কোরআনকে সব ধরনের পার্থক্য ও বৈপরীত্য- যা মানবীয় কাজেরই অনিবার্য পরিণতি তা থেকে পবিত্র ও মুক্ত করে।

সপ্তদশ অধ্যায়হিজরত :

প্রথম হিজরত

হাবাশা বা আবিসিনিয়ায়[২৮৭] একদল মুসলমানের হিজরত তাঁদের গভীর ঈমান ও নিষ্ঠারই স্পষ্ট দলিল। একদল মুসলমান কুরাইশদের উৎপীড়ন ও নির্যাতনের হাত থেকে রেহাই পাওয়া, নির্বিঘ্নে ধর্মীয় আচার- অনুষ্ঠানাদি পালন এবং এক- অদ্বিতীয় মহান আল্লাহর ইবাদাত- বন্দেগী করার জ শান্ত ও উপযুক্ত পরিবেশ খুঁজে পাওয়ার লক্ষ্যে পবিত্র মক্কা নগরী ত্যাগ এবং ব্যবসা- বাণিজ্য, পেশা, স্ত্রী- পরিবার, সন্তান- সন্ততি পরিহার করে অ ত্র যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। কিন্তু তারা কোথায় যাবে, কি করবে- এ ব্যাপারে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েছিল। কারণ তারা দেখতে পাচ্ছিল যে, সমগ্র আরব উপদ্বীপ জুড়ে ছিল মূর্তিপূজা ও মূর্তিপূজকদের আধিপত্য। আরব উপদ্বীপের কোন অঞ্চলেই তাওহীদের ধ্বনি তোলা এবং একত্ববাদী ধর্মের বিধি- বিধান পালন করা সম্ভব ছিল না। যে নবীর ধর্মের মূল ভিত্তি ছিল 'নিশ্চয়ই আমার জমিন প্রশস্ত। অতএব, তোমরা একমাত্র আমারই ইবাদাত কর '[২৮৮]- এ আয়াতের ওপর প্রতিষ্ঠিত সেই নবীর কাছে হিজরতের প্রস উত্থাপন করাই যে সবচেয়ে উত্তম হবে এ ব্যাপারে তারা চিন্তা করল।

আর মহানবীও মুসলমানদের শোচনীয় অবস্থা সম্পর্কে পূর্ণরূপে অবগত ছিলেন। যদিও তিনি বনি হাশিমের পূর্ণ সাহায্য- সমর্থন এবং পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করতেন এবং তারা তাঁকে সব ধরনের অনিষ্ট ও ক্ষতি থেকে রক্ষা করতেন, তথাপি তাঁর স ী- সাথী ও অনুসারীদের মধ্যে দাস- দাসী, আশ্রয়হীন মুক্ত ব্যক্তি এবং পৃষ্ঠপোষকহীন দুর্বল ব্যক্তিদের সংখ্যা কম ছিল না। আর কুরাইশ নেতৃবর্গ এ সব ব্যক্তির ওপর নির্যাতন করা থেকে মুহূর্তের জ ও বিরত থাকত না। যাতে করে আন্তঃগোত্রীয় কলহ ও যুদ্ধ- বিগ্রহের উদ্ভব না হয় সেজ প্রতিটি গোত্রের নেতা এবং ক্ষমতাশালী ব্যক্তিবর্গ উক্ত গোত্রের যে সব ব্যক্তি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করত তাদের ওপর অকথ্য নির্যাতন চালাত। আর আপনারা এ সব লোমহর্ষক নির্যাতন ও অত্যাচারের কাহিনী পূর্ববর্তী অধ্যায়সমূহে পড়েছেন।

এ সব কারণে সাহাবিগণ যখন মহানবীর কাছে হিজরত করার ব্যাপারে তাঁদের ধর্মীয় দায়িত্ব ও কর্তব্যের কথা জিজ্ঞাসা করেছিলেন তখন মহানবী বলেছিলেন,

لو خرجتم إلى أرض الحبشة فإنّ بها ملكا لا يُظلم عنده أحد و هي أرض صدق، حتّى يجعل الله لكم فرجا ممّا أنتم فيه

"যদি তোমরা হাবাশায় হিজরত কর তাহলে তা তোমাদের জ অত্যন্ত উপকারী হবে। কারণ সেখানে একজন শক্তিশালী ায়পরায়ণ বাদশাহ্ আছেন যাঁর সামনে কোন ব্যক্তির ওপর বি মাত্র অত্যাচার করা হয় না। সে দেশটি সত্য ও পুণ্যভূমি। তোমাদের জ মহান আল্লাহ্ কর্তৃক মুক্তির পথ বাতলে দেয়া পর্যন্ত তোমরা সে দেশটিতে বসবাস করতে পার।"[২৮৯]

হ্যাঁ, যে পবিত্র পরিবেশ ও অঞ্চলের যাবতীয় বিষয়ের দায়িত্বভার একজন উপযুক্ত ায়পরায়ণ শাসনকর্তার হাতে স্ত সে দেশ বা অঞ্চলটি হচ্ছে মর্ত্যলোকে স্বর্গরাজ্যের নমুনাস্বরূপ। আর মহানবীর সাহাবীদের একমাত্র আশা- আকাঙ্ক্ষাই ছিল এ ধরনের একটি পুণ্যভূমি খুঁজে বের করা যেখানে তাঁরা পূর্ণ নিরাপত্তা ও নিশ্চয়তার সাথে তাঁদের ধর্মীয় দায়িত্ব আঞ্জাম দিতে পারবেন।

মহানবী (সা.)- এর দয়গ্রাহী বক্তব্য তাঁদের ওপর এতটা প্রভাব বিস্তার করেছিল যে, তাঁরা অনতিবিলম্বে মক্কার মুশরিকদের বুঝে ওঠার আগেই কেউ পায়ে হেঁটে, আবার কেউ সওয়ারী পশুর ওপর চড়ে রাতের আঁধারে জেদ্দা বন্দরের পথ ধরে যাত্রা শুরু করে। এবারে তাঁদের মোট সংখ্যা ছিল ১০ অথবা ১৫ জন এবং তাঁদের মধ্যে ৪ জন মুসলিম নারীও ছিলেন।[২৯০]

এখানে আমাদের অবশ্যই একটু চিন্তা করে দেখা দরকার যে, মহানবী (সা.) কেন হিজরতের জ হাবাশা ব্যতীত অ কোন দেশ বা স্থানের নাম প্রস্তাব করেন নি? আরব উপদ্বীপ এবং অ া সব এলাকা ও দেশের অবস্থা ও পরিবেশ অধ্যয়ন করলেই হাবাশাকে হিজরতের স্থল হিসাবে বাছাই করার কারণ স্পষ্ট হয়ে যাবে। কারণ আরব উপদ্বীপের সকল এলাকাই ছিল সাধারণত মুশরিকদের করায়ত্তে। তাই এ সব এলাকায় হিজরত করা ছিল বিপজ্জনক। মুশরিকরা কুরাইশদেরকে সন্তুষ্ট করার জ অথবা পূর্বপুরুষদের ধর্মের প্রতি টান থাকার কারণে হিজরতকারী মুসলমানদেরকে আশ্রয় দান করা থেকে বিরত থাকত। আর আরব উপদ্বীপের ি ষ্টান

ও ইয়া দী অধ্যুষিত অঞ্চলসমূহও মুসলমানদের হিজরতের জ উপযুক্ত স্থান ছিল না। কারণ তারা পরস্পরের ওপর ধর্মীয় প্রভাব বিস্তার করার জ যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত ছিল। তাই তাদের এলাকাসমূহে তৃতীয় প্রতিপক্ষের আগমনের কোন প্রেক্ষাপটেরই অস্তিত্ব ও সুযোগ ছিল না। অধিকন্তু এ গোষ্ঠীদ্বয় (ি ষ্টান ও ইয়া দী) আরব জাতিকে হীন ও নীচ বলে গণ্য করত।

ইয়েমেন পারস্য সম্রাটের শাসনাধীন ছিল। আর ইয়েমেনে মুসলমানদের হিজরত ও বসবাস করার ব্যাপারে ইরানী প্রশাসনিক কর্মকর্তাগণ রাজী ছিলেন না, এমনকি মহানবী (সা.)-এর চিঠি পারস্য সম্রাট খসরু পারভেজের হাতে পৌঁছলে তিনি তাৎক্ষণিকভাবে ইয়েমেনের শাসনকর্তাকে লিখিত আদেশ দিয়ে বলেছিলেন, "নব আবির্ভূত নবীকে গ্রেফতার করে ইরানে পাঠিয়ে দাও।"

ইয়েমেনের মতো হীরাও ছিল পারস্য সাম্রাজ্যের শাসনাধীন। শাম ছিল পবিত্র মক্কা নগরী থেকে ব দূরে। অধিকন্তু ইয়েমেন ও শাম ছিল কুরাইশদের বাজার এবং এ সব এলাকার অধিবাসীদের সাথে কুরাইশদের ছিল ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ও সম্পর্ক। মুসলমানরা যদি ঐ সব অঞ্চলে আশ্রয় নিত তাহলে নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, কুরাইশদের অনুরোধে তাদেরকে ঐ সব জনপদ থেকে বহিষ্কার করা হতো। দৃষ্টান্তস্বরূপ হাবাশার বাদশার কাছে এ ধরনের আবেদন করা হয়েছিল যদিও তিনি তা গ্রহণ করেন নি।

সে যুগে শিশু ও নারীদের সাথে নিয়ে সমুদ্রপথে ভ্রমণ করা ছিল অত্যন্ত কষ্টসাধ্য ও দুরূহ ব্যাপার। এ ভ্রমণ ও জীবনের মায়া ত্যাগ করাটা ছিল নিঃসন্দেহে তাঁদের পবিত্র ঈমান ও নিষ্ঠার পরিচায়ক।

তখনকার জেদ্দা বন্দর ছিল আজকের ায় মহাব্যস্ত বাণিজ্যিক বন্দর। সৌভাগ্যক্রমে দু'টি বাণিজ্যিক জাহাজ হাবাশা গমনের অপেক্ষায় ছিল। কুরাইশদের পিছু নেয়ার ভয়ে মুসলমানরা হাবাশা গমনের ব্যাপারে নিজেদের প্রস্তুতির কথা ঘোষণা করে এবং অর্ধ দিনার প্রদান করার মাধ্যমে অত্যন্ত তাড়া ড়া করে তারা জাহাজে চড়ে। একদল মুসলমানের ভ্রমণ ও দেশ ত্যাগের সংবাদ মক্কার মুশরিক নেতাদের কানে পৌঁছলে তারা তৎক্ষণাৎ দেশত্যাগী মুসলমানদেরকে পবিত্র মক্কা নগরীতে ফিরিয়ে আনার জ একদল ব্যক্তিকে দায়িত্ব প্রদান করে। কিন্তু তাদের

জেদ্দার সমুদ্রোপকূলে পৌঁছানোর আগেই জাহাজদ্বয় বন্দর ত্যাগ করে হাবাশার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে গিয়েছিল। মুসলমানদের এ দলটির হিজরত ও দেশ ত্যাগ নবুওয়াতের ৫ম বর্ষের রজব মাসে সংঘটিত হয়েছিল।

যে ক্ষুদ্র গোষ্ঠীটি নিজেদের ধর্মরক্ষার্থে বিদেশে আশ্রয় নিয়েছিল তাদের পশ্চাদ্ধাবন আসলে কুরাইশদের জঘ পাপাচারের আরেকটি স্পষ্ট নমুনা। মুহাজিরগণ নিজেদের সন্তান- সন্ততি, পরিবার- পরিজন, ঘর- বাড়ি, ধন- সম্পদ এবং ব্যবসা- বাণিজ্য সব কিছু ছেড়ে দেশ ত্যাগ করেছিল, কিন্তু তারপরও মক্কার কাফের- মুশরিক নেতৃবর্গ তাদের পিছু ছাড়েনি। হ্যাঁ, দারুন নাদওয়ার নেতৃবর্গ বেশ কিছু কারণবশত মুসলমানদের এ সফর ও হিজরতের অন্তর্নিহিত রহস্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবগত ছিল বলেই বেশ কিছু ব্যাপারে নিজেদের মধ্যে গোপনে আলোচনা করেছিল যা আমরা পরবর্তীতে বিস্তারিত ব্যাখ্যা করব।

ক্ষুদ্র এ দলটির সবাই একই গোত্রভুক্ত ছিল না। এ দশ মুহাজিরের প্রত্যেক ব্যক্তিই ভিন্ন ভিন্ন গোত্রভুক্ত ছিল। এ হিজরতের পরপরই মুসলমানদের আরেকটি গোষ্ঠী জাফর ইবনে আবি তালিবের নেতৃত্বে হাবাশায় হিজরত করেছিল।

দ্বিতীয় হিজরত বাধাহীনভাবে সংঘটিত হয়েছিল। এ কারণেই কতিপয় মুসলমান নিজেদের স্ত্রী ও সন্তানদেরকে নিজেদের সাথে নিয়ে যেতে পেরেছিল। এদের আগমনে হাবাশায় মুসলমানদের সংখ্যা ৮৩ জনে উন্নীত হয়। আর তারা যে সব শিশুকে সাথে নিয়ে গিয়েছিল অথবা যে সব শিশু সেখানে জন্মগ্রহণ করেছিল আমরা যদি তাদের সংখ্যা হিসাব করি তাহলে তাদের পরিসংখ্যান উপরিউক্ত সংখ্যাকে ছাড়িয়ে যাবে।

মহানবী (সা.) হাবাশাকে যেমন বর্ণনা করেছিলেন মুহাজির মুসলমানগণ সে দেশটিকে ঠিক সে রকম একটি সমৃদ্ধশালী ও শান্ত দেশ হিসাবেই পেয়েছিল- যেখানে পূর্ণ স্বাধীনতা বিদ্যমান ছিল। আবু সালামার স্ত্রী উম্মে সালামাহ্ যিনি পরবর্তীকালে মহানবী (সা.)- এর স্ত্রী হওয়ার মর্যাদা লাভ করেছিলেন তিনি হাবাশা সম্পর্কে বলেছেন,

لما نزلنا أرض الحبشة جاورنا بها خير جار النّجّاشيّ أمنّا على ديننا، و عبدنا الله لا نؤذى و لا نسمع شيئا

"আমরা যখন হাবাশায় বসবাস শুরু করলাম, তখন আমরা সর্বোত্তম প্রতিবেশী বাদশা নাজ্জাশীর পৃষ্ঠপোষকতা ও সহযোগিতা পেয়েছিলাম। আমরা সেখানে কারো কাছ থেকে সামা   তম যাতনা ও নির্যাতন ভোগ করি নি এবং কেউ আমাদের কটু কথাও শোনায় নি।"

কতিপয় মুহাজির কর্তৃক রচিত কবিতা থেকেও প্রতীয়মান হয় যে, হাবাশার পরিবেশ ছিল অত্যন্ত মনোজ্ঞ, আনন্দদায়ক ও চমৎকার। আবদুল্লাহ্ ইবনে হারিস রচিত দীর্ঘ কবিতা থেকে মাত্র তিনটি পঙক্তি এখানে উল্লেখ করছি এবং পুরো কবিতাটি পাদটীকায় উদ্ধৃত করব।

فـــلا تقيمـــــوا علــــى ذل الحيــــاة وخــــز   ي في الممــــــات و عيـــــب غــــــير مــــــأمون

"পবিত্র মক্কা নগরীতে মহান আল্লাহর সকল বান্দা

লাঞ্ছিত, নিষ্পেষিত ও নির্যাতিত

আমরা মহান আল্লাহর ভূমি প্রশস্ত পেয়েছি

যা মানুষকে অপদস্থতা থেকে মুক্তি দেবে,

তাই কল জনক জীবনের গ্লানি

অবমাননাকর মৃত্যু ও যে ত্রুটি কাউকে নিরাপত্তা দেয় না, তার জ   অপেক্ষা করো না।"

ইবনে আসির লিখেছেন, "এ দলটি নবুওয়াতপ্রাপ্তির পর পঞ্চম বর্ষের রজব মাসে হাবাশায় হিজরত করেছিল। এদের সবাই পুরো শাবান ও রামযান মাস হাবাশায় ছিল। যখন তাদের কাছে সংবাদ পৌঁছল যে, কুরাইশরা মুসলমানদের ওপর অত্যাচার ও নির্যাতন করা থেকে বিরত হয়েছে তখন তারা শাওয়াল মাসে মক্কায় ফিরে আসে। কিন্তু প্রত্যাবর্তনের পর যে সংবাদ তাদের কাছে পৌঁছেছিল মক্কার অবস্থা ঠিক তার বিপরীতই তারা দেখতে পেল। এ কারণেই তারা পুনরায় হাবাশার পথ ধরল।"[২৯১]

আগ্রহী পাঠকবর্গ এতৎসংক্রান্ত বিস্তারিত বিবরণ পেতে হলে সীরাতে ইবনে হিশাম অধ্যয়ন করুন।[২৯২]

হাবাশার রাজদরবারে কুরাইশ প্রতিনিধি

হাবাশায় মুসলমানদের স্বাধীন ও নিরুপদ্রব জীবনযাপনের সংবাদ মক্কার কাফের- মুশরিকদের নেতৃবৃন্দের কানে পৌঁছলে শত্রুতার বহ্নি তাদের অন্তরে দাউদাউ করে লে উঠল। হাবাশায় মুসলমানগণ যে প্রভাবশালী হয়ে উঠছে তা তখন তারা বুঝতে পারল। কারণ হাবাশার ভূমি মুসলমানদের জ একটি দুর্ভেদ্য ঘাঁটিতে পরিণত হয়েছিল। তাদের ভয় এ কারণে বৃদ্ধি পেয়েছিল যে, পাছে হয়তো আবিসিনিয়ার দরবারে ব্যাপক হিজরতকারী মুসলমান প্রভাব- প্রতিপত্তির অধিকারী হয়ে যেতে পারে এবং আবিসিনিয়ার বাদশাকে আত্মিকভাবে ইসলামের দিকে আকৃষ্ট করে ফেলতে পারে। আর এর ফলে তারা (মুসলমানরা) এক সুসজ্জিত সেনাদলের দ্বারা সমগ্র আরব উপদ্বীপ থেকে মুশরিকদের শাসন, প্রভাব- প্রতিপত্তি ও দৌরাত্ম্য সমূলে উচ্ছেদ করতে সক্ষম হবে।

দারুন নাদওয়ার[২৯৩] প্রধানগণ পুনরায় পরামর্শ সভায় মিলিত হয়ে অভিমত ব্যক্ত করল যে, কতিপয় প্রতিনিধিকে তারা হাবাশার দরবারে প্রেরণ করবে। আর সে দেশের বাদশার দৃষ্টি আকর্ষণ করার জ তারা যথোপযুক্ত উপঢৌকনেরও ব্যবস্থা করবে। তাহলে তারা এ সব উপঢৌকন প্রদানের মাধ্যমে বাদশার অন্তরে স্থান করে নিতে সক্ষম হবে। এরপর তারা মুহাজির মুসলমানদেরকে বোকা, অজ্ঞ ও নতুন শরীয়ত ও ধর্মমতের উদ্ভাবক বলে বাদশার সামনে অভিযুক্ত করবে। যাতে করে তাদের পরিকল্পনা যত ত সম্ভব বাস্তবায়িত হয় সেজ তারা তাদের নিজেদের মধ্য থেকে দু'জন অভিজ্ঞ, ধূর্ত ও ফন্দিবাজকে মনোনীত করে। প্রস ত উল্লেখ্য যে, উক্ত দু'জন ফন্দিবাজের একজন পরবর্তীতে রাজনৈতিক অ নে তুখোড় রাজনীতিকে পরিণত হয়েছিল। লটারীতে আমর ইবনে আস ও আবদুল্লাহ্ ইবনে রবীয়ার নাম উঠল। দারুন নাদওয়ার প্রধান তাদের দু'জনকে নির্দেশ দিল : বাদশার সাথে সাক্ষাৎ করার আগেই মন্ত্রীদের উপঢৌকনগুলো তাদের কাছে সমর্পণ করবে এবং আগেই তাদের সাথে আলোচনা সেরে নেবে। আর তাদের সহানুভূতি ও সমর্থন আদায়ের চেষ্টা করবে যাতে করে বাদশার সাথে সাক্ষাতকালে

তারা তোমাদের আবেদনের সত্যায়ন করে। উপরিউক্ত ব্যক্তিদ্বয় প্রয়োজনীয় নির্দেশ পেয়ে হাবাশার উদ্দেশ্যে যাত্রা করে।

হাবাশার মন্ত্রীরা কুরাইশ প্রতিনিধিদের মুখোমুখি হলো। কুরাইশ প্রতিনিধিরা যে সব উপঢৌকন মন্ত্রীদের জ   এনেছিল সেগুলো তাদের কাছে অর্পণ করে বলল, "আমাদের মধ্য থেকে একদল অর্বাচীন যুবক নিজেদের পূর্বপুরুষদের ধর্ম ত্যাগ করে এমন এক ধর্ম উদ্ভাবন করেছে যা আমাদের ও আপনাদের ধর্ম থেকে পৃথক। আর এখন তারা আপনাদের দেশেই বসবাস করছে। কুরাইশ নেতৃবর্গ ও অভিজাতশ্রেণী ঐকান্তিকভাবে হাবাশার বাদশাকে অনুরোধ জানিয়েছেন তিনি যেন যত শীঘ্র সম্ভব এ সব আশ্রয় গ্রহণকারীকে বহিষ্কারের আদেশ জারী করেন এবং ইত্যবসরে আমরা আরো অনুরোধ করছি যে, বাদশার সাথে আলাপ-আলোচনাকালে মন্ত্রী পরিষদ যেন আমাদের সহায়তা দান করা থেকে কু ি ত না হন। আর যেহেতু আমরা তাদের দোষ-ত্রুটি ও অবস্থা উত্তমরূপে জ্ঞাত সেহেতু তাদের সাথে আলাপ-আলোচনা না করাই শ্রেয়। আর বাদশার সাথেও যেন তাদের দেখা-সাক্ষাৎ না হয়।"

লোভী ও স্থূলদৃষ্টিসম্পন্ন দরবারিগণ তাদেরকে আশা-ভরসা দিল। পরের দিন তারা হাবাশার বাদশার কাছে গমন করল। কুশল বিনিময় এবং উপঢৌকন অর্পণ করার পর তারা কুরাইশদের বাণী বাদশার কাছে পৌঁছে দিয়ে বলল, "হাবাশার সম্মানিত বাদশাহ্! কতিপয় অর্বাচীন ও নির্বোধ যুবক তাদের নিজেদের পূর্বপুরুষদের ধর্ম ত্যাগ করে এমন এক ধর্ম প্রচারের উদ্যোগ নিয়েছে যা হাবাশার রাষ্ট্রধর্মের সাথেও যেমন খাপ খায় না, ঠিক তেমনি তাদের পূর্বপুরুষদের ধর্মের সাথেও খাপ খায় না। এ দলটি সম্প্রতি এ দেশে আশ্রয় নিয়েছে এবং এ দেশে মত প্রকাশের যে স্বাধীনতা ও সুযোগ আছে তার তারা অপব্যবহার করছে। তাদের গোত্র ও সম্প্রদায়ের প্রধানগণ হাবাশার বাদশার কাছে বিনীত নিবেদন করেছেন যেন তিনি তাদের বহিষ্কারের আদেশ প্রদান করেন। এর ফলে যেন তারা তাদের নিজ দেশে প্রত্যাবর্তন করতে বাধ্য হয়।...

যখনই কুরাইশ প্রতিনিধিদের বাণী এ স্থলে পৌঁছাল, যে সব মন্ত্রী রাজকীয় সিংহাসনের পাশে উপবিষ্ট ছিল তাদের ক স্বর উচ্চকিত হলো। তাদের সবাই কুরাইশ প্রতিনিধিদের সাহায্যার্থে উঠে

দাঁড়িয়ে তাদের বক্তব্য সত্যায়ন করল। কিন্তু হাবাশার জ্ঞানী ায়পরায়ণ বাদশাহ্ তাঁর দরবারের আমাত্য ও সভাসদদের সাথে বিরোধিতা করে বললেন, "কখনই এ কাজ বাস্তবায়িত হবে না। আমি যে দলটিকে আমাদের দেশে আশ্রয় দিয়েছি, অনুসন্ধান করা ব্যতীত কেবল এ দু'জন ব্যক্তির কথায় তাদের হাতে সোপর্দ করব না। অবশ্যই এ সব আশ্রয় গ্রহণকারীর প্রকৃত অবস্থা অনুসন্ধান করে দেখতে হবে। পূর্ণা অনুসন্ধান করার পর যদি তাদের ব্যাপারে এ দু'জন প্রতিনিধির বক্তব্য সঠিক হয়, তাহলে তাদেরকে তাদের দেশে ফেরত পাঠাব। আর এদের ব্যাপারে যদি প্রতিনিধিদের বক্তব্য সত্য না হয় তাহলে আমি কখনই তাদের প্রতি আমার সমর্থন প্রত্যাহার করব না এবং তাদেরকে আগের চেয়েও বেশি সাহায্য করব।"

অতঃপর শাহী দরবারের বিশেষ কর্মকর্তা মুহাজির মুসলমানদের কাছে গমন করে পূর্ব থেকে বি মাত্র কিছু না জানিয়েই তাদেরকে তাৎক্ষণিকভাবে দরবারে উপস্থিত করল। জাফর ইবনে আবু তালিবকে মুহাজির মুসলমানদের প্রতিনিধি বলে পরিচিত করানো হলো। কতিপয় মুসলমান উদ্বি ছিলেন যে, এতদপ্রসে মুহাজির মুসলমানদের মুখপাত্র হাবাশার ি ষ্টান বাদশার সাথে কিভাবে কথা বলবেন? সব ধরনের দুশ্চিন্তা দূর করার জ জাফর ইবনে আবু তালিব বললেন, "আমি যতটুকু আমার নেতা ও নবীর কাছ থেকে শুনেছি তার চেয়ে কম বা বেশি কিছুই বলব না।"

হাবাশার বাদশাহ্ জাফরের দিকে মুখ করে বললেন, "কেন আপনারা আপনাদের পূর্বপুরুষদের ধর্ম ত্যাগ করে এমন এক নতুন ধর্মের অনুসারী হয়েছেন যার সাথে আমাদের ধর্মেরও মিল নেই?" জাফর ইবনে আবু আলিব বললেন, "আমরা অজ্ঞ- মূর্খ ও মূর্তিপূজারী ছিলাম। আমরা মৃত ভক্ষণ করা থেকে বিরত থাকতাম না। আমরা সব সময় খারাপ কাজ করতাম। আমরা আমাদের প্রতিবেশীদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতাম না। দুর্বল ও অক্ষম ব্যক্তিরা ছিল ক্ষমতাবানদের অধীন আজ্ঞাবহ। আমরা আমাদের আত্মীয়- স্বজনদের সাথেও ঝগড়া- বিবাদ ও দ্বন্দ্ব করতাম। আমরা এভাবেই আমাদের জীবন নির্বাহ করছিলাম ঐ সময় পর্যন্ত যখন আমাদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি যিনি পূর্ব হতেই সততা, সত্যবাদিতা ও সচ্চরিত্রের জ খ্যাত ও প্রসিদ্ধ ছিলেন তিনি মহান

আল্লাহর নির্দেশে আমাদের সবাইকে তাওহীদের (একে রবাদ) দিকে আহবান জানালেন এবং প্রতিমাসমূহের স্তুতি ও প্রশংসাকে অত্যন্ত ঘৃণ্য বলে গণ্য করলেন। তিনি আমানত সংরক্ষণ, অপবিত্রতা থেকে দূরে থাকা, নিজেদের আত্মীয়- স্বজন ও প্রতিবেশীদের সাথে সদাচরণ এবং রক্তপাত, অবৈধ যৌন সম্পর্ক, মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান, ইয়াতীমদের ধন- সম্পদ আত্মসাৎ এবং মহিলাদেরকে খারাপ কাজ আঞ্জাম দেয়ার অপবাদ দেয়া থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি আমাদেরকে নামায পড়তে, রোযা রাখতে এবং (নিজেদের) সম্পদের যাকাত আদায় করার নির্দেশ দেন। আমরা মহান আল্লাহর প্রতি ঈমান এনে এক- অদ্বিতীয় মহান আল্লাহর প্রশংসা ও উপাসনায় রত হলাম। তিনি যা হারাম সাব্যস্ত করেছেন তা হারাম এবং তিনি যা হালাল সাব্যস্ত করেছেন আমরা তা হালাল বলে বি াস করি। কিন্তু কুরাইশ গোত্র আমাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়। যাতে করে আমরা আমাদের ধর্ম ত্যাগ করে পুনরায় পাথর ও ফুলের পূজা করি এবং অপবিত্র ও মন্দ কাজে লিপ্ত হই সেজ   তারা আমাদেরকে দিন- রাত নির্যাতন করেছে। আমাদের সহ্যক্ষমতা ও শক্তি নিঃশেষিত হওয়া পর্যন্ত আমরা তাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ করেছি। আমাদের নিজেদের ধর্মরক্ষা করার জ   আমরা আমাদের জীবন ও সহায়- সম্পদের মায়া ত্যাগ করে হাবাশায় আশ্রয় নিয়েছি। হাবাশার বাদশার   ায়পরায়ণতা আমাদের চুম্বকের মতো তাঁর দেশের দিকে টেনে এনেছে এবং এখনও তাঁর   ায়পরায়ণতার ওপর আমাদের পরিপূর্ণ আস্থা আছে।[২৯৪]

জাফর ইবনে আবি তালিবের সুমিষ্ট ও   দয়গ্রাহী বক্তব্য এতটা কার্যকরী হয়েছিল যে, হাবাশার বাদশা অশ্রুসজল নেত্রে তাঁকে তাঁর নবীর ওপর অবতীর্ণ আসমানী গ্রন্থ থেকে কিয়দংশ পাঠ করার অনুরোধ করেছিলেন। জাফর সূরা মরিয়মের প্রথম দিকের কয়েকটি আয়াত তেলাওয়াত করলেন। তিনি এ সূরার আয়াতগুলোর তেলাওয়াত অব্যাহত রাখলেন এবং হযরত মরিয়মের সতীত্ব ও হযরত ঈসা (আ.)- এর মর্যাদা ও অবস্থান সংক্রান্ত ইসলাম ধর্মের দৃষ্টিভি স্পষ্ট করে তুলে ধরলেন। সূরা মরিয়মের আয়াতসমূহ তেলাওয়াত শেষ হতে না হতেই বাদশা ও

ধর্মযাজকদের ক্রন্দনধ্বনি উচ্চকিত হলো। অশ্রুজল তাঁদের দাড়ি ও তাঁদের সম্মুখে উন্মুক্ত গ্রন্থগুলোকে সিক্ত করছিল।

বেশ কিছুক্ষণ পুরো রাজদরবারে সুনসান নীরবতা বিরাজ করতে লাগল, এমনকি সবার মধ্যে অনুচ্চ গুঞ্জরণ ধ্বনিও থেমে গিয়েছিল। তখন হাবাশার বাদশাহ্ বললেন, “এদের নবীর বাণী এবং যা কিছু ঈসা (আ.) আনয়ন করেছেন সেগুলো আসলে একই আলোকোজ্জ্বল উৎস থেকে উৎসারিত (إنّ هذا و ما جاء به عيسى ليخرج من مشكاة واحدة)। তোমরা চলে যাও। আমি কখনই এদেরকে তোমাদের হাতে সোপর্দ করব না। ”

রাজকীয় অধিবেশন মন্ত্রীবর্গ ও কুরাইশ প্রতিনিধিগণ যা ধারণা করেছিল ঠিক তার বিপরীতে চলে গেল। ফলে তাদের কোন আশাই আর বিদ্যমান রইল না।

আমর ইবনে আস ছিল ধূর্ত রাজনীতিবিদ। সে তার সফরস ী আবদুল্লাহ্ ইবনে রাবীয়ার সাথে রাতে আলোচনা করে বলল, “আমাদেরকে আগামীকাল অবশ্যই ভিন্ন আরেকটি পথ অবলম্বন করতে হবে। সম্ভবত আশা করা যায় যে, এ পথেই মুহাজির মুসলমানদের প্রাণ আর রক্ষা পাবে না। আমরা আগামীকাল হাবাশার বাদশাকে বলব, এ সব মুহাজিরের নেতা (জাফর ইবনে আবি তালিব) হযরত ঈসার ব্যাপারে এক বিশেষ আকীদা- বি াস পোষণ করে যা ি ষ্টধর্মের আকীদার পরিপন্থী।” আবদুল্লাহ্ তাকে এ ধরনের কাজ করা থেকে বিরত থাকার জ বলল, “এ সব ব্যক্তির মধ্যে এমন কিছু ব্যক্তি আছে যাদের সাথে আমাদের আত্মীয়তার সম্পর্ক বিদ্যমান।” কিন্তু এ ব্যাপারে তার কথায় কোন কাজ হলো না। পরের দিন পুনরায় তারা হাবাশার রাজদরবারে মন্ত্রীবর্গসমেত উপস্থিত হলো। এবার তারা হাবাশার রাষ্ট্রধর্মের প্রতি সহমর্মিতা ও সাহায্যের ধূয়ো তুলে হযরত ঈসা মসীহ্ (আ.) সংক্রান্ত মুসলমানদের আকীদার সমালোচনা করতে লাগল। তারা বাদশাকে বলল, “ঈসা (আ.)- এর ব্যাপারে এরা এক বিশেষ ধরনের আকীদা পোষণ করে যা ি ষ্টধর্মের আকীদা ও মূলনীতির সাথে মোটেও খাপ খায় না। আর এ ধরনের ব্যক্তিদের উপস্থিতি আপনাদের রাষ্ট্রধর্মের অস্তিত্বের জ অত্যন্ত বিপজ্জনক। তাই তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করে দেখতে পারেন। ”

হাবাশার বুদ্ধিমান শাসনকর্তা এবারও অনুসন্ধান ও যাচাই করার উদ্যোগ নিলেন। তিনি মুহাজিরদেরকে দরবারে উপস্থিত করার আদেশ দিলেন। পুনরায় দরবারে তলব করার ব্যাপারে মুহাজির মুসলমানগণ চিন্তা করতে লাগলেন। যেন তাঁদের কাছে ইলহাম হলো যে, শাহী দরবারে তাঁদেরকে পুনরায় তলব করার কারণই হচ্ছে ি ষ্টধর্মের প্রধান ব্যক্তিত্ব হযরত ঈসা (আ.) সম্পর্কে মুসলমানদের আকীদা কি তা জিজ্ঞাসা করা। এবারেও জাফর ইবনে আবি তালিব মুসলমানদের মুখপাত্র মনোনীত হলেন। তিনি আগেই মুসলমানদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, মহানবী (সা.)- এর নিকট থেকে এ ব্যাপারে যা কিছু শুনেছেন তা বলবেন।

বাদশাহ্ নাজ্জাশী মুহাজিরদের প্রতি তাকিয়ে বললেন, "হযরত ঈসা মসীহ্ সম্পর্কে আপনাদের আকীদা কী?" জাফর ইবনে আবি তালিব উত্তরে বললেন, "হযরত ঈসা (আ.) সম্পর্কে আমাদের নবী (সা.) যা বলেছেন সেটিই আমাদের আকীদা। তিনি মহান আল্লাহর বান্দা ও রাসূল। তিনি তাঁর পক্ষ থেকে রূহ ও কালেমা ছিলেন যা কুমারী ও দুনিয়াবিমুখ মরিয়মকে প্রদান করা হয়েছিল।"[২৯৫]

হাবাশার বাদশাহ্ জাফর ইবনে আবি তালিব (রা.)- এর কথায় পুরোপুরি সন্তুষ্ট ও প্রসন্ন হলেন এবং বললেন, "মহান আল্লাহর শপথ, এর চেয়ে বেশি মর্যাদা হযরত ঈসা (আ.)- এর ছিল না।" কিন্তু বাদশার এ কথা বিচ্যুত মন্ত্রীবর্গ ও দরবারীদের পছন্দ হলো না। তবুও বাদশাহ্ মুসলমানদের আকীদা- বি াসের প্রশংসা করলেন এবং তিনি তাঁদেরকে পূর্ণ স্বাধীনতা দিলেন। তিনি কুরাইশদের প্রেরিত উপঢৌকনগুলো কুরাইশ প্রতিনিধিদের সামনে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন এবং বললেন, "মহান আল্লাহ্ তো আমাকে এ ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব প্রদান করার সময় আমা থেকে কোন উৎকোচ নেন নি। এ কারণেই আমার জ   শোভনীয় নয় যে, আমিও এ পথে জীবিকা নির্বাহ করি।"[২৯৬]

হাবাশা থেকে প্রত্যাবর্তন

পূর্বে আমরা উল্লেখ করেছিলাম যে, হাবাশায় হিজরতকারী মুসলমানদের প্রথম দলটি 'কুরাইশরা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছে' - এ মর্মে একটি মিথ্যা সংবাদ শুনে হাবাশা ত্যাগ করে হিজাযে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন। কিন্তু হিজাযে প্রবেশকালে তাঁরা জানতে পারলেন যে, ঐ সংবাদটি মিথ্যা ছিল; বরং মুসলমানদের প্রতি কুরাইশদের কঠিন- অমানবিক আচরণ ও চাপ পূর্বের মতো এখনও বহাল আছে। তাই তাঁদের মধ্য থেকে অধিকাংশ হাবাশায় ফিরে গেলেন এবং খুব মুষ্টিমেয় কয়েকজন গোপনে অথবা নেতৃত্বস্থানীয় কুরাইশ ব্যক্তিদের আশ্রয়াধীনে মক্কায় প্রবেশ করলেন।

উসমান ইবনে মাযউন, ওয়ালীদ ইবনে মুগীরার আশ্রয়ে মক্কায় প্রবেশ করলেন; আর এ কারণে তিনি শত্রুদের নির্যাতন থেকে নিরাপদ ছিলেন। কিন্তু তিনি নিজ চোখে দেখতে পেতেন যে, অ া মুসলমান কুরাইশদের দ্বারা অত্যাচারিত ও নির্যাতিত হচ্ছে। এ ধরনের বৈষম্য হযরত উসমানের মনকে খুবই ব্যথিত করল। তিনি ওয়ালীদকে অনুরোধ করলেন যেন সে একটি সাধারণ সমাবেশে ঘোষণা দেয় যে, এরপর থেকে মাযউন তনয় উসমান তার তত্ত্বাবধান ও আশ্রয়ে নেই। এ কথা বলার উদ্দেশ্য ছিল এটি যে, তিনি যেন অ া মুসলমানের সাথে তাঁদের দুঃখ- কষ্টের অংশীদার হন। তাই ওয়ালীদ মসজিদুল হারামে ঘোষণা করল যে, এখন থেকে উসমান ইবনে মাযউন তার আশ্রয়ে নেই। আর তিনিও (উসমান) বললেন, "আমিও তা সত্যায়ন করছি।" আর ঠিক তখনই আরবের প্রসিদ্ধ বাগ্মী- কবি লাবীদ মসজিদুল হারামে প্রবেশ করে কুরাইশদের বৃহৎ সমাবেশে তার প্রসিদ্ধ কাসীদা আবৃত্তি শুরু করল। যখন লাবীদ বলল,

ألا كلّ شيء ما خلا الله باطل 'জেনে রাখ, মহান আল্লাহ্ ব্যতীত সকল বস্তু অমূলক' তখন উসমান ইবনে মাযউন বললেন, صدّقت "তুমি সত্য বলেছ।" লাবীদ দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তি পড়লেন :

و كلّ نعيم لا محالة زائل 'সকল নেয়ামতই ক্ষণস্থায়ী।' উসমান ইবনে মাযউন এ কথা শুনে খুবই উত্তেজিত হয়ে বললেন, "তুমি ভুল করছ। পরকালের নেয়ামতসমূহ স্থায়ী।" উসমানের এ প্রতিবাদ

লাবীদের কাছে খুবই অসহনীয় বোধ হলো। তাই সে বলল, “হে কুরাইশ গোত্র! তোমাদের অবস্থা দেখছি পরিবর্তিত হয়ে গেছে; এ লোকটি কে?” উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি বলল, “এ বোকা লোকটি আমাদের ধর্ম থেকে বের হয়ে তার নিজের মতো এক ব্যক্তির অনুসরণ করছে। তার কথায় কান দিও না।” এরপর সে উঠে দাঁড়িয়ে উসমান ইবনে মাযউনের মুখে জোরে একটি চড় মারল। আঘাতে তাঁর মুখমণ্ডল কালো হয়ে গেল। ওয়ালীদ ইবনে মুগীরাহ্ তখন উসমান ইবনে মাযউনকে লক্ষ্য করে বলল, “উসমান! যদি তুমি আমার আশ্রিত থাকতে তাহলে কখনই কেউ তোমার অনিষ্ট সাধন করতে পারত না।” তখন তিনি বললেন, “আমি মহান আল্লাহর আশ্রয়ে আছি।” ওয়ালীদ তখন পুনরায় বলল, “আবারও আমি তোমাকে আশ্রয় দিতে প্রস্তুত।” তখন উসমান বললেন, “আমি কখনই তা গ্রহণ করব না।”[২৯৭]

মক্কা নগরীতে খ্রিষ্টানদের অনুসন্ধানী দল

মুসলমান মুহাজিরদের প্রচার কার্যের ফলে হাবাশার ি ষ্টান ধর্মযাজকদের কেন্দ্রীয় সংস্থার পক্ষ থেকে ২০ সদস্য বিশিষ্ট একটি অনুসন্ধানী দল পবিত্র মক্কা নগরী আগমন করে মসজিদুল হারামে মহানবী (সা.)- এর সাথে সাক্ষাৎ করলেন এবং তাঁর কাছে বেশ কিছু প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলেন। মহানবী (সা.) তাঁদের প্রশ্নগুলোর উত্তর দিলেন এবং তাঁদেরকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার আহবান জানালেন। তিনি তাঁদেরকে পবিত্র কোরআনের কতিপয় আয়াত তিলাওয়াত করে শুনালেন।

পবিত্র কোরআনের আয়াতসমূহ তাঁদের মন- মানসিকতার ওপর এতটা প্রভাব বিস্তার করেছিল যে, তাঁরা তাঁদের নয়নাশ্রু থামিয়ে রাখতে পারলেন না। তাঁদের সবাই প্রতিশ্রুত নবীর যে সব নিদর্শন ইঞ্জিল শরীফে পাঠ করেছিলেন সেগুলোর সব ক'টি তাঁর মধ্যে বিদ্যমান দেখতে পেলেন।

এ অনুসন্ধানী দলের আগমন ও সাক্ষাৎ আবু জাহলের জ খুবই অসহনীয় ও যন্ত্রণাদায়ক ব্যাপার ছিল। সে সম্পূর্ণ উগ্র মেজাজ সহকারে বলল, "হাবাশার জনগণ আপনাদেরকে একটি অনুসন্ধানী প্রতিনিধি দল হিসাবে পবিত্র মক্কায় প্রেরণ করেছেন, এটি তো নির্ধারিত ছিল না যে, আপনারা আপনাদের পূর্বপুরুষদের ধর্ম ত্যাগ করবেন। আপনাদের চেয়ে অধিকতর বোকা জনগণ এ ধরণীর বুকে আছে কি না তা আমি ভাবতেই পারছি না। "

মক্কার ফিরআউন আবু জাহল যে উদীয়মান সূর্যের রশ্মি প্রতিহত করতে চেয়েছিল তার ঔদ্ধত্যপূর্ণ বক্তব্যের জবাবে হাবাশার অনুসন্ধানী দল অত্যন্ত ধীর ও শান্ত কে বললেন, "আমরা আমাদের ধর্মের ওপর এবং আপনারা আপনাদের ধর্মের ওপর বহাল থাকুন, তবে আমরা যে জিনিস বা বিষয় আমাদের জ কল্যাণকর বলে চিহ্নিত করব তা আমরা কখনই উপেক্ষা করব না।"আর তাঁরা এ কথা বলে আবু জাহলের সাথে আর বিতর্কে জড়ালেন না।[২৯৮]

কুরাইশদের প্রেরিত প্রতিনিধিদল

হাবাশার জনগণের পক্ষ থেকে প্রেরিত অনুসন্ধানী দলটি কুরাইশদের জাগরণের কারণ হয়েছিল। তাই তারাও অনুসন্ধান ও যাচাই- বাছাই করার জ   হারিস ইবনে নাসর, উকবা ইবনে আবি মুয়ীত প্রমুখ ব্যক্তিগণকে কুরাইশদের তরফ থেকে প্রতিনিধি হিসাবে ইয়াসরিব প্রেরণ করল। উদ্দেশ্য ইয়াসরিব গমন করে হযরত মুহাম্মদ (সা.)- এর রিসালাত ও ইসলাম ধর্ম প্রচারের বিষয়টি নিয়ে ইয়া দী পণ্ডিতদের সাথে আলোচনা করা। ইয়া দী পণ্ডিত ব্যক্তিবর্গ প্রেরিত প্রতিনিধি দলকে বলেছিলেন, "নিম্নোক্ত বিষয়গুলো প্রসে   মুহাম্মদকে জিজ্ঞাসা করবে :

১. আত্মার স্বরূপ (হাকীকত) কি?

২. পূর্ববর্তী যুগে যে সব যুবক জনগণের কাছ থেকে আত্মগোপন করেছিলেন তাঁদের (আসহাব- ই কাহাফ) কাহিনী।

৩. যে ব্যক্তি পৃথিবীর পূর্ব- পশ্চিমে ভ্রমণ করেছিলেন তাঁর (যুলকারনাইন) জীবনী।

মুহাম্মদ যদি এ তিনটি প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে সক্ষম হন তাহলে আপনারা নিশ্চিত বি াস করবেন যে, সে মহান আল্লাহর মনোনীত। আর এর অ   থা হলে বুঝতে হবে যে, সে মিথ্যাবাদী। তখন তাকে যত শীঘ্র সম্ভব হত্যা করতে হবে।"

প্রেরিত কুরাইশ প্রতিনিধিগণ অত্যন্ত আনন্দের সাথে মক্কায় ফিরে এসে ঐ তিনটি প্রশ্ন সম্পর্কে কুরাইশদেরকে অবহিত করল। কুরাইশগণ একটি সভার আয়োজন করে হযরত মুহাম্মদ (সা.)- কে সেখানে আসার আমন্ত্রণ জানাল। মহানবী (সা.) তাদেরকে বললেন, "আমি এ তিনটি প্রশ্নের ব্যাপারে ওহীর অপেক্ষা করছি।"[২৯৯] মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহী অবতীর্ণ হলো। আত্মা বিষয়ক তাদের প্রশ্নের উত্তর সূরা ইসরার ৮৫নং আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। আর তাদের অপর দু'টি প্রশ্নের উত্তর সূরা কাহাফে ৯- ২৮ নং এবং ৮৩- ৯৮ নং আয়াতসমূহে বিস্তারিত বর্ণিত হয়েছে। এ তিনটি বিষয়ে মহানবী (সা.)- এর উত্তরের বিস্তারিত বিবরণ তাফসীর গ্রন্থগুলোতে বিদ্যমান রয়েছে।

এখানে একটি বিষয় উল্লেখ না করে পারছি না। আর তা হলো : প্রশ্নের মধ্যে আত্মার (روح) অর্থ 'মানবীয় আত্মা' নয়, বরং যেহেতু এ সব প্রশ্নের উপস্থাপকরা ছিল ইয়া দী এবং রু ল আমীনের সাথে তাদের সম্পর্ক ভালো ছিল না তাই প্রশ্নে উত্থাপিত روح (রূহ) বলতে হযরত জিবরাইল আমীনকেই বুঝানো হয়েছে।

এতৎসংক্রান্ত বিস্তারিত আলোচনা 'মানশুর-ই জভীদ' গ্রন্থের ৩য় খণ্ডের ২০৪-২১৬ পৃষ্ঠাসমূহে বর্ণিত হয়েছে। আগ্রহী পাঠকবর্গ তা অধ্যয়ন করতে পারেন।

অষ্টাদশ অধ্যায় : মরিচাপড়া অস্ত্রশস্ত্র

কুরাইশ নেতৃবর্গ একত্ববাদী ধর্ম ইসলামের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার জ   নিজেদের সুশৃঙ্খল ও সুসংগঠিত করছিল। শুরুতে তারা ধনসম্পদ ও নেতৃত্বের প্রলোভন দিয়ে মহানবী (সা.)- কে তাঁর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করা থেকে বিরত রাখতে চেয়েছিল। কিন্তু তাদের এ প্রচেষ্টা নিষ্ফল ও ব্যর্থ হয়েছিল। তারা "মহান আল্লাহর শপথ, যদি আমার ডান হাতে সূর্য এবং বাম হাতে চন্দ্রও স্থাপন কর (অর্থাৎ সমগ্র পৃথিবী আমার কর্তৃত্বের মুঠোয় দিয়ে দাও) তবুও এ কাজ (ইসলামের প্রচার) থেকে বিরত থাকব না" - ঐ সংগ্রামী মহাপুরুষের এ প্রসিদ্ধ বাক্যের মুখোমুখি হলো। এরপর তারা তাঁর স ীসাথীদের হেয় প্রতিপন্ন করতে তাঁদের ওপর নির্যাতন চালাতে লাগল। আর তারা মহানবী (সা.) এবং তাঁর সাহাবীদেরকে একটি মুহূর্তের জ ও কষ্ট দেয়া থেকে বিরত থাকত না। কিন্তু তাঁর ও তাঁর নিষ্ঠাবান স ী- সাথীদের দৃঢ়তা, সাহসিকতার কারণে এ ক্ষেত্রেও বিজয়ী হয়েছিলেন। এমনকি ইসলাম ধর্মে তাঁদের অবিচল থাকার জ   তাঁরা নিজেদের বসত-বাটি, দেশ ও জন্মভূমি ত্যাগ করে হাবাশায় হিজরত পর্যন্ত করেছিলেন এবং এভাবে তাঁরা সত্য ধর্ম ইসলাম প্রচার করার জ   সর্বাত্মক চেষ্টা চালিয়েছিলেন। তাওহীদের পবিত্র বৃক্ষের মূলোৎপাটন করার জ   কুরাইশ নেতৃবর্গের বিভিন্ন পরিকল্পনা তখনও সমাপ্ত হয় নি, বরং এবার তারা এগুলোর চাইতেও আরো ধারালো হাতিয়ার ব্যবহার করল।

আর এই হাতিয়ারটি ছিল মহানবী (সা.)- এর বিরুদ্ধে প্রচারণা। কারণ এটি ঠিক যে, যারা মক্কায় বসবাস করত, নির্যাতন করে ও অধিকার কেড়ে নিয়ে তাদেরকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করা থেকে বিরত রাখা যেত; কিন্তু পবিত্র কাবায় যিয়ারতকারিগণ যারা নিষিদ্ধ মাসগুলোতে পবিত্র মক্কা নগরীতে আসত তারা শান্ত ও নিরাপদ পরিবেশের মধ্যে মহানবীর সাথে দেখা করত এবং তাঁর ধর্ম প্রচার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে যেত। আর তারা যদি তাঁর ধর্মে বি াস স্থাপন নাও করত তবুও তারা তাদের নিজেদের ধর্মের (মূর্তিপূজা ও শিরক) ব্যাপারে শিথিল ও সন্দিহান হয়ে যেত। নিজেদের জন্মভূমিতে প্রত্যাবর্তন করার পর তারা মহানবীর বার্তাবাহক হয়ে যেত এবং মহানবীর আবির্ভাবের সুসংবাদ প্রদান করত। আর এভাবে মহানবী (সা.) ও ইসলাম ধর্মের নাম আরব

উপদ্বীপের সকল স্থানে পৌঁছে যেত। আর এটি মূর্তিপূজারীদের ওপর একটি বিরাট আঘাত এবং তাওহীদ ও ইসলাম ধর্মের প্রসার ও প্রচারের ক্ষেত্রে একটি কার্যকর কারণ বলে বিবেচিত হতো।

কুরাইশ নেতৃবর্গ আরো একটি ধ্বংসাত্মক কার্যক্রমে হাত দেয়। তারা এর দ্বারা ইসলাম ধর্ম প্রচার ও প্রসারের পথ বন্ধ করতে এবং মহানবী (সা.)- এর সাথে আরব জাতির সম্পর্কচ্ছেদ করতে চেয়েছিল।

আমরা এখন কুরাইশদের সে সকল ধ্বংসাত্মক পরিকল্পনা ও কার্যক্রম পাঠকবর্গের সামনে তুলে ধরব।

১. ভিত্তিহীন অপবাদ

কোন ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব তার প্রতি তার শত্রুদের গালিগালাজ, কটুক্তি, অপবাদ আরোপ ও অ ায় আচরণ দ্বারা মূল্যায়ন ও যাচাই করা যেতে পারে। শত্রুরা সর্বদা (জনগণকে) জনমতকে বিভ্রান্ত করার জ   প্রতিপক্ষকে এমনভাবে দোষী সাব্যস্ত করে যে, এর ফলে মিথ্যা ও ভিত্তিহীন বিষয়াদি প্রচার করে প্রতিপক্ষের মান- মর্যাদা ধ্বংস অথবা ন্যূনতম পর্যায়ে হলেও যতটা সম্ভব তার মর্যাদা ও সম্মান খাটো করতে চায়। জ্ঞানী শত্রু নিজ প্রতিদ্বন্দ্বীর সাথে এমন সব বিষয় সম্পর্কযুক্ত করার চেষ্টা করে যে, অন্তত সমাজের একটি বিশেষ শ্রেণী সেগুলো বি াস করবে অথবা সেগুলোর সত্য- মিথ্যা হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করবে। যে সব সম্পর্ক ও সংশ্লিষ্টতা কখনই প্রতিপক্ষের সাথে খাপ খায় না এবং তার মন- মানসিকতা, মানসিক শক্তি এবং প্রসিদ্ধ কার্যকলাপসমূহের সাথে কোন বাস্তব সম্পর্ক নেই শত্রুরা সেই সব বিষয় তার ওপর আরোপ করে না; কারণ এমতাবস্থায় এর পরিণতি হবে উল্টো ও অনাকাঙ্ক্ষিত।

এতৎসংক্রান্ত গবেষক ঐতিহাসিক এ সব মিথ্যা ও ভিত্তিহীন অপবাদ আরোপের পেছনে প্রতিপক্ষের প্রকৃত চেহারাটিই দেখতে পান, এমনকি শত্রুর দৃষ্টিকোণ থেকেই তাঁর সামাজিক অবস্থান ও মর্যাদা এবং তাঁর মানসিকতা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হন। কারণ কোন বেপরোয়া শত্রু- যে অপবাদ তার নিজের স্বার্থানুকূলে রয়েছে- প্রতিপক্ষের ওপর তা আরোপ করার ব্যাপারে চেষ্টার কোন ত্রুটি করবে না। আর সে প্রচারণার তীক্ষ্ণ অস্ত্র যতদূর পর্যন্ত তার চিন্তা- ভাবনা, উপলব্ধি ও সঠিক সুযোগ সংক্রান্ত জ্ঞান তাকে অনুমতি দেবে ততদূর সে তা সর্বোচ্চ মাত্রায় সদ্ব্যবহার করবেই। অতঃপর শত্রু যদি তার প্রস   কোন অশালীন উক্তি ও অপবাদ আরোপ না করে তা আসলে এ দৃষ্টিকোণ থেকে যে, তার ব্যক্তিসত্তা আসলে এসব অবৈধ- অনৈতিক চারিত্রিক দোষ ও সম্পর্কের দ্বারাই সজ্জিত; আর সমাজও তার কথা ও আদর্শের খরিদ্দার নয়।

আমরা যদি ইসলামের ইতিহাসের পাতা উল্টাই তাহলে দেখতে পাব যে, কুরাইশগণ অস্বাভাবিক ধরনের শত্রুতা ও জিঘাংসার মনোবৃত্তির অধিকারী হয়েও যেমন করেই হোক না কেন নব্য প্রতিষ্ঠিত ইসলাম ধর্মের ধ্বংস সাধন এবং এ ধর্মের প্রবর্তনকারীর ব্যক্তিত্ব ও মান- মর্যাদা ক্ষুন্ন

করতে চাইত এতদসত্ত্বেও তারা পূর্ণরূপে এ হাতিয়ার বা অস্ত্র (অর্থাৎ প্রচারণা) ব্যবহার করতে সক্ষম হয় নি। তারা নিজেরাই চিন্তা করে কূল পেত না যে, তারা কি বলবে? তারা কি তাঁকে অর্থ কেলে ারী ও আত্মসাতের অভিযোগে অভিযুক্ত করবে, অথচ তখনও তাদের (কুরাইশদের) কারো কারো ধন- সম্পদ তাঁর ঘরেই আমানত হিসাবে গচ্ছিত ছিল এবং তাঁর চল্লিশ বছরের জীবন আপামর জনতার চোখে তাঁকে 'আল আমীন ' বলে প্রতীয়মান ও প্রতিষ্ঠিত করেছিল? তারা কি তাঁকে 'কামুক' ও 'ইন্দ্রিয়পরায়ণ ' বলে অভিযুক্ত করবে? তারা কিভাবে এ কথা মুখে উচ্চারণ করবে? কারণ তিনি কিছুটা হলেও তাঁর যৌবনকাল একজন বয়স্কা রমণীর সাথে শুরু করেছিলেন এবং ঐ দিন পর্যন্তও যখন তাঁর বিরুদ্ধে প্রচারণা চালনোর জ কুরাইশদের পরামর্শ সভার আয়োজন করা হয়েছিল তিনি ঐ স্ত্রী নিয়েই বৈবাহিক জীবনযাপন করে যাচ্ছিলেন। অবশেষে তারা চিন্তা- ভাবনা করল যে, তারা কি বলবে যা মুহাম্মদ (সা.)- এর সাথে ভালোভাবে খাপ খায় এবং যার ফলে ন্যূনতম হলেও জনগণ তা শতকরা এক ভাগ সত্য হতে পারে বলে ধারণা করবে। অবশেষে দারুন নাদওয়ার নেতারা কিভাবে এ ধরনের হাতিয়ার ব্যবহার করবে সে ব্যাপারে বিভ্রান্ত ছিল। তারা সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যে, তারা এ ব্যাপারটি একজন কুরাইশ নেতার কাছে উত্থাপন করে এ ব্যাপারে তার অভিমতটিই বাস্তবায়ন করবে। সভা অনুষ্ঠিত হলো। ওয়ালীদ কুরাইশদের দিকে মুখ করে বলল, "হ র দিনগুলো অতি নিকটে। আর এ দিনগুলোতে হ র করণীয় ও আমলসমূহ আঞ্জাম দেয়ার জ (বিভিন্ন স্থান থেকে) জনগণ শহরে সমবেত হবে। আর মুহাম্মদও হ মওসূমের স্বাধীনতার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করে তার নিজ ধর্ম প্রচার কাজে আত্মনিয়োগ করবে। কতই না উত্তম হবে যদি কুরাইশ নেতৃবর্গ তার ও তার নতুন ধর্মের ব্যাপারে তাদের চূড়ান্ত অভিমত ব্যক্ত করেন এবং তার ব্যাপারে একটি ঐকমত্যে পৌঁছতে পারেন! কারণ তাদের মধ্যকার মতবিরোধ তাদের বক্তব্য ও অভিমতকে অকার্যকর করে দেবে। "

আরবদের প্রজ্ঞাবান ব্যক্তিটি চিন্তায় ডুবে গেল এবং বলতে লাগল, "আমাদের কি বলা উচিত?" একজন বলল, "তাকে (মুহাম্মদকে) আমরা গণক বলতে পারি।"[৩০০] সে এ ব্যক্তির বক্তব্য অপছন্দ করে বলল, "মুহাম্মদ যা কিছু বলে তা জ্যোতিষী ও গণকদের বাণীর মতো নয়।" আরেকজন

প্রস্তাব দিয়ে বলল, "আমরা তাকে পাগল বলতে পারি।" এ প্রস্তাবটিও ওয়ালীদের পক্ষ থেকে প্রত্যাখ্যাত হলো এবং সে বলল, "তার মধ্যে পাগলামীর লক্ষণ পরিলক্ষিত হচ্ছে না।" অনেক আলোচনা- পর্যালোচনার পর সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হলো যে, তারা তাঁকে 'যাদুকর' বলে অভিহিত করবে। কারণ তাঁর কথায় যাদু আছে। আর এর দলিল হচ্ছে এই যে, তিনি তাঁর কোরআনের মাধ্যমে মক্কাবাসীদের মধ্যে অনৈক্য ও বিভেদ সৃষ্টি করেছেন[৩০১], অথচ এর আগে মক্কাবাসীদের মধ্যকার ঐক্য প্রবাদ বাক্যে পরিণত হয়েছিল।

সূরা মুদ্দাসসিরের তাফসীর প্রসঙ্গে মুফাসসিরগণ এ বিষয়টি আরেকভাবেও বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন, "যখন ওয়ালীদ সূরা ফুসসিলাতের কয়েকটি আয়াত মহানবী (সা.)- এর কাছ থেকে শুনল তখন সে অত্যন্ত প্রভাবিত হলো এবং তার শরীরের লোমগুলো দাঁড়িয়ে গেল। সে বাড়ির দিকে ছুটে পালাল এবং বাড়ি থেকে বাইরে বের হলো না। কুরাইশরা তাকে মস্করা করে বলেছিল : ওয়ালীদ মুহাম্মদের ধর্ম গ্রহণ করেছে।" তারা দলবেঁধে ওয়ালীদের বাড়িতে গেল এবং তার কাছে হযরত মুহাম্মদ (সা.)- এর পবিত্র কোরআনের প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে জানতে চাইল। উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের মধ্য থেকে যে কেউই উল্লিখিত বিষয়াদির কোন একটি উল্লেখ করেছিল ওয়ালীদ সেটিই প্রত্যাখ্যান করছিল। অবশেষে সে অভিমত ব্যক্ত করে বলল, "তাদের মধ্যে সে যে অনৈক্য ও বিভেদ ঘটিয়েছে সে কারণেই তাকে তোমরা যাদুকর বলবে এবং বলবে : তার কথায় যাদু আছে।"

মুফাসসিরগণ বিশ্বাস করেন যে, নিম্নলিখিত আয়াতগুলো তার (ওয়ালীদ) ব্যাপারেই অবতীর্ণ হয়েছে :

(ذَرني ومَنْ خلقْتُ وحيداً وجعلْتُ له مالاً ممْدوداً)

"যেহেতু আমি তাকে অনন্য করে সৃষ্টি করেছি এবং তাকে প্রভূত ধন- সম্পদ দিয়েছি সেহেতু আমাকে ছেড়ে দাও ...।"(সূরা মুদ্দাসসির, ৫০ নং আয়াত পর্যন্ত)

সে পবিত্র কোরআন সম্পর্কে চিন্তা- ভাবনা ও মূল্যায়ন করল। ধ্বংস হয়ে যাক সে কিভাবেই বা মূল্যায়ন করবে, পুনশ্চঃ সে নিহত হোক সে কিভাবেই মূল্যায়ন করবে; সে ভ্রূকুটি করল এবং মুখ পেচিয়ে বলল এটি ে ফ একটি যাদু যা সে বর্ণনা করে।[৩০২]

মহানবীকে পাগল বলে আখ্যায়িত করা

ইতিহাসে অকাট্যভাবে প্রতিষ্ঠিত আছে যে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) যৌবনের সূচনাল থেকেই জনগণের মাঝে সত্যবাদিতা ও সৎকর্মের জ প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। এমনকি তাঁর শত্রুরাও তাঁর উত্তম চারিত্রিক গুণাবলীর সামনে শ্রদ্ধাবনত হয়ে যেত। তাঁর অ তম মহৎ গুণ ছিল এই যে, সকল মানুষ তাঁকে 'আস সাদেকুল আমীন ' অর্থাৎ পরম সত্যবাদী ও বি স্ত বলে সম্বোধন করত। এমনকি মুশরিকগণও প্রকাশ্যে ইসলাম প্রচারের দশ বছর পরেও তাঁর কাছে তাদের অতি মূল্যবান সম্পদ আমানত হিসাবে গচ্ছিত রাখত। যেহেতু তাঁর ইসলাম ধর্ম প্রচার কার্যক্রম শত্রুদের কাছে চরম অসহনীয় হয়ে গিয়েছিল তাই তাদের সকল চেষ্টা- প্রচেষ্টা এ বিষয়ে নিয়োজিত করেছিল যে, যে সব সম্পর্কের দ্বারা জনগণের অন্তরকে সম্পূর্ণরূপে প্রভাবান্বিত করা সম্ভব সেগুলোর মধ্য থেকে কিছু সম্পর্ককে তারা তাঁর থেকে ঘুরিয়ে দেবে। কারণ তারা জানত যে, অ া সম্পর্ক মুশরিকদের চিন্তা- চেতনায় গুরুত্বহীন হওয়ার কারণে সেগুলো কোন কাঙ্ক্ষিত প্রভাব রাখতে পারবে না। এ কারণেই তারা ইসলামের প্রতি তাঁর আহবান প্রত্যাখ্যান করার কারণ দর্শিয়ে বলতে বাধ্য হয়েছিল যে, তাঁর দাবিগুলোর উৎসমূল হচ্ছে কতকগুলো পাগলামিপূর্ণ চিন্তা- ভাবনা ও কল্পনা যেগুলো তাঁর যুহদ (পার্থিব আয়েশ বর্জন) ও সত্যবাদিতার মোটেও পরিপন্থী হবে না এবং এই লোক- দেখানো সম্পর্ক প্রচার করার ক্ষেত্রে তারা (কুরাইশগণ) বিভিন্ন ধরনের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছিল।

চরম লোক দেখানোর কারণে অপবাদ আরোপের সময় তারা (কুরাইশগণ) পবিত্রতার ভাব ধারণ করত। তারা মহানবীর নবুওয়াতের বিষয়টি সন্দেহ ও সংশয়সহ প্রকাশ করত এবং বলত :

(إفترى على الله كذبا أم به جنّة)

" সে মহান আল্লাহর ওপর অপবাদ আরোপ করছে অথবা উন্মাদনা তার ওপর জেঁকে বসেছে অর্থাৎ সে উম্মাদ ও পাগল হয়ে গেছে। " - (সূরা সাবা : ৮)

এটিই হচ্ছে সত্যের শত্রুদের ব্যব ত শয়তানী প্রক্রিয়া যা তারা সর্বদা মহান ব্যক্তিবর্গ ও সমাজ-সংস্কারকদেরকে প্রত্যাখ্যান করার জ ব্যবহার ও প্রয়োগ করে থাকে। আর পবিত্র কোরআন থেকেও আমরা জানতে পারি যে, এ নিন্দিত প্রক্রিয়াটি মহানবীর রিসালাতের যুগের ব্যক্তিদের সাথেই সম্পর্কিত নয়, বরং পূর্ববর্তী যুগসমূহের শত্রুরাও নবীদেরকে প্রত্যাখ্যান করার ক্ষেত্রে ব্যবহার করেছে।

উদাহরণস্বরূপ পবিত্র কোরআনে বর্ণিত হয়েছে :

(وكذلك ما أتى الذين مِن قبلهم مِن رسولٍ إلّا قالوا ساحرٌ أوْ مجنونٌ، أتواصوا به بل هم قومٌ طاغونَ)

"আর ঠিক একইভাবে পূর্ববর্তী উম্মতসমূহে যখনই কোন রাসূল প্রেরিত হয়েছে তখনই তাঁকে যাদুকর অথবা পাগল বলা হয়েছে; তারা (পূর্ববর্তী উম্মতগণ) কি এ কথা বলার ব্যাপারে অনুরোধ করে নি, বরং তারাই ছিল অবাধ্য- সীমা লঙ্ঘনকারী সম্প্রদায়।"(সূরা যারিয়াত : ৫২- ৫৩)

বর্তমানে বিদ্যমান ইঞ্জিলসমূহেও উল্লিখিত আছে যে, হযরত ঈসা মাসীহ্ (আ.) যখন ইয়া দী জাতিকে উপদেশ দিলেন তখন তারা বলেছিল, "তার মধ্যে শয়তান আছে এবং সে প্রলাপ বকছে। তাহলে কেন তোমরা তাঁর কথা শুনবে?"[৩০৩]

তাই নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, কুরাইশরা যদি এ সব অপবাদ ব্যতীত অ কোন অপবাদ আরোপ করতে পারত, তাহলে তারা কখনই ঐ অপবাদ আরোপ করা থেকে পিছপা হতো না। কিন্তু মহানবীর চল্লিশোর্ধ নির্মল পবিত্র গৌরবোজ্জ্বল জীবন তাদেরকে অ া অপবাদ ও রটনা আরোপ করা থেকে বিরত থাকতে বাধ্য করেছে। খুবই ছোট- খাট ও তুচ্ছ ঘটনাকে মহানবীর বিরুদ্ধে ব্যবহার করার জ কুরাইশগণ সদা প্রস্তুত থাকত। উদাহরণস্বরূপ কখনো কখনো মহানবী (সা.) 'মারওয়া ' পাহাড়ের কাছে 'জাবর ' নামের এক ি ষ্টান গোলামের সাথে বসতেন। রিসালাতের যুগের শত্রুরা এ ব্যাপারকে তৎক্ষণাৎ পুঁজি করে বলত, এই ি ষ্টান গোলামই মহানবীকে পবিত্র কোরআন শিখাচ্ছে। পবিত্র কোরআন তাদের ভিত্তিহীন কথা ও বক্তব্যের জবাব দিয়েছে এভাবে :

(ولقد نعلمُ أنّهم يقولون إنّما يعلّمه بشرٌ لسانُ الّذي يُلحدون إليه أعجميٌّ وهذا لسانٌ عربيٌّ مبينٌ)

“আমরা নিশ্চিতভাবে জানি যে, তারা (কুরাইশগণ) বলে : একজন মানুষ তাঁকে কোরআন শিখায়; যে ব্যক্তির প্রতি তারা ইি ত করছে তার ভাষা আজামী (অনারব ভাষা) এবং এ গ্রন্থটি (কোরআন) হচ্ছে অত্যন্ত স্পষ্ট আরবী ভাষায় অবতীর্ণ।”(সূরা নাহল : ১০৩)

অবচেতন মনের কাল্পনিক ওহী মতবাদ : পাগলামীর অপবাদ আরোপের উন্নততর ধরন

মহান নবীদের ওহী, বিশেষ করে মহানবী (সা.)- এর ওপর অবতীর্ণ ওহী সম্পর্কে মনগড়া ব্যাখ্যা দেয়ার জ ধর্মবিরোধী নাস্তিক গোষ্ঠীসমূহের অ তম প্রচেষ্টা হলো ‘অবচেতন মনের কাল্পনিক ওহী মতবাদ’।

বিভিন্ন কারণে এ গোষ্ঠীটি মহানবীকে একজন মিথ্যাবাদী ও অপরাধী বলে অভিহিত করতে চায় না; কারণ তাঁর আচার- আচরণ ও কথাবার্তা, তাঁর নিজের বাণীর সত্যতার ব্যাপারে তাঁর দৃঢ় বি াস ও আস্থাকে স্পষ্ট করে উত্থাপন করে। এ কারণেই তারা বি াস করে যে, তিনি আসলেই দৃঢ়ভাবে বি াস করতেন, তিনি মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত এবং তাঁর যাবতীয় শিক্ষাও তাঁর কাছ থেকেই প্রাপ্ত। কিন্তু তারা তাঁর ঈমানকে ভিন্ন আরেকটি পথে ব্যাখ্যা করে থাকে। তারা বলে যে, ওহী হচ্ছে মুহাম্মদ (সা.)- এর আত্মারই এক ধরনের আহবান ব্যতীত আর কিছুই নয়। কারণ বছরের পর বছর ধরে চিন্তা- ভাবনা এবং ঐ একই চিন্তা দ্বারা তাঁর আত্মার পরিতুষ্টির কারণে ঐ চিন্তা- ভাবনা তাঁর কাছে বাস্তবরূপ পরিগ্রহ করত এবং যে ব্যক্তি সর্বদা কোন ব্যাপার ও চিন্তার মধ্যে ম হয়ে যায় তার অন্তরে এ ধরনের শব্দ ঝংকৃত হতে থাকে এবং তার অবচেতন মনের ফেরেশতা ছিল তাঁর অস্তিত্বের সুগভীরে লুক্কায়িত তাঁর আশা- আকাঙ্ক্ষা।

তবে অবশ্যই আমাদের মনে রাখা উচিত যে, এ ধরনের অপব্যাখ্যাও নতুন নয়। রিসালাতের যুগের মুশরিকগণ মহানবী (সা.)- এর ওপর অবতীর্ণ ওহীকে এভাবেও ব্যাখ্যা করত এবং বলত :

(بل قالوا أضْغاثٌ أحلامٍ بلِ افتراه)

“যা কিছু সে (মুহাম্মদ) বলে তা হচ্ছে সব ইতস্তত বিক্ষিপ্ত চিন্তাধারা যা তার কল্পনাপ্রসূত, বরং সে মিথ্যারোপ করেছে।”(সূরা আম্বিয়া : ৫)

তারা পবিত্র কোরআনকে কতগুলো ইতস্তত বিক্ষিপ্ত চিন্তাধারা হিসাবে বিবেচনা করত যা অনিচ্ছাকৃতভাবে তাঁর মস্তিষ্কে উদিত হতো এবং তারা তাঁকে এ সব বিষয় সৃষ্টি ও রচনা করার ইচ্ছা পোষণকারী এবং ক্ষমতাবান বলে মনেও করত না। যদিও এ পর্যায় ছাড়িয়েও আরো ব দূর এগিয়ে গিয়ে কেউ কেউ তাঁর ওপর মিথ্যা বলারও অপবাদ আরোপ করেছে।

পবিত্র কোরআন সূরা নাজমে মহানবী (সা.)- এর ওপর অবতীর্ণ ওহীর বিষয়টি বর্ণনা এবং ওহীর প্রকৃত স্বরূপ উন্মোচন করেছে। এ গ্রন্থ এ মতবাদটি (অবচেতন মনের কাল্পনিক ওহী মতবাদ) অপনোদন করে বলেছে যে, একদল ব্যক্তি পবিত্র কোরআন ও মহানবীর নবুওয়াতের দাবিকে তাঁর নিজেরই কল্পনার ফসল বলে অভিহিত করে বলে যে, তিনি কল্পনা করেন তাঁর ওপর ওহী অবতীর্ণ হয় অথবা তিনি কোন ফেরেশতাকে দেখতে পান, অথচ কেবল তাঁর কল্পনার জগৎ ব্যতীত আর কোথাও এ ধরনের জিনিসের বাস্তবে কোন অস্তিত্ব নেই।

সূরা নাজমের এ আয়াতগুলো এক ধরনের অনবদ্য শৃঙ্খলা ও সামঞ্জস্যের অধিকারী এবং এমন এক ব্যক্তির আধ্যাত্মিকতা বর্ণনা করছে যিনি বিশেষ বিশেষ অবস্থা ও পরিস্থিতিতে মহান আল্লাহর আধ্যাত্মিক দান ও আশীর্বাদপুষ্ট। পবিত্র কোরআন এ সূরায় অবচেতন মনের কাল্পনিক মতবাদ অপনোদন করে বলেছে :

(والنّجمِ إذا هوى ما ضلَّ صاحبكم وما غوى وما ينطقُ عنِ الهوى إنْ هو إلّا وحيٌ يوحى علّمه شديد القوى ذو مرّةٍ فاستوى وهو بالأُفقِ الأعلى ثمّ دنا فتدلّى فكان قاب قوسينِ أو أدنى فأوحى إلى عبده مآ أوحى ما كذب الفؤادُ ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رءاه نزلةً أُخرى عند سدرة المنتهى عندها جنّةُ المأْوى إذ يغشى السّدرةَ ما يغشى مازاغَ البصرُ و ما طغى لقد رأى مِن آياتِ ربِّه الكبرى)

“ ঐ তারকার শপথ যখন তা অস্তগামী হয়, তোমাদের বন্ধু পথভ্রষ্ট (হন নি) এবং বিপথগামীও হন নি, তিনি প্রবৃত্তির কামনা- বাসনার বশবর্তী হয়ে কথা বলেন না, যা কিছু তিনি বলেন তা ওহী ব্যতীত আর কিছুই নয় যা (তাঁর কাছে) প্রেরিত (প্রত্যাদেশ) হয়, এক শক্তিমান সত্তা (ওহীর ফেরেশতা) তাঁকে শিক্ষা দিয়েছেন, সহজাত শক্তিসম্পন্ন, তিনি নিজ আকৃতিতে প্রকাশ পেলেন ঊর্ধ্ব দিগন্তে [৩০৪], অতঃপর নিকটবর্তী হলেন ও ঝুলে গেলেন, তখন দুই ধনুকের ব্যবধান ছিল অথবা আরো কম, তখন তিনি (ফেরেশতা) তাঁর (মহান আল্লাহর) বান্দার প্রতি যা প্রত্যাদেশ

করার তা প্রত্যাদেশ করলেন, (মহানবীর) অন্তর মিথ্যা বলে নি যা তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন, তিনি যা দেখেছেন সে ব্যাপারে কি তোমরা তাঁর সাথে তর্ক করবে? নিশ্চয়ই তিনি আরেকবার তাঁকে দেখেছিলেন সিদরাতুল মুনতাহার (সর্বশেষ দূরত্বে অবস্থিত কুলবৃক্ষ) কাছে, যার কাছে অবস্থিত বসবাসের বেহেশত, যা আচ্ছাদন করে তা- ই কুলবৃক্ষটিকে আচ্ছাদন করে, তাঁর দৃষ্টিভ্রম হয় নি এবং সীমা লঙ্ঘনও করে নি, নিশ্চয়ই তিনি নিজ প্রভুর মহান নিদর্শনসমূহ অবলোকন করেছেন। ”

পবিত্র কোরআন এ সব আয়াতে ‘অবচেতন মনের কাল্পনিক ওহী মতবাদ’ এবং ‘পবিত্র কোরআন তাঁর কল্পনার ফসল’ - এ ধরনের ধারণার তীব্র নিন্দা করেছে। আর এ মতবাদের সমর্থকগণকে অহেতুক তর্কবিতর্ককারী ও কলহপ্রিয় বলে বিবেচনা করে। তাই পবিত্র কোরআন দ্ব্যর্থহীনভাবে ঘোষণা করেছে যে, মহানবী (সা.)- এর অন্তর যেমন ভুল করে নি, ঠিক তেমনি তাঁর চোখ ও দৃষ্টিশক্তিও ভুল করে নি। উভয় ক্ষেত্রেই দর্শনকার্য সঠিক ও বাস্তব অর্থেই সম্পন্ন হয়েছে। তাই পবিত্র কোরআনে বর্ণিত হয়েছে :

(ما كذب الفؤاد ما رأى)

“অন্তর যা দেখেছে তা ভুল দেখে নি।”

(مازاغ البصرُ وما طغى)

“চোখ ও দৃষ্টিশক্তি ভ্রষ্ট ও বিচ্যুত হয় নি এবং (দর্শন ও দৃষ্টি সংক্রান্ত নীতিমালার) লঙ্ঘন করে নি।” আর সব কিছুই সম্পূর্ণরূপেই বাস্তব ছিল; কোন কিছুই এ ক্ষেত্রে অলীক স্বপ্ন ছিল না।

পরোক্ষভাবে মহানবীকে পাগল বলার অপচেষ্টা

জাহেলী আরবগণ যদিও বিভিন্নভাবে মহান আল্লাহর ওহীর অপব্যাখ্যা দিত এবং মহানবীকে মিথ্যারোপকারী বলত অথবা তাঁকে যাদুকর বলে অভিহিত করত; তবু তারা জোর করে মহানবীকে পাগল ও গণক হিসাবেও পরিচিত করাতে চাইত।

তাদের পরিভাষায় পাগল হচ্ছে ি নের আছরগ্রস্ত ব্যক্তি যে তার ওপর ি নের হস্তক্ষেপের ফলে অনুধাবন করার ক্ষমতা ও বোধশক্তি হারিয়ে ফেলে এবং আবোল- তাবোল বকতে থাকে।

গণক হচ্ছে অদৃষ্টবক্তা কোন একটি ি নের সাথে যার সম্পর্ক রয়েছে এবং যাকে বিভিন্ন অবস্থা ও ঘটনার সাথে পরিচিত করায়।

অবশেষে এক পাগল অথবা অদৃষ্টবক্তা গণকের বাণীগুলো কেবল তার নিজের সাথে জড়িত নয়, বরং সেগুলো হচ্ছে ঐ ি নের পক্ষ থেকে প্রক্ষেপস্বরূপ যে তার মন ও ক র ওপর আরোপ করে যদিও সে এ ব্যাপারে সচেতন নয়।

জাহেলী আরবগণ জ্ঞান ও বিদ্যা থেকে দূরে থাকা, ধোঁকাবাজি, কূটকৌশল ও ছলচাতুরী থেকে দূরে থাকার কারণে যা কিছু তাদের   দয়ে পোষণ করত তা অবাধে বলে ফেলত এবং মহানবী (সা.)- এর সামনে দাঁড়িয়েই বলত :

(وقالوا يا أيُّها الّذي نزّل عليه الذّكرُ إنّك لمجنون)

" হে ঐ ব্যক্তি যার ওপর কোরআন অবতীর্ণ হয়েছে! নিশ্চয়ই তুমি পাগল।"(সূরা হিজর : ৬)

এই অভিযোগ কেবল মহানবী (সা.)- এর সাথেই সংশ্লিষ্ট নয়, বরং মানব জাতির ইতিহাসে বিদ্যমান সাক্ষ্য- প্রমাণের ভিত্তিতে দেখা যায় যে, সংস্কারকদেরকে অজ্ঞ ও পাগল বলে অভিহিত করা হতো এবং এ ধরনের সম্পর্ক ও উপাধি আরোপ করার অন্তর্নিহিত কারণ ছিল এই যে, জনগণকে তাঁদের কাছ থেকে বিক্ষিপ্ত করে দেয়া যাতে তারা তাঁদের কথা শ্রবণ না করে। পবিত্র কোরআনে মহানবী (সা.)- এর ব্যাপারে এ ধরনের উপাধি ও সম্পর্ক আরোপের বিষয়টি সূরা হিজরের ৬ নং আয়াত, সূরা সাবার ৮ নং আয়াত, সূরা সাফফাতের ৩৬ নং আয়াত, সূরা দুখানের ১৪ নং আয়াত, সূরা তূরের ২৯ নং আয়াত, সূরা কলমের ২ নং আয়াত ও সূরা তাকভীরের ২২ নং আয়াতে বর্ণিত হয়েছে।

২. পবিত্র কোরআনের বিরোধিতা করার চিন্তা

অপবাদ আরোপের মরিচাধরা হাতিয়ার মহানবী (সা.)- এর ওপর তেমন একটা কার্যকর হয় নি; কারণ জনগণ পূর্ণ বুদ্ধিমত্তা ও বিচক্ষণতা সহকারে অনুভব করতে পেরেছিল যে, পবিত্র কোরআনের এক আশ্চর্যজনক আত্মিক আকর্ষণ ক্ষমতা আছে। আর তারা কখনই এ ধরনের মিষ্টি মধুর বাণী শুনে নি। এ কোরআনের বাণী এতটা গভীর ও মৌলিক যে, তা দয়ে গেঁথে যায়। মহানবীকে দোষী সাব্যস্ত ও তাঁর ওপর মিথ্যা অপবাদ আরোপ করে লাভবান না হওয়ার ফলশ্রুতিতেই শত্রুরা আরেক ধরনের শিশুসুলভ ফন্দি- ফিকিরে লিপ্ত হয়। তারা ভেবেছিল যে, তা প্রয়োগ করার মাধ্যমে তারা মহানবীর প্রতি জনগণের মনোযোগ নষ্ট করে দিতে সক্ষম হবে।

নযর বিন হারেস কুরাইশদের অ তম বুদ্ধিমান, চতুর ও বিশেষজ্ঞ পর্যায়ের ব্যক্তিত্ব ছিল। এ ব্যক্তি তার জীবনের একাংশ হীরা ও ইরাকে কাটিয়েছিল। সে ইরানের রাজা- বাদশাহ্ এবং রুস্তম ও ইসফানদিয়ারের মতো সেখানকার সাহসী বীরের অবস্থা এবং ম ল ও অম ল সংক্রান্ত ইরানীদের বি াস সম্পর্কে কিছুটা জ্ঞাত ছিল। মহানবীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার জ কুরাইশরা তাকে নির্বাচিত করে। তারা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, নযর বিন হারেস হাটে- বাজারে, পথে- ঘাটে ও অলিতে- গলিতে ইরানী জাতি ও তাদের রাজা- বাদশাহেদের গল্প ও কাহিনী বর্ণনা করে মহানবী (সা.)- এর বাণী শ্রবণ করা থেকে জনগণকে বিরত রাখবে এবং তাদেরকে নিজের প্রতি আকৃষ্ট করবে। মহানবীর মর্যাদা ও সম্মান কমানোর জ এবং পবিত্র কোরআনের বাণী অর্থহীন দেখানোর জ সে সব সময় বলত : "হে জনগণ! মুহাম্মদের বাণীগুলোর সাথে কি আমার কথাগুলোর কোন পার্থক্য আছে? সে তোমাদের কাছে এমন সম্প্রদায়ের গল্প ও কাহিনী বর্ণনা করে যারা মহান আল্লাহর ক্রোধ, গজব ও আযাবের শিকার হয়েছিল। আর আমিও এমন এক গোষ্ঠীর গল্প ও কাহিনী বর্ণনা করি যারা বিত্তবিভব ও প্রাচুর্যে নিমজ্জিত ছিল এবং দীর্ঘকাল পৃথিবীর বুকে রাজত্ব করেছে।"

এ পরিকল্পনাটি এতটা নির্বুদ্ধিতাপূর্ণ ছিল যে, তা গুটিকতক দিনের বেশি চলে নি। আর স্বয়ং কুরাইশরাও তার কথা শুনে ক্লান্ত হয়ে পড়ে এবং তার থেকে দূরে সরে যায়।

এ প্রসে বেশ কিছু আয়াত অবতীর্ণ হয়েছিল। তন্মধ্যে কেবল একটি আয়াতের তরজমা নিচে দেয়া হলো :

(وقالوا أساطيرُ الأوّلينَ اكْتتبَها فهي تملى عليه بكرةً و أصيلاً، قل أنزلَه الّذي يعلمُ السِّرَّ في السّماوات والأرضِ إنّه كان غفوراً رحيما)

"আর তারা বলেছে : এগুলো হচ্ছে পূর্ববর্তীদের গল্প ও কাহিনী যেগুলো সে রচনা করেছে; আর এগুলো সকাল ও সন্ধ্যায় তার ওপর আরোপ করা হয়। আপনি বলে দিন যিনি আকাশসমূহ ও পৃথিবীর সকল রহস্য সম্পর্কে জ্ঞাত তিনিই তা অবতীর্ণ করেছেন; নিশ্চয়ই তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও দয়ালু।"(সূরা ফুরকান ৫ ও ৬)[৩০৫]

বিরোধিতা সত্ত্বেও নিজস্ব অভিমত বজায় রাখা

মহানবী (সা.) খুব ভালোভাবেই জানতেন যে, অধিকাংশ মানুষের মূর্তিপূজা আসলে গোত্রপতিদের অন্ধ অনুসরণ থেকেই উদ্ভূত এবং তাদের অন্তরে তা প্রোথিত নয়। যদি গোত্রপতিদের মধ্যে এমন কোন বি ব সংঘটিত এবং তা সফল হয় যার ফলে দু'একজন গোত্রপতি (এ বি বের সাথে) একাত্ম হয়ে যায় তাহলে অগণিত সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। এ কারণেই তিনি ওয়ালীদ বিন মুগীরার ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হবার ব্যাপারে বেশ গুরুত্ব দিতেন। এই ওয়ালীদ বিন মুগীরার ছেলে খালিদ ইবনে ওয়ালীদ পরবর্তীতে মুসলমানদের দি জয়ী সেনাপতি হয়েছিলেন। ওয়ালীদ ছিল সবচেয়ে বর্ষীয়ান ও প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব- কুরাইশ বংশের মধ্যে যার ছিল মর্যাদা ও নেতৃত্ব। তাকে আরবদের মধ্যে জ্ঞানী ও প্রজ্ঞাবান ব্যক্তি বলে অভিহিত করা হতো এবং মতবিরোধের ক্ষেত্রে তার অভিমতের প্রতি সম্মান প্রদান করা হতো।

একদিন এক উপযুক্ত মুহূর্তে মহানবী তার সাথে কথা বলছিলেন। ঠিক সে সময় অন্ধ সাহাবী ইবনে উম্মে মাকতূম মহানবী (সা.)- এর কাছে উপস্থিত হয়ে তাঁকে পবিত্র কোরআনের কিছু অংশ পাঠ করে শোনাতে অত্যন্ত জোরালোভাবে অনুরোধ করলেন। এ কারণেই তিনি ইবনে উম্মে মাকতূম থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন, ভ্রূকুটি করলেন এবং তাঁর সাথে কথা বললেন না।

এ ঘটনা ঘটে গেল। কিন্তু মহানবী (সা.) এ অবস্থা ও পরিস্থিতি নিয়ে চিন্তা করেছিলেন এমনি অবস্থায় সূরা আবাসার প্রথম দিকের ১৪টি আয়াত অবতীর্ণ হলো। এখানে কয়েকটি আয়াতের অনুবাদ দেয়া হলো :

" সে ভ্রূকুটি করল এবং পিঠ ফিরিয়ে নিল এ কারণে যে, তাঁর কাছে একজন অন্ধ (ইবনে উম্মে মাকতূম) এসেছে। আপনি কি জানেন যে, তার অন্তঃকরণ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে পবিত্র হবে এবং তাকে স্মরণ করিয়ে দিলে কি তার কোন লাভ হবে? কিন্তু যে ব্যক্তি নিজের অভাবহীনতা প্রদর্শন করে সে কি আপনার প্রতি আকৃষ্ট হবে ও ঝুঁকে পড়বে? কিন্তু যে ব্যক্তি আপনার কাছে ত ছুটে আসে এবং (মহান আল্লাহকে) ভয় করে, আপনি কি তাঁর ব্যাপারে উদাসীন থাকবেন? এরকম করবেন না। কারণ এ কোরআন হচ্ছে স্মরণকারী ঐ ব্যক্তির জ , যে তা শিখতে চায়...।"[৩০৬]

প্রখ্যাত শিয়া গবেষক ও পণ্ডিতগণ ইতিহাসের এ অংশটিকে ভিত্তিহীন বলে জানেন এবং এ থেকে মহানবী (সা.)- এর চরিত্র পবিত্র বলে গণ্য করেন। তাঁরা বলেছেন, স্বয়ং এ সব আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় না যে, যে ব্যক্তি ভ্রূকুটি করেছে ও মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে সে ব্যক্তি ছিল স্বয়ং মহানবী (সা.)। ইমাম জাফর সাদেক (আ.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, এ সূরায় যে ভ্রূকুটি করেছে ও মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে সে ব্যক্তিটি ছিল আসলে উমাইয়্যা বংশোদ্ভূত এক ব্যক্তি; যখন ইবনে উম্মে মাকতূম মহানবীর কাছে উপস্থিত হলেন তখন সে- ই তাঁর (ইবনে উম্মে মাকতূমের) প্রতি চরম অবজ্ঞা ও ঘৃণা প্রদর্শন করেছিল।[৩০৭]

৩. কুরাইশগণ কর্তৃক পবিত্র কোরআন শ্রবণ বর্জন

তাওহীদভিত্তিক ইসলাম ধর্মের প্রসারে বাধা দেয়া এবং এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ও সংগ্রামের যে ব্যাপক পরিকল্পনা মক্কার পৌত্তলিকগণ গ্রহণ করেছিল তা একের পর এক বাস্তবায়ন করা হলো। কিন্তু তারা এ সব প্রতিরোধ ও সংগ্রামে ততটা সফল হয় নি এবং তাদের সকল পরিকল্পনা ও ষড়যন্ত্র একের পর এক ব্যর্থ হয়ে যায়।

এক যুগ তারা মহানবী (সা.)- এর বিরুদ্ধে প্রচারণা চালাল; কিন্তু কখনই তারা পরিপূর্ণভাবে সফল হয় নি এবং মহানবী (সা.)- কে তারা তাঁর পথ ও আদর্শে অধিকতর অটল ও দৃঢ়তর পেয়েছে এবং প্রত্যক্ষ করেছে যে, ইসলাম ধর্ম দিন দিন প্রসার লাভ করেছে।

কুরাইশ নেতৃবর্গ জনগণকে পবিত্র কোরআন শ্রবণ করা থেকে বিরত রাখার সিদ্ধান্ত নেয়। তাদের ষড়যন্ত্র যাতে করে পূর্ণরূপে সফল হয় সেজ তারা পবিত্র মক্কার সর্বত্র গুপ্তচরদের নিয়োগ করে মহান আল্লাহর ঘর যিয়ারতকারী ও ব্যবসা- বাণিজ্য উপলক্ষে মক্কায় আগত ব্যবসায়ীদেরকে মহানবী (সা.)- এর সাথে যোগাযোগ এবং সম্ভাব্য সকল পন্থায় তাদেরকে পবিত্র কোরআন শ্রবণ করা থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করেছে। এ সব কুরাইশ নেতৃবৃন্দের মুখপাত্র মক্কাবাসীদের মাঝে একটি ঘোষণাপত্র প্রচার করেছিল যার বিষয়বস্তু পবিত্র কোরআন বর্ণনা করেছে :

(وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآنِ وألْغَوا فيه لعلّكم تغلبون)

" কাফিরগণ বলেছে : এ কোরআন শ্রবণ করো না এবং (কোরআন) তিলাওয়াত করার সময় হৈ চৈ করো, আশা করা যায় যে, তোমরাই বিজয়ী হবে।"(সূরা ফুসসিলাত : ২৬)

মহানবী (সা.)- এর সবচেয়ে সফল ও কার্যকর হাতিয়ার যা শত্রুদের মনে এক আশ্চর্যজনক ভীতি ও ত্রাসের সঞ্চার করেছিল তা ছিল এই কোরআন। কুরাইশ নেতৃবর্গ দেখতে পেল যে, মহানবীর অগণিত শত্রু তাঁকে ব্য - বি প ও কষ্ট দেয়ার জ তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতে যেত; যখনই তাদের কর্ণকুহরে পবিত্র কোরআনের গুটিকতক আয়াতের সুললিত তিলাওয়াত ধ্বনি পৌঁছে যেত তখনই তারা নিজেদের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলত এবং তখন থেকেই তারা তাঁর একনিষ্ঠ

সমর্থক হয়ে যেত। এ ধরনের ঘটনাগুলোর যাতে পুনরাবৃত্তি না হয় সেজ   তারা সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যে, পবিত্র কোরআনের আয়াতসমূহ শ্রবণ করা থেকে তারা তাদের অনুসারী ও সমর্থকদেরকে নিষেধ করবে এবং মহানবীর সাথে কথা বলা থেকে তারা বিরত থাকবে।

আইন ভঙ্গকারী আইন প্রণেতাগণ

যে গোষ্ঠীটি তীব্র একগুঁয়েমিবশত জনগণকে মহানবী (সা.)- এর পবিত্র কোরআন শোনা থেকে বিরত রাখত এবং যে ব্যক্তি তাদের গৃহীত এ সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধাচরণ করত তাকেই তারা অপরাধী বলে গণ্য করত, তারাই কয়েকদিন পরে আইনভ কারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। তারা সর্বসম্মতিক্রমে যে আইনটি অনুমোদন করেছিল কার্যত তারা নিজেরাই গোপনে আইনটি ভ করেছিল।

আবু সুফিয়ান, আবু জাহল ও আখনাস বিন শুরাইক একে অপরের অজান্তে এক রাতে ঘর থেকে বের হয়ে মহানবী (সা.)- এর গৃহাভিমুখে রওয়ানা হয়। তাদের প্রত্যেকেই এক এক কোণায় লুকিয়ে থাকে। মহানবী (সা.) যখন রাতের বেলা নামাযে অত্যন্ত আকর্ষণীয় কে পবিত্র কোরআন তিলাওয়াত করবেন তখন তা শোনাই ছিল তাদের উদ্দেশ্য। ঐ তিন ব্যক্তি একে অপরের অজান্তে প্রভাত পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করে পবিত্র কোরআন শ্রবণ করতে থাকে। প্রভাতে তারা নিজেদের ঘরে ফিরে যেতে বাধ্য হয়। পথিমধ্যে তাদের একে অপরের সাথে সাক্ষাৎ হলে তারা পরস্পরকে তিরস্কার করে এবং বলতে থাকে, “সরলমনা লোকেরা যদি আমাদের এ কাজের কথা জানতে পারে তাহলে তারা আমাদের ব্যাপারে কি বলবে?”

দ্বিতীয় রাতেও এই একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হয়। যেন এক অভ্যন্তরীণ আকর্ষণী ক্ষমতা তাদেরকে মহানবীর গৃহাভিমুখে টেনে নিয়ে যেত। ফেরার সময় আবার তিনজনেরই একে অপরের সাথে সাক্ষাৎ হয় এবং তারা নিজেরা একে অপরকে তিরস্কার করতে থাকে। তারা সিদ্ধান্ত নেয় যে, তারা এ কাজের আর পুনরাবৃত্তি করবে না। কিন্তু পবিত্র কোরআনের আকর্ষণী ক্ষমতা তাদেরকে তৃতীয়বারের মতো পুনরায় একে অপরের অজান্তেই মহানবীর ঘরের চারপাশে জড়ো করেছিল এবং তারা প্রভাত পর্যন্ত মহানবীর পবিত্র কোরআন তিলাওয়াত শুনতে থাকে। প্রতি মুহূর্তে তাদের মনে ভয়- ভীতি বেড়ে যেতে লাগল এবং তারা নিজেদেরকে নিজেরাই বলতে লাগল যে, যদি মুহাম্মদের পুরস্কার ও শাস্তির অ ীকার সত্য হয় তাহলে জীবনে তারা পাপী ও অপরাধী বলে গণ্য হবে।

দিনের আলোয় চারদিক উজ্জ্বল হয়ে গেলে সরলমনা লোকদের ভয়ে তারা মহানবীর ঘর ত্যাগ করে এবং প্রথম দু’বারের মতো এবারেও ফেরার পথে একে অপরের সাথে সাক্ষাৎ হয় এবং তারা স্বীকার করতে বাধ্য হয় যে, পবিত্র কোরআনের আকর্ষণী ক্ষমতা, আহবান ও বিধি- বিধানের সামনে তাদের প্রতিরোধ করার ক্ষমতা নেই। কিন্তু অপ্রীতিকর ঘটনাবলী প্রতিহত করার জ তারা পরস্পর অ ীকারবদ্ধ হয় যে, তারা চিরকালের জ এ অভ্যাস ত্যাগ করবে।[৩০৮]

জনগণের ইসলাম ধর্ম গ্রহণে বাধা দান

'পবিত্র কোরআন শ্রবণ করা বর্জন ও বাধা দান' কর্মসূচীর পরপরই অপর একটি কর্মসূচী নেয়া হয়। দূরের ও কাছের যে সব ব্যক্তি ইসলাম ধর্মের প্রতি ঝুঁকতে থাকে এবং পবিত্র মক্কায় আগমন করতে থাকে, কুরাইশদের নিযুক্ত গুপ্তচররা পথিমধ্যে অথবা পবিত্র মক্কা নগরীতে প্রবেশ করার মুহূর্তে তাদের সাথে যোগাযোগ করে বিভিন্নভাবে তাদেরকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করা থেকে বিরত রাখত। এখানে আমরা দু'টি জীবন্ত ঐতিহাসিক দলিল উপস্থাপন করব :

১. জাহেলী যুগের অ তম প্রসিদ্ধ কবি ছিলেন আ'শা (أعشى)। তাঁর কবিতা কুরাইশদের উৎসবগুলোয় মিসরি দানার মতো গণ্য হতো (অর্থাৎ তাদের উৎসব ও ভোজসভাগুলোতে তাঁর কবিতাগুলো ব্যাপকভাবে আবৃত্তি করা না হলে সেগুলো জমতোই না)। জীবন সায়াে হ্ন বার্ধক্য যখন তাঁর ওপর জেকে বসে তখন তাওহীদ ও ইসলাম ধর্মের কিছু সুমহান শিক্ষা ও বাণী তাঁর কাছে পৌঁছেছিল। তিনি পবিত্র মক্কা থেকে দূরে অবস্থিত একটি এলাকায় জীবনযাপন করতেন এবং তখনও ঐ সব এলাকায় মহানবী (সা.)- এর নবুওয়াতের আহবান ও বাণী ভালোভাবে প্রচারিত হয় নি। কিন্তু তিনি ইসলাম ধর্মের সুমহান শিক্ষার সাথে যতটুকু পরিচিত হয়েছিলেন ততটুকুই তাঁর অস্তিত্বের মাঝে প্রবল ঝড় ও আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল। এ কারণেই তিনি মহানবীর প্রশংসায় একটি কাসীদাহ্ রচনা করেছিলেন যা মহানবী (সা.)- এর সামনে আবৃত্তি করার চেয়ে উত্তম আর কোন উপহার তাঁর দৃষ্টিতে বিবেচিত হয় নি। যদিও এ কাসীদাহ্ ২৪টি পঙ্ক্তিবিশিষ্ট তবুও এটি ছিল সর্বোত্তম কবিতা ও কাসীদাসমূহের অন্তর্ভুক্ত যেগুলো ঐ দিনগুলোতে মহানবী (সা.) সম্পর্কে রচিত হয়েছিল। এ কাসীদাটি 'আ'শার দেওয়ান' (আ'শার কবিতাসমগ্র)- এর ১০১- ১০৩ পৃষ্ঠায় পাওয়া যাবে।[৩০৯]

মহানবী (সা.)- এর খেদমতে উপস্থিত হবার সৌভাগ্য অর্জন করার আগেই কুরাইশদের গুপ্তচর কবি আ'শার সাথে যোগাযোগ করে তাঁর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সাথে পরিচিত হয়। তারা খুব

ভালোভাবে জানত যে, আ'শা ইন্দ্রিয়াসক্ত এবং মদ ও নারীর প্রতি তাঁর চরম আসক্তি আছে। তারা তাৎক্ষণিকভাবে তাঁর দুর্বল দিকটিকে কাজে লাগিয়ে বলল, "হে আবু বসীর! আপনার চারিত্রিক ও আত্মিক অবস্থার সাথে মুহাম্মদের ধর্ম মোটেও সংগতিপূর্ণ নয়।" তিনি বললেন, "কেন?" তখন তারা বলেছিল, "সে যিনা (ব্যভিচার) হারাম (নিষিদ্ধ) করেছে।" তিনি উত্তরে বলেছিলেন, "এ কাজে (যিনা) আমার কোন প্রয়োজন নেই। এ বিষয়টি (ব্যভিচার নিষিদ্ধকরণ) তাঁর ধর্ম গ্রহণ করার পথে আমার জ কোন বাধা নয়।" তারা বলল, "সে মদ হারাম করেছে।" আ'শা এ কথা শুনে কিছুটা দুঃখ পেলেন এবং বললেন, "আমি এখনও মদ পান করে তৃপ্তি লাভ করি নাই। আমি এখন ফিরে গিয়ে টানা এক বছর পরিপূর্ণ তৃপ্ত হওয়া পর্যন্ত মদপান করব এবং পরের বছর এসে তাঁর হাতে বাইআত করব।" এ কথা বলে আ'শা ফিরে গেলেন। কিন্তু মৃত্যু তাঁকে আর সে সুযোগ দেয় নি এবং ঐ বছরই তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন।[৩১০]

২. তুফাইল ইবনে আমর : তিনি ছিলেন একজন মিষ্টভাষী জ্ঞানী কবি। নিজ গোত্রের মধ্যে তাঁর কথার বেশ প্রভাব ছিল। তিনি একদা পবিত্র মক্কা নগরীতে গমন করলেন। কিন্তু তুফাইলের মতো ব্যক্তিবর্গের ইসলাম গ্রহণ মক্কার কুরাইশদের জ ছিল অত্যন্ত মারাত্মক ও দুর্বিষহ। এ কারণেই কুরাইশ নেতৃবর্গ এবং রাজনৈতিক অ নের প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তিগণ তাঁর কাছে এসে বলেছিল, "এ লোকটি যে পবিত্র কাবার পাশে নামায পড়ছে একটি নতুন ধর্ম প্রবর্তন করে সে আমাদের ঐক্য ও সংহতি নষ্ট করে দিয়েছে। আর সে তার কথার যাদু দিয়ে আমাদের মধ্যে অনৈক্য ও বিভেদের ভিত রচনা করেছে। আমরা ভয় পাচ্ছি যে, আপনাদের গোত্রের মধ্যেও সে বিভেদ ও অনৈক্যের সৃষ্টি করবে। তাই কতই না উত্তম হবে যদি আপনি এ লোকের সাথে কথা না বলেন!"

তুফাইল বলেন, "তাদের কথা আমার ওপর এতটা প্রভাব বিস্তার করেছিল যে, তাঁর ভাষার যাদুর প্রভাব বিস্তারের ভীতিবশত আমি সিদ্ধান্ত নিলাম যে, তাঁর সাথে কোন কথাই বলব না। আর তাঁর ভাষার যাদুর প্রভাব প্রতিহত করার জ তাওয়াফ করার সময় আমার কানের ভেতরে কিছু তুলা ভরে রাখলাম পাছে তাঁর নিচু স্বরে কোরআন তিলাওয়াত ও নামাযের ধ্বনি আমার কানে না

পৌঁছায়। প্রত্যুষে আমার দু'কানে তুলা থাকা অবস্থায় আমি মসজিদে প্রবেশ করি এবং তাঁর কথা শোনার কোন ইচ্ছা আমার ছিল না। কিন্তু আমার জানা নেই যে, কিভাবে আমার কানে অতি চমৎকার মিষ্টি বাণী তখন প্রবেশ করেছিল। আর আমিও সীমাহীন পুলকিত ও আনন্দিত হলাম। তখন আমি নিজেকেই বললাম : তোমার মা তোমার জ শোক প্রকাশ করুক। কারণ তুমি নিজেই একজন কবি ও বুদ্ধিমান। এ ব্যক্তির কথা শুনতে তোমার আপত্তি ও বাধাটা কোথায়? তাঁর কথা যদি সত্য হয় তাহলে তা গ্রহণ করবে। আর যদি তা মন্দ হয় তাহলে তা তুমি প্রত্যাখ্যান করবে। তাঁর সাথে প্রকাশ্যে যোগাযোগ না করে বরং একটু অপেক্ষা করতে লাগলাম। যখন তিনি সেখান থেকে বের হয়ে বাড়ির দিকে গমন করলেন এবং যে মুহূর্তে তিনি বাড়িতে প্রবেশ করতে যাবেন তখন আমিও তাঁর অনুমতি নিয়ে তাঁর ঘরে প্রবেশ করলাম। আমার ঘটনাটা আদ্যপান্ত তাঁকে শুনালাম এবং বললাম : কুরাইশগণ আপনার ব্যাপারে এরকম বলে থাকে এবং আমি মক্কায় আসার শুরুতে আপনার সাথে সাক্ষাৎ করার সিদ্ধান্ত নিই নি। কিন্তু আপনার ওপর অবতীর্ণ পবিত্র কোরআনের সুমিষ্টতা ও মাধুর্য আমাকে আপনার কাছে টেনে এনেছে। এখন আমি চাই আপনি আপনার ধর্মের প্রকৃত তাৎপর্য আমাকে ব্যাখ্যা করে শুনান।"

মহানবী (সা.) তুফাইলের কাছে ইসলাম ধর্মের প্রকৃত তাৎপর্য তুলে ধরলেন এবং পবিত্র কোরআন থেকে কিছু অংশ তিলাওয়াত করে শুনালেন। তুফাইল বলেন, "মহান আল্লাহর শপথ, এর চাইতে সুন্দর কোন বাণী আমি শুনি নি এবং এ ধর্মের চেয়ে অধিকতর ভারসাম্যপূর্ণ ধর্ম আর দ্বিতীয়টি দেখি নি।"

فلا والله ما سمعت قولاً قطُّ أحسن منه ولا أمراً أعدل منه

এরপর তুফাইল মহানবী (স.) এর কাছে অনুরোধ করে বললেন, "আমি আমার গোত্রের মাঝে একজন অত্যন্ত প্রভাবশালী ব্যক্তি। আমি আপনার ধর্ম প্রচারের জ কাজ করব।"

ইবনে হিশাম লিখেছেন, "তুফাইল খায়বর যুদ্ধের দিবস পর্যন্ত তাঁর গোত্রের মধ্যে ইসলাম ধর্ম প্রচারে মশগুল ছিলেন। ঐ দিবসে প্রায় ৮৭টি মুসলিম পরিবার তুফাইলের গোত্র থেকে মহানবী

(সা.)- এর সাথে যোগ দেয়। তুফাইল ইবনে আমর মহানবীর ওফাতের পর খলীফাদের যুগে ইয়ামামার যুদ্ধে শাহাদাতের শরবত পান করা পর্যন্ত ইসলাম ধর্মের ওপর দৃঢ় ছিলেন। ”

ঊনবিংশ অধ্যায় : ‘গারানিক’- এর উপাখ্যান

পাঠকদের মধ্যে সম্ভবত এমন ব্যক্তিও আছেন যাঁরা ‘গারানিক’- এর উপাখ্যানের উৎসমূল উদ্ধার করতে চান এবং বুঝতে চান যে, এ ধরনের মিথ্যা কল্প- কাহিনী তৈরি ও প্রসার করার ক্ষেত্রে কাদের হাত রয়েছে। স্মর্তব্য যে, গারানিকের এ উপাখ্যানটি আহলে সুন্নাত মাজহাবভুক্ত ঐতিহাসিকগণ বর্ণনা করেছেন।

ইয়া দীরা, বিশেষ করে তাদের নেতা ও ধর্মীয় পণ্ডিতগণ (আহবার) ইসলাম ধর্মের এক নম্বর শত্রু ছিল এবং আছে। কাবুল আহবার ও অ া ে র মতো একদল ব্যক্তি বাহ্যত ঈমান এনে মহান নবীদের নামে উদ্ধৃতি দিয়ে ভিত্তিহীন রেওয়ায়েতসমূহ প্রচার করে এবং মিথ্যা কল্প- কাহিনী বানিয়ে সত্য ঘটনাবলীর বিকৃতি সাধনে লিপ্ত হয়েছে। কতিপয় মুসলমান লেখক সকল মুসলিম ভাইয়ের প্রতি সুধারণা পোষণ করার কারণে গবেষণা ও অনুসন্ধান ব্যতিরেকেই তাদের বানোয়াট কাহিনীগুলোকে বিশুদ্ধ হাদীস ও ইতিহাসের সমপর্যায়ভুক্ত বিবেচনা করে লিপিবদ্ধ করেছেন।

কিন্তু এখন যখন এ ধরনের বিষয় অধ্যয়ন ও গবেষণা করার জ বিদগ্ধ পণ্ডিতগণের অপেক্ষাকৃত বেশি সময় ও সুযোগ রয়েছে এবং বিশেষ করে একদল ইসলামী গবেষকের ব চেষ্টা- সাধনার ফলশ্রুতিতে কাল্পনিক উপাখ্যানসমূহ থেকে সঠিক ঐতিহাসিক ঘটনাবলী পৃথক করার মূলনীতিসমূহ প্রণীত হয়েছে তখন এ কারণেই একজন ধর্মীয় আলেম লেখকের জ যে কোন বই- পুস্তকে যা কিছু তিনি দেখতে পাবেন তা অকাট্য সত্য বিষয় হিসাবে গণ্য করা এবং যাচাই- বাছাই না করে তা গ্রহণ ও মেনে নেয়া অনুচিত।

গারানিকের উপাখ্যান কি?

বলা হয় যে, ওয়ালীদ, আ'স, আসওয়াদ ও উমাইয়্যার মতো কুরাইশ নেতৃবর্গ ও গোত্রপতিগণ মহানবী (সা.)- এর সাথে সাক্ষাৎ করে তাঁকে অনুরোধ জানায় যে, মতপার্থক্য ও বিরোধ নিষ্পত্তি করার জ   উভয় পক্ষই একে অে   র উপাস্যদেরকে মেনে নেবে। এ সময়ই সূরা আল কাফিরূন তাদের অনুরোধের প্রেক্ষিতে অবতীর্ণ হয় এবং মহানবী (সা.) এ ধরনের কথা বলার জ   আদিষ্ট হন যে, "তোমরা যার ইবাদাত কর, আমি তার ইবাদাত করি না এবং আমিও যাঁর ইবাদাত করি, তোমরা তাঁর ইবাদাতকারী নও।"

এতদসত্ত্বেও মহানবী (সা.) কুরাইশদের সাথে একটি সমঝোতায় উপনীত হওয়ার ব্যাপারে আগ্রহী ছিলেন; তাই তিনি মনে মনে বলছিলেন, "হায় যদি এমন কোন বিধান অবতীর্ণ হতো যা আমাদের ও কুরাইশদের মধ্যকার ব্যবধান কমিয়ে আনত।"

একদিন তিনি কাবার পাশে অত্যন্ত আকর্ষণীয় ও   দয়গ্রাহী কে   সূরা নাজম তিলাওয়াত করছিলেন। যখন তিনি

(أفرأيتم اللّاتَ والعزّى ومناة الثّالثة الأخرى)

(অতঃপর তোমরা কি লাত, উয্যা এবং অপর তৃতীয় প্রতিমা মানাতকে দেখেছ? অর্থাৎ আমাকে লাত, উয্যা ও মানাত সম্পর্কে তথ্য দিতে পারবে?) - এ দুই আয়াতে (সূরা নাজমের ১৯ ও ২০ আয়াত) উপনীত হলেন তখন হঠাৎ শয়তান তাঁর (সা.) কে   নিম্নোক্ত দু'টি বাক্য উচ্চারিত করায়:

تلك الغرانيق العلى، منها الشّفاعةُ ترتجى

" এগুলো (লাত, উযযা ও মানাত) হচ্ছে উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন মহান গারানিক[৩১১] এদের শাফায়াতই কাম্য।"

এরপর তিনি সূরা নাজমের অবশিষ্ট আয়াতগুলোও তিলাওয়াত করলেন। যখন তিনি সিজদার আয়াতে পৌঁছলেন[৩১২] তখন স্বয়ং তিনি, মুসলমান ও মুশরিক নির্বিশেষে সকল উপস্থিত ব্যক্তি

প্রতিমাগুলোর সামনে সিজদাহ্ করলেন। কেবল ওয়ালীদ বার্ধক্যজনিত কারণে সিজদা করতে পারে নি।

মসজিদুল হারামে তুমুল হৈ চৈ ও আনন্দের বান বয়ে গেল। আর মুশরিকরা বলতে লাগল : মুহাম্মদ আমাদের উপাস্যদের প্রশংসা এবং সম্মানের সাথে স্মরণ করেছে। কুরাইশদের সাথে মুহাম্মদ (সা.)- এর সন্ধি- চুক্তির খবর হাবাশায় হিজরতকারী মুসলমানদের কানে গিয়েও পৌঁছায়। আর কুরাইশদের সাথে মুহাম্মদ (সা.)- এর সন্ধি ও শান্তি চুক্তি একদল মুহাজির মুসলমানের নিজেদের আবাসস্থল (হাবাশা) থেকে মক্কায় প্রত্যাবর্তন করার কারণ ছিল। কিন্তু মক্কায় প্রত্যাবর্তন করার পর তাঁরা দেখতে পেলেন যে, অবস্থা পুনরায় পরিবর্তিত হয়ে গেছে এবং ওহীর ফেরেশতা মহানবীর ওপর অবতীর্ণ হয়ে তাঁকে পুনরায় মুশরিকদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ও জিহাদ করার নির্দেশ দিয়ে বলেছেন, "এ দু'টি বাক্য শয়তান আপনার কে জারী করেছে। আর আমি কখনই এ ধরনের কথা বলি নি।" আর এতদপ্রসে সূরা হে র ৫২- ৫৪ নং আয়াতগুলো অবতীর্ণ হয়।

এটিই ছিল গারানিক উপাখ্যান যা তাবারী তাঁর[৩১৩] ইতিহাস গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন এবং প্রাচ্যবিদগণও তা ঢাক- ঢোল বাজিয়ে বর্ণনা করেছেন।

উপাখ্যান সংক্রান্ত একটি সাদামাটা পর্যালোচনা

আপনারা ধরে নিন যে, হযরত মুহাম্মদ (সা.) নির্বাচিত আসমানী ব্যক্তিত্বদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না; কিন্তু তাই বলে তাঁর বুদ্ধিমত্তা, দক্ষতা এবং জ্ঞান কখনই অস্বীকার করা সম্ভব নয়। কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তিই কি এ ধরনের কাজ করবে? যিনি জ্ঞানী, বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমান এবং দেখতে পাচ্ছেন যে, প্রতিদিনই তাঁর অনুসারীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং শত্রু শিবিরে বিরোধ ও ফাটল ব্যাপকতর হচ্ছে তখন কি এ ধরনের পরিস্থিতিতে তিনি এমন কোন কাজ করবেন যার ফলে তাঁর ব্যাপারে বন্ধু ও শত্রু সবাই হতাশ হয়ে পড়বে? আপনারা কি বি াস করবেন, যে ব্যক্তি তাওহীদী ধর্ম ইসলামের পথে কুরাইশদের প্রস্তাবিত সকল পদ ও বিত্ত- বৈভব প্রত্যাখ্যান করেছিলেন তিনিই আবার শিরক ও প্রতিমাপূজার প্রবর্তক হয়ে যাবেন? আমরা একজন

সংস্কারক ও সাধারণ রাজনীতিবিদের ব্যাপারেই এ ধরনের সম্ভাবনা আরোপ করি না, আর সেখানে মহানবী (সা.)- এর ক্ষেত্রে তো প্রশ্নই আসে না।

এ উপাখ্যান প্রসঙ্গে বিবেক- বুদ্ধির ফায়সালা

১. ঐ রিক শিক্ষকগণ (অর্থাৎ নবী- রাসূলগণ) বুদ্ধিবৃত্তিক দৃষ্টিকোণ থেকে সব সময় ইসমাত অর্থাৎ পবিত্রতার শক্তির বদৌলতে সব ধরনের পাপ, স্খলন ও ভুল- ভ্রান্তি থেকে সংরক্ষিত ও নিরাপদ। আর যদি অবধারিত থাকে যে, তাঁরা ধর্মীয় বিষয়াদির ক্ষেত্রেও ভুল- ভ্রান্তির শিকার হবেন, তাহলে তাঁদের কথা ও বাণীর প্রতি জনগণের আস্থা ও বি াস ধ্বংস হয়ে যাবে।

অতএব, এ ধরনের ঐতিহাসিক ঘটনাবলীকে আমাদের যুক্তিভিত্তিক আকীদা- বি াস দিয়ে অবশ্যই বিচার- বিশ্লেষণ করতে হবে। আমাদের দৃঢ় আকীদা- বি াসের আলোকে ইতিহাসের অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য বিষয় ও ঘটনাবলীর সমাধান করতে হবে। নিশ্চিতভাবে খোদায়ী ধর্ম প্রচার মহানবী (সা.)- এর ইসমাত এ ধরনের ঘটনাবলী ঘটার ক্ষেত্রে অন্তরায়স্বরূপ।

২. এ উপাখ্যানের ভিত্তি হচ্ছে এরূপ : মহান আল্লাহ্ মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)- এর কাঁধে যে দায়িত্ব অর্পণ করেছিলেন তিনি তা পালন করতে গিয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। মূর্তিপূজক ও পৌত্তলিকদের বিচ্যুতি তাঁর কাছে খুবই দুর্বিষহ হয়ে পড়ে। তাই তিনি তাদের অবস্থার পরিবর্তন ও সংস্কার সাধনের উপায় খুঁজে বের করার চেষ্টা করতে থাকেন। কিন্তু বিবেক ও বুদ্ধিবৃত্তির আলোকে নবী- রাসূলদেরকে অবশ্যই সীমাহীনভাবে ধৈর্যশীল হতে হবে। ধৈর্যাবলম্বনের ক্ষেত্রে তাঁদেরকে নিরঙ্কুশভাবে সকলের জ   অনুসরণীয় উদাহরণে পরিণত হতে হবে। বাস্তবতা ও ময়দান থেকে পলায়ন করার চিন্তা যেন তাঁরা কখনই মাথায় না আনেন।

আর গারানিকের উপাখ্যানটি যদি সত্য হয় তাহলে এ থেকে প্রতীয়মান হয়ে যাবে যে, আমাদের আলোচনার কেন্দ্রবি   মহানায়ক পুরুষটি তাঁর ধৈর্য- ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছিলেন, তাঁর মন ক্লান্ত হয়ে গিয়েছিল। আর এ বিষয়টি বুদ্ধিবৃত্তির আলোকে মহান নবী- রাসূলদের ক্ষেত্রে মোটেও খাপ খায় না। আর তা মহানবী (সা.)- এর জীবনীর সাথে মোটেও সংগতিশীল নয় যা ইতোমধ্যে আলোচনা করা হয়েছে এবং ভবি   তেও আলোচনা করা হবে।

এ কাহিনী ও উপাখ্যানের রচয়িতা ভেবেও দেখে নি যে, পবিত্র কোরআন এ ঘটনাটি বানোয়াট ও ভিত্তিহীন হওয়ার জ   উৎকৃষ্ট সাক্ষী। কারণ মহান আল্লাহ্ তাঁর নবীকে সুসংবাদ দিয়েছেন যে, এতে কখনই বাতিল অনুপ্রবেশ করতে পারবে না। যেমন পবিত্র কোরআনে বর্ণিত হয়েছে :

(لا يأتيه الباطلُ من بين يديه ولا من خلفه)

"বাতিল (মিথ্যা) না সামনে থেকে এতে (পবিত্র কোরআনে) আসতে পারবে, না পেছন থেকে।"(সূরা ফুসসিলাত : ৪২)।

পবিত্র কোরআনে আরো বর্ণিত হয়েছে :

(إنّا نحنُ نزّلنا الذِّكرَ وإنّا له لحافظون)

"নিশ্চয়ই আমরা যিকর (আল- কোরআন) অবতীর্ণ করেছি এবং আমরাই এর হিফাযতকারী।"(সূরা হিজর : ৯)।

এতদসত্ত্বেও মহান আল্লাহর দরবার থেকে বিতাড়িত (শয়তান) কিভাবে মহান আল্লাহর মনোনীত বান্দার ওপর বিজয়ী হবে এবং তাঁর ওপর অবতীর্ণ কোরআনে বাতিলের অনুপ্রবেশ করাবে। আর যে কোরআনের ভিত্তি হচ্ছে মূর্তিপূজার বিরুদ্ধে সংগ্রাম সে কোরআনটিকেই সে মূর্তিপূজা ও পৌত্তলিকতার প্রচারক বানিয়ে দিয়েছে।

খুবই আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে এই যে, এ কাহিনী ও উপাখ্যানের রচয়িতা অনুপযুক্ত স্থানে একটি বেমানান গীত তৈরি করেছে এবং এমন এক স্থানে তাওহীদের ওপর অপবাদ আরোপ করেছে যে, অল্প কিছুক্ষণ আগে স্বয়ং কোরআনই তা প্রত্যাখ্যান করেছে। কারণ মহান আল্লাহ্ এ সূরায় এরশাদ করেছেন,

(وما ينطقُ عن الهوى إنْ هو إلّا وحيٌ يوحى)

"তিনি নিজ প্রবৃত্তির কামনা- বাসনাবশত কথা বলেন না; যা কিছু বলেন তা তাঁর কাছে প্রেরিত ও অবতীর্ণ ওহী।"

কিন্তু কিভাবে মহান আল্লাহ্ এত অকাট্য ও নিশ্চিত সুসংবাদ দিয়েও তাঁর নবীকে অরক্ষিত রাখবেন এবং শয়তানকে তাঁর দয়, চিন্তা- চেতনা ও মন- মানসিকতায় প্রভাব বিস্তার করার অনুমতি দেবেন?

এ সব বুদ্ধিবৃত্তিক দলিল- প্রমাণ ঐ সব ব্যক্তির জ উপকারী যারা মহানবী (সা.)- এর নবুওয়াত ও রিসালাতে ঈমান রাখে। তবে যে সব প্রাচ্যবিদ তাঁর নবুওয়াত ও রিসালাতে বি াসী নন এবং ইসলাম ধর্মের অবমূল্যায়ন করার জ এ ধরনের ভিত্তিহীন উপাখ্যান বর্ণনা ও ব্যাখ্যা করে থাকেন তাঁদের জ এগুলো যথেষ্ট নয়। অবশ্যই আরেক পদ্ধতিতে তাঁদের বক্তব্যের সমুচিত জবাব দিতে হবে।

উপাখ্যানটি ভিত্তিহীন প্রমাণ করা

ইতিহাসে বর্ণিত আছে যে, যখন মহানবী (সা.) এ সূরাটি তিলাওয়াত করছিলেন তখন কুরাইশ নেতৃবর্গ যাদের অধিকাংশই ছিল প্রথিতযশা সাহিত্যিক, কথাশিল্পী এবং ভাষার প্রাঞ্জলতা, সাবলীলতা ও অলংকারশাস্ত্রের দিকপাল তারা মসজিদুল হারামে উপস্থিত ছিল। তাদের মধ্যে সেখানে ওয়ালীদও উপস্থিত ছিল। এই ওয়ালীদ ছিল আরবের প্রজ্ঞাবান কথাশিল্পী ও সাহিত্যিক। সে বিচক্ষণতা, বুদ্ধিমত্তা ও প্রজ্ঞার জ আরব জাতির মাঝে অত্যন্ত খ্যাতি অর্জন করেছিল। সে সহ উপস্থিত সকল ব্যক্তি এ সূরাটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অর্থাৎ এ সূরার সর্বশেষ আয়াতটি যা হচ্ছে সিজদার আয়াত তা সহ শুনেছে এবং সিজদা করেছে।

কিন্তু এ গোষ্ঠীটি যারা ছিল অলংকারশাস্ত্রের স্থপতি এবং তুখোড় সাহিত্য ও কাব্য সমালোচক তারা কিভাবে মাত্র এ দু'টি বাক্যের ওপর নির্ভর করেছে যেগুলোয় তাদের উপাস্যদের স্তুতি বিদ্যমান? অথচ এ দু'টি বাক্যের পূর্বের ও পরবর্তী বাক্যগুলোয় আদ্যোপান্ত তাদের উপাস্যদের তীব্র নিন্দা, তিরস্কার ও দোষারোপ করা হয়েছে।

স্পষ্ট এ বানোয়াট কাহিনীর রচয়িতা তাদেরকে কি ধরনের ব্যক্তি বলে মনে করেছে? যে গোষ্ঠীটির ভাষা আরবী এবং সমগ্র আরব সমাজে যাদেরকে ভাষাবিদ ও অলংকারশাস্ত্রের স্থপতি বলে গণ্য করা হতো এবং যারা স্পষ্ট অর্থবোধক বাক্য ও উক্তিসহ নিজেদের মাতৃভাষার সকল

ইশারা- ইি ত এবং পরোক্ষ অর্থবোধক উক্তি অ দের চেয়ে ভালোভাবে উপলব্ধি করতে সক্ষম তারা কিভাবে মাত্র দু'টি বাক্যের ওপর নির্ভর করতে পারল যেগুলোয় তাদের দেব- দেবী ও উপাস্যদের প্রশংসা ও স্তুতি রয়েছে এবং কিভাবে তারা এ দু'টি বাক্যের পূর্ববর্তী বাক্যগুলোর ব্যাপারে সম্পূর্ণ অমনোযোগী থেকে গেল? যেখানে সাধারণ মানুষকে ঐ সব বাক্য যেগুলোয় আদ্যোপান্ত তাদের আকীদা- বি াস ও আচার- আচরণের তীব্র নিন্দা জানানো হয়েছে সেগুলোর মধ্যে কেবল এ দু'টি বাক্য দিয়ে ধোঁকা দেয়া সম্ভব নয় সেখানে অসাধারণ ব্যক্তিদেরকে এ দু'টি বাক্য দিয়ে ধোঁকা দেয়া কিভাবে সম্ভব?

এখন আমরা সংশ্লিষ্ট আয়াতগুলো এখানে উল্লেখ করছি এবং এ দু'টি বাক্যের স্থানে বি স্থাপন করছি অর্থাৎ তা খালি রাখছি; এরপর এগুলোর ব ানুবাদ করছি। আপনারা ভালোভাবে লক্ষ্য করবেন যে, আসলেই কি এ বাক্যদ্বয় (تلك الغرانيق العلى، منها الشّفاعةُ ترتجى অর্থাৎ এরা হচ্ছে উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন সুন্দর যুবক যাদের কাছ থেকেই কেবল শাফায়াত প্রত্যাশা করা যায়) এ সব আয়াতের মাঝে স্থান দেয়া যায় যেগুলোয় প্রতিমা ও মূর্তিসমূহের নিন্দা ও ভর্ৎসনা করা হয়েছে?

أفرأيتمُ اللّاتَ والعُزّى ومناةَ الثّالثةَ الأخرى ... ألكمُ الذّكرُ وله الأُنثى تلكَ إذاً قِسْمةٌ ضيزى إنْ هي إلّا أسماءٌ سمَّيتموها أنتم وآباؤكم ما أنزلَ اللهُ بها مِنْ سلطانٍ

"আমাকে লাত, উয্যা ও মানাত যা হচ্ছে তৃতীয় প্রতিমা সে সম্পর্কে বল...[৩১৪] পুত্রসন্তান কি তোমাদের এবং ক াসন্তান মহান আল্লাহর? (তাহলে) এ তো এক ধরনের অ ায্য বণ্টন- রীতি। প্রতিমাগুলো নিছক কতগুলো নাম ছাড়া আর কিছুই নয় যেগুলো তোমরা ও তোমাদের পূর্বপুরুষগণই রেখেছ; আর মহান আল্লাহ্ এ ব্যাপারে (এ প্রতিমার ব্যাপারে) কোন স্পষ্ট দলিল- প্রমাণ অবতীর্ণ করেন নি?"

একজন সাধারণ মানুষও কি মহানবী (সা.)- এর মতো- যে শত্রু দশ বছর যাবত তাঁর ধর্মের ওপর তীব্র আঘাত হেনেছে এবং তার অস্তিত্ব ও স্বাধীনতা বিপন্ন করে তুলেছে সেই শত্রুর পক্ষ থেকে এ ধরনের পরস্পরবিরোধী কতিপয় বাক্য শুনেই তার বিরুদ্ধাচরণ করা থেকে হাত গুটিয়ে নেবে এবং তার সাথে সকল বিরোধের নিষ্পত্তি করবে?

ভাষাগত দিক থেকে কাল্পনিক এ উপাখ্যানটি রদ করার দলিল

প্রখ্যাত মিশরীয় আলেম আবদু বলেন, "আরবী ভাষা ও কবিতায় কখনই গারানিক শব্দটি দেব-দেবী ও উপাস্যদের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয় নি; غرنيق ও غرنوق যা অভিধানে বর্ণিত হয়েছে এগুলোর অর্থ হচ্ছে জলচর পাখি (গাংচিল, বলাকা) অথবা সুদর্শন ে তা যুবক। আর এ অর্থগুলোর কোন একটিই দেব- দেবী, প্রতিমা ও উপাস্য অর্থের সাথে সংগতিশীল নয়।

স্যার উইলিয়াম মূর নামক একজন প্রাচ্যবিদ 'গারানিক'- এর উপাখ্যানকে ইতিহাসের অকাট্য বিষয়াদির অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য করেছেন। আর তাঁর এ অভিমতের পক্ষে দলিল হচ্ছে এই যে, হাবাশায় হিজরতকারী প্রথম দলটি হিজরতের তিন মাস গত হতে না হতেই কুরাইশদের সাথে মহানবী (সা.)- এর সন্ধিচুক্তির সংবাদটি শুনতে পায় এবং তারা মক্কায় প্রত্যাবর্তন করে। যে সব মুসলমান ঐ দেশে হিজরত করেছিলেন তাঁরা সেখানে বাদশাহ্ নাজ্জাশীর আশ্রয়ে নির্বিঘ্নে জীবনযাপন করছিলেন। যদি তাঁদের কাছে কুরাইশদের সাথে মহানবীর নৈকট্য ও সন্ধি- চুক্তি সম্পাদনের সংবাদ না পৌঁছত তাহলে তাঁরা নিজেদের আত্মীয়- স্বজনদের সাথে মিলিত হওয়ার জ মক্কা প্রত্যাবর্তন করতেন না। অতএব, মহানবী শান্তি প্রতিষ্ঠা করার জ একটি পন্থার উদ্ভাবন করে থাকবেনই। আর এ গারানিকের উপাখ্যানই হচ্ছে সেই পন্থা।

কিন্তু এখন আমরা সম্মানিত এ প্রাচ্যবিদের কাছে প্রশ্ন করতে চাই, হাবাশায় হিজরতকারী মুসলমানদের মক্কায় প্রত্যাবর্তন যে অবশ্যই একটি সত্য সংবাদের ভিত্তিতে হতে হবে এ ধরনের কি কোন আবশ্যকতা আছে? এমন কোন দিন নেই যে, প্রবৃত্তির পূজারী ও স্বার্থান্বেষী চক্র জনগণের মাঝে হাজার ধরনের মিথ্যা সংবাদ ও তথ্য প্রচার করত না, বরং এসব মুহাজির মুসলমানদের হাবাশা থেকে মক্কায় ফিরিয়ে আনার জ একদল লোক যে কুরাইশদের সাথে মহানবীর সন্ধি- চুক্তি সম্পাদনের সংবাদটি জাল করে থাকতে পারে সে সম্ভাবনাই এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি বিদ্যমান। এর ফলে এ সংবাদ শুনে হিজরতকারী মুসলমানরা নিজেরাই হাবাশা

থেকে পবিত্র মক্কায় প্রত্যাবর্তন করার উদ্যোগ নিয়েছিলেন। এ কারণেই কতিপয় হিজরতকারী মুসলমান এ সংবাদটি বি াস করেছিলেন এবং মক্কায় ফিরে এসেছিলেন। কিন্তু অপর কিছু সংখ্যক হিজরতকারী এ গুজব দ্বারা প্রতারিত না হয়ে হাবাশায় থেকে যান।

দ্বিতীয়ত আপনারা ভেবে দেখুন যে, মহানবী (সা.) সন্ধি- চুক্তি সম্পাদন করার মাধ্যমে কুরাইশদের সাথে তাঁর বিরোধ নিষ্পত্তি করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু এ কারণে সন্ধি- চুক্তির মূল ভিত কেন এ দু'টি বাক্য জাল করার সাথেই সংশ্লিষ্ট হবে? বরং কুরাইশদের আকীদা- বি াস সংক্রান্ত এক নিরঙ্কুশ নীরবতা- একটি সহায়ক প্রতিজ্ঞা তাদের দয়কে তাঁর নিজের প্রতি আকৃষ্ট করার জ ছিল যথেষ্ট।

যা হোক হিজরতকারীদের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন এ উপাখ্যান সত্য হওয়ার দলিল নয়। আর এ বাক্য (এগুলো হচ্ছে উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন বলাকা, এদের শাফায়াত- ই কেবল প্রত্যাশা করা যায়) উচ্চারণ করার মধ্যেই কেবল শান্তি ও সন্ধি নিহিত নেই।

এর চেয়ে আরো আশ্চর্যজনক হচ্ছে এই যে, কোন কোন ব্যক্তি ধারণা করেছেন যে, সূরা হ র ৫২- ৫৪ আয়াত গারানিক উপাখ্যানকে কেন্দ্র করেই অবতীর্ণ হয়েছে। যেহেতু এ আয়াতগুলো প্রাচ্যবিদ ও ইতিহাস বিকৃতকারীদের হাতের দলিল সেহেতু আমরা এগুলোর

অন্তর্নিহিত অর্থ ব্যাখ্যা করব এবং সুস্পষ্ট করে দেব যে, এ সব আয়াত ভিন্ন লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অনুসরণ করে।

আয়াতগুলো এবং এগুলোর অনুবাদ নিচে উল্লেখ করা হলো :

(وما أرسلنا مِن قبلكَ مِنْ رسولٍ ولا نبيٍّ إلّا إذا تمنّى ألقى الشّيطانُ في أُمنِيَّته فينسخُ اللهُ ما يُلْقي الشَّيطانُ ثمَّ يحكِمُ اللهُ آياته واللهُ عليمٌ حكيمٌ)

"আমরা আপনার আগে যে রাসূল ও নবীকেই প্রেরণ করেছি তিনি যখনই আকাঙ্ক্ষা করেছেন তখনই শয়তান তাঁর আশা- আকাঙ্ক্ষায় হস্তক্ষেপ ও প্রক্ষেপ করেছে এবং মহান আল্লাহ্ নবী- রাসূলদের আশা- আকাঙ্ক্ষায় শয়তান যা প্রক্ষেপ করে তা বিলুপ্ত (করে দেন)। অতঃপর তিনি

(মহান আল্লাহ্) তাঁর আয়াতসমূহ দৃঢ় করে প্রতিষ্ঠিত করে দেন (অর্থাৎ নিদর্শনসমূহে দৃঢ়তা প্রদান করেন)। মহান আল্লাহ্ অত্যন্ত জ্ঞানী ও প্রজ্ঞাবান।"[৩১৫]

(ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للّذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإنّ الظّالمين لفي شقاقٍ بعيدٍ)

"যাতে শয়তান যা কিছু সম্পন্ন করে, মহান আল্লাহ্ তা দিয়ে যাদের অন্তরে রোগ আছে এবং যাদের দয় পাষাণ তাদেরকে পরীক্ষা করেন; আর নিশ্চয়ই অত্যাচারীরা চরম দুর্ভাগ্যে পতিত ও পারলৌকিক মুক্তি থেকে ব দূরে (আছে)।"[৩১৬]

(وليعلم الذين أوتوا العلم أنّه الحقّ من ربّك فيؤمنوا به فتخبتَ له قلوبهم وإنّ الله لهادِ الذين آمنوا إلى صراطٍ مستقيمٍ)

"যাতে জ্ঞানী ব্যক্তিগণ জানতে সক্ষম হয় যে, এ কোরআন সত্য এবং আপনার প্রভুর পক্ষ থেকে (অবতীর্ণ) এবং এর প্রতি ঈমান আনতে পারে। অতঃপর তাঁর প্রতি অবনত ও বিনয়ী হয়ে যায়; আর নিশ্চয়ই মহান আল্লাহ্ যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে সরল সঠিক পথের দিকে পরিচালিত করেন।"[৩১৭]

এখন আয়াতের অন্তর্নিহিত মূল অর্থ ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন। প্রথম আয়াতটিতে তিনটি বিষয় বর্ণিত হয়েছে :

ক. নবী- রাসূলগণ আকাঙ্ক্ষা করেন।

খ. শয়তান তাঁদের আশা- আকাঙ্ক্ষায় হস্তক্ষেপ করে।

গ. মহান আল্লাহ্ শয়তানের অযাচিত হস্তক্ষেপ ও প্রক্ষেপের অশুভ প্রভাব বিলুপ্ত করে দেন।

ক. নবী- রাসূলগণের আকাঙ্ক্ষা বলতে কি বোঝানো হয়েছে?

মহান নবিগণ সব সময় তাঁদের নিজ উম্মাহ্ ও জাতির মাঝে হেদায়েত ও সত্য ধর্ম প্রচার ও প্রসারের আকাঙ্ক্ষা করতেন; আর তাঁরা তাঁদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করার জ প্রভূত পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছেন এবং এ পথে তাঁরা বিভিন্ন ধরনের বিপদাপদ ও কষ্ট- যন্ত্রণা সহ্য করেছেন এবং সেগুলোর প্রতিরোধ করেছেন। মহানবীও এর ব্যতিক্রম ছিলেন না। তাঁর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করার জ তাঁর বেশ কিছু পরিকল্পনা ছিল। তাই তিনি তাঁর আশা- আকাঙ্ক্ষার বাস্তব রূপদান করার জ বেশ কিছু পূর্বপ্রস্তুতিমূলক পদক্ষেপও গ্রহণ করেছিলেন। পবিত্র কোরআন এ বাস্তবতাকে-

(وما أرسلنا من رسول ولا نبي إلّا إذا تمنّى)

"আমি আপনার পূর্বে যে রাসূল ও নবীই প্রেরণ করেছি তিনি যখনই আকাঙ্ক্ষা করেছেন..." (সূরা হ র ৫২ নং আয়াত)- এ আয়াতের মাধ্যমে বর্ণনা করেছে।

এ পর্যন্ত تمنّى (আকাঙ্ক্ষা করেছেন) এর অর্থ পরিষ্কার হয়ে গেছে; এখন আমরা দ্বিতীয় বিষয়টি ব্যাখ্যা করব।

খ. শয়তানের হস্তক্ষেপ ও প্রক্ষেপের (إلقاء) অর্থ কি?

নিম্নোক্ত প্রক্রিয়াদ্বয়ের যে কোন একটির দ্বারা শয়তান হস্তক্ষেপ ও প্রক্ষেপ করে থাকে :

১. মহান নবীদের গৃহীত সিদ্ধান্তে সন্দেহ ও সংশয় সৃষ্টি করে এবং তাঁদের ও তাঁদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহের মাঝে অগণিত বাধা বিদ্যমান আছে এবং এ সব বাধা- বিপত্তির কথা বিবেচনা করলে তাঁরা তাঁদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে যে সফল হবেন না- এ ব্যাপারে তাঁদেরকে সন্দিহান করার মাধ্যমে।

২. যখনই মহান নবিগণ কোন কাজের প্রয়োজনীয় পূর্বপ্রস্তুতি সম্পন্ন করতেন এবং যখনই নিদর্শনাদি থেকে কোন নবীর দৃঢ় পদক্ষেপ ও উদ্যোগ গ্রহণের বিষয়টি স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়ে যেত ঠিক তখনই শয়তান ও শয়তান প্রকৃতির লোকেরা মহান নবীদের বিরুদ্ধে জনগণকে প্ররোচিত

করত এবং তাঁদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের পথে বাধা- বিপত্তি সৃষ্টি করে তাঁদেরকে তাঁদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জন করা থেকে বিরত রাখত।

প্রথম সম্ভাবনা যেমন পবিত্র কোরআনের অ া আয়াতের সাথে মোটেও খাপ খায় না ঠিক তেমনি তা আলোচ্য দ্বিতীয় আয়াতের সাথেও সংগতিসম্পন্ন নয়; কিন্তু অ া আয়াতের দৃষ্টিতে পবিত্র কোরআন মহান আল্লাহর একনিষ্ঠ বান্দাদের ওপর শয়তানের যে আধিপত্য ও কর্তৃত্ব করার ক্ষমতা নেই তা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বর্ণনা করেছে (যদিও শয়তান এভাবে তাঁদেরকে দেখাতে ও বোঝাতে চায় যে, তাঁরা তাঁদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং আশা- আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়ন করতে পারবেন না) এবং বলেছে :

(إنَّ عبادي ليس لك عليهم سلطانٌ)

“ নিশ্চয়ই আমার (প্রকৃত) বান্দাদের ওপর তোমার কোন আধিপত্য ও কর্তৃত্ব নেই।”(সূরা হিজর : ৪২ ও সূরা ইসরা : ৬৫)

(إنّه ليسَ له سلطانٌ على الّذين آمنوا وعلى ربّهم يتوكّلون)

“ নিশ্চয়ই ঐ সব ব্যক্তির ওপর শয়তানের কোন কর্তৃত্ব ও আধিপত্য নেই যারা ঈমান এনেছে এবং নিজেদের প্রতিপালকের ওপর ভরসা করে।”(সূরা নাহল : ৯৯)

এ আয়াত ও আরো অ া আয়াত যেগুলো থেকে প্রতীয়মান হয় যে, মহান আল্লাহর ওয়ালীদের (বন্ধু) অন্তরে শয়তান অনুপ্রবেশ ও প্রভাব বিস্তার করতে পারে না সেগুলো থেকেও প্রমাণিত হয়ে যায় যে, মহান নবীদের আশা- আকাঙ্ক্ষায় শয়তানের হস্তক্ষেপ ও প্রক্ষেপের প্রকৃত অর্থ তাঁদের ইচ্ছাশক্তি দুর্বল করা এবং তাঁদের কাছে তাঁদের কাজের পথে বিদ্যমান বাধা- বিপত্তিগুলো বড় করে দেখানো নয়।

কিন্তু আলোচ্য দ্বিতীয় ও তৃতীয় আয়াতের দৃষ্টিতে শয়তানের এ হস্তক্ষেপ ও প্রক্ষেপের বিষয়টি এভাবে ব্যাখ্যা করা যায় যে, আমরা এ কাজের দ্বারা দু'টি গোষ্ঠীকে পরীক্ষা করব। একটি গোষ্ঠী যাদের অন্তঃকরণ অসুস্থ এবং অ দলটি হচ্ছে জ্ঞানী যাঁরা মহান আল্লাহ্ ও তাঁর নিদর্শনসমূহে আস্থা রাখেন।

অর্থাৎ জনগণকে মহান নবীদের সুমহান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলার মাধ্যমে শয়তানের অযাচিত হস্তক্ষেপ প্রথম গোষ্ঠীটির ক্ষেত্রে মহান নবী ও রাসূলদের প্রতি তাদের অবাধ্যতা ও বিরুদ্ধাচরণের কারণ হয়, অথচ অপর গোষ্ঠীটির ক্ষেত্রে এ হস্তক্ষেপের প্রভাব পূর্ববর্তী গোষ্ঠীর ঠিক বিপরীত হয়ে থাকে এবং এর ফলে তাঁদের দৃঢ়তা ও স্থায়িত্ব আরও বৃদ্ধি পায়।

যেহেতু মহান নবীদের আশা- আকাঙ্ক্ষায় শয়তানের অযাচিত হস্তক্ষেপ ও প্রক্ষেপের এমন দু’টি ভিন্ন ধরনের প্রভাব রয়েছে (অর্থাৎ একদল লোক মহান নবী- রাসূলগণের বিরোধী এবং অ একটি দল মহান আল্লাহ্, তার নবী- রাসূলগণ এবং নিদর্শনাদির প্রতি ঈমান রাখার ব্যাপারে অধিকতর দৃঢ় ও অবিচল হয়ে থাকে) সেহেতু এ থেকে প্রতীয়মান হয়ে যায় যে, শয়তানের হস্তক্ষেপ ও প্রক্ষেপ আসলে দ্বিতীয় অর্থে অর্থাৎ মহান নবীদের বিরুদ্ধে জনগণকে ক্ষেপিয়ে তুলে ও প্ররোচিত করে শত্রুদের অন্তরে কুমন্ত্রণা দিয়ে এবং তাদের সুমহান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে বাধা ও প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে শয়তান হস্তক্ষেপ ও প্রক্ষেপ করে থাকে। তার হস্তক্ষেপ ও প্রক্ষেপ কখনো এমন নয় যে, সে নবীদের অন্তরে হস্তক্ষেপ করে তাঁদের ইচ্ছাশক্তি ও সিদ্ধান্তকে দুর্বল ও খর্ব করে দিতে সক্ষম।

এ পর্যন্ত মহান নবীদের আশা- আকাঙ্ক্ষায় শয়তানের অযাচিত হস্তক্ষেপ ও প্রক্ষেপের অর্থ স্পষ্ট হয়ে গেল। এরপর এখন তৃতীয় বিষয় অর্থাৎ শয়তানের এ অযাচিত হস্তক্ষেপের কুপ্রভাবগুলো বিলুপ্ত করা সংক্রান্ত ব্যাখ্যা- বিশ্লেষণ করব।

গ. হস্তক্ষেপ করার প্রভাবসমূহ মিটিয়ে দেবার প্রকৃত তাৎপর্য কী?

যদি শয়তানের হস্তক্ষেপের অর্থ একদল মানুষের বিরুদ্ধে আরেকদল মানুষকে উসকে দেয়া বোঝায় তাহলে এ কাজ তাদেরকে উন্নতি থেকে বিরত রাখবে। তাহলে এ পর্যায়ে মহান আল্লাহ্ কর্তৃক শয়তানের কাজ পরিপূর্ণ বিলুপ্ত করার অর্থ হচ্ছে এই যে, তাদের (শয়তানদের) ষড়যন্ত্র ও অম ল তাঁদের থেকে দূর করে দেন যে পর্যন্ত না মুমিনদের কাছে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, পরীক্ষা কেবল আঁধার দয়েরই জ । উদাহরণস্বরূপ নিম্নোক্ত আয়াতটিতে বর্ণিত হয়েছে :

(إنّا لننصرُ رسلنا والّذين آمنوا في الحياة الدّنيا)

“নিশ্চয়ই আমরা আমাদের প্রেরিত রাসূলগণ এবং পার্থিব জগতে যারা ঈমান এনেছে তাদের সবাইকে সাহায্য করব।”(সূরা মুমীন : ৫১)

সংক্ষেপে : পবিত্র কোরআন এ সব আয়াতে নবীদের মাঝে মহান আল্লাহর সনাতন ও প্রতিষ্ঠিত একটি সুন্নাহ্ বা নিয়ম সম্পর্কে তথ্য জ্ঞাপন করে। আর তা হচ্ছে মহান নবিগণ কর্তৃক সুমহান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন এবং জনগণকে সুপথে পরিচালনা করার ব্যাপারে সাফল্য লাভের আশা- আকাঙ্ক্ষা। আর ঠিক তখনই মহান নবী- রাসূলদের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির মাধ্যমে শয়তান এবং মানুষ ও ি নরূপী শয়তানদের পালা চলে আসে। এরপরই শয়তানী ষড়যন্ত্র ও পরিকল্পনাসমূহ নস্যাৎ করার জ মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে ঐশী সাহায্য এসে পৌঁছায়। এটিই ছিল অতীত সকল উম্মাহ্ ও জাতির মাঝে মহান আল্লাহর সুন্নাহ্। হযরত নূহ, হযরত ইবরাহীম এবং বনি ইসরাইলের নবী- রাসূলগণ, বিশেষত হযরত মূসা ও হযরত ঈসাসহ সকল নবী- রাসূলের জীবনেতিহাস এবং বিশেষ করে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)- এর জীবনেতিহাস এ ঐতিহাসিক সত্যের সাক্ষ্য প্রদান করে।

বিংশতিতম অধ্যায় : অর্থনৈতিক অবরোধ ও সামাজিক বয়কট

সমাজের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে দমন ও নিশ্চিহ্ন করার অত্যন্ত সহজ পন্থা হচ্ছে নেতিবাচক সংগ্রাম যার মূল ভিত সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের একতার দ্বারা রচিত হয়।

বিভিন্ন ধরনের পদ্ধতির ওপর ইতিবাচক সংগ্রাম নির্ভরশীল। কারণ একদল যোদ্ধাকে অবশ্যই যুগোপযোগী হাতিয়ার ব্যবহার করতে হবে। আর জান- মালের ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার এবং অনেক চড়াই- উৎরাই অতিক্রম করেই তাদেরকে অভীষ্ট লক্ষ্যপানে এগিয়ে যেতে হবে। বলার অপেক্ষা রাখে না যে, সংগ্রামের ধরন শত কষ্ট ও বিপদ সম্বলিত। আর প্রজ্ঞাবান নেতৃত্ব প্রয়োজনীয় কর্মকৌশল ও পদক্ষেপ এবং পূর্ণ প্রস্তুতি গ্রহণ করার পরই এ ধরনের সংগ্রামে অবতীর্ণ হন; আর অস্থি পর্যন্ত ছুরি না পৌঁছা পর্যন্ত (দেয়ালে পিঠ না ঠেকা পর্যন্ত) এবং যুদ্ধের বিকল্প উপায় বিদ্যমান থাকলে তাঁরা এ ধরনের কর্মসূচী বাস্তবায়ন করেন না।

কিন্তু নেতিবাচক সংগ্রাম ও প্রতিরোধ এ ধরনের বিষয়াদির ওপর নির্ভরশীল নয়। তা কেবল একটি নিয়ামকের ওপর নির্ভরশীল। আর তা হলো সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের একতা ও ঐকমত্য।

অর্থাৎ যে দল বা গোষ্ঠীর বিশেষ চিন্তা ও লক্ষ্য আছে তারা আত্মিকভাবে একে অপরের সাথে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয় যে, তারা একযোগে বিরোধী সংখ্যালঘু গোষ্ঠীর সাথে তাদের সকল সম্পর্ক ও বন্ধন ছিন্ন করবে। তাদের সাথে কেনা- বেচা বন্ধ করে দেবে। তাদের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থগিত রাখবে এবং সামাজিক কর্মকাণ্ডে তাদেরকে অংশগ্রহণ করতে বাধা দেবে এবং তাদের ব্যক্তিগত ব্যাপারেও তারা তাদের সাথে কোন সহযোগিতা করবে না। এমতাবস্থায় পৃথিবী প্রশস্ত ও বিশাল হওয়া সত্ত্বেও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জ   একটি ক্ষুদ্র ও সংকীর্ণ কারাগারে পরিণত হবে যার ফলে যে কোন মুহূর্তে চাপ প্রয়োগ করা হলেই তারা (ঐ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়) ধ্বংস ও বিলুপ্ত হয়ে যাবে।

বিরোধী সংখ্যালঘু গোষ্ঠী এ ধরনের সংঘাতময় পরিস্থিতিতে (চাপসৃষ্টিকারী সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের কাছে) আত্মসমর্পণ করে এবং তাদের ইচ্ছাশক্তির কাছে বশ্যতা স্বীকার করে। কিন্তু এ ধরনের সংখ্যালঘু সম্প্রদায় অবশ্যই এমন একটি গোষ্ঠী হবে যাদের বিরোধিতার কোন আদর্শিক ও মূলনীতিগত দৃঢ়ভিত্তি নেই। যেমন : ধন- সম্পদ পুঞ্জীভূত এবং অতি গুরুত্বপূর্ণ সরকারী পদ

লাভ করার জ   ই তারা নিজেদেরকে অ   দের কাছ থেকে পৃথক করেছে। এ ধরনের সংখ্যালঘু গোষ্ঠী যখনই বিপদের আশ া করবে এবং দুঃখ- কষ্ট, কারাভোগ ও অবরোধের সম্মুখীন হবে যেহেতু তাদের কোন আত্মিক ও ঈমানী লক্ষ্য নেই আর তাদেরকে উদ্বুদ্ধকারী কারণ ও লক্ষ্য যেহেতু বস্তুগত সেহেতু তারা ক্ষণস্থায়ী ও   ত অপসৃয়মান (পার্থিব) ভোগ ও আনন্দকে সম্ভাব্য পারলৌকিক সুখ ও আনন্দের ওপর প্রাধা   দেবে এবং অবশেষে সংখ্যাগুরু সম্প্রদায় বা অংশের আকাঙ্ক্ষার কাছে আত্মসমর্পণ করবে।

তবে যে সম্প্রদায়ের বিরোধিতা ও সংগ্রামের মূল ভিত- ই হচ্ছে সুমহান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের প্রতি তাদের অবিচল আস্থা ও বি াস তারা এ ধরনের ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ প্রবল বায়ুপ্রবাহের সামনে মোটেও প্রকম্পিত হয় না, বরং অবরোধ ও আরোপিত চাপ তাদের ঈমানের মূল ভিতকে আরো দৃঢ় ও শক্তিশালী করে এবং তারা ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার ঢাল দিয়ে শত্রুর আঘাতগুলোর যথোপযুক্ত জবাব দেয়।

মানব জাতির ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের ইচ্ছা ও আশা- আকাঙ্ক্ষার সামনে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের দৃঢ়তা ও প্রতিরোধের সবচেয়ে শক্তিশালী কারণ হচ্ছে তাদের ঈমানী শক্তি ও আদর্শের প্রতি বি াস। এই সংখ্যালঘু সম্প্রদায় কখনো কখনো সর্বশেষ রক্তবি   ঝরা পর্যন্ত সংগ্রাম অব্যাহত রাখে। আমরা আমাদের এ বক্তব্যের পক্ষে শত শত সাক্ষ্য- প্রমাণ উপস্থাপন করতে পারব।

কুরাইশদের ঘোষণা

কুরাইশ নেতৃবর্গ তাওহীদী ধর্মের আশ্চর্যজনক প্রসার ও প্রভাবের কারণে অত্যন্ত ভীত- শ ি ত হয়ে পড়ে। তাই তারা এ থেকে বাঁচার উপায় খুঁজে পাবার চিন্তা করতে থাকে। হামযার মতো ব্যক্তিবর্গের ইসলাম ধর্ম গ্রহণ, কুরাইশ বংশীয় চিন্তাশীল ও আলোকিত দয়ের অধিকারী যুবকদের ইসলাম ধর্মের প্রতি ঝোঁক এবং হাবাশায় হিজরতকারী মুসলমানগণ ধর্ম পালনের যে স্বাধীনতা পেয়েছিল সে সব কারণে মক্কার তদানীন্তন গোত্রীয় প্রশাসনের বিহ্বলতা ব লাংশে বৃদ্ধি পায়। ইসলাম ধর্মের প্রসার রোধ করার জ   পরিকল্পনাগুলো একের পর এক ব্যর্থতায় পর্যবসিত হলে কুরাইশগণ খুবই অসন্তুষ্ট ও মনঃক্ষুন্ন হয়ে পড়ে। এ কারণেই তারা আরেকটি মারাত্মক নীল- নকশা প্রণয়নের চিন্তা- ভাবনা করতে থাকে এবং তারা অর্থনৈতিক অবরোধ আরোপ করার সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যা মুসলমানদের সামাজিক জীবনের শিরা- উপশিরা ও ধমনী কর্তন ও ছিন্ন- ভিন্ন করে দেবে এবং ইসলাম ধর্মের প্রসার ও প্রভাব নষ্ট করে দেবে। আর তাওহীদবাদী এ ধর্মের প্রবর্তক ও অনুসারীদেরকে এ অর্থনৈতিক অবরোধ আরোপের মাধ্যমে চিরতরে নিঃশেষ করা সম্ভব হবে।

সুতরাং কুরাইশ নেতৃবর্গের উচ্চ পর্যায়ের একটি পরিষদ মানসুর বিন ইকরামার হস্তলিখিত একটি অ ীকারপত্রে স্বাক্ষর করে এবং তা কাবাগৃহের অভ্যন্তরে ঝুলিয়ে রাখে এবং সকলেই অ ীকার করে যে, কুরাইশ গোত্র আমৃত্যু নিম্নোক্ত ধারাসমূহ মোতাবেক কাজ করবে :

১. মুহাম্মদের সকল অনুসারী ও সমর্থকের সাথে সব ধরনের কেনা- বেচা নিষিদ্ধ করা হবে।

২. তাদের (মুসলমানদের) সাথে সকল সম্পর্ক ও মেলামেশা জোরালোভাবে নিষিদ্ধ করা হবে।

৩. মুসলমানদের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের অধিকার কারো থাকবে না।

উপরিউক্ত ধারা সম্বলিত অ ীকার পত্রটিতে কেবল মুতঈম বিন আদী ব্যতীত সকল কুরাইশ নেতা স্বাক্ষর করে এবং তা (চুক্তিনামা) কঠোরতার সাথে বাস্তবায়ন করা হয়। মহানবী (সা.)- এর একমাত্র সমর্থক ও পৃষ্ঠপোষক তাঁর পিতৃব্য হযরত আবু তালিব তাঁর সকল আত্মীয়- স্বজনের

(হাশিম বংশীয়গণ) প্রতি মহানবী (সা.)- কে সাহায্য করার আহবান জানান। তিনি বনি হাশিমের সবাইকে পবিত্র মক্কা নগরীর বাইরে একটি পার্বত্য উপত্যকায় অবস্থান গ্রহণ করার নির্দেশ দিলে তাঁরা সবাই সেখানে গিয়ে অবস্থান গ্রহণ করেন। স্মর্তব্য যে, উক্ত উপত্যকাটি ‘শেবে আবু তালিব ’ (আবু তালিবের উপত্যকা) নামে প্রসিদ্ধ। এ উপত্যকায় কয়েকটি জরাজীর্ণ বাড়ি ও ছোটখাটো ছাউনি ব্যতীত আর কিছুই ছিল না। বনি হাশিম ও মহানবী (সা.) মুশরিকদের সামাজিক জীবন ও কোলাহল থেকে দূরে সেই উপত্যকায় বসবাস করতে থাকেন। আর ঠিক এভাবেই হযরত আবু তালিব (রা.) কুরাইশদের আকস্মিক আক্রমণ প্রতিহত করার জ উঁচু উঁচু স্থানসমূহে অবস্থা পর্যবেক্ষণ করার জ কতিপয় ব্যক্তিকে নিয়োজিত রাখেন যাতে করে যে কোন ঘটনা ঘটলেই তারা তাঁদেরকে অবগত করতে পারে।[৩১৮] হযরত আবু তালিব (রা.) যখন কুরাইশদের এ চুক্তিটির ব্যাপারে অবগত হন তখন তিনি একটি কাসীদাহ্ আবৃত্তি করেন যার প্রথম পঙ্ক্তিটি হচ্ছে নিম্নরূপ:

ألم تعلمـــــوا أنّـــــا وجـــــدنا محمّـــــدًا نبيّـــــاً كموســـــى حـــظّ في أوّل الكتـــــب

“তোমরা কি জান না যে, আমরা মুহাম্মদকে পেয়েছি
মূসার মতো নবী হিসাবে, যাঁর কথা আদি ধর্মগ্রন্থসমূহে লিপিবদ্ধ আছে।”

এ অবরোধ পুরো তিন বছর স্থায়ী হয়েছিল। চাপ ও কঠোরতা এক অদ্ভুত পর্যায়ে উপনীত হয়েছিল। বনি হাশিমের শিশুদের মর্মভেদী ক্রন্দন পবিত্র মক্কার পাষাণ দয়ের লোকদের কর্ণে পৌঁছতে লাগল। তবে তাদের অন্তরে তা ততটা প্রভাব ফেলত না। যুবক ও পুরুষরা কেবল এক টুকরো খেজুর খেয়ে ক্ষুধা নিবৃত্ত ও দিন অতিবাহিত করত। কখনো কখনো একটি খেজুর দুই টুকরো করে নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিত। পুরো এই তিন বছর হারাম মাসগুলোতে (যখন পুরো আরব উপদ্বীপে পূর্ণ নিরাপত্তা বজায় থাকত তখন) বনি হাশিম শেবে আবু তালিব থেকে বের হয়ে আসত এবং সংক্ষিপ্ত কেনাবেচা ও ছোট- খাটো লেনদেন সম্পন্ন করত। এরপর তারা পুনরায় উপত্যকায় প্রত্যাবর্তন করত। মহানবীও কেবল এ মাসগুলোতেই ধর্ম প্রচারের সুযোগ

পেতেন। কুরাইশদের লোকগণ এ মাসগুলোতেই বনি হাশিমের ওপর চাপ সৃষ্টি ও অত্যাচার করার সকল উপায়- উপকরণের ব্যবস্থা করত। বনি হাশিম ও মুসলমানগণ যখনই হাট- বাজার ও দোকানগুলোতে উপস্থিত হতো এবং কোন কিছু কিনতে চাইত এ সব চর তাৎক্ষণিকভাবে সেখানে উপস্থিত হয়ে আরো চড়ামূল্যে তা ক্রয় করত এবং এভাবে তারা মুসলমানদের ক্রয় ক্ষমতা ছিনিয়ে নিত।

এ সময় আবু লাহাব সবচেয়ে বেশি বাড়াবাড়ি করত। সে বাজারের মধ্যে চিৎকার করে বলতে থাকত, "হে লোকসকল! পণ্য- সামগ্রীর দাম বাড়িয়ে ফেল যার ফলে তোমরা মুহাম্মদের অনুসারীদের ক্রয়- ক্ষমতা তাদের থেকে ছিনিয়ে নিতে সক্ষম হবে। মূল্য স্থির রাখার জ তোমরা নিজেরাও পণ্য- সামগ্রী চড়ামূল্যে ক্রয় কর।"এ কারণেই জিনিসপত্রের দাম সব সময় চড়া থাকত।

উপত্যকায় বনি হাশিমের নাজুক অবস্থা

ক্ষুধার কষ্ট এতটা তীব্র হয়েছিল যে সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস বলেছেন, "একরাতে আমি উপত্যকার বাইরে আসলাম। আমি আমার সমস্ত শক্তি প্রায় হারিয়েই ফেলেছিলাম। তখন আমি উটের চামড়া দেখতে পেলাম। আমি তা তুলে নিয়ে ধুয়ে পোড়ালাম এবং গুঁড়ো করলাম। এরপর অল্প একটু পানি দিয়ে ঐ গুঁড়ো চামড়াকে মণ্ডে পরিণত করলাম। আর এ মণ্ড তিনদিন পর্যন্ত খেয়েছিলাম।"

কুরাইশদের গুপ্তচররা উপত্যকায় যাওয়ার পথে সার্বক্ষণিক দৃষ্টি রাখত যাতে কেউ খাদ্য- সামগ্রী নিয়ে আবু তালিবের উপত্যকায় যেতে না পারে। এ ধরনের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ ও দৃষ্টি রাখা সত্ত্বেও কখনো কখনো হযরত খাদীজার ভ্রাতুষ্পুত্র হাকীম বিন হিযাম, আবুল আস ইবনে রাবী এবং হিশাম ইবনে আমর মাঝরাতে কিছু গম ও খেজুর একটি উটের ওপর চাপিয়ে উপত্যকার কাছাকাছি চলে আসতেন। এরপর রশি উটের গলায় পেঁচিয়ে ঐ উটকে ছেড়ে দিতেন (আর উট উপত্যকার মধ্যে অবরুদ্ধ বনি হাশিমের কাছে পৌঁছে যেতে এবং তাঁরা উটের পিঠ থেকে প্রেরিত গম ও খেজুর নামিয়ে নিতেন।) কখনো কখনো এ ধরনের সাহায্য ও সহযোগিতা করতে গিয়ে তাঁরা অসুবিধার সম্মুখীন হতেন। একদিন আবু জাহল দেখতে পেল যে, হাকীম বিন হিযাম কিছু খাদ্য- সামগ্রী উটের পিঠে নিয়ে উপত্যকার পথে রওয়ানা হয়েছেন। সে তীব্রভাবে তাঁর ওপর চড়াও হয়ে বলল, "আমি তোমাকে অবশ্যই কুরাইশদের কাছে নিয়ে গিয়ে অপমানিত করব।" তাদের ধস্তাধস্তি ও বাকবিতণ্ডা দীর্ঘক্ষণ ধরে চলল। আবুল বুখতুরী যে ছিল ইসলামের শত্রু সে সেখানে উপস্থিত হয়ে আবু জাহলের এহেন আচরণের তীব্র নিন্দা করে বলল, "সে (হাকীম) তার ফুফু খাদীজার জ খাদ্য নিয়ে যাচ্ছে। তাকে বাধা দেয়ার অধিকার তোমার নেই।" এমনকি আবুল বুখতুরী এ কথা বলেও ক্ষান্ত হলো না। সে আবু জাহলকে লাথি মারল।

চুক্তি ও অ ীকারপত্র বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কুরাইশদের কঠোর আচরণ মুসলমানদের ধৈর্যশক্তি বি মাত্র হ্রাস করতে পারে নি। অবশেষে ছোট ছোট শিশুদের দয় বিদীর্ণকারী ক্রন্দন এবং

সার্বিকভাবে মুসলমানদের অত্যন্ত শোচনীয় অবস্থা একটি গোষ্ঠীর ওপর গভীর প্রভাব বিস্তার করে। তাই তারা চুক্তি ও অ ীকারপত্রে স্বাক্ষর করার ব্যাপারে খুবই অনুতপ্ত হয় এবং উদ্ভূত সংকট নিরসন করার চিন্তাভাবনা করতে থাকে।

একদিন হিশাম ইবনে আমর আবদুল মুত্তালিবের দৌহিত্র যুহাইর ইবনে আবি উমাইয়্যার কাছে গিয়ে বলল, "এটি কি শোভনীয় যে, তুমি পেট পুরে আহার করবে ও সর্বোত্তম পোশাক পরবে, অথচ তোমার নিকটাত্মীয়গণ বস্ত্রহীন ও ক্ষুধার্ত অবস্থায় জীবনযাপন করবে? মহান আল্লাহর শপথ, যদি তুমি আবু জাহলের আত্মীয়- স্বজনদের ব্যাপারে এ ধরনের সিদ্ধান্ত নিতে এবং তাকে তুমি তা বাস্তবায়ন করার আহবান জানাতে তাহলে সে কখনই তোমার আহবান মেনে নিত না।" যুহাইর এ কথা শুনে বলল, "আমি একা কুরাইশদের এ সিদ্ধান্ত লঙ্ঘন করতে পারব না। তবে আমার সাথে যদি কেউ থাকে, তাহলে আমি চুক্তি ও অ ীকারপত্রটি ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করব।" হিশাম তাকে বলল, "আমি তোমার সাথে আছি।" তখন সে বলল, "তৃতীয় আরেক ব্যক্তিকে আমাদের সাথে নাও।" তখন হিশাম মুতঈম ইবনে আদীর কাছে গিয়ে বলল, "আমি চিন্তাও করতে পারি না যে, এ দু'টি বংশ (বনি হাশিম ও বনি মুত্তালিব) যারা আবদে মান্নাফের বংশধর এবং এ বংশের সাথে তোমার রক্ত ও আত্মীয়তার সম্পর্ক থাকার কারণে তুমি নিজেও গর্বিত, তারা সকলেই মৃত্যুবরণ করুক তা তুমি কামনা করবে এবং এতে সন্তুষ্ট থাকবে?" সে তখন বলল, "আমিই বা কি করতে পারি। এক ব্যক্তির পক্ষে কোন কিছু করা সম্ভব নয়।" তখন হিশাম উত্তরে বলল, "আর কিছুসংখ্যক ব্যক্তি অবশ্যই আমাদের সাথে সহযোগিতা করবে।" এ কারণে হিশাম বিষয়টি যেভাবে মুতঈমের কাছে উত্থাপন করেছিল ঠিক সেভাবে আবুল বুখতুরী ও যামআর কাছেও করল এবং তাদেরকে এ ব্যাপারে সহযোগিতা করার আহবান জানাল। তারা সবাই ঠিক করল যে, তারা সকাল বেলা মসজিদুল হারামে উপস্থিত হবে।

যুহাইর ও তার কতিপয় সহযোগীর উপস্থিতি ও অংশগ্রহণে কুরাইশদের অধিবেশন শুরু হলো। যুহাইর নীরবতা ভে বলল, "আজ কুরাইশদের উচিত তাদের থেকে এ াক্কারজনক কালিমার

দাগ দূর করা। আজ অবশ্যই বেইনসাফীমূলক এ অ ীকারপত্রটি ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলতে হবে। কারণ বনি হাশিমের দয়বিদারী এ দুরবস্থা সবাইকে দুঃখভারাক্রান্ত করেছে। ”

তখন আবু জাহল বলল, “এটি কখনই বাস্তবায়ন করা যাবে না। আর কুরাইশদের চুক্তি ও অ ীকার (সর্বাবস্থায়) সম্মানার্হ। ঠিক তখন যুহাইরের বক্তব্য সমর্থন করে যামআহ্ উঠে দাঁড়িয়ে বলল, “অবশ্যই ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করতে হবে। আর আমরা শুরু থেকেই এ চুক্তি ও অ ীকারের ব্যাপারে সন্তুষ্ট ছিলাম না।”সভার আরেক প্রান্ত থেকে যারা নিজেরাই এ ধরনের বৈষম্যমূলক অ ায় চুক্তি ভ করতে চাচ্ছিল তারাও যুহাইরের বক্তব্য সমর্থন করল। আবু জাহল বুঝতে পারল যে, বিষয়টি খুবই গুরুতর এবং এ ব্যাপারে আগেই ক্ষেত্র প্রস্তুত করা হয়েছে। আর এরা তার অনুপস্থিতিতেই চুক্তি ভে ফেলার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে। এ কারণে সে একটু নরম হলো এবং চুপচাপ রইল। মুতইম তৎক্ষণাৎ এ সুযোগের সদ্ব্যবহার করল এবং চুক্তিপত্রটি ছিঁড়ে ফেলার জ যে স্থানে তা সংরক্ষিত ছিল সেখানে গিয়ে দেখতে পেল যে, ইতোমধ্যে উঁইপোকা চুক্তিপত্রটি খেয়ে ফেলেছে এবং কেবল بسمك اللهمّ (হে আল্লাহ্! তোমার নামে)- এ বাক্যটি ব্যতীত ঐ চুক্তিপত্রের আর কিছু অবশিষ্ট নেই। এখানে স্মর্তব্য যে কুরাইশগণ তাদের চিঠিপত্র, অ ীকার বা চুক্তিপত্র ইত্যাদির শুরুতে بسمك اللهمّ লিখত।[৩১৯]

হযরত আবু তালিব ঐ দিন কাছ থেকে ঘটনাটি দেখলেন এবং এর পরিসমাপ্তি ঘটার জ অপেক্ষমাণ রইলেন। ঘটনার পূর্ণ নিষ্পত্তি হওয়ার পর তিনি উপত্যকায় ফিরে গিয়ে পুরো ব্যাপার তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রকে জানালেন। হযরত আবু তালিব (রা.)- এর সাথে পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত নিয়েই উপত্যকায় আশ্রয়গ্রহণকারিগণ আবার তাঁদের নিজ নিজ গৃহে প্রত্যাবর্তন করলেন।

কোন কোন ঐতিহাসিক লিখেছেন : “মহানবী (সা.), হযরত আবু তালিব (রা.) ও হযরত খাদীজাহ্ (রা.) অবরোধ চলাকালীন সময়ে তাঁদের সকল সম্পদ ব্যয় করে ফেলেছিলেন। তখন হঠাৎ জিবরাইল (আ.) অবতীর্ণ হয়ে মহানবী (সা.)- কে জানালেন, “কুরাইশ যে চুক্তিপত্রটি লিখে সীলমোহর লাগিয়ে বন্ধ করে রেখেছিল তা পুরোটা উঁই পোকা খেয়ে ফেলেছে। কেবল

بسمك اللهم- এ বাক্যাংশটি ব্যতীত উক্ত চুক্তিপত্রের আর কিছু অবশিষ্ট নেই। মহানবী (সা.) হযরত আবু তালিবকে এ ব্যাপারে অবহিত করেন। তাঁরা উপত্যকায় আশ্রয়গ্রহণকারী কতিপয় ব্যক্তির সাথে উপত্যকা থেকে বের হয়ে পবিত্র কাবায় আসলেন এবং সেখানে বসে পড়লেন। এ সময় কুরাইশরা আবু তালিবকে ঘিরে ফেলল এবং তাঁকে বলতে লাগল, "আমাদের সাথে তোমার আত্মীয়তার সম্পর্কের কথা স্মরণ করা এবং নিজ ভ্রাতুষ্পুত্রকে সমর্থন দান করা থেকে বিরত থাকার সময় কি আসে নি?"

হযরত আবু তালিব (রা.) তাদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন, "চুক্তিপত্রটি নিয়ে এসো।" তারা সেই চুক্তিপত্রটি নিয়ে আসল, অথচ তখনও সেটির সীলমোহর বিদ্যমান ছিল। হযরত আবু তালিব (রা.) বললেন, "এটিই কি সেই চুক্তিপত্র যা তোমরা সবাই লিখেছ?" তারা তখন বলল, "হ্যাঁ।" তিনি বললেন, "কেউ কি এতে কোন পরিবর্তন সাধন করেছ?" তারা বলল, "না।" তিনি তাদেরকে বললেন, "আমার ভ্রাতুষ্পুত্র তার প্রভুর কাছ থেকে একটি সংবাদপ্রাপ্ত হয়েছে। যদি তার কথা সত্য হয় তাহলে কি তোমরা তার ওপর থেকে হাত উঠিয়ে নেবে (অর্থাৎ তার সাথে শত্রুতা করবে না, তার বিরুদ্ধাচরণ করবে না, তাকে ধর্ম প্রচারে বাধা দেবে না)?" তারা বলল, "হ্যাঁ।" তখন তিনি বললেন, "আর যদি তার কথা মিথ্যা হয় তাহলে আমিও তাকে তোমাদের হাতে তুলে দেব আর তোমরা তাকে হত্যা করো।" কুরাইশগণ তখন আবু তালিবের কথা মেনে নিয়ে বলল, "(হে আবু তালিব!) তুমি এখন ায় পথেই অগ্রসর হয়েছ।" আবু তালিব তখন বললেন, "আমার ভ্রাতুষ্পুত্র বলেছে : উঁই পোকা চুক্তিপত্রটি খেয়ে ফেলেছে।" তারা তখন চুক্তিপত্রটির সীলমোহর ভে দেখতে পেল যে, সত্যিই উঁই পোকা মহান আল্লাহর নাম ব্যতীত গোটা চুক্তিপত্রটি খেয়ে ফেলেছে। এ ঘটনা তাদের হেদায়েতের কারণ তো হলোই না, বরং তাদের শত্রুতাকে আরো বাড়িয়ে দিল। আর অবশেষে বনি হাশিম উপত্যকায় প্রত্যাবর্তন করলেন।[৩২০] হিশাম কর্তৃক অবরোধ ভা া পর্যন্ত বনি হাশিমকে সেখানে থাকতে হয়েছিল।

চুক্তি ভ হওয়ার পর হযরত আবু তালিব (রা.) দুঃসাহসী এ পদক্ষেপ গ্রহণের প্রশংসায় যে কবিতাটি রচনা করেছিলেন ইবনে হিশাম তাঁর সীরাত গ্রন্থে তা উল্লেখ করেছেন।[৩২১]

এগুলো ছিল মহানবী (সা.)- এর ইসলাম ধর্ম প্রচার কার্যক্রমের বিরুদ্ধে কুরাইশদের অ ায়মূলক প্রতিক্রিয়াসমূহের গুটিকতক নমুনা। অবশ্য সবসময় নিশ্চিতভাবে দাবি করা সম্ভব নয় যে, আমরা যে ধারাবাহিকতা উল্লেখ করেছি ঠিক সেভাবেই এ সব প্রতিক্রিয়া সংঘটিত ও প্রদর্শিত হয়েছে। তবে ইতিহাস অধ্যয়ন করলে, বিশেষ করে আমরা যা উল্লেখ করেছি তদনুসারে এ ধরনের ধারাবাহিকতা দৃষ্টিগোচর হয়। নবুওয়াতের দশম বর্ষের রজব মাসের মাঝামাঝিতে অর্থনৈতিক অবরোধের অবসান হয়।

তবে কুরাইশদের নির্যাতন ও প্রতিক্রিয়াগুলো যা কিছু আমরা এ গ্রন্থে উল্লেখ করেছি কেবল সেগুলোর মাঝেই সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং এ সুমহান ঐশী আন্দোলনের বিপক্ষে তাদের আরো কিছু প্রচারপদ্ধতি ছিল যেগুলো তারা ব্যবহার করত। যেমন মহানবী (সা.)- এর সুমহান ব্যক্তিত্বকে নষ্ট করার জ তারা তাঁকে ‘আবতার’ অর্থাৎ নির্বংশ বলত। যখনই মহানবী (সা.)- এর নাম আলোচিত হতো তখনই আ’স ইবনে ওয়াইল সাহমী বলত : “আরে তার কথা বাদ দাও তো। সে তো আঁটকুড়ে; সে যদি মৃত্যুবরণ করে, তাহলে তার ধর্ম প্রচার কার্যক্রমও থেমে যাবে।”

এ সময় সূরা কাওসার অবতীর্ণ হয় এবং এ সূরায় বলা হয়েছে যে, মহানবী (সা.)- কে অগণিত সন্তান- সন্ততি ও বংশধর দেয়া হবে।[৩২২]

একুশতম অধ্যায় : হযরত আবু তালিব) রা -(.এর মৃত্যু

যখন আমি এ অধ্যায় রচনা করছিলাম তখন সৌদি আরবের কাতীফ নগরীর কারাগারে এক মুক্তমনা ও সাহসী যুবক বন্দী ছিলেন যিনি ‘কুরাইশ বংশের মুমিন হযরত আবু তালিব ’ [৩২৩] নামক একটি বই- এর রচয়িতা। এই বইতে তিনি আবু তালিব (রা.)- এর ঈমান, ইসলাম ধর্ম গ্রহণ এবং নিষ্ঠার ব্যাপারে লিখেছেন। তিনি আহলে সুন্নাতের আলেমদের তথ্য ও দলিল- প্রমাণের ভিত্তিতে হযরত আবু তালিব (রা.) যে মুমিন ছিলেন তা প্রমাণ করেছেন। সৌদি আরবের বিচার বিভাগ আকীদা- বি াস ও বাক- স্বাধীনতার এ যুগে এবং বর্তমান মুক্ত বি , তাঁকে নির্দেশ দিয়েছিল যেন তিনি তাঁর বক্তব্য প্রত্যাহার করে নেন। যেহেতু এ যুবক যে সত্যের ব্যাপারে তাঁর দৃঢ় বি াস ও আস্থা রয়েছে তা অস্বীকার করতে চান নি সেহেতু তাঁকে মৃতুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। তাঁর প্রাণ রক্ষার ব্যাপারে বেশ কিছু উদ্যোগ ও পদক্ষেপ নেওয়ার পর তাঁর শাস্তির মাত্রা লাঘব করা হয় এবং (মৃতুদণ্ডের পরিবর্তে) তাঁকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেয়া হয়। এরপর আরো বেশ কিছু জোরালো পদক্ষেপ নেয়া হলে উপরিউক্ত দণ্ড আরো লাঘব ও শিথিল করা হয় অর্থাৎ তাঁকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের পরিবর্তে ৮০ ঘা বেত্রাঘাত করার আদেশ দেয়া হয়।

তিনি এখন কারাগারে দণ্ডভোগের জ   অপেক্ষমাণ। (সে দেশের) মুসলিম জনসাধারণের উচিত হয় সাহস করে সৌদি আরবের বিচার বিভাগ ও আদালতের[৩২৪] কাছে তাঁর শাস্তি ও দণ্ড মওকুফ করার জ   আবেদন জানানো এবং সমগ্র বি র মুসলামানদের সৌদি আরবের ব্যাপারে বীতশ্রদ্ধ করা নতুবা নিরপরাধ এ যুবককে বেত্রাঘাতে জর্জরিত হয়ে প্রাণ হারাতে হবে।[৩২৫]

অবশেষে কুরাইশদের আরোপিত অর্থনৈতিক অবরোধ তাদেরই মধ্য থেকে কতিপয় চিন্তাশীল ব্যক্তির উদ্যোগে ভে যায় এবং ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। মহানবী (সা.) ও তাঁর অনুসারিগণ তিন বছর নির্বাসনে কষ্ট ও দুর্ভোগ পোহানোর পর আবু তালিবের উপত্যকা থেকে বের হয়ে আসেন এবং নিজ নিজ গৃহে প্রত্যাবর্তন করেন। মুসলমাদের সাথে কেনা- বেচা পুনরায় চালু হয়ে যায় এবং ধীরে ধীরে তাঁদের অবস্থার উন্নতি হতে থাকে। হঠাৎ করে মহানবী (সা.) এ সময় অত্যন্ত তিক্ত অবস্থার সম্মুখীন হন। এক বিরাট মুসীবতের অনাকাঙ্ক্ষিত প্রভাব নিরপরাধ মুসলমানদের মন- মানসিকতা ও আত্মিক শক্তির ওপর পড়েছিল। অত্যন্ত নাজুক ও সংবেদনশীল ঐ মুহূর্তে এ

ঘটনার ব্যাপকতা ও তীব্রতা কোন মাপকাঠি দিয়েই পরিমাপ করা সম্ভব নয়। কারণ কোন মতাদর্শ ও চিন্তাধারার বিকাশ দু'ধরনের কারণের ওপর নির্ভরশীল। কারণদ্বয় নিম্নরূপ : বাক-স্বাধীনতা এবং শত্রুর কাপুরুষোচিত আক্রমণ প্রতিহত ও প্রতিরোধ করার ক্ষমতা। ঘটনাক্রমে যে মুহূর্তে মুসলমানগণ বাক- স্বাধীনতা ভোগ করতে যাচ্ছিল ঠিক তখনই তাঁরা দ্বিতীয় কারণটি হারায় অর্থাৎ ইসলাম ধর্মের একমাত্র পৃষ্ঠপোষক ও প্রতিরক্ষা বিধায়ক তাঁদের মধ্য হতে বিদায় নেন এবং চিরনিদ্রায় শায়িত হন।

সে দিন মহানবী (সা.) তাঁর একমাত্র পৃষ্ঠপোষক ও প্রতিরক্ষা বিধায়ককে হারান যিনি তাঁকে ৮ বছর বয়স থেকে ৫০ বছর বয়স পর্যন্ত পৃষ্ঠপোষকতা দান ও রক্ষা করার দায়িত্ব পালন করেছেন এবং পতঙ্গের মতো তাঁর অস্তিত্ব প্রদীপের চারপাশে ঘুরেছে। হযরত মুহাম্মদ (সা.)- এর আয়-উপার্জনের সংস্থান হওয়া পর্যন্ত তিনি তাঁর (মহানবীর) যাবতীয় ব্যয় বহন করেছেন এবং তাঁকে তাঁর নিজ সন্তানদের ওপরও অগ্রাধিকার দিয়েছেন।

মহানবী (সা.) এমন এক ব্যক্তিত্বকে হারালেন যাঁর হাতে আবদুল মুত্তালিব (মহানবীর দাদা) তাঁর জীবনের অন্তিম মুহূর্তগুলোতে তাঁকে অর্থাৎ শিশু অনাথ হযরত মুহাম্মদকে তুলে দিয়েছিলেন এবং তাঁকে নিম্নোক্ত কবিতার মাধ্যমে সম্বোধন করে বলেছিলেন :

أُوصـــيك يـــا عبـــد منـــاف بعـــدي   بموعــــــد بعــــــد أبيــــــه فــــــرد

"হে আবদে মান্নাফ (হযরত আবু তালিবের নাম ছিল আবদে মান্নাফ এবং এ কারণেই তাঁর পিতা তাঁকে এ নামে সম্বোধন করেছেন)![৩২৬] ঐ ব্যক্তির লালন- পালন ও রক্ষণাবেক্ষণ তোমার কাঁধে অর্পণ করছি যে তার নিজ পিতার মতই তাওহীদবাদী।"আর তিনি পিতা আবদুল মুত্তালিবের প্রতি সাড়া দিয়ে বলেছিলেন :

يا أبت لا توصيّن بمحمّدٍ فإنّه ابني وابن أخي

“ হে পিতা! মুহাম্মদের ব্যাপারে অসিয়ত করার প্রয়োজন নেই; কারণ সে আমারই সন্তান এবং আমারই ভ্রাতুষ্পুত্র। ”

সম্ভবত যে মুহূর্তে হযরত আবু তালিবের কপালে মৃত্যুঘামের বারিবি গুলো স্পষ্ট ফুটে উঠেছিল, তখন মহানবী (সা.) অতীতের তিক্ত ও মধুর ঘটনাগুলো স্মরণ করছিলেন এবং নিজেকে বলছিলেন :

১. এ ব্যক্তি যিনি মৃত্যুপথযাত্রী তিনিই আমার সেই দয়ালু পিতৃব্য যিনি অবরোধ চলাকালীন সময়ে (আবু তালিবের) গিরি উপত্যকায় রাতের বেলা আমাকে আমার শয্যা বা ঘুমানোর জায়গা থেকে উঠিয়ে আমার হাত ধরে অ এক স্থানে নিয়ে যেতেন। সেখানে আমার শোয়া ও বিশ্রাম নেয়ার ব্যবস্থা করতেন এবং তাঁর প্রাণপ্রিয় সন্তান আলীকে আমার শয্যাস্থানে শোয়াতেন। তাঁর দৃষ্টিভি ছিল এটিই যে, যদি (রাতের বেলা) কখনও আকস্মিকভাবে কুরাইশরা আক্রমণ চালিয়ে আমাকে ঘুমন্ত অবস্থায় টুকরো টুকরো করতে চায় তাহলে তাদের নিক্ষিপ্ত তীর যেন লক্ষ্যভেদ করতে না পারে এবং তাঁর সন্তান আলীই যেন আমার প্রাণ রক্ষার বিনিময়ে কোরবানী হয়ে যায়। এমনকি যে রাতে তাঁর সন্তান আলী তাঁকে বলেছিলেন : আব্বা, অবশেষে এক রাতে আমিও এই শয্যায় শায়িতাবস্থায় নিহত হয়ে যাব। তখন তিনি তাকে বেশ কঠিন ভাষায় বলেছিলেন :

إصـــــبرن يــــــا بـــــنيّ فالصـــــبر احجـــــى   كـــــــلّ حـــــــيّ مصـــــــيره لشـــــــعوبٍ

قـــــــد بلونــــــــاك والــــــــبلاء شـــــــديدٌ   لفـــــــداء النّجيـــــــب وابـــــــن النّجيـــــــب

“হে বৎস! ধৈর্য জ্ঞান ও বুদ্ধির নিদর্শন।

প্রত্যেক জীবিত সত্তাই মৃত্যুবরণ করবে।

আমি তোমার ধৈর্য পরীক্ষা করছি এবং বিপদ- আপদও বেশ কঠিন।

আমি তোমাকে ঐ মহানুভবের জীবিত থাকার জ উৎসর্গ করেছি যিনি আরেক মহানুভব সত্তারই সন্তান।”

আর তাঁর সন্তান আলীও তাঁকে আরো মিষ্টি ও চমৎকার ভাষায় উত্তর দিয়েছিল এবং নবীর পথে মৃত্যুবরণ করাকে নিজের জ   বিরাট গৌরব বলে অভিহিত করেছিল।[৩২৭]

২. এ নি প্রাণ দেহটি আমার শ্রদ্ধেয় ও আন্তরিক পিতৃব্যের দেহ যিনি আমার পথে তিন বছর অন্তরীন ও অবরুদ্ধ জীবনযাপন করেছেন এবং যিনি পুরো বনি হাশিমের শান্তি ও আরাম কেড়ে নিয়েছিলেন এবং নির্দেশ দিয়েছিলেন যেন তারা সবাই আমার সাথে একটি উপত্যকায় বসবাস করে এবং নিজেদের নেতৃত্ব- কর্তৃত্ব সব কিছু বিসর্জন দেয়। অর্থাৎ তিনি তাঁর পুরো পার্থিব জীবন ও অস্তিত্ব বিসর্জন দিয়ে আমাকে আঁকড়ে ধরেছেন এবং কুরাইশদের কাছে মারাত্মক ভাষায় চিঠি দিয়ে তাদেরকে স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন যে, তিনি কখনই আমাকে সাহায্য দান ও পৃষ্ঠপোষকতা করা থেকে বিরত থাকবেন না। এখানে তাঁর চিঠির মূল পাঠ্যটি উদ্ধৃত করা হলো :

"হে মুহাম্মদের শত্রুরা। ভেবো না যে, আমরা মুহাম্মদকে ত্যাগ করব। কখনই না। সে সর্বদা আমাদের নিকট ও দূর সম্পর্কের সকল আত্মীয়- স্বজনের কাছে প্রিয় ও সম্মানিত। বনি হাশিমের শক্তিশালী বা গুলো তাঁকে সব ধরনের আঘাত ও ক্ষতি থেকে রক্ষা করবে।"[৩২৮]

চাচার মৃত্যু নিশ্চিত হলে আবু তালিবের গৃহ থেকে শোক, বিলাপ ও ক্রন্দন শোনা যেতে লাগল। শত্রু- বন্ধু সকলেই তাঁর দাফন অনুষ্ঠানে যোগ দেয়ার জ   তাঁর ঘরে উপস্থিত হয়েছিল। তাহলে কি এত   ত কুরাইশ গোত্রপ্রধান এবং তাদের নেতা হযরত আবু তালিবের (রা.) মতো ব্যক্তির মৃত্যুবরণের ঘটনাটির পরিসমাপ্তি ও যবনিকাপাত ঘটবে?

আবু তালিবের হৃদ্যতা ও আবেগের উদাহরণ

ইতিহাসের পাতায় পাতায় পরস্পরের প্রতি বিভিন্ন ব্যক্তির ভালোবাসা ও আবেগ অনুভূতির নিদর্শনসমূহ বর্ণিত হয়েছে যেগুলোর অধিকাংশই ছিল বস্তুবাদী মাপকাঠি এবং বিত্ত- বিভবকে কেন্দ্র করেই; আর খুব অল্প সময়ের মধ্যেই তাদের অস্তিত্বের সুগভীরে প্রোথিত এ ভালোবাসা ও আবেগ- অনুভূতির বহ্নিশিখা নির্বাপিত হয়ে যায়।

তবে যে সব আবেগ- অনুভূতির ভিত্তি হচ্ছে আত্মীয়তা ও রক্তের বন্ধন অথবা ভালোবাসার পাত্র অর্থাৎ প্রিয় ব্যক্তিটির আত্মিক- আধ্যাত্মিক পূর্ণতা ও উৎকৃষ্ট গুণাবলীর প্রতি আস্থা, বি াস এবং নিষ্ঠা সেগুলোর বহ্নিশিখা এত তাড়াতাড়ি নিভে যায় না এবং এ সব ব্যক্তির ভালোবাসা ও আবেগ- অনুভূতি এত তাড়াতাড়ি ও সহজেই বিলুপ্ত হবে না।

ঘটনাক্রমে হযরত মুহাম্মদ (সা.)- এর প্রতি আবু তালিব (রা.)- এর ভালোবাসার দু'টি উৎস ছিল। অর্থাৎ মহানবীর প্রতি তাঁর যেমন বি াস ছিল অর্থাৎ তিনি তাঁকে একজন ইনসানে কামিল (পূর্ণ মানব) এবং মানবতা ও মানব চরিত্রের পূর্ণ বহিঃপ্রকাশ হিসাবে বিবেচনা করতেন ঠিক তেমনি তিনি (মহানবী) ছিলেন তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র এবং হযরত আবু তালিব (রা.)ও তাঁর নিজ অন্তরে নিজ ভাই ও সন্তানদের স্থলে তাঁকে (মহানবী) স্থান দিয়েছিলেন এবং প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন।

হযরত আবু তালিব (রা.) মহানবী (সা.)- এর আধ্যাত্মিকতা ও আত্মিক পবিত্রতায় এতটা বি াস ও আস্থা পোষণ করতেন যে, তিনি দুর্ভিক্ষের সময় মহানবীকে সাথে নিয়ে মুসাল্লায় যেতেন এবং মহান আল্লাহর কাছে তাঁর নৈকট্য ও মর্যাদার উসীলায় প্রার্থনা করতেন এবং বিপদগ্রস্ত ও ঐ রিক দয়া ও করুণাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর জ বৃষ্টি প্রার্থনা করতেন এবং তাঁর প্রার্থনায় ফল হতো। অনেক ঐতিহাসিকই নিম্নোক্ত ঘটনাটি উল্লেখ করেছেন :

কোন এক বছর মক্কা নগরী ও এর পা র্বর্তী এলাকাসমূহের অধিবাসিগণ এক বিস্ময়কর অনাবৃষ্টি ও দুর্ভিক্ষ কবলিত হয়েছিল। ভূপৃষ্ঠ ও আকাশের করুণা ও আশীর্বাদ তাদের জ যেন বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। কুরাইশগণ দলে দলে অশ্রুসিক্ত নয়নে হযরত আবু তালিবের কাছে গমন করে

ঐকান্তিকভাবে তাঁকে অনুরোধ করেছিল যেন তিনি মুসাল্লায় গিয়ে মহান আল্লাহর কাছে জনগণের জ   রহমতের বৃষ্টি প্রার্থনা করেন। হযরত আবু তালিব (রা.) শিশু হযরত মুহাম্মদ (সা.)- এর হাত ধরে পবিত্র কাবার দেয়ালের দিকে ঠেস দিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে প্রার্থনা করে বলেছিলেন, "হে দয়ালু প্রভু! এই শিশু পুত্রটির উসিলায় (আর তিনি তখন আ ুল দিয়ে রাসূলুল্লাহর দিকে ই িত করেছিলেন) আপনার রহমতের বৃষ্টি বর্ষণ করুন এবং আমাদেরকে আপনার অসীম দয়া ও মহানুভবতার অন্তর্ভুক্ত করে নিন।"

সকল ঐতিহাসিক সর্বসম্মতিক্রমে লিখেছেন : "হযরত আবু তালিব (রা.) যখন বৃষ্টির জ   প্রার্থনা করেছিলেন তখন আকাশে একখণ্ড মেঘও ছিল না। কিন্তু অনতিবিলম্বে আকাশে চারদিক থেকে মেঘমালা ছুটে আসল। সমগ্র মক্কা নগরী ও এর পা র্বর্তী এলাকাসমূহের আকাশ মেঘে ছেয়ে গেল। মেঘমালার গর্জন ও বিদ্যুৎ চমকানি সেখানে এক মহা হৈ চৈ ও চাঞ্চল্যকর পরিবেশ সৃষ্টি করল। প্রবল বৃষ্টি বর্ষণের ফলে মক্কা নগরীর সর্বত্র ব া দেখা দিল এবং নিকট ও দূরবর্তী সকল এলাকা রহমতের বারিবি   দিয়ে সিক্ত ও াবিত হয়ে গেল। সবার মন হাসি- আনন্দে ভরে উঠল। এ সময় হযরত আবু তালিব (রা.) কতিপয় পঙ্ক্তি রচনা করেছিলেন।[৩২৮]

হযরত আবু তালিব (রা.) জীবনের সবচেয়ে কঠিন সময়ে তাঁর রচিত কাসীদাটি রচনা ও আবৃত্তি করেছিলেন যখন কুরাইশদের হাতে মহানবীকে তুলে দেয়ার জ   তাঁর ওপর তাদের পক্ষ থেকে চাপ অত্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছিল। তিনি এই কাসীদায় মহানবী (সা.)- এর পুণ্যময় অস্তিত্বের সাথে বৃষ্টি বর্ষণের ঘটনাটি সম্পর্কিত বলে উল্লেখ করেছিলেন।

ইবনে হিশাম তাঁর সীরাত গ্রন্থের ২য় খণ্ডের ২৮৬ পৃষ্ঠায় (আবু তালিবের) ঐ কাসীদা থেকে ৯৪ টি পঙ্ক্তি উল্লেখ করেছেন। অথচ ইবনে কাসীর শামী তাঁর ইতিহাস গ্রন্থের ২য় খণ্ডের ৫২- ৫৭ পৃষ্ঠায় উক্ত কাসিদা থেকে ৯২ টি পঙ্ক্তি উল্লেখ করেছেন। এ কাসিদাটি বলিষ্ঠতা, মাধুর্যতা, সাবলীলতা, ভাষার প্রাঞ্জলতা আকর্ষণ এবং স্পষ্টরূপে প্রকাশ করার ক্ষমতার দৃষ্টিকোণ থেকে ঝুলন্ত কাব্যসপ্তক (মুআল্লাকাত- ই সাবআহ্) অপেক্ষাও উন্নততর ও শ্রেষ্ঠ। এখানে

উল্লেখ্য যে, অন্ধকার যুগের আরবগণ এ মুআল্লাকাত- ই সাবআহ্ নিয়ে গর্ব করত এবং এগুলোকে সর্বোৎকৃষ্ট কাব্য বলে গণ্য করত।

হযরত আবু তালিবের কাব্যসমগ্রের সংগ্রাহক আবু হাফফান আবদী উক্ত কাসিদা- ই লামিয়ার ১২১টি পঙ্ক্তি উল্লেখ করেছেন এবং সম্ভবত সমগ্র কাসিদাটি এ ১২১টি পঙক্তি বিশিষ্টই হবে।

হযরত আবু তালিব (রা.) এ কাসিদায় হযরত মুহাম্মদ (সা.)- এর আলোকিত (নূরানী) বদনমণ্ডলের উসীলায় মহান আল্লাহর কাছে বৃষ্টি প্রার্থনা করার ব্যাপারে ইি ত করে বলেছেন :

وأبـــــيضُ يستســـــقي الغـــــام بوجهـــــه ثمـــــالَ اليتـــــامى عصـــــمةً للارامـــــل

يلـــــوذ بـــــه الهـــــلاك مـــــن آل هاشـــــم فهـــــم عنـــــده في رحمـــــة و فواضـــــل

“ সেই ৫ তশুভ্র সত্তার পবিত্র মুখমণ্ডলের উসীলায়

তীব্র উষ্ণ ও অনাবৃষ্টির দিবসও হয় পানি দ্বারা স্নাত- সিক্ত,

যে অনাথদের আশ্রয়স্থল ও অভিভাবক এবং বিধবা ও অসহায়দের ত্রাণকর্তা- যার কাছে আশ্রয় নেয় বনি হাশিমের অভাগাগণ

যার সান্নিধ্যে তারা লাভ করে (পরম করুণাময়ের) করুণা ও সমৃদ্ধি। ”

সফরের কর্মসূচীতে পরিবর্তন

তখনও মহানবী (সা.)- এর জীবনের ১২টি বসন্ত গত হয় নি, ঠিক ঐ সময় হযরত আবু তালিব (রা.) কুরাইশদের বাণিজ্য কাফেলার সাথে শাম দেশ গমন করেছিলেন। যে মুহূর্তে মালপত্র উটের পিঠে বেঁধে উটগুলোকে যাত্রার জ প্রস্তুত করা হলো এবং যাত্রা করার ঘণ্টা বেজে উঠল ঠিক তখনই মহানবী (সা.) হঠাৎ হযরত আবু তালিবের উটের দড়ি হাতে নিয়ে নিলেন; আর সেই মুহূর্তে তাঁর (মহানবীর) নয়ন যুগল অশ্রুসিক্ত হয়ে গেল এবং ছল ছল করতে লাগল। তিনি বললেন, "হে চাচা! আপনার সাথে আমিও অবশ্যই যাব।" হযরত মুহাম্মদ (সা.)- এর চোখে অশ্রু দেখতে পেয়ে হযরত আবু তালিবেরও দু'নয়ন বেয়ে অশ্রু ঝরতে লাগল।

হযরত আবু তালিবও এ ধরনের অতি সংবেদনশীল মুহূর্তে অত্যাবশ্যকীয় পূর্বপ্রস্তুতি ছাড়াই ভ্রাতুষ্পুত্রকে নিজের সাথে সফরে নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললেন। যদিও ঐ কাফেলায় তাঁর জ কোন স্থান আগে থেকেই নির্দিষ্ট করা হয় নি তবুও তিনি (আবু তালিব) তাঁর (মহানবীর) সফরের যাবতীয় চাপ ও ঝামেলা নিজেই সামাল দিয়েছিলেন। তিনি মহানবীকে নিজের উটের পিঠেই সওয়ার করলেন। আর সফরে তিনি সব সময় তাঁর জ চিন্তা করতেন। এই সফরে তিনি মহানবী (সা.)- এর বেশ কিছু মু ' জিযা প্রত্যক্ষ করে কিছু কবিতা রচনা করেছিলেন যেগুলো আবু তালিবের কাব্য সমগ্র অর্থাৎ দিওয়ানে সংকলিত হয়েছে।[৩২৯]

বিশ্বাসের সংরক্ষণ ও সুরক্ষা

ঈমানী শক্তির মতো আর কোন শক্তিই হতে পারে না যা দৃঢ়তা, স্থিরতা ও অবিচলতা দানকারী। জীবনে মানুষের প্রগতি ও উন্নতির শক্তিশালী কারণ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের প্রতি তার শক্তিশালী আস্থা ও বি াস যা সব ধরনের দুঃখ- কষ্ট ও যন্ত্রণাকে বিলীন করে দেয় এবং মানুষকে তার পবিত্র ও কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছানোর জ   মৃত্যুরও মুখোমুখি করে।

ঈমানী শক্তিবলে বলীয়ান সৈনিক শতকরা একশ ’   ভাগ বিজয়ী হবেই। যে যোদ্ধা বি াস করে যে, আকীদা- বি াস ও আদর্শের পথে হত্যা করা ও নিহত হওয়াই হচ্ছে প্রকৃত সৌভাগ্য, আসলে বিজয় ও সাফল্য তার হবেই। যুগোপযোগী অস্ত্র ও হাতিয়ারে সজ্জিত হবার আগেই যোদ্ধার   দয় অবশ্যই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের প্রতি বি াস ও আস্থা দ্বারা পরিপূর্ণ হতে হবে; তার অন্তঃকরণ সত্যের প্রতি প্রেম ও ভালোবাসার আলোকবর্তিকা দ্বারা অবশ্যই আলোকিত হতে হবে। তার যাবতীয় কর্মকাণ্ড, স্থিতি, যুদ্ধ ও সন্ধি অবশ্যই ঈমান ও বি াসের ভিত্তিতে হতে হবে; তার যুদ্ধ, সংগ্রাম ও সন্ধি সবকিছুই অবশ্যই ঈমান ও বি াসের ওপর প্রতিষ্ঠিত হতে হবে।

চিন্তা- চেতনা ও আকীদা- বি াস আমাদের আত্মা থেকেই উদ্ভূত। আর প্রকৃতপক্ষে মানুষের চিন্তা- ভাবনার উৎপত্তিও তার বিবেক- বুদ্ধি থেকেই। মানুষ যেমন তার ঔরসজাত সন্তানকে ভালোবাসে ঠিক তেমনি সে তার চিন্তা- ভাবনার প্রতিও ভালোবাসা প্রদর্শন করে যা তার বিবেক- বুদ্ধি ও আত্মা হতে উদ্ভূত। বরং নিজ আকীদা- বি াসের প্রতি মানুষের টান ও ভালোবাসা নিজের ঔরসজাত সন্তানের প্রতি টান ও ভালোবাসার চেয়েও বেশি। এ কারণেই মানুষ তার নিজ আকীদা- বি াস সংরক্ষণ করার জ   মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যায়। সে নিজ আকীদা- বি াসের বেদীমূলে তার সব কিছু উৎসর্গ করতেও কু াবোধ করে না। অথচ সে তার সন্তান- সন্ততি ও আপনজনদেরকে রক্ষা করার জ   এতটা আত্মত্যাগ করে না।

অর্থ, ধনসম্পদ ও পদমর্যাদার প্রতি মানুষের টান ও আগ্রহ সীমিত। যে পর্যন্ত না নিশ্চিত মৃত্যু তার জ   মকি হয়ে দাঁড়াবে সে পর্যন্ত সে অর্থ, সম্পদ ও পদমর্যাদা প্রাপ্তির চেষ্টা করে থাকে। কিন্তু

সে- ই আবার আকীদা- বি াসের ক্ষেত্রে মৃত্যুর মুখোমুখি হয় এবং এ পথে বেঁচে থাকার চেয়ে সম্মানজনক মৃত্যুকেই অগ্রাধিকার প্রদান করে। এভাবে সে মুজাহিদ বীর পুরুষদের বদনমণ্ডলে প্রকৃত জীবনের প্রতিচ্ছবি প্রত্যক্ষ করে। তাই إِنَّمَا الحياةُ عقيدةٌ وَجِهادٌ 'নিশ্চয়ই জীবনই হচ্ছে আকীদা- বি াস ও জিহাদ ' - এ বাক্যটি তার জপমালায় পরিণত হয়।[৩৩০]

(প্রিয় পাঠকবর্গ!) আমাদের কাহিনীর মহানায়কের (পবিত্র ইসলাম ধর্ম ও মহানবীর একমাত্র পৃষ্ঠপোষক ও সংরক্ষণকারী) জীবনীর দিকে একটু দৃষ্টি দিন; এ পথে কোন্ জিনিসটি তাঁকে প্রেরণা দিয়েছে এবং কোন্ কারণের বশবর্তী হয়ে তিনি মৃত্যু ও ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে এগিয়ে গিয়েছেন, নিজের জীবন, ধন- সম্পদ, সম্মান, পদমর্যাদা ও গোত্রের মায়াও ত্যাগ করেছেন এবং মহানবী (সা.)- এর জ তাঁর সবকিছু উৎসর্গ করেছেন? নিশ্চিত করে বলা যায় যে, তাঁর (আবু তালিব) কোন বস্তুবাদী কারণ ও উদ্দেশ্য ছিল না এবং তিনি তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রকে ব্যবহার করে দুনিয়াবী কোন স্বার্থ উদ্ধার অর্থাৎ কোন পার্থিব সম্পদ অর্জন করতে চান নি। কারণ ঐ সময় মহানবী রিক্ত হস্ত ছিলেন এবং তাঁর কোন ক্ষমতা ও বিত্ত- বিভব ছিল না। আর আবু তালিবের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য (মহানবীকে ব্যবহার করে) সামাজিক প্রতিপত্তি, পদ ও মর্যাদা অর্জনও ছিল না। কারণ তখনকার সমাজে তিনি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক পদ ও মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। তিনি ছিলেন পবিত্র মক্কা ও বাতহা অঞ্চলের প্রধান। বরং মহানবীকে সাহায্য ও সমর্থন করার কারণে তিনি তাঁর অন সাধারণ ব্যক্তিত্ব ও পদমর্যাদা প্রায় হারাতে বসেছিলেন। কারণ মহানবী (সা.)- কে রক্ষা করতে গিয়েই তো মক্কার গোত্রপতিগণ তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল এবং তারা তাঁর ও বনি হাশিম গোত্রের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছিল।

বাতিল ও অমূলক চিন্তা

সম্ভবত কোন কোন সংকীর্ণ দৃষ্টিভ পোষণকারী ব্যক্তি চিন্তা করতে পারে যে, হযরত আবু তালিবের আত্মত্যাগের কারণই হচ্ছে আত্মীয়তা ও রক্তসম্পর্ক। অর্থাৎ আরেকভাবে বলা যায় যে, অন্ধ সাম্প্রদায়িকতা ও গোত্রীয় গোঁড়ামি তাঁকে এ কাজ করতে উদ্বুদ্ধ করেছে এবং বংশীয়

গোঁড়ামি ও গোত্রীয় বন্ধনের কারণেই তিনি তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রের পথে নিজ অস্তিত্ব পর্যন্ত বিলীন করে দিতে প্রস্তুত ছিলেন।

কিন্তু এ ধরনের ধারণা ও কল্পনা এতটা বৃথা ও ভিত্তিহীন যে সামা   একটু অনুসন্ধান ও গবেষণা করলেই এর ভিত্তিহীনতা দিব্য পরিষ্কার হয়ে যায়। কারণ নিছক আত্মীয়তার সম্পর্ক ও বন্ধন কখনই মানুষকে তার পুরো অস্তিত্ব তারই এক আত্মীয়ের জ   বিসর্জন দিতে, নিজ পুত্র আলীকে ভ্রাতুষ্পুত্রের পথে উৎসর্গ করতে এবং ভ্রাতুষ্পুত্রের পথে নিজ সন্তানকে টুকরো টুকরো করতে মোটেও উদ্বুদ্ধ করবে না।

যদিও কখনো কখনো বংশীয় গোঁড়ামি মানুষকে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে নিয়ে যায় তবুও বিশেষভাবে কোন একজন নির্দিষ্ট আত্মীয়ের প্রতি এত তীব্র মাত্রায় বংশীয় গোঁড়ামি পোষণ করার কোন অর্থই থাকতে পারে না। অথচ হযরত আবু তালিব (রা.) একজন নির্দিষ্ট আত্মীয়ের জ   ই কেবল এতটা আত্মত্যাগ করেছিলেন যা তিনি আবদুল মুত্তালিব ও হাশিমের আর কোন বংশধরের জ   কখনই করেন নি।

আবু তালিবকে উদ্বুদ্ধ করার প্রকৃত কারণ

এ মূলনীতির ভিত্তিতে (সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে) যে কারণ আবু তালিব (রা.)- কে উদ্বুদ্ধ করেছিল তা নিছক কোন বস্তুগত বিষয়, পদমর্যাদার লোভ বা গোত্রীয় সাম্প্রদায়িক গোঁড়ামি ছিল না। বরং কোন একটি আধ্যাত্মিক কারণ বা বিষয় তাঁকে আত্মোৎসর্গ করার অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে। আর শত্রুদের চাপ ও ক্ষমতা তাঁকে সব ধরনের আত্মত্যাগ করার জ   পূর্ণ প্রস্তুত রাখত। সেই কারণ যা তাঁকে আত্মোৎসর্গ করার অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে তা ছিল মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)- এর প্রতি তাঁর অবিচল আস্থা ও বি াস। কারণ তিনি মহানবীকে মহৎ গুণাবলী ও মানবতার পূর্ণ বহিঃপ্রকাশ ও নিদর্শন বলে বি াস করতেন। যেহেতু তিনি সত্যের প্রেমিক ছিলেন সেহেতু তিনি স্বভাবতই সত্যকে সমর্থন ও পক্ষাবলম্বন করবেন।

হযরত আবু তালিবের কবিতাসমূহ থেকে এ সত্যটি স্পষ্ট বোধগম্য হয়। তিনি প্রকাশ্যে মহানবীকে হযরত মূসা ও হযরত ঈসা (আ.)- এর মতো নবী মনে করতেন। এখানে তাঁর কয়েকটি কবিতার ব ানুবাদ পেশ করা হলো যেগুলো দ্বারা মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)- এর প্রতি তাঁর ঈমান প্রমাণিত হয়ে যায় :

ليعلمْ خيارُ النّاسِ أنّ محمّداً   نبيٌّ كموسى والمسيح بن مريم

اتانا بهدىً مثل ما أتيا به   فكل بأمر الله يهدي ويعصم

“সকল শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি জেনে নিক যে, নিশ্চয়ই মুহাম্মদ

মূসা ও ঈসা ইবনে মরিয়মের মতো একজন নবী

তাঁরা দু’জন যে হেদায়েত আনয়ন করেছিলেন, সেরূপ হেদায়েত তিনিও আমাদের জ   এনেছেন

তাই তাঁদের প্রত্যেকেই মহান আল্লাহর নির্দেশে হেদায়েত করেন এবং পাপ থেকে মুক্ত।”

وإنّكم تتْلونه في كتابكم   بصدقِ حديثٍ لا حديث المرجم

“আর তোমরা তোমাদের গ্রন্থে তাঁর সত্যবাদিতার কথা

অবশ্যই পাঠ কর তিনি না জেনে শুনে কথা বলেন না।”

আরেকটি কাসীদায় হযরত আবু তালিব নিজ ভাতিজার ব্যাপারে তাঁর নিজস্ব আকীদা- বি াস এভাবে ব্যাক্ত করেছেন :

ألم تعلمـــــوا أنّــــا وجـــــدنا محمّـــــداً رســـولاً كموســـى خـــطَّ في أوّل الكتـــبِ

“ তোমাদের কি জানা নেই যে, আমরা মুহাম্মদকে মূসা ইবনে ইমরানের মতো একজন রাসূল হিসাবে পেয়েছি। আর তাঁর নবুওয়াত সংক্রান্ত বিবরণ পূর্ববর্তী আসমানী গ্রন্থসমূহে লিপিবদ্ধ রয়েছে।”[৩৩১]

পূর্বোল্লিখিত কবিতাসমূহ এবং অ া কবিতা যেগুলো দিওয়ানে আবু তালিব তা ইতিহাসের পাতায় পাতায় এবং হাদীস ও তাফসীরের গ্রন্থাবলীতে লিপিবদ্ধ আছে। সেগুলো থেকে স্পষ্ট প্রমাণ মেলে যে, যে লক্ষ্য ও কারণ মহানবী (সা.) ও ইসলাম ধর্মকে রক্ষা করার জ তাঁকে উদ্দীপ্ত করেছে তা ছিল আসলে তাঁর বিশুদ্ধ বি াস এবং ইসলাম ধর্মের প্রতি তাঁর প্রকৃত আত্মসমর্পণ। কেবল তাঁর আকীদা ও ঈমান ব্যতীত আর কোন কারণ ও লক্ষ্য বিদ্যমান ছিল না। আমরা মহানবী ও ইসলাম ধর্ম প্রচারের ক্ষেত্রে তাঁর আত্মত্যাগ, অকু সমর্থন ও পৃষ্ঠপোষকতা দানের গুটিকতক নিদর্শন তুলে ধরব এবং আপনারা এ ধরনের আত্মোৎসর্গ ও ত্যাগের ব্যাপারে নিজেরাই গভীর ও সূক্ষ্মভাবে চিন্তা ও গবেষণা করবেন তাহলে তখন আপনারা নিজেরাই বিচার করতে পারবেন যে, এ ধরনের আত্মোৎসর্গ ও ত্যাগের উৎস মূল খাঁটি আকীদা- বি াস ও ঈমান ব্যতীত আর কিছুই হতে পারে না।

আবু তালিব (রা.)- এর ত্যাগের কতিপয় নমুনা

কুরাইশ নেতৃবর্গ মহানবী (সা.)- এর উপস্থিতিতে হযরত আবু তালিবের ঘরে একটি সভার আয়োজন করে। তাদের মধ্যে সেখানে বাক্য বিনিময় ও আলোচনা অনুষ্ঠিত হবার পর কুরাইশ নেতৃবৃন্দ তাদের আলোচনার ফলাফলের অপেক্ষা না করেই সেখান থেকে উঠে গেল। ঐ অবস্থায় উকবা ইবনে আবি মুঈত উচ্চৈঃস্বরে চেঁচিয়ে বলতে লাগল : তাকে (মহানবী) তার অবস্থার ওপর ছেড়ে দাও। তাকে সদুপদেশ দিয়ে কোন লাভ হবে না। তাকে অবশ্যই হত্যা করা উচিত

(لا نعود إليه أبداً وما خير من ان نقتال محمّداً) । ”

হযরত আবু তালিব (রা.) এ কথা শুনে খুবই মর্মাহত হলেন। তবে তিনি কিইবা করতে পারতেন। তারা (কুরাইশ সর্দারগণ) তাঁর ঘরে অতিথি হিসাবে এসেছিল। ঘটনাক্রমে মহানবী সেদিন ঘর থেকে বের হয়ে গেলেন এবং আর ঘরে ফিরলেন না। সন্ধ্যার দিকে মহানবী (সা.)- এর চাচারা তাঁর ঘরে যান কিন্তু তাঁরা তাঁকে সেখানে দেখতে পেলেন না। হঠাৎ উকবার কথা হযরত আবু তালিবের মনে পড়ে গেল। তখন তিনি মনে মনে বললেন, "অবশ্যই আমার ভাতিজাকে তারা হত্যা করে ফেলেছে। ”

তখন তিনি চিন্তা করলেন যে, যা হবার তা হয়ে গিয়েছে। এখন অবশ্যই মক্কার ফিরআউনদের কাছ থেকে মুহাম্মদের হত্যার প্রতিশোধ নিতে হবে। তাই তিনি পুরো বনি হাশিম গোত্র এবং আবদুল মুত্তালিবের বংশধরদের তাঁর নিজ গৃহে ডেকে প্রত্যেককেই ধারালো অস্ত্র তাঁদের পোশাকের নিচে লুকিয়ে রেখে একত্রে মসজিদুল হারামে গমন করার নির্দেশ দিলেন। তিনি তাঁদেরকে বললেন তাঁরা যেন প্রত্যেকেই প্রতি একজন করে কুরাইশ নেতার পাশে বসে। আর যখনই আবু তালিবের স্বর উচ্চকিত হবে এবং তিনি বলতে থাকবেন : হে কুরাইশ সম্প্রদায়! আমি মুহাম্মদকে চাচ্ছি (يا معشر قريش أبغي محمّداً) তখন তাৎক্ষণিকভাবে তাঁরা তাঁদের জায়গা থেকে উঠে

দাঁড়াবেন এবং প্রত্যেকে যে ব্যক্তির কাছে বসেছেন তাকে হত্যা করে ফেলবেন; আর এভাবে সকল কুরাইশ নেতৃবৃন্দ একত্রে এক দফায় নিহত হবে।

হযরত আবু তালিব (রা.) যখন মসজিদুল হারামে যাওয়ার জ বের হচ্ছিলেন ঠিক তখন অকস্মাৎ যায়েদ ইবনে হারেসা সেখানে উপস্থিত হলেন এবং তাঁদের প্রস্তুতি প্রত্যক্ষ করলেন। তিনি এতটা আশ্চর্যান্বিত হলেন যে, তাঁর বাকশক্তি যেন রহিত হয়ে গেল এবং বললেন, "মহানবী (সা.)- এর কোন ক্ষতি হয়নি। তিনি এক মুসলমানের ঘরে ধর্ম প্রচার কার্যে মশগুল আছেন। এ কথা বলেই তিনি মহানবীর কাছে দৌড়ে চলে গেলেন এবং তাঁকে হযরত আবু তালিবের অত্যন্ত বিপজ্জনক এ সিদ্ধান্ত সম্পর্কে অবগত করলেন। মহানবীও অতি তগতিতে ঘরে পৌঁছলেন। হযরত আবু তালিব (রা.)- এর দৃষ্টি ভ্রাতুষ্পুত্র মহানবীর পবিত্র সুন্দর ও আকর্ষণীয় চেহারার ওপর পড়লে তাঁর দু'চোখ বেয়ে আনন্দাশ্রু বয়ে যেতে লাগল। তিনি তাঁর দিকে তাকিয়ে বললেন, "হে আমার ভাতিজা! তুমি কোথায় ছিলে? তুমি ভাল ছিলে তো?" মহানবী চাচার প্রশ্নের জবাব দিলেন এবং বললেন যে, কেউ তাঁর কোন ক্ষতি করে নি।

হযরত আবু তালিব (রা.) পুরো ঐ রাতটা চিন্তাম ছিলেন। তিনি চিন্তা করছিলেন, "আজ আমার ভ্রাতুষ্পুত্র শত্রুর আক্রমণের শিকার হয় নি। তবে কুরাইশরা তাকে যতক্ষণ পর্যন্ত হত্যা না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত স্থির ও শান্ত হতে পারবে না।" তিনি এ উদ্যোগের মাঝে কল্যাণ ও ম ল দেখতে পেলেন যে, তিনি পরের দিন প্রভাতে সূর্যোদয়ের পর যখন কুরাইশদের সভা ও জমায়েতগুলো জমজমাট হতে থাকবে তখন তিনি বনি হাশিম ও আবদুল মুত্তালিবের বংশধর যুবকদের সাথে মসজিদুল হারামে যাবেন এবং আগের দিন তিনি যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন সে সিদ্ধান্ত সম্পর্কে কুরাইশদেরকে অবহিত করবেন। আশা করা যায় যে, তাদের অন্তরে ভীতির সঞ্চার হবে এবং এরপর থেকে তারা মুহাম্মদ (সা.)- কে হত্যার পরিকল্পনা ত্যাগ করবে। সূর্য কিছুটা উঁচুতে উঠলে কুরাইশদের ঘরবাড়ি থেকে বের হয়ে সভা ও সমবেত হওয়ার স্থানগুলোতে যাওয়ার সময় হলো। তারা তখনও কথাবার্তায় রত হয় নি ঠিক ঐ মুহূর্তে হযরত আবু তালিবকে দূর থেকে দেখা গেল। কুরাইশগণ দেখতে পেল যে, তাঁর পেছনে বেশ কিছু সাহসী যুবক আসছে। তারা হাত- পা গুটিয়ে

অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতে লাগল যে, আবু তালিব (রা.) কি বলতে চান এবং কোন্ উদ্দেশ্যে তিনি লোকজন নিয়ে মসজিদুল হারামে এসেছেন?

হযরত আবু তালিব (রা.) কুরাইশদের সভার সামনে দাঁড়িয়ে বললেন, "গতকাল মুহাম্মদ বেশ কয়েক ঘণ্টা আমাদের মধ্যে অনুপস্থিত ছিল। আমি ভেবেছিলাম, তোমরা উকবার কথানুযায়ী তাকে হত্যা করে ফেলেছ। এ কারণে আমি সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছিলাম যে, এ সব যুবককে সাথে নিয়ে মসজিদুল হারামে প্রবেশ করব। এদের প্রত্যেককে আমি নির্দেশ দিয়েছিলাম যে, তারা তোমাদের প্রত্যেকের পাশে বসে পড়বে এবং যখনই আমার ক উচ্চকিত হবে ঠিক তখনই বিলম্ব না করে তারা নিজেদের স্থান থেকে উঠে দাঁড়াবে এবং লুক্কায়িত অস্ত্র বের করে তোমাদেরকে হত্যা করবে। কিন্তু সৌভাগ্যবশত মুহাম্মদকে আমি জীবিত এবং তোমাদের অনিষ্ট থেকে নিরাপদ পেয়েছি।" এরপর তিনি তাঁর সাহসী যুবকদেরকে তাঁদের লুকানো অস্ত্র বের করে আনার নির্দেশ দিলেন। তিনি এ কথা বলার মাধ্যমে তাঁর বক্তব্য শেষ করলেন, "মহান আল্লাহর শপথ, যদি তোমরা তাকে হত্যা করতে তাহলে আমি তোমাদের কাউকে আর জীবিত রাখতাম না এবং সর্বশক্তি নিয়োগ করে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতাম এবং...।"[৩৩২]

শ্রদ্ধেয় পাঠকবৃন্দ! আপনারা যদি হযরত আবু তালিবের জীবনী অধ্যয়ন করেন তাহলে আপনারা দেখতে পাবেন যে, তিনি পুরো ৪২ বছর মহানবী হযরত মুহাম্মদকে সাহায্য করেছেন এবং বিশেষ করে তাঁর জীবনের সর্বশেষ দশ বছর (অর্থাৎ যা ছিল ঐ সময় পর্যন্ত মহানবীর নবুওয়াত ও ধর্ম প্রচার সময়কালের সমান) তিনি মহানবীর জ   মাত্রাতিরিক্ত আত্মত্যাগ ও কোরবানী করেছিলেন। একমাত্র যে কারণটি তাঁকে এতটা দৃঢ়, স্থির ও অবিচল রেখেছিল তা ছিল তাঁর ঈমানী শক্তি ও মহানবী (সা.)- এর প্রতি বিশুদ্ধ বি াস। আর আপনারা যদি তাঁর প্রিয় পুত্র আলী (আ.)- এর আত্মত্যাগ পিতার খেদমত ও অবদানের সাথে যোগ করেন তাহলে নিম্নোক্ত কবিতাসমূহের প্রকৃত তাৎপর্য ও অর্থ আপনাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে যাবে যা ইবনে আবীল হাদীদ এতদপ্রসে রচনা করেছিলেন। এখানে ঐ কবিতাগুলোর কিয়দংশের অনুবাদ উল্লেখ করা হলো :

و لـــــــــولا أبـــــو طالـــــب و ابنـــــه   لمـــا مثـــل الـــدّين شخصـــا و قامـــا

فـــــــــذاك بمكـــــــــة آوى و حـــــــــامى   و هـــــــذا بيثـــــرب جـــــس الحمامـــــا

" যদি আবু তালিব ও তাঁর সন্তান না থাকতেন,

তাহলে দীন কখনই প্রতিষ্ঠিত হতে পারত না।

তিনি পবিত্র মক্কায় (মহানবীকে) আশ্রয় এবং সমর্থন দিয়েছেন

আর তাঁর সন্তান ইয়াসরিবে মৃত্যুর ভয়াল ঘূর্ণাবর্তের গভীরে প্রবেশ করেছেন।"[৩৩৩]

আলোচনার রাজনৈতিক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

এতে কোন সন্দেহ নেই যে, আবু তালিবের ঈমান ও মুসলিম হওয়ার ব্যাপারে যে সব সাক্ষ্য-প্রমাণ বিদ্যমান সেগুলোর এক দশমাংশও যদি রাজনীতি, ঘৃণা ও শত্রুতা থেকে মুক্ত অ কোন ব্যক্তির ব্যাপারে বিদ্যমান থাকত তাহলে শিয়া- সুন্নী নির্বিশেষে সকলেই সর্বসম্মতিক্রমে তাঁর ঈমান ও মুসলিম হবার বিষয়টি মেনে নিত; অথচ হযরত আবু তালিবের ঈমান ও ইসলাম ধর্ম গ্রহণ সংক্রান্ত অগণিত সাক্ষ্য- প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও কিভাবে একটি গোষ্ঠী তাঁকে কাফির বলতে পেরেছে? এমনকি কেউ কেউ বলেছে যে, আযাব সংক্রান্ত আয়াতসমূহের মধ্য থেকে গুটিকতক আয়াতও তাঁর সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে; আবার আরেকটি গোষ্ঠী এ ব্যাপারে মন্তব্য করা থেকে বিরত থেকেছে। আর অত্যন্ত মুষ্টিমেয় সুন্নী আলেমও তাঁর ঈমান ও ইসলাম ধর্ম গ্রহণের কথা স্বীকার করেছেন। তাঁদের অ তম আল্লামা যায়নী দাহলান যিনি পবিত্র মক্কা নগরীর মুফতী ছিলেন (মৃত্যু ১৩০৪ হি.)। তবে অবশ্যই ইনসাফ করতে হবে যে, এ ধরনের আলোচনা উত্থাপন করার প্রকৃত উদ্দেশ্য হযরত আবু তালিবের সন্তানগণ, বিশেষ করে আমীরুল মুমিনীন আলী (আ.)- এর প্রতি বক্র ও কটাক্ষ উক্তি ও মন্তব্য করা ছাড়া আর কিছুই নয়।

কতিপয় সুন্নী আলেম হযরত আবু তালিবকে যাতে করে ভালোভাবে কাফির বলে অভিহিত করতে পারেন সেজ মহানবী (সা.)- এর ঊর্ধতন পূর্বপুরুষগণ পর্যন্ত এ আলোচনা সম্প্রসারিত করেছেন এবং তাঁর (মহানবীর) পিতা- মাতাকেও তাঁরা অবি াসী বলে অভিহিত করেছেন।

মহানবী (সা.)- এর পিতা- মাতাকে অবি াসী অভিহিত করার বিষয়টি ইমামীয়াহ্, যায়দীয়াহ্ এবং কতিপয় গবেষক সুন্নী আলেমের অভিমতের পরিপন্থী। কিন্তু কথা হচ্ছে ঐ সব ব্যক্তির ক্ষেত্রে যাঁরা সহজেই মহানবী (সা.)- এর একমাত্র সমর্থক, পৃষ্ঠপোষক, সাহায্যকারী এবং রক্ষককে কাফির বলে সাব্যস্ত করেছেন।

আবু তালিবের ঈমানের প্রমাণ

যে কোন ব্যক্তির আকীদা- বি াস ও চিন্তাধারা নিম্নোক্ত তিনটি পদ্ধতিতে জানা ও শনাক্ত করা যায়:

১. তার থেকে যে সব তত্ত্বমূলক রচনা ও সাহিত্যকর্ম বিদ্যমান সেগুলো অধ্যয়ন করা,

২. সমাজে তার আচার- আচরণ ও কর্মকাণ্ড এবং

৩. তার ব্যাপারে তার নিরপেক্ষ বন্ধু- বান্ধব ও আত্মীয়স্বজনদের আকীদা- বি াস।

আমরা উপরিউক্ত তিনটি পদ্ধতিতে হযরত আবু তালিবের ঈমান ও আকীদা- বি াস প্রমাণ করতে পারব।

হযরত আবু তালিবের কবিতাসমূহ পুরোপুরি তাঁর ঈমান ও নিষ্ঠার সাক্ষ্য দেয়। ঠিক একইভাবে তাঁর জীবনের সর্বশেষ দশ বছরে তিনি যে সব মূল্যবান অবদান রেখেছিলেন সেগুলোও তাঁর অসাধারণ ঈমান ও বি াসের শক্তিশালী সাক্ষী। তাঁর নিরপেক্ষ নিকটবর্তী ব্যক্তি ও আত্মীয়- স্বজনদের আকীদা ও বি াস হচ্ছে এই যে, তিনি একজন বি াসী মুসলমান ছিলেন। তাঁর বন্ধু- বান্ধব ও আত্মীয়- স্বজনদের মধ্য থেকে কোন ব্যক্তিই তাঁর ঈমান ও ইখলাসের স্বীকৃতি দেয়া ছাড়া আর কিছুই বলেন নি। এখন আমরা উপরিউক্ত তিন পদ্ধতিতে এ বিষয়টি পূর্ণরূপে অধ্যয়ন ও আলোচনা করব :

আবু তালিবের সাহিত্যকর্ম

আমরা তাঁর দীর্ঘ কবিতা ও কাসীদাসমূহ থেকে কিছু অংশ মনোনীত করেছি এবং বিষয়বস্তু স্পষ্ট বোধগম্য হবার জ   এগুলোর ব ানুবাদ নিচে পেশ করছি :

ليعلم خيارُ النّاس إنّ محمّدا نبي كموسى و المسيح بن مريم

أتانا بُهدى مثل ما أتيابه فكلّ بأمر الله يهدي و يعصم

" ভালো মানুষেরা সবাই জানুক যে, মুহাম্মদ
মূসা ও ঈসা ইবনে মরিযমের মতো নবী। এই দুই নবী যে আসমানী নূর (অর্থাৎ হেদায়েত) নিয়ে এসেছিলেন
ঠিক সেই নূর তিনিও আমাদের জ   আনয়ন করেছেন। কারণ সকল নবী- রাসূল মহান আল্লাহর নির্দেশে মানব জাতিকে
পথ প্রদর্শন করেন এবং তাদেরকে পাপ থেকে বিরত রাখেন। "

تمنّيتم أن تقتلوه و أنّما أمانيّكم هذى كأحلام نائم

نبيّ أتاه الوحي من عند ربّه و من قال لا يقرع بها سن نادم

" (হে কুরাইশ সর্দারগণ!) তোমরা তাঁকে হত্যা করতে চাও,
অথচ তোমাদের এ সব চিন্তা- ভাবনা ও আকাঙ্ক্ষা আসলে ঘুমন্ত ব্যক্তির অলীক স্বপ্নের মতো।
তিনি একজন নবী। তাঁর প্রভুর কাছ থেকে তাঁর কাছে ওহী এসেছে।
আর যে ব্যক্তি 'না' বলবে (অর্থাৎ এ বিষয়টি অস্বীকার করবে) সে আসলে অনুতাপ ও পরিতাপ করতঃ দাঁত দিয়ে নিজ আ ুলই দংশন করবে।"[৩৩৪]

ألم تعلموا أنّا وجدنا محمّدا رسولا كموسى خطّ في أوّل الكتب

و ان عليـــــــــه في العبـــــــــاد محبــــــــــة　　و لاحيـــــف فـــيمن خصـــه الله بالحـــبّ

“ (হে কুরাইশ!) তোমরা কি জান না যে, আমরা মুহাম্মদকে

মূসার মতো রাসূল হিসাবে পেয়েছি যাঁর কথা পূর্ববর্তী আসমানী গ্রন্থসমূহে বর্ণিত হয়েছে। মহান

আল্লাহর বান্দাগণ তাঁর প্রতি বিশেষ ভালোবাসা পোষণ করে।

মহান আল্লাহ্ যে ব্যক্তির ভালোবাসা অন্তঃকরণসমূহে স্থাপন করেছেন

তাঁর প্রতি অ　ায় ও অত্যাচার করা অনুচিত।”[৩৩৫]

و الله لـــــن يصـــــلوا إليـــــك بجمعهـــــم　　حـــــتّى اوســـــد في الـــــتراب دفينـــــا

فاصـــــدع بـــــأمرك مـــــا عليـــــك غضاضـــــة　　و أبشـــــر بـــــذاك و قـــــرّ منـــــك عيونـــــا

و دعـــــوتني و علمـــــت أنـــــك ناصـــــحي　　و لقـــــد دعـــــوت و كنـــــت ثمّ أمينـــــا

و لقـــــد علمـــــت أنّ ديـــــن محمّـــــد (ص)　　مـــــن خـــــير أديـــــان البريّـــــة دنيـــــا

“ মহান আল্লাহর শপথ, আমার মাটিতে শায়িত হওয়া পর্যন্ত

(আমার মৃত্যুবরণ করা পর্যন্ত) তারা (কুরাইশ) কখনই তোমার নাগাল পাবে না।

(আর আমি তোমাকে সাহায্য করা থেকে কখনই আমার হাত গুটিয়ে নেব না।)

তুমি যা প্রচার করার জ　আদিষ্ট হয়েছ তা স্পষ্ট ও প্রকাশ্যে প্রচার কর।

তোমার কোন ভয় নেই। সুসংবাদ প্রদান কর এবং নিজের চক্ষুকে শীতল কর।

তুমি আমাকে (তোমার ধর্মের প্রতি) আহবান করেছ

এবং আমি জানি যে, তুমি আমার সদুপদেশদানকারী

এবং দীন প্রচার করার ক্ষেত্রে তুমি সকল ধর্মের চেয়ে শ্রেষ্ঠ।”[৩৩৬]

أوتؤمنـــــوا بكتـــــاب منـــــزل عجـــــب　　علـــى نـــبيّ كموســـى او كـــذى النـــون

"অথবা তোমরা মূসা ও যূননূনের (ইউনুস) মতো নবীর ওপর অবতীর্ণ

আশ্চর্যজনক গ্রন্থ পবিত্র কোরআনে বি াস স্থাপন করবে।"[৩৩৭]

চয়নকৃত এ সব টুকরো কবিতা আসলে আবু তালিবের দীর্ঘ মনোজ্ঞ কাসীদাসমূহের একটি ক্ষুদ্র অংশ যা দ্ব্যর্থহীনভাবে ভ্রাতুষ্পুত্রের ধর্মের প্রতি হযরত আবু তালিবের অগাধ বি াস ও ঈমানের কথাই ব্যক্ত করে। আমরা এখানে হযরত আবু তালিব (রা.)- এর ঈমান ও বি াসের সাক্ষ্য-প্রমাণস্বরূপ এগুলো উল্লেখ করেছি।

সংক্ষেপে এ সব কবিতা এগুলোর রচয়িতার ঈমান ও নিষ্ঠা প্রমাণ করার জ   যথেষ্ট। এ সব কবিতা ও কাসীদার রচয়িতা যদি এমন এক ব্যক্তি হতেন সব ধরনের শত্রুতামূলক এবং সাম্প্রদায়িক বিষবাষ্প ও বিদ্বেষপূর্ণ পরিবেশের বাইরে যাঁর অবস্থান- তাহলে সবাই এক বাক্যে ঈমান ও ইসলাম ধর্ম গ্রহণের কথা স্বীকার করে নিত। কিন্তু যেহেতু এ সব কবিতা ও কাসীদার রচয়িতা আবু তালিব এবং উমাইয়্যা ও আব্বাসীয় প্রশাসন যন্ত্র ও রাজনৈতিক ধারার প্রচার মাধ্যমগুলো সব সময় আবু তালিবের বংশধরদের বিরুদ্ধে প্রচারণা চালাত সেহেতু একটি গোষ্ঠী চায় নি যে, হযরত আবু তালিবের এ ধরনের শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা প্রমাণিত হোক।

একদিকে তিনি হযরত আলী (আ.)- এর পিতা। আর উমাইয়্যা ও আব্বসীয় খলীফাদের প্রচার মাধ্যমগুলো সব সময় তাঁর বিরুদ্ধে প্রচারণা চালাত। কারণ তাঁর পিতার ঈমান ও ইসলাম ধর্ম গ্রহণের বিষয়টি তাঁর জ   অতি গুরুত্বপূর্ণ মর্যাদা বলে গণ্য হতো। অথচ খলীফাদের পূর্বপুরুষদের কাফির ও মুশরিক হওয়ার বিষয়টি ছিল তাদের সম্মান ও মর্যাদা হানিকর।

যা হোক এ সব কবিতা, কাসীদা এবং বাণী, কর্ম ও অবদান রাখা সত্ত্বেও একটি গোষ্ঠী আবু তালিব (রা.)- কে কাফির বলে আখ্যায়িত করার জ   উঠে- পড়ে লেগেছে, এমনকি তারা এতেও ক্ষান্ত হয় নি এবং দাবি করেছে যে, পবিত্র কোরআনে কিছু আয়াতও অবতীর্ণ হয়েছে যেগুলো থেকে আবু তালিবের কাফির হওয়ার বিষয়টি প্রতিপন্ন হয়।

আবু তালিবের ঈমান প্রমাণ করার দ্বিতীয় পদ্ধতি

দ্বিতীয় পদ্ধতিটি মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)- এর সাথে আবু তালিবের আচার- আচরণ এবং মহানবীকে রক্ষা করা ও তাঁর পথে তাঁর আত্মত্যাগ ও কোরবানীর প্রক্রিয়া ও ধরন। এ সব অবদানের প্রতিটি তাঁর (আবু তালিব) মানসিকতা, আত্মিক মনোবল এবং চিন্তাধারার বহিঃপ্রকাশকারী। কারণ আবু তালিব (রা.) এমন এক ব্যক্তি ছিলেন যিনি চাইতেন না তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র শিশু হযরত মুহাম্মদ (সা.) ভ দয় হয়ে থাক। সব ধরনের প্রতিবন্ধকতা ও সুযোগ- সুবিধার অভাব সত্ত্বেও তিনি নিজের সাথে তাঁকে শামে নিয়ে যাওয়ার কষ্ট স্বীকার করেছিলেন। নিজ ভ্রাতুষ্পুত্রের প্রতি হযরত আবু তালিবের ঈমান ও বি াসের মাত্রা এতটা গভীর ছিল যে, তিনি দুর্ভিক্ষ ও অনাবৃষ্টির সময় তাঁকে নিজের সাথে মুসাল্লায় নিয়ে গিয়েছিলেন এবং তাঁর উসীলায় তিনি মহান আল্লাহর কাছে রহমতের বৃষ্টি প্রার্থনা করেছিলেন।

হযরত আবু তালিব (রা.) মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)- এর জীবন রক্ষা করার জ চেষ্টার কোন ক্রটি করেন নি এবং হাত- পা গুটিয়ে বসে থাকেন নি। তিনি মক্কা নগরীর নেতৃত্ব ও প্রশাসনিক প্রধানের পদমর্যাদার ওপর পাহাড়- পর্বতে এবং গিরি- উপত্যকায় দীর্ঘ তিন বছরের অবরুদ্ধ জীবনকে প্রাধা দিয়েছিলেন। এ তিন বছরের শরণার্থী জীবন তাঁকে এতটা ক্লান্ত ও অবসাদগ্রস্ত করেছিল যে, তিনি এর ফলে শারীরিক সুস্থতা হারিয়ে ফেলেছিলেন। তাই অর্থনৈতিক অবরোধ তুলে নেয়া হলে নিজ গৃহে প্রত্যাবর্তন করার পর অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই তিনি ইন্তেকাল করেন।

মহানবী (সা.)- এর প্রতি তাঁর ঈমান ও বি াস এতটা দৃঢ় ও শক্তিশালী ছিল যে, তাঁর সকল সন্তান নিহত হয়েও যেন মহানবী জীবিত থাকেন এটিই তিনি চাইতেন এবং এতেই তিনি সন্তুষ্ট ছিলেন। তিনি আলীকে মহানবীর শয্যায় শোয়াতেন যাতে করে তাঁকে হত্যা করার কোন ষড়যন্ত্র করা হলে তা যেন কার্যকর না হয়। এর চেয়েও আরো উচ্চ ও মহান ছিল ঐ ঘটনা যে, একদিন তিনি

প্রতিশোধ গ্রহণের জ   সকল কুরাইশ নেতা ও সর্দারকে হত্যা করার জ   প্রস্তুত হয়েছিলেন। আর এর ফলশ্রুতিতে স্বাভাবিকভাবে বনি হাশিম গোত্রও সমূলে ধ্বংস হয়ে যেত।

মৃত্যুর সময় আবু তালিবের অসিয়ত

মৃত্যুর সময় তিনি তাঁর সন্তানদেরকে বলেছিলেন, ‘‘আমি মুহাম্মদের ব্যাপারে তোমাদেরকে অসিয়ত করছি। কারণ তিনি কুরাইশদের মধ্যে সবচেয়ে বি স্ত, আরবদের মধ্যে সবচেয়ে সত্যবাদী এবং সকল মানবীয় পূর্ণতা ও মহৎ গুণের অধিকারী। তিনি এমন এক ধর্ম আনয়ন করেছেন যার প্রতি জনগনের অন্তঃকরণসমূহ বি াস স্থাপন করেছে, কিন্তু কটাক্ষ, নিন্দা ও তিরস্কারের ভয়ে মুখে মুখে তারা এ ধর্মের বিরোধিতা এবং তা অস্বীকার করছে। আমি এখন দেখতে পাচ্ছি যে, আরবের দুর্বল ও অবহেলিত জনগণ তাঁকে সমর্থন এবং তাঁর প্রতি বি াস স্থাপন করছে। আর মুহাম্মদও তাদের সাহায্যে কুরাইশদের আধিপত্য ভেঙে দেয়ার জ উঠে দাঁড়িয়েছেন। তিনি কুরাইশ সর্দারদেরকে অপদস্থ ও তাদের বাড়িগুলোকে বিরান এবং আশ্রয়হীনদেরকে শক্তিশালী করেছেন।” এরপর তিনি নিম্নোক্ত বাক্যগুলোর মাধ্যমে তাঁর বক্তব্য শেষ করলেন,

كونوا له ولاة و لحزبه حماة، والله لا يسلك أحد سبيله إلا رشد و لا يأخذ رشد و لا يأخذ أحد بهداه إلّا سعد،
و لو كان لنفسي مدة و في احلي تأخير لكففت عنه الهزاهز، و لدافعت عنه الدوافع

“হে আমার আত্মীয়স্বজনগণ! মুহাম্মদের দলের বন্ধু ও সমর্থক হয়ে যাও। মহান আল্লাহর শপথ, যে কেউ তাঁর অনুসরণ করবে, তাঁর পথে চলবে, সে সুপথপ্রাপ্ত ও সৌভাগ্যমণ্ডিত হবে। আমার জীবন যদি অবশিষ্ট থাকত এবং আমার মৃত্যু যদি পিছিয়ে যেত তাহলে আমি তাঁর নিকট থেকে সব ধরনের বিপদাপদ ও তিক্ত ঘটনা প্রতিহত করতাম এবং তাঁকে রক্ষা করতাম।”[৩৩৮]

আমাদের কোন সন্দেহ নেই যে, তিনি তাঁর এ আশা- আকাঙ্ক্ষার ক্ষেত্রে সত্যবাদী ছিলেন। কারণ তাঁর দীর্ঘ দশ বছরের অবদান ও আত্মত্যাগ তাঁর বক্তব্য ও কথা সত্য হওয়ার সাক্ষ্য-প্রমাণস্বরূপ। তাঁর কথা ও বক্তব্যের সত্যতার সাক্ষ্যপ্রমাণ হচ্ছে (তাঁর) ঐ অ ীকার যা তিনি হযরত মুহাম্মদ (সা.)- কে তাঁর নবুওয়াতের সূচনালে দিয়েছিলেন। কারণ যে দিন হযরত

মুহাম্মদ তাঁর সকল চাচা ও নিকটাত্মীয়কে নিজ গৃহে একত্র করে তাদের সামনে ইসলাম ধর্ম উপস্থাপন করেছিলেন সে দিন হযরত আবু তালিব (রা.) তাঁকে বলেছিলেন,

أخرج ابن أخي فإنّك الرّفيع كعبا، و المنيع حزبا والأعلى أبا و الله لا يسلقك لسان إلّا سلقته ألسن حداد، واجتذبته سيوف حداد، و الله لتذلّنّ لك العرب ذلّ البهم لحاضنها

"হে আমার ভ্রাতুষ্পুত্র! তুমি (দৃঢ়ভাবে) দাঁড়াও। কারণ তুমি সুউচ্চ মাকাম ও মর্যাদার অধিকারী, তোমার দলই অত্যন্ত সম্মানিত দল। তুমি অত্যন্ত সম্মানিত পিতার সন্তান। মহান আল্লাহর শপথ, যখন তোমাকে কোন ক কষ্ট দেবে তখন অত্যন্ত ধারালো ক সমূহ তোমার পক্ষাবলম্বন করে সেই ক কেই আঘাতে জর্জরিত করে দেবে এবং ধারালো তরবারিগুলো তাদেরকে বধ করবে। মহান আল্লাহর শপথ, পশুপালকের কাছে পশুগুলো যেভাবে নত হয় ঠিক সেভাবে আরবগণ তোমার কাছে নতজানু হবে ও বশ্যতা স্বীকার করবে।"[৩৩৯]

সর্বশেষ পথ

হযরত আবু তালিবের ঈমান ও নিষ্ঠা সম্পর্কে তাঁর নিরপেক্ষ নিকটাত্মীয়দেরকে জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে সবচেয়ে উত্তম পন্থা। কারণ ঘরে যা ঘটে সে সম্পর্কে ঘরের অধিবাসীরাই সবচেয়ে বেশি জ্ঞাত।

১. যখন হযরত আলী (আ.) মহানবী (সা.)- কে হযরত আবু তালিবের মৃত্যু সংবাদ জানালেন তখন মহানবী খুব কেঁদেছিলেন এবং তিনি হযরত আলীকে হযরত আবু তালিবের লাশের গোসল, কাফন ও দাফনের নির্দেশ দিয়েছিলেন এবং মহান আল্লাহর কাছে তাঁর মাগফেরাত কামনা করেছিলেন।[৩৪০]

২. চতুর্থ ইমাম হযরত যয়নুল আবেদীন (আ.)- এর কাছে হযরত আবু তালিবের ঈমান প্রস কথা উঠলে তিনি বলেছিলেন, "আমি আশ্চর্যান্বিত হচ্ছি যে, মানুষ কেন তাঁর ঈমান ও ইখলাসের ব্যাপারে সন্দিহান অথচ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার পর কোন মুসলিম নারী কাফির স্বামীর বিবাহবন্ধন ও তত্ত্বাবধানে থাকতে পারবে না (অর্থাৎ তাদের বিবাহ বন্ধনই টুটে যাবে)। ফাতিমা বিনতে আসাদ 'আস সাবিকুনাল আউওয়ালুন ' - এর অন্তর্ভুক্ত এবং তিনি ঐ সব মহিলা ও নারীর

অন্তর্ভুক্ত যাঁরা অনেক আগে মহানবী (সা.)- এর প্রতি ঈমান এনেছিলেন। আর হযরত আবু তালিবের মৃত্যু পর্যন্ত এ মহিলা তাঁর সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন।

৩. ইমাম বাকির (আ.) বলতেন, ‘‘আবু তালিবের ঈমান ব লোকের ঈমানের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। আমীরুল মুমিনীন আলী (আ.) হযরত আবু তালিবের পক্ষ থেকে হ আদায় করার নির্দেশ দিতেন।[৩৪১]

৪. ইমাম সাদিক (আ.) বলেছেন, "হযরত আবু তালিব (রা.) ছিলেন আসহাবে কাহাফসদৃশ যাঁদের অন্তরে ঈমান ছিল এং যাঁরা বাহ্যত (মুখে) শিরকের বাণী উচ্চারণ করতেন। এ কারণেই তাঁরা দু'বার পুরস্কারপ্রাপ্ত হবেন (أسرّوا الإيمان و أظهروا الشّرك فأتاهم الله أجرهم مرّتين)।"[৩৪২]

শিয়া আলেমদের অভিমত

ইমামীয়াহ্ ও যায়েদীয়াহ্ আলেমগণ আহলে বাইতের অনুসরণ করে ঐকমত্য পোষণ করেছেন যে, হযরত আবু তালিব (রা.) ইসলামের সুমহান ও উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। যে দিন তিনি মৃত্যুবরণ করলেন সে দিন তাঁর অন্তর ইসলাম ও মুসলমানদের প্রতি বি াস ও নিষ্ঠার দ্বারা পরিপূর্ণ ছিল। তাঁর ঈমান ও নিষ্ঠার ব্যাপারে অনেক বই ও প্রবন্ধ লিখা হয়েছে। পূর্ববর্তী যুগগুলো থেকে এ পর্যন্ত হযরত আবু তালিব (রা.)- এর ঈমান প্রসে ১৮টি গ্রন্থ রচনা করা হয়েছে। এ ব্যাপারে অধিক অবগতির জ নাজাফ থেকে প্রকাশিত ‘আল গাদীর ’ গ্রন্থের ৭ম খণ্ডের ৪০২- ৪০৪ পৃষ্ঠা অধ্যয়ন করুন।

বাইশতম অধ্যায় : মিরাজ

রাত্রির অন্ধকার দিগন্তকে আচ্ছাদন করে রেখেছিল। চারিদিকে তখন বিরাজ করছিল নিস্তব্ধতা। সকল প্রাণী দিবসের ক্লান্তি দূর করার উদ্দেশ্যে নিদ্রার কোলে ঢলে পড়েছিল। তারা যেন প্রকৃতি-দর্শন হতে সীমিত সময়ের জ বিরত হয়ে পরবর্তী দিবসের কর্মব্যস্ততার জ শক্তি সঞ্চয় করছিল। স্বয়ং মহানবীও প্রকৃতিজগতের এ নিয়ম থেকে ব্যতিক্রম ছিলেন না। তিনিও তাঁর ওপর অর্পিত দায়িত্ব সম্পাদনের পর খেজুর পাতার বিছানায় গা এলিয়ে দিয়েছিলেন। হঠাৎ এক পরিচিত ক স্বর তাঁর কানে ভেসে আসল। এ ক প্রত্যাদেশ বহনকারী ফেরেশতা জিবরাইলের। তিনি তাঁকে বললেন, "আজ রাতে আপনার সামনে এক দীর্ঘ সফর রয়েছে। আপনি ঊর্ধ্বগামীযান বোরাকে আরোহণ করে বি র বিভিন্ন স্থানে পরিভ্রমণ করবেন। এ সফরে আমিও আপনার সহযাত্রী।"

মহানবী (সা.) তাঁর বোন উম্মে হানীর গৃহ হতে এ সফর শুরু করলেন। মহাশূ যান বোরাকে চেপে ফিলিস্তিনে অবস্থিত বায়তুল মোকাদ্দাসের উদ্দেশে যাত্রা করলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই সেখানে পৌঁছে মসজিদের নিকটবর্তী বিভিন্ন স্থান, যেমন ঈসা (আ.)-এর জন্মভূমি বেথেলহেম, অ া নবী-রাসূলের গৃহ ও স্মৃতিচিহ্নসমূহ পরিদর্শন করেন। কোন কোন স্থানে দু'রাকাত নামায পড়েন।

এরপর তাঁর দ্বিতীয় পর্যায়ের সফর শুরু হয়। এখান থেকেই ঊর্ধ্বজগতের উদ্দেশে যাত্রা করেন। তিনি গ্রহ-নক্ষত্র ও বি জগতের পরিচালনা ব্যবস্থা দেখেন, নবী ও ফেরেশতাদের সে কথোপকথন করেন, আল্লাহর রহমত ও আযাবের প্রতিকৃতি (বেহেশত ও দোযখ) লক্ষ্য করেন। বেহেশতবাসী ও দোযখবাসীদের বিভিন্ন স্তর নিকট থেকে দেখেন। সর্বোপরি বি জগতের ব্যাপকতা, এর গুপ্ত রহস্য এবং মহান আল্লাহর অসীম ক্ষমতা সম্পর্কে পূর্ণরূপে অবহিত হন। অতঃপর তাঁর গন্তব্যের শেষ স্থান 'সিদরাতুল মুনতাহা'য় পৌঁছেন এবং মহান আল্লাহর অসীমত্ব ও মহান মর্যাদাকে অনুভব করেন। এখানেই তাঁর ঊর্ধ্ব সফরের পরিসমাপ্তি ঘটে। পরে একই পথে

তিনি বায়তুল মোকাদ্দাসে ফিরে আসেন। বায়তুল মোকাদ্দাস থেকে মক্কায় ফেরার পথে কুরাইশ গোত্রের একটি কাফেলার সে   তাঁর দেখা হয়। তারা তাদের উট হারিয়ে ফেলেছিল এবং রাতের অন্ধকারে খুঁজছিল। তিনি তাদের রক্ষিত পাত্র থেকে কিছু পানি পান করে অবশিষ্ট পানি মাটিতে ছড়িয়ে দেন এবং পাত্রটি পুনরায় ঢেকে রাখেন। সুবহে সাদিকের পূর্বেই তিনি উম্মে হানীর গৃহে ফিরে আসেন। এ রাতের ঘটনাটি তিনি উম্মে হানীকেই প্রথম বলেন। পরবর্তী দিন সকালে কুরাইশদের সমাবেশে তিনি তাঁর এ সফরের ঘটনা বর্ণনা করেন। তাঁর এ আশ্চর্য সফরের ঘটনা- যা 'মিরাজ' নামে অভিহিত তা তাদের নিকট অসম্ভব বলে প্রতীয়মান হয়, কিন্তু ঘটনাটি লোকমুখে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে এবং কুরাইশদের ক্ষোভের উদ্রেক করে।

কুরাইশগণ তাদের প্রাচীন অভ্যাস অনুযায়ী তাঁকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে ও বলে, "এখানে অনেকেই আছে যারা বায়তুল মোকাদ্দাস দেখেছে। যদি তুমি সত্য বলে থাক তাহলে এর গঠন কাঠামোর বর্ণনা দাও।"তিনি শুধু বায়তুল মোকাদ্দাসের বৈশিষ্ট্যই বর্ণনা করলেন না, সে সাথে বায়তুল মোকাদ্দাস থেকে মক্কার মধ্যবর্তী স্থানে যে সকল ঘটনা ঘটেছে তা বর্ণনা করে বললেন, "আমি ফেরার পথে অমুক স্থানে অমুক গোত্রের কাফেলার সাথে দেখা হয়েছিল যারা তাদের উট হারিয়ে ফেলেছিল এবং আমি তাদের রক্ষিত পাত্র থেকে পানি পান করে পাত্রটি পুনরায় ঢেকে রাখি। অ স্থানে একদল লোকের সে   দেখা হয় যাদের উট ক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে গিয়ে সামনের পা ভেঙে ফেলেছিল।" কুরাইশরা খবর পেল একটি কাফেলা মক্কার নিকটবর্তী স্থানে পৌঁছেছে। একটি মেটে রঙের উট তাদের কাফেলার সম্মুখে রয়েছে। তারা রাগান্বিত হয়ে বলল, "তোমার কথার সত্যতা এখনই প্রমাণিত হবে।" কিছুক্ষণের মধ্যেই আবু সুফিয়ানসহ ঐ কাফেলার অগ্রগামী অংশ কাবা ঘরে পৌঁছল। তারা রাসূল (সা.) কর্তৃক বর্ণিত ঘটনাকে সত্যায়ন করল। উপরিউক্ত বর্ণনাটি তাফসীর ও হাদীস গ্রন্থসমূহের বর্ণনার সংক্ষিপ্ত রূপ। এ বিষয়ে বিস্তারিত জানার জ   'বিহারুল আনওয়ার' গ্রন্থের 'মিরাজ' অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

মিরাজের কোরআনী ভিত্তি

রাসূল (সা.)- এর মিরাজ কোরআনের দু'টি সূরায় স্পষ্টরূপে বর্ণিত হয়েছে। কোন কোন সূরায় এ বিষয়ে কিছুটা ইঁ িত দেয়া হয়েছে। আমরা এখানে সংক্ষিপ্ত আকারে এরূপ একটি আয়াতের অনুবাদ ও ব্যাখ্যা উপস্থাপন করছি। মহান আল্লাহ্ সূরা বনি ইসরাইলের প্রথম আয়াতে বলেছেন,

(سبحان الّذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصا الّذي باركنا حوله لنريه من ءاياتنا إنّه هو السّميع البصير)

"পরম পবিত্র ও মহিমাময় সত্তা তিনি, যিনি স্বীয় বান্দাকে রাত্রিবেলায় ভ্রমণ করিয়েছিলেন মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে আকসা পর্যন্ত- যার চারদিকে আমি পর্যাপ্ত বরকত দান করেছি যাতে আমি তাঁকে কুদরতের কিছু নিদর্শন দেখিয়ে দিই। নিশ্চয়ই তিনি পরম শ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা।"(সূরা ইসরা : ১)

উপরিউক্ত আয়াতের বাহ্যিক অর্থ থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো বোঝা যায় :

১.মহানবী (সা.) যে মানবীয় ক্ষমতা দ্বারা এ সফর করেন নি, বরং ঐশী শক্তির সাহায্যে স্বল্প সময়ে এ দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়েছিলেন তা বুঝানোর জ আয়াতটি سبحان الّذي(সুবহানাল্লাযি) দ্বারা অর্থাৎ মহান আল্লাহর ত্রুটি ও অপূর্ণতা থেকে পবিত্রতা ঘোষণার মাধ্যমে শুরু হয়েছে। শুধু তা- ই নয় মহান আল্লাহ্ এ যাত্রার উদগাতা হিসাবে নিজেকে উল্লেখ করে বলেছেন أسرى (আসরা) অর্থাৎ তিনিই এ পরিভ্রমণ করিয়েছেন যাতে কেউ মনে না করে যে, সাধারণভাবে প্রাকৃতিক নিয়মে তা সম্পন্ন হয়েছে, বরং এ সফরটি মহান সত্তা ও প্রতিপালকের বিশেষ ক্ষমতায় সম্পাদিত হয়েছে।

২. এ সফরটি রাত্রিতে সম্পাদিত হয়েছিল। তাই ليلا (লাইলা) শব্দটির পাশাপাশি أسرى (আসরা) শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে যা আরবগণ রাত্রিকালীন পরিভ্রমণের ক্ষেত্রে ব্যবহার করে থাকে।

৩. যদিও এ সফরের শুরু আবু তালিবের ক া উম্মে হানীর গৃহ থেকে হয়েছিল তদুপরি এ যাত্রার শুরুটি মসজিদুল হারাম বলে উল্লেখ করা হয়েছে। সম্ভবত আরবরা যেহেতু সমগ্র মক্কাকে 'হারাম' বলে অভিহিত করে থাকে সেহেতু সমগ্র মক্কাই মসজিদে হারামের অন্তর্ভুক্ত বলে ধরা হয়েছে।

সুতরাং তিনি মসজিদুল হারাম থেকে পরিভ্রমণ করিয়েছেন কথাটি সঠিক। অবশ্য কোন কোন হাদীসের বর্ণনায় মিরাজ মসজিদে হারাম থেকেই হয়েছিল বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

এ আয়াতটিতে যদিও সফরের শুরু মসজিদে হারাম হতে এবং পরিসমাপ্তি মসজিদে আকসা উল্লেখ করা হয়েছে তদুপরি তা নবী (সা.)- এর ঊর্ধ্বজগতের পরিভ্রমণ সম্পর্কিত বর্ণনার পরিপন্থী নয়। কারণ এ আয়াতে এই পরিসীমার মধ্যে সফরের বর্ণনা থাকলেও সূরা নাজমের আয়াতসমূহে ঊর্ধ্বজগতের ভ্রমণের বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে।

৪. মহানবী (সা.)- এর এ পরিভ্রমণ দেহ ও আত্মার সমন্বয়ে হয়েছিল। কখনই তা শুধু আত্মিক ছিল না। এ কারণেই এ আয়াতে بعبده (বিআবদিহি) বলা হয়েছে যা দেহ ও আত্মার সমন্বিত রূপের প্রতি ইঁ ত করে। মিরাজ যদি শুধু আত্মিক হতো তবে আল্লাহ্ বলতেন بروحه (বিরূউহিহি)।

৫. এ মহাসফরের উদ্দেশ্য ছিল অস্তিত্বজগতের বিশালতা ও এর উল্লেখযোগ্য নিদর্শনসমূহ রাসূলকে দেখানো।

অ যে সূরাটি মিরাজের ঘটনাকে স্পষ্টরূপে বর্ণনা করেছে তা হলো সূরা আন্ নাজম। এ সূরার নিম্নোক্ত আয়াতটির শানে নুযূল হলো যখন নবী (সা.) কুরাইশদের বললেন, 'আমি প্রত্যাদেশ বহনকারী ফেরেশতাকে তাঁর প্রকৃত চেহারায় প্রথম ওহী অবতীর্ণ হওয়ার সময় দেখেছিলাম ', তখন কুরাইশরা এ কথায় তাঁর স বিতর্কে লিপ্ত হয়। কোরআন তাদের জবাবে বলে,

(أفتما رونه على ما يرى و لقد راه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنّة المأوى إذ يغشى السّدرة ما يغشى ما زاغ البصر و ما طغى لقد رأى من آيات ربّه الكبرى)

"রাসূল যা দেখেছেন তোমরা কেন সে বিষয়ে তাঁর স বিতর্ক কর? তিনি আরেকবার তাঁকে (ফেরেশতা) দেখেছিলেন সিদরাতুল মুনতাহার নিকট যা সৎকর্মশীলদের জ নির্ধারিত বেহেশতের সন্নিকটে অবস্থিত। তখন সিদরাতুল মুনতাহাকে যা আচ্ছাদিত করার ছিল পূর্ণরূপে আচ্ছাদিত করে রেখেছিল। তাঁর দৃষ্টি কোন ভুল করে নি এবং কোনরূপ বিচ্যুতও হয় নি এবং তিনি তাঁর প্রতিপালকের মহান নিদর্শনের কিয়দংশ প্রত্যক্ষ করেন।"

মিরাজ সম্পর্কিত হাদীসসমূহ

মুফাসসির ও মুহাদ্দিসগণ রাসূল (সা.)- এর মিরাজ ও তাতে তিনি কি দেখেছেন সে সম্পর্কে প্রচুর হাদীস বর্ণনা করেছেন। এর সবগুলোই অকাট্য ও নির্ভুল নয়। বিশিষ্ট শিয়া মুফাসসির আল্লামা তাবারসী এ সম্পর্কিত হাদীসসমূহকে চার ভাগে ভাগ করেছেন[৩৪৩] :

১. অকাট্য হাদীসসমূহ যাতে মিরাজ সংঘটিত হওয়ার বিষয়টি কিছু বিশেষত্বসহ বর্ণিত হয়েছে।

২. যে সকল রেওয়ায়েত সহীহ হিসাবে বর্ণিত হয়েছে, তবে অকাট্য নয় এবং বুদ্ধিবৃত্তি ও প্রজ্ঞার পরিপন্থীও নয়। যেমন ঊর্ধ্বাকাশে পরিভ্রমণ, বেহেশত- দোযখ দর্শন এবং নবিগণের আত্মার সংে কথোপকথন।

৩. ঐ সকল হাদীস যেগুলোর বাহ্যিক অর্থ গ্রহণীয় নয়, তবে তা ব্যাখ্যাসাপেক্ষ। যেমন মিরাজের রাত্রিতে বেহেশতবাসী ও দোযখবাসীদের সংে নবী করীম (সা.)- এর কথোপকথন। একে ব্যাখ্যা করে বলতে হয় তিনি তাদের অভ্যন্তরীণ আকৃতি ও বৈশিষ্ট্যের প্রতিকৃতির সংে কথা বলেছেন।

৪. এ সম্পর্কে মিথ্যাবাদী বর্ণনাকারীরা যে সকল জাল হাদীস তৈরি করেছে। যেমন কোন বর্ণনায় এ সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, রাসূল (সা.) আল্লাহর পাশে গিয়ে বসেন এবং তাঁর কলমের খসখস শব্দ শুনতে পান।

মিরাজ কখন সংঘটিত হয়েছিল

যদিও মিরাজের ঘটনাটি একটি ঐতিহাসিক ও অলৌকিক ঘটনা হিসাবে স্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ হওয়া বাঞ্ছনীয় ছিল, তদুপরি এ বিষয়ে মতানৈক্য রয়েছে। মতানৈক্যের অ তম বিষয় ছিল এ ঘটনার সময়কাল নিয়ে। ইসলামের দু'জন প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ইবনে ইসহাক ও হিশাম এ ঘটনাটি নবুওয়াতের দশম বছরে সংঘটিত হয়েছিল বলে উল্লেখ করেছেন। ঐতিহাসিক বায়হাকীর মতে এ ঘটনাটি নবুওয়াতের দ্বাদশ বর্ষে সংঘটিত হয়েছিল। ঐতিহাসিকদের কেউ কেউ এ ঘটনাকে নবুওয়াতের প্রথম দিকের, আবার কেউ কেউ মাঝামাঝি সময়ের বলে উল্লেখ করেছেন। অনেক ঐতিহাসিক এ মতগুলোকে সমন্বিত করার উদ্দেশ্যে রাসূল (সা.)- এর মিরাজ একাধিকবার সংঘটিত হয়েছে বলে মত প্রকাশ করেছেন। কিন্তু আমার মনে হয়, যে মিরাজে প্রাত্যহিক নামাযসমূহ ফরজ করা হয় তা আবু তালিবের মৃত্যুর বছর অর্থাৎ নবুওয়াতের দশম বর্ষে সংঘটিত হয়েছিল। কারণ ইতিহাস ও হাদীস গ্রন্থসমূহ থেকে নিশ্চিতভাবে জানা যায় যে, মিরাজের রাত্রিতে নবীর উম্মতের ওপর পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরজ করা হয়েছে। তদুপরি ইতিহাস হতে জানা যায় আবু তালিবের মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত নামায ফরজ করা হয় নি। কারণ তাঁর মৃত্যুর সময় কুরাইশ প্রধানগণ তাঁর নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রের স তাদের মীমাংসা করিয়ে দিতে বলে যাতে করে নবী (সা.) তাঁর দাওয়াতী কর্ম থেকে নিবৃত্ত হন। নবী (সা.) ঐ বৈঠকে কুরাইশ প্রধানদের উদ্দেশে বলেন, "আমি তোমাদের নিকট থেকে একটি জিনিসই শুধু চাই। আর তা হলো :

تقولون لا إله إلّا الله و تخلعون ما تعبدون من دونه

"তোমরা এ সাক্ষ্য দাও যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন উপাস্য নেই এবং তিনি ব্যতীত অ কিছুর উপাসনা করা থেকে বিরত হও।"[৩৪৪]

তিনি এখানে এ বিষয়ে তাদের মৌখিক স্বীকৃতি আদায়েরই চেষ্টা করেছেন এবং তা- ই যথেষ্ট মনে করেছেন। এটি তখনও নামায ফরজ না হওয়ার পক্ষে দলিল। কারণ শুধু এ ঈমান ব্যক্তির মুক্তির

জ   যথেষ্ট নয় যদি নামাযের মতো অপরিহার্য কর্ম এর সং যুক্ত না হয়ে থাকে। কিন্তু কেন রাসূল (সা.) নিজ নবুওয়াতের স্বীকৃতির বিষয় উপস্থাপন করেন নি? এ প্রশ্নের জবাবে বলা যায় নবীর নির্দেশে আল্লাহর একত্বের স্বীকৃতি তাঁর রিসালাতের স্বীকৃতিও বটে। অর্থাৎ আল্লাহর একত্বকে স্বীকার করে নেয়া এ ক্ষেত্রে তাওহীদ ও রিসালাতকে এক সং স্বীকার করে নেয়ারই শামিল।

তদুপরি ঐতিহাসিকগণ হিজরতের কিছু পূর্বে যে সকল ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করেছে, যেমন তোফাইল ইবনে আমর দুসীর ইসলাম গ্রহণের ঘটনার যে বিবরণ দিয়েছেন তাতে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) শুধু শাহাদাতাইনের শিক্ষাই তাদের দিয়েছেন- নামাজের বিষয়ে কিছু বলেন নি। মিরাজের ঘটনাটি যে হিজরতের কিছু দিন পূর্বে হয়েছিল এটি তার অ   তম প্রমাণ।

যে সকল ব্যক্তি মিরাজ নবুওয়াতের দশম বর্ষের পূর্বে হয়েছিল বলেছেন তাঁরা সঠিক বলেন নি। কারণ রাসূল (সা.) নবুওয়াতের অষ্টম হতে দশম বর্ষে ‘শেবে আবি তালিব ’ - এ (আবু তালিবের উপত্যকায়) অবস্থান করছিলেন। তাই মুসলমানদের অবস্থা সে সময় বেশ সঙিন ছিল এবং নামাযের মতো গুরুদায়িত্ব কাঁধে নেয়া তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। নবুওয়াতের অষ্টম বছরের পূর্বেও কুরাইশদের চাপে মুসলমানদের অবস্থা সংকটজনক ছিল এবং তাদের সংখ্যাও ছিল স্বল্প। যেহেতু তখনও ঈমানের আলো ও এর মৌল শিক্ষা লক্ষণীয় সংখ্যক ব্যক্তির মাঝে প্রস্ফুটিত হয় নি সেহেতু নামাযের বিষয়টি তাদের ওপর অতিরিক্ত চাপ সৃষ্টি করত।

কোন কোন হাদীসে যে এসেছে হযরত আলী (আ.) হিজরতের তিন বছর পূর্ব হতেই রাসূলের সং নামায পড়েছেন সেই নামায নির্দিষ্ট শর্তাধীন ও অপরিহার্য নামায ছিল না, বরং শর্তহীন বিশেষ নামায ছিল[৩৪৫] ; সম্ভবত সেগুলো মুস্তাহাব নামায ছিল।

মহানবী (সা.)- এর মিরাজ কি দৈহিক ছিল?

মহানবী (সা.)- এর মিরাজের ধরন কি ছিল- দৈহিক না আত্মিক তা নিয়ে বিভিন্ন মত রয়েছে। যদিও কোরআনের আয়াত ও হাদীসসমূহ স্পষ্টভাবে রাসূলের মিরাজ দৈহিক ছিল বলে উল্লেখ করেছে[৩৪৬] তদুপরি সাধারণ লোকদের চিন্তাপ্রসূত যুক্তিসমূহ এ ক্ষেত্রে কিছু সমস্যা সৃষ্টি করেছে ও এর ব্যাখ্যা দিতে ব্যর্থ হয়ে মিরাজ আত্মিকভাবে হয়েছে বলে মনে করেছে। তাদের মতে শুধু নবীর আত্মাই অ জগতে ভ্রমণ করেছে এবং পরিভ্রমণশেষে তাঁর দেহে ফিরে এসেছে। কেউ কেউ আবার আরো বাড়িয়ে বলেছেন, রাসূলের মিরাজ স্বপ্নযোগে হয়েছিল এবং তিনি স্বপ্নে এ পরিভ্রমণ সম্পন্ন করেছিলেন।

শেষোক্ত দৃষ্টিভি টি সত্য থেকে এতটা দূরে যে, এটি একটি মত হিসাবে উল্লেখের যোগ্যতা রাখে না। কারণ নবীর মিরাজ দৈহিক ছিল বলেই কুরাইশগণ এ দীর্ঘ পথ এক রাত্রিতে পাড়ি দেয়া সম্ভব নয় ভেবেই নবীর দাবিতে ক্ষুব্ধ হয়েছিল ও তাঁকে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করেছিল। মিরাজের বিষয়টি দৈহিক হওয়ার কারণেই কুরাইশদের সভাসমূহে মুখে মুখে তা ঘুরছিল। যদি মিরাজ স্বপ্নযোগে হতো তাহলে কুরাইশরা তা মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে সচেষ্ট হতো না। যদি রাসূল (সা.) বলতেন যে, তিনি ঘুমের মধ্যে এমন স্বপ্ন দেখেছেন তাহলে তা বিতর্কের বিষয় হতো না। কারণ স্বপ্নে অনেক অসম্ভব বিষয়ও সম্ভব হয়ে থাকে এবং এতে বিতর্কের কিছু নেই। এরূপ ক্ষেত্রে বিষয়টিরও তেমন মূল্য থাকে না। তদুপরি আফসোসের বিষয় হলো কোন কোন মুসলিম মনীষী, যেমন মিশরীয় লেখক ফরিদ ওয়াজদী ও অ া রা এ মতকে গ্রহণ করে তা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ভিত্তিহীন সকল যুক্তি উপস্থাপন করেছেন।[৩৪৭]

আত্মিক মিরাজ কী?

যে সকল ব্যক্তি দৈহিক মিরাজ সংঘটিত হওয়ার প্রতিবন্ধকতাসমূহের জবাব দানে ব্যর্থ হয়েছেন তাঁরা মিরাজ সম্পর্কিত আয়াত ও রেওয়ায়েতসমূহকে ভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করে মিরাজ আত্মিকভাবে হয়েছিল বলে প্রমাণ করতে সচেষ্ট হয়েছেন।

আত্মিক মিরাজের অর্থ হলো আল্লাহর সৃষ্টিতে গভীর চিন্তা, তাঁর সৌন্দর্য ও শক্তিমত্তার স্মরণে ম হওয়ার মাধ্যমে দুনিয়া ও বস্তুসংশ্লিষ্টতা থেকে মুক্ত হয়ে আত্মিকভাবে বিভিন্ন স্তর অতিক্রমের পর ষ্টার বিশেষ নৈকট্য লাভ- যা বর্ণনাতীত।

আত্মিক মিরাজের কথা বললেই আল্লাহর মহত্ত্ব ও তাঁর সৃষ্টিজগতের বিশালতার বিষয়ে চিন্তার মাধ্যমে উপরিউক্ত পর্যায়ে পৌঁছানো বুঝালে নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, এ মর্যাদা শুধু রাসূল (সা.)- এর জ নির্দিষ্ট নয়, বরং অধিকাংশ নবী এবং পবিত্র দয়ের অধিকারী আল্লাহর অনেক ওলীই তা অর্জনে সক্ষম হয়েছিলেন। কিন্তু আমরা জানি মিরাজকে আল্লাহপাক রাসূলের একটি বিশেষত্ব বলে উল্লেখ করেছেন যা অ দের জ প্রযোজ্য নয়। তা ছাড়া পূর্বোক্ত আত্মিক নৈকট্যের বিষয়টি নবী (সা.)- এর জ প্রতি রাত্রেই অর্জিত হতো [৩৪৮], অথচ মিরাজের ঘটনাটি একটি বিশেষ রাত্রির সে সম্পর্কিত।

যে বিষয়টি এ ব্যক্তিবর্গকে এরূপ চিন্তায় ম করেছে তা হলো গ্রীক জ্যোতির্বিদ টলেমীর তত্ত্ব যা দু'হাজার বছরের অধিক সময় ধরে প্রাচ্যে ও পাশ্চাত্যে প্রতিষ্ঠিত ও ব ল প্রচারিত ছিল এবং এ বিষয়ে অনেক গ্রন্থ রচিত হয়েছে। তাঁর মতে বি দু'ভাগে বিভক্ত : পার্থিব ও ঊর্ধ্বজগৎ। পার্থিবজগৎ চারটি উপাদানে গঠিত : পানি, মাটি, বায়ু ও অি । প্রথম যে উপাদানের সমাহার আমাদের চোখে পড়ে তা হলো স্থলভাগ এবং এটি বি র কেন্দ্র। এর পরবর্তী স্তরে রয়েছে জলভাগ যা স্থলভাগকে ঘিরে রেখেছে এবং তৃতীয় স্তরে জলভাগকে ঘিরে রেখেছে বায়ুর স্তর। পার্থিব জগতের শেষ ও চতুর্থ স্তরে রয়েছে অি র স্তর যা বায়ুজগতকে আবৃত করে রেখেছে। বায়ুজগৎ পার্থিবজগতের সর্বশেষ স্তর। এরপর থেকে ঊর্ধ্বজগতের শুরু। ঊর্ধ্বজগৎ নয়টি স্তরের

সমন্বয়ে গঠিত এবং এ স্তরসমূহ পিঁয়াজের ায় পরস্পর অবিচ্ছিন্নভাবে সংযুক্ত। কোন বস্তুই এ স্তরসমূহ বিদীর্ণ করতে সক্ষম নয়। কারণ এতে সমগ্র ঊর্ধ্বজগতের উপাদানসমূহ বিক্ষিপ্ত ও ধ্বংস হয়ে যাবে।

মিরাজ যদি দৈহিক হয়ে থাকে তাহলে এর অর্থ নবী (সা.) বি র কেন্দ্র থেকে সরাসরি ঊর্ধ্ব দিকে পার্থিবজগতের চারটি স্তর অতিক্রম করে ঊর্ধ্বজগতে পৌঁছেছেন এবং ঊর্ধ্বজগতের স্তরসমূহ একের পর এক ছিন্ন করে গন্তব্যে পৌঁছেছেন। কিন্তু টলেমীর তত্ত্ব অনুসারে তা সম্ভব নয়। কারণ তাহলে সমগ্র ঊর্ধ্বজগতই ধ্বংস হয়ে যেত। এর ভিত্তিতেই তাঁরা মহানবী (সা.)- এর দৈহিক মিরাজকে অস্বীকার করে তা আত্মিক ছিল বলে ধরে নিয়েছেন।

উত্তর

উপরিউক্ত মতটি গ্রহণযোগ্য হতো যদি টলেমীর তত্ত্বটি আজও বিজ্ঞানশাস্ত্রে গ্রহণীয় একটি মতবাদ বলে পরিগণিত হতো। সে ক্ষেত্রে তাঁরা তাঁদের এ ভ্রান্ত মতের ওপর নির্ভর করে কোরআনের এ মহাসত্যের বিষয়ে সন্দেহ পোষণ করে ভিন্ন ব্যাখ্যার কথা ভাবতে পারতেন। কিন্তু বর্তমানে এ তত্ত্বটি ভুল প্রমাণিত হয়েছে এবং জ্যোতির্বিজ্ঞানের গ্রন্থে তা একটি তত্ত্ব হিসাবে শুধু লিপিবদ্ধই রয়েছে। বিশেষত বর্তমানে উদ্ভাবিত শক্তিশালী টেলিস্কোপ যন্ত্রসমূহ যখন সূক্ষ্মভাবে গ্রহ- নক্ষত্রসমূহকে পর্যবেক্ষণ করছে, অ্যাপোলো ও লুনার মতো মহাশূ যানসমূহ চন্দ্রপৃষ্ঠে অবতরণ করেছে, ম ল, শনি প্রভৃতি গ্রহের তথ্য জানার জ ভয়েজারের মতো মহাশূ যান সৌরজগতে ঘুরে ফিরছে তখন এরূপ ভ্রান্ত তত্ত্বের পেছনে ছোটা অযৌক্তিক। তাই বর্তমানে টলেমীর কল্পনাপ্রসূত তত্ত্বের কোন মূল্য নেই।

সুরহীন সংগীত

শেখ আহমদ এহসায়ী (‘শাইখীয়া’[৩৪৯] নামে প্রসিদ্ধ বাতিল ফের্কার নেতা) তাঁর ‘কাতিফিয়া ’ নামক গ্রন্থে মিরাজের ভিন্ন এক ব্যাখ্যা উপস্থাপনের মাধ্যমে দৈহিক ও আত্মিক মিরাজে বি াসী ভিন্ন দু’দলকেই সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করেছেন। তিনি বলেছেন, মহানবী (সা.) বারযাখীরূপে (অর্থাৎ ঘুমন্ত ব্যক্তি যেমন স্বপ্নে সকল কাজ করে থাকে সেরূপে) মিরাজ সম্পন্ন করেছেন। এতে তিনি

মনে করেছেন যে, দৈহিক মিরাজের পক্ষাবলম্বনকারীদের যেমন সন্তুষ্ট করতে পেরেছেন (যেহেতু মিরাজে নবীর দৈহিক উপস্থিতিও প্রমাণিত হয়েছে) তেমনি ঊর্ধ্বজগতে প্রবেশের অসুবিধাসমূহও দূরীভূত করতে সক্ষম হয়েছেন। কারণ বারযাখী দেহের ঊর্ধ্বজগৎ অতিক্রমের ফলে তা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না।[৩৫০]

কুসংস্কারমুক্ত ও সত্যান্বেষী ব্যক্তিগণ নিঃসন্দেহে স্বীকার করবেন এ মতটিও পূর্বোক্ত মতের ায় (আত্মিকভাবে মিরাজ সংঘটিত হওয়া) ভিত্তিহীন ও কোরাআন- হাদীসের পরিপন্থী। কারণ মিরাজ সম্পর্কিত কোরআনের আয়াতটি যে কোন আরবী ভাষাবিদকে দিলে তিনি বলবেন, যেহেতু আয়াতটিতে عبد শব্দটি ব্যব ত হয়েছে তা মানুষের দেহে বিদ্যমান সকল উপাদানের সমন্বয়ে গঠিত সত্তাকে বুঝায়। কখনই তা 'হোরকুলায়ী ' দেহ নয়। কারণ এমন নামের সত্তার সে আরবরা পরিচিত ছিল না, অথচ তাদের বুঝানোর উদ্দেশ্যেই সূরা বনি ইসরাইলে عبد (আবদ) শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে।

যে বিষয়টি এ মতের প্রবক্তাকে এরূপ ধারণা পোষণে বাধ্য করেছে তা বি জগৎ সম্পর্কে প্রাচীন গ্রীক কল্পনাপ্রসূত উপসিদ্ধান্ত) Hypothesis (ব্যতীত অ কিছু নয়। বর্তমানে বি র সকল জ্যোতির্বিদই এ মতকে অগ্রহণযোগ্য বলে মনে করেন। তাই এমতাবস্থায় এ মতের অন্ধ অনুসরণ আমাদের জ কাঙ্ক্ষিত নয়। পূর্বে যদিও কেউ অজ্ঞতাবশত এ মতকে সমর্থন করে থাকেন বর্তমানে তা করা বুদ্ধিবৃত্তিক হবে না। কোনক্রমেই এমন উপসিদ্ধান্ত-যা বিজ্ঞানও অযৌক্তিক মনে করে তার ভিত্তিতে কোরআনের আয়াতকে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা বৈধ নয়।

মিরাজ ও বর্তমানের বৈজ্ঞানিক তত্ত্বসমূহ

কেউ কেউ মনে করেছেন, বর্তমানের বিজ্ঞান ও এর তত্ত্বসমূহ রাসূল (সা.)- এর মিরাজের সং সংগতিশীল নয়। কারণ :

১. বর্তমানের বিজ্ঞান বলে, ভূপৃষ্ঠ থেকে কোন বস্তুকে ঊর্ধ্বে যেতে হলে পৃথিবীর অভিকর্ষ বলকে অতিক্রম করতে হয়। যদি কোন বলকে ঊর্ধ্বে ছোড়া হয় তাহলে অভিকর্ষ বলের কারণে তা ভূপৃষ্ঠে ফিরে আসে। বলকে যত জোরেই নিক্ষেপ করা হোক না কেন এরূপ হয়ে থাকে। যদি বল তার গতিকে ঊর্ধ্বদিকে অব্যাহত রাখতে চায় তবে তাকে অভিকর্ষ বল অতিক্রম করতে হবে এবং এ লক্ষ্যে বলকে ২৫০০০ মাইল/ঘণ্টা গতিতে ছুঁড়তে হবে।

তাই মহানবী (সা.)- কে মিরাজে ঐ গতিতে যাত্রা করতে হয়েছে ফলে তাঁর দেহে ভরশূ তার সৃষ্টি হয়েছে। দ্বিতীয়ত এখানে প্রশ্ন আসে যে, তিনি কিরূপে কোন উপযোগী বাহন ব্যতিরেকে এ গতিতে যাত্রায় সক্ষম হলেন?

২. ভূমি হতে কয়েক কিলোমিটার ওপর হতে াস গ্রহণের উপযোগী বায়ু নেই। অর্থাৎ এর ঊর্ধ্বে যত ওপরে ওঠা হবে বায়ু ততই সূক্ষ্ম ও পাতলা হয়ে যাবে। ফলে াস- প্র াস কার্য সম্পাদন সম্ভব নয়। আরো ঊর্ধ্বে একেবারেই বায়ুর অস্তিত্ব নেই। তাই নবীর ঊর্ধ্বাকাশ ভ্রমণ অক্সিজেনের অভাবজনিত সমস্যার কারণে সম্ভব নয়।

৩. আকাশের সকল উল্কা ও ক্ষতিকর রশ্মি পৃথিবীতে পৌঁছলে সকল কিছু ধ্বংস করে ফেলত। কিন্তু সেগুলো হয় ঊর্ধ্ব বায়ুমণ্ডলে গোলাকার রূপ ধারণ করে ধরিত্রীর চারিদিকে ঘূর্ণায়মান থাকে নতুবা একটি স্তরে বাধাপ্রাপ্ত হয়। এ স্তরটি ধরিত্রীর রক্ষক আবরণরূপে কাজ করে। রাসূল (সা.) এ স্তর ভেদ করে উল্কাপিণ্ড ও ক্ষতিকর রশ্মিসমূহ থেকে কিভাবে নিজেকে সংরক্ষণে সক্ষম হয়েছেন?

৪. বায়ুচাপ মানুষের জীবন নিয়ন্ত্রণে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। মানুষ নির্দিষ্ট বায়ুচাপে জীবন ধারণে সক্ষম যা ঊর্ধ্বলোকে অনুপস্থিত।

৫. মহানবী (সা.)- এর উর্ধ্ব যাত্রার গতি নিঃসন্দেহে আলোর গতি অপেক্ষা বেশি ছিল। বর্তমানে প্রমাণিত হয়েছে কোন বস্তুই আলোর গতি[৩৫১] অপেক্ষা অধিক গতিসম্পন্ন হতে পারে না। তাই আলোর গতি থেকেও তগতিতে যাত্রা করে নবী (সা.) কিরূপে জীবিত থাকতে পারেন?

আমাদের উত্তর

যদি আমরা প্রাকৃতিক নিয়মকে সমস্যা বলে ধরি তবে এরূপ সমস্যার কোন সীমা নেই। আমরা এ প্রাকৃতিক নিয়মের বাধা দ্বারা কি বুঝাতে চাচ্ছি? আমরা কি এ প্রাকৃতিক নিয়মকে অতিক্রমের বিষয়টিকে অসম্ভব বলে বিবেচনা করব এবং বলব যে, এ নিয়মসমূহের লঙ্ঘন সত্তাগতভাবে অসম্ভব। অবশ্যই না। কারণ বর্তমানের নভোবিজ্ঞানীরা এ বিষয়টিকে সম্ভব বলে প্রমাণে সক্ষম হয়েছেন। ১৯৫৭ সালে মহাশূ যান স্পুটনিক নিক্ষেপের মাধ্যমে অভিকর্ষ বলকে যে অতিক্রম করা সম্ভব তা প্রমাণিত হয়েছে। কৃত্রিম উপগ্রহ ও নভোযানে চড়ে মহাশূ পাড়ি দিয়ে মানুষ প্রমাণ করেছে মহাশূ পরিভ্রমণের প্রতিবন্ধকতাসমূহ বিজ্ঞানের কল্যাণে দূর করা সম্ভব। মানুষ তার জ্ঞানের দ্বারা অক্সিজেনের শূ তা, ক্ষতিকর রশ্মি, বায়ুচাপ ও অ া সমস্যা দূরীভূত করতে সক্ষম। বর্তমানে নভোবিজ্ঞানের বিস্তৃতির ফলে বিজ্ঞানীরা আশা করছেন খুব শীঘ্রই তাঁরা সৌরজগতের অ গ্রহেও অবতরণ ও ভ্রমণ করতে পারবেন।[৩৫২]

বিজ্ঞানের এ অভিযাত্রা প্রমাণ করেছে উর্ধ্ব যাত্রার বিষয়টি অসম্ভাব্যের পর্যায়ে পড়ে না। তবে যদি নবীর মিরাজ এরূপ বৈজ্ঞানিক উপকরণের অনুপস্থিতিতে কিরূপে সম্ভব হয়েছিল সে প্রশ্ন করা হয়, তাহলে উত্তরে আমরা বলব পূর্বে নবিগণের মুজিযা বিষয়ে, বিশেষত আবাবীল পাখির দ্বারা আবরাহার হস্তীবাহিনী ধ্বংসের আলোচনায় ঐশী সাহায্যে অলৌকিক ঘটনা সংঘটনের যে বিবরণ আমরা দিয়েছি তা হতে বিষয়টি স্পষ্ট হবে বলে আশা করি। যে কাজগুলো মানুষ তার জ্ঞান দ্বারা উদ্ভাবিত বৈজ্ঞানিক সরঞ্জামাদি দ্বারা সম্পাদন করে, নবিগণ তাঁদের প্রতিপালকের বিশেষ অনুগ্রহে বাহ্যিক উপকরণের সহযোগিতা ছাড়াই তা সম্পাদনে সক্ষম।

নবী (সা.) তাঁর প্রতিপালকের বিশেষ অনুগ্রহে মিরাজ সম্পন্ন করেছেন। মহান আল্লাহ্ সমগ্র অস্তিত্বজগতের অধিপতি এবং এ বি জগতের শৃঙ্খলা বিধানকারী। তিনিই এ পৃথিবীকে অভিকর্ষ

বল দ্বারা সৃষ্টি করেছেন, বায়ুমণ্ডলের স্তরসমূহের বি াস করেছেন এবং মহাশূ বিভিন্ন রশ্মির বিকিরণ ঘটিয়েছেন। তাই তিনি যখন চান তখনই এগুলোর ক্রিয়াশক্তির বিলোপ সাধনে সক্ষম। যখন মহানবী (সা.)- এর এ ঐতিহাসিক সফর ষ্টার বিশেষ অনুগ্রহের অধীনে সম্পন্ন হবে তখন তাঁর অসীম ক্ষমতার নিকট প্রাকৃতিক সকল নিয়ম আত্মসমর্পণ করবে এটিই স্বাভাবিক। কারণ এ সবই তাঁর ক্ষমতার অধীন। তাই তিনি তাঁর মনোনীত রাসূলকে পৃথিবী থেকে ঊর্ধ্বে নেয়ার উদ্দেশ্যে যদি পৃথিবীর অভিকর্ষ বলকে রহিত ও তাঁকে নিরাপদ রাখার লক্ষ্যে ক্ষতিকর উপাদানসমূহের ক্ষমতার অবলুপ্তি ঘটান তাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। যে আল্লাহ্ অক্সিজেনের ষ্টা তিনি অক্সিজেনশূ স্তরে তাঁর প্রেরিত ব্যক্তির জ অক্সিজেনের ব্যবস্থা করতে কি সক্ষম নন? 'আল্লাহ্ কারণের উদগাতা ও বিলোপ সাধনকারী ' কথাটির অর্থ এটিই।

প্রকৃতপক্ষে মিরাজের বিষয়টি প্রাকৃতিক নিয়ম ও মানুষের ক্ষমতার বহির্ভূত একটি বিষয়। আল্লাহর ক্ষমতাকে আমাদের যোগ্যতা ও ক্ষমতার মানদণ্ডে বিচার করা কখনই উচিত হবে না। যদি আমরা কোন মাধ্যম ছাড়া কাজ করতে অক্ষম হই তাহলে এটি মনে করা ভুল হবে যে, অসীম ক্ষমতাবান ষ্টাও প্রাকৃতিক মাধ্যমের সাহায্য ব্যতীত তা করতে অক্ষম হবেন।

মৃতকে জীবিত করা, লাঠিকে সাপে পরিণত করা, গভীর সমুদ্রের নিচে মাছের পেটে হযরত ইউনুস (আ.)- কে জীবিত রাখা প্রভৃতি বিষয়ের সত্যতা বিভিন্ন ঐশীগ্রন্থে উল্লিখিত হয়েছে এবং এগুলোর বাস্তবতাকে স্বীকার মিরাজের বাস্তবতাকে স্বীকার হতে স্বাভাবিক দৃষ্টিতে কম কঠিন নয়।

মোটকথা, সকল প্রাকৃতিক নিয়ম (কারণসমূহ) এবং বাহ্যিক প্রতিবন্ধকতাসমূহ মহান আল্লাহর ইচ্ছাশক্তি ও ক্ষমতার অধীন। তাঁর ইচ্ছাশক্তি কেবল সত্তাগত অসম্ভব বিষয়ের ওপর (বিষয়টির সত্তাগত অসম্ভাব্যতার কারণে) কার্যকর নয়। কিন্তু সত্তাগতভাবে সম্ভাব্য সকল বিষয়ের ওপর তাঁর ইচ্ছাশক্তি পূর্ণরূপে কার্যকর। সে ক্ষেত্রে মানুষের দ্বারা সেটি সম্ভব কি সম্ভব নয় তা আদৌ বিবেচ্য নয়।

অবশ্য এ বিষয়টিকে তারাই গ্রহণ করতে পারবে যারা আল্লাহকে তাঁর গুণাবলী থেকে যথার্থভাবে চিনতে পেরেছে এবং তাঁকে অসীম ক্ষমতাবান এক অস্তিত্ব হিসাবে মেনে নিয়েছে।

অস্তিত্বজগতের বিভিন্ন পর্যায়ে পরিভ্রমণের উদ্দেশ্য

এক ব্যক্তি ইমাম যয়নুল আবেদীন (আ.)- কে প্রশ্ন করে, "আল্লাহর জ   কোন স্থান নির্দিষ্ট রয়েছে কি?" তিনি বললেন, "না।? সে বলল, "তবে কোন্ উদ্দেশ্যে তিনি তাঁর রাসূলকে ঊর্ধ্বজগতে ভ্রমণ করালেন?" তিনি বললেন, "আল্লাহ্ স্থান ও কালের ঊর্ধ্বে। আল্লাহ্ মিরাজের মাধ্যমে চেয়েছেন ঊর্ধ্বজগতে তাঁর নবীর উপস্থিতির মাধ্যমে ফেরেশতা ও আকাশমণ্ডলীর অধিবাসীদের সম্মানিত করতে এবং তাঁর নবীকে বি জগতের ব্যাপকতা এবং তাঁর আশ্চর্য সৃষ্টিসমূহ- যা কোন চক্ষু কোন দিন অবলোকন করে নি ও কর্ণও কোন দিন শুনে নি তা দেখাতে যেন তিনি ফিরে এসে বি বাসীদের সে সম্পর্কে অবহিত করেন।"[৩৫৩]

অবশ্যই সর্বশেষ নবীর জ   এমন মর্যাদাকর স্থানই নির্দিষ্ট। তিনি যেন বিংশ শতাব্দীর যে সকল ব্যক্তি চন্দ্র ও ম ল গ্রহের উদ্দেশে যাত্রা করছে তাদের লক্ষ্য করে বলছেন, "আমি কোন মাধ্যম ছাড়াই এরূপ যাত্রা করেছি এবং আমার প্রভু আমাকে বি জগতের পরিচালনা ব্যবস্থা ও শৃঙ্খলা অবলোকন করিয়েছেন।"

তেইশতম অধ্যায় : তায়েফ যাত্রা

নবুওয়াতের দশম বর্ষটি আনন্দ- বেদনার বিভিন্ন ঘটনার মাধ্যমে অতিবাহিত হলো। এ বছরেই তিনি তাঁর বড় দুই পৃষ্ঠপোষক হারান। প্রথমে আবদুল মুত্তালিব পরিবারের সম্মানিত ব্যক্তিত্ব, তাঁর মিশনের একমাত্র কুরাইশ সমর্থক ও পৃষ্ঠপোষক স্বীয় চাচা আবু তালিবকে হারান। এ মুসিবতের কষ্ট তাঁর অন্তর হতে দূরীভূত হওয়ার পূর্বেই প্রিয় স্ত্রী হযরত খাদীজার বিয়োগ তাঁর মনোকষ্টকে কয়েকগুণ বাড়িয়ে দিল।[৩৫৪] হযরত আবু তালিব মহানবী (সা.)- এর প্রাণ ও সম্মান রক্ষাকারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন এবং হযরত খাদীজাহ্ তাঁর সমগ্র সম্পদ দ্বারা ইসলামের উন্নতি ও সেবায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন।

ইবনে হিশাম তাঁর 'সীরাত' গ্রন্থের ১ম খণ্ডের ২৫ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন। আবু তালিবের মৃত্যুর কয়েকদিন পর কুরাইশ বংশীয় এক ব্যক্তি রাসূল (সা.)- এর মাথায় কিছু মাটি ঢেলে দিলে তিনি এ অবস্থায় গৃহে ফিরে আসলেন। তাঁর এক ক া এ করুণ অবস্থায় পিতাকে দেখে ত পানি এনে তা দ্বারা পিতার মস্তক ধৌত করতে থাকেন ও চিৎকার করে ক্রন্দন শুরু করেন। তাঁর চক্ষু হতে পানি ঝরতে দেখে নবী (সা.) তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন, "ক্রন্দন করো না। আল্লাহ্ তোমার পিতার রক্ষক।" অতঃপর বললেন, "যতদিন আবু তালিব জীবিত ছিলেন, কুরাইশ আমাকে কষ্ট দেয়ার সাহস পায় নি।"[৩৫৫]

মক্কায় াসরুদ্ধকর অবস্থার কারণে নবী (সা.) অ স্থানে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। সে সময় 'তায়েফ' হিজাযের অ তম কেন্দ্র ছিল। তিনি সেখানে একটি সফরের চিন্তা করলেন। তিনি ভাবলেন, সেখানকার 'সাকীফ' গোত্রের নিকট গিয়ে দীনের দাওয়াত দিবেন (যদি তারা তা গ্রহণ করে এ আশায়)। তিনি তায়েফে পৌঁছে উপরিউক্ত গোত্রের প্রধান ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সে সাক্ষাৎ করলেন এবং তাদের নিকট নিজের আনীত একত্ববাদী ধর্মের বিবরণ দান করে তা গ্রহণের আহবান জানালেন। কিন্তু নবীর এ আহবান ও বক্তব্য তাদের ওপর কোন প্রভাব তো বিস্তার করলই না, বরং তারা তাঁকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে বলল, "যদি তুমি আল্লাহর প্রেরিত নবী হয়ে থাক তবে তোমাকে অস্বীকার করার কারণে প্রতিশ্রুত আযাব আন। আর যদি তোমার দাবি মিথ্যা হয় তবে কোন কথা বলার অধিকার তোমার নেই।"

নবী করীম তাদের অযৌক্তিক ও শিশুসুলভ কথায় বুঝতে পারলেন তারা দায়িত্ব এড়াতে চাইছে। ফলে তিনি সে স্থান ত্যাগ করা সমীচীন মনে করে তাদের নিকট থেকে এ প্রতিশ্রুতি নিলেন যে, তাঁর এ কথা যেন গোত্রের অ ব্যক্তিরা জানতে না পারে। কারণ এতে গোত্রের নিম্নশ্রেণীর ব্যক্তিরা তাঁর একাকিত্বের সুযোগে তাঁর ক্ষতি করতে পারে। কিন্তু সাকীফ গোত্রের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা তাদের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করল না। তারা গোত্রের মূর্খ ও দুষ্ট প্রকৃতির লোকদেরকে নবীর পেছনে লেলিয়ে দিল। নবী (সা.) হঠাৎ করে নিজেকে অসংখ্য শত্রুর মাঝে দেখতে পেলেন। ফলে তিনি বাধ্য হয়ে নিজ শত্রু উতবা ও শায়বার মালিকানাধীন বাগানে আশ্রয় নিলেন।[৩৫৬] নবী অনেক কষ্টে ঐ বাগানে প্রবেশ করলেন। তায়েফবাসীরাও তাঁকে ঐ অবস্থায় দেখে প্রত্যাবর্তন করল। তখন নবী (সা.)- এর পবিত্র দেহ ক্ষত- বিক্ষত এবং তাঁর দেহ হতে অবিরত ঘাম ও রক্ত ঝরছিল। তিনি আ ুরের মাচার নিচে বসে বলছিলেন,

اللّهم إليك أشكو ضعف قوّتي و قلّة حيلي و هواني على النّاس يا أرحم الرّاحمين أنت ربّ المستضعفين و أنت ربّي من تكلني ...

“হে আল্লাহ! আমার শক্তির স্বল্পতা ও অক্ষমতার বিষয়ে আপনার দ্বারস্থ হয়েছি। আপনি পরমতম দয়ালু এবং অসহায় ও দুর্বলের আশ্রয়। আপনি আমার প্রতিপালক, আমাকে কার ওপর ছেড়ে দেবেন...?”

উপরিউক্ত দোয়ার ভাষা এমন এক ব্যক্তির যিনি পঞ্চাশ বছর সম্মান ও মর্যাদার সাথে নিবেদিত ব্যক্তিদের পৃষ্ঠপোষকতায় জীবন কাটিয়েছেন। এখন তিনি এমনই সংকটাপন্ন অবস্থায় পড়েছেন যে, শত্রুর উদ্যানে ক্লান্ত ও ক্ষত- বিক্ষত দেহ নিয়ে আশ্রয় নিয়েছেন এবং নিজ ভবি তের প্রতীক্ষায় রয়েছেন।

এমন সময় ‘রাবিয়া ’ পরিবারের এক ব্যক্তি নবী (সা.)- এর অবস্থাদৃষ্টে প্রভাবিত হয়ে স্বীয় দাস আ’দাসকে তাঁর নিকট এক পেয়ালা আ ুরের রস নিয়ে যাবার নির্দেশ দিল। আ’দাস একজন ি ষ্টান ছিল। সে যখন আ ুরের রসপূর্ণ পাত্র নিয়ে নবীর নিকট উপস্থিত হলো তখন তাঁর আলোকোজ্জ্বল চেহারা দেখে হতচকিত হলো। কিছুক্ষণের মধ্যেই একটি ঘটনা তার দৃষ্টি আকর্ষণ

করল। আর তা হলো এ ি ষ্টান দাস লক্ষ্য করল, নবী (সা.) আ ুরের রসপানের মুহূর্তে 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম ' বললেন। বিষয়টি তাকে এতটা আশ্চর্যান্বিত করল যে, সে নীরবতা ভেঙে নবী (সা.)- কে প্রশ্ন করল, "আপনি যে বাক্যটি বললেন, আরব উপদ্বীপের কেউ এ বাক্যের স পরিচিত নয় এবং আমি কোন ব্যক্তির নিকট থেকে এ বাক্য শুনি নি; সাধারণত এ অঞ্চলের লোকেরা খাদ্য গ্রহণের সময় লাত ও উয্যার নাম উচ্চারণ করে থাকে।" রাসূল (সা.) তাকে প্রশ্ন করলেন, "তুমি কোথাকার অধিবাসী এবং কোন্ ধর্মের অনুসারী?" সে বলল, "আমি 'নেইনাওয়া ' - এর অধিবাসী এবং ি ষ্টান।" নবী (সা.) বললেন, "তাহলে তুমি আল্লাহর পুণ্যময় বান্দা ইউনুস ইবনে মাত্তার অঞ্চলের লোক।" নবীর এ কথায় সে অধিকতর আশ্চর্যান্বিত হলো। সে প্রশ্ন করল, "আপনি ইউনুস ইবনে মাত্তাকে কিরূপে চিনলেন?" নবী বললেন, "আমার ভ্রাতা ইউনুস আমার ায় আল্লাহর নবী ছিলেন।" নবীর বক্তব্যে সত্যতার চিহ্ন লক্ষ্য করে সে আশ্চর্য রকম প্রভাবিত হলো। সে নবীর প্রতি এতটা আকৃষ্ট হলো যে, তাঁর হাতে- পায়ে চুম্বন করতে লাগল এবং তাঁকে সত্য নবী বলে গ্রহণ করল। অতঃপর তাঁর অনুমতি নিয়ে নিজ মালিকের দিকে প্রত্যাবর্তন করল। তার মনিব তার মধ্যে ব্যাপক পরিবর্তন লক্ষ্য করে তাকে প্রশ্ন করল, "এ আগন্তুক ব্যক্তির স কি বিষয়ে আলাপ করলে এবং কেনই বা তার হাতে- পায়ে পড়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করলে?" দাস উত্তর দিল, "যে ব্যক্তিটি এ বাগানে আশ্রয় নিয়েছেন তিনি মানবকুলের নেতা। তিনি আমাকে এমন বিষয়ে বলেছেন- যে বিষয়ে কেবল নবীরাই জানেন। তিনিই প্রতিশ্রুত নবী। তার এ কথায় রাবীয়ার সন্তানরা অসন্তুষ্ট হয়ে তার শুভাকাঙ্ক্ষী হিসাবে বুঝানোর চেষ্টা করল, "এ ব্যক্তি তোমাকে তোমার আদি ধর্ম থেকে সরিয়ে নিতে চায়, অথচ তুমি যে ি ষ্টধর্মে রয়েছ তা তার ধর্ম থেকে উত্তম। "

মহানবীর মক্কায় প্রত্যাবর্তন

তায়েফবাসী কর্তৃক পশ্চাদ্ধাবনের বিষয়টি রাবীয়া পরিবারের উদ্যানে আশ্রয় গ্রহণের মাধ্যমে পরিসমাপ্তি ঘটলেও যেহেতু নবীকে পুনরায় মক্কায় ফিরে আসতে হবে সেহেতু মক্কায় প্রত্যাবর্তনের বিষয়টিও তাঁর জ তেমন সুখকর নয়। কারণ মক্কায় তাঁর একমাত্র পৃষ্ঠপোষকের মৃত্যুর ফলে তিনি প্রত্যাবর্তনের সাথে সাথেই বন্দী অথবা নিহত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তাই তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন কয়েকদিন মক্কা ও তায়েফের মধ্যবর্তী নাখলা নামক স্থানে অবস্থান করবেন। তিনি পরিকল্পনা করলেন কাউকে কুরাইশ নেতাদের নিকট প্রেরণ করে নিজ নিরাপত্তার ব্যবস্থা করবেন। কিন্তু সেখানে এমন কোন ব্যক্তির সন্ধান না পেয়ে হেরা পর্বতের উদ্দেশে যাত্রা করলেন এবং একজন খুযায়ী আরব ব্যক্তির সন্ধান পেলেন। তিনি তাকে মক্কার অ তম সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি মুতয়েম ইবনে আদীর নিকট গিয়ে তাঁর জ নিরাপত্তার ব্যবস্থা করার অনুরোধ জানালেন। খুযায়ী লোকটি মক্কায় প্রবেশ করে মুতয়েমের নিকট মহানবীর অনুরোধের বিষয়টি উপস্থাপন করল। মুতয়েম যদিও একজন মূর্তিপূজক ছিলেন তদুপরি মহানবীর অনুরোধ রক্ষা করলেন এবং বললেন, "মুহাম্মদ আমার গৃহে নির্বিঘ্নে প্রবেশ করতে পারে এবং আমি ও আমার সন্তানেরা তার নিরাপত্তার পূর্ণ দায়িত্ব নিলাম।" নবী করীম (সা.) রাত্রিতে মক্কায় প্রবেশ করে সরাসরি মুতয়েমের গৃহে পৌঁছলে সেখানে রাত্রি যাপনের পর প্রভাত হলে মুতয়েম তাঁর নিকট প্রস্তাব রাখলেন যেহেতু তাঁর গৃহে নবীর আশ্রয় গ্রহণের বিষয়টি কুরাইশদের জানা প্রয়োজন সেহেতু নবী যেন তাঁর স কাবা ঘর পর্যন্ত যান। প্রস্তাবটি মহানবীর পছন্দ হলো এবং তিনি এ প্রস্তাবে সম্মত হলেন। মুতয়েম তাঁর সন্তানদের অস্ত্রসহ প্রস্তুত হতে আদেশ দিলেন। অতঃপর তাঁকে স নিয়ে তাঁরা বায়তুল্লায় প্রবেশ করলেন। তাঁদের বায়তুল্লায় প্রবেশের দৃশ্যটি দর্শনীয় ছিল। আবু সুফিয়ান রাসূলের অনিষ্টের প্রচেষ্টায় ছিল, কিন্তু রাসূলকে এভাবে কাবা গৃহে প্রবেশ করতে দেখে সে খুবই রাগান্বিত হলো কিন্তু তাঁর ক্ষতিসাধনের ইচ্ছা ত্যাগে বাধ্য হলো। মুতয়েম ও তাঁর সন্তানরা কাবাগৃহের নিকট বসে পড়লেন এবং নবী করীম (সা.) শান্তভাবে কাবার তাওয়াফ সম্পন্ন করলেন। তাওয়াফ শেষ করে তাঁদের নিকট থেকে বিদায় নিয়ে নিজ গৃহে প্রত্যাবর্তন করলেন।[৩৫৭]

এর কিছুদিন পরেই মহানবী (সা.) মদীনায় হিজরত করেন এবং হিজরতের প্রথম বর্ষেই মক্কায় মুতয়েমের মৃত্যু ঘটে। যখন তাঁর মৃত্যুর খবর নবীর নিকট পৌঁছে তখন তিনি কৃতজ্ঞতার সাথে তাঁকে স্মরণ করেন। নবীর সাহাবী কবি হাসসান ইবনে সাবিত তাঁর প্রশংসায় বেশ কিছু কবিতা রচনা করেছেন। মহানবী (সা.) বিভিন্ন সময় এ ব্যক্তির কথা স্মরণ করতেন, যেমন বদর যুদ্ধের পর- এ যুদ্ধে কুরাইশরা শোচনীয় পরাজয় বরণ করে ও তাদের অনেকেই মুসলমানদের হাতে বন্দী হয়- রাসূল (সা.) মুতয়েমের কথা স্মরণ করে বলেন, “যদি মুতয়েম এখন জীবিত থাকতেন এবং আমাকে এ বন্দীদের মুক্তিদানের অনুরোধ করতেন বা ক্ষমা করে তাঁর নিকট হস্তান্তরের আহবান জানাতেন তাহলে আমি তা গ্রহণ করতাম।”

একটি উল্লেখযোগ্য বিষয়

রাসূলের তায়েফ সফরের কষ্টদায়ক ঘটনাটি তাঁর দৃঢ়তা ও সহনশীলতার দৃষ্টান্ত। তাই ঐ বিশেষ মুহূর্তে মুতয়েম ইবনে আদী তাঁর প্রতি যে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন তিনি তা কখনই ভুলতে পারেন নি। এ বিষয়টি আমাদেরকে উন্নত এক বৈশিষ্ট্য অর্জনের প্রতি আহবান জানায়। কিন্তু এ ঘটনাটি এর বাইরের অপর একটি বিষয়ে পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণের দাবি রাখে। আর তা হলো রাসূলের চাচা আবু তালিবের মূল্যবান অবদান। মুতয়েম কয়েকদিন বা কয়েক ঘণ্টা রাসূলের খেদমত ও পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন, অথচ আবু তালিব সারা জীবন রাসূলের খেদমত ও পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন। হযরত আবু তালিব রাসূল (সা.)- কে রক্ষা করতে যত কষ্ট সহ্য করেছেন মুতয়েম তার সহ ভাগের একভাগও করেন নি। যদি রাসূলুল্লাহ্ মুতয়েমের কয়েক ঘণ্টার সহযোগিতা ও পৃষ্ঠপোষকতার কারণে বদরের যুদ্ধের সকল বন্দীকে মুক্তি দিতে সম্মত হতে চান, তবে স্বীয় চাচার অক্লান্ত ও নিরবচ্ছিন্ন খেদমতের প্রতিদান কি দিয়ে দিতে পারেন? যে ব্যক্তি নবুওয়াতের ধারকের আট বছর বয়স হতে পঞ্চাশ বছর বয়স পর্যন্ত সুদীর্ঘ বিয়াল্লিশ বছর সেবা করেছেন, বিশেষত শেষ দশ বছর নিজের ও স্বীয় পুত্রের জীবন বাজি রেখে তাঁকে রক্ষায় ব্রত হয়েছেন বি নেতার নিকট তাঁর স্থান কোন্ পর্যায়ে হওয়া উচিত? তদুপরি এ দু’ব্যক্তির

(হযরত আবু তালিব ও মুতয়েম) মধ্যে বিরাট পার্থক্য লক্ষণীয়। আর তা হলো মুতয়েম একজন মূর্তিপূজক, অথচ আবু তালিব ছিলেন ইসলামী জগতের এক শ্রেষ্ঠ মুসলিম ব্যক্তিত্ব।

আরবদের প্রসিদ্ধ বাজারসমূহে বক্তব্য দান

হ র সময়ে আরবরা উকাজ, মাজনাহ্, যিলমাজাজ প্রভৃতি স্থানে সমবেত হতো। বাগ্মী, মিষ্টভাষী কবিরা বিভিন্ন উচ্চ স্থানে দাঁড়িয়ে প্রেম, গোত্রীয় প্রশংসা ও বীরত্বসূচক কবিতা ও বাণীসমূহ উপস্থাপন করে লোকদের মাতিয়ে রাখতেন। নবী করীম (সা.) পূর্ববর্তী অ া নবীর ায় এরূপ সমাবেশের সুযোগকে কাজে লাগাতেন। যেহেতু হারাম মাসসমূহে (রজব, শাবান, যিলহ ও মুহররম) যুদ্ধ ও রক্তপাত নিষিদ্ধ ছিল সেহেতু নবী (সা) এ সময় তাদের নিকট থেকে ক্ষতির আশংকামুক্ত ছিলেন। তিনিও অ াে র মতো এক উচ্চ স্থানে দাঁড়িয়ে জনসাধারণের উদ্দেশে বলতেন,

قولوا لا إله إلّا الله تفلحوا تملكوا بها العرب و تذلّ لكم العجم و إذا آمنتم كنتم ملوكا في الجنة

"আল্লাহর একত্বকে মেনে নাও, তবে সফলকাম হবে। এ ঈমানের শক্তিতে তোমরা বি কে (আজম) পদানত করতে পারবে এবং সকল মানুষ তোমাদের অনুগত হবে। যখন তোমরা ঈমান আনবে তখন চিরস্থায়ী বেহেশতে স্থান লাভ করবে।"

হজ্বের মৌসুমে বিভিন্ন গোত্রপতিদের প্রতি দাওয়াত

নবী করীম (সা.) হে র সময় আরবের বিভিন্ন গোত্রপ্রধানদের সে সাক্ষাৎ করতেন। বিভিন্ন স্থানে তাদের সে স্বতন্ত্রভাবে নিজ দীনের দাওয়াত পেশ করতেন। কখনো কখনো নবীর বক্তব্যে বাধা প্রদান করে আবু লাহাব তাদেরকে তাঁর কথা বি াস না করতে বলত। সে প্রচার চালাত এ বলে যে, রাসূল (সা.) তাদের পিতৃধর্মের সে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছে এবং তাঁর দাবি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। নিজ চাচার বিরোধিতার বিষয়টি গোত্রপতিদের মনের ওপর প্রভাব ফেলত এ কারণে যে, তারা মনে করত যদি এ ব্যক্তির কথা সত্য হতো তবে চাচা ও আত্মীয়রা তাঁর বিরোধিতা করত না।[৩৫৮]

বনি আমের গোত্রের কিছুসংখ্যক লোক মক্কায় আগমন করলে নবী (সা.) তাদের নিকট ইসলামের দাওয়াত উপস্থাপন করলেন। তারা এ শর্তে ইসলাম গ্রহণে সম্মত হলো যে, নবীর মৃত্যুর পর তাদের গোত্র তাঁর উত্তরাধিকারী হবে। তিনি বললেন যে, তাঁর উত্তরাধিকারী মনোনয়নের দায়িত্ব আল্লাহর, তিনি যাকে ভালো মনে করেন তাকেই মনোনীত করেন।[৩৫৯] এ কথা শ্রবণে তারা ইসলাম গ্রহণ থেকে বিরত রইল। নিজ গোত্রের নিকট ফিরে গিয়ে বিষয়টি এক স্বচ্ছ দয় বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তির নিকট উপস্থাপন করলে তিনি বললেন, এটি সেই উজ্জ্বল নক্ষত্র যা মক্কার আকাশে উদিত হওয়ার কথা। ইতিহাসের এ অংশটি প্রমাণ করে যে, 'ইমামত ' অর্থাৎ রাসূলের উত্তরাধিকারী নির্ধারণের বিষয়টি মানুষের নির্বাচনের মাধ্যমে নয়, বরং আল্লাহর মনোনয়নের ওপর নির্ভরশীল। এ বিষয়টি নিয়ে আমরা 'পিশভোয়ায়ী আয নাজারে ইসলাম ' (ইসলামের দৃষ্টিতে নেতৃত্ব) নামক গ্রন্থে আলোচনা করেছি।

চব্বিশতম অধ্যায় : আকাবার চুক্তি

পূর্বকালে ইয়েমেন হতে সিরিয়ায় বাণিজ্য কাফেলার পথ ছিল ‘ওয়াদিউল কুরা’র ওপর দিয়ে। ইয়েমেন থেকে বাণিজ্য কাফেলা মক্কা অতিক্রম করে যে বিস্তীর্ণ উপত্যকায় পৌঁছত তাকে ‘ওয়াদিউল কুরা’ বলা হতো। ওয়াদিউল কুরা অতিক্রম করে যে সবুজাকীর্ণ লোকালয়ে কাফেলা পৌঁছায় তার পূর্ববর্তী নাম ছিল ‘ইয়াসরিব ’। পরবর্তীতে তা ‘মদীনাতুর রাসূল ’ নামে অভিহিত হয় ও প্রসিদ্ধি লাভ করে। এ এলাকায় ইয়েমেনের ‘কাহতানী ’ আরবদের (যারা ইয়েমেন থেকে অত্র এলাকায় হিজরত করে এসেছিল) দু’টি গোত্র (আওস ও খাজরাজ) বসবাস করত। সেখানে আরব উপদ্বীপের উত্তরাঞ্চল হতে আসা ইয়া দীদের তিনটি প্রসিদ্ধ গোত্রও (বনি কুরাইযাহ্, বনি নাযির ও বনি কাইনুকা ’) বাস করত। প্রতি বছরই ইয়াসরিব হতে একদল লোক মক্কায় হ র উদ্দেশ্যে আসত। নবী (সা.) তাদের স সাক্ষাৎ করতেন। এরূপ সাক্ষাতের ফলশ্রুতিতেই হিজরতের পরিবেশ সৃষ্টি হয় এবং ইসলামের বিক্ষিপ্ত শক্তিকে এক স্থানে কেন্দ্রীভূত করার সুযোগ সৃষ্টি হয়। যদিও এরূপ সাক্ষাতের অধিকাংশই ফলপ্রসূ হতো না তদুপরি ইয়াসরিবের হাজীরা নতুন এক নবীর আগমনের সংবাদ বহন করে নিয়ে যেত যা একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ হিসাবে সেখানে প্রচারিত হতো। খবরটি সেখানকার অধিবাসীদের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করত। তাই আমরা এখানে এরূপ কয়েকটি সাক্ষাতের বিবরণ পেশ করছি যা নবুওয়াতের একাদশ, দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ বছরে হয়েছিল। এ আলোচনা থেকে নবীর মক্কা হতে মদীনায় হিজরতের কারণ ও ইসলামী শক্তির কেন্দ্রীভূত হওয়ার বিষয়টি পরিষ্কার হবে।

ক. যখনই মহানবী (সা.) জানতে পারতেন কোন বহিরাগত ব্যক্তি মক্কায় এসেছে তখনই তিনি তার স সাক্ষাৎ করতেন ও তার নিকট ইসলামের দাওয়াত পেশ করতেন। একদিন তিনি খবর পেলেন সুয়াইদ ইবনে সামেত নামে এক ব্যক্তি মক্কায় এসেছে। তিনি তৎক্ষণাৎ তার স সাক্ষাৎ করলেন এবং তাকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন। তিনি বললেন, “আমার নিকট হযরত লোকমানের প্রজ্ঞাজনোচিত যে কথামালা রয়েছে তদনুরূপ কথাই কি বলছেন?” রাসূল (সা.) বললেন,

و الّذي معي أفضل هذا قرآن أنزله الله تعالى هو هدى و نور

“(তোমার কাছে যা রয়েছে তা ভালো) তবে আমার ওপর আল্লাহ্ যা অবতীর্ণ করেছেন তা আরো উত্তম। কারণ তা প্র লিত আলো এবং হেদায়েতের নূর।”[৩৬০]

অতঃপর রাসূল (সা.) কয়েকটি আয়াত পাঠ করলে তিনি ইসলাম গ্রহণ করলেন এবং মদীনায় ফিরে গেলেন। ‘বুয়াস ’ যুদ্ধে তিনি খাজরাজ গোত্রের হাতে নিহত হন এবং মৃত্যুর সময় তাঁর মুখে পবিত্র কালেমার ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল।

খ. আনাস ইবনে রাফে বনি আবদুল আশহালের কিছু যুবককে স নিয়ে মক্কায় প্রবেশ করে। তাদের স আয়াস ইবনে মায়ায নামে এক যুবকও ছিল। তাদের মক্কা আগমনের উদ্দেশ্য ছিল খাজরাজ গোত্রের মোকাবিলায় কুরাইশদের নিকট থেকে সামরিক সাহায্য গ্রহণ। নবী (সা.) তাদের বৈঠকে তাদের স মিলিত হলেন ও ইসলামের দাওয়াত উপস্থাপন করে কয়েকটি আয়াত পাঠ করলেন। আয়াস একজন সাহসী যুবক ছিলেন। তিনি দাঁড়িয়ে এ নতুন ধর্মের প্রতি ঈমানের ঘোষণা দিয়ে বললেন, “এ ধর্মটি কুরাইশদের নিকট থেকে সাহায্য গ্রহণ অপেক্ষা উত্তম।”তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, একত্ববাদী এ ধর্ম তাঁদের জীবনের সকল দিকের নিরাপত্তা বিধানকারী। কারণ এ ধর্ম সকল বিশৃঙ্খলা, ভ্রাতৃহত্যা ও ধ্বংসকারী যুদ্ধের অপনোদন ঘটাবে। যেহেতু এ যুবক গোত্রপতির অনুমতি ব্যতিরেকে ঈমান এনেছিলেন সেহেতু আনাস এতে খুবই রাগান্বিত হলো। সে তার রাগ দমনের উদ্দেশ্যে এক মুঠো বালি এ যুবকের উদ্দেশে ছুঁড়ে দিয়ে বলল, “চুপ কর! আমরা এখানে কুরাইশদের নিকট থেকে সাহায্যের আশায় এসেছি, নতুন ধর্ম গ্রহণের উদ্দেশ্যে আসি নি।”নবী (সা.) সেখান থেকে উঠে এলে দলটি মদীনায় ফিরে যায় এবং আওস ও খাজরাজ গোত্রের মধ্যে ‘বুয়া’স ’ - এর যুদ্ধ সংঘটিত হয়। আয়াস ইসলামের প্রতি ঈমান নিয়ে এ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে নিহত হন।

বুয়া’সের যুদ্ধ

আওস ও খাজরাজ গোত্রের মধ্যে ঐতিহাসিক যুদ্ধসমূহের মধ্যে প্রসিদ্ধ একটি যুদ্ধ হলো বুয়া’সের যুদ্ধ। এ যুদ্ধে আওসরা জয়ী হয় এবং খাজরাজ গোত্রের খেজুর বাগানগুলো ালিয়ে দেয়। এরপর তাদের মধ্যে পালাক্রমে যুদ্ধ ও সন্ধি হতে থাকে। খাজরাজ গোত্রের অ তম প্রধান ব্যক্তি আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই এ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে নি। এ কারণে উভয় গোত্রের নিকটই সে সম্মানিত ছিল। ক্রমাগত যুদ্ধের কারণে উভয় পক্ষই ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল এবং তাদের মধ্যে সন্ধির প্রতি তীব্র আগ্রহ দেখা দিয়েছিল। ফলে উভয় গোত্র আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাইকে সন্ধির জ মধ্যস্থতাকারী নেতৃত্ব বলে গ্রহণে সম্মত হলো, এমনকি তারা উভয় গোত্রের নেতা হিসাবে তাকে গ্রহণের লক্ষ্যে তার জ বিশেষ মুকুট প্রস্তুতের পরিকল্পনা করল। কিন্তু এ পরিকল্পনা খাজরাজ গোত্রের কিছুসংখ্যক ব্যক্তির ইসলাম গ্রহণের কারণে পণ্ড হলো। নবী করীম (সা.) খাজরাজ গোত্রের ছয় ব্যক্তির নিকট ইসলামের দাওয়াত দিলে তারা তা গ্রহণ করে।

খাজরাজদের ইসলাম গ্রহণ

নবী (সা.) হে র সময় মক্কায় খাজরাজ গোত্রের ছয় ব্যক্তির সে সাক্ষাৎ করে তাদের উদ্দেশে বলেন, "তোমরা কি ইয়া দীদের সে চুক্তিবদ্ধ?" তারা বলল, "হ্যাঁ।" নবী (সা.) তাদের বললেন, "তোমাদের সে আমি কথা বলতে চাই।"তারা মহানবীর আহবান গ্রহণ করে তাঁর কথা শ্রবণ করল। মহানবী (সা.) কয়েকটি আয়াত পাঠ করে বক্তব্য রাখলে তা তাদের মনে ব্যাপক প্রভাব ফেলল। এ বৈঠকেই তারা ইসলাম গ্রহণ করল। যে বিষয়টি তাদের ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করেছিল তা হলো তারা পূর্বেই ইয়া দীদের নিকট থেকে শুনেছিল আরবদের মধ্য থেকে একজন নবীর আবির্ভাব ঘটবে যিনি একত্ববাদী ধর্মের দাওয়াত দেবেন এবং মূর্তিপূজার অবসান ঘটাবেন। খুব শীঘ্রই তিনি আবির্র্ভূত হবেন। এ কারণে ইয়া দীরা কোন অপচেষ্টা করার পূর্বেই তারা ইসলাম গ্রহণের মাধ্যমে তাঁকে সাহায্য করার ইচ্ছা পোষণ করল।

ছয় সদস্যের দলটি মহানবীকে উদ্দেশ্য করে বলল, "আমাদের মাঝে সব সময় যুদ্ধের অি প্র লিত। আশা করি মহান আল্লাহ্ আপনার এ পবিত্র ধর্মের মাধ্যমে এ যুদ্ধের অি কে প্রশমিত করবেন। আমরা ইয়াসরিবে ফিরে গিয়ে আপনার দীনের দাওয়াত দেব। যখনই আমরা সকলে আপনার বিষয়ে ঐকমত্যে পৌঁছব তখন আমাদের নিকট আপনি অপেক্ষা সম্মানিত কেউ থাকবে না।"[৩৬১]

আকাবার প্রথম শপথ

উক্ত ছয় ব্যক্তি ইয়াসরিবের অধিবাসীদের মধ্যে অনবরত দীনের প্রচার কার্য চালায়। ফলে ইয়াসরিবের প্রতিটি ঘরে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছে যায় এবং তাদের অনেকেই ইসলাম গ্রহণ করে। নবুওয়াতের দ্বাদশ বছরে মদীনা থেকে বারো সদস্যের একটি দল রাসূল (সা.)- এর সে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। এদের সে প্রথম আকাবা চুক্তি সম্পাদিত হয়। এ বারো সদস্যের দলের প্রসিদ্ধ দু'জন ব্যক্তি হলেন আসআদ ইবনে জুরারাহ্ এবং উবাদাতা ইবনে সামিত। তাঁদের সে সম্পাদিত চুক্তিতে নিম্নোক্ত বক্তব্যটি ছিল :

أن لا نشرك بالله شيئا و لا نسرق و لا نزنى و لا نقتل أولَادنا و لا نأتى ببهتان نفتريه بين أيدينا و أرجلنا و لا نعصيه في معروف

"রাসূলের সে এ মর্মে চুক্তিবদ্ধ হলাম যে, আল্লাহর সে কাউকে শরীক (অংশীদার) করব না, চুরি ও ব্যভিচার করব না, নিজ সন্তানদেরকে হত্যা করব না, একে অপরের ওপর অপবাদ আরোপ করব না, অশ্লীল ও মন্দ কাজ করব না এবং ভালো কাজের বিরোধিতা করব না।"

রাসূল (সা.) তাদেরকে উদ্দেশ্য করে বললেন, "যদি এ প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী কাজ কর তাহলে তোমাদের স্থান হবে বেহেশত, আর যদি এর অ থা কর তবে তোমাদের কর্মফল আল্লাহর ইচ্ছাধীন, হয় তিনি তোমাদের ক্ষমা করবেন, নতুবা শাস্তি দেবেন।" এ প্রতিশ্রুতি গ্রহণ ও চুক্তিনামাটি ঐতিহাসিকভাবে 'বাইয়াতুন্নেসা' নামে প্রসিদ্ধ। কারণ নবী (সা.) মক্কা বিজয়ের পর নারীদের নিকট থেকে একই মর্মে প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেছিলেন।

এ বারো ব্যক্তি পূর্ণ ঈমান নিয়ে মদীনায় ফিরে যায় এবং পূর্ণোদ্যমে দীনের দাওয়াতের কাজ শুরু করে। পরে তারা নবীর নিকট তাদের কোরআন শিক্ষাদানের জ একজন মুবাল্লিগ (প্রচারক) পাঠানোর অনুরোধ জানায়। নবী মুসআব ইবনে উমাইরকে তাদের প্রশিক্ষিত করার উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন। এ শক্তিশালী মুবাল্লিগের প্রচেষ্টায় মুসলমানরা পরস্পর ঐক্যবদ্ধ হয় এবং জামায়াতে নামায পড়া শুরু হয়।[৩৬২]

আকাবার দ্বিতীয় শপথ

মদীনার মুসলমানদের মধ্যে আশ্চর্য উদ্দীপনা দেখা দিয়েছিল। তারা হ র সময়ের প্রহর গুনছিল। কারণ হ র সময় মহানবী (সা.)- এর সান্নিধ্য লাভ সম্ভব হবে এবং তাঁর সেবায় যে তারা অধিকতর প্রস্তুত হয়েছে এ কথা ঘোষণা করার সুযোগ ঘটবে। সে সাথে পূর্বোক্ত চুক্তিনামার সম্প্রসারণের (পরিমাণ ও মান উভয় ক্ষেত্রেই) ইচ্ছাটি ব্যক্ত করার অভিপ্রায়ও ছিল। মদীনা থেকে পাঁচশ ’ ব্যক্তির কাফেলা হ র উদ্দেশ্যে যাত্রা করল। এ কাফেলায় ৭৩ জন মুসলমান ছিলেন যাঁদের দু’জন ছিলেন নারী। কাফেলার অ া সদস্যও হয় ইসলামের প্রতি দুর্বল, নতুবা নিরপেক্ষ ছিল। মুসলমানগণ মক্কায় মহানবীর স দেখা করে বাইয়াত (চুক্তিবদ্ধ হওয়া) অনুষ্ঠানের সময় নির্ধারণের অনুরোধ জানালেন। নবী (সা.) তাঁদের বললেন, “আমরা মিনায় পরস্পরের স মিলিত হব। ১৩ জিলহ যখন সকলে ঘুমিয়ে পড়বে তখন ‘আকাবা ’ র গিরিপথে আমরা সংলাপে বসব। ”

১৩ জিলহ মহানবী (সা.) চাচা আব্বাসকে স নিয়ে সকলের পূর্বেই আকাবায় পৌঁছলেন। তখন রাত্রির একাংশ অতিবাহিত হয়েছে; আরবের মুশরিকরা ঘুমে বিভোর হয়ে পড়েছে। মুসলমানরা একের পর এক ধীরে ধীরে গোপনে আকাবার পথ ধরল। সকলে সমবেত হওয়ার পর রাসূলের চাচা আব্বাস প্রথম নীরবতা ভ করে রাসূল (সা.) সম্পর্কে বললেন, “হে খাজরাজ গোত্রীয়গণ! তোমরা মুহাম্মদের দীনের প্রতি নিজেদের সহায়তার ঘোষণা দিয়েছ। তোমরা জেনে রাখ, সে তার গোত্রের নিকট সর্বাধিক প্রিয় ব্যক্তি। বনি হাশিমের সকল সদস্য তার প্রতিরক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত। কিন্তু এখন মুহাম্মদ তোমাদের মধ্যে অবস্থান করাকে শ্রেয় মনে করেছে। যদি তোমরা নিজ চুক্তির প্রতি দৃঢ় থাক এবং তাকে শত্রুর আক্রমণ হতে রক্ষা কর তাহলে সে তোমাদের মধ্যে জীবন অতিবাহিত করতে পারবে। কিন্তু যদি কোন কঠিন অবস্থায় তাকে প্রতিরক্ষা করতে অক্ষম হও তাহলে এখনই তা বল। এতে সে পূর্ণ সম্মান ও মর্যাদা সহকারে স্বীয় গোত্রেই অবস্থান করবে। ”

তখন বাররা ইবনে মা'রুর দাঁড়িয়ে বললেন, "আল্লাহর শপথ! আমরা মুখে যা বলেছি অন্তরে এর বিপরীত কিছু নেই। আমরা আমাদের কথার সত্যতা ও শপথ রক্ষায় বদ্ধপরিকর। নবীর পথে প্রাণপণ সংগ্রাম ব্যতীত অ কোন চিন্তা আমরা করছি না।" অতঃপর খাজরাজগণ মহানবীর দিকে লক্ষ্য করে কিছু বলার অনুরোধ জানাল। নবী (সা.) কোরআনের কয়েকটি আয়াত পাঠের মাধ্যমে তাদেরকে ইসলাম ধর্মের প্রতি অধিকতর নিবেদিত ভূমিকা রাখতে অনুপ্রাণিত করলেন। অতঃপর বললেন, "তোমাদের স এ মর্মে চুক্তিবদ্ধ হচ্ছি যে, তোমরা তোমাদের পরিবার ও সন্তানদের যেরূপ প্রতিরক্ষা কর আমাকেও সেরূপ প্রতিরক্ষা করবে।"[৩৬৩]

এখানে লক্ষণীয় যে, নবী (সা.) তাঁকে রক্ষার জ চুক্তি করেছেন (প্রতিশ্রুতি নিয়েছেন), আল্লাহর পথে যুদ্ধ ও সংগ্রামের (জিহাদের) প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেন নি। তিনি বদর যুদ্ধের সময় যতক্ষণ আনসারদের সম্মতি লাভ করেন নি ততক্ষণ পর্যন্ত যুদ্ধের ঘোষণা দেন নি।

তখন বাররা দ্বিতীয় বারের মতো উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "আমরা যুদ্ধে প্রশিক্ষিত এবং যুদ্ধের উপযোগী হয়েই গড়ে উঠেছি। এ বিষয়টি আমরা উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করেছি।" এ সময় খাজরাজগণের ক নবী (সা.)- এর প্রতি ভালোবাসার প্রচণ্ড প্রকাশ লক্ষ্য করা গেল। তাদের উদ্বেলিত অভিব্যক্তি সমগ্র পরিবেশকে আচ্ছাদিত করল। কারো কারো ক উচ্ছাসে কিছুটা উচ্চ হলে রাসূলের চাচা আব্বাস (তাঁর হস্ত রাসূলের হস্তকে ধারণ করেছিল) বললেন, "আমাদের পেছনে গুপ্তচর লেগে আছে। সুতরাং আস্তে কথা বল। এ সময় বাররা ইবনে মা'রুর, আবুল হাইসাম ইবনে তাইহান এবং আসআদ ইবনে জুরারাহ্ স্বীয় স্থান হতে উঠে রাসূলের হাতে বাইয়াত করলেন। তাঁদের অনুসরণে বাকী সবাই একে একে বাইয়াত নিলেন।

আবুল হাইসাম বাইয়াতের সময় রাসূলকে বললেন, "হে রাসূলাল্লাহ্! আমরা ইয়া দীদের স চুক্তিবদ্ধ। এখন থেকে তার তেমন মূল্য দেব না। আপনার জ ই আমরা সব কিছু করছি। এমন যেন না হয় যে, আপনি আমাদের ছেড়ে একদিন নিজ গোত্রের নিকট ফিরে যাবেন।" নবী (সা.) বললেন, "তোমরা যাদের স চুক্তিবদ্ধ হয়েছ আমি সে চুক্তির প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকব।" অতঃপর বললেন, "তোমাদের মধ্য হতে বারো ব্যক্তিকে প্রতিনিধি নির্বাচিত কর যাতে করে তারা

তোমাদের সমস্যার চূড়ান্ত সমাধানদাতা হতে পারে।" (যেমনটি মূসা ইবনে ইমরান (আ.) বনি ইসরাইলের জ   করেছিলেন।) আনসার প্রতিনিধিগণ খাজরাজ গোত্র হতে নয় ব্যক্তি এবং আওস গোত্র হতে তিন ব্যক্তিকে নির্বাচিত করলেন। এ ব্যক্তিবর্গের নাম ইতিহাসে উল্লিখিত হয়েছে। অতঃপর বাইয়াত পর্বের সমাপ্তি ঘটলে রাসূল (সা.) তাদের প্রতিশ্রুতি দিলেন সুবিধাজনক সময়ে মক্কা হতে মদীনায় হিজরত করবেন। বৈঠকশেষে সকলে নিজ নিজ পথে ফিরে গেলেন।[৩৬৪]

আকাবা চুক্তির পর মুসলমানদের অবস্থা

এখানে একটি প্রশ্ন প্রণিধানযোগ্য যে, কেন মদীনার অধিবাসীরা ইসলামের আবির্ভাবের কেন্দ্র হতে দূরে থাকা সত্ত্বেও মাত্র কয়েকটি বৈঠকের ফলে ইসলামকে আপন করে নিয়েছিল, অথচ মক্কাবাসীরা নবীর অত্যন্ত নিকট সম্পর্র্কীয় হওয়া সত্ত্বেও তের বছর প্রচার তাদের মধ্যে কোন প্রভাব রাখতে পারে নি? এ পার্থক্যের কারণ দু'টি বিষয় বলা যেতে পারে।

প্রথমত ইয়াসরিববাসীরা দীর্ঘদিন ইয়া দীদের প্রতিবেশী থাকার কারণে সব সময়ই বিভিন্ন বৈঠক ও সভায় আরবদের মধ্যে একজন নবীর আগমনের কথা শুনত। ইয়া দীরা ইয়াসরিবের মূর্তিপূজকদের উদ্দেশে বলত, ঐ আরবীয় নবী ইয়া দী ধর্মকে প্রচার করবেন এবং বি হতে মূর্তিপূজাকে রহিত করবেন। এরূপ সংলাপ ইয়াসরিবের অধিবাসীদের নতুন এ ধর্মকে গ্রহণের জ মানসিকভাবে প্রস্তুত করেছিল ও তারা এর প্রতীক্ষায় ছিল। বিষয়টি তাদেরকে এতটা প্রস্তুত করেছিল যে, তারা নবী (সা.)- এর সে প্রথম সাক্ষাতেই ঈমান আনে ও নিজেদের মধ্যে কথোপকথনে বলে যে, ইনিই সেই প্রতিশ্রুত নবী যাঁর প্রতীক্ষায় ইয়া দীরা রয়েছে। তাই আমাদের উচিত হবে এ ক্ষেত্রে তাদের হতে অগ্রগামী হওয়া।

এ কারণেই পবিত্র কোরআন ইয়া দীদের সমালোচনা করে বলেছে, তোমরা মূর্তিপূজকদের আরব নবীর আগমনের কথা বলে ভীতি প্রদর্শন করতে এবং লোকদের তাঁর আগমনের সুসংবাদ দিতে। তোমরা তাওরাত হতে তাঁর আবির্ভাবের নিদর্শনসমূহ পড়ে শুনাতে। তবে কেন এখন তাঁর থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছ? কোরআন বলেছে,

(و لَمّا جاءهم كتاب مّن عند الله مصدّق لما معهم و كانوا من قبل يستفتحون على الّذين كفروا فلمّا جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين)

"যখন আল্লাহর পক্ষ হতে তাদের নিকট গ্রন্থ (কোরআন) প্রেরিত হলো যা তাদের নিকট বিদ্যমান গ্রন্থকে (তাওরাত) সত্যায়ন করে এবং তারা এর মাধ্যমে কাফিরদের (মূর্তিপূজক) ওপর বিজয়ী হওয়ার প্রতীক্ষায় ছিল। অতঃপর যখন তা আসল পূর্ব হতে তারা সে বিষয়ে জানার পরও

তা অস্বীকার (গোপন) করল। কাফিরদের ওপর আল্লাহর লানত বর্ষিত হোক।”(সূরা বাকারা : ৮৯)

দ্বিতীয় যে কারণটি মদীনাবাসীদের ইসলাম গ্রহণের পেছনে ভূমিকা রেখেছিল তা হলো দীর্ঘ একশ বিশ বছরের গোত্রীয় দ্বন্দ্ব তাদেরকে দৈহিক ও মানসিকভাবে বিপর্যস্ত করে ফেলেছিল, তারা জীবনের প্রতি হতাশ হয়ে পড়েছিল এবং মুক্তির আশা হারিয়ে ফেলেছিল। তাদের মধ্যে সংঘটিত যুদ্ধসমূহের মধ্যে শুধু বুয়া'সের যুদ্ধের ইতিহাস পড়লেই তাদের প্রকৃত অবস্থা আমাদের দৃষ্টিতে ফুটে উঠবে। এ যুদ্ধে প্রথমে আওসরা পরাজিত হয় এবং নজদে পলায়নে বাধ্য হয়। বিজয়ী খাজরাজগণ তাদের তীব্র সমালোচনা করে। আওস গোত্রপতি জাইর এতে ভীষণভাবে মর্মাহত হন। তিনি নজদে পৌঁছে নিজ অ হতে অবতরণ করে নিজ গোত্রের উদ্দেশে বক্তব্যে বলেন, “খোদার শপথ! নিহত না হওয়া পর্যন্ত যুদ্ধ করব।” জাইরের দৃঢ়তা তাঁর গোত্রের পরাজিত সৈনিকদের আত্মরক্ষা, সাহসিকতা ও ত মর্যাদা পুনরুদ্ধারে উৎসাহিত করে। তারা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে কোন মূল্যে নিজেদের অধিকার রক্ষা করবে এবং মদীনায় ফিরে আসবে। তারা জীবন বাজী রেখে যুদ্ধ করে। আত্মোৎসর্গী দল সকল সময় বিজয়ী হয়- এ সত্যটি পরাজিত আওসরা আবার প্রমাণ করে। তারা খাজরাজদের পরাজিত করে এবং তাদের খেজুর বাগানসমূহ ালিয়ে দেয়।

এরপর আওস ও খাজরাজদের মধ্যে পালাক্রমে যুদ্ধ ও সন্ধি হতে থাকে। তাদের জীবন সহ অপ্রীতিকর ও ক্লান্তিদায়ক ঘটনায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। এ অবস্থা উভয় গোত্রের জ ই অনাকাঙ্ক্ষিত বিষয় ছিল এবং তারা অসন্তুষ্টির চরম সীমায় পৌঁছেছিল। তারা মুক্তির পথ ও আশার আলো খুঁজছিল। এ কারণেই খাজরাজের ঐ ছয় ব্যক্তি নবী (সা.)- এর কথায় তাদের হারানো বস্তুর সন্ধান পেয়েছিল এবং অভিব্যক্তি করেছিল যে, সম্ভবত আল্লাহ্ আপনার মাধ্যমে আমাদের অশান্তির অবসান ঘটাবেন এবং মুক্তি দেবেন। এ সকল কারণেই ইয়াসরিবের অধিবাসীরা উদার চিত্তে ইসলামকে গ্রহণ করেছিল।

আকাবা চুক্তি ও কুরাইশদের প্রতিক্রিয়া

যেহেতু ইসলাম মক্কায় তেমন প্রসার লাভ করে নি সেহেতু কুরাইশরা ভেবেছিল ইসলাম ক্রমাবনতির দিকে এগুচ্ছে ও অচিরেই এর প্রদীপ নিভে যাবে। এ কারণে তারা ইসলামের প্রতি অনেকটা উদাসীন হয়ে পড়েছিল। তাই দ্বিতীয় আকাবার চুক্তিটি কুরাইশদের কাছে এক বিস্ফোরণের মতো মনে হয়েছিল। যখন তারা জানতে পারল ইয়াসরিবের তিয়াত্তর ব্যক্তি রাসূলের স এ মর্মে চুক্তিবদ্ধ হয়েছে যে, তাকে নিজ সন্তানের ায় প্রতিরক্ষা করবে তখন তাদের দয়ে ভীতির সঞ্চার হলো। তারা বুঝতে পারল মুসলমানরা আরব উপদ্বীপের কেন্দ্রে ঘাঁটি স্থাপন করতে যাচ্ছে। তারা আশংকা করল মুসলমানরা তাদের সমগ্র শক্তিকে যা এতদিন বিক্ষিপ্ত ছিল তা কেন্দ্রীভূত করে একত্ববাদী ইসলামকে প্রতিষ্ঠা করতে যাচ্ছে এবং এতে মক্কার মূর্তিপূজা মকির সম্মুখীন হতে যাচ্ছে।

কুরাইশ গোত্রের প্রধান ব্যক্তিবর্গ পরদিন সকালে বিষয়টি জানার পর নিশ্চিত হওয়ার লক্ষ্যে খাজরাজ গোত্রের হ যাত্রীদের নিকট গিয়ে বলল, "আমরা জানতে পেরেছি তোমরা গত রাতে মুহাম্মদের স প্রতিরক্ষা চুক্তি করেছ এবং তাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছ যে, আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে।" খাজরাজগণ শপথ করে বলল, "আমরা কখনই চাই না তোমাদের ও আমাদের মধ্যে যুদ্ধের অি প্র লিত হোক।"

ইয়াসরিবের হ কাফেলায় প্রায় পাঁচশ ' লোক ছিল। তাদের মধ্যে মাত্র তিয়াত্তর জন পূর্ব রাত্রিতে রাসূলের স চুক্তিবদ্ধ হয়েছিল। অ রা সে সময় ঘুমে অচেতন ছিল এবং এ ঘটনা সম্পর্কে অবহিত ছিল না। যেহেতু তারা মুসলমান ছিল না তাই বিষয়টি তাদের জানা ছিল না। এ কারণে তারা শপথ করে এ ধরনের ঘটনাকে অস্বীকার করে বিষয়টিকে মিথ্যা বলে ঘোষণা করল। খাজরাজ নেতা আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই সমগ্র ইয়াসরিবের ওপর যার নেতৃত্বের প্রস্তুতি চলছিল সে বলল, "এ ধরনের কোন ঘটনাই ঘটে নি এবং খাজরাজ গোত্রের লোকেরা আমার পরামর্শ ব্যতিরেকে এমন কাজ করতে পারে না।" কুরাইশ দলপতিরা বিষয়টিকে আরো খতিয়ে দেখার

জ   অ দেরও প্রশ্ন করতে লাগল। সেখানে যে সব মুসলমান উপস্থিত ছিলেন তাঁরা বুঝলেন তাঁদের গোপন বৈঠকের বিষয়টি ফাঁস হয়ে গেছে। তাই সময়ের অপচয় না করে নিজেরা পরিচিত হওয়ার পূর্বেই মক্কা ত্যাগের পরিকল্পনা নিলেন ও ত্বরিৎ মদীনার পথ ধরলেন।

নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই বেশ কিছু মদীনাবাসীর মক্কা ত্যাগের বিষয়টি কুরাইশদের সন্দেহকে (চুক্তি হওয়া) আরো ঘনীভূত করল। তারা বুঝতে পারল যে, তারা সঠিক তথ্যই পেয়েছে। ফলে তারা ইয়াসরিববাসীদের পশ্চাদ্ধাবনে তৎপর হলো। কিন্তু এতে তারা তেমন সফল হলো না। কারণ প্রায় সকল ইয়াসরিববাসী তাদের সীমার বাইরে চলে গিয়েছিল। শুধু সা'দ ইবনে উবাদা নামক এক ব্যক্তিকে তারা ধরতে সক্ষম হয়েছিল। অবশ্য ঐতিহাসিক ইবনে হিশামের মতে দু'ব্যক্তিকে তারা নাগালে পেয়েছিল। তাদের একজন হলো সা'দ ইবনে উবাদা এবং অপর জন হলো মুনজির ইবনে উমার। দ্বিতীয় জন তাদের হাত থেকে ছুটে পালায়। কুরাইশরা হিং তার সাথে সা'দ ইবনে উবাদার মাথার চুল ধরে টানতে লাগল ও তাঁকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে গেল। কুরাইশদের এক ব্যক্তি তাঁর এ অবস্থাদৃষ্টে সহানুভূতিশীল হয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসা করল, "মক্কার কোন ব্যক্তির সে   তোমার কি চুক্তি নেই?" তিনি বললেন, "হ্যাঁ। মুতয়েম ইবনে আদীর সে   আমার নিরাপত্তা চুক্তি রয়েছে। কারণ আমি ইয়াসরিবের ওপর দিয়ে যাওয়ার সময় তার জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা বিধান করতাম।"

এ কথা শুনে কুরাইশ ব্যক্তিটি তাঁকে মুক্তি দানের উদ্দেশ্যে মুতয়েম ইবনে আদীর শরণাপন্ন হলো এবং তাঁকে বলল, "খাজরাজ গোত্রের এক ব্যক্তি বন্দী হয়েছে এবং কুরাইশরা তাকে নির্যাতন করছে। সে তোমার সাহায্য কামনা করছে ও তোমার সাহায্যের অপেক্ষায় রয়েছে।" মুতয়েম ঐ ব্যক্তির সে   উক্ত স্থানে এসে দেখল ব্যক্তিটি অ   কেউ নয় সা'দ ইবনে উবাদা যাঁর নিরাপত্তায় মুতয়েমের বাণিজ্য কাফেলা নিরাপদে গন্তব্যে পৌঁছায়। তিনি তাঁকে কুরাইশদের হাত থেকে মুক্তি দিয়ে ইয়াসরিবে পাঠানোর ব্যবস্থা করলেন। সা'দ ইবনে উবাদার বন্দী হওয়ার বিষয়টি অ   া মুসলমান ও তাঁর বন্ধুরা ইতোমধ্যে জেনেছিলেন। তাঁরা তাঁকে মুক্ত করার উদ্দেশ্যে মক্কায় ফিরে

আসার পরিকল্পনা করছিলেন। এমন সময় তাঁরা সা'দকে ফিরে আসতে দেখলেন। সা'দ তাঁদের নিকট নিজ করুণ অবস্থার বর্ণনা দান করলেন।[৩৬৫]

ইসলামের নৈতিক প্রভাব

প্রাচ্যবিদরা প্রচেষ্টা চালিয়ে থাকেন ইসলামের প্রসার ও প্রভাব বিস্তারের বিষয়টি তরবারীর মাধ্যমে হয়েছিল তা প্রমাণ করার জ । এ দাবি কতটা ভিত্তিহীন পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহ তা প্রমাণ করবে। আমরা এর উদাহরণ হিসাবে হিজরতের পূর্বে ইয়াসরিবে কি ঘটেছিল তা পাঠকদের সামনে এখানে উপস্থাপন করছি। এতে স্পষ্টরূপে প্রমাণিত হবে যে, ইসলামের প্রচার ও প্রসার প্রথম থেকেই এর আকর্ষণীয় আহবানের ফলশ্রুতিতে ঘটেছিল। এর আহবান যে কোন শ্রোতাকেই আকৃষ্ট করত। ইসলামের প্রসিদ্ধ মুখপাত্র ও প্রচারক মুসআব ইবনে উমাইর রাসূল (সা.)- এর পক্ষ হতে মদীনায় দীন প্রচারের ও শিক্ষাদানের দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিলেন।

তিনি আসআদ ইবনে জুরারার আমন্ত্রণে রাসূলের পক্ষ হতে প্রেরিত হয়েছিলেন। এ দু'ব্যক্তি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন ইয়াসরিবের প্রসিদ্ধ ব্যক্তিদেরকে যুক্তি- প্রমাণের মাধ্যমে ইসলামের দিকে দাওয়াত দেবেন। একদিন তাঁরা মদীনার এক বাগানে মুসলমানদের সমাবেশে পৌঁছে দেখলেন সেখানে বনি আবদুল আশহাল গোত্রের দু'প্রধান ব্যক্তি সা'দ ইবনে মায়ায এবং উসাইদ ইবনে হাদ্বিরও রয়েছেন। এ সময় সা'দ ইবনে মায়ায উসাইদকে উদ্দেশ্য করে বললেন, "তোমার তরবারি কোষমুক্ত কর এবং এ দু'ব্যক্তির সামনে গিয়ে বল তারা যেন ইসলাম প্রচার করা হতে বিরত হয় ও নিজ বক্তব্যের মাধ্যমে আমাদের সহজ- সরল মানুষদের প্রতারিত না করে। তোমাকে এটি করতে বলার কারণ আমি খোলা অস্ত্র হাতে আসআদ ইবনে জুরারার মুখোমুখি হতে চাই না যেহেতু সে আমার খালাতো ভাই। ”

উসাইদ উত্তেজিত ভ তে তরবারি উন্মোচিত করে তাঁদের দু'জনের সামনে উপস্থিত হয়ে কঠোর ভাষায় সা'দ- এর উদ্ধৃত কথাগুলো পুনরাবৃত্তি করলেন। রাসূলের হাতে প্রশিক্ষিত দীন প্রচারক বাগ্মী মাসআব ইবনে উমাইর শান্ত কে তাঁকে বললেন, "আমরা কি কিছু সময় সংলাপের জ বসতে পারি?" যদি আমাদের কথা তোমার পছন্দ না হয় তাহলে আমরা যে পথে এসেছি সে পথেই ফিরে যাব।"উসাইদ বললেন, "যুক্তিপূর্ণ ও ায্য কথা বলেছ।" অতঃপর নিজ তরবারি কোষাবদ্ধ করে তাঁদের কথা শোনার জ কিছুক্ষণ বসলেন। মুসআব কোরআনের কয়েকটি

আয়াত তেলাওয়াত করে ব্যাখ্যা দিলেন। একদিকে পবিত্র কোরআনের সুমধুর ও আকর্ষণীয় বাণী, অ দিকে মাসআবের যুক্তিপূর্ণ বক্তব্য তাঁকে আকৃষ্ট করল। সে আত্মহারা হয়ে বলল,

كيف تصنعون إذا أردتم أن تدخلوا هذا الدّين

"কিভাবে এ দীনে প্রবেশ করা যায় (তোমরা প্রবেশ করেছ)?" তাঁরা বললেন, "আল্লাহ্‌র একত্বের সাক্ষী দাও, নিজ দেহ ও পোশাক পানি দ্বারা পবিত্র কর এবং নামায পড়।"

উসাইদ ইতিপূর্বে তাঁদের দু'জনের রক্ত ঝরানোর উদ্দেশ্যে আসলেও এখন মুক্ত মনে আল্লাহ্‌র একত্ব ও রাসূলের নবুওয়াতের সাক্ষ্য দিলেন। নিকটবর্তী পানির আধার হতে পানি নিয়ে নিজ দেহ ও পোশাক পবিত্র করলেন এবং কালেমা পড়তে পড়তে সা'দের নিকট এসে উপস্থিত হলেন। সা'দ ইবনে মায়ায অধৈর্য হয়ে উসাইদের অপেক্ষায় বসেছিলেন। আকস্মিকভাবে উসাইদ হাস্যোজ্জ্বল মুখ নিয়ে তাঁর দিকে এগিয়ে এলেন। সা'দ ইবনে মায়ায তাঁর হাস্যোজ্জ্বল চেহারা দেখে সকলের উদ্দেশে বললেন, নিঃসন্দেহে উসাইদ তার ধর্মবি াস পরিবর্তন করেছে এবং যে উদ্দেশ্যে গিয়েছিল তাতে সফল হয় নি। উসাইদ পুরো ব্যাপারটি তাঁর নিকট বর্ণনা করলে সা'দ ক্রোধে ফেটে পড়লেন এবং সিদ্ধান্ত নিলেন, যে করেই হোক এ দু'ব্যক্তিকে দীন প্রচারের কাজ থেকে বিরত করবেন। কিন্তু উসাইদের ায় তিনিও একই পরিণতির শিকার হলেন। তিনি মাসআবের প্রাঞ্জল, যুক্তিপূর্ণ, দৃঢ় ও আকর্ষণীয় বক্তব্যের দ্বারা প্রভাবিত হলেন। নিজ সিদ্ধান্তের জ মনে মনে অনুশোচনা করলেন এবং তার ক্রোধ প্রশমিত হয়ে সৌহার্দ্যে পরিণত হলো। তিনি একত্ববাদী ধর্ম ইসলাম গ্রহণ করলেন এবং ঐ স্থানেই গোসল করে নিজ পোশাক ধৌত ও পবিত্র করে নিজ গোত্রে ফিরে এসে তাদের উদ্দেশে বললেন, "তোমাদের মাঝে আমার অবস্থান কোথায়?" তারা বলল, "তুমি আমাদের গোত্রের প্রধান।"তিনি বললেন, "আমি আমার গোত্রের কোন পুরুষ বা নারীর সে কোন কথা বলব না যতক্ষণ না তারা ইসলাম ধর্মকে গ্রহণ করে।" গোত্র প্রধানের এ বক্তব্য গোত্রের সকলের মুখে মুখে প্রচারিত হতে লাগল এবং নবীকে স্বচক্ষে দেখার পূর্বেই একত্ববাদী এ ধর্মের প্রতিরক্ষায় তারা রত হলো।[৩৬৬]

ইসলামের ইতিহাসের এরূপ অসংখ্য উদাহরণ আমাদের নিকট রয়েছে যেগুলো প্রাচ্যবিদদের ইসলাম প্রসারের তথাকথিত ধারণাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে। কারণ এ ঘটনাসমূহে না কোন শক্তি প্রয়োগের চিহ্ন রয়েছে, না প্রমাণ রয়েছে অস্ত্র ব্যবহারের ও স্বাধীনতা হরণের। তারা নবীর কথাও শোনে নি, নবীকে দেখেও নি তদুপরি নবীর প্রেরিত এক প্রচারকের যুক্তিপূর্ণ কথায় কয়েক মুহূর্তের মধ্যে তাদের ব্যাপক মানসিক পরিবর্তন ঘটেছিল। অ   কোন কারণ সেখানে প্রভাব রাখে নি।

কুরাইশদের মধ্যে ভীতির সঞ্চার

ইয়াসরিববাসীদের পক্ষ থেকে মুসলমানদের পৃষ্ঠপোষকতা ও সহযোগিতার বিষয়টি কুরাইশদের উদাসীনতার ঘুম ভেঙে দিল। ফলে তারা নতুন করে মুসলমানদের নির্যাতন ও নিপীড়নের মাধ্যমে ইসলামের প্রসারের পথকে রুদ্ধ করার পরিকল্পনা করল।

মহানবী (সা.)- এর সাহাবিগণ মুশরিকদের নির্যাতনের বিষয়ে নবীর নিকট অভিযোগ করলেন। তাঁরা নবীর নিকট অ স্থানে হিজরত করার অনুমতি চাইলেন। নবী তাঁদের নিকট কয়েক দিনের সময় নিলেন। অতঃপর বললেন, "তোমাদের হিজরতের জ সর্বোত্তম স্থান হলো ইয়াসরিব। তোমরা একে একে প্রশান্ত চিত্তে সেখানে চলে যাও।" রাসূলের নির্দেশ পাওয়ার পর মুসলমানরা বিভিন্ন বাহানা দেখিয়ে একে একে মক্কা থেকে বেরিয়ে গেলেন ও মদীনার পথ ধরলেন। কুরাইশরা কিছু দিনের মধ্যেই বিষয়টি আঁচ করতে পারল এবং মুসলমানদের বহির্গমন রোধের পরিকল্পনা নিল। তারা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল মক্কা হতে কোন মুসলমানকে বেরিয়ে যেতে দেখলে তাকে জোরপূর্বক ফিরিয়ে আনা হবে এবং যদি বহির্গামী ব্যক্তিটির স্ত্রী ও সন্তান কুরাইশ বংশোদ্ভূত হয় ও সে তাদের স নিয়ে হিজরত করছে জানা যায় তবে তার স্ত্রীর বহির্গমনের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হবে। তবে কুরাইশরা কিছুটা ভীতও হয়েছিল। সে কারণে কাউকে হত্যা করা থেকে বিরত ছিল এবং হিজরত করছে এমন কোন ব্যক্তিকে পেলে তাকে বন্দী করা ও শারীরিক কিছু নির্যাতন করা ব্যতীত অ কিছু করত না। অবশ্য কুরাইশদের এ পরিকল্পনা তেমন সফল হয় নি।[৩৬৭]

অবশেষে দেখা গেল অনেকেই কুরাইশদের হাত গলিয়ে বেরিয়ে গেছেন এবং ইয়াসরিবে পৌঁছতে সক্ষম হয়েছেন। কিছু দিনের মধ্যে অবস্থা এমন দাঁড়াল যে, মক্কায় নবী (সা.), হযরত আলীসহ কিছু বন্দী ও অসুস্থ মুসলমান ব্যতীত কেউই অবশিষ্ট রইল না। এ অবস্থা লক্ষ্য করে কুরাইশরা আরো শ ি ত হলো এবং তারা ইসলামের বিস্তার রোধের উদ্দেশ্যে 'দারুন নাদওয়া ' নামক মন্ত্রণাকক্ষে সভায় মিলিত হলো। তারা এ উদ্দেশ্যে বিভিন্ন প্রস্তাব রাখল। কিন্তু তাদের সকল

পরিকল্পনাই রাসূলের বিশেষ ব্যবস্থাপনার নিকট পরাস্ত হলো। পরিশেষে মহানবী (সা.) নবুওয়াতের চতুর্দশ বর্ষের রবিউল আউয়াল মাসে মদীনায় হিজরত করলেন।

রাসূল (সা.)- এর হিজরতকে বানচাল করার সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হওয়ায় এবং মুসলমানরা দ্বিতীয় প্রচার কেন্দ্র হস্তগত করায় তারা সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ল। মক্কায় যে সকল মুসলমান অবশিষ্ট ছিলেন মহানবী তাঁদের মদীনায় হিজরত করে আনসারদের সং মিলিত হওয়ার নির্দেশ দিলেন এবং বললেন, "আল্লাহ্ তোমাদের জ একদল ভাই সৃষ্টি করে দিয়েছেন এবং বাসস্থানও প্রস্তুত করেছেন।"

পঁচিশতম অধ্যায় : হিজরতের প্রথম বছরের ঘটনাপ্রবাহ

হিজরতের ঘটনা[৩৬৮]

কুরাইশ গোত্রপ্রধানরা ‘দারুন নাদওয়া’য় জটিল এক সমস্যার সমাধানে পরস্পর মত বিনিময়ের মাধ্যমে সম্মিলিত উদ্যোগ গ্রহণের প্রচেষ্টায় রত হলো।

মক্কার মুশরিকরা নবুওয়াতের দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ বর্ষে বিপদের অশনি সংকেত শুনতে পেয়েছিল। মুসলমানদের মদীনায় ঘাঁটি স্থাপন এবং মহানবীকে সর্ববিধ সহযোগিতা প্রদানে মদীনাবাসীদের সম্মতির বিষয়টি এ বিপদের স্পষ্ট আলামত।

নবুওয়াতের ত্রয়োদশ বছরের রবিউল আউয়াল মাসে মহানবীর হিজরতের অব্যবহিত পূর্বে তিনি, হযরত আলী, হযরত আবু বকর এবং অসুস্থ ও বৃদ্ধ কিছুসংখ্যক মুসলমানই কেবল মক্কায় অবস্থান করছিলেন এবং এঁরা সকলেই মক্কা ত্যাগের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। এ সময়ই কুরাইশরা মুসলমানদের জ   বিপজ্জনক এক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল।

দারুন নাদওয়ায় কুরাইশ প্রধানদের পরামর্শ সভা বসলে সভার উদ্যোক্তারা মদীনায় মুসলমানদের সমবেত হওয়া এবং আওস ও খাজরাজ গোত্রের স   নিরাপত্তা চুক্তি সম্পাদনের বিপদ ও এর ভয়াবহতা তুলে ধরে আলোচনা শুরু করল। তারা বলল, “আমরা পবিত্র হারাম- এর অধিবাসীরা সকল গোত্রের নিকটই সম্মানিত ছিলাম, কিন্তু মুহাম্মদ আমাদের মাঝে বিভেদ ও অনৈক্য সৃষ্টি করে বিপদ সৃষ্টি করেছে। আমাদের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেছে। আমাদের এখন মুক্তির পথ খুঁজতে হবে। আমাদের মুক্তির একমাত্র পথ হচ্ছে, আমাদের মধ্য হতে সাহসী কেউ গোপনে মুহাম্মদকে হত্যা করবে। যদি এতে বনি হাশিম রক্তপণ চায় তাহলে আমরা সকলে তা পরিশোধ করব।”

একজন অপরিচিত ব্যক্তি নিজেকে নাজদের অধিবাসী বলে পরিচয় দান করে বলল, “তোমাদের এ পরিকল্পনা বাস্তবায়নযোগ্য নয়। কারণ বনি হাশিম মুহাম্মদের হত্যাকারীকে হত্যা করবে এবং কোন অবস্থায়ই তারা মুহাম্মদের রক্তপণ নিয়ে সন্তুষ্ট হবে না। তাই যে ব্যক্তি মুহাম্মদকে হত্যা

করতে চায় সে যেন নিজ জীবনের আশা ত্যাগ করে। আমার মনে হয় তোমাদের মাঝে এমন কোন ব্যক্তি নেই।”

আবুল বাখতারী নামের অপর এক গোত্রপতি বলল, “আমার মনে হয় মুহাম্মদকে বন্দী করাই অধিকতর যুক্তিসংগত। আমরা তাকে বন্দী করে খুবই কম খাদ্য ও পানীয় দিয়ে কোনরকমে বাঁচিয়ে রাখব এবং এভাবে তার দীনের প্রচারকে বন্ধ করব।” নাজদের অধিবাসী পরিচয়দানকারী বৃদ্ধ ব্যক্তিটি পুনরায় বলল, “পূর্বের পরামর্শের ায় এটিও অগ্রহণীয়। কারণ এ ক্ষেত্রে বনি হাশিম তোমাদের সে যুদ্ধ ও দ্বন্দ্বে লিপ্ত হবে এবং অবশেষে তারা তাকে মুক্ত করে ছাড়বে। যদি তারা নিজেরা এ কাজে সক্ষম না হয় তবে হে র সময় অ গোত্রসমূহের সাহায্য নিয়ে তারা তা করবে।”

তৃতীয় এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলল, “আমাদের উচিত হবে মুহাম্মদকে একটি ক্ষিপ্ত উটের ওপর উঠিয়ে শক্ত করে বেঁধে উটটিকে ক্ষেপিয়ে দেয়া। ফলে উট তাকে পাথরের সে আছড়ে ছিন্নভিন্ন করে মেরে ফেলবে। যদি সে বেঁচেও যায় ও অপরিচিত কোন গোত্রের আশ্রয় পায় সেখানে তার দীন প্রচার করুক। সে গোত্রও মূর্তিপূজক হয়ে থাকলে তাকে উপযুক্ত শাস্তি প্রদান করবে।”

নাজদের বৃদ্ধ ব্যক্তিটি তৃতীয় বারের মতো এ মতটিকেও যুক্তিসংগত নয় বলে মন্তব্য করে বলল, “মুহাম্মদের সুন্দর বক্তব্য ও আকর্ষণীয় কথার বিষয়ে তোমরা অবহিত। সে তার বাগ্মিতা ও যাদুকরী কথার মাধ্যমে অ গোত্রকে প্রভাবিত করে তার অনুসারী বানিয়ে ফেলবে ও তাদেরকে তোমাদের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলবে।”

এ সময় সমগ্র সভায় পিনপতন নীরবতা লক্ষ্য করা গেল। অকস্মাৎ নাজদের বৃদ্ধ ব্যক্তিটি আবু জাহলের কানে ফিসফিস করে কিছু বলল। তখন আবু জাহল বলল, “একমাত্র নির্ভুল পথ হলো আমরা প্রতিটি গোত্র থেকে এক ব্যক্তিকে মনোনীত করব। তারা সম্মিলিতভাবে রাত্রিতে মুহাম্মদের গৃহে আক্রমণ করবে এবং তাকে টুকরো টুকরো করে ফেলবে। এতে করে মুহাম্মদের খুনের দায়দায়িত্ব সকল গোত্রের ওপরই বর্তাবে এবং বনি হাশিম সকলের সে যুদ্ধে সক্ষম হবে

না।" এ মতটি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হলো। তখন প্রতিটি গোত্র হতে একেক ব্যক্তিকে মনোনীত করা হলো। তাদেরকে দায়িত্ব দেয়া হলো পরের রাত্রিতে সম্মিলিতভাবে উপরিউক্ত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করার জ   ।[৩৬৯]

গায়েবী সাহায্য

এ হঠকারী ও অবিবেচক গোত্রপ্রধানরা ভেবেছিল তাদের এ পরিকল্পনার মাধ্যমে আল্লাহপাকের মদদপুষ্ট নবী (সা.)- এর নবুওয়াতের মিশনকে চিরতরে স্তব্ধ করে দেবে। তারা এ চিন্তা করে নি যে, মহানবীও পূর্ববর্তী অ া নবীর ায় ঐশী সাহায্যপ্রাপ্ত এবং যে অদৃশ্য হাত বিগত তের বছর ইসলামের প্রোজ্জ্বল মশালকে তীব্র বাতাসের মোকাবিলায় দীপ্তমান রেখেছে তা তাদের এ পরিকল্পনাকে নস্যাৎ করে দিতে পারে।

মুফাসসিরগণ বর্ণনা করেছেন, মহান আল্লাহ্ নিম্নোক্ত আয়াতটি অবতীর্ণের মাধ্যমে রাসূলকে মুশরিকদের ষড়যন্ত্র সম্পর্কে অবহিত করেন এবং তাদের ষড়যন্ত্রের নিষ্ফলতা সম্পর্কে আ াস দেন :

(و إذ يمكربك الّذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك و يمكرون و يمكر الله و الله خير الماكرين)

“এবং যখন কাফিররা তোমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে তোমাকে বন্দী করবে অথবা হত্যা করবে অথবা তোমাকে নির্বাসিত করবে। তারা যেমন ষড়যন্ত্র করে মহান আল্লাহ্ও তেমনি পরিকল্পনা ও কৌশল অবলম্বন করেন এবং নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সর্বোত্তম কৌশলী”[৩৭০]

মহানবী (সা.) আল্লাহর পক্ষ থেকে মদীনার উদ্দেশে যাত্রার জ নির্দেশপ্রাপ্ত হলেন। কিন্তু মূর্তিপূজকদের নিয়োজিত কঠোর দয়ের ব্যক্তিদের চোখ এড়িয়ে মক্কা হতে বের হওয়া সহজ কাজ নয়। বিশেষত মক্কা হতে মদীনার দূরত্ব খুব বেশি হওয়ার কারণে। যদি রাসূল সঠিক পরিকল্পনা ও মানচিত্র সহকারে মদীনার দিকে যাত্রা না করতেন তবে সম্ভাবনা ছিল মক্কার মুশরিকদের তাঁকে অনুসরণ করে বন্দী ও হত্যা করার।

ঐতিহাসিকগণ মহানবীর হিজরতের ঘটনাটি বিভিন্নভাবে বর্ণনা করেছেন। এ সকল বর্ণনার মধ্যে এতটা পার্থক্য পরিদৃষ্ট হয়েছে যা প্রায় বিরল। ‘সীরাতে হালাবী’ গ্রন্থের লেখক মোটামুটিভাবে এ পার্থক্যপূর্ণ বর্ণনাসমূহের মধ্যে সমন্বয়ের চেষ্টা করলেও এ সকল বর্ণনার বৈপরীত্য অবসানে সক্ষম হন নি।

যে বিষয়টি লক্ষণীয় তা হলো শিয়া ও সুন্নী উভয় হাদীসবেত্তাগণই হিজরতের ঘটনাটি এমনভাবে বর্ণনা করেছেন যাতে করে এটি মুজিযা হিসাবে প্রতীয়মান হয়। কিন্তু হিজরতের ঘটনার পটভূমি যদি কেউ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে লক্ষ্য করেন তাহলে দেখবেন মুশরিকদের হাত থেকে মহানবী (সা.)-এর মুক্তি তাঁর বিশেষ পরিকল্পনা ও সতর্কতামূলক পদক্ষেপের কারণে ঘটেছিল এবং আল্লাহ্ চেয়েছিলেন প্রাকৃতিক নিয়মে ও পরিকল্পনার মাধ্যমেই তাঁর নবী মুক্তি লাভ করুক- মুজিযার মাধ্যমে বা অলৌকিকভাবে নয়। এর প্রমাণ হলো নবীর বুদ্ধিবৃত্তিক ও প্রাকৃতিক উপায়সমূহের আশ্রয় গ্রহণ, যেমন আলী (আ.)- কে নিজ শয্যায় শায়িত হতে নির্দেশ দান, গুহায় আশ্রয় গ্রহণ প্রভৃতি পদ্ধতি অবলম্বনের মাধ্যমে তিনি নিজেকে কুরাইশদের কব্জা থেকে মুক্ত করেন।

ওহীবাহী ফেরেশতা কর্তৃক মহানবীকে মুশরিকদের ষড়যন্ত্র সম্পর্কে অবহিত করা

ওহীবাহী ফেরেশতা মহানবীকে মুশরিকদের কপট ষড়যন্ত্র সম্পর্কে অবহিত করেন ও তাঁকে হিজরতের প্রস্তুতি নেয়ার পরামর্শ দেন। মুশরিকদের বিভ্রান্ত করতে ও রাসূলের পশ্চাদ্ধাবন রোধে নবীকে তাঁর শয্যায় অ কাউকে শায়িত করার পরামর্শ দেয়া হয়। এতে করে তারা ভাববে নবী গৃহ হতে বাইরে কোথাও যান নি, বরং গৃহেই অবস্থান করছেন। তাই তারা তাঁর গৃহই শুধু অবরোধ করে রাখবে এবং মক্কার ভিতরের ও আশেপাশের পথগুলো স্বাধীনভাবে চলাচলের জ উন্মুক্ত থাকবে।

এ কারণেই মহানবী (সা.) তাদের চোখকে এড়িয়ে বিশেষ স্থানে পৌঁছতে ও আশ্রয় নিতে সক্ষম হয়েছিলেন।

এখন দেখা যাক কোন্ ব্যক্তি নবীর শয্যাস্থানে নিজের জীবনকে বিপন্ন করে শুয়েছিলেন। নিঃসন্দেহে বলা যায়, তিনি সে ব্যক্তিই হবেন যিনি রাসূলের ওপর প্রথম ঈমান এনেছিলেন এবং তাঁর মোমবাতিরূপ অস্তিত্বের চারিদিকে সব সময় প্রজাপতির মতো ঘুরতেন। অবশ্যই এ ব্যক্তিটি আলী ছাড়া অ কেউ নন। তাই মহানবী (সা.) আলী (আ.)- কে লক্ষ্য করে বললেন, "আজ রাতে তুমি আমার শয্যায় ঘুমাবে এবং যে সবুজ রঙের চাদরটি দিয়ে আমি নিজেকে ঢাকি তা দিয়ে

নিজেকে আচ্ছাদিত করবে। শত্রুরা আমাকে হত্যার পরিকল্পনা নিয়েছে। তাই আমি মদীনায় হিজরত করছি।”

হযরত আলী (আ.) নবীর শয্যায় ঘুমালেন। কিছুটা রাত্রি হয়ে আসলে চল্লিশ জন সন্ত্রাসী নবীর গৃহকে ঘিরে ফেলল। তারা দরজার ফাঁক দিয়ে উঁকি দিয়ে গৃহের অভ্যন্তরে সব কিছু স্বাভাবিকভাবে লক্ষ্য করে ভাবল শয্যায় যে ব্যক্তি ঘুমিয়ে রয়েছেন তিনিই স্বয়ং নবী। মহানবী এ সময় সিদ্ধান্ত নিলেন গৃহ থেকে বেরিয়ে আসবেন। শত্রুরা গৃহের চারিদিক অবরোধ করে রেখেছিল এবং সতর্কতার স পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছিল। অপর দিকে মহাশক্তির অধিকারী আল্লাহর ইচ্ছা হলো ইসলামের সম্মানিত নেতাকে তাঁর শত্রুদের কবল থেকে মুক্তি দেবেন। মহানবী (সা.) সূরা ইয়াসীনের প্রথম কয়েকটি আয়াত (فهم لا يبصرونপর্যন্ত)- যা এ ঘটনার স সংগতিশীল ছিল তেলাওয়াত করলেন ও গৃহ হতে বেরিয়ে এসে নির্দিষ্ট গন্তব্যের দিকে রওয়ানা হলেন। নবী কিরূপে অবরোধকারীদের চোখ এড়িয়ে বেরিয়ে এলেন তা স্পষ্ট নয়। প্রসিদ্ধ শিয়া মুফাসসির আলী ইবনে ইবরাহীম কুমী و إذ يمكربك الّذين كفروا আয়াতটির তাফসীরে বর্ণনা করেছেন, নবী (সা.) যখন গৃহ হতে বেরিয়ে আসেন তখন অবরোধকারীরা সকলেই ঘুমিয়ে ছিল এবং ভোর হলে গৃহে প্রবেশের চিন্তা করেছিল। তারা ভাবেনি যে, রাসূল তাদের ষড়যন্ত্র সম্পর্কে অবহিত আছেন।

অ ঐতিহাসিকগণ বর্ণনা করেছেন[৩৭১] তারা নবীর গৃহ অবরোধ করার সময় থেকে জেগেই ছিল, কিন্তু নবী অলৌকিকভাবে তাদের চোখকে ফাঁকি দিয়ে গৃহ থেকে বের হয়ে আসেন।

যদিও এ ধরনের মুজিযা সংঘটিত হওয়ার বিষয়টিতে সন্দেহ পোষণ করা যায় না। কিন্তু প্রকৃতই এরূপ মুজিযা প্রদর্শনের প্রয়োজন ছিল কি? হিজরতের পুরো ঘটনা পর্যালোচনা করলে স্পষ্টরূপে বলা যায় যে, মহানবী (সা.) তাঁর গৃহ অবরোধের পূর্বেই শত্রুদের ষড়যন্ত্র সম্পর্কে অবহিত হয়েছিলেন। তাই নিজের মুক্তির জ তিনি যে পরিকল্পনা নিয়েছিলেন তা সাধারণ বুদ্ধিবৃত্তিক ছিল, এর মধ্যে কোন অলৌকিকত্বের প্রয়োজন ছিল না। তাই তিনি মুজিযার পথ অবলম্বন না করে স্বাভাবিক প্রক্রিয়াতেই শত্রুকে বিভ্রান্ত করার উদ্দেশ্যে নিজ শয্যায় আলীকে শুইয়ে দিয়ে গৃহ

হতে বেরিয়ে এসেছিলেন, এমনকি তাঁর গৃহ অবরোধের পূর্বেই তিনি গৃহ হতে চলে যেতে পারতেন। তাই মুজিযা প্রদর্শনের প্রয়োজন ছিল না।

অবশ্য সম্ভাবনা রয়েছে মহানবী (সা.) কোন বিশেষ কারণে অবরোধ পর্যন্ত অপেক্ষা করেছিলেন, তবে কারণটি আমাদের জানা নেই। তিনি রাত্রিতে গৃহ হতে বেরিয়ে আসেন- এ বিষয়টি সর্বসম্মত ও অকাট্য নয়। কারণ কারো কারো মতে তিনি সন্ধ্যার পূর্বেই গৃহ ত্যাগ করেছিলেন।[৩৭২]

নবুওয়াতের গৃহে শত্রুদের আক্রমণ

কুফরী শক্তি নবুওয়াতের গৃহ অবরোধ করে রেখেছিল এবং নবীকে তাঁর শয্যায় হত্যা করার পরিকল্পনা নিয়েছিল। তাদের কেউ কেউ চেয়েছিল মধ্যরাতেই গৃহে প্রবেশ করে তাঁকে হত্যা করতে। কিন্তু আবু লাহাব প্রতিবাদ করে বলেছিল, বনি হাশিমের নারী ও শিশুরা গৃহে রয়েছে, তাদের ক্ষতির আশংকা রয়েছে। কেউ কেউ বর্ণনা করেছেন তাদের দেরী করার কারণ ছিল তারা দিবালোকে বনি হাশিমের সামনে তাঁকে হত্যা করবে যাতে করে বনি হাশিম বুঝতে পারে তাঁর হত্যাকারী এক ব্যক্তি নয়। তাই তারা ভোরের আলোয় তাদের পরিকল্পনা বাস্তবায়নের ইচ্ছা পোষণ করেছিল।[৩৭৩]

অন্ধকারের আচ্ছাদন একের পর এক উন্মোচিত হয়ে সুবহে সাদিকের আলো দিগন্তের বুকে প্রতিভাত হয়ে উঠল। অবরোধকারী মুশরিকদের অন্তর আশ্চর্যরকম আলোড়িত হতে শুরু করল। তারা আশান্বিত ছিল কিছুক্ষণের মধ্যেই তাদের লক্ষ্যে পৌঁছতে পারবে। তারা চরম উত্তেজনা নিয়ে রাসূলের কক্ষে উন্মুক্ত তরবারি নিয়ে প্রবেশ করল। তখন আলী শয্যা হতে জাগরিত হয়ে যে চাদরে নিজেকে আবৃত করেছিলেন তা সরিয়ে সম্পূর্ণ প্রশান্ত চিত্তে তাদের প্রশ্ন করলেন, "তোমরা কি চাও?" তারা বলল, "মুহাম্মদকে চাই। সে কোথায়?" আলী (আ.) বললেন, "তোমরা কি তাঁকে আমার নিকট আমানত রেখে গিয়েছিলে, তাই এখন আমাকে তাঁর অবস্থান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করছ? তিনি এখন গৃহে নেই।"

প্রচণ্ড ক্ষোভ তাদের চেহারায় প্রকাশিত হলো এবং ভোর পর্যন্ত অপেক্ষা করায় চরমভাবে অনুতপ্ত হলো। এ পরিকল্পনা ভেস্তে যাওয়ার দায়িত্ব তারা আবু লাহাবের কাঁধে আরোপ করে ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগল। কারণ সে- ই রাত্রিতে আক্রমণে বাদ সেধেছিল।

কুরাইশরা তাদের ষড়যন্ত্রের নিষ্ফলতায় কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ল। কেউ কেউ বলল, এত স্বল্প সময়ে মুহাম্মদ মক্কা হতে বেরিয়ে যেতে পারে নি; হয় সে মক্কারই কোথাও লুকিয়ে রয়েছে, নতুবা মদীনার পথে রয়েছে। তাই তারা পশ্চাদ্ধাবনের প্রস্তুতি নিল।

সওর পর্বতের গুহায় মহানবী

এটি ঐতিহাসিক সত্য যে, মহানবী (সা.) হিজরতের প্রথম ও পরবর্তী দু'রাত্রি মক্কার দক্ষিণে (মক্কা হতে মদীনার পথের ঠিক বিপরীত দিকে) অবস্থিত সওর পর্বতের গুহায় হযরত আবু বকরের সং একত্রে অবস্থান করেছিলেন। ঐতিহাসিকভাবে এ বিষয়টি স্পষ্ট নয় যে, কিরূপে হযরত আবু বকর রাসূলের সহগামী হলেন। কারো কারো মতে আকস্মিকভাবে তা ঘটেছিল এবং রাসূল তাঁকে পথে দেখে সং নিয়েছিলেন। কোন কোন বর্ণনামতে নবী নিজ গৃহ হতে বেরিয়ে সরাসরি হযরত আবু বকরের গৃহে যান এবং তাঁকে নিয়েই সওর পর্বতের দিকে রওয়ানা হন। কেউ কেউ বলেছেন, আবু বকর রাসূলের সন্ধানে এলে আলী তাঁকে পথ দেখিয়ে দেন।[৩৭৪] অনেক ঐতিহাসিক হিজরতে নবীর সহগামী হওয়ার বিষয়টিকে প্রথম খলীফার বিশেষত্ব বলে মনে করে তাঁর ফজিলত হিসাবে বর্ণনা করে থাকেন।

মহানবীর সন্ধানে কুরাইশ গোত্র

কুরাইশদের পূর্ব পরিকল্পনা ভেস্তে গেলে তারা রাসূলকে হাতে পেতে নতুন পরিকল্পনা নিল। তারা মদীনা গমনের সকল পথ বন্ধ করে দিল এবং এ সব পথে প্রহরী নিয়োগ করল। পায়ের চিহ্ন দেখে অবস্থান শনাক্ত করতে পারদর্শী ব্যক্তিদের ডেকে আনা হলো। যে ব্যক্তি মহানবীর অবস্থান সম্পর্কে সঠিক তথ্য দিতে পারবে তার জ একশ' উট পুরস্কার ঘোষণা করা হলো। কুরাইশদের একদল মক্কার উত্তর দিকে মদীনার পথে এ কর্মে নিয়োজিত হলো। অথচ নবী (সা.) তাদের বিভ্রান্ত করতে মদীনার পথের ঠিক বিপরীতে মক্কার দক্ষিণের সওর পর্বতের গুহায় আত্মগোপন করেছিলেন। মক্কার প্রসিদ্ধ পদচিহ্ন ও চেহারা বিষয়ক বিশেষজ্ঞ আবু কারাস রাসূলের পদচি‍েহ্নর সে পরিচিত ছিল। সে তাঁর পদচিহ্ন লক্ষ্য করে এগিয়ে সওর পর্বত পর্যন্ত এসে পৌঁছল এবং কুরাইশদের উদ্দেশ্যে বলল, "মুহাম্মদের গমন পথ এ পর্যন্ত স্পষ্ট। সম্ভবত সে এ পর্বতের গুহায় আত্মগোপন করেছে।" এক ব্যক্তিকে নির্দেশ দেয়া হলো গুহার অভ্যন্তরে লক্ষ্য করার। সে গুহার মুখে এসে দেখতে পেল গুহার মুখ মাকড়সার ঘন জালে আবৃত এবং এক বুনো কবুতর সেখানে বসে ডিমে তা দিচ্ছে।[৩৭৫] সে গুহায় প্রবেশ না করেই ফিরে এসে বলল, "গুহার মুখে মাকড়সার ঘন জাল রয়েছে, তাতে বোঝা যাচ্ছে সেখানে কেউ নেই।" তিনদিন ধরে মহানবীকে ধরার জ প্রচেষ্টা চালানো হলো। অতঃপর তারা হতাশ হয়ে এ কাজ হতে বিরত হলো।

সত্যের পথে জীবন বাজি রাখা

ইতিহাসের এ অংশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হলো সত্যের পথে আলী (আ.)- এর জীবন বাজি রাখা। নিজেকে উৎসর্গ করতে পারে এমন উৎসর্গপ্রেমিক ব্যক্তিরাই সত্যের পথে জীবন বাজি রাখতে পারে। যারা জান, মাল ও ব্যক্তিত্বকে বিলিয়ে দিয়ে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক সকল শক্তিকে সত্যের পথে নিয়োজিত করতে পারে তারাই সত্যপ্রেমিকের খাতায় নাম লেখাতে পারে। তারা তাদের লক্ষ্যে যে পূর্ণতা ও সৌভাগ্য অবলোকন করে তা তাদের এ ক্ষণস্থায়ী জীবনকে তুচ্ছ করে স্থায়ী জীবনে সংযুক্ত হতে উৎসাহিত করে।

সেদিন নবীর শয্যায় আলী (আ.)- এর ঘুমানোর বিষয়টি সত্যের প্রতি তাঁর অসীম প্রেমের একটি নমুনা। ইসলামের টিকে থাকার বিষয়টি মানব জাতির সৌভাগ্যের নিশ্চয়তা- এ বি াসই তাঁকে এরূপ ঝুঁকিপূর্ণ কর্মে উৎসাহিত করেছিল।

আলী (আ.)- এর আত্মত্যাগের এ নমুনা এতটা মূল্যবান ছিল যে, আল্লাহ্ তাঁর প্রশংসা করে এটি যে তাঁর সন্তুষ্টির নিমিত্তেই সম্পাদিত হয়েছিল তা কোরআনে উল্লেখ করেছেন :

(و من النّاس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله و الله رءوف بالعباد)

"মানুষের মধ্যে কেউ কেউ আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জ আত্ম- বিক্রয় করে থাকে। আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের প্রতি অত্যন্ত দয়ার্দ্র।" (সূরা বাকারা : ২০৭)

অনেক মুফাসসিরই এ আয়াতটি এ পটভূমিতে অবতীর্ণ হয়েছে বলে বর্ণনা করেছেন। হযরত আলীর এ কর্মটি এতটা গুরুত্বের দাবি রাখে যে, ইসলামের অনেক বড় বড় মনীষী তাঁর এ ভূমিকাকে তাঁর অ তম বড় ফজিলত বলে উল্লেখ করেছেন এবং তাঁকে একজন আত্মত্যাগী প্রবাদপুরুষ বলেছেন। ঐতিহাসিকগণ হিজরতের ঘটনা বর্ণনা করলেই এ আয়াতটি তাঁর সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে বলেছেন।[৩৭৬]

এ সত্যটি কখনই হারিয়ে যাবার নয়। সত্যকে হয়তো কিছুদিন গোপন রাখা যায়, কিন্তু অবশেষে তা মেঘের আড়ালে গুপ্ত সূর্যের ায় তার উজ্জ্বলতা নিয়ে বেরিয়ে আসবেই।

নবী পরিবারের সে , বিশেষত হযরত আলীর সে মুয়াবিয়ার শত্রুতার বিষয়টি কারো অজানা নয়। তিনি নবীর অনেক সাহাবীকে প্ররোচিত করে ইসলামের ইতিহাসের অনেক উজ্জ্বল ঘটনাকে ভিন্নভাবে বর্ণনা ও জাল করার মাধ্যমে মুছে ফেলতে চেয়েছেন, কিন্তু এ ক্ষেত্রে তিনি তেমন সফল হন নি।

সামারাত ইবনে জুনদুব নামে এক ব্যক্তি রাসূলের জীবদ্দশায় জন্মগ্রহণ করে। সে তার শেষ জীবনে মুয়াবিয়ার দলে যোগ দেয় এবং মুয়াবিয়ার নিকট থেকে অর্থ গ্রহণের মাধ্যমে সে সত্যকে বিকৃত করত। একবার মুয়াবিয়া তাকে নির্দেশ দেন মসজিদের মিম্বারে গিয়ে উপরিউক্ত আয়াতটি আলীর শানে অবতীর্ণ হয় নি বলে প্রচার করার এবং আয়াতটি আলীর হত্যাকারী আবদুর রহমান ইবনে মুলজিমের শানে অবতীর্ণ বলে হাদীস জাল করার। মুয়াবিয়া সামারাতের ঈমান ধ্বংসকারী এ কর্মের জ এক লক্ষ দিরহাম দিতে সম্মত হলেন। কিন্তু সামারাত তাতে রাজী না হলে মুয়াবিয়া চার লক্ষ্য দিরহাম দিতে চাইলেন এবং সামারাত এ অর্থের বিনিময়ে তার দীন বিক্রি করতে সম্মত হলো। এ লোভী বৃদ্ধ যার সমগ্র জীবন পাপে পূর্ণ ছিল, এ কর্মের মাধ্যমে তার আমলনামাকে আরো অন্ধকার করে তুলল। সে এক জনসমাবেশে ঘোষণা করল যে, এ আয়াতটি কখনই আলীর শানে নয়, বরং তাঁর হত্যাকারী আবদুর রহমান ইবনে মুলজিমের শানে অবতীর্ণ হয়েছে।

সরল চিন্তার অনেকেই তার এ কথা গ্রহণ করল। তারা ভেবেও দেখল না এ আয়াতটি অবতীর্ণের সময় আবদুর রহমান ইয়েমেনী হিজাযেই ছিল না, হয়তোবা আদৌ জন্মগ্রহণই করে নি। কিন্তু তার এ অপচেষ্টায় সত্য চাপা পড়ে যায় নি। এক সময় ইতিহাসের পরিক্রমায় তাঁর (মুয়াবিয়ার) শাসনক্ষমতার পরিসমাপ্তি ঘটল, মিথ্যা প্রচারের যুগের অবসানের মাধ্যমে মিথ্যা ও অজ্ঞতার পর্দা অপসারিত হলো এবং সত্য তার স্বকীয়তায় নতুনভাবে উদ্ভাসিত হলো। প্রথম সারির মুফাসসির[৩৭৭] ও মুহাদ্দিসগণ সকল যুগ ও সময়েই এ বিষয়টি স্বীকার করেছেন যে, উপরিউক্ত আয়াতটি 'লাইলাতুল মাবিত' নামে খ্যাত- যা হিজরতের উদ্দেশে নবীর গৃহ ত্যাগের রাত্রিতে আলী (আ.)- এর আত্মত্যাগের প্রশংসায় অবতীর্ণ হয়েছে।[৩৭৮]

ইবনে তাইমিয়ার বক্তব্য

আহমদ ইবনে আবদুল হালীম হারানী হাম্বালী আহলে সুন্নাতের অ তম আলেম যিনি মরক্কোর একটি জেলখানায় ৭২৮ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন। ওয়াহাবী চিন্তাধারার অনেক কিছুরই মূল এ ব্যক্তি। তিনি নবী (সা.) এবং তাঁর আহলে বাইতের বিষয়ে বিশেষ আকীদা পোষণ করতেন। তিনি তাঁর 'মিনহাজুস্ সুন্নাহ্' গ্রন্থে এ আকীদাসমূহ নিয়ে কথা বলেছেন। তাঁর বিকৃত আকীদার কারণে তাঁর সমসাময়িক অনেক আলেমই তাঁর সমালোচনা করেছেন। এ ক্ষুদ্র পরিসরে তা বর্ণনার সুযোগ আমাদের নেই। এ ব্যক্তি হযরত আলী (আ.)- এর ফজিলতের এ ঘটনা সম্পর্কে নিজস্ব মত দিয়েছেন।[৩৭৯] তাঁর মতটি সংক্ষিপ্ত আকারে এখানে আমরা তুলে ধরছি। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা গেছে স্বল্প জ্ঞানের অধিকারী ব্যক্তিরা তাঁর কথায় প্রভাবিত হয়েছে এবং কোনরূপ গবেষণা ও যাচাই- বাছাই ছাড়াই (অর্থাৎ বিশেষজ্ঞদের শরণাপন্ন না হয়েই) তাঁর মতকে সাধারণের মধ্যে প্রচার করেছে। সাধারণ মানুষও তাদের কথাকে গবেষক আলেমের কথা মনে করে গ্রহণ করেছে, অথচ তারা জানে না এ কথাগুলো এমন এক ব্যক্তির যাঁকে তাঁর সমসাময়িক সুন্নী আলেমরাই প্রত্যাখ্যান করেছেন। ইবনে তাইমিয়ার বক্তব্যটি হলো নিম্নরূপ :

রাসূল (সা.)- এর শয্যায় আলীর শয়নের বিষয়টিতে ফজিলতের কিছুই নেই। কারণ আলী দু'টি সূত্রে জানতে পেরেছিলেন যে, সে রাত্রিতে তাঁর কোন ক্ষতি হবে না।

প্রথমত সত্যবাদী ও সত্যপরায়ণ নবীর নিকট তিনি জানতে পেরেছিলেন তাঁর শয্যায় ঘুমানোর কারণে তাঁর কোন ক্ষতি হবে না।[৩৮০]

দ্বিতীয়ত মহানবী (সা.) তাঁর ঋণ ও আমানতসমূহ আদায় ও পৌঁছে দেয়ার দায়িত্ব তাঁকে দিয়েছিলেন। তাই আলী বুঝতে পেরেছিলেন যে, তিনি নিহত হবেন না। যদি তিনি নিহত হতেন তবে নবী (সা.) অ   কাউকে সে দায়িত্ব অর্পণ করতেন। তাই তিনি নিশ্চিত জানতেন যে, তিনি জীবিত থাকবেন এবং উপরিউক্ত দায়িত্বসমূহ পালন করবেন।

প্রশ্নগুলোর উত্তর প্রদানের পূর্বে বলতে চাই ইবনে তাইমিয়া হযরত আলীর ফজিলতকে অস্বীকার করতে গিয়ে বরং তাঁর মর্যাদাকেই সমুন্নত করেছেন। কারণ হয় রাসূলের কথার প্রতি হযরত

আলীর বি াস সাধারণের ায় ছিল, নতুবা তাঁর কথার প্রতি আলীর বি াস ছিল অগাধ ও অপরিসীম এবং নবীর কথাকে তিনি তাঁর শক্তিশালী ঈমানের আলোয় স্পষ্টরূপে উদ্ভাসিত দেখতেন। ইবনে তাইমিয়ার প্রথম যুক্তিতে নবী (সা.) সত্যবাদী হলেও আলী (আ.)- এর তাঁর কথায় বি াসের বিষয়ে সন্দেহ থাকা স্বাভাবিক। তাই তিনি সুস্থ ও নিরাপদ থাকবেন এ বি াস তাঁর হওয়ার কথা নয়। কারণ সাধারণ পর্যায়ের ব্যক্তিদের নবীর কথায় অকাট্য বি াস হওয়া সম্ভব নয়। যদিও সে ক্ষেত্রে তারা বাহ্যিকভাবে মেনে নিতে পারে, কিন্তু তাদের মনে সব সময়ই সন্দেহ থাকবে। বিপদের আশংকা তাদের দয়কে সম্পূর্ণ আচ্ছাদিত করে রাখবে। কারণ প্রতি মুহূর্তে মৃত্যুর আশংকা রয়েছে। তাই প্রথম যুক্তি অনুযায়ী আলী (আ.) বিশেষ ঈমানের বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন না হওয়াই স্বাভাবিক, তদুপরি তিনি মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী জেনেও এ কর্মে রাজী হয়েছেন- সুস্থ ও নিরাপদ থাকার বি াস নিয়ে নয়। দ্বিতীয় যুক্তির ভিত্তিতে হযরত আলীর জ উচ্চতর এক ফজিলত প্রতিষ্ঠিত হয়। কারণ যদি ব্যক্তির ঈমান ঐ পর্যায়ে থাকে যে, যা কিছুই নবীর নিকট থেকে শুনবে তা তার নিকট দিবালোকের ায় সত্য প্রতিভাত হবে, তবে এরূপ ব্যক্তির ঈমানের স কোন কিছুই তুল্য হতে পারে না। কারণ এ পর্যায়ের ঈমানের কারণে নবী যখন তাকে বলবেন, 'আমার শয্যায় তুমি ঘুমাও। সন্ত্রাসীদের হামলায় তোমার কোন ক্ষতিই হবে না', তখন সে স্থির ও প্রশান্ত দয় নিয়ে নবীর শয্যায় শোবে এবং তার মনে বিপদের বি মাত্র ভয় থাকবে না। যদি ইবনে তাইমিয়ার মতানুযায়ী এমনটিই হয়ে থাকে যে, আলী (আ.) তাঁর নিরাপদ থাকার বিষয়ে নিশ্চিত ছিলেন। কারণ মহাসত্যবাদী রাসূল (সা.) তাঁকে এরূপ নিশ্চয়তা দান করেছিলেন, তবে তা আলীর সর্বোচ্চ পর্যায়ের ঈমানকে প্রমাণ করে। তিনি আলীর ফজিলতকে উপেক্ষা করতে গিয়ে বরং তাঁর জ উচ্চতর ফজিলতকেই প্রমাণ করেছেন।

এখন আসি বিস্তারিত আলোচনায়। প্রথম যুক্তিতে যে বলা হয়েছে : রাসূল (সা.) আলীকে বলেছেন, 'তোমার কোন ক্ষতি হবে না'- প্রাচীন ও মৌলিক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী অনেক ইতিহাস গ্রন্থে এ বর্ণনাটি আসে নি। যেমন ইবনে সা'দ (জন্ম ১৬৮ হিজরী এবং মৃত্যু ২৩০ হিজরী) তাঁর 'তাবাকাতুল কুবরা' গ্রন্থের ২২৭- ২২৮ পৃষ্ঠায় এ ঘটনাটি বর্ণনা করলেও এরূপ

কোন কথা উল্লেখ করেন নি। ত প মাকরিজী তাঁর 'আল ইমতা' গ্রন্থে এ কথাটি বর্ণনা করেন নি।

তবে ইবনে আসির (মৃত্যু ৬৩০ হি.), তাবারী (মৃত্যু ৩১০ হি.) প্রভৃতি ঐতিহাসিক এ কথাটি তাঁদের বর্ণনায় উল্লেখ করেছেন। সম্ভবত তাঁরা সীরাতে ইবনে হিশাম হতে এটি বর্ণনা করেছেন। কারণ ইবনে হিশামের বর্ণনা ও তাঁদের বর্ণনা ব একই।

তদুপরি এ ধরনের বর্ণনা আমার জানামতে কোন শিয়া সূত্রে উল্লিখিত হয় নি। বিশিষ্ট শিয়া আলেম ও ফকীহ্ শেখ মুহাম্মদ ইবনে হাসান তুসী (মৃত্যু ৪৬০ হি.) তাঁর 'আমালী' গ্রন্থে হিজরতের ঘটনাটির বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন, কিন্তু তাঁর বর্ণনায় উপরিউক্ত বাক্যটি সামা পার্থক্যসহ বর্ণিত হয়েছে। তবে ঘটনাটি আহলে সুন্নাতের বর্ণনায় ভিন্ন ধারায় বর্ণিত হয়েছে। কারণ তিনি স্পষ্ট বর্ণনা করেছেন যে, হিজরতের রাত্রির দু'রাত্রি পরেই হযরত আলী হযরত খাদীজার পূর্ববর্তী স্বামীর পুত্র হিন্দ ইবনে আবি হালিকে সে নিয়ে নবীর সে মিলিত হন। তখনই নবী তাঁকে উদ্দেশ্য করে বলেন, 'হে আলী! তারা এখন তোমার কোন ক্ষতি করতে পারবে না।' এ বাক্যটি ইবনে হিশাম, ইবনে আসির ও তাবারী বর্ণিত বাক্যের সদৃশ। কিন্তু শেখ তুসীর বর্ণনানুযায়ী নিরাপত্তার সুসংবাদবাহী এ বাক্যটি নবী (সা.) হিজরতের দ্বিতীয় বা তৃতীয় রাত্রিতে দিয়েছিলেন- প্রথম রাত্রিতে নয়। তদুপরি আমাদের যুক্তির সপক্ষে শক্তিশালী প্রমাণ স্বয়ং আলী (আ.)- এর কথা। হযরত আলী তাঁর এ ভূমিকাকে নিজেই 'আত্মত্যাগ ও জীবন বাজী' রাখা বলে উল্লেখ করেছেন। যেমন নিম্নোক্ত এ কবিতায় তিনি বলেছেন :

وقيـــت بنفســـي خـــير مـــن وطـــا الحصـــا   و اكـرم خلـق طـاف بالبيـت العتيـق بـالحجر

محمّـــد لمـــا خـــاف ان يمكـــروا بـــه   فوقـــاه ربى ذو الجـــلال مـــن المكـــر

و بـــت أراعـــى مـــنهم يســـؤنى   و قـــد نفـــس علـــى القتـــل و الاســـر

و بـــات رســـول الله فى الغـــار آمنـــا   و مـــازال في حفـــظ الالـــه و في الســـتر

কবিতার ভাবার্থ এরূপ : আমি জীবন বাজি রেখে পৃথিবীর ওপর বিচরণকারী সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি; যিনি আল্লাহর ঘর ও হাজারে আসওয়াদকে তাওয়াফকারী সর্বোত্তম চরিত্রের মানুষ, তাঁর জীবন রক্ষা করেছি। তিনি মুহাম্মদ ছাড়া আর কেউ নন। আমি তখনই এ কাজ করেছি যখন কাফেররা তাঁকে হত্যার ষড়যন্ত্র করেছিল। আল্লাহ্ তাঁকে এ ষড়যন্ত্র থেকে রক্ষা করেন। আমি তাঁর শয্যায় ঘুমিয়েছিলাম সকাল পর্যন্ত এবং শত্রুর প্রতীক্ষায় ছিলাম। আমি নিজেকে নিহত অথবা বন্দী হতে প্রস্তুত রেখেছিলাম। রাসূল তখন গুহায় নিরাপদে কাটিয়েছিলেন রাত।

উপরিউক্ত পঙ্ক্তিগুলো 'আল ফুসুল আল মুহিম্মাহ্' নামক গ্রন্থের ৪৮ পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ রয়েছে।

হযরত আলী (আ.)- এর উপরিউক্ত স্পষ্ট বক্তব্য থেকে যা বোঝা যায় তা আমাদের ইবনে হিশামের ত্রুটিপূর্ণ বর্ণনার ওপর বি াস স্থাপন করা হতে বাধা দেয়। অধিকাংশ বর্ণনার ত্রুটিই তাঁর ওপর বর্তায়। সম্ভবত তাঁর এ ত্রুটির কারণ হলো তিনি 'সীরাতে ইবনে ইসহাক' গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সংকলন করেছেন। যেহেতু তিনি ইবনে ইসহাকের বর্ণনাকে সংক্ষেপ করতে চেয়েছেন সেহেতু বর্ণনার পারিপার্ িকতা বাদ দিয়ে শুধু মূল বাক্যটিই বর্ণনায় এনেছেন। এ কারণেই হয়তো তিনি নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দানকারী বাক্যটিকে হিজরতের দ্বিতীয় না তৃতীয় রাত্রিতে বলেছেন তা উল্লেখ করেন নি, বরং এমনভাবে বর্ণনা করেছেন যা থেকে মনে হয় সমগ্র ঘটনাটি হিজরতের রাত্রিতেই ঘটেছিল।

আমাদের যুক্তির সপক্ষে অ তম দলিল হলো একটি প্রসিদ্ধ হাদীস যা শিয়া ও সুন্নী উভয় হাদীস গ্রন্থেই এসেছে। হাদীসটি এরূপ যে, ঐ রাত্রিতে আল্লাহ্ হযরত জিবরাইল ও হযরত মিকাঈল (আ.)- কে সম্বোধন করে বলেন, "যদি আমি তোমাদের একজনকে জীবিত রাখতে এবং অপর জনকে মৃত্যুদান করতে চাই তবে তোমাদের কে রাজী আছ নিজে মৃত্যুকে বেছে নিয়ে অপর জনকে জীবনদান করতে?" তাঁরা কেউই এ কাজে সম্মত হন নি। তখন তিনি তাঁদের নির্দেশ দেন, "গিয়ে দেখ আলী নবীর প্রাণ রক্ষার্থে তাঁর শয্যায় ঘুমিয়েছে, তোমরা গিয়ে আলীর নিরাপত্তার দায়িত্ব নাও।"[৩৮১]

ইবনে তাইমিয়া দ্বিতীয় যে দলিলটি এনেছেন তাতে বলা হয়েছে, হযরত আলী ঘটনার নিরাপদ পরিসমাপ্তি সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। কারণ যেহেতু রাসূল (সা.) তাঁকে কুরাইশদের আমানতসমূহ বুঝিয়ে দিয়েছিলেন সেহেতু তিনি জানতেন তিনি নিরাপদে থেকে আমানতের দায়িত্ব পালন করতে পারবেন। আমরা নবীর হিজরতের পরবর্তী ঘটনাসমূহ বর্ণনা করলে উত্থিত সমস্যার সমাধান পাওয়া যাবে।

নবী (সা.)- এর হিজরত পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহ

মহানবী (সা.)- এর নিরাপত্তার প্রাথমিক পর্যায় সঠিক পরিকল্পনার ফলে সফলতা পেল। মহানবী সওর পর্বতের গুহায় আশ্রয় নিয়ে ষড়যন্ত্রকারীদের প্রচেষ্টাকে নস্যাৎ করে দিলেন। নবীর অন্তরে বি মাত্র অস্থিরতা ছিল না। এ কারণেই শত্রুরা গুহার মুখে এসে পড়লেও তিনি নিশ্চিন্তে তাঁর স ীকে বলেছেন, لا تحزن إنّ الله معنا ‘শ ি ত হয়ো না, আল্লাহ্ আমাদের সে রয়েছেন’।[৩৮২]

নবী (সা.) তিন দিবারাত্রি মহান আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ লাভ করেছিলেন। শেখ তুসীর ‘আমালী’ গ্রন্থের বর্ণনানুসারে এ তিন দিনে হযরত আলী ও হিন্দ ইবনে আবি হালে রাসূলের সে সাক্ষাৎ করেন। আহলে সুন্নাতের অধিকাংশ ঐতিহাসিকের মতে এ সময় হযরত আবু বকরের পুত্র আবদুল্লাহ্ ইবনে আবি বকর এবং তাঁর রাখাল আমের ইবনে ফাহিরা রাসূলের নিকট নিয়মিত যেতেন।

ইবনে আসির[৩৮৩] বর্ণনা করেছেন, “হযরত আবু বকরের পুত্র আবদুল্লাহ্ রাত্রিতে তাঁদের নিকট গিয়ে কুরাইশদের পরিকল্পনা সম্পর্কে অবহিত করতেন। আমের ইবনে ফাহিরা সন্ধ্যা লে মেষগুলোকে গুহার নিকটবর্তী স্থান দিয়ে ফিরিয়ে আনত যাতে করে নবী (সা.) ও তাঁর স ী মেষের দুধ পান করতে পারেন। আবদুল্লাহ্ মেষপালের অগ্রভাগে পথ চলতেন যাতে করে তাঁর পদচিহ্ন মুছে যায়।

শেখ তুসী তাঁর ‘আমালী’ গ্রন্থে বলেছেন, হিজরতের পরবর্তী কোন এক রাত্রিতে হযরত আলী এবং হিন্দ ইবনে আবি হালে মহানবী (সা.)- এর নিকট গেলে তিনি তাঁদের নির্দেশ দেন পরবর্তী রাত্রিতে তাঁরা যেন দু’টি উট নিয়ে সেখানে উপস্থিত হন। এ সময় হযরত আবু বকর বলেন : আমি পূর্ব হতেই আমাদের জ   দু’টি উট প্রস্তুত রেখেছি যদি আপনি সেগুলো গ্রহণ করেন। নবী উটের মূল্য পরিশোধের শর্তে তা গ্রহণে রাজী হন। অতঃপর হযরত আলীকে উটের মূল্য পরিশোধের নির্দেশ দেন।

মহান রাসূল ঐ রাত্রিতে (সওর পর্বতের গুহায়) অপর যে নির্দেশটি দেন তা হলো পরবর্তী দিবসে যেন তিনি (আলী) স্পষ্ট ভাষায় প্রকাশ্যে এ ঘোষণা দান করেন যে, রাসূলের নিকট যে সকল ব্যক্তির ঋণ ও আমানত রয়েছে সেগুলো যেন তারা বুঝে নিয়ে যায়। রাসূল (সা.) হযরত আলীকে আরো বলেন, স্বীয় ক া ফাতিমা, আলীর মাতা ফাতিমা বিনতে আসাদ এবং ফাতিমা বিনতে যুবাইরসহ বনি হাশিমের যারা হিজরত করতে চায় তাদের সফরের ব্যবস্থা করার। এ সময়েই রাসূল إنّهم لن يصلوا إليك من الآن بشيء تكرهه 'এখন থেকে তোমার কোন ক্ষতির সম্ভাবনা নেই'- এ কথাটি বলেন যেটি ইবনে তাইমিয়া তাঁর প্রথম যুক্তি হিসাবে এনেছেন।

নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন, রাসূল আলীকে আমানত ফিরিয়ে দেয়ার নির্দেশ দেন হিজরতের রাত্রির দু'রাত্রি পরে অর্থাৎ যখন তিনি সওর পর্বতের গুহা হতে মদীনার দিকে যাত্রার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন।

হালাবী তাঁর সীরাত গ্রন্থে[৩৮৪] বর্ণনা করেছেন, নবী (সা.) সওর পর্বতের গুহায় অবস্থানকালে আলী এক রাত্রিতে তাঁর নিকট উপস্থিত হন। তখন রাসূল আলীকে যে সকল নির্দেশ দেন তন্মধ্যে আমানতসমূহ ফিরিয়ে দেয়ার বিষয়টিও ছিল।

হালাবী 'আদ্ দার' গ্রন্থের রচয়িতার সূত্রে হিজরতের পরবর্তী এক রাত্রিতে রাসূলের স আলীর সাক্ষাতের বিষয়টি উদ্ধৃত করেছেন।

প্রকৃতপক্ষে যখন আমরা দেখি শেখ তুসীর মতো বিশিষ্ট আলেম নির্ভরযোগ্য সূত্রে আমানত ফিরিয়ে দেয়ার রাসূলের নির্দেশের ঘটনাটি হিজরতের রাত্রির পরবর্তী সময়ে সংঘটিত হয়েছিল বলেছেন তখন আমরা এরূপ নির্ভরযোগ্য বর্ণনা ত্যাগ করে অনির্ভরযোগ্য সূত্র নিয়ে সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করার অবকাশ রাখি না। আহলে সুন্নাতের ঐতিহাসিকগণ এ ঘটনাকে এমনভাবে বর্ণনা করেছেন যেন মনে হয় রাসূলের নির্দেশসমূহ এক রাত্রিতেই (হিজরতের রজনী) এসেছিল। অসম্ভব নয় যে, তাঁরা সমগ্র বিষয়টি বিস্তারিত বর্ণনা না করে শুধু মূলকথা ও বক্তব্যটিই বর্ণনা করতে চেয়েছেন এবং রাসূলের নির্দেশনাসমূহের সময়ের বিষয়ে বিশেষ কোন গুরুত্ব তাঁরা দেন নি।

গুহা হতে বহির্গমন

হযরত আলী রাসূল (সা.)- এর নির্দেশ অনুযায়ী তিনটি উট প্রস্তুত করে উরাইকাত নামে এক বি স্ত পথপ্রদর্শক ব্যক্তির হাতে সমর্পণ করে চতুর্থ রাত্রিতে গুহায় উপস্থিত হতে বলেন। উটের অথবা পথপ্রদর্শকের শব্দে রাসূল স ীসহ গুহা হতে বেরিয়ে এলেন এবং উটের পিঠে আরোহণ করলেন। তাঁরা লোহিত সাগরের নিকটবর্তী অঞ্চল দিয়ে মদীনার পথ ধরলেন। ইবনে আসিরের ইতিহাস গ্রন্থের পাদটীকা এবং ইবনে হিশামের সীরাত গ্রন্থে[৩৮৫] রাসূলের হিজরতের পথটি খুঁটিনাটি বিষয়সহ বর্ণিত হয়েছে।

হিজরী সালের প্রথম পৃষ্ঠা উন্মোচিত হলো

রাত্রির অন্ধকার নেমে এল এবং সূর্য তখন পৃথিবীর অ পৃষ্ঠে (অ অর্ধাংশে) আলো বিকিরণে নিয়োজিত হলো। কুরাইশদের বিভিন্ন দল তিন দিবারাত্রি মক্কা ও এর পা র্বর্তী এলাকা চষে বেরিয়ে নবীকে খুঁজে পাওয়ার বিষয়ে নিরুৎসাহিত হয়ে গৃহে ফিরে গেল। একশ' উটের পুরস্কার লাভের সম্ভাবনাও ক্ষীণ দেখে তারা নিরাশ হয়ে ক্লান্ত মনে প্রত্যাবর্তন করল। ফলে মদীনার পথে নিযুক্ত প্রহরীরাও ফিরে গিয়েছিল এবং মদীনার পথ উন্মুক্ত হয়ে পড়েছিল।[৩৮৬]

এমন সময়ই পথপ্রদর্শকের অনুচ্চ ক স্বর নবীর কানে পৌঁছে। তার সে তিনটি উট ছাড়াও কিছু খাদ্য ছিল। সে অনুচ্চ স্বরে নবীকে বলল, "আমাদের রাত্রির অন্ধকারকে কাজে লাগিয়েই ত মক্কার সীমানা পেরিয়ে যেতে হবে এবং এমন এক পথ ধরতে হবে যে পথে লোকজন কম চলাচল করে।"

মুসলিম ইতিহাসের বর্ণনাক্রম হিজরতের এ রাত্রিকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়েছে এবং মুসলমানগণ এ রাত্রিকে তাদের ইতিহাসের প্রথম দিন বলে ধরে পরবর্তী সকল ঘটনা বর্ণনা করেছে।

কেন হিজরী বর্ষকে কেন্দ্র করে ইসলামী ইতিহাস আবর্তিত হয়েছে

ইসলাম ধর্ম ঐশী শরীয়তের পূর্ণতম রূপ। এ শরীয়ত হযরত মূসা ও হযরত ঈসা (আ.)- এর শরীয়তকে পূর্ণত্ব দিয়ে সকল যুগে ও সময়ে প্রয়োগপোযোগী হয়ে মানব জাতির জ অবতীর্ণ হয়েছে যদিও হযরত ঈসা ও তাঁর জন্মদিবস মুসলমানদের নিকট সম্মানিত, কিন্তু তাঁর জন্মদিবস ইসলামী ইতিহাস বর্ণনার কেন্দ্র হয় নি। কারণ মুসলমানগণ স্বতন্ত্র চিন্তা- বি াসের এক জাতি। তাই অ জাতির দিনপঞ্জী তারা গ্রহণ করতে পারে না। যে দিনটিতে আবরাহার হস্তীবাহিনী (কাবা ধ্বংসের উদ্দেশ্যে) মক্কা আক্রমণ করতে এসে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল সে দিনটি দীর্ঘ দিন আরবদের নিকট তাদের দিনপঞ্জীর প্রথম দিবস বলে বিবেচিত হতো।

যদিও মহানবী একই বছর জন্মগ্রহণ করেছিলেন তদুপরি তা ইসলামী ইতিহাসের প্রথম দিবস বলে পরিগণিত হয় নি। কারণ সে সময় ইসলাম ও ঈমানের কোন চিহ্নই বিদ্যমান ছিল না। একই কারণে মুসলমানগণ নবুওয়াতের বর্ষটিকেও (যখন মুসলমানের সংখ্যা তিনজনে সীমাবদ্ধ ছিল) তাদের ইতিহাসের শুরু বলে ধরে নি। কিন্তু হিজরতের প্রথম বছরেই ইসলাম ও মুসলমানদের এক বিরাট বিজয় অর্জিত হয় এবং মদীনায় ইসলামের স্বাধীন কেন্দ্র স্থাপন সম্ভব হয়। যার ফলশ্রুতিতে মুসলমানরা বিচ্ছিন্ন অবস্থা থেকে মুক্তি লাভ করে স্বীয় শক্তিকে কেন্দ্রীভূত করার অবকাশ পায়। এ বিজয়ের কারণেই এ বছরকে তারা তাদের ইতিহাসের শুরু হিসাবে ধরেছে এবং তাদের সকল উত্থান- পতনকে এ দিনপঞ্জীর আবর্তেই মূল্যায়ন করেছে। এ গ্রন্থটি লেখার সময় হিজরী সালের (চান্দ্র বর্ষ) ১৩৮২ বছর অতিক্রান্ত হয়েছে যা সৌর বর্ষ অনুযায়ী ১৩৪২ বছরের সমান।[৩৮৭]

মহানবীর হিজরতকে কেন্দ্র করে মুসলিম বিশ্বের নিজস্ব তারিখের সূচনা

মহানবী স্বয়ং হিজরী বর্ষের সূচনা ঘোষণা করেন। তাই হিজরী সালের স্থলে অ সালের প্রচলন একরূপ নবীর সুন্নাত থেকে প্রত্যাবর্তন।

মানুষের সামাজিক জীবনে বছর, মাস ও সপ্তাহের হিসাব অপরিহার্য। এ হিসাব ছাড়া মানব জীবন অচল। বিষয়টি এতটা স্পষ্ট যে, এর সপক্ষে যুক্তি প্রদর্শনের প্রয়োজন নেই।

যদি আমাদের প্রশ্ন করা হয় যে, রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক চুক্তি, বাণিজ্যিক চেক, সনদ ও অ া লেন- দেন, বিচারকার্য, পারিবারিকসহ সকল ধরনের পত্র ইত্যাদি বিষয় নির্দিষ্ট তারিখ ব্যতীত মূল্যহীন নয় কি? উত্তরে বলা যায়, অবশ্যই।

যখন মহানবীর সাহাবিগণ বিভিন্ন সময়ে চন্দ্রের আকৃতির পরিবর্তন নিয়ে তাঁকে প্রশ্ন করেন অর্থাৎ কেন চন্দ্র প্রথমে শীর্ণকায়, অতঃপর ধীরে ধীরে স্ফীত হয়ে পূর্ণ রূপ নেয় তখন মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহী অবতীর্ণ হয় চন্দ্রের বিবর্তনের অ তম দর্শন বর্ণনা করে, যাতে বলা হয়

قل هي مواقيت للنّاس ‘এর মাধ্যমে মানুষ সময় নির্ধারণ করতে পারে’ অর্থাৎ মাসের শুরু ও শেষ নির্ণয় করার মাধ্যমে সামাজিক ও ধর্মীয় দায়িত্বসমূহ পালনে সক্ষম হয়। ঋণদাতা ঋণ আদায় এবং ঋণগ্রহীতা ঋণ পরিশোধের সময় জানতে পারে, ঈমানদার রোযা ও হ র মতো ধর্মীয় বিভিন্ন দায়িত্ব যথার্থভাবে পালন করতে পারে।

সব জাতিরই যে নিজস্ব দিনপঞ্জী থাকা উচিত সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু প্রশ্ন হলো তারা তাদের অফিস- আদালতে কোন্ পঞ্জিকা ব্যবহার করবে? অ ভাবে বলা যায়, কোন্ ঘটনাকে তাদের ইতিহাসের শুরু বলে ধরে ভবি তের ঘটনাপ্রবাহকে তার মানদণ্ডে লিপিবদ্ধ করবে? এর উত্তর খুবই সহজ। স্বাভাবিকভাবেই যে জাতির উজ্জ্বল অতীত রয়েছে, যাদের সভ্যতা ও সংস্কৃতি মৌলিক, স্বাধীন ধর্মের অনুসারী, বিশিষ্ট রাজনৈতিক ও জ্ঞানী ব্যক্তিত্বের গর্ব করার মতো ঐতিহাসিক ঘটনার অধিকারী অর্থাৎ ব্যাঙের ছাতার ায় অগভীর মূলের জাতি নয় তাদের উচিত তাদের জাতির সামাজিক ও ধর্মীয় ইতিহাসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার বছরকে ইতিহাসের শুরু বলে গ্রহণ করা এবং এর পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল ঘটনাপ্রবাহকে তার স তুলনা করে ইতিহাস

রচনা করা। এভাবেই তারা নিজ জাতি ও ব্যক্তিত্বের শিকড়কে সুদৃঢ় করতে পারবে এবং অ জাতির মধ্যে বিলীন হওয়া থেকে নিজেদের রক্ষা করতে পারবে।

মুসলিম জাতির ইতিহাসে মহানবী (সা.) অপেক্ষা বড় কোন ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব ঘটে নি এবং তাঁর হিজরত অপেক্ষা বড় ও লাভজনক ঘটনাও ঘটে নি। কারণ নবীর হিজরতের মাধ্যমেই মানবতার ইতিহাসের নতুন এক পাতা উন্মোচিত হয়েছিল এবং মহানবী ও তাঁর অনুসারী মুসলমানরা াসরুদ্ধকর পরিবেশ থেকে মুক্তিলাভ করে স্বাধীন ও অনুকূল পরিবেশে নব যাত্রার সুযোগ পেয়েছিলেন। মদীনার স্থানীয় জনসাধারণ মুসলমানদের নেতাকে উষ্ণ অভিনন্দন জানিয়েছিল এবং তাদের সমগ্র শক্তিকে তাঁর সেবায় নিবেদন করেছিল। কিছুদিন না যেতেই এ হিজরতের বরকতে ইসলাম এক স্বাধীন রাজনৈতিক ও সামরিক ভিত্তি পেয়েছিল। ফলশ্রুতিতে ইসলাম আরব উপদ্বীপে শক্তিশালী রাষ্ট্রব্যবস্থা স্থাপনে সক্ষম হয় এবং এমন এক নতুন সভ্যতার জন্মদান করে যা মানব ইতিহাসে বিরল। যদি হিজরতের ঘটনা না ঘটত তবে ইসলাম মক্কায়ই স্তিমিত ও প্রোথিত হতো। ফলে মানবতা এক বিরাট নেয়ামত থেকে বঞ্চিত হতো।

এ কারণেই মুসলমানগণ হিজরতকে তাদের ইতিহাসের সূচনা বলে ধরেছে। সে দিন হতে এখন পর্যন্ত প্রায় চৌদ্দ শতাব্দী অতিক্রান্ত হয়েছে এবং মুসলমানগণ গর্বময় সব ইতিহাস রচনা করে পঞ্চদশ হিজরী শতাব্দীর দ্বারপ্রান্তে এসে উপস্থিত হয়েছে।

হিজরী বর্ষের প্রবর্তনকারী কে?

অধিকাংশ ঐতিহাসিকের বর্ণনা অনুযায়ী হযরত আলী (আ.)- এর পরামর্শ অনুযায়ী দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমর রাসূল (সা.)- এর হিজরতের বছরকে সূচনা ধরে হিজরী বর্ষের প্রবর্তন করেন এবং বিভিন্ন প্রদেশ ও দফতরে নির্দেশ পাঠান সে অনুযায়ী রাষ্ট্রীয় পত্র ও দলিলসমূহ সংরক্ষণের। কিন্তু কেউ যদি সীরাত ও হাদীস গ্রন্থসমূহে বর্ণিত রাসূল (সা.)- এর পত্রসমূহ লক্ষ্য করেন (যার অধিকাংশই এখনও ইতিহাস ও হাদীস গ্রন্থসমূহে বিদ্যমান), তাহলে তাঁদের নিকট স্পষ্ট হবে যে, স্বয়ং রাসূলই হিজরী বর্ষের প্রবর্তন করেছিলেন। তিনি আরবের বিভিন্ন গোত্রপ্রধানের নিকট যে পত্র প্রেরণ করেন তাতে স্পষ্টভাবে হিজরী তারিখ সংযুক্ত করেছেন।

আমরা এ অধ্যায়ে মহানবী কর্তৃক লিখিত কয়েকটি পত্রের উল্লেখ করব যাতে হিজরী তারিখ সংযোজিত হয়েছিল। এরপর এর সপক্ষে কয়েকটি দলিল উপস্থাপন করব। সম্ভবত এর বাইরেও প্রমাণসমূহ রয়েছে যা আমরা অবগত নই।

হিজরী তারিখ সম্বলিত মহানবীর কয়েকটি পত্র

১. হযরত সালমান ফার্সী তাঁর ভ্রাতা ও পরিবারবর্গের উদ্দেশ্যে উপদেশমূলক একটি পত্র লেখার আহবান জানালে মহানবী হযরত আলীকে ডেকে পাঠান ও উপদেশমূলক একটি পত্র তাঁর দ্বারা লেখান যে পত্রের শেষে লেখা রয়েছে :

و كتب علي بن أبي طالب بأمر رسول الله في رجب سنة تسع من الهجرة

“এ পত্রটি রাসূলের নির্দেশে আলী ইবনে আবি তালিব কর্তৃক লিখিত যা হিজরতের নবম বর্ষের রজব মাসে লেখা হলো।”[৩৮৮]

২. প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক বালাজুরী তাঁর ‘ফুতু ল বুলদান’ গ্রন্থে মাকনার ইয়া দীদের সে রাসূলের সম্পাদিত চুক্তির বিবরণ দিয়েছেন যা একজন মিশরীয় ব্যক্তি পুরাতন লাল চামড়ায় লিপিবদ্ধ দেখেছিল এবং তা নিজে লিখে রেখেছিল। সে ব্যক্তি বালাজুরীর নিকট সম্পূর্ণ পত্রটি পড়ে শোনায়। পত্রের শেষে বলা হয়েছে, ‘আলী ইবনে আবু তালিব কর্তৃক নবম হিজরীতে লিখিত’। উল্লেখ্য যে, যদিও আরবী ব্যাকরণবিধি অনুযায়ী ‘আলী ইবনে আবি তালিব’ কর্তৃক লিখিত বলা উচিত, তা সত্ত্বেও পত্রে ‘আলী ইবনে আবু তালিব’ বলা হয়েছে। বিশেষজ্ঞদের মতে এর কারণ কুরাইশরা সকল অবস্থায়ই ‘আব’ শব্দটিকে ‘আবু’ উচ্চারণ করে থাকে। বিশিষ্ট ব্যাকরণবিদ আসমায়ী এ বক্তব্যটি সত্য বলে স্বীকার করেছেন।

‘আল ওয়াসাকুস সিয়াসিয়া’ নামক গ্রন্থের লেখক অধ্যাপক মুহাম্মদ হামিদুল্লাহ্ বলেছেন, “আমি ১৩৫৮ হিজরীতে পবিত্র মদীনা নগরীতে গবেষণার কাজে নিয়োজিত ছিলাম। সে সময় হযরত আলীর হস্তলিখিত কিছু পত্রের সন্ধান পেয়েছিলাম[৩৮৯] যাতে লেখা ছিল : أنا علي بن أبو طالب ‘আমি আলী ইবনে আবু তালিব’।

৩. দামেস্কের অধিবাসীদের সে সম্পাদিত শান্তিচুক্তি যা খালিদ ইবনে ওয়ালিদ কর্তৃক লিখিত হয়েছিল এবং সেখানকার অধিবাসীদের জীবন, সম্পদ ও উপাসনালয়ের নিরাপত্তা দান করা হয়েছিল তাতে লেখা ছিল ‘তের হিজরীতে লিখিত হয়েছে’।[৩৯০]

আমরা জানি যে, দামেস্ক প্রথম খলীফা হযরত আবু বকরের জীবনের শেষ দিনগুলোতে বিজিত হয়। যে সকল ঐতিহাসিক বলেছেন, দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমরের নির্দেশে এবং হযরত আলীর পরামর্শে হিজরী বর্ষ প্রবর্তিত হয় তাঁরা মনে করেন, ষোড়শ অথবা সপ্তদশ হিজরীতে তা ঘটেছিল। অথচ এ পত্রটি এর চার বছর পূর্বে লিখিত এবং তাতে হিজরী তারিখ সংযুক্ত ছিল।

৪. রাসূল (সা.)- এর নির্দেশ অনুযায়ী হযরত আলী নাজরানের খ্রিষ্টানদের সঙ্গে সম্পাদিত যে সন্ধিপত্রটি লিখেন তাতে পঞ্চম হিজরী সাল সংযোজিত রয়েছে। পত্রে এরূপ লেখা রয়েছে :

و امر عليا أن يكتب فيه أنّه كتب لخمس من الهجرة

"তিনি আলীকে লেখার নির্দেশ দেন, এ সন্ধি পত্রটি পঞ্চম হিজরীতে লিখিত হয়েছে।"[৩৯১] এ বাক্যটি প্রমাণ করে যে, স্বয়ং রাসূলই হিজরী বর্ষের প্রবর্তক এবং তিনিই আলীকে পত্রসমূহের শেষে হিজরী তারিখ লেখার নির্দেশ দিয়েছিলেন।

৫. সহীফায়ে সাজ্জাদিয়ার শুরুতে রাসূল (সা.)- এর একটি স্বপ্নের যে ব্যাখ্যা হযরত জিবরাইল দিয়েছেন তা এরূপ : ইসলামের যাঁতাটি হিজরতের নবম ও দশম বর্ষ পর্যন্ত ঘুরবে। অতঃপর থেমে যাবে এবং হিজরতের ৩৫তম বছর থেকে পুনরায় তা পাঁচ বছরের জন্য ঘূর্ণায়মান থাকবে এবং সে সময় গোমরাহী তার সঠিক কেন্দ্রে আবর্তিত হবে।[৩৯২]

৬. মুসলিম হাদীসবিদগণ উল্লেখ করেছেন, রাসূল (সা.) উম্মুল মুমিনীন উম্মে সালামাকে বলেছেন, "আমার সন্তান হুসাইন হিজরতের ষাট বছরের মাথায় নিহত হবে।"[৩৯৩]

৭. আনাস ইবনে মালিক বর্ণনা করেছেন, "রাসূল (সা.)- এর সঙ্গীরা আমাকে খবর দিয়েছেন, তিনি বলেছেন : আমার হিজরতের একশ' বছর অতিক্রান্ত হলে তোমাদের সকলের চোখই বন্ধ হয়ে যাবে অর্থাৎ তোমরা সকলেই মৃত্যুবরণ করবে।"[৩৯৪]

৮. রাসূলের সাহাবিগণ তাঁর জীবদ্দশায় সংঘটিত বিভিন্ন ঘটনাকে তাঁর হিজরতের সঙ্গে সম্পৃক্ত করে বর্ণনা করতেন। যেমন তাঁরা বলতেন, মসজিদুল আকসা (আল কুদস) থেকে কাবার দিকে কিবলা পরিবর্তন হিজরতের সপ্তদশ অথবা অষ্টাদশ মাসে সংঘটিত হয়েছিল।[৩৯৫]

রামাজান মাসের রোযা হিজরতের অষ্টাদশ মাসে ফরয করা হয়।[৩৯৬]

রাসূল (সা.) কর্তৃক প্রেরিত মুবাল্লিগ আবদুল্লাহ্ ইবনে উনাইস বলেন, “আমি হিজরতের চুয়ান্নতম মাসে মুহররমের পঞ্চম দিবসে সোমবারে মদীনা থেকে যাত্রা করি।”[৩৯৭]

মুহাম্মদ ইবনে সালমা কুরতার যুদ্ধ সম্পর্কে বলেছেন, “দশই মুহররম মদীনা থেকে বের হই। অতঃপর ১৯ দিন বাইরে থাকার পর হিজরতের পঞ্চান্নতম মাসের (মুহররম) শেষ দিনে মদীনায় ফিরে আসি।”[৩৯৮]

এরূপ তারিখ সম্বলিত করা থেকে বোঝা যায় যে, মুসলমানগণ পঞ্চম হিজরী পর্যন্ত বিভিন্ন ঘটনা নবীর হিজরতের স মাসের তুলনা করে হিসাব রাখতেন। পঞ্চম হিজরী থেকে নবীর নির্দেশ মোতাবেক বর্ষ অনুযায়ী হিজরী সাল গণনা শুরু হয় যার নমুনা আমরা চার নম্বর উদাহরণে উল্লেখ করেছি যাতে নাজরানের ি ষ্টানদের সাথে সম্পাদিত চুক্তিপত্র হযরত আলী রাসূলের নির্দেশ মতো বর্ষ হিসাবে লিখেন।

৯. তদুপরি হাদীসবেত্তাগণ মুহাদ্দিস জুহরী থেকে বর্ণনা করেছেন, যখন মহানবী মদীনায় প্রবেশ করেন (রবিউল আউয়াল মাসে) তখন স্বয়ং হিজরতের ভিত্তিতে দিনপঞ্জী নির্ধারণের নির্দেশ দান করেন।

১০. হাকিম নিশাবুরী ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেছেন হিজরী সাল নবীর হিজরতের বছরেই প্রবর্তিত হয় এবং সে বছরই আবদুল্লাহ্ ইবনে যুবাইর জন্মগ্রহণ করেন।

এ সকল বর্ণনা প্রমাণ করে যে, ইসলামের মহান নেতা মহানবী (সা.) প্রথম মদীনায় পদার্পণ করেই তাঁর হিজরতের বছরকে ইসলামী বর্ষের শুরু বলে ঘোষণা করেন। তবে হিজরতের পর প্রথম পাঁচ বছর মাসের ভিত্তিতে তারিখ গণনা করা হতো এবং পঞ্চম হিজরীর পর থেকে তা বর্ষের ভিত্তিতে করা হয়।

একটি প্রশ্নের উত্তর

হয়তো কেউ বলবেন, যদি মহানবী স্বয়ং হিজরী বছরের ভিত্তিতে বর্ষপঞ্জী নির্ধারণ করে থাকেন তবে বিভিন্ন হাদীসবিদ ও ঐতিহাসিক যে ভিন্ন বর্ণনা করেছেন তার কারণ কি? যে সকল বর্ণনায় এসেছে যে, একবার এক ব্যক্তি তার পাওনা হিসাবের খাতা দ্বিতীয় খলীফার নিকট আনলে

খলীফা লক্ষ্য করেন তাতে লেখা রয়েছে, এ হিসাবের সময়সীমা শাবান মাস পর্যন্ত। খলীফা তাকে জিজ্ঞাসা করেন, এর সময়সীমা এ বছরের শাবান মাস, নাকি গত বছরের, নাকি আগামী বছরের? তখন খলীফা নিজে অ । সাহাবীকে ডেকে আহবান জানান সাধারণের সুবিধার্থে বর্ষপঞ্জী প্রস্তুত করার যাতে করে তারা তাদের দেনা- পাওনা আদায় ও পরিশোধের বিষয়ে সমস্যার সম্মুখীন না হয়। সাহাবীদের কেউ কেউ পরামর্শ দিলেন ফার্সী বর্ষ অনুসরণের। ফার্সী বর্ষপঞ্জী শাসকগোষ্ঠীর ক্ষমতায় অভিষিক্তের বর্ষের ভিত্তিতে ছিল। যখন কোন শাসক মারা যেত তখন অ শাসকের ক্ষমতায় অভিষিক্তের বছর বর্ষপঞ্জীর জ নির্ধারিত হতো। কেউ কেউ পরামর্শ দেন রোমীয় বর্ষপঞ্জী অনুসরণের। তারা আলেকজান্ডারের প্রবর্তিত বর্ষপঞ্জী অনুসরণ করত। কেউ কেউ বললেন, নবী (সা.)- এর নবুওয়াতপ্রাপ্তির বছরের ভিত্তিতে বর্ষপঞ্জী নির্ধারিত হোক। এ সময় হযরত আলী (আ.) প্রস্তাব করলেন, নবী (সা.)- এর হিজরতের বছর থেকে বর্ষ গণনা করা উচিত। কারণ নবীর জন্ম ও নবুওয়াতপ্রাপ্তির বর্ষ অপেক্ষা হিজরতের বর্ষ আমাদের জ অধিকতর গুরুত্ববহ ছিল। হযরত উমর এ মতটি পছন্দ করেন ও নির্দেশ দেন নবীর হিজরতের বর্ষকে ইসলামী তারিখ হিসাবে গ্রহণের।[৩৯৯] ইয়াকুবী তাঁর 'তারিখ' গ্রন্থে বলেছেন, হিজরী বর্ষপঞ্জীর ঘোষণা ষোড়শ হিজরীতে দেয়া হয়েছিল।[৪০০]

জবাব

ইতিহাসের এ অংশটি মহানবী (সা.) কর্তৃক হিজরী বর্ষপঞ্জী প্রবর্তনের দলিলের বিপরীতে আদৌ গ্রহণযোগ্য নয়। যদিও ইতিহাসের বর্ণনা সঠিক বলে ধরি তবে বলতে হবে, নবী (সা.) যে হিজরী বর্ষপঞ্জীর প্রবর্তন করেছিলেন তা রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনের সীমাবদ্ধতার কারণে ব্যাপক প্রচলন লাভ করে নি এবং বিষয়টি দ্বিতীয় খলীফার সময় আনুষ্ঠানিকতা লাভ করে।

দু'টি দৃষ্টি আকর্ষণী বিষয়

১. দ্বিতীয় খলীফার আহবানের প্রেক্ষিতে মহানবীর সাহাবিগণ যে সকল পরামর্শ দিয়েছিলেন তার মধ্যে হযরত ঈসা (আ.)- এর জন্মের ভিত্তিতে প্রবর্তিত ি ষ্টীয় সালের কোন প্রস্তাব ছিল না। কারণ

ি ষ্টীয় বর্ষপঞ্জী চতুর্থ হিজরী শতাব্দীতে বিশেষ এক লক্ষ্য নিয়ে ি ষ্টানগণ প্রচলন করে। ইতিপূর্বে এ বর্ষপঞ্জীর প্রচলন ছিল না।

২. বর্তমান সময়ে মুসলিম দেশগুলোর মধ্যে পূর্বের সকল সময় অপেক্ষা ঐক্যের প্রয়োজন অনুভূত হয়েছে। ইসলামী তারিখ ও বর্ষপঞ্জী ঐক্যসাধনের অ তম উপকরণ হতে পারে। এ কারণে সকল মুসলিম দেশ হিজরতের ভিত্তিতে (সৌরবর্ষ অথবা চান্দ্রবর্ষ ধরে) বর্ষপঞ্জীর প্রচলনের উদ্যোগ নিতে পারে এবং এর ভিত্তিতে কর্মসূচীসমূহ নির্ধারণ করতে পারে। মুসলিম দেশসমূহ তাদের ঐক্যকে দৃঢ়তর করার লক্ষ্যে এক বর্ষপঞ্জী প্রবর্তনের উদ্দেশ্যে কনফারেন্সের আয়োজন করতে পারে যাতে ইসলামী বি র সকল বিশেষ ব্যক্তিত্ব সমবেত হয়ে পাশ্চাত্যের অনুসরণ হতে বেরিয়ে ইসলামী বর্ষপঞ্জী প্রতিস্থাপনের সম্ভাব্য পথ নির্ণয় ও উদ্যোগ নিতে পারেন।

খুবই দুঃখজনক যে, ইসলামী বি র অনেক দেশ, এমনকি আরব বি রও অনেকেই হিজরী সালকে পাশ কাটিয়ে ি ষ্ট বর্ষপঞ্জীকে তাদের রাষ্ট্রীয় ও দৈনন্দিন সকল কাজের ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করেছে। এমনকি সুন্নী বি র অ তম প্রধান ধর্মশিক্ষা কেন্দ্র আল আযহারের প্রধানও তাঁর পত্রে ি ষ্ট বর্ষ অনুযায়ী তারিখ লিখে থাকেন; সেখানে হিজরী বর্ষের কোন উল্লেখও তিনি করেন না।[৪০১]

তাগুতী ষড়যন্ত্র

ইসলামী দেশসমূহের মধ্যে ইরান পূর্ব থেকেই হিজরী বর্ষ অনুযায়ী তার কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে ও এর সংরক্ষণে সর্বদা সচেষ্ট থেকেছে। কিন্তু ইরানের তাগুতী শাসক ১৩৫৬ হিজরী সৌরবর্ষে এক ষড়যন্ত্র শুরু করে এবং ইসলামী বর্ষকে তাগুতী পাহলভী বর্ষে পরিবর্তনের প্রয়াস চালায়। রাষ্ট্রীয় প্রচার মাধ্যমসমূহে প্রচারণা শুরু হয় নতুন বর্ষপঞ্জী হিসাবে কার্যক্রম পরিচালনার। তাগুতী শাসক ভেবেছিল ইসলামী বর্ষপঞ্জী পরিবর্তন করে রাজকীয় পাহলভী বর্ষপঞ্জী প্রবর্তনের মাধ্যমে তাদের শাসনকে দৃঢ় করবে এবং তাদের অত্যাচারী শাসনকে আরো কিছু দিন অব্যাহত রাখবে। কিন্তু মহান আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহে ও আমাদের শ্রদ্ধেয় ও মহান শিক্ষক আয়াতুল্লাহ্

আল উযমা ইমাম খোমেইনীর নেতৃত্বে সাহসী এ জাতি এ ষড়যন্ত্রকে নস্যাৎ করে দিতে সক্ষম হয়। অবশেষে এ জাতির বি বী উত্থানে রাজতান্ত্রিক পাহলভী শাসনের মূলোৎপাটিত হয়ে ইসলামী প্রজাতন্ত্র স্থাপিত হয় এবং ইসলামী বর্ষপঞ্জী আবার প্রতিষ্ঠা পায়।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করছি যে, ধর্মীয়, সামরিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সকল কর্মকাণ্ডে হিজরী চন্দ্র ও সৌর উভয় বর্ষের উল্লেখ অপরিহার্য। কারণ প্রথমটি আমাদের ধর্মীয় দায়িত্বসমূহ পালন ও অনুষ্ঠানাদি উদযাপনে সহায়ক নির্দেশনা দেবে এবং দ্বিতীয়টি আমাদের অফিস- আদালতের কাজ, গ্রীষ্মকালীন ও অ া ছুটিকে নির্দিষ্ট করবে যাতে করে বি ে র অ া দেশের সাথে সামঞ্জস্য বজায় রাখা সম্ভব হয়। তাই উভয় বর্ষই অনুসরণ অপরিহার্য। একটি বর্ষপঞ্জী সকল প্রয়োজন পূরণে সক্ষম নয়।

হিজরতের সফরনামা

হিজরতের জ   রাসূলকে প্রায় চারশ’ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করতে হয়েছিল। এত দীর্ঘ পথ অতিক্রম করা অতি উষ্ণ মরু আবহাওয়ায় অত্যন্ত কঠিন এবং এজ   সঠিক পদ্ধতি অবলম্বনের প্রয়োজন ছিল। দিনের আলোয় মক্কার কোন কাফেলার সাথে দেখা হতে পারে এ আশংকায় তাঁরা রাত্রিতে পথ চলতেন এবং দিনে বিশ্রাম করতেন।

সতর্কতা সত্ত্বেও এক উষ্ট্রারোহী হযরত মুহাম্মদ (সা.) ও তাঁর স ীদ্বয়কে দেখে ফেলে এবং   ত নিজ কাফেলার নিকট ফিরে এসে এ ঘটনা জানায়। কাফেলার অ তম সদস্য সুরাকা ইবনে মালিক ইবনে জাশাস মাদলাকী একাই পুরস্কার লাভের মনোবৃত্তিতে তাদেরকে বলল, “তারা মুহাম্মদ ও তার স ী নয়, অ   কেউ হবে। তোমাদের তাদের অনুসরণের প্রয়োজন নেই।” অতঃপর সে মক্কায় পৌঁছে একটি   তগামী অ   ও অস্ত্র স   নিয়ে রাসূলকে হত্যার উদ্দেশ্যে মদীনার পথে যাত্রা করে এবং নবী (সা.) ও তার স ীদ্বয়কে এক স্থানে বিশ্রামরত অবস্থায় দেখতে পায়।

ইবনে আসির[৪০২] বর্ণনা করেছেন, এ দৃশ্যের অবতারণা হলে মহানবীর স ী হযরত আবু বকর ভীত হয়ে পড়েন এবং পুনরায় রাসূলকে বলেন, “আমরা কিরূপে বাঁচব?” মহানবী (সা.) দ্বিতীয় বারের মতো ‘নিশ্চয়ই আল্লাহ্ আমাদের স   রয়েছেন’ বলে তাঁকে সান্ত্বনা দেন।

অ দিকে অস্ত্র হাতে আত্মগর্বিত সুরাকা আরবের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার লাভের আশায় নবীর রক্ত ঝরানোর উদ্দেশ্যে তাঁর দিকে অগ্রসর হলো। তিনি পূর্ণ ঈমান ও বি াস নিয়ে আল্লাহর নিকট দোয়া করলেন, “হে আল্লাহ্! এ ব্যক্তির অনিষ্ট হতে আমাদের রক্ষা কর।” স   স ই দেখা গেল সুরাকার অ   উত্তেজিত হয়ে তাকে মাটিতে আছড়ে ফেলে দিল। সুরাকা বুঝতে পারল এর পেছনে কোন ঐশী কারণ রয়েছে এবং মুহাম্মদ (সা.)- এর প্রতি তার অসৎ উদ্দেশ্যের কারণেই তা ঘটেছে।[৪০৩] তাই সে রাসূলকে অনুরোধ করল, “আমার ক্রীতদাস ও অ   তোমাকে দিলাম এবং তুমি আমার নিকট কিছু চাইলে আমি তা দিতে প্রস্তুত আছি।” রাসূল তাকে বললেন, “তোমার কোন কিছুর আমার প্রয়োজন নেই।” আল্লামা মজলিসীর[৪০৪] বর্ণনায় এসেছে, রাসূল তাকে

বলেন, “তুমি ফিরে যাও এবং অ দের আমাকে অনুসরণ করা থেকে বিরত রাখ।” সুরাকা প্রত্যাবর্তনের পথে যাকেই দেখত তাকেই বলত এ পথে মুহাম্মদের কোন চিহ্নই নেই।

শিয়া- সুন্নী নির্বিশেষে সকল জীবনী লেখক মদীনার পথে রাসূলের তেরটি মুজিযা প্রদর্শনের কথা উল্লেখ করেছেন। আমরা তার কয়েকটি এখানে উল্লেখ করছি :

উম্মে মা’বাদ নামে এক সম্মানিতা নারী ছিলেন। খরা ও দুর্ভিক্ষের কারণে তাঁর সকল মেষ দুধশূ   হয়ে পড়েছিল। নবী (সা.) হিজরতের পথে তাঁর তাঁবু অতিক্রম করেন এবং লক্ষ্য করেন রু   ও শীর্ণকায় এক মেষ তাঁর তাঁবুর পাশে বাঁধা রয়েছে। তিনি তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন, “হে উম্মে মা’বাদ! এ মেষটির কি দুধ রয়েছে?” তিনি জবাব দেন, “এ মেষটি দুধ দেয়ার উপযোগিতা হারিয়েছে।” মহানবী আল্লাহর নিকট দোয়া করলেন, “হে আল্লাহ্! এ মেষটিকে এ নারীর জ   বরকতময় করে দাও।” নবীর দোয়ার বরকতে মেষের স্তন থেকে দুধ ঝরে পড়তে লাগল। মহানবী তাঁকে একটি পাত্র আনতে বললেন ও স্বহস্তে দুধ দোহন করলেন। অতঃপর দুধপূর্ণ পাত্রটি উম্মে মা’বাদের হাতে দিলেন। তাঁর স ীদ্বয়কে ঐ মেষের দুধ হতে পান করালেন এবং নিজেও তা পান করলেন। আবার মেষকে দুইয়ে দুধ উম্মে মা’বাদের হাতে দিয়ে স ীদ্বয়সহ মদীনার পথ ধরলেন।

মুজিযার এ ঘটনাটি বিভিন্ন ইতিহাস ও জীবনী গ্রন্থে বিধৃত হয়েছে। ঐশী শক্তিতে বি াসী ব্যক্তির নিকট এ ধরনের ঘটনা অসম্ভব নয়। কারণ প্রকৃতির ওপর ক্রিয়াশীল কারণসমূহের অ   তম হলো দোয়া। প্রকৃতির ওপর দোয়ার ক্রিয়াশীলতার বিষয়ে ধর্মীয় গ্রন্থসমূহে অসংখ্য উদাহরণ এসেছে এবং মানব অভিজ্ঞতাও এ বিষয়টির সত্যতা প্রমাণ করে।

কুবা গ্রামে রাসূল (সা.)- এর প্রবেশ

কুবা মদীনা থেকে দু'ফারসাখ দূরের একটি গ্রাম যেখানে বনি আমর ইবনে আওফ গোত্র বাস করত। রাসূল (সা.) ১২ রবিউল আউয়াল সেখানে পৌঁছে গোত্রপতি কুলসুম ইবনুল হাদামের গৃহে অবস্থান করেন। মদীনা থেকে আগত কিছু আনসার এবং মক্কার মুহাজিরদের অনেকেই সেখানে তাঁর জ অপেক্ষা করছিলেন। মহানবী (সা.) সপ্তাহের শেষ দিন পর্যন্ত সেখানে হযরত আলীর আগমনের অপেক্ষায় ছিলেন। অনেকেই তাঁকে ত মদীনায় চলে যাওয়ার পরামর্শ দিলেও তিনি যান নি। কুবায় তিনি বনি আমর ইবনে আওফের জ একটি মসজিদের ভিত্তি স্থাপন করেন।

হযরত আলী রাসূলের মক্কা ত্যাগের কয়েকদিন পর একটি উচ্চস্থানে দাঁড়িয়ে ঘোষণা দিলেন,

من كان له قبل محمد أمانة أو وديعة فليأت فلنودّ إليه أمانة

"যারা মুহাম্মদের নিকট আমানত হিসাবে কিছু গচ্ছিত রেখেছ অথবা কাউকে পৌঁছে দেয়ার উদ্দেশ্যে তাঁর নিকট দিয়েছ, তারা আমার নিকট থেকে তা নিয়ে যাও।"[৪০৫]

যারা নবীর নিকট কিছু আমানত রেখেছিল তারা প্রমাণ দেখিয়ে তা নিয়ে গেল। অতঃপর হযরত আলী (আ.) রাসূলের নির্দেশমতো হাশিমী বংশের নারীদেরসহ মদীনায় যাওয়ার প্রস্তুতি নেন। এঁদের মধ্যে নবীর ক া ফাতিমা (আ.), স্বীয় মাতা ফাতিমা বিনতে আসাদ এবং যুবাইরের ক া ফাতিমা অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। অ যে সব মুসলমান তখনও মদীনায় হিজরত করতে সক্ষম হন নি তিনি তাদেরও হিজরতের জ প্রস্তুত করেন। প্রস্তুতি সমাপ্ত হলে তিনি তাদেরকে স নিয়ে এক রাত্রিতে 'যি তোয়া'র পথ ধরে মদীনার দিকে যাত্রা করলেন।

শেখ তুসী তাঁর 'আমালী'[৪০৬] গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন, কুরাইশ গুপ্তচররা মুসলমানগণসহ হযরত আলীর মক্কা ত্যাগের বিষয়টি অবহিত হয় এবং তারা তাঁকে অনুসরণ করে দ্বাজনান নামক স্থানে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে। দীর্ঘক্ষণ হযরত আলী ও তাদের মধ্যে তর্ক চলে এবং নারীরা ভীত হয়ে চিৎকার করে ক্রন্দন করতে থাকে। যখন আলী দেখলেন ইসলাম ও মুসলমানদের সম্মান রক্ষার জ অস্ত্রধারণ ব্যতীত কোন উপায় নেই তখন তিনি তাদেরকে বললেন,

فمن سره أن أفرى لحمه و أهريق دمه فليدن منّي

“তোমাদের মধ্যে যার ইচ্ছা তার দেহ ছিন্নভিন্ন ও তার রক্ত প্রবাহিত হোক (সে) আমার সামনে এসে দাঁড়াক।” আলীর দৃঢ়তা ও রুদ্রমূর্তি দেখে তারা ভীত হয়ে পড়ে এবং তাঁর পথ ছেড়ে দিয়ে মক্কায় ফিরে যায়।

ইবনে আসির বর্ণনা করেছেন, হযরত আলী যখন কুবায় পৌঁছান তখন তাঁর পা দু’টি এতটা জখম হয়ে গিয়েছিল যে, তিনি হাঁটার শক্তি হারিয়ে ফেলেছিলেন। তিনি ক্ষত- বিক্ষত পা নিয়ে বসে পড়েছিলেন। রাসূল (সা.)- কে খবর দেয়া হলে তিনি সেখানে পৌঁছে আলীকে টেনে তুলে বুকে জড়িয়ে ধরেন। তিনি আলীর ক্ষত- বিক্ষত পদযুগল লক্ষ্য করে কেঁদে ফেলেন।[৪০৭]

রাসূলুল্লাহ্ ১২ রবিউল আউয়াল কুবায় পৌঁছেছিলেন এবং আলী ১৫ রবিউল আউয়াল সেখানে পৌঁছেন। এর সপক্ষে দলিল হলো তাবারী তাঁর ‘তারিখ’ গ্রন্থে বলেছেন, আলী মহানবীর হিজরতের[৪০৮] পর তিন দিন মক্কায় অবস্থান করেন ও আমানতসমূহ ফিরিয়ে দেন।[৪০৯]

মদীনায় আনন্দের ঢল

মদীনার জনসাধারণ হিজরতের তিন বছর পূর্বে রাসূলের ওপর ঈমান এনেছিলেন। প্রতি বছরই তাঁরা মক্কায় তাঁর সে   সাক্ষাতের জ   প্রতিনিধি দল পাঠাতেন। যে নবীর ওপর তাঁরা বিগত তিন বছর ধরে তাঁদের নামাযে দরুদ পড়েছেন, তাঁর পবিত্র নাম বারবার স্মরণ করেছেন, এখন তিনি মদীনার মাত্র দু'ফারসাখ দূরে অবস্থান করছেন এবং খুব শীঘ্রই মদীনায় এসে পৌঁছবেন। মহানবীকে কাছে পাওয়া যাবে এ অনুভূতি তাঁদের মধ্যে আশ্চর্য শিহরণ এনেছিল। তাঁদের মধ্যে যে আনন্দ- উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়েছিল তা বর্ণনা করা কখনই আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। আনসার যুবকরা ইসলামের মহান ও প্রাণসঞ্চারক কর্মসূচীর জ   তৃষ্ণার্ত ছিল। তারা নবীর আগমনের পূর্বেই মদীনার পরিবেশকে যতটা সম্ভব মূর্তিপূজার আবহ ও চিহ্ন হতে মুক্ত করার প্রয়াস চালিয়েছিল। তারা মদীনার গৃহ ও বাজারগুলো থেকে মূর্তি অপসারণ করে পুড়িয়ে দিয়েছিল।

আমরা এখানে নবীর প্রতি মদীনার আনসারদের ভালোবাসার কিছু ক্ষুদ্র নমুনা তুলো ধরছি :

আমর ইবনে জুমুহ বনি সালমা গোত্রের অ তম প্রধান ব্যক্তি ছিল। তার গৃহে একটি বিশেষ মূর্তি ছিল। মদীনার যুবকরা এ মূর্তির অক্ষমতা প্রমাণের জ তার গৃহ থেকে সেটি চুরি করে নিয়ে আসে ও তার ব্যবহারের জ প্রস্তুত পায়খানার গর্তে তা ফেলে দেয়। সে অনেক খোঁজাখুঁজির পর মূর্তিটি সেখানে পায় এবং সেটি ধুয়ে- মুছে স্বস্থানে পুনঃস্থাপন করে। কিন্তু যুবকরা আবার তা চুরি করে ঐ গর্তে ফেলে দেয়। এভাবে তিন বার ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটলে সে মূর্তিটির ঘাড়ে একটি তরবারি ঝুলিয়ে মূর্তিটিকে উদ্দেশ্য করে বলে যদি এ বি তোমার কোন ক্ষমতা থাকে তবে নিজেকে এর মাধ্যমে রক্ষা কর। কিন্তু তার এ কর্ম কোন ফল দেয় নি। যুবকরা পুনরায় তা চুরি করে একটি কুকুরের মৃতদেহের স বেঁধে অ একটি গর্তে ফেলে দেয়। সে অনেক খোঁজার পর ঐ গর্তে মূর্তিটিকে তরবারিহীন অবস্থায় পায়। এ ঘটনা থেকে সে বুঝতে পারে, মানুষ মাটি ও পাথরের মূর্তির সামনে অবনত হওয়া হতে উর্ধ্বের এক অস্তিত্ব। অতঃপর সে নিম্নোক্ত কবিতা পাঠ করে :

تـــالله لـــو كنـــت إلهـــا لم تكـــن   أنـــت و كلـــب وســـط بئـــر في قـــرن

فالحمــــــد لله العلــــــى ذي المــــــنن   ألواهــــب الـــرزاق و ديـــان الـــدين

هـــو الـــذي انقـــذنى مـــن قبـــل أن   أكـــون في ظلمـــة قـــبر مـــرتهن

"যদি তুমি উপাস্য হতে তবে কখনই মৃত কুকুরের স একত্রে এক গর্তে পড়ে থাকতে না। সে আল্লাহর প্রশংসা যিনি নেয়ামতের অধিকারী, রিযিকদাতা ও পুরস্কারদাতা। তিনিই আমাকে কবরের অন্ধকার হতে মুক্তি দিয়েছেন।"[৪১০]

রাসূল (সা.) মদীনার দিকে যাত্রা করে মদীনার সন্নিকটে অবস্থিত 'সানিয়াতুল বিদা' নামক স্থানে পৌঁছলে মুসলমানগণ ও মদীনার যুবকরা তাঁকে অভ্যর্থনা জানানোর উদ্দেশ্যে এগিয়ে আসল।

তারা স্বাগতসূচক গান গেয়ে মদীনার অকাশ- বাতাস মুখরিত করে তুলল। তাদের পঠিত গজলটি ছিল নিম্নরূপ :

طلـــــــــع البـــــــــدر علينـــــــــا مـــــــــن ثنيـــــــات الـــــــــوداع

وجـــــــــب الشّـــــــــكر علينـــــــــا مـــــــــا دعـــــــــا لله داع

أيّهـــــــــا المبعـــــــــوث فينـــــــــا جئـــــــــت بـــــــــالأمر المطـــــــــاع

“সানিয়াতুল বিদা হতে চন্দ্র উদিত হয়েছে, আমাদের ওপর এ নেয়ামতের শোকর করা অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। হে সেই মহান যাঁকে আল্লাহ্ আমাদের হেদায়েতের জ পাঠিয়েছেন এবং যাঁর নির্দেশ আমাদের নিকট অবশ্য পালনীয়।”

আমর ইবনে আওফ গোত্র নবীর প্রতি জোর অনুরোধ জানিয়ে বলল, “আমরা অত্যন্ত পরিশ্রমী, যোদ্ধা ও সংগ্রামী জাতি। আপনি আমাদের মাঝেই থেকে যান।” রাসূল (সা.) তাঁর অসম্মতির কথা তাদেরকে বুঝিয়ে বললেন। রাসূল মদীনার নিকটবর্তী হয়েছেন জানতে পেরে আওস ও খাজরাজ গোত্র তরবারী হাতে গজল গেয়ে তাঁর অভ্যর্থনার জ এগিয়ে এল। তারা তাঁর উটের চারিদিক ঘিরে ধরল। তিনি যখনই যে গোত্রের এলাকা অতিক্রম করছিলেন ঐ গোত্রের লোকেরা তাঁর উটের রশি ধরে টেনে আহবান জানাচ্ছিল তাদের গোত্রের মেহমান হওয়ার জ । নবী (সা.) তাদের উদ্দেশ্য করে বললেন, خلوا سبيلها فانها مامورة “উটের জ রাস্তা উন্মুক্ত কর, সে- ই দায়িত্বপ্রাপ্ত (অর্থাৎ উট যেখানে বসে পড়বে সেখানেই আমি নামব)।” অবশেষে উটটি আসআদ ইবনে জুরারাহ্[৪১১] নামক এক ব্যক্তির অভিভাবকত্বে থাকা সাহল ও সুহাইল নামক দু’ইয়াতীমের অধিকৃত স্থানে বসে পড়ে। স্থানটি খেজুর ও অ । ফসল শুকানোর জ ব্যব ত হতো। হযরত আবু আইয়ুব আনসারীর গৃহ এর সন্নিকটেই ছিল। তাঁর মাতা চতুরতার সাথে গোপনে রাসূলের আসবাবপত্র তাঁর গৃহে নিয়ে উঠালেন। এদিকে সকলে নবীকে নিজ গৃহে নেয়ার জ পীড়াপীড়ি করতে লাগল। মহানবী তাদের থামিয়ে দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, أين الرحل

“(আমার) আসবাবপত্র কোথায়?” সকলে বলল, “আবু আইয়ুবের মাতা তা নিয়ে গেছেন।” মহানবী বললেন, المرء مع رحله “লোকেরা সেখানেই ওঠে যেখানে তার আসবাবপত্র থাকে।” অতঃপর আসআদ ইবনে জুরারাহ্ উটের রশি ধরে নবীকে সেখানে পৌঁছে দেন।

নিফাকের উৎপত্তি

আওস ও খাজরাজ গোত্র মহানবী (সা.)- এর সং চুক্তিবদ্ধ হওয়ার পূর্বে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাইকে (মুনাফিক নেতা বলে প্রসিদ্ধ) মদীনার সর্বময় নেতা বলে গ্রহণ করার। কিন্তু নবীর সং তাদের বিশেষ সম্পর্ক স্থাপিত হওয়ায় ঐ সিদ্ধান্ত কার্যত বাতিল হয়ে পড়েছিল। ফলে উবাইয়ের পুত্র আবদুল্লাহর অন্তরে ইসলামের মহান নেতা রাসূলুল্লাহ্ (সা.)- এর প্রতি চরম বিদ্বেষ দানা বেঁধে উঠে এবং শেষ জীবন পর্যন্ত সে অন্তর থেকে ইসলাম গ্রহণ করতে পারে নি। সে যখন রাসূলের প্রতি আওস ও খাজরাজ গোত্রের দয় নিংড়ানো অভ্যর্থনা লক্ষ্য করল তখন তার অন্তরে বিদ্যমান হিংসা ও শত্রুতা চেপে রাখতে না পেরে বলেই ফেলল,

يا هذا إذهب إلى الذين غرّوك و أتوابك فانزل عليهم و لا تغشنا في ديارنا

"হে অনা ত! যারা তোমাকে প্রতারিত করেছে তাদের নিকট ফিরে যাও, আমাদের প্রতারিত করতে এখানে এসো না।"[৪১২]

মহানবী যেন তার কথায় সকলের প্রতি মনঃক্ষুণ্ন না হন এজ সা'দ ইবনে উবাদা ক্ষমা প্রার্থনা করে তাঁকে বললেন, "এ ব্যক্তি আপনার প্রতি বিদ্বেষবশত এ কথা বলেছে। যেহেতু সে আওস ও খাজরাজের একচ্ছত্র নেতা হতে যাচ্ছিল এবং আপনার আগমনের মাধ্যমে তা নস্যাৎ হয়ে গিয়েছে।"

অধিকাংশ ঐতিহাসিকের মতে মহানবী (সা.) শুক্রবার মদীনায় প্রবেশ করেন এবং বনি সালিম গোত্রের আবাসস্থলের নিকট সাহাবীদের নিয়ে জুমআর নামায পড়েন। তিনি নামাযের পূর্বে একটি অনলবর্ষী খুতবা দেন যা তারা পূর্বে কখনই শোনে নি এবং এ ধরনের শব্দ ও বাক্যের সং তেমন পরিচিত ছিল না। এ খুতবা তাদের অন্তরে গভীর ও চিরস্থায়ী প্রভাব ফেলে। ইবনে হিশাম তাঁর 'সীরাত' গ্রন্থে এবং আল্লামা মাজলিসী তাঁর 'বিহার' গ্রন্থে খুতবাটি বর্ণনা করেছেন।[৪১৩] অবশ্য আল্লামা মাজলিসীর বক্তব্যের সং ইবনে হিশামের বর্ণনার পার্থক্য রয়েছে।

ছাব্বিশতম অধ্যায় : হিজরতের প্রথম বর্ষের ঘটনাপ্রবাহ

হিজরতের প্রথম বর্ষের[৪১৪] ঘটনাপ্রবাহ

মহানবীর প্রথম ইতিবাচক পদক্ষেপসমূহ

মসজিদ : ইসলামী আন্দোলনের কেন্দ্র

আনসার যুবক এবং আওস ও খাজরাজ গোত্রের অধিকাংশ ব্যক্তির উষ্ণ ও জাঁকজমকপূর্ণ অভ্যর্থনা মহানবীকে ঐক্যবদ্ধ সুন্দর সমাজ গঠনের পদক্ষেপ নিতে উৎসাহিত করেছিল। তিনি জ্ঞানচর্চা, প্রশিক্ষণ, রাজনীতি ও বিচারকার্য সম্পাদনের কেন্দ্র হিসাবে মসজিদকে বেছে নিয়েছিলেন। যেহেতু তাওহীদ বা একত্ববাদের বিষয়টি ইসলামী কর্মসূচীর প্রথম ধাপ সেহেতু তিনি সব কিছুর পূর্বে এক আল্লাহর ইবাদাত ও স্মরণের লক্ষ্যে মুসলমানদের জ মসজিদ তৈরি করেন।

ইসলামের সৈনিকগণ যেন প্রতি সপ্তাহের বিশেষ দিনে সেখানে সমবেত হয়ে ইসলাম ও মুসলমানদের কল্যাণের বিষয়ে পরামর্শ করতে পারে সে লক্ষ্যেও নবী (সা.) এ কেন্দ্রটি স্থাপন করেছিলেন। মুসলমানগণ সেখানে প্রত্যহ সমবেত হতেন এবং বছরে দু'বার ঈদের জামায়াতে সকল প্রান্ত হতে মুসলমানগণ সেখানে আসতেন।

মসজিদ শুধু ইবাদাতের কেন্দ্রই ছিল না, বরং সে সাথে ইসলামী বিধিবিধান ও অ । প্রয়োজনীয় ধর্মীয় শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের কার্যক্রমও সেখানে সম্পাদিত হতো। ধর্মীয় জ্ঞান শিক্ষা ছাড়াও লিখন ও পঠন শিক্ষা দান করা হতো। চতুর্থ হিজরী শতাব্দীর প্রারম্ভ পর্যন্ত মসজিদ পাঞ্জেগানা নামাযের বাইরের সময়গুলোতে মাদ্রাসা বা দীনী শিক্ষার কেন্দ্র হিসাবে ব্যব ত হতো।[৪১৫] পরবর্তীতে ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিশেষ রূপে আবির্ভূত হয়। ইসলামের অনেক মনীষীই মসজিদভিত্তিক শিক্ষা ও পাঠচক্রের ফসল।

কখনো কখনো মদীনার মসজিদ সাহিত্য চর্চা কেন্দ্রের রূপ নিত। আরবের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গ তাঁদের রচিত যে সব কবিতা ইসলামী নৈতিকতা ও প্রশিক্ষণপদ্ধতির সে সামঞ্জস্যশীল ছিল তা মসজিদে নববীর সামনে পাঠ করে শুনাতেন। আরবের বিশিষ্ট কবি কা'ব ইবনে যুহাইর মহানবী (সা.)- এর প্রশংসায় রচিত তাঁর প্রসিদ্ধ 'বানাত সুয়াদ' কাসীদাটি এ মসজিদেই মহানবীর সামনে পাঠ করে শুনান এবং তাঁর নিকট থেকে মূল্যবান পুরস্কার লাভ করেন। অপর এক প্রসিদ্ধ কবি হাসসান

ইবনে সাবিত, যিনি ইসলাম ও নবীর শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রশংসায় অনেক কবিতা লিখেছেন তিনি এ মসজিদেই তাঁর কবিতাসমূহ পাঠ করে শুনাতেন।

মহানবী (সা.)- এর সময় মদীনার মসজিদে শিক্ষার আসরগুলো এতটা আকর্ষণীয় ও প্রাণবন্ত ছিল যে, বনি সাকিফের সফরকারী প্রতিনিধিরা তা দর্শনে অভিভূত হয়ে পড়েছিল। ধর্মীয় বিধিবিধান ও জ্ঞান শিক্ষার প্রতি মুসলমানদের আগ্রহ লক্ষ্য করে তারা আশ্চর্যান্বিত হয়েছিল।

অপরাধীদের বিচার ও শাস্তি প্রদানের কার্যটিও মসজিদে সম্পাদিত হতো। সে সময় মসজিদ প্রকৃত অর্থেই একটি বিচারালয় ছিল। এ ছাড়া কাফির ও মুশরিকদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ও জিহাদের আহবান জানিয়ে অনলবর্ষী বক্তৃতাসমূহ রাসূল (সা.) মসজিদেই দিতেন। সম্ভবত ধর্ম ও জ্ঞানকে মসজিদে সমন্বিত করার যে প্রয়াস মহানবী নিয়েছিলেন তার অ   তম উদ্দেশ্য ছিল এই যে, তিনি দেখিয়ে যেতে চেয়েছেন জ্ঞান ও ঈমান (বি াস) পরস্পর ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তাই যেখানেই ঈমানের কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হোক না কেন একই স   তা জ্ঞানকেন্দ্রও হতে হবে। বিচারকার্য, সামাজিক সেবাদান ও যুদ্ধ- বিগ্রহের ঘোষণা প্রদানের কার্যসমূহ মসজিদে এ লক্ষ্যেই সম্পাদিত হতো যে, নবী (সা.) বুঝাতে চেয়েছেন তাঁর প্রতি অবতীর্ণ শরীয়ত শুধু আধ্যাত্মিকতার স   সংশ্লিষ্ট নয়, বরং মানুষের বৈষয়িক কার্যসমূহও তার অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ এ ধর্ম মানুষকে ঈমান ও তাকওয়ার দিকেই শুধু দাওয়াত দেয় না, সে সাথে সমাজ সংস্কার ও পরিচালনার বিষয়ের প্রতিও দৃষ্টি দেয় এবং এ দিকগুলোর প্রতি অসচেতন নয়।

জ্ঞান ও ঈমানের সমন্বয়ের বিষয়টি এখনও মুসলমানদের মধ্যে বিদ্যমান। এ কারণেই মহানবীর যুগের পরবর্তী সময়ে যখন শিক্ষাকেন্দ্রসমূহ বিশেষ রূপধারণ করে তখনও দেখা গেছে মসজিদকে কেন্দ্র করেই শিক্ষা ন ও ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়েছে। এর মাধ্যমে তারা (মুসলমানগণ) বি বাসীর নিকট প্রমাণ করতে চেয়েছে যে, মানুষের সৌভাগ্যের নিয়ামক এ দু'টি উপকরণ (জ্ঞান ও ঈমান) পরস্পর অবিচ্ছেদ্য।

হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসিরের ঘটনা

মহানবী (সা.)- এর উটটি যেখানে বসে পড়েছিল সে স্থানটি দশ দিনারে ক্রয় করা হয়েছিল। সকল মুসলমানই মসজিদ ও গৃহ নির্মাণে হাতে হাত রেখে সেখানে কাজ করছিলেন, এমনকি মহানবীও অ া মুসলমানের সে পাথর আনয়নের কাজে অংশগ্রহণ করেছিলেন। উসাইদ ইবনে হাদির (হাজীর) নামক এক আনসার নবীর নিকট গিয়ে বলেন, "হে আল্লাহর রাসূল! আপনি বসুন, আমরা এ পাথর বয়ে নিয়ে যাই।" তিনি তাঁকে বলেন, إذهب فاحمل غيره "যাও অ পাথর নিয়ে আস।" নবী (সা.) তাঁর এ কর্মের মাধ্যমে তাঁর মহান মিশনে তিনি যে শুধু কথায় নয়, কাজেও অনুরূপ তা বুঝিয়ে দেন। এ সময় একজন মুসলমান নিম্নোক্ত কবিতাটি পাঠ করে :

لــــــئن قعــــــدنا و النّــــــبيّ يعمــــــل   فــــــذاك منّــــــا العمــــــل المضــــــلّل

"যদি আমরা বসে থাকি আর নবী কাজ করেন,

তবে তা আমাদের বিচ্যুতির কারণ হবে।"

নবী করীম (সা.) ও অ া মুসলমান কাজ করার সময় নিম্নোক্ত দোয়াটি পড়ছিলেন :

لا عيش إلّا عيش الآخرة اللهم ارحم الأنصار و المهاجرة

"প্রকৃত জীবন আখেরাতের জীবন। হে আল্লাহ্! আপনি আনসার ও মুহাজিরদের ওপর রহমত বর্ষণ করুন।"

হযরত উসমান ইবনে আফফান সব সময় মাটি ও ধুলা- বালি থেকে দূরে থাকতেন এবং পোশাকের পরিচ্ছন্নতার বিষয়ে বিশেষ সচেতন ছিলেন। এ কারণেই মসজিদ নির্মাণের সময় তিনি তাঁর পোশাক পরিষ্কার রাখার নিমিত্তে অ াে র বিপরীতে কাজে অংশগ্রহণ করা থেকে বিরত থাকেন। হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসির হযরত আলীর নিকট থেকে একটি কবিতা শিখেছিলেন যা ঐ সকল ব্যক্তির সমালোচনায় রচিত ছিল যারা ধুলা- বালি থেকে নিজেদেরকে মুক্ত রাখার উদ্দেশ্যে কাজ হতে বিরত থাকে। হযরত উসমানের কাজের সমালোচনায় হযরত আম্মার এ কবিতাটি পাঠ করছিলেন :

لا يستوي من يعمر المساجدا

يدأب فيها قائما قاعدا

و من يرى عن الغبار حائدا

কবিতাটির ভাবার্থ এরূপ যে, যে ব্যক্তি মসজিদ নির্মাণের জ দাঁড়িয়ে এবং বসে সর্বদা প্রচেষ্টায় লিপ্ত এবং যে ব্যক্তি ধুলা- বালি থেকে বাঁচা এবং পোশাক পরিষ্কার রাখার নিমিত্তে মসজিদ নির্মাণ করা থেকে বিরত থাকে তারা উভয়ে সমান নয়।[৪১৬]

কবিতাটির উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে হযরত উসমান খুবই রাগান্বিত হলেন এবং তাঁর হাতের লাঠিটি আম্মারকে দেখিয়ে বললেন, "এ লাঠি দিয়ে তোমার নাক ভেঙে দিলে বুঝতে পারবে।" মহানবী (সা.) ঘটনাটি সম্পূর্ণ জানতে পেরে বলেন, "আম্মারকে ছেড়ে দাও, আম্মার তাদেরকে বেহেশতের দিকে আহবান জানাচ্ছে আর তারা তাকে আহবান জানাচ্ছে দোযখের দিকে।"

হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসির ইসলামের সেবক ও এক শক্তিশালী যুবক ছিলেন। তিনি মসজিদ নির্মাণের সময় কয়েকটি করে পাথর বহন করছিলেন। কেউ কেউ তাঁর নিষ্ঠা ও সরলতার সুযোগ নিয়ে তাঁর প্রতি অবিচার করছিল এবং তাঁর ক্ষমতার অধিক পাথর তাঁর ওপর চাপিয়ে দিচ্ছিল। হযরত আম্মার বলেন, "আমি একটি পাথর নিজের নিয়্যতে এবং অপর একটি পাথর রাসূল (সা.)- এর নিয়্যতে বহন করছিলাম।" একবার রাসূল (সা.) তাঁকে তিনটি পাথর বহন করতে দেখলেন। আম্মার রাসূলের উদ্দেশে অনুযোগের সুরে বললেন, "হে রাসূলাল্লাহ্! আপনার স ীদের আমার প্রতি মন্দ উদ্দেশ্য রয়েছে এবং তারা আমার মৃত্যু কামনা করে; তারা প্রত্যেকে একটি করে পাথর বহন করে, অথচ আমার কাঁধে তিনটি করে পাথর চাপিয়ে দেয়।" নবী (সা.) তাঁর হাত ধরে পিঠের ধুলা- বালি পরিষ্কার করতে লাগলেন এবং ঐতিহাসিক এ ভবি দ্বাণী করলেন : "তারা তোমার হত্যাকারী নয়, তোমার হত্যাকারী একদল অত্যাচারী ব্যক্তি। (তারা তোমাকে হত্যা করবে) তুমি তাদেরকে সত্যের দিকে আহবানকারী অবস্থায়।"[৪১৭]

মহানবী (সা.)- এর এ ভবি দ্বাণী তাঁর সত্যবাদিতা ও নবুওয়াতের আরেকটি প্রমাণ। মহানবী যেমন বলেছিলেন ঠিক তেমনিভাবেই ঘটনাটি ঘটেছিল। কারণ পরিশেষে হযরত আম্মার ৯০ বছর

বয়সে সিফিফনের যুদ্ধে হযরত আলীর পক্ষে যুদ্ধরত অবস্থায় মুয়াবিয়ার অনুচরদের দ্বারা নিহত হন। হযরত আম্মারের জীবদ্দশায় এ গায়েবী খবর মুসলমানদের ওপর আশ্চর্য প্রভাব ফেলেছিল। তারা রাসূলের এ ভবি দ্বাণীর পর হযরত আম্মারকে সত্যের মানদণ্ড মনে করত এবং হযরত আম্মার কোন্ পক্ষে যোগ দিচ্ছেন তা দেখে ঐ পক্ষের দাবির সত্যতা যাচাই করত।

সিফিফনের যুদ্ধে যখন হযরত আম্মার শহীদ হন তখন মুয়াবিয়ার বাহিনীর সিরীয়দের মধ্যে আশ্চর্যজনক মতপার্থক্যের সৃষ্টি হয়। যে সব ব্যক্তি মুয়াবিয়া এবং আমর ইবনুল আসের বিষাক্ত অপপ্রচারে হযরত আলীর সত্যতার বিষয়ে সন্দেহে পতিত হয়েছিল তাদের অনেকেরই তখন সন্দেহের অপনোদন হয়। জাইমা ইবনে সাবিত আনসারী যিনি হযরত আলীর স   সিফিফনে গিয়েছিলেন, কিন্তু যুদ্ধে অংশগ্রহণের বিষয়ে দ্বিধান্বিত ছিলেন, তিনি আম্মার ইবনে ইয়াসিরের শাহাদাতের পর তরবারি উন্মুক্ত করেন ও সিরীয় বাহিনীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েন।[৪১৮]

জুলকালা ’   হামিরি ২০ হাজার সৈ   নিয়ে (যাদের সকলেই তার গোত্রভুক্ত ছিল) হযরত আলীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জ   সিফিফনে এসেছিল। এ যুদ্ধের জ   মুয়াবিয়া তার ওপরেই বেশি নির্ভর করছিলেন এবং তার সাহায্যের আ াস পেয়েই তিনি যুদ্ধের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। মুয়াবিয়া কর্তৃক প্রতারিত এ গোত্রপতি সিফিফনে এসে যখন শুনল যে, আম্মার ইবনে ইয়াসির আলীর পক্ষে যুদ্ধ করতে এসেছেন তখন সে যেন প্রকম্পিত হলো। মুয়াবিয়ার অনুচররা সিফিফনে হযরত আম্মারের উপস্থিতির বিষয়টি তার নিকট সন্দেহপূর্ণ করার নিমিত্তে বলল, আম্মার সিফিফনে আসেন নি এবং ইরাকীরা মিথ্যা প্রচারে অভ্যস্ত বলে আম্মার সিফিফনে এসেছেন বলে প্রচার করছে। কিন্তু জুলকালা ’   এতে সন্তুষ্ট হলো না, সে আমর ইবনুল আসকে লক্ষ্য করে বলল, “নবী (সা.) কি আম্মার সম্পর্কে এমন কথা বলেছেন?” আমর ইবনুল আস বলল, “হ্যাঁ, নবী (সা.) এমন কথা বলেছেন। কিন্তু আম্মার আলীর স   সিফিফনে আসেন নি।” জুলকালা ’ বলল, “আমি নিজেই বিষয়টি যাচাই করতে চাই।” তাই সে তার গোত্রের কিছু লোককে বিষয়টির সত্যতা যাচাইয়ের জ   খোঁজ- খবর নিতে বলল। মুয়াবিয়া এবং আমর ইবনুল আস

সত্য প্রকাশ হওয়ার ভয়ে শ ি ত হলেন। কারণ এর ফলে সিরীয় বাহিনীর মধ্যে অনৈক্যের সম্ভাবনা ছিল। পরবর্তীতে সিরীয় এ সেনা ও গোত্রপতি রহস্যজনকভাবে নিহত হয়।

হযরত আম্মার সম্পর্কিত এ হাদীসটি শিয়া- সুন্নী উভয় সূত্রেই এতটা প্রসিদ্ধ যে, হাদীসটির সূত্র উল্লেখের তেমন প্রয়োজন পড়ে না।

আহমদ ইবনে হাম্বল বর্ণনা করেছেন, যখন সিফিফনের যুদ্ধে হযরত আম্মার শহীদ হলেন তখন আমর ইবনে হাজম আমর ইবনুল আসের নিকট এসে বললেন, আম্মার নিহত হয়েছেন এবং রাসূল (সা.) তাঁর সম্পর্কে বলেছেন : تقتله الفئة الباغية "তাকে একদল বিদ্রোহী জালেম হত্যা করবে।" আমর ইবনুল আস আর্তনাদ করে বলল, "ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন"। তিনি মুয়াবিয়াকে গিয়ে ঘটনাটি জানালেন। মুয়াবিয়া এ কথা শ্রবণে বললেন, "আমরা আম্মারের হত্যাকারী নই, বরং আলী ও তার অনুসারীরা তাকে হত্যা করেছে। কারণ তারা তাকে স‍ে করে এনেছে এবং আমাদের তরবারির মুখে ঠেলে দিয়েছে।"[৪১৯]

এটি সুস্পষ্ট যে, মুয়াবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান এরূপ অপব্যাখ্যার মাধ্যমে সিরীয় সেনাদের অবচেতন করে বিভ্রান্ত করতে চেয়েছে। এরূপ ব্যাখ্যা কখনই আল্লাহর ায়বিচারের মানদণ্ডে গ্রহণীয় নয়। তাই বুদ্ধিসম্পন্ন যে কোন ব্যক্তি বুঝবেন এরূপ ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও অযৌক্তিক। যদি মুয়াবিয়ার এ কথাটি গ্রহণ করা হয় তবে তা স্পষ্ট হাদীসের বিপরীতে অবস্থান গ্রহণ করার নামান্তর। অর্থাৎ স্পষ্ট হাদীসের বিপরীতে ইজতিহাদকে গ্রহণ এবং এরূপ কর্ম সম্পূর্ণ মন্দ। এরূপ বাতিল ইজতিহাদই (যার অবস্থান কোরআনের আয়াত ও হাদীসের বাণীর সম্পূর্ণ বিপরীতে) পরবর্তী সময়ে অনেক বড় অপরাধীর অপরাধকে অপব্যাখ্যা করার সুযোগ করে দিয়েছিল।

উপরিউক্ত ঘটনাকে কিরূপে অপব্যাখ্যা করা হয়েছে তার নমুনা আমরা নিম্নে বর্ণনা করছি :

অষ্টম হিজরী শতাব্দীর বিশিষ্ট সিরীয় ঐতিহাসিক 'আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া' গ্রন্থের রচয়িতা ইবনে কাসির এরূপ অপব্যাখ্যাকারীদের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এ ঐতিহাসিক মুয়াবিয়ার সমর্থনে তাঁর গ্রন্থে[৪২০] বলেছেন, "নবী (সা.) যে হযরত আম্মারের হত্যাকারীদের জালেম বলে অভিহিত করেছেন

তার অর্থ এ নয় যে, তারা কাফির। কারণ যদিও তারা ভুল করেছেন এবং হযরত আলীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছেন, কিন্তু তাঁরা ঈমান নিয়েই ইজতিহাদের ভিত্তিতে এটি করেছেন। এ কারণেই তাঁদেরকে কাফির ও বিভ্রান্ত বলা যাবে না।" অতঃপর তিনি বলেছেন, "রাসূল (সা.) যে বলেছেন: আম্মার তাদেরকে বেহেশতের দিকে আহবান জানাবে, কিন্তু আম্মারের হত্যাকারীরা তাকে দোযখের দিকে আহবান করবে [৪২১]- এর অর্থ হযরত আম্মার তাদেরকে ঐক্যের দিকে আহবান করবেন যা বেহেশতের নামান্তর, কিন্তু আম্মারের হত্যাকারীরা হযরত আলী খেলাফতের জ সবচেয়ে উপযক্তু জানা সত্ত্বেও মুয়াবিয়াকে তাদের নেতা নির্বাচিত করায় ইসলামী ভূখণ্ডের বিভিন্ন অঞ্চলে স্বতন্ত্র শাসনকর্তার আবির্ভাবের পথ উন্মুক্ত করে মুসলমানদের মধ্যে গভীর বিভেদ ও অনৈক্যের সৃষ্টি করেছে যা নবী (সা.) দোযখ বলে অভিহিত করেছেন।"

আমরা এ বিষয়ে যতই চিন্তা করি না কেন এ অপব্যাখ্যাকে সত্যকে বিকৃত করার প্রয়াস ব্যতীত আর কিছুই বলতে পারি না। আম্মারের হত্যাকারী বিদ্রোহী জালেমের দলনেতারা সত্যকে বিকৃত ও মিথ্যা প্রতিপন্ন করায় অত্যন্ত দক্ষ হওয়া সত্ত্বেও এ সত্যকে অস্বীকার করতে পারে নি যদিও রাসূল (সা.)- এর এ ভবি দ্বাণী তাদের বিরুদ্ধেই ছিল। কিন্তু ঐতিহাসিক ইবনে কাসির 'মায়ের চেয়ে মাসীর দরদ বেশি' - এ প্রবাদটির সত্যতা প্রমাণ করে সত্যকে বিকৃত করার এমন এক প্রয়াস নিয়েছেন যা তাদের মাথায়ও আসে নি।

আহমদ ইবনে হাম্বল বর্ণনা করেছেন যে, দু'ব্যক্তি মুয়াবিয়ার নিকট উপস্থিত হয়ে উভয়েই আম্মারের হত্যাকারী হিসাবে নিজেকে দাবি করল। আমর ইবনুল আসের পুত্র আবদুল্লাহ্ তাদের উদ্দেশ্য করে বললেন,

"তোমাদের একজনের এ দাবি প্রত্যাহার করে নেয়া উচিত। কারণ আমি মহানবীকে বলতে শুনেছি যে, একদল অত্যাচারী ব্যক্তি আম্মারকে হত্যা করবে।" এ সময় মুয়াবিয়া আবদুল্লাহকে লক্ষ্য করে বললেন, "যদি আমরা সেই অত্যাচারীর দল হয়ে থাকি, তবে কেন তুমি আমাদের সে রয়েছ?" তিনি জবাবে বললেন, "একদিন আমার পিতা মহানবীর নিকট আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ

করলে তিনি আমাকে পিতার আনুগত্যের নির্দেশ দেন। সে কারণেই আমি আপনার সে   রয়েছি। কিন্তু যুদ্ধে অংশগ্রহণ হতে বিরত থাকাকে শ্রেয় মনে করছি। ”

ইবনে কাসির আমর ইবনুল আসের পুত্র আবদুল্লাহর যুদ্ধে অংশগ্রহণের অপারগতার ওজরকে ব্যাখ্যা করে বলেছেন, মুয়াবিয়া স্বীয় ইজতিহাদ ও ঈমানের ভিত্তিতে এ যুদ্ধ করেছিলেন যদিও এ ইজতিহাদে তিনি ভুল করেছিলেন। অপরদিকে আবদুল্লাহ্ পিতার আনুগত্যের লক্ষ্যে মুয়াবিয়ার পক্ষে ছিলেন। কিন্তু আমরা জানি, পিতার আনুগত্য শরীয়তের পরিপন্থী কাজে হতে পারে না। পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে :

(و إن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما)

“ যদি তোমার পিতা- মাতা শিরক করার জ   তোমাকে নির্দেশ দেয় যে বিষয়ে তোমার জ্ঞান নেই, তাহলে কখনই তাদের আনুগত্য করবে না। ” [৪২২]

অনুরূপ ইজতিহাদ বা স্বীয় মত প্রদান তখনই সঠিক হবে যখন রাসূল (সা.)- এর নিকট থেকে স্পষ্ট হাদীস না থাকবে। তাই মুয়াবিয়া ও আমর ইবনুল আসদের ইজতিহাদ মহানবী (সা.)- এর সুস্পষ্ট হাদীসের বিপরীতে বাতিল ও ভ্রান্তিপূর্ণ এবং যদি এরূপ ক্ষেত্রেও ইজতিহাদের দ্বার উন্মোচন করা হয় তবে নবী (সা.)- এর বিরুদ্ধে মুশরিক ও মুনাফিকদের যুদ্ধগুলোকেও তাদের ইজতিহাদের ভিত্তিতে সঠিক বলতে হবে। এরূপ ইজতিহাদের কারণেই ইয়াযীদ ও হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফের মতো ব্যক্তি মুসলিম উম্মাহর পবিত্র ব্যক্তিদের হত্যার পরও নিরপরাধ বলে ঘোষিত হয়েছে।

যা হোক আম্মার ও মহানবী (সা.)- এর অ   া   সাহাবীর অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে অবশেষে মসজিদ নির্মাণ সমাপ্ত হলো। দিন দিন মসজিদের কর্মকাণ্ডের পরিসীমা বাড়তে লাগল। মসজিদের পাশেই মুহাজির ও অ   া   নিরাশ্রয় ব্যক্তির জ   কুটির নির্মিত হলো যা ‘সোফফা ’ নামে পরিচিত। এ সকল ব্যক্তির কোরআন শিক্ষাদানের জ   ওবাদা ইবনে সামিতকে নিয়োজিত করা হলো।

ভ্রাতৃত্ব বন্ধন : ঈমানের সর্বোত্তম বিচ্ছুরণ

মদীনায় মুসলমানদের কেন্দ্রীভূত হওয়ার বিষয়টি নবী (সা.)- এর জীবনে নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেছিল। মদীনায় হিজরতের পূর্বে তিনি শুধু ইসলামের প্রচার ও এ ধর্মের প্রতি মানুষকে আকৃষ্ট করার জ   প্রচেষ্টা চালাতেন, কিন্তু হিজরতের পর থেকে একজন দক্ষ ও পরিপক্ব রাজনীতিবিদের ায় তাঁর দায়িত্ব হয়ে পড়ে তাঁর নিজ ও সমর্থকদের যথাযথ সংরক্ষণ করার এবং কোন অবস্থাতেই বাইরের ও ভিতরের শত্রুদেরকে ক্ষতিসাধন করতে না দেয়া। এ ক্ষেত্রে তিনি তিনটি সমস্যার মুখোমুখি হয়েছিলেন :

ক. কুরাইশসহ আরব উপদ্বীপের সকল মূর্তিপূজকের নিকট থেকে আক্রমণের সম্ভাবনা;

খ. মদীনা ও মদীনার বাইরে অবস্থানরত অর্থনৈতিক শক্তিধর ইয়া দী গোষ্ঠী; এবং

গ. আওস, খাজরাজ ও মুহাজিরদের কারো কারো মধ্যে বিদ্যমান অনৈক্য।

মুহাজির ও আনসারগণ দু'টি ভিন্ন পরিবেশে প্রতিপালিত ও প্রশিক্ষিত ছিল। তাদের মধ্যে চিন্তা ও পারস্পরিক সম্পর্কের ধরনে বেশ পার্থক্য ছিল। তদুপরি আনসারগণ আওস ও খাজরাজ নামক দু'গোত্রের সমষ্টি ছিল- যাদের মধ্যে ১২০ বছরব্যাপী যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল এবং তারা একে অপরের ঘোর শত্রু ছিল। তাই যদি তাদের (আওস, খাজরাজ ও মুহাজিরগণ) মধ্যে বিদ্যমান এ অনৈক্য অব্যাহত থাকত তবে তাদের ধর্মীয় ও রাজনৈতিক জীবন অব্যাহত রাখা কখনই সম্ভব হতো না। কিন্তু মহানবী (সা.) তাঁর প্রজ্ঞাজনোচিত নির্দেশনার মাধ্যমে এ সকল সমস্যার উত্তম সমাধান দান করেছিলেন। প্রথম দু'টি সমস্যার বিষয়ে তিনি যে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন তা নিয়ে আমরা পরে আলোচনা করব। তৃতীয় সমস্যাটি যা তাঁর সমর্থকদের মধ্যে বিদ্যমান ছিল তা তিনি অত্যন্ত দক্ষতার সাথে সমাধান করেন। তিনি মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে মুহাজির ও আনসারদের পরস্পরের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন সৃষ্টি করার নির্দেশপ্রাপ্ত হন। তিনি একদিন আনসার ও মুহাজিরদের এক সমাবেশে ঘোষণা করেন : تآخّوا في الله اخوين اخوين "তোমরা দু'জন দু'জন করে

একে অপরের ভাই হয়ে যাও।” মুসলিম ঐতিহাসিকগণ বিশেষত ইবনে হিশাম দু’জন দু’জন করে যে সকল ব্যক্তি পরস্পরের ভাই হয়েছিলেন তাঁদের নামসমূহ লিপিবদ্ধ করেছেন।[৪২৩]
তিনি এ পরিকল্পনার মাধ্যমে মুসলমানদের মধ্যে রাজনৈতিক ও আধ্যাত্মিক বন্ধন সৃষ্টি করেন। এ ঐক্যবন্ধনই মহানবী (সা.)- কে প্রথম দু’টি সমস্যা সমাধানে উপযুক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করেছিল।

হযরত আলীর দু'টি শ্রেষ্ঠত্ব

অধিকাংশ শিয়া- সুন্নী হাদীস বিশারদ ও ঐতিহাসিক এ স্থানে হযরত আলীর দু'টি বিশেষ ফজিলত লাভের ঘটনা বর্ণনা করেছেন। আমরা এখানে সংক্ষিপ্ত আকারে তা বর্ণনা করছি। মহানবী আনসার ও মুহাজিরদের তিনশ ' ব্যক্তির মধ্যে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন সৃষ্টি করে দেন।

তিনি নিজে একজনকে অপর একজনের ভাই বলে ঘোষণা করেন। ভ্রাতৃত্ব বন্ধনের ঘোষণা সমাপ্ত হলে হযরত আলী অশ্রুসিক্ত নয়নে রাসূলের নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন, "হে রাসূলাল্লাহ্! আপনি আপনার স ীদের প্রত্যেককে অপর একজনের ভাই বলে ঘোষণা দিয়েছেন, কিন্তু আমাকে কারো ভাই বলে ঘোষণা করেন নি। মহানবী (সা.) তখন হযরত আলীকে বললেন,

أنت أخي في الدّنيا و الآخرة

" তুমি দুনিয়া ও আখেরাতে আমার ভাই। "

কানদুজী হানাফী এ ঘটনাকে অপেক্ষাকৃত পূর্ণরূপে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, রাসূল (সা.) হযরত আলীর প্রশ্নের জবাবে বলেছিলেন, "সেই আল্লাহর শপথ! যিনি মানুষের হেদায়েতের জ আমাকে সত্যনবী হিসাবে প্রেরণ করেছেন; তোমার ভ্রাতৃত্বের ঘোষণাটি এজ ই সবশেষে প্রদান করছি যে, আমি তোমাকে ভাই হিসাবে গ্রহণ করব। কারণ তোমার সে আমার সম্পর্ক হারুন ও মূসার ায়। তবে পার্থক্য এই যে, আমার পরে নবী নেই এবং তুমি ভাই ও উত্তরাধিকারী।"[৪২৪]

ইবনে কাসির[৪২৫] এ ঘটনার সত্যতা সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করেছেন। তাঁর এ সন্দেহ তাঁর মানসিক অবস্থার প্রতিফলন। কারণ মুয়াবিয়া ও তাঁর অনুসারীদের ইচ্ছাই তাঁর ইচ্ছা। তাই তাঁর বক্তব্য খণ্ডনের কোন প্রয়োজন অনুভব করছি না।

হযরত আলীর অপর ফজিলতের ঘটনা এরূপ :

মসজিদ নির্মাণের সমাপ্তি ঘটলে মহানবী (সা.) ও তাঁর সাহাবীরা মসজিদকে কেন্দ্র করে নিজ নিজ গৃহ নির্মাণ করেন এবং গৃহের একটি বিশেষ দ্বার মসজিদের দিকে উন্মুক্ত রাখেন। এ দ্বার দিয়ে বের হয়ে মসজিদে প্রবেশ করা যেত। কিছু দিন পরই মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্দেশ আসে হযরত আলীর দ্বার ব্যতীত মসজিদের দিকে উন্মুক্ত বিশেষ সব দ্বার বন্ধ করার। সে মতে ইবনুল

জাউযী বর্ণনা করেছেন, এ ঘোষণাটি বেশ হট্টগোলের সৃষ্টি করে। অনেকেই ভাবতে লাগলেন নবী আলীর প্রতি ভালোবাসার কারণে এমনটি করেছেন। মহানবী (সা.) তাঁদের মনোভাব বুঝতে পেরে এ বক্তব্য প্রদান করেন, "আমি নিজের পক্ষ থেকে দ্বারসমূহ বন্ধের এ ঘোষণা দেইনি, বরং মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্দেশ আসার পর তা করেছি।" [৪২৬]

মহানবী (সা.) ভ্রাতৃত্ব বন্ধনের এ ঘোষণার মাধ্যমে মুসলমানদের মধ্যে বিদ্যমান অনৈক্যের অবসান ঘটান। এতে করে তিনটি সমস্যার মধ্যে একটির সমাধান হলো।

ইয়াসরিবের ইয়াহুদীদের সঙ্গে মুসলমানদের প্রতিরক্ষা চুক্তি

দ্বিতীয় সমস্যাটি ছিল মদীনার ইয়া দীদের নিয়ে যারা মদীনা ও এর পা ́বর্তী এলাকায় বাস করত এবং ব্যবসা ও অর্থনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করত।

রাসূল (সা.) এ বিষয়টি ভালোভাবেই বুঝতেন যে, যদি মুসলমানদের অভ্যন্তরীণ ঐক্য প্রতিষ্ঠিত না হয় এবং মদীনার ইয়া দীদের সে চুক্তিবদ্ধ না হওয়া যায় তবে তাঁর শাসনব্যবস্থায় রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা অর্জন কখনই সম্ভব হবে না। এর ফলে ইসলামের চারা গাছটি ঐ পরিবেশে সঠিক পরিচর্যা পাবে না। ইসলাম যদি উপযুক্তভাবে বেড়ে না উঠতে পারে তবে প্রথম সমস্যা অর্থাৎ আরব উপদ্বীপের মূর্তিপূজকদের বিশেষত কুরাইশদের সমস্যা সমাধান করতে পারবে না। অর্থাৎ বহিঃশত্রুর মোকাবিলার মাধ্যমে তাঁর কুমতের নিরাপত্তা বিধানে সক্ষম হবেন না।

মহানবীর মদীনায় প্রবেশের সময় থেকেই মুসলমান ও ইয়া দীদের মধ্যে কিছু বিষয়ে ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কারণ তারা উভয়ই মূর্তিপূজার বিরোধী এবং আল্লাহর উপাসক হওয়ায় ইয়া দীরা ভেবেছিল ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় তারা রোমের ি ষ্টানদের আক্রমণ থেকে নিরাপদ থাকবে। অ দিকে আওস ও খাজরাজ গোত্রের সে তাদের অনেক দিন থেকেই বিভিন্ন চুক্তি ছিল।

এ বিষয়গুলোকে লক্ষ্য রেখেই মহানবী (সা.) মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে ঐক্য স্থাপনের নিমিত্তে একটি চুক্তিনামা প্রস্তুত করেন। আনসারদের দু'গোত্র আওস ও খাজরাজের মধ্যেও স্বল্প সংখ্যক ইয়া দী ছিল। মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে সম্পাদিত এ চুক্তিতে তারাও স্বাক্ষর করেছিল।[৪২৭] মহানবী (সা.) তাদের রক্ত ও সম্পদকে এ চুক্তিনামায় মর্যাদা দিয়েছেন। ঐতিহাসিকগণ এ চুক্তিনামাটি পূর্ণরূপে বর্ণনা করেছেন।[৪২৮] যেহেতু এটি একটি ঐতিহাসিক চুক্তিনামা যাতে শৃঙ্খলা, স্বাধীনতা ও ায়ের মূলনীতির প্রতি মহানবী (সা.)- এর মহান দৃষ্টিভি র উত্তম প্রতিফলন ঘটেছে এবং এ বিষয়গুলোর প্রতি মহানবীর সম্মান প্রদান ও বহিঃশক্তির আক্রমণ থেকে রক্ষার জ ঐক্যবদ্ধ করতে তাঁর প্রয়াস প্রভৃতি দিকসমূহ ভালোভাবে ফুটে

উঠেছে, সেহেতু আমরা এ চুক্তিনামার উল্লেখযোগ্য কিছু অংশের অনুবাদ এখানে তুলে ধরছি। এতে তৎকালীন বিে   নতুন ধর্ম হিসাবে ইসলামের রাজনৈতিক বিজয়ের দিকটি ফুটে উঠেছে।

ইতিহাসের সর্ববৃহৎ সনদ (চুক্তিনামা)

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

এ চুক্তিনামা আল্লাহর রাসূল মুহাম্মদ (সা.) কুরাইশ ও মদীনার মুসলমানগণ এবং তাদের অনুসারী ব্যক্তিবর্গের মধ্যে সম্পাদন করেন।

ধারা : **১**

উপধারা ১ : এ চুক্তিনামায় স্বাক্ষরকারিগণ এক জাতি হিসাবে পরিগণিত হবে। কুরাইশ মুহাজিরগণ তাদের ইসলামপূর্ব নিয়মানুযায়ী রক্তপণ প্রদানে বাধ্য থাকবে। যদি তাদের কোন ব্যক্তি কাউকে হত্যা করে অথবা তাদের কেউ বন্দী হয় তবে এ ক্ষেত্রে তাদের পরস্পরকে সহযোগিতা করতে হবে। অর্থাৎ সমবেতভাবে ঐ রক্তপণ আদায় করবে ও বন্দীকে মুক্ত করতে হবে।

উপধারা ২ : বনি আওফ কুরাইশ মুহাজিরদের ায় এ ক্ষেত্রে তাদের পূর্ববর্তী আইন অনুসরণ করবে এবং তাদের গোত্রের বন্দীদেরকে সমবেতভাবে মুক্তিপণ দানের মাধ্যমে মুক্ত করবে। তেমনিভাবে আনসারদের মধ্যে যে সব গোত্র ইসলাম গ্রহণ করেছে, যেমন বনি সায়েদা, বনি হারিস, বনি জুশাম, বনি নাজ্জার, বনি আমর ইবনে আওফ, বনি নাবিত ও বনি আওস, তারাও প্রয়োজন অনুযায়ী তাদের গোত্রের কোন ব্যক্তির রক্তপণ সমবেতভাবে প্রদান করবে এবং তাদের বন্দীদেরকে গোত্রের সকলে সমবেতভাবে মুক্তিপণ দানের মাধ্যমে মুক্ত করবে।

উপধারা ৩ : আর্থিকভাবে অক্ষম ব্যক্তিকে মুসলমানগণ সমবেতভাবে সাহায্য করবে। কোন মুসলমান যদি রক্তপণ অথবা মুক্তিপণ প্রদানের কারণে অর্থনৈতিকভাবে নিঃস্ব হয়ে পড়ে তবে সকলে মিলে তাকে সাহায্য করতে হবে।

উপধারা ৪ : পরহেজগার মুমিনগণ তাদের কোন ব্যক্তি অবাধ্য হলে এবং অনাচার করলে তার বিরুদ্ধে সমবেতভাবে পদক্ষেপ গ্রহণ করবে, যদিও সে ব্যক্তি তাদের কারো সন্তান হয়।

উপধারা ৫ : কোন ব্যক্তি কোন মুসলমানের সন্তান অথবা দাসের সে তার পিতা ও মনিবের অনুমতি ব্যতিরেকে চুক্তিবদ্ধ হতে পারবে না।

উপধারা ৬ : কোন কাফিরকে হত্যা করার দায়ে কোন ঈমানদার ব্যক্তিকে হত্যা করার অধিকার কোন মুমিনের নেই। কোন মুসলমানের বিরুদ্ধে কোন কাফিরকে সহযোগিতা করা যাবে না।

উপধারা ৭ : চুক্তির ক্ষেত্রে আল্লাহর দৃষ্টিতে সকল মুসলমান সমান। এ দৃষ্টিতে উচ্চ- নিচ সকল মুসলমানই সমানভাবে কাফেরদের সে চুক্তিবদ্ধ হওয়ার অধিকার রাখে।

উপধারা ৮ : মুসলমানগণ একে অপরের বন্ধু ও সহযোগী।

উপধারা ৯ : ইয়া দীদের মধ্য হতে যে আমাদের অনুসরণে ইসলাম গ্রহণ করে সে আমাদের সহযোগিতা পাবে। সে ক্ষেত্রে তার সে অ মুসলমানের কোনই পার্থক্য নেই এবং তার প্রতি অবিচার করার অধিকার করো নেই। তার বিরুদ্ধে কাউকে ক্ষেপিয়ে তোলা ও তার শত্রুকে সাহায্য করা যাবে না।

উপধারা ১০ : সন্ধি ও শান্তিচুক্তির ক্ষেত্রে মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। অপর মুসলমানের অনুমতি ব্যতিরেকে এবং সাম্য ও ায়ের প্রতি যথাযথ দৃষ্টিদান না করে সন্ধি চুক্তি করা যাবে না।

উপধারা ১১ : মুসলমানদের বিভিন্ন দল পালাক্রমে যুদ্ধে (জিহাদে) অংশগ্রহণ করবে যাতে আল্লাহর পথে তাদের রক্ত সমভাবে উৎসর্গীকৃত হয়।

উপধারা ১২ : মুসলমানদের অনুসৃত পথ সর্বোত্তম পথ।

উপধারা ১৩ : কুরাইশ মুশরিকদের জীবন ও সম্পদ রক্ষায় সহযোগিতা করার কোন অধিকার মদীনার মুশরিকদের নেই এবং তাদের সে তারা কোনরূপ চুক্তিবদ্ধ হতে পারবে না। তাদেরকে মুসলমানদের হাতে বন্দী হওয়া থেকে রক্ষা করতে পারবে না।

উপধারা ১৪ : যদি কোন মুসলমান অ কোন মুসলমানকে অ ায়ভাবে হত্যা করে এবং তার এ অপরাধ শরীয়তগতভাবে প্রমাণিত হয়, তাহলে হত্যাকারীকে প্রাণদণ্ড দেয়া হবে। তবে নিহত ব্যক্তির অভিভাবকরা যদি তাকে ক্ষমা করে দেয় তবে তাকে প্রাণদণ্ড থেকে মুক্তি দেয়া হবে। এ উভয় ক্ষেত্রে মুসলমানদের দায়িত্ব হলো হত্যাকারীর বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ অবস্থান গ্রহণ।

উপধারা ১৫ : যে ব্যক্তিই এ চুক্তিনামার প্রতি সম্মতি জ্ঞাপন করবে এবং আল্লাহ্‌ ও তাঁর রাসূলের ওপর ঈমান আনয়ন করবে তার এ চুক্তিনামা লঙ্ঘনের ও কোন অপরাধীকে সহযোগিতা ও আশ্রয়

দানের কোন অধিকার নেই। যে কেউই অপরাধীকে সহযোগিতা করলে কিংবা আশ্রয় দিলে আল্লাহর ক্রোধে নিপতিত হবে এবং এ ক্ষেত্রে সকল ক্ষতির দায়- দায়িত্ব তার।

উপধারা ১৬ : যে কোন বিভেদের ফায়সালার চূড়ান্ত কর্তৃপক্ষ আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল।

ধারা : **২**

উপধারা ১৭ : মদীনাকে রক্ষার জ   মুসলমানরা যুদ্ধ করলে ইয়া দীদেরকে অবশ্যই যুদ্ধের ব্যয় বহন করতে হবে।

উপধারা ১৮ : বনি আওফের ইয়া দীরা মুসলমানদের স   এক জাতি হিসাবে পরিগণিত এবং মুসলমান ও ইয়া দীরা তাদের ধর্মের ব্যাপারে স্বাধীন। তাদের দাসরা এ বিধানের অন্তর্গত অর্থাৎ তারাও এ ক্ষেত্রে স্বাধীন। তবে যে সকল অ   ায়কারী তার নিজ ও পরিবারকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেয় তারা এর অন্তর্ভুক্ত নয়। এ ব্যতিক্রমের ফলে ঐক্য কেবল শান্তিপ্রিয় মুসলমান ও ইয়া দীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়েছে।

উপধারা ১৯ : বনি নাজ্জার, বনি হারিস, বনি সায়েদা, বনি জুশাম, বনি আওস, বনি সায়ালাবা ও বনি শাতিবার ইয়া দীরাও বনি আওফ গোত্রের ইয়া দীদের   ায় উপরিউক্ত বিধানের অন্তর্ভুক্ত। বিভিন্ন অধিকারের ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। সায়ালাবা গোত্রের অন্তর্ভুক্ত জাফনা গোত্র এবং বনি শাতিবার অন্তর্ভুক্ত সকল উপগোত্রও বনি আওফের   ায় অধিকার ভোগ করবে।

উপধারা ২০ : এ চুক্তির অধীন সকলকেই তাদের মন্দের ওপর ভালো বৈশিষ্ট্যসমূহকে বিজয়ী করতে হবে।

উপধারা ২১ : বনি সায়ালাবার অন্তর্ভুক্ত উপগোত্রসমূহ বনি সায়ালাবার জ   প্রযোজ্য বিধানের অন্তর্ভুক্ত।

উপধারা ২২ : ইয়া দীদের উপরিউক্ত গোত্রসমূহের সাথে চুক্তিবদ্ধ গোত্র ও ব্যক্তিবর্গ এ বিধানের অন্তর্ভুক্ত।

উপধারা ২৩ : হযরত মুহাম্মদ (সা.)- এর অনুমতি ব্যতিরেকে কেউই এ চুক্তিবদ্ধ জোট থেকে বেরিয়ে যেতে পারবে না।

উপধারা ২৪ : এ চুক্তির অধীন প্রত্যেক ব্যক্তির রক্ত সম্মানিত (অর্থাৎ আহত ও নিহত প্রত্যেক ব্যক্তির রক্তের মর্যাদার বিধান রয়েছে)। যদি কেউ কাউকে হত্যা করে তবে তার ওপর কিসাসের বিধান কার্যকরী হবে। এর (হত্যার) মাধ্যমে সে যেন নিজ ও স্বীয় পরিবারকে ক্ষতিগ্রস্ত করল। কিন্তু হত্যাকারী যদি অত্যাচারিত হয় তবে তার বিধান ভিন্ন।

উপধারা ২৫ : যদি মুসলমান ও ইয়া দীরা সমবেতভাবে যুদ্ধ করে তবে তারা ভিন্ন ভিন্নভাবে যুদ্ধের খরচ বহন করবে। যদি কেউ চুক্তিবদ্ধ জোটের কোন এক অংশের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয় তবে জোটের অন্তর্ভুক্ত সকল পক্ষ তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে।

উপধারা ২৬ : চুক্তিবদ্ধ পক্ষসমূহ কল্যাণের ভিত্তিতে পরস্পরের সহযোগী- অকল্যাণের ভিত্তিতে নয়।

উপধারা ২৭ : চুক্তিবদ্ধ কোন পক্ষই অ   কোন পক্ষের ওপর অবিচার করার অধিকার রাখে না। কেউ এরূপ করলে সকলকে অবশ্যই অত্যাচারিত পক্ষকে সাহায্য করতে হবে।

উপধারা ২৮ : চুক্তিবদ্ধ সকল পক্ষের জ   মদীনা নিরাপদ এলাকা বলে ঘোষিত হলো।

উপধারা ২৯ : চুক্তিবদ্ধ পক্ষের কোন ব্যক্তি যদি কোন প্রতিবেশীকে আশ্রয় দান করে তবে তার জীবন অ   সকলের জীবনের   ায় সম্মানার্হ এবং কোনক্রমেই তার ক্ষতি করা যাবে না।

উপধারা ৩০ : কোন নারীকেই তার নিকটাত্মীয়ের অনুমতি ব্যতিরেকে আশ্রয় দেয়া যাবে না।

উপধারা ৩১ : চুক্তিবদ্ধ পক্ষসমূহের সকল ব্যক্তি ও গোত্র মুমিন হোক বা কাফের তাদের দ্বন্দ্বের চূড়ান্ত মীমাংসাকারী স্বয়ং মুহাম্মদ (সা.)। আল্লাহ্ ঐ ব্যক্তির সে   রয়েছেন যে ব্যক্তি এ চুক্তিনামার প্রতি সর্বাধিক প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

উপধারা ৩২ : কুরাইশ ও তাদের সে   চুক্তিবদ্ধ ব্যক্তি ও গোত্রকে আশ্রয় দেয়া যাবে না।

ধারা : ৩

উপধারা ৩৩ : এ চুক্তি স্বাক্ষরকারী সকল পক্ষ সমবেতভাবে মদীনাকে রক্ষার দায়িত্বপ্রাপ্ত।

উপধারা ৩৪ : যদি মুসলমানরা ইয়া দীদেরকে কোন শত্রুর সে   সন্ধির আহবান জানায় তবে তাদেরকে তা অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে। অনুরূপ ইয়া দীরা যদি মুসলমানদের কোন শত্রুপক্ষের

সে   সন্ধির আহবান জানায় তবে মুসলমানগণ তা গ্রহণে বাধ্য। তবে যদি ঐ শত্রুপক্ষ ইসলামের শত্রু ও ইসলাম প্রচারের পথে প্রতিবন্ধক হয়ে থাকে তবে তা গ্রহণীয় নয়।

উপধারা ৩৫ : আওস গোত্রের গোলাম- মনিব নির্বিশেষে সকল ইয়া দী এ চুক্তির অন্তর্ভুক্ত।

ধারা : ৪

উপধারা ৩৬ : এ চুক্তিনামা অত্যাচারী ও অপরাধীদের পৃষ্ঠপোষকতা করে না।

উপধারা ৩৭ : মদীনায় অবস্থানকারী যে কোন ব্যক্তি নিরাপত্তা পাওয়ার অধিকারী এবং মদীনা থেকে যারা বাইরে যাবে তারাও নিরাপত্তা পাওয়ার অধিকারী, তবে এ বিধান অত্যাচারী ও অপরাধীদের জ   প্রযোজ্য নয়।

এ চুক্তিনামার শেষ বাক্যটি ছিল : إنّ الله جار لمن برّ واتّقى و محمد رسول الله "সৎকর্মপরায়ণ এবং পরহেজগার ব্যক্তির নিরাপত্তা দানকারী স্বয়ং আল্লাহ্ এবং মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল।"[৪২৯]

এ রাজনৈতিক চুক্তিপত্রটির কিছু অংশ আমরা অনুবাদ করেছি। ইসলামে চিন্তার স্বাধীনতা, সামাজিক নিরাপত্তা ও সমাজের প্রয়োজনে পারস্পরিক সহযোগিতার মনোভাব ও দৃষ্টিভি এতে স্পষ্টরূপে ফুটে উঠেছে। সর্বোপরি এ চুক্তিপত্রে নেতার দায়িত্ব ও ইখতিয়ার এবং চুক্তি স্বাক্ষরকারী সর্বসাধারণের দায়িত্বের বিষয়টি পূর্ণরূপে বর্ণিত হয়েছে।

যদিও এ চুক্তিনামায় শুধু আওস ও খাজরাজ গোত্রের অন্তর্ভুক্ত ইয়া দীরা স্বাক্ষর করেছিল এবং ইয়া দীদের বড় তিন গোত্র বনি কুরাইযাহ্, বনি নাদির ও বনি কাইনুকা অংশগ্রহণ করে নি, কিন্তু পরবর্তীতে তারাও মুসলমানদের নেতা মহানবী (সা.)- এর সে   স্বতন্ত্র চুক্তি করেছিল। এ চুক্তিনামার মূল প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল নিম্নরূপ :

এ তিন গোত্র স্বতন্ত্রভাবে রাসূল (সা.)- এর সে   এ মর্মে চুক্তিবদ্ধ হয় যে, তারা রাসূল ও তাঁর অনুসারীদের বিরুদ্ধে প্রচেষ্টা চালাবে না। তারা তাদের মুখ ও হাতের দ্বারা নবী (সা.)- এর ক্ষতি করার চেষ্টা করবে না এবং মুসলমানদের শত্রুদের অস্ত্র ও যুদ্ধবাহন সরবরাহ করবে না। যদি কখনও তারা এ চুক্তিপত্রের বিরোধী কিছু করে তবে তাদের রক্ত ঝরানো মহানবীর জ   বৈধ হয়ে যাবে এবং তাদের সম্পদ ক্রোক এবং নারী ও সন্তানদের বন্দী করা হবে। এ চুক্তিপত্রে বনি

নাদিরের পক্ষে ইয়াই ইবনে আখতাব, বনি কুরাইযার পক্ষে কায়াব ইবনে আসাদ এবং বনি কাইনুকার পক্ষে মুখাইরিক স্বাক্ষর করে।[৪৩০]

এ চুক্তিনামার ফলশ্রুতিতে মদীনা নিষিদ্ধ (হারাম) ও নিরাপদ এলাকায় পরিণত হলো। এখন মহানবী (সা.) প্রথম সমস্যা অর্থাৎ মক্কার মুশরিকদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণের চিন্তা শুরু করলেন। কারণ যতক্ষণ তাঁর দীনের প্রচারের প্রতিবন্ধক এ শত্রু বিদ্যমান রয়েছে ততক্ষণ তাঁর দীনের প্রচার কার্যক্রম সফলতা লাভ করতে পারবে না।

ইয়াহুদীদের অপচেষ্টাসমূহ

ইসলামের মহান শিক্ষা ও মহানবী (সা.)- এর উন্নত নৈতিক চরিত্র ও আচরণের প্রভাবে দিন দিন মুসলমানদের সংখ্যা বাড়তে লাগল ও সে সাথে তাদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামরিক শক্তিও সুসংহত হলো। মুসলমানদের এ অগ্রগতি মদীনার ইয়া দীদের মধ্যে ভীতি ও অস্থিরতার সৃষ্টি করল। কারণ তারা ভেবেছিল ইসলামের শক্তি বৃদ্ধির সাথে সাথে তারা মহানবীকে নিজেদের দিকে টানতে পারবে। তারা কখনই ভাবতে পারে নি যে, একদিন মহানবীর শক্তি ইয়া দী ও ি ষ্টানদের ছাড়িয়ে যাবে। এ কারণেই তারা ষড়যন্ত্র শুরু করে। তারা সাধারণ মুসলমানদের নিকট ধর্ম সম্পর্কিত বিভিন্ন জটিল প্রশ্ন উথাপনের মাধ্যমে মহানবীর ব্যাপারে সন্দেহ সৃষ্টির দ্বারা তাঁর প্রতি তাদের বি াসকে দুর্বল করার প্রচেষ্টা চালাত। কিন্তু তাদের এ ষড়যন্ত্র প্রকৃত মুসলমানদের প্রভাবিত করতে সক্ষম হয় নি। পবিত্র কোরআনের সূরা বাকারা ও সূরা নিসায় তাদের উপস্থাপিত এরূপ বিতর্কিত কিছু বিষয়ের উল্লেখ করা হয়েছে।

সম্মানিত পাঠকগণ এ দু’টি সূরা পাঠ করলে ইয়া দীদের একগুঁয়েমি ও শত্রুতামূলক মনোভাবের পরিচয় পাবেন। যদিও তারা যে সকল প্রশ্ন উত্থাপন করত তার স্পষ্ট উত্তর দেয়া হতো তদুপরি তারা ইসলাম গ্রহণের ক্ষেত্রে অন্তঃসারশূ   অজুহাত দেখাত এবং নবীর আহবানের উত্তরে বলত : قلوبنا غلف ‘আমাদের অন্তর পর্দাবৃত, আমরা আপনার কথা সঠিকভাবে বুঝতে পারছি না’।[৪৩১]

আবদুল্লাহ্ ইবনে সালামের ঈমান আনয়ন

এ সকল বিতর্ক যদিও ইয়া দীদের গোয়ার্তুমি আরো বাড়িয়ে দিত তবুও কখনো কখনো দেখা যেত কেউ কেউ এর ফলে ঈমান আনত। আবদুল্লাহ্ ইবনে সালাম এমনই একজন ব্যক্তিত্ব যিনি ইয়া দী ধর্মযাজক ছিলেন। তিনি মহানবী (সা.)- এর সে দীর্ঘ আলোচনার[৪৩২] পর ঈমান আনয়ন করেন। এর কিছুদনি পর অপর ইয়া দী ধর্মযাজক মুখাইরিকও ঈমান আনেন। আবদুল্লাহর ঈমান আনার বিষয়টি যদি তাঁর গোত্র জানতে পারে তবে তাঁর নামে কুৎসা রটনা করবে এ আশংকায় তিনি মহানবীকে প্রথমেই তাঁর ঈমান আনয়নের বিষয়টি প্রকাশ না করতে অনুরোধ জানালেন। মহানবী (সা.) তদনুযায়ী প্রথমে তাঁর ঈমান আনয়নের ঘটনা প্রকাশ না করে তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য কিরূপ- এ সম্পর্কে ইয়া দীদের প্রশ্ন করলেন। তারা সমবেতভাবে তাঁকে জ্ঞানী ব্যক্তি হিসাবে তাদের অ তম পুরোধা বলে ঘোষণা করল। এ সময় আবদুল্লাহ্ তাদের নিকট উপস্থিত হয়ে নিজ ঈমান গ্রহণের কথা ঘোষণা করলেন। এ কথা শোনামাত্র তারা আবদুল্লাহর ওপর চরমভাবে ক্ষিপ্ত হলো ও তাকে ফাসেক ও নির্বোধ বলে অপবাদ দেয়া শুরু করল, অথচ কিছুক্ষণ পূর্বেও তারা তাঁকে নিজেদের ধর্মীয় পুরোধা ও জ্ঞানী ব্যক্তি বলে স্বীকার করেছিল।

ইসলামী হুকুমতকে উৎখাতের ষড়যন্ত্র

ইয়া দী সম্প্রদায়ের বিতর্কসমূহ ও জটিল প্রশ্নসমূহ উত্থাপনের বিষয়টি মহানবী (সা.)- এর প্রতি মুসলমানদের বি াসকে শুধু বাড়িয়েই দেয় নি, সেই সাথে তাঁর উচ্চমর্যাদা ও গায়েবী জ্ঞান সম্পর্কে মুসলমানদের ধারণাকে আরো স্পষ্ট ও দৃঢ় করেছিল। এ সকল বিতর্কের ফলশ্রুতিতেই আরো কিছু মূর্তিপূজক ও ইয়া দী ইসলাম গ্রহণ করেছিল। ইয়া দীরা এ পন্থায় ব্যর্থ হয়ে ষড়যন্ত্রের অ পন্থা গ্রহণ করেছিল; তারা মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির মাধ্যমে শাসনক্ষমতা দখলের পরিকল্পনা আঁটছিল। তাই তারা আওস ও খাজরাজ গোত্রের মধ্যে শতাধিক বছরের যে দ্বন্দ্ব ছিল এবং ইসলাম ও ঈমানের ছায়াতলে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে যা চাপা পড়ে গিয়েছিল তা পুনরুজ্জীবিত করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হলো। তারা মুসলমানদের মধ্যে অভ্যন্তরীণ কোন্দল সৃষ্টির মাধ্যমে যুদ্ধের আগুন প্র লিত করার ষড়যন্ত্র করল যাতে মুসলমানরা সকলেই এর শিকারে পরিণত হয়।

একদিন আওস ও খাজরাজ গোত্রের সকলে এক জায়গায় সৌহার্দপূর্ণ এক সমাবেশে মিলিত হয়েছিল। বিগত দিনের পরস্পর চরম শত্রু এ দু'গোত্রের একক এ সমাবেশ ইয়া দীদের অন্ত ালা বাড়িয়ে দিয়েছিল। তাই তাদের মধ্যকার শাস নামক এক খলনায়ক পূর্বপরিকল্পনা অনুযায়ী অপর এক ইয়া দী যুবকের প্রতি ইশারা করে এ দু'গোত্রের পূর্ব শত্রুতার বিষয়টি উপস্থাপন করতে বলল। সেই যুবক আওস ও খাজরাজ গোত্রের মধ্যে সংঘটিত যুদ্ধসমূহের তিক্ত ঘটনাগুলো বর্ণনা শুরু করল, বিশেষত 'বুয়া'স ' নামক যুদ্ধের ঘটনা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করল যাতে আওস গোত্র খাজরাজ গোত্রের ওপর বিজয়ী হয়েছিল। এ দু'গোত্রের বীরত্বের কাহিনী সে এমনভাবে বর্ণনা করা শুরু করল যাতে ইসলাম গ্রহণকারী এ দু'গোত্রের মধ্যে পুনরায় যুদ্ধের অি প্র লিত হয়।

ঘটনাটি এমন পর্যায়ে পৌঁছল যে, উভয় গোত্র আত্মগর্বে গর্বিত হয়ে অপর পক্ষকে আক্রমণ শুরু করল ও তাদের মধ্যে যুদ্ধের উন্মাদনা দেখা দিল। এ খবরটি মহানবী (সা.)- এর নিকট পৌঁছলে তিনি ইয়া দীদের ষড়যন্ত্র সম্পর্কে অবহিত হলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ কয়েকজন স ীকে সাথে নিয়ে

সেখানে উপস্থিত হলেন এবং ইসলামের মহান লক্ষ্য ও পরিকল্পনার কথা তাদের স্মরণ করিয়ে দিয়ে বললেন, “ইসলাম তোমাদেরকে পরস্পরের ভাই বানিয়ে দিয়েছে এবং তোমাদের মধ্যকার সকল হিংসা-বিদ্বেষ ভুলে যেতে বলেছে।” অতঃপর তাদেরকে কিছু উপদেশ দিলেন এবং বিভেদের পরিণতি সম্পর্কে সচেতন করলেন। মহানবীর মর্মস্পর্শী বক্তব্যে তারা এতটা প্রভাবিত হলো যে, তারা উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন শুরু করল এবং পরস্পরের ভ্রাতৃত্বকে দৃঢ় করার উদ্দেশ্যে পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে শপথ গ্রহণ করল। তারা তাদের অজ্ঞতাজনিত কর্মের জ আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করল।[৪৩৩]

ইয়া দীদের অপচেষ্টা এখানেই শেষ হয় নি, বরং ধীরে ধীরে তারা চুক্তি ভ র ায় বি াসঘাতকতামূলক কাজের দিকে অগ্রসর হলো। তারা আওস ও খাজরাজের কিছু মুশরিক ও মুনাফিক ব্যক্তির সে বিশেষ সম্পর্ক স্থাপন করল। তারা মুসলমানদের সাথে কুরাইশদের যুদ্ধে প্রকাশ্য ভূমিকা নিয়ে মূর্তিপূজকদের সপক্ষে জোরেশোরে কাজ করতে লাগল।

কুরাইশ মুশরিকদের সে ইয়া দীদের প্রকাশ্য ও গোপন যোগসাজশের বিষয়টি মুসলমান ও ইয়া দীদের রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের দিকে ঠেলে দেয়। ফলশ্রুতিতে মদীনায় ইয়া দীদের স্থায়ী অবস্থানের অবসান ঘটে। এ ঘটনাসমূহের বিস্তারিত বিবরণ আমরা তৃতীয় ও চতুর্থ হিজরী সালের ঘটনাপ্রবাহে প্রদান করব। সে সম্পর্কিত আলোচনায় পাঠকবৃন্দ স্পষ্টরূপে দেখবেন ইয়া দীরা কিরূপে পূর্বোল্লিখিত দু’টি চুক্তি যা নবীর উদারপন্থী ও সৌহার্দপূর্ণ নীতির পরিচায়ক তা ভ করেছে এবং ইসলাম, মুসলমানগণ ও স্বয়ং মহানবীর বিরুদ্ধে জঘ ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়ে ইসলামের শত্রুদের সহযোগিতা করেছে! তারা রাসূলকে উপরিউক্ত দু’টি চুক্তিনামা থেকে দূরে সরে আসতে বাধ্য করেছিল।

রাসূল (সা.) হিজরী প্রথম বর্ষের রবিউল আউয়াল মাস হতে দ্বিতীয় হিজরী বর্ষের সফর মাস পর্যন্ত মদীনায় অবস্থান করেন। এ সময়েই মসজিদ ও মসজিদকে কেন্দ্র করে গৃহসমূহ নির্মিত হয় এবং আওস ও খাজরাজ গোত্রের অন্তর্ভুক্ত উপগোত্রসমূহের প্রায় সকলেই ইসলাম গ্রহণ করে। এ

দু’গোত্রের খুব কম সংখ্যক লোকই তখনও ইসলাম গ্রহণ করে নি। বদর যুদ্ধের অব্যবহিত পরে এরা সকলেই ইসলাম গ্রহণ করে।[৪৩৪]

সাতাশতম অধ্যায় দ্বিতীয় হিজরীর ঘটনাপ্রবাহ :

যুদ্ধ ও সামরিক মহড়া

যুদ্ধের প্রস্তুতির লক্ষ্যেই এ ধরনের সামরিক মহড়ার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এ সামরিক মহড়াসমূহ প্রথম হিজরীর অষ্টম মাস হতে শুরু হয় এবং দ্বিতীয় হিজরীর রামযান মাস পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। এটি মুসলমানদের প্রথম সামরিক মহড়া। এ ধরনের সামরিক মহড়ার সঠিক ব্যাখ্যা ও রহস্য উদঘাটন আমাদের জ   তখনই সম্ভব হবে যখন আমরা এ ঘটনাপ্রবাহের সঠিক তথ্য ইতিহাস গ্রন্থসমূহ[৪৩৫] থেকে কোনরূপ কম- বেশি ছাড়াই অনুবাদ করব এবং বিশেষজ্ঞ ঐতিহাসিকদের অকাট্য মতসমূহ পাঠকদের সমীপে উপস্থাপন করব।

সামরিক অভিযানসমূহের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা

১. মদীনায় মহানবী (সা.)- এর হিজরতের অষ্টম মাসে তিনি ইসলামের বীর সৈনিক হযরত হামযাহ্ ইবনে আবদুল মুত্তালিবের নেতৃত্বে ত্রিশজন মুহাজিরের একটি দলকে লোহিত সাগরের তীরবর্তী পথ অবরোধের উদ্দেশ্যে পাঠান। এ পথে কুরাইশদের বাণিজ্য কাফেলা যাতায়াত করত। হযরত হামযার নেতৃত্বাধীন দল ‘আইস ’ (عيص) নামক স্থানে কুরাইশদের তিনশ ’ ব্যক্তির একটি কাফেলার মুখোমুখি হয়। কুরাইশ কাফেলার নেতৃত্বে ছিল আবু জাহল। কিন্তু তাদের মধ্যে কোন সংঘর্ষ হয় নি। কারণ মাজদী ইবনে আমর নামক এক ব্যক্তির সাথে উভয় দলের সুসম্পর্ক ছিল এবং সে এ দু’দলের মধ্যে সমঝোতা করে। ফলে প্রেরিত সেনাদল মদীনায় ফিরে আসে।

কুরাইশের বাণিজ্য পথ হুমকির সম্মুখীন

আনন্দ- বেদনার প্রথম হিজরী বর্ষ অতিবাহিত হয়ে মহানবী (সা.) ও তাঁর স ী মুহাজিরদের মদীনা পদার্পণের দ্বিতীয় বর্ষ শুরু হলো। দ্বিতীয় হিজরীতে লক্ষণীয় বড় কয়েকটি ঘটনা ঘটে। তন্মধ্যে দু'টি ঘটনা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যার প্রথমটি হলো কিবলা পরিবর্তন এবং দ্বিতীয়টি হলো বদর যুদ্ধ। বদর যুদ্ধের কারণ উদঘাটনের লক্ষ্যে এর কিছু পটভূমি আলোচনার প্রয়োজন রয়েছে। এ পটভূমি আলোচনার মাধ্যমে বদর যুদ্ধের লক্ষ্যের বিষয়টি পরিষ্কার হবে। প্রথম হিজরীর শেষ দিকে ও দ্বিতীয় হিজরীর প্রথমাংশে মহানবী (সা.) বেশ কিছু টহলদার সেনা[৪৩৬] কুরাইশদের বিভিন্ন বাণিজ্য পথে নিয়োজিত করেন। আমরা পরবর্তীতে দেখব এ সব টহলদার সেনা নিয়োগের কারণ কি ছিল।

ঐতিহাসিকগণ রাসূলের জীবনী গ্রন্থে দু'টি শব্দ অনেক বার ব্যবহার করেছেন যার একটি হলো 'গাজওয়া' এবং অপরটি হলো 'সারিয়া'। গাজওয়া হলো সে সকল সেনা অভিযান যাতে স্বয়ং রাসূল (সা.) অংশগ্রহণ করেছেন ও নেতৃত্ব দিয়েছেন। সারিয়া হলো যে সকল সামরিক অভিযানে রাসূল সেনাদল প্রেরণ করেছেন, কিন্তু নিজে অংশগ্রহণ করেন নি। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে তিনি অ কারো নেতৃত্বে সেনাদল প্রেরণ করেছেন। মহানবীর নেতৃত্বাধীন যুদ্ধের সংখ্যা ঐতিহাসিকগণ ২৬ অথবা ২৭টি বলেছেন। এ মতপার্থক্যের কারণ হলো খাইবারের যুদ্ধ ও ওয়াদিউল কুরার যুদ্ধ কোন বিরতি ছাড়াই সংঘটিত হওয়ায় কেউ কেউ এ দু'টিকে একটি যুদ্ধ বলে ধরেছেন আবার কেউ স্বতন্ত্র যুদ্ধ হিসাবে লিপিবদ্ধ করেছেন।[৪৩৭]

রাসূলের জীবদ্দশায় কতটি সারিয়া সংঘটিত হয়েছিল সে সংখ্যার বিষয়েও বিভিন্ন মত রয়েছে। ঐতিহাসিকগণ সারিয়ার সংখ্যা ৩৫, ৩৬, ৪৮, এমনকি কেউ কেউ ৬৬ পর্যন্ত বলেছেন। সংখ্যার এ ভিন্নতার কারণ হলো যে সকল সেনা অভিযানে সৈ র সংখ্যা খুব কম ছিলকোন কোন ঐতিহাসিক সেগুলোকে হিসাব করেন নি; এ কারণেই সংখ্যার এ তারতম্য দেখা দিয়েছে। ঐতিহাসিকদের অনুকরণে আমরাও এখন থেকে যে সকল যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) অংশগ্রহণ করেন নি সেগুলোকে 'সারিয়া' এবং যে সকল যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ্ অংশগ্রহণ করেছিলেন সেগুলোকে

‘গাজওয়া ’   নামে অভিহিত করব। আমরা বর্ণনা সংক্ষিপ্ত করার উদ্দেশ্যে সারিয়াসমূহের উল্লেখ হতে বিরত থাকব। তবে প্রথম হিজরীর সারিয়াসমূহের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা এখানে প্রদান করব। কারণ কোন কোন যুদ্ধে, বিশেষত বদরের যুদ্ধে এ সকল সারিয়ার প্রভাব ছিল। এখানে আমরা কয়েকটি গাজওয়া ও সারিয়ার বর্ণনা প্রদান করছি :

২. এ সেনা অভিযানে মহানবী (সা.) উবাইদাতা ইবনে হারেস ইবনে আবদুল মুত্তালিবের নেতৃত্বে ষাট অথবা আশি জন মুহাজিরকে কুরাইশ কাফেলার বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। তিনি সেনাদল নিয়ে সানিয়াতুল মাররার পাদদেশে প্রবাহমান বারিধারা পর্যন্ত পৌঁছান। তিনি সেখানে আবু সুফিয়ানের নেতৃত্বে আসা দু'শ ’   ব্যক্তির এক কাফেলার মুখোমুখি হন। উভয় দল কোন সংঘর্ষ ছাড়াই নিজ নিজ পথে ফিরে যায়; তবে আবু সুফিয়ানের নেতৃত্বাধীন কাফেলা হতে দু'ব্যক্তি (যারা ইসলাম গ্রহণ করেছিল) মুসলমানদের সে   মদীনায় চলে আসে। এ অভিযানে সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস আবু সুফিয়ানের কাফেলার দিকে একটি তীর নিক্ষেপ করেছিলেন।

৩. প্রথম হিজরী বর্ষের জিলহ   মাসে মহানবী (সা.) সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাসের নেতৃত্বে আটজনের একটি সেনা দলকে (যাঁদের সকলেই মুহাজির ছিলেন) কুরাইশদের খবর নিতে মদীনার বাইরে প্রেরণ করেন। তিনি ‘খার্রার ’   নামক স্থান পর্যন্ত গিয়ে কাউকে না দেখে ফিরে আসেন।

কয়েকটি ক্ষেত্রে মহানবী (সা.) স্বয়ং কুরাইশ কাফেলার পশ্চাদ্ধাবন করেন :

৪. দ্বিতীয় হিজরী বর্ষের সফর মাসে একদল মুহাজির ও আনসারকে সে   নিয়ে মহানবী কুরাইশ কাফেলার পশ্চাদ্ধাবন ও বনি দামারার (জামারার) সে   সন্ধি চুক্তি সম্পাদনের উদ্দেশ্যে আবওয়া পর্যন্ত আসেন। তিনি মদীনায় ধর্মীয় দায়িত্ব পালনের ভার সা'দ ইবনে ওবাদার ওপর অর্পণ করেন। মহানবী আবওয়া পর্যন্ত পৌঁছলেও কুরাইশ কাফেলার দেখা পান নি এবং তিনি বনি দামারাহ্ গোত্রের সে   চুক্তি করে মদীনায় ফিরে আসেন।

৫. দ্বিতীয় হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসে তিনি সায়েব ইবনে উসমান অথবা সা'দ ইবনে মায়াজের ওপর মদীনার দায়িত্ব অর্পণ করে দু'শ ’   ব্যক্তিকে সে   নিয়ে কুরাইশ কাফেলার

পশ্চাদ্ধাবনের উদ্দেশ্যে বাওয়াত[৪৩৮] (بواط) পর্বত পর্যন্ত গমন করেন, কিন্তু উমাইয়্যা ইবনে খালফের নেতৃত্বাধীন একশ ’ ব্যক্তির কাফেলাটিকে ধরতে সক্ষম হন নি এবং মদীনায় ফিরে আসেন।

৬. দ্বিতীয় হিজরীর জমাদিউল উলা মাসের মধ্যভাগে মদীনায় খবর পৌঁছে যে, আবু সুফিয়ান এক কাফেলা নিয়ে সিরিয়ার দিকে যাত্রা করেছে। মহানবী (সা.) আবু সালামাকে মদীনায় তাঁর স্থলাভিষিক্ত করে জাতুল উশাইরার দিকে যাত্রা করেন। তিনি উশাইরাতে জমাদিউস সানির প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত আবু সুফিয়ানের কাফেলার প্রতীক্ষায় থাকেন। কিন্তু তাদের সন্ধান না পেয়ে ফিরে আসেন। ফেরার পথে তিনি বনি মাদলাজ গোত্রের স চুক্তি করেন। এ চুক্তির বিষয়বস্তু ইতিহাস গ্রন্থসমূহে উল্লিখিত হয়েছে।[৪৩৯]

ইবনে আসির[৪৪০] বলেছেন, এ সেনা অভিযানে মহানবী (সা.) ও তাঁর স ীরা এক স্থানে যাত্রাবিরতি করে রাত্রি যাপন করেছিলেন। সে রাত্রিতে তিনি ঘুমন্ত হযরত আলী ও আম্মার ইবনে ইয়াসিরের শিয়রে এসে দাঁড়ান এবং তাঁদেরকে ঘুম থেকে জাগান। তিনি আলীর মাথা ও মুখমণ্ডল ধুলায় আবৃত দেখেন। তিনি আলীকে লক্ষ্য করে বলেন, “হে আবু তোরাব (মাটি দ্বারা আবৃত)! কি হয়েছে?” (তখন থেকে তিনি মুসলমানদের মধ্যে আবু তোরাব নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন।) অতঃপর তিনি উভয়ের উদ্দেশে বলেন, “পৃথিবীর ওপর বিচরণকারী সবচেয়ে কঠোর দয়ের ব্যক্তি কে তা কি তোমাদের বলব?” তাঁরা উভয়েই বললেন, “অবশ্যই, হে রাসূলাল্লাহ্।” তিনি বললেন, “পৃথিবীর ওপর বিচরণকারী দু’ব্যক্তি সবচেয়ে কঠোর দয়ের অধিকারী। তাদের প্রথম জন হলো যে হযরত সালেহ (আ.)- এর উষ্ট্রীকে হত্যা করে আর তাদের দ্বিতীয় জন হলো যে আলীর মাথায় তরবারি দ্বারা আঘাত করবে ও তার শ্মশ্রু ও মুখমণ্ডলকে রক্তরঞ্জিত করবে।”

৭. মহানবীর পূর্বোক্ত অভিযান হতে মদীনায় ফিরে আসার দশ দিন অতিক্রান্ত হওয়ার পূর্বেই খবর পাওয়া যায় যে, কারাজ ইবনে জাবের নামক এক ব্যক্তি মদীনা হতে উষ্ট্র ও মেষসমূহ জোরপূর্বক নিয়ে গিয়েছে। এ ব্যক্তিকে ধরার উদ্দেশ্যে মহানবী (সা.) কিছুসংখ্যক সাহাবীকে নিয়ে বদর নামক স্থান পর্যন্ত অগ্রসর হন। কিন্তু তাকে না পেয়ে মদীনায় ফিরে আসেন এবং শাবান মাস পর্যন্ত মদীনাতেই অবস্থান করেন।[৪৪১]

৮. দ্বিতীয় হিজরী সালের রজব মাসে মহানবী আবদুল্লাহ্ ইবনে জাহাশ নামক এক সাহাবীর নেতৃত্বে আশি জন মুহাজিরকে কুরাইশ কাফেলার অনুসন্ধানে পাঠান। তিনি এ সেনাদলের নেতার হাতে একটি পত্র দিয়ে বলেন, "দু'দিন যাত্রার পর পত্রটি খুলে সেই নির্দেশমতো কাজ করবে[৪৪২] এবং অধীন ব্যক্তিদের কোন কাজে বাধ্য করবে না।" তিনি দু'দিন পথযাত্রার পর পত্রটি খুলে দেখেন তাকে মহানবী নির্দেশ দিয়েছেন মক্কা ও তায়েফের মধ্যবর্তী 'নাহলাহ্' নামক স্থানে অবস্থানের এবং সেখান হতে কুরাইশদের কাফেলাসমূহের ও অ া খবর সংগ্রহের চেষ্টা করার। আবদুল্লাহ্ পত্রের নির্দেশ মতো তাঁর অনুগত সকল সৈ কে নিয়ে নাহলায় অবস্থান নেন। তখন তায়েফ হতে কুরাইশদের একটি কাফেলা আমর খাদরামীর (খাজরামীর) নেতৃত্বে মক্কায় ফিরছিল। মুসলমানগণ তাদের নিকটবর্তী স্থানে অবস্থান করছিল। মুসলমানগণ শত্রুদেরকে নিজেদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে জানতে না দেয়ার উদ্দেশ্যে মাথা কামিয়ে ফেলেন যাতে তারা মনে করে মুসলমানগণ মক্কায় যিয়ারতের উদ্দেশ্যে এসেছে। কুরাইশগণ মুসলমানদের এ অবস্থায় দেখে নিশ্চিত হলো যে, তারা উমরার উদ্দেশ্যে এসেছে এবং স্বস্তির নিঃ াস ফেলল।

অপর দিকে মুসলমানগণ যুদ্ধের লক্ষ্যে পরামর্শ সভাতে বসল। সভায় কুরাইশদের ওপর হামলা করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো। কিন্তু সে দিন ছিল হারাম মাস (যে মাসে যুদ্ধ হারাম) রজবের শেষ দিন। এ কারণে মুসলমানগণ আক্রমণের বিষয়ে দ্বিধাগ্রস্ত ছিল। অ দিকে সে দিনই কুরাইশদের ঐ স্থান ত্যাগ করে মক্কার হারামে প্রবেশ করার সম্ভাবনা ছিল। সে ক্ষেত্রে হারামের সীমানায় যুদ্ধ করাও হারাম হয়ে যাবে। তাই মুসলমানরা হারামের পরিসীমায় যুদ্ধ করা অপেক্ষা হারাম মাসে যুদ্ধ করাকে প্রাধা দেয়। এ লক্ষ্যে তারা শত্রুকে বিভ্রান্তিতে ফেলে যুদ্ধ শুরু করে। এতে কাফেলার প্রধান ওয়াকেদ ইবনে আবদুল্লাহ্ তীরবিদ্ধ হয়ে নিহত হয়। তার অধীন ব্যক্তিরাও পালিয়ে যায়। কিন্তু উসমান ইবনে আবদুল্লাহ্ ও হাকাম ইবনে কাইসান নামক দু'ব্যক্তি মুসলমানদের হাতে বন্দী হয়। টহলদার সেনাপতি আবদুল্লাহ্ ইবনে জাহাশ বন্দী ঐ দু'ব্যক্তিকে নিয়ে তাদের ব্যবসালব্ধ সম্পদসহ মদীনায় প্রত্যাবর্তন করেন।

মহানবী (সা.) টহলদার সেনাপতির ওপর এ কারণে তীব্র অসন্তুষ্ট হন যে, তিনি তাঁর নির্দেশ অমা করে হারাম মাসে যুদ্ধ করেছেন। তাই তিনি তাঁদেরকে বলেন, "কখনই আমি তোমাদেরকে হারাম মাসে যুদ্ধ করার অনুমতি দেই নি।" [৪৪৩] কুরাইশরা এ ঘটনাকে তাদের অপপ্রচারের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করে বলা শুরু করল যে, মুহাম্মদ হারাম মাসের সম্মান বিনষ্ট করেছে। মদীনার ইয়া দীরাও এ ঘটনাকে খারাপ লক্ষণ বলে প্রচার চালিয়ে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির অপপ্রয়াস চালাল। মুসলমানগণ আবদুল্লাহ্ ও তাঁর অনুগত সৈনিকদের ভৎসনা করতে লাগল। মহানবী (সা.) তাঁদের আনীত গনীমতসমূহ কি করবেন এজ ওহীর প্রতীক্ষায় রইলেন। তখনই আল্লাহর তরফ থেকে হযরত জিবরাঈল নিম্নোক্ত আয়াত নিয়ে অবতীর্ণ হলেন :

(يسئلونك عن الشّهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير و صدّ عن سبيل الله كفربه و المسجد الحرام و إخراج أهله منه أكبر عند الله و الفتنة أكبر من القتال)

"তোমাকে তারা হারাম মাস সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে, তুমি (তাদেরকে) বল, হারাম মাসে যুদ্ধ গুরুতর অপরাধ। আর আল্লাহর পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি, আল্লাহকে অস্বীকার করা, মসজিদুল হারামে বাধা দেয়া ও তার বাসিন্দাদেরকে তা থেকে বহিষ্কার করা আল্লাহর নিকট হারাম মাসে যুদ্ধ অপেক্ষা বড় অপরাধ। ফিতনা ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হত্যা অপেক্ষা গুরুতর অ ায়।" [৪৪৪]

এ আয়াত অবতীর্ণের মাধ্যমে বলা হয় যে, হারাম মাসে যুদ্ধ করার মাধ্যমে মুসলমানগণ অ ায় করেছে, কিন্তু কুরাইশদের অপরাধ তার থেকেও গুরুতর। কারণ তারা মসজিদুল হারামের অধিবাসী মুসলমানদের গৃহত্যাগে বাধ্য করে, তাদের ওপর নির্যাতন চালিয়ে ও ভীতি প্রদর্শন করে যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করেছে তা এতটা গুরুতর যে, তারা মুসলমানদের কর্মের প্রতিবাদের অধিকার রাখে না।

সুতরাং এ আয়াত অবতীর্ণের ফলে মুসলমানদের মধ্যে নতুন প্রাণের সঞ্চার হলো। মহানবী (সা.) যুদ্ধলব্ধ গনীমতের সম্পদ মুসলমানদের মধ্যে বিতরণ করলেন। কুরাইশরা তাদের বন্দী দু'ব্যক্তিকে মুক্তিপণের মাধ্যমে মুক্ত করতে চাইলে মহানবী তাদের হাতে বন্দী দু'জন মুসলমানকে মুক্ত করার শর্তে তাতে রাজী হন। আর যদি তারা ঐ দু'মুসলমানকে হত্যা করে

থাকে তবে তাদের দু'বন্দীকেও হত্যা করা হবে বলে ঘোষণা দেন। কুরাইশরা বাধ্য হয়ে মুসলমান বন্দীদ্বয়কে মুক্ত করে দেয়। মহানবী কুরাইশ বন্দীদ্বয়ের মুক্তির নির্দেশ দেন। মহানবীর বদা তায় ঐ দু'কুরাইশের একজন মুসলমান হয় এবং অপর জন মক্কায় ফিরে যায়।

সামরিক অভিযান ও মহড়ার উদ্দেশ্য

এ সকল অভিযানের মূল উদ্দেশ্য ছিল কুরাইশদের বাণিজ্য পথের নিকট বসবাসকারী বিভিন্ন গোত্রের সং শান্তিচুক্তি করা এবং কুরাইশদেরকে মুসলমানদের সামরিক শক্তি সম্পর্কে অবহিত করা। বিশেষত যে সকল অভিযানে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) মুসলমানদের সং নিয়ে কুরাইশদের বাণিজ্য কাফেলার পথ অবরোধ করতেন সে অভিযানগুলোর মাধ্যমে মক্কার শাসকগোষ্ঠীকে বুঝিয়ে দিতেন : তোমাদের বাণিজ্য পথ সম্পূর্ণভাবে আমাদের নিয়ন্ত্রণে। তাই আমরা চাইলে যে কোন সময় সে পথ বন্ধ করে দিতে পারি।

মক্কার অধিবাসীদের জীবন ধারণের মূল উপায় ছিল ব্যবসা- বাণিজ্য। সিরিয়া ও তায়েফ হতে যে সম্পদ আনা- নেয়া হতো তা দিয়েই মক্কাবাসীদের অর্থনৈতিক জীবন পরিচালিত হতো। যদি এ বাণিজ্য- পথটি নব্য শত্রু ও তাদের সং চুক্তিবদ্ধ গোত্রগুলোর (বনি দামারা, বনি মাদলাজ প্রভৃতি) দ্বারা আক্রান্ত হয় তবে তাদের জীবনযাত্রাই স্তব্ধ হয়ে যাবে।

বাণিজ্য পথে টহলসেনা মোতায়েন ও সামরিক মহড়া প্রদর্শন করে কুরাইশদের বুঝিয়ে দেয়া হয় তাদের বাণিজ্যের ভবি ৎ মুসলমানদের হাতে। যদি তারা মুসলমানদের সং অসদাচরণ করে, মক্কায় অবস্থানকারী মুসলমানদের ওপর নির্যাতন চালায় এবং পূর্বের ায় একগুঁয়ে মনোভাব নিয়ে ইসলামের প্রচার ও প্রসারে বাধা প্রদান করে তবে তাদের জীবনযাত্রাকে মুসলমানরা অচল করে দেবে।

মোটামুটি এ সকল অভিযানের লক্ষ্য বলা যায় মুসলমানদের ইসলাম প্রচারে স্বাধীনতা দানে কুরাইশদের বাধ্য করা যাতে একত্ববাদী এ ধর্মের আলো সমগ্র আরব উপদ্বীপ ও এর কেন্দ্রে ছড়িয়ে পড়তে পারে এবং এর শক্তিশালী ও যুক্তিপূর্ণ বাণী এ ভূখণ্ডের অধিবাসীদের অন্তরে স্থান করে নিতে পারে। অ দিকে মুসলমানদের জ আল্লাহর ঘর যিয়ারতের পথও যেন উন্মুক্ত হয় সেটিও লক্ষ্য ছিল।

কোন আন্দোলনের নেতা যতই শক্তিশালী ও ক্ষমতাবান হন না কেন, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণে তিনি যতই নিষ্ঠা ও প্রচেষ্টার পরিচয় দিন না কেন, যদি সেখানে স্বাধীন ও মুক্ত পরিবেশ না থাকে তবে তিনি যথাযথভাবে অন্তরসমূহকে আলোকিত করতে সক্ষম হবেন না।

ইসলামের অগ্রযাত্রায় সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধকতা ছিল কুরাইশগণ কর্তৃক সৃষ্ট াসরুদ্ধকর পরিবেশ যা মুক্তভাবে ইসলাম প্রচারের পথকে রুদ্ধ করেছিল। এ প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণের একমাত্র পথ ছিল বিভিন্ন গোত্রের সে সামরিক চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়া এবং সামরিক অভিযানের মাধ্যমে কুরাইশদের বাণিজ্য পথকে শ ি ত করে তাদেরকে অর্থনৈতিক চাপে রাখা।

মধ্যপ্রাচ্যবিদগণের দৃষ্টিতে এ অভিযানসমূহ

এ সামরিক অভিযানসমূহের বিশ্লেষণে মধ্যপ্রাচ্যবিদগণ ব্যর্থ হয়েছেন। তাঁরা এমন অনেক কথা বলেছেন যা ইতিহাস গ্রন্থসমূহে বিদ্যমান সাক্ষ্য-প্রমাণের সম্পূর্ণ বিপরীত। তাঁরা বলে থাকেন, রাসূল এ আক্রমণসমূহ পরিচালনার মাধ্যমে কুরাইশদের অর্থসম্পদ হস্তগত করে নিজ শক্তি বৃদ্ধি করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু এ বক্তব্য মদীনার অধিবাসীদের মানসিকতার সং সংগতিপূর্ণ নয়। কারণ হত্যা ও লু ন সভ্যতা বিবর্জিত আরব বেদুঈনের কাজ ছিল। মদীনার মুসলমানগণ এরূপ ছিলেন না। তাঁরা মূলত ছিলেন কৃষিজীবী। কখনই তাঁরা দস্যুবৃত্তি ও লু নের কাজ করতেন না। মদীনার অধিবাসীরা সম্পদ লু নের জ মদীনার বাইরে কখনই আক্রমণ করে নি। আওস ও খাজরাজ গোত্রের মধ্যে যে যুদ্ধ সংঘটিত হতো তা মদীনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকত, তদুপরি এ সকল যুদ্ধের ইন্ধনদাতা ছিল মূলত মদীনার ইয়া দীরা। তারা নিজস্ব অবস্থানকে শক্তিশালী করার উদ্দেশ্যে আরবের এ দু'গোত্রের মধ্যে যুদ্ধ বাধিয়ে রাখত।

মহানবী (সা.)-এর স ী মুহাজিরগণের সম্পদ মক্কার কুরাইশ গোত্র কর্তৃক বাজেয়াপ্ত হলেও কখনই মুসলমানগণ তার ক্ষতিপূরণের ইচ্ছা পোষণ করত না। প্রমাণস্বরূপ বলা যায়, বদরের যুদ্ধের পর মুসলমানগণ কুরাইশদের কোন কাফেলার ওপর আক্রমণ করে নি এবং ইতিপূর্বে তারা যে কুরাইশ কাফেলার ওপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখত ও তাদের পথের ওপর টহল সেনা মোতায়েন করেছিল তার উদ্দেশ্য ছিল তথ্য সংগ্রহ। তদুপরি প্রেরিত টহল সেনার সংখ্যা কখনো ৮ জন আবার কখনো ৬০ অথবা ৮০ জন ছিল। এ সংখ্যার সেনাদল কুরাইশদের বৃহৎ বাণিজ্য কাফেলার নিরাপত্তা রক্ষীদের তুলনায় অপ্রতুল ছিল বলা যায়। তাই তাদের পক্ষে এ সকল কাফেলার সম্পদ লু নের চিন্তা অবান্তর।

যদি সম্পদ লু নই মুসলমানদের উদ্দেশ্য হতো তবে কেন তারা শুধু কুরাইশ কাফেলার পশ্চাদ্ধাবন করত, অ কাফেলার প্রতি কোন দৃষ্টিই দিত না। কেন তারা একবারও অ কারো প্রতি তাদের হাত প্রসারিত করে নি? যদি সম্পদ লু ন উদ্দেশ্য হতো তবে কেন এ সকল

অভিযানে অধিকাংশ ক্ষেত্রে শুধু মুহাজিরদের ব্যবহার করা হতো এবং আনসারদের সাহায্য নেয়া হতো না?

কখনো কখনো তাঁরা বলেন, মহানবী ও মুসলমানগণ কুরাইশদের নিকট থেকে প্রতিশোধ গ্রহণের নিমিত্তে এরূপ করত। কারণ মুসলমানগণ মক্কাবাসীদের অত্যাচার ও নিপীড়নের কথা স্মরণ করে প্রতিশোধ গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল অস্ত্রধারণের মাধ্যমে কুরাইশদের রক্ত ঝরানোর।

তাদের এ যুক্তিও প্রথম যুক্তির ায় ভিত্তিহীন। কারণ ঐতিহাসিক সাক্ষ্য- প্রমাণাদি এ যুক্তিকে মিথ্যা প্রমাণ করে। ঐতিহাসিক বর্ণনামতে এ সকল অভিযানের উদ্দেশ্য কখনই যুদ্ধ, রক্তপাত ও প্রতিশোধস্পৃহা ছিল না। আমরা এ মতের অসারতা এখানে প্রমাণ করব।

প্রথমত যদি মহানবীর এ সকল অভিযানের উদ্দেশ্য যুদ্ধ ও গনীমত হতো তবে অবশ্যই প্রেরিত সেনাদলের সদস্যসংখ্যা আরো অধিক হতো এবং সম্পূর্ণ সুসজ্জিত হয়ে তাঁরা কাফেলাকে আক্রমণের জ যেতেন। কিন্তু আমরা দেখি তিনি হামযাহ্ ইবনে আবদুল মুত্তালিবকে ৩০ জন, উবাইদাতা ইবনে হারিসকে ৬০ জন এবং সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাসকে আরো কম সংখ্যক সেনাসহ প্রেরণ করেছিলেন। অথচ কুরাইশ কাফেলাগুলোর প্রহরী ও যোদ্ধার পরিমাণ তাঁদের থেকে অনেক বেশি ছিল। হযরত হামযাহ্ কুরাইশদের তিনশ ' ব্যক্তির এবং উবাইদাতা তাদের দু'শ ' ব্যক্তির মুখোমুখি হয়েছিলেন। বিশেষত কুরাইশরা যখন বিভিন্ন গোত্রের স মুসলমানদের চুক্তিবদ্ধ হওয়ার খবর পেয়েছিল তখন তারা তাদের কাফেলায় নিরাপত্তা প্রহরীর সংখ্যা কয়েকগুণ বাড়িয়ে দিয়েছিল। যদি মহানবী (সা.) কর্তৃক প্রেরিত সেনাদলের উদ্দেশ্য যুদ্ধ হতো তবে কেন অধিকাংশ অভিযানেই কোন রক্তপাতের ঘটনা সংঘটিত হয় নি? কোন কোন ক্ষেত্রে বিশেষ কোন ব্যক্তির মধ্যস্থতায় উভয় পক্ষ পরস্পর হতে দূরত্বে অবস্থানের নীতি গ্রহণ করেছিল।

দ্বিতীয়ত মহানবী (সা.) আবদুল্লাহ্ ইবনে জাহাশের হাতে যে পত্রটি দেন তা থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, তাঁকে অভিযানে প্রেরণের উদ্দেশ্য কখনই যুদ্ধ ছিল না। কারণ ঐ পত্রে তিনি উল্লেখ করেছিলেন, 'মক্কা ও তায়েফের মধ্যবর্তী নাখলাতে অবস্থান গ্রহণ কর এবং কুরাইশদের প্রতীক্ষায়

থেকে তাদের অবস্থা সম্পর্কে আমাদেরকে জানাও ’ । এ পত্র সাক্ষ্য বহন করে যে, আবদুল্লাহ্ ইবনে জাহাশ যুদ্ধের দায়িত্বপ্রাপ্ত হন নি, বরং তাঁকে তথ্য সংগ্রহের দায়িত্ব দিয়ে প্রেরণ করা হয়েছিল। তাঁরা যে যুদ্ধ করেছিলেন এবং আমর ইবনে খাদরামীকে হত্যা করেছিলেন তার সিদ্ধান্ত তাঁরা নিজেরাই আকস্মিকভাবে গ্রহণ করেছিলেন। এ কারণেই যখন মহানবী রক্তপাতের ঘটনা সম্পর্কে অবহিত হলেন তখন তাদেরকে তীব্র ভাষায় তিরস্কার করেন এবং বলেন, “আমি তোমাদের যুদ্ধের কোন নির্দেশ প্রদান করি নি। ”

উল্লেখ না করলেও বোঝা যায় যে, এ সকল সেনা অভিযানের সবগুলো অথবা অধিকাংশই একই উদ্দেশ্যে প্রেরিত হয়েছিল। কখনই বলা সম্ভব নয় যে, তিনি আবদুল্লাহ্ ইবনে জাহাশকে আশি জন সহ তথ্য সংগ্রহ করার জ   পাঠিয়েছিলেন, অথচ হামযাহ্ ইবনে আবদুল মুত্তালিবকে ত্রিশ জন সহ যুদ্ধের জ   পাঠিয়েছিলেন। মধ্যপ্রাচ্যবিদগণ দাবি করেছেন, হামযাহ্ ইবনে আবদুল মুত্তালিব যুদ্ধের জ   প্রেরিত হয়েছিলেন। তাঁদের মতে প্রেরিত সেনাদল সাধারণত মুহাজিরদের মধ্য থেকে মনোনীত হতেন। কারণ মদীনার আনসারগণ আকাবাতে রাসূলের স   প্রতিরক্ষা চুক্তি করেছিলেন এবং প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিলেন যে, শত্রুর আক্রমণ থেকে তাঁকে রক্ষা করবেন। এ কারণেই মহানবী (সা.) এ ধরনের আক্রমণাত্মক অভিযানে তাঁদেরকে প্রেরণ করেন নি এবং নিজেও মদীনায় অবস্থান করতেন। কিন্তু যখন তিনি মদীনার বাইরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন তখন আনসার ও মুহাজিরদের ঐক্যকে সুসংহত করার লক্ষ্যে আনসারদের মধ্য থেকে কাউকে কাউকে স   নিতেন। এ লক্ষ্যেই বাওয়াত ও জাতুল উশাইরাতে আনসার ও মুহাজিরদের সম্মিলিত দল রাসূলুল্লাহর সহগামী ছিলেন।

পূর্বোল্লিখিত যুক্তির আলোকে মধ্যপ্রাচ্যবিদদের যুক্তির অসারতা প্রমাণিত হয়। তাঁদের দৃষ্টিভ র কিছু অংশ স্বয়ং মহানবীর অভিযানে অংশগ্রহণের ফলশ্রুতিতে অযৌক্তিক প্রমাণিত হয়েছে। কারণ বাওয়াত ও জাতুল উশাইরাতে তিনি শুধু মুহাজিরদের নিয়ে যান নি, বরং আনসারদের একটি দল তাঁর স   ছিলেন। অথচ আনসারগণ তাঁর স   আক্রমণাত্মক যুদ্ধে সাহায্য করার চুক্তি করেন নি। সে ক্ষেত্রে মহানবী (সা.) তাঁদেরকে কিভাবে যুদ্ধ ও রক্তপাতের দিকে আহবান করতে পারেন?

আমাদের বক্তব্যের যথার্থতা পরবর্তীতে বদরের যুদ্ধের ঘটনাপ্রবাহের বিস্তারিত বিবরণে পাঠকদের নিকট স্পষ্ট হবে। আনসারগণ যতক্ষণ পর্যন্ত বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণের জ সম্মতি প্রদান করেন নি ততক্ষণ মহানবী (সা.) এ যুদ্ধের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন নি।

মুসলিম ঐতিহাসিকগণ এ সকল সেনা অভিযানকে 'গাজওয়া ' নামে অভিহিত করেছেন এ কারণে যে, তাঁরা চেয়েছেন এ সকল অভিযানকে এক শিরোনামে লিপিবদ্ধ করতে, যদিও এ সকল সেনা অভিযানের মূল লক্ষ্য যুদ্ধ ছিল না।

আটাশতম অধ্যায়কিবলা পরিবর্তন :

মহানবী (সা.)- এর হিজরতের কয়েক মাস অতিবাহিত না হতেই ইয়া দীদের পক্ষ থেকে প্রতিবাদ শুরু হলো। হিজরতের সপ্তদশ মাসে[৪৪৫] মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্দেশ আসল কাবাকে কিবলা হিসাবে গ্রহণের এবং নামাযের সময় মসজিদুল হারামের দিকে লক্ষ্য করে নামায পড়ার। বিস্তারিত ঘটনাটি নিম্নরূপ :

মহানবী (সা.) মক্কী জীবনের তের বছর বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ ফিরিয়ে নামায পড়েছেন। তাঁর মদীনায় হিজরতের পরও এ নির্দেশ বহাল থাকে। মদীনায় হিজরতের পরও ঐশী নির্দেশ এটি ছিল যে, ইয়া দীরা যে কিবলার দিকে ফিরে নামায পড়ে মুসলমানগণও যেন সে দিকে ফিরে নামায পড়ে। এ বিষয়টি কার্যত প্রাচীন ও নবীন এ দু'ধর্মের নৈকট্য ও সহযোগিতার চিহ্ন হিসাবে প্রতীয়মান হতো। কিন্তু মুসলমানদের উন্নতি ও সমৃদ্ধির শ া ইয়া দীদেরকে আচ্ছাদিত করল। কারণ মুসলমানদের উত্তরোত্তর অগ্রগতি স্বল্প সময়ের মধ্যেই সারা আরব উপদ্বীপে ইসলামের বিজয়ের আলামত বহন করছিল। ইয়া দীরা আশংকা করল অচিরেই তাদের ধর্ম বিলীন হয়ে যেতে পারে। তাই তারা ষড়যন্ত্র শুরু করল। তারা বিভিন্নভাবে মহানবী (সা.) ও মুসলমানদের কষ্ট দিতে লাগল। বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ ফিরিয়ে নামায পড়ার বিষয়টি উল্লেখ করে তারা বলতে লাগল, মুহাম্মদ দাবি করে যে, সে স্বতন্ত্র এক ধর্ম নিয়ে এসেছে এবং তার আনীত শরীয়ত পূর্ববর্তী সকল ধর্মের সমাপ্তকারী ও স্থলাভিষিক্ত, অথচ সে স্বতন্ত্র কিবলার অধিকারী নয়, বরং ইয়া দীদের কিবলার দিকে নামায পড়ে। তাদের এ কথা মহানবীকে বেশ কষ্ট দিত। তিনি মাঝরাত্রিতে গৃহ থেকে বের হতেন এবং আকাশের দিকে তাকিয়ে এ বিষয়ে ওহী আগমনের প্রতীক্ষা করতেন। নিম্নোক্ত আয়াতটি এ কথার সত্যতা প্রমাণ করে :

(قد نرى تقلّب وجهك في السّماء فلنولّينّك قبلة ترضها)

“আমরা আকাশের দিকে তোমার অর্থবহ দৃষ্টিসমূহকে লক্ষ্য করেছি। তাই যে কিবলার দিকে তুমি সন্তুষ্ট সে দিকেই তোমার মুখ ফিরিয়ে দেব।”[৪৪৬]

পবিত্র কোরআনের আয়াতসমূহ থেকে জানা যায় ইয়া দীদের আচরণের প্রতিবাদ ছাড়াও কিবলা পরিবর্তনের অ কারণও বিদ্যমান ছিল এবং তা হলো মুসলমানদের পরীক্ষা করা। এ পরীক্ষার মাধ্যমে প্রকৃত মুমিনদের মিথ্যা ঈমানের দাবিদারদের থেকে পৃথক করা হয়েছিল যাতে রাসূল (সা.) তাদের চিনতে পারেন। কারণ নামাযের মধ্যে ঐশী নির্দেশ মসজিদুল হারামের দিকে মুখ ফিরিয়ে নতুন ধর্মের প্রতি ঈমান ও ইখলাসের (নিষ্ঠা) প্রমাণ বহন করে এবং এ নির্দেশের অবমাননা কপটতার চিহ্ন হিসাবে পরিগণিত। পবিত্র কোরআনে স্পষ্টভাবে এ বিষয়টি উল্লিখিত হয়েছে :

(و ما جعلنا القبلة الّتي كنت عليها إلّا لنعلم من يتّبع الرّسول ممّن ينقلب على عقبيه و إن كانت لكبيرة إلّا على الّذين هدى الله)

“তুমি এতদিন যে কিবলার অনুসরণ করছিলে তা এ উদ্দেশ্যে ছিল যে, যাতে আমরা জানতে পারি কে রাসূলের অনুসরণ করে ও কে ফিরে যায়। মহান আল্লাহ্ যাদের সৎ পথে পরিচালিত করেছেন তা ব্যতীত অপরের নিকট এটি নিশ্চয়ই কঠিন।”[৪৪৭]

অবশ্য আরব উপদ্বীপ ও ইসলামের ইতিহাস অধ্যয়নে কিবলা পরিবর্তনের অ া কারণও জানা যায়।

প্রথমত কাবা একত্ববাদের মহান সৈনিক হযরত ইবরাহীম (আ.)- এর মাধ্যমে নির্মিত হওয়ায় আরবদের নিকট বিশেষ সম্মানিত ছিল। তাই কাবাকে কিবলা হিসাবে ঘোষণা আরবের সাধারণ মানুষদের সন্তুষ্টির কারণ হয়েছিল এবং তাদেরকে ইসলাম ও ইসলামের একত্ববাদী চিন্তাকে গ্রহণে উৎসাহিত করেছিল। সুতরাং সভ্যতাবিবর্জিত ও একগুঁয়ে মনোভাবের আরব মুশরিকদের ইসলামের প্রতি ঝোঁকানোর এ মহৎ লক্ষ্য কিবলা পরিবর্তনের মধ্যে নিহিত ছিল। এর ফলেই সারা বি ইসলামের প্রসারের পথ উন্মুক্ত হয়েছিল।

দ্বিতীয়ত কাবাকে কিবলা হিসাবে গ্রহণের ফলে ইয়া দীদের হতে মুসলমানরা স্বতন্ত্র হয়ে গিয়েছিল। যেহেতু মদীনার ইয়া দীদের ইসলাম গ্রহণের সম্ভাবনা প্রায় বিলীন হয়ে গিয়েছিল সেহেতু এর প্রয়োজন ছিল। তারা প্রতি মুহূর্তেই ষড়যন্ত্র করত এবং জটিল প্রশ্ন উত্থাপনের মাধ্যমে মহানবীর সময় ক্ষেপণ করত। তারা মনে করত এর মাধ্যমে তাদের জ্ঞানের বহিঃপ্রকাশ ঘটছে। তাই কিবলা পরিবর্তন ইয়া দীদের প্রত্যাখ্যান ও দূরত্ব সৃষ্টির কারণ হয়েছিল। ১০ মুহররম (আশুরার দিন) রোযা রাখার বিধান রহিত হওয়ার লক্ষ্যও এটি ছিল। ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে ইয়া দীরা আশুরার দিন রোযা রাখত। মহানবী (সা.) এবং মুসলমানগনও এ দিনটিকে স্মরণ করে রোযা রাখতেন। পরবর্তীতে আশুরার রোযা রহিত হওয়ার নির্দেশ আসে এবং রমযান মাসের রোযা ফরয করা হয়।

যেহেতু ইসলামের সকল ক্ষেত্রেই শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে। তাই তার পূর্ণত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব সকল দিকেই প্রকাশিত হওয়া আবশ্যক।

উক্ত আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে অনেকে ভাবতে লাগলেন তাঁদের পূর্ববর্তী নামাযসমূহ গ্রহণযোগ্যতা হারিয়েছে। তাই তখনই নিম্নোক্ত আয়াত অবতীর্ণ হলো :

(و ما كان الله ليضيع إيمانكم إنّ الله بالنّاس لرءوف رحيم)

"আল্লাহ্ তোমাদের কর্মকে নিষ্ফল করবেন না। নিশ্চয়ই তিনি মানুষের প্রতি অত্যন্ত দয়ালু ও করুণাময়।"[৪৪৮]

মহানবী (সা.) যোহরের নামাযের দু'রাকাত পড়েছিলেন এমতাবস্থায় জিবরাইল অবতীর্ণ হলেন এবং মহানবীকে ওহীর দ্বারা নির্দেশ দেয়া হলো মসজিদুল হারামের দিকে মুখ ফিরানোর। কোন কোন হাদীসে এসেছে যে, জিবরাইল (আ.) রাসূলের হাত ধরে মসজিদুল হারামের দিকে ঘুরিয়ে দেন। যে সকল নর- নারী মসজিদে নামাযরত ছিলেন তাঁরাও তাঁর অনুকরণে সে দিকে ঘোরেন। সে দিন থেকেই কাবা মুসলমানদের স্বতন্ত্র কিবলা হিসাবে ঘোষিত হলো।

মহানবীর বৈজ্ঞানিক মুজেযা

পূর্ববর্তী ভূগোলবিদদের হিসাব অনুযায়ী মদীনার অবস্থান হলো ২৫ ডিগ্রী অক্ষাংশে এবং ৭৫ ডিগ্রী ২০ মিনিট দ্রাঘিমায়। এ হিসাব অনুযায়ী মদীনা থেকে কিবলার যে দিকনির্দেশনা রয়েছে মহানবীর মিহরাবের অবস্থান তার সে   সংগতিপূর্ণ নয়। এ কারণে মুসলিম মনীষিগণ এ বৈষম্য দূরীকরণে বিভিন্ন ব্যাখ্যার আশ্রয় নিতেন। কিন্তু সম্প্রতি প্রসিদ্ধ মুসলিম বিশেষজ্ঞ সরদার কাবুলী প্রমাণ করেছেন যে, মদীনার অবস্থান হলো ২৪ ডিগ্রী ৭৫ মিনিট অক্ষাংশে এবং ৩৯ ডিগ্রী ৫৯ মিনিট দ্রাঘিমায়। নতুন এ হিসাবে মদীনা থেকে কিবলার অবস্থান ঠিক দক্ষিণ হতে ৪৫ মিনিট ব্যবধানে।[৪৪৯]

মহানবীর মিহরাব ঠিক এরূপ অবস্থানে রয়েছে। এ বিষয়টি মহানবীর একটি বৈজ্ঞানিক মুজিযা। কারণ যে সময়ে দিক নির্ণয়ের কোন মাধ্যম ছিল না সে সময় তিনি বায়তুল মুকাদ্দাস থেকে কাবার দিকে মুখ ফিরিয়ে কিবলার সঠিক স্থান নির্ণয়ে সক্ষম হয়েছিলেন। পূর্বে আমরা উল্লেখ করেছি যে, হযরত জিবরাইল (আ.) নামাযরত অবস্থায় রাসূলকে কাবার দিকে ঘুরিয়ে দেন।[৪৫০]

উনত্রিশতম অধ্যায়বদরের যুদ্ধ :

ইসলামের প্রসিদ্ধ যুদ্ধসমূহের মধ্যে বদর অ তম। এ যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীরা মুসলমানদের নিকট পরবর্তীতে বিশেষ মর্যাদা লাভ করেছিলেন। এ কারণেই যে কোন গুরুত্বপূর্ণ ঘটনায় সাক্ষী উপস্থাপনের ক্ষেত্রে পক্ষসমূহ তাদের দাবির যথার্থতা বুঝাতে কতজন বদরী সাহাবী তাদের সে রয়েছেন তার উল্লেখ করত। রাসূল (সা.)- এর জীবনীতে বদরে অংশগ্রহণকারী ব্যক্তিদের 'বদরী ' বলে অভিহিত করা হয়ে থাকে। এ বিষয়টি বদরের যুদ্ধের গুরুত্বকে আমাদের নিকট তুলে ধরে।

দু'অধ্যায় পূর্বে আমরা উল্লেখ করেছি দ্বিতীয় হিজরীর জমাদিউল আউয়াল মাসের মাঝামাঝি মদীনায় খবর পৌঁছায় আবু সুফিয়ানের নেতৃত্বে মক্কা থেকে সিরিয়ায় বাণিজ্য কাফেলা যাত্রা করেছে। মহানবী (সা.) এ কাফেলাকে ধরার জ জাতুল উশাইরা পর্যন্ত গমন করেন ও পরবর্তী মাসের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত সেখানে অপেক্ষা করেন। কিন্তু ঐ কাফেলার সন্ধান পান নি। কাফেলাটি প্রত্যাবর্তনের সময় শরতের প্রথম দিক নির্দিষ্ট ছিল। কারণ সাধারণত এ সময়েই সিরিয়া থেকে মক্কায় কাফেলাসমূহ ফিরে আসে। যে কোন যুদ্ধে তথ্য হলো জয়ের প্রথম পদক্ষেপ। যদি যুদ্ধের সেনাপতি শত্রুর ক্ষমতা, অবস্থান ও মানসিক অবস্থা সম্পর্কে সঠিকভাবে না জানে তবে যুদ্ধের প্রথমেই পরাস্ত হবার সম্ভাবনা রয়েছে।

ইসলামের নবীর যুদ্ধকৌশলের প্রশংসিত ও লক্ষণীয় একটি দিক হলো- যার প্রমাণ প্রতিটি যুদ্ধের বিস্তারিত বিবরণ থেকে আমরা পাই- শত্রুর অবস্থান ও প্রস্তুতি সম্পর্কে অগ্রিম তথ্য সংগ্রহ। তথ্য সংগ্রহের বিষয়টি বৃহৎ ও ক্ষুদ্র সকল যুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ।

আল্লামা মাজলিসীর[৪৫১] বর্ণনা মতে রাসূল (সা.) আদী নামের এক সাহাবীকে তথ্য সংগ্রহের জ প্রেরণ করেন। 'হায়াতে মুহাম্মদ ' এবং অ া ঐতিহাসিক গ্রন্থ অনুযায়ী মহানবী কুরাইশ

কাফেলার যাত্রাপথ, প্রহরীর সংখ্যা ও আনীত পণ্যের ধরন সম্পর্কে জানার জ তালহা ইবনে উবাইদুল্লাহ্ ও সাঈদ ইবনে যাইদকে প্রেরণ করেছিলেন। তাঁদের আনীত তথ্য নিম্নরূপ ছিল :

১. কাফেলাটি বেশ বড় এবং মক্কার সকল গোত্রের লোকই তাতে রয়েছে।

২. কাফেলার নেতৃত্বে রয়েছে আবু সুফিয়ান এবং ৪০ জন প্রহরী ও রক্ষী তাদের সে রয়েছে।

৩. এক হাজার উষ্ট্র মাল বহন করে নিয়ে আসছে যার মূল্য পঞ্চাশ হাজার দিনারের সমপরিমাণ।

যেহেতু মদীনার মুহাজির মুসলমানদের সম্পদসমূহ মক্কার কুরাইশদের দ্বারা অবরুদ্ধ (ক্রোক) হয়েছিল সেহেতু মুসলমানদের জ কুরাইশদের বাণিজ্য পণ্য অবরোধের প্রয়োজন ছিল। যদি কুরাইশরা মুসলমানদের সম্পদ অবরোধ অব্যাহত রাখে তবে মুসলমানরাও স্বাভাবিকভাবে কুরাইশদের বাণিজ্য পণ্য অবরোধ করে গনীমত হিসাবে নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে নেবে। এ লক্ষ্য নিয়েই রাসূল (সা.) সাহাবীদের উদ্দেশ্যে বলেন,

هذا غير قريش فيها أموالهم فاخرجوا إليها لعل الله يغنمكموها

“হে লোকসকল! কুরাইশ কাফেলা নিকটেই। তাদের সম্পদ হাতে পেতে মদীনা থেকে বেরিয়ে যাও। এতে তোমাদের অর্থনৈতিক অসুবিধা দূর হবে।”[৫৫২]

মহানবী (সা.) আবদুল্লাহ্ ইবনে উম্মে মাকতুমকে মদীনার মসজিদে ইমামতির এবং আবু লাবাবাকে মদীনার সার্বিক দায়িত্ব দান করে দ্বিতীয় হিজরীর রমজান মাসের ৮ তারিখে তিনশ ’ তের জন স ীকে সে নিয়ে কুরাইশদের সম্পদ আটক করার উদ্দেশ্যে মদীনা থেকে বের হলেন।

যাফরান নামক স্থানের দিকে মহানবীর যাত্রা

সংবাদদাতাদের প্রেরিত বার্তা পেয়ে মহানবী (সা.) হিজরী বর্ষের দ্বিতীয় সালের রমজান মাসের আট তারিখ সোমবার কুরাইশ কাফেলার উদ্দেশ্যে যাফরানের[৫৫৩] দিকে যাত্রা করেন। তিনি আলী ইবনে আবি তালিব ও মুসআবের হাতে পৃথক দু'টি পতাকা প্রদান করেন। প্রেরিত সেনাদলে বিরাশি জন মুহাজির, খাজরাজ গোত্রের একশ ' সতের জন এবং একষট্টি জন আওস গোত্রের লোক ছিলেন। সেনাদলে মাত্র তিনটি অ ও সত্তরটি উষ্ট্র ছিল।

ইসলামের সে যুগে মুসলিম সমাজে আত্মত্যাগ ও শাহাদাতের আকাঙ্ক্ষা এতটা তীব্র ছিল যে, অনেক অপ্রাপ্তবয়স্ক বালকও সে যুদ্ধে অংশগ্রহণের আগ্রহ ব্যক্ত করেছিল; কিন্তু রাসূল (সা.) তাদেরকে মদীনায় ফিরিয়ে দেন।

মহানবী (সা.)- এর কথা হতে পূর্বেই বোঝা গিয়েছিল, এ অভিযান মুসলমানদের জীবনে কিছুটা স্বস্তি ও অর্থনৈতিক মুক্তির সুযোগ এনে দেবে। কুরাইশরা যে সম্পদসমূহ মক্কায় বহন করে নিয়ে যাচ্ছিল তা- ই মুসলমানদের আশার উপকরণ ছিল। মুসলমানরা তা কব্জা করার উদ্দেশ্যেই মদীনা থেকে বের হয়েছিল। এ কাজের বৈধতা সম্পর্কে বলতে গিয়ে আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি, কুরাইশরা মক্কায় মুসলমানদের সমগ্র সম্পদ ক্রোক করেছিল এবং তাদের মক্কায় যাতায়াতের পথরোধ করেছিল। ফলে তারা তাদের জীবন নির্বাহের উপকরণ হতে বঞ্চিত ছিল। স্পষ্ট যে, যে কোন জ্ঞানসম্পন্ন মানুষই বলবেন শত্রুর সে সেরূপ আচরণই করা উচিত যেরূপ আচরণ সে তার প্রতিপক্ষের সে করেছে।

প্রকৃতপক্ষে কুরাইশদের কাফেলাসমূহের ওপর মুসলমানদের আক্রমণের কারণ মুসলমানদের প্রতি তাদের নির্যাতনমূলক আচরণ যা কোরআনও উল্লেখ করেছে এবং মুসলমানদের এ আক্রমণের অনুমতি দিয়ে বলেছে :

(أذن للّذين يُقاتلون بأنّهم ظُلموا و أنّ الله على نصرهم لقدير)

"যাদের প্রতি আক্রমণ করা হয়েছে তাদের প্রতিরোধের অনুমতি দেয়া হলো। কারণ তারা নির্যাতিত হয়েছে এবং নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তাদের সাহায্য করতে পূর্ণ ক্ষমতাবান।"[৫৫৪]

আবু সুফিয়ান সিরিয়ার দিকে যাত্রার পূর্বেই জেনেছিল যে, মহানবী (সা.) তাদের কাফেলাকে পশ্চাদ্ধাবন করতে পারেন। এ কারণেই সে প্রত্যাবর্তনের পথে সতর্কতা অবলম্বনের লক্ষ্যে যে কাফেলারই মুখোমুখি হতো প্রশ্ন করত মুহাম্মদ (সা.) কাফেলার পথ রুদ্ধ করে রেখেছেন কি না? যখন তার নিকট বার্তা পৌঁছল মহানবী (সা.) স ীদের সে নিয়ে মদীনা হতে বেরিয়ে এসেছেন ও কুরাইশ কাফেলার পশ্চাদ্ধাবনের মনোবৃত্তিতে বদর প্রান্তরের নিকটবর্তী যাফরানে ছাউনী ফেলেছেন তখন সে কাফেলা নিয়ে অগ্রসর হতে নিবৃত্ত হয়ে কুরাইশদের এ বিষয়টি সম্পর্কে অবহিত করাকে অধিকতর যুক্তিযুক্ত মনে করল। সে দামদাম (জামজাম) ইবনে আমর গিফারী নামক এক তগামী উষ্ট্রচালককে ভাড়া করে নির্দেশ দিল মক্কায় পৌঁছে মক্কার সাহসী কুরাইশ বীরদের ও কাফেলার সে যাদের সম্পর্ক রয়েছে তাদের জানাও তারা যেন মুসলমানদের হাত থেকে কুরাইশ কাফেলাকে বাঁচাতে মক্কা থেকে এখানে এসে পৌঁছায়।

দামদাম ত মক্কায় পৌঁছে আবু সুফিয়ানের নির্দেশ অনুযায়ী নিজ উষ্ট্রের কান কেটে ও নাক ছিদ্র করে, তার পিঠে বসবার স্থানটি বিপরীত দিকে ঘুরিয়ে অগ্র ও পশ্চাৎ ছিন্ন করে বলল, “হে মক্কার অধিবাসিগণ! তোমাদের বাণিজ্য পণ্য বহনকারী উটগুলো আক্রান্ত হয়েছে। মুহাম্মদ ও তার স ীরা তোমাদের পণ্য লু নের উদ্দেশ্যে আক্রমণ করতে উদ্যত হয়েছে। তোমাদের পণ্য তোমাদের হাতে পৌঁছবে বলে মনে হয় না, ত কুরাইশ কাফেলার সাহায্যে এগিয়ে এস।” [৫৫৫]

উষ্ট্রের কান ও নাক হতে অঝোরে রক্ত ঝরছিল। উটের এ করুণ অবস্থাদৃষ্টে এবং দামদামের মর্মস্পর্শী বক্তব্য ও সাহায্যের আহ্বানে মক্কার অধিবাসীদের রক্ত উষ্ণ হয়ে উঠল। সকল যোদ্ধা ও সাহসী পুরুষ যুদ্ধের প্রস্তুতি নিয়ে মক্কা থেকে বের হলো। মক্কার প্রসিদ্ধ ব্যক্তিদের মধ্যে শুধু আবু লাহাব এ দলটির সে আসে নি, তবে সে আস ইবনে হিশাম নামে এক ব্যক্তিকে তার প্রতিনিধিত্ব করার জ চার হাজার দিরহাম দিয়ে যুদ্ধে অংশগ্রহণের জ রাজী করায়।

কুরাইশ গোত্রপতিদের মধ্যে উমাইয়্যা ইবনে খালাফ বিশেষ কারণে এ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে চাচ্ছিল না। কারণ সে শুনেছিল মুহাম্মদ (সা.) বলেছেন, সে মুসলমানদের হাতে নিহত হবে। কুরাইশ গোত্রপ্রধানরা দেখল এরূপ ব্যক্তিত্ব যদি যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করে তবে নিশ্চিতভাবে তাতে

কুরাইশদের ক্ষতি ও মর্যাদাহানি হবে। উমাইয়্যা ইবনে খালাফকে যুদ্ধে অংশগ্রহণে উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে কুরাইশরা দু'ব্যক্তিকে (যারা যুদ্ধের জ   প্রস্তুতি নিয়ে বের হচ্ছিল) উমাইয়্যার নিকট প্রেরণ করে। সে যখন কুরাইশদের নিকট বসেছিল তখন এ দু'ব্যক্তি একটি ট্রেতে সুরমাদানি নিয়ে তার নিকট উপস্থিত হয়ে বলে, "হে উমাইয়্যা! যখন তুমি নিজ গোত্র ও ভূমির সম্ভ্রম রক্ষা ও বাণিজ্য পণ্য উদ্ধারের কাজ হতে বিরত থেকে নারীদের   ায় ঘরের কোণে বসে যুদ্ধ এড়িয়ে চলার নীতি গ্রহণ করেছ তখন নারীদের   ায় এ সুরমা চোখে দিয়ে তাদের স   ই বসে থাক, কুরাইশ বীর যোদ্ধাদের তালিকা হতে নিজের নাম উঠিয়ে নাও।"

এরূপ আক্রমণাত্মক কথা উমাইয়্যাকে এতটা উত্তেজিত করল যে, সে অবচেতনভাবেই যুদ্ধে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত নিয়ে যাত্রার জ   প্রস্তুত হয়ে কুরাইশ কাফেলার স   বাণিজ্য পণ্য উদ্ধারের লক্ষ্যে রওয়ানা হলো।[৫৫৬]

কুরাইশ যে সমস্যার মুখোমুখি হলো

যাত্রার সময় নির্ধারিত হলো। কুরাইশ গোত্রপ্রধানরা বুঝতে পারল মুসলমানদের পূর্বেই বনি বকর গোত্রের মতো কঠিন শত্রুর মুখোমুখি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে এবং পশ্চাৎ দিক থেকে তাদের আক্রমণের শিকার হতে পারে। কারণ বনি বকরের স   কুরাইশদের রক্তের শত্রুতা ছিল। এ ঘটনাটি ইবনে হিশাম তাঁর সিরাত গ্রন্থে বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন।[৫৫৭] বনি বকর গোত্রের প্রসিদ্ধ ব্যক্তি সুরাকা ইবনে মালিক এ সময় তাদের নিকট এসে নিশ্চয়তা দান করল যে, এমন কিছু ঘটার কোন সম্ভাবনা নেই এবং কুরাইশরা নিশ্চিত মনে মক্কা হতে বেরিয়ে যেতে পারবে।

মহানবী (সা.) কুরাইশ বাণিজ্য কাফেলাকে অবরোধ করার লক্ষ্যে মদীনা থেকে বের হয়েছিলেন এবং যাফরান নামক স্থানে অবস্থান নিয়েছিলেন। সেখানে তিনি বাণিজ্য কাফেলার আগমনের অপেক্ষায় ছিলেন। এ সময় হঠাৎ করে নতুন খবর এসে পৌঁছাল যা ইসলামের সৈনিকদের চিন্তা-চেতনায় বৈ বিক পরিবর্তন ঘটাল এবং তাদের জীবনে নতুন অধ্যায়ের সূচনা করল। মহানবীর নিকট সংবাদ পৌঁছেছিল যে, মক্কাবাসীরা তাদের বাণিজ্য কাফেলাকে রক্ষার উদ্দেশ্যে মক্কা থেকে বের হয়েছে এবং আশেপাশেই অবস্থান গ্রহণ করেছে। মক্কার সকল গোত্রই এ সৈ দলে অংশগ্রহণ করেছে। মুসলমানদের মহান নেতা দু'পথের মাঝে নিজেকে লক্ষ্য করলেন। একদিকে তিনি ও তাঁর স ীরা বাণিজ্যপণ্য অবরোধের উদ্দেশ্যে মদীনা থেকে বের হয়েছিলেন এবং এ কারণে মক্কা থেকে আগত বড় একটি সেনাদলের মুখোমুখি হওয়ার উপযুক্ত প্রস্তুতি তাঁদের ছিল না; লোকবল এবং যুদ্ধাস্ত্র উভয় ক্ষেত্রেই তাঁদের অবস্থা ছিল খুবই শোচনীয়। অ দিকে যে পথে তাঁরা মদীনা থেকে বের হয়েছিলেন সে পথেই যদি পুনরায় মদীনায় ফিরে যেতেন তবে এতদিন পরিচালিত বিভিন্ন সামরিক মহড়াগুলোর ফলে অর্জিত মর্যাদা ভূলু ি ত হতো। হয়তো এর ফলে শত্রুরা দুঃসাহস দেখিয়ে আরো অগ্রসর হয়ে ইসলামের কেন্দ্র মদীনাতেও আক্রমণ করে বসত। তাই মহানবী (সা.) পশ্চাদপসরণকে উপযুক্ত মনে করলেন না, বরং যেটুকু শক্তি রয়েছে তা নিয়েই শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত প্রতিরোধ করাই সমীচীন মনে করলেন।

অ   যে বিষয়টি এখানে লক্ষণীয় ছিল তা হলো মদীনা থেকে আগত সেনাদলের অধিকাংশই ছিলেন আনসার যুবক। তাঁদের মধ্যে শুধু ৭৪ জন মুহাজির ছিলেন। তদুপরি মহানবী (সা.) আকাবায় আনসারদের স   যে চুক্তি করেছিলেন তা ছিল প্রতিরক্ষামূলক-   আক্রমণাত্মক নয়। তাই তাঁরা মদীনার বাইরে তাঁর শত্রুদের স   যুদ্ধ করবেন এমন কোন প্রতিশ্রুতি সেখানে ছিল না। এমন মুহূর্তে মুসলিম সেনাদলের সর্বাধিনায়ক কি করলেন? তিনি সামরিক পরামর্শ সভার আহবান ব্যতীত আর কোন পথ খুঁজে পেলেন না। এভাবে তিনি মতামত জানার মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের চিন্তা করলেন।

সামরিক পরামর্শ সভা

তিনি দাঁড়িয়ে সবাইকে লক্ষ্য করে বললেন, “এ বিষয়ে তোমাদের মত কি?” সর্বপ্রথম আবু বকর দাঁড়িয়ে বললেন, “কুরাইশদের সম্ভ্রান্ত সাহসী ব্যক্তিরা মক্কা থেকে আগত সেনাদলে অংশগ্রহণ করছে। কুরাইশ কখনই অ কোন ধর্ম গ্রহণ করে নি এবং তাদের সম্মানিত স্থান থেকে নিচে নেমে অপমানকে গ্রহণ করে নি। অ দিকে আমরা মদীনা থেকে পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে আসি নি।”[৫৫৮] (অর্থাৎ যুদ্ধ না করার মধ্যেই কল্যাণ রয়েছে এবং মদীনায় ফিরে যাওয়াই উত্তম।) রাসূল (সা.) তাঁকে লক্ষ্য করে বললেন, “বসুন।” অতঃপর হযরত উমর দাঁড়িয়ে হযরত আবু বকরের কথার পুনরাবৃত্তি করলেন। রাসূল তাঁকেও বসার নির্দেশ দিলেন। তখন হযরত মিকদাদ (রা.) দাঁড়িয়ে বললেন, “হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের অন্তর আপনার সে । আল্লাহ্ আপনাকে যা নির্দেশ দিয়েছেন আপনি তারই অনুসরণ করুন। মহান আল্লাহর শপথ, কখনই আমরা আপনাকে সেরূপ কথা বলব না যেরূপ কথা বনি ইসরাইল হযরত মূসাকে বলেছিলেন। যখন হযরত মূসা (আ.) বনি ইসরাইলকে জিহাদের আহবান জানিয়েছিলেন তখন তারা হযরত মূসাকে বলেছিল : হে মূসা! তুমি ও তোমার প্রভু তাদের সে যুদ্ধ কর এবং আমরা এখানেই বসে থাকব।[৫৫৯] কিন্তু আমরা এর বিপরীতে আপনাকে বলব : আপনি আপনার প্রতিপালকের অনুগ্রহের ছায়ায় জিহাদ করুন এবং আমরাও আপনার অনুগত হয়ে আপনার অধীনে যুদ্ধ করব।”[৫৬০] মহানবী (সা.) মিকদাদের এ কথায় অত্যন্ত খুশী হলেন এবং তাঁর জ মহান আল্লাহর নিকট বিশেষভাবে দোয়া করলেন।

মিথ্যার প্রতি গোঁড়ামি ও সত্যকে গোপনের প্রয়াস সকল লেখকের ক্ষেত্রেই অ ায় বলে বিবেচিত হলেও ঐতিহাসিকদের ক্ষেত্রে এটি আরো বড় অ ায়। কারণ ইতিহাস হলো দর্পণের ায় যা সমাজের মানুষগুলোর প্রকৃত চেহারাকে প্রতিফলিত করে। ইতিহাসের মধ্যেই মানুষ তাদের প্রতিচ্ছবি দেখতে পায়। তাই ঐতিহাসিকদের উচিত ইতিহাসের পাতাগুলোকে ভবি তের মানুষদের জ সকল ধরনের গোঁড়ামি ও মিথ্যার মরিচা হতে মুক্ত রাখা।

ইবনে হিশাম, মাকরিযী[৫৬১] এবং তাবারী[৫৬২] তাঁদের ইতিহাস গ্রন্থসমূহে মহানবীর সামরিক পরামর্শ সভার ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন এবং হযরত মিকদাদ এবং সা’দ ইবনে মায়ায- এর বক্তব্য

এনেছেন, কিন্তু হযরত আবু বকর ও হযরত উমরের বক্তব্যকে পূর্ণরূপে বর্ণনা না করে শুধু বলেছেন যে, তাঁরাও দাঁড়ালেন এবং উত্তম কথা বললেন। এ প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিকদের প্রতি আমার প্রশ্ন : যদি তাঁরা উত্তম কথাই বলে থাকেন, তবে কেন আপনারা তা বর্ণনা করা থেকে বিরত থাকলেন?

সেদিন তাঁরা যা বলেছিলেন আমরা তা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। যদিও এ ঐতিহাসিকগণ এ সত্যের ওপর পর্দার আবরণ টেনে দেয়ার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু অ ঐতিহাসিকগণ তা বর্ণনা করেছেন।[৫৬৩] এ সব বর্ণনা থেকে বোঝা যায় তাঁরা উত্তম কোন কথা বলেন নি, বরং তাঁরা এমন কথা বলেছিলেন যা থেকে বক্তার আতি ত ও ভীত হওয়ার লক্ষণ প্রকাশ পায়। কারণ তাঁরা কুরাইশদের এতটা শক্তিশালী ভেবেছিলেন যেন তাদের কখনই পরাজিত করা সম্ভব নয়। তাঁদের কথার নেতিবাচক ভ টি যে নবীকে অসন্তুষ্ট করেছিল তা তাবারীর বর্ণনার অংশ থেকে কিছুটা আঁচ করা যায়। কারণ তাবারীর বর্ণনা থেকে শায়খাইন (আবু বকর ও উমর) সর্বপ্রথম কথা বলেছিলেন তা বোঝা যায় এবং তাঁদের কথার জবাবেই হযরত মিকদাদ ও সা'দ ইবনে মায়ায কথা বলেছিলেন।

তাবারী হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদের নিকট থেকে বর্ণনা করেছেন, "বদরের দিন আমার আকাঙ্ক্ষা ছিল মিকদাদের অবস্থানে যদি আমি অবস্থান নিতে পারতাম। কারণ তিনি বিরূপ এক পরিবেশে বলেছিলেন : আমরা কখনই বনি ইসরাইল জাতির মতো আপনাকে (মহানবীকে) বলব না যে, আপনি ও আপনার প্রভু গিয়ে যুদ্ধ করুন এবং আমরা এখানে বসে রইলাম। যখন মহানবীর চেহারা ক্রোধে রক্তিম হয়ে গিয়েছিল তখন হযরত মিকদাদ এমন কথা বলেছিলেন যাতে মহানবীর চেহারা আনন্দে উদ্ভাসিত হয়েছিল। তাই আমার আকাঙ্ক্ষা ছিল ঐ ইপ্সিত অবস্থানটি যদি আমি অর্জন করতে পারতাম!"[৬৬৪] তাই বোঝা যায়, মিকদাদের পূর্বে শায়খাইন আত ও হতাশার বাণী শুনিয়েছিলেন ও মদীনায় ফিরে যাওয়ার জ তাগিদ দিয়েছিলেন।

এটি ছিল একটি পরামর্শ সভা। তাই সভায় উপস্থিত প্রত্যেকেরই নিজস্ব মত প্রকাশের অধিকার ছিল। কিন্তু ইতিহাসের পরিক্রমা প্রমাণ করেছে হযরত মিকদাদ (রা.) উপরিউক্ত দু'ব্যক্তি হতে সত্যের অধিকতর নিকটবর্তী ছিলেন।

পরামর্শ সভার সিদ্ধান্ত ও আনসার দলপতির মত

যে মতগুলো এতক্ষণ উপস্থাপিত হয়েছে তা ব্যক্তিগত মত হিসাবেই প্রণিধানযোগ্য। মূলত পরামর্শ সভার লক্ষ্য ছিল আনসারদের মত জানা। যতক্ষণ আনসাররা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত না নিবে ততক্ষণ ছোট কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণও সম্ভব ছিল না। এতক্ষণ মতামত দানকারী ব্যক্তিবর্গের সকলেই ছিলেন মুহাজির। এ কারণেই মহানবী (সা.) আনসারদের মত নেয়ার জ   তাঁর কথার পুনরাবৃত্তি করে বললেন, "তোমরা তোমাদের মত প্রদান কর।"

সা'দ ইবনে মায়ায আনসারী দাঁড়িয়ে বললেন, "আপনি কি আমাদের মত চাচ্ছেন?" রাসূল বললেন, "হ্যাঁ।" মায়ায বললেন, "হে আল্লাহর রাসূল! আমরা আপনার ওপর ঈমান এনেছি। আমরা সাক্ষ্য দিয়েছি আপনার আনীত ধর্ম সত্য। এ বিষয়ে আমরা আপনার সাথে প্রতিশ্রুতিবদ্ধও হয়েছি। তাই আপনি যা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন, আমরা তারই অনুসরণ করব। সেই আল্লাহর শপথ, যিনি আপনাকে নবী হিসাবে প্রেরণ করেছেন। যদি আপনি সমুদ্রেও প্রবেশ করেন (লোহিত সাগরের দিকে ইশারা করে) তবে আমরাও আপনার পশ্চাতে তাতে প্রবেশ করব। আমাদের এক ব্যক্তিও আপনার অবাধ্য হবে না। আমরা শত্রুর মুখোমুখি হতে কু ত নই। আত্মত্যাগের ক্ষেত্রে আমরা এতটা প্রমাণ করব যে, এতে আপনার চক্ষু উজ্জ্বল হবে। আপনি আল্লাহর নির্দেশে আমাদের যেখানেই যেতে বলবেন, আমরা যেতে প্রস্তুত।"

সা'দের এ বক্তব্য মহানবীর অন্তরে প্রফুল্লতা বয়ে আনল এবং তাঁর সত্য ও লক্ষ্যের পথে দৃঢ়তা এবং জীবনসঞ্চারক আশার বাণী হতাশা ও শ ার কালো ছায়াকে দূরীভূত করল।

সত্যের এ সাহসী সৈনিকের বক্তব্য এতটা উদ্দীপক ছিল যে, মহানবী (সা.) সাথে সাথে যাত্রার নির্দেশ দিয়ে বললেন,

"যাত্রা শুরু কর। তোমাদের জ   সুসংবাদ, হয় তোমরা কাফেলার মুখোমুখি হবে ও তাদের সম্পদ ক্রোক করবে, নতুবা কাফেলার সাহায্যে এগিয়ে আসা দলের মুখোমুখি হয়ে তাদের সে যুদ্ধ করবে। আমি কুরাইশদের নিহত হওয়ার স্থানটি দেখতে পাচ্ছি, তাদের ভয় র ক্ষতির সম্মুখীন হতে হবে।"

মুসলিম সেনাদল নবীর পশ্চাতে যাত্রা শুরু করল এবং বদরের প্রান্তরে পানির আধারের নিকট ছাউনী ফেলল।

শত্রুর সার্বিক অবস্থা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ

যদিও বর্তমানে সামরিক নীতি ও যুদ্ধকৌশলের ব্যাপক পরিবর্তন হয়েছে ও পূর্ববর্তী সময় থেকে তার পার্থক্য স্পষ্ট তদুপরি এখনও শত্রুর অবস্থা, যুদ্ধকৌশল, সামরিক শক্তি ও অ া গোপন তথ্য সম্পর্কে অবগত হওয়ার প্রয়োজনীয়তা পূর্বের মতোই গুরুত্বপূর্ণ। যুদ্ধে জয়লাভের জ এ সকল তথ্য এখনও মৌলিক বলে বিবেচিত। অবশ্য বর্তমানে তথ্য সংগ্রহের এ জ্ঞানটি সামরিক শিক্ষাদানের অ তম পাঠ্যের রূপ নিয়েছে এবং গোয়েন্দাবৃত্তির জ বিশেষ ক্লাস ও পাঠ্যসূচী প্রণীত হয়েছে। বর্তমানে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ব্লকের দেশগুলোর সামরিক অবস্থান তাদের গোয়েন্দা সংস্থার বিস্তৃতির ওপর নির্ভরশীল মনে করে। কারণ গোয়েন্দা তথ্যের মাধ্যমেই তারা শত্রুর সম্ভাব্য শক্তি ও যুদ্ধকৌশল সম্পর্কে পূর্বে অবহিত হয়ে তাদের পরিকল্পনাকে নস্যাৎ করে দিতে সক্ষম হবে বলে বি াস করে।

এ কারণেই মুসলিম সেনাবাহিনী এমন এক স্থানে অবস্থান নিল যাতে করে এ মৌলনীতি সংরক্ষিত হয় এবং কোনরূপেই যেন গোপন তথ্যসমূহ প্রকাশিত না হয়। অ দিকে একদল সংবাদ বাহককে কুরাইশ সেনাদল ও বাণিজ্য কাফেলা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের জ নিয়োগ করা হলো। প্রেরিত সংবাদ বাহকরা তথ্যসমূহ নিম্নরূপ পদ্ধতিতে হস্তগত করেছিল :

১. প্রথম দলে স্বয়ং নবী (সা.) ছিলেন। তিনি একজন সেনাকে স নিয়ে কিছু পথ অগ্রসর হয়ে একজন গোত্রপ্রধানের সাক্ষাৎ পেলেন এবং তাকে প্রশ্ন করলেন, “কুরাইশ এবং মুহাম্মদ ও তার স ীদের সম্পর্কে আপনি কোন তথ্য জানেন কি?”

সে বলল, “আমার নিকট খবর পৌঁছেছে যে, মুহাম্মদ ও তার স ীরা অমুক দিন মদীনা থেকে বের হয়েছে। যদি এ খবরটি সত্য হয়, তবে তারা অমুক স্থানে অবস্থান নিয়েছে (সে এমন স্থানের নাম বলল রাসূল ও তাঁর স ীরা ঠিক সেখানে অবস্থান নিয়েছিলেন)। কুরাইশরাও অমুক দিন মক্কা থেকে যাত্রা করেছে বলে আমরা খবর পেয়েছি। যদি এ খবরটিও সঠিক হয় তবে কুরাইশ অমুক স্থানে অবস্থান নিয়েছে (এ ক্ষেত্রে সে কুরাইশদের অবস্থান নেয়া স্থানের নামই উল্লেখ করল।)

২. যুবাইর ইবনে আওয়াম, সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস ও আরো কিছু স ী হযরত আলীর নেতৃত্বে বদরের কূপের নিকটবর্তী স্থানে তথ্য সংগ্রহের জ প্রেরিত হয়েছিল। এ স্থানটি তথ্য সংগ্রহের জ আনাগোনার স্থান হিসাবে সংবাদ বাহকদের কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। প্রেরিত দলটি কূপের নিকট কুরাইশদের দু'জন দাসের সাক্ষাৎ লাভ করল। তাঁরা তাদের বন্দী করে রাসূল (সা.)- এর নিকট আনয়ন করলেন। এ দুই দাস কুরাইশের দু'গোত্র বনি হাজ্জাজ ও বনি আ'সের পক্ষ থেকে কুরাইশদের জ পানি নেয়ার উদ্দেশ্যে কূপের নিকট এসেছিল।

রাসূল (সা.) তাদেরকে কুরাইশদের অবস্থান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তারা জানায় পর্বতের পশ্চাতের সমতল ভূমিতে তারা অবস্থান নিয়েছে। তাদের সংখ্যা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তাদের সঠিক সংখ্যা সম্পর্কে তারা অবগত নয় বলে জানাল। মহানবী (সা.) প্রশ্ন করলেন, "প্রতিদিন তারা খাদ্যের জ কতটি উট জবাই করে।" তারা বলল, " কোন দিন দশটি, কোন দিন নয়টি।" মহানবী ধারণা করলেন তাদের সংখ্যা নয়শ' থেকে এক হাজার। অতঃপর তাদের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের মধ্যে কারা এসেছে প্রশ্ন করলে জানায়, উতবা ইবনে রাবীয়া, শাইবা ইবনে রাবীয়া, আবুল বাখতারি ইবনে হিশাম, আবু জাহল ইবনে হিশাম, হাকিম ইবনে হাজাম, উমাইয়্যা ইবনে খালাফ প্রমুখ তাদের মধ্যে রয়েছে। এ সময় রাসূল (সা.) সাহাবীদের উদ্দেশে বললেন,

هذه مكّة قد القت اليكم افلاذ كبدها

" মক্কা শহর তার কলিজার টুকরোগুলোকে বের করে দিয়েছে।" [৫৬৫]

অতঃপর তিনি এ দু'ব্যক্তিকে বন্দী রাখার নির্দেশ দিয়ে তথ্য সংগ্রহ অভিযান অব্যাহত রাখার নির্দেশ দিলেন।

৩. দু'ব্যক্তিকে দায়িত্ব দেয়া হলো বদর প্রান্তে গিয়ে কুরাইশ কাফেলা সম্পর্কে খোঁজ- খবর নেয়ার। তাঁরা একটি কূপের নিকটবর্তী স্থানে অবতরণ করে পানি পানের উদ্দেশ্যে এসেছেন এমন ভান করে কূপের নিকট পৌঁছলেন। সেখানে দু'নারীর সাক্ষাৎ লাভ করলেন যারা পরস্পর কথা বলছিল। তাদের একজন আরেক জনকে বলছিল, "আমার প্রয়োজন আছে জেনেও কেন আমার ধার পরিশোধ করছ না?" অ জন বলল, "কাল অথবা পরশু বাণিজ্য কাফেলা এসে পৌঁছবে।

আমি কাফেলার জ   শ্রম দিয়ে তোমার অর্থ পরিশোধ করব।” মাজদি ইবনে আমর নামক এক ব্যক্তি এ দু’নারীর নিকট দাঁড়িয়েছিল। সেও ঋণগ্রস্ত মহিলার কথাকে সমর্থন করে বলল, “কাফেলা দু’এক দিনের মধ্যেই এসে পৌঁছবে।”

সংবাদ বাহক দু’ব্যক্তি এ কথা শুনে আনন্দিত হলেন, তবে সাবধানতা ও গোপনীয়তা বজায় রেখে ফিরে এলেন এবং রাসূল (সা.)- কে তথ্যটি অবহিত করলেন। যখন মহানবী কুরাইশদের অবস্থান ও বাণিজ্যিক কাফেলার আগমন সম্পর্কে পর্যাপ্ত তথ্য পেলেন তখন প্রয়োজনীয় প্রাথমিক প্রস্তুতি নিতে শুরু করলেন।

আবু সুফিয়ানের পলায়ন

কুরাইশ বাণিজ্য কাফেলাপ্রধান আবু সুফিয়ান কাফেলা নিয়ে সিরিয়া গমনের সময় একদল মুসলমান কর্তৃক আক্রান্ত হয়েছিল। তাই সে ভালোভাবে জানত যে, ফিরে আসার সময় অবশ্যই মুসলমানদের দ্বারা আক্রান্ত হবে। এ কারণেই সে মুসলমানদের আয়ত্তাধীন এলাকায় প্রবেশের পরপরই তার কাফেলাকে এক স্থানে বিশ্রাম নিতে বলে স্বয়ং তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে বদর এলাকায় প্রবেশ করে। সেখানে সে মাজদি ইবনে আমরের সাক্ষাৎ পেল। তাকে সে প্রশ্ন করল, "অত্র এলাকায় সন্দেহভাজন কোন ব্যক্তিকে দেখেছ কি?" সে বলল, "সন্দেহ হতে পারে এমন কিছু দেখি নি দুই উষ্ট্রারোহীকে কূপের নিকট অবতরণ করে পানি পান করে চলে যেতে দেখেছি।" আবু সুফিয়ান কূপের নিকট এসে উষ্ট্রের বসার স্থানটিতে উষ্ট্রের মল পড়ে থাকতে দেখল। সে মলগুলোকে আঘাত করে ভেঙে দেখল তাতে খেজুরের বীজ রয়েছে। সে বুঝতে পারল উটগুলো মদীনা থেকে এসেছে। সে ত কাফেলার নিকট ফিরে এসে কাফেলাকে মুসলমানদের আয়ত্তাধীন এলাকা থেকে ত বেরিয়ে যাবার নির্দেশ দিল এবং কাফেলার পথকে অ দিকে ঘুরিয়ে দিল। অতঃপর সে কুরাইশদের নিকট বার্তা পাঠাল যে, কাফেলা মুসলমানদের অধীন এলাকা থেকে নিরাপদ স্থানে পৌঁছে গেছে এবং কুরাইশ সেনাদল যেন যে পথে এসেছে সে পথে মক্কায় ফিরে যায়। হযরত মুহাম্মদ (সা.)- কে উপযুক্ত শিক্ষাদানের দায়িত্বটি যেন আরবদের ওপর ছেড়ে দেয়।

কুরাইশ কাফেলার পরিত্রাণ লাভের ঘটনা সম্পর্কে মুসলমানদের তথ্য লাভ

কুরাইশ কাফেলার পলায়নের ঘটনাটি মুসলমানদের নিকট পৌঁছলে যে সকল ব্যক্তি বাণিজ্য পণ্য লাভের নেশায় বুঁদ হয়েছিল তারা বেশ অসন্তুষ্ট হলো। তখন মহান আল্লাহ্ তাদের অন্তরকে সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে নিম্নোক্ত আয়াত অবতীর্ণ করলেন :

(و إذا يعدكم الله إحدى الطائفتين أنّها لكم و تودّون أنّ غير ذات الشوكة تكون لكم و يريد الله أن يحقّ الحقّ بكلماته و يقطع دابر الكافرين)

“স্মরণ কর ঐ মুহূর্তকে যখন আল্লাহ্ দু’টি দলের একটিকে মুখোমুখি হওয়ার সুসংবাদ তোমাদের দিলেন এবং তোমরা অমর্যাদার দলটির (বাণিজ্য কাফেলা) মুখোমুখি হওয়ার আশা করছিলে; অ দিকে আল্লাহ্ চেয়েছেন সত্যকে পৃথিবীর ওপর সুদৃঢ় করতে এবং কাফির দলের মূলোৎপাটন করতে।” [৫৬৬]

কুরাইশদের মতদ্বৈততা

যখন আবু সুফিয়ানের প্রেরিত ব্যক্তি কুরাইশ সেনাদলের নিকট তার বার্তা নিয়ে পৌঁছল তখন এ নিয়ে কুরাইশদের মধ্যে ব্যাপক মতদ্বৈততা সৃষ্টি হলো। বনি যোহরা ও আখনাস ইবনে শারীক তাদের সং চুক্তিবদ্ধ পক্ষসমূহকে নিয়ে প্রা ন ত্যাগ করল। কারণ তাদের ভা ছিল : আমরা বনি যোহরা গোত্রের বাণিজ্য পণ্যসমূহ রক্ষার উদ্দেশ্যে এখানে এসেছিলাম। সে লক্ষ্য অর্জিত হয়েছে। হযরত আবু তালিবের পুত্র তালিব, যিনি বাধ্য হয়ে কুরাইশদের সং এসেছিলেন তিনিও কুরাইশদের সং বাকবিতণ্ডার পর মক্কায় ফিরে গেলেন।

আবু জাহল আবু সুফিয়ানের মতের বিপরীতে নাছোড়বান্দা হয়ে বলল, "আমরা বদর প্রান্তে তিন দিনের জ অবস্থান নেব। সেখানে উট জবাই করে, শরাব পান করে ও গায়িকাদের গান শুনে কাটাব। সে সাথে আমাদের শক্তির মহড়া প্রদর্শন করব যাতে করে সকল আরব আমাদের শক্তি সম্পর্কে অবহিত হয় এবং চিরকাল তা স্মরণ রাখে। "

আবু জাহলের মনভোলানো কথায় প্ররোচিত হযে কুরাইশরা বদর প্রান্তরের দিকে ধাবিত হয়ে একটি উঁচু টিলার পশ্চাতে উঁচু সমতল ভূমিতে গিয়ে অবস্থান নেয়ার সিদ্ধান্ত নিল। অবশ্য সেদিন প্রচণ্ড বৃষ্টি হওয়ায় কুরাইশদের চলাচলই মুশকিল হয়ে পড়ল ও তারা আরো অগ্রসর হওয়ার চিন্তা বাদ দিয়ে ঐ টিলা থেকে একটু দূরেই অবস্থান নিতে বাধ্য হলো।

অ দিকে মহানবী (সা.) বদরের যে প্রান্তে অবস্থান গ্রহণ করেছিলেন সেখানে বৃষ্টির কোন নেতিবাচক প্রভাব ছিল না। এ প্রান্তটি 'উদওয়াতুদ দুনিয়া ' নামে প্রসিদ্ধ।

বদর অঞ্চলটি একটি বিস্তৃত ভূমি যার দক্ষিণ প্রান্ত উঁচু ও 'উদওয়াতুল কাছওয়া ' নামে পরিচিত এবং উত্তর প্রান্তটি নিচু ও ঢালু। এ প্রান্তটি 'উদওয়াতুদ দুনিয়া ' নামে পরিচিত। এ বিস্তৃত ভূমিতে বিভিন্ন ধরনের কূপ থাকার কারণে পর্যাপ্ত পানির সরবরাহ ছিল এবং সব সময় কাফেলাসমূহ এ স্থানে অবতরণ করে বিশ্রাম নিত।

হাব্বাব ইবনে মুনযার নামক এক মুসলিম সেনাপতি রাসূল (সা.)- কে বললেন, "হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কি আল্লাহর নির্দেশে এখানে অবস্থান নিয়েছেন নাকি এ স্থানে অবস্থানগ্রহণ যুদ্ধের

জ   উপযোগী মনে করে অবস্থান করছেন?” মহানবী (সা.) বললেন, “এ বিষয়ে বিশেষ কোন নির্দেশ অবতীর্ণ হয় নি। যদি তোমার মতে অ   কোন স্থান এটি হতে উপযোগী হয় তা বলতে পার। যদি যুদ্ধের জ   অধিকতর উপযোগী স্থান পাওয়া যায়, আমরা সেখানে স্থানান্তরিত হব।”[৫৬৭] হাব্বাব বললেন, “আমরা শত্রুর নিকটবর্তী পানির কিনারে অবস্থান নিলে ভালো হবে। সেখানে বড় চৌবাচ্চা তৈরি করলে আমাদের এবং চতুষ্পদ প্রাণীগুলোরও সার্বক্ষণিক পানির ব্যবস্থা হবে। ” মহানবী (সা.) তাঁর কথা পছন্দ করলেন এবং সকলকে ঐ স্থানের দিকে যাত্রার নির্দেশ দিলেন। এ ঘটনাটি প্রমাণ করে যে, রাসূল সামাজিক বিষয়ে সব সময় জনমত ও সার্বিক পরামর্শের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিতেন।

নেতৃত্ব মঞ্চ

সা'দ ইবনে মায়ায মহানবী (সা.)- এর নিকট প্রস্তাব করলেন, "আপনার জ উঁচু টিলার ওপর তাঁবু তৈরি করি যেখান থেকে সমগ্র প্রা ণের ওপর আপনি দৃষ্টি রাখতে পারবেন। তদুপরি আপনার জ কয়েকজন রক্ষী নিয়োজিত করি যাতে করে তারা আপনার নিরাপত্তার প্রতি লক্ষ্য রাখতে পারে এবং আপনার নির্দেশসমূহ যুদ্ধে নিয়োজিত সেনাপতিদের নিকট পৌঁছাতে পারে। সর্বোপরি যদি এ যুদ্ধে মুসলমানগণ জয়ী হন তবে তো কথাই নেই। আর যদি পরাজিত হন ও সকলে নিহত হন, হে নবী! আপনি তগামী উষ্ট্রের সাহায্যে মদীনার দিকে রওয়ানা হয়ে যাবেন। আপনার দেহরক্ষী সৈ রা কৌশল অবলম্বন করে যুদ্ধের গতিকে শিথিল করে দিয়ে শত্রুর অগ্রযাত্রাকে প্রতিহত করবে এবং এ সুযোগে আপনি মদীনায় পৌঁছে যাবেন। মদীনায় অনেক মুসলমান রয়েছেন যাঁরা আমাদের অবস্থা সম্পর্কে অনবগত। যখন তাঁরা আমাদের অবস্থা সম্পর্কে অবহিত হবে তখন আপনাকে পূর্ণরূপে সহায়তা দেবে এবং আপনার সে সম্পাদিত চুক্তি অনুযায়ী শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত কাজ করবে।

মহানবী (সা.) সা'দ ইবনে মায়াযের জ দোয়া করলেন এবং নির্দেশ দিলেন তাঁর জ টিলার ওপর নিরাপত্তা তাঁবু স্থাপন করার যাতে করে সমগ্র প্রা ণের অবস্থার ওপর দৃষ্টি রাখতে পারেন। মহানবী (সা.)- এর কথা অনুযায়ী নেতৃত্ব মঞ্চ স্থানান্তরিত করা হলো।

নিরাপদ নেতৃত্ব মঞ্চের ওপর দৃষ্টিপাত

মহানবী (সা.)- এ জ নিরাপদ নেতৃত্ব মঞ্চ প্রস্তুত ও সা'দ ইবনে মায়ায ও অ া আনসার যুবক কর্তৃক তাঁর প্রহরার বিষয়টি তাবারী[৫৬৮] ইবনে ইসহাক থেকে বর্ণনা করেছেন এবং অ রাও তাঁর অনুসরণে তা তাঁদের ইতিহাস গ্রন্থে এনেছেন। কিন্তু নিম্নোক্ত যুক্তিসমূহের ভিত্তিতে বলা যায় যে, এ বিষয়টি গ্রহণযোগ্য নয়।

প্রথমত এ বিষয়টি সৈ দের মনোবলকে নিঃসন্দেহে কমিয়ে দেবে এবং তাদের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে। যদি কোন সেনানায়ক শুধু নিজের জীবন ও নিরাপত্তার কথাই চিন্তা করেন তাঁর

অনুগত সেনাদের নিরাপত্তার কথা চিন্তা করেন না, সেরূপ সেনানায়ক তাঁর অনুগত সেনাদের প্রভাবিত করতে সক্ষম নন।

দ্বিতীয়ত এ কাজটি মহানবী (সা.) কর্তৃক প্রাপ্ত ঐশী আয়াতে উল্লিখিত সুসংবাদের স   মোটেও সামঞ্জস্যশীল নয়। তিনি কুরাইশদের মুখোমুখি হওয়ার পূর্বেই তাঁর স ীদের সুসংবাদ দিয়ে বলেছিলেন, "স্মরণ কর যখন আল্লাহ্ তোমাদের নিশ্চিত প্রতিশ্রুতি দান করলেন যে, দুই দলের (বাণিজ্য কাফেলা ও কুরাইশদের সাহায্যকারী দলের) একদলের মুখোমুখি হওয়ার যাতে তোমাদেরই জয় হবে।"

তাবারীর মতে এরূপ সুসংবাদ পাওয়ার পরও যখন বাণিজ্য কাফেলা হাতছাড়া হয়েছিল ও সাহায্যকারী দলটি সামনে উপস্থিত হয়েছিল তখন মহানবী (সা.)- এর জ   নিরাপদ নেতৃত্ব মঞ্চ তৈরি হয়েছিল। এ সুসংবাদ মতে মুসলমানরা বিজয়ী হবেন এ কথা আগেই জেনেছিলেন। তাই পরাজিত হওয়ার শ া তাঁদের ছিল না এবং সে আশংকায় নবী (সা.)- এর জ   নিরাপত্তা মঞ্চ তৈরি ও   তগামী উষ্ট্র প্রস্তুত রাখার বিষয়টি অর্থহীন ছিল।

ইবনে সা'দ তাঁর তাবাকাত[৫৬৯] গ্রন্থে হযরত উমর ইবনে খাত্তাবের নিকট হতে বর্ণনা করেছেন, "যখন নিম্নোক্ত আয়াতটি[৫৭০] অবতীর্ণ হয় এবং একটি দলের পরাজয়ের কথা বলা হয় তখন আমি মনে মনে বললাম : এ আয়াতটিকে কোন্ দলের পরাজয়ের কথা বলা হয়েছে? বদর যুদ্ধের দিন দেখলাম রাসূল (সা.) যুদ্ধের পোশাক পরিধান করেছেন ও জোশের স   এ আয়াতটি পড়ছেন। তখন বুঝতে পারলাম আমাদের প্রতিপক্ষ এ দলের পরাজয়ের কথাই এতে বলা হয়েছে।"

ইতিহাসের এ অংশটি লক্ষ্য করেও কি আমরা মহানবী (সা.) ও মুসলমানদের অন্তরে পরাজয়ের শ া ছিল বলে মনে করব?

তৃতীয়ত হযরত আলী (আ.) যুদ্ধক্ষেত্রে মহানবী (সা.)- এর যে রূপ বর্ণনা করেছেন তার স   এ কৌশলটি সংগতিশীল নয়। তিনি হযরত মুহাম্মদ সম্পর্কে বলেছেন, "যুদ্ধক্ষেত্রে যখনই যুদ্ধ ভয়াবহ রূপ লাভ করত আমরা মহানবীর পশ্চাতে আশ্রয় গ্রহণ করতাম। তখন কোন ব্যক্তিই

মহানবী (সা.) হতে শত্রুর নিকটবর্তী থাকত না।”[৬৭১] যে ব্যক্তির অবস্থাকে তাঁর প্রথম ছাত্র এভাবে বর্ণনা করেন তাঁর সম্পর্কে কিরূপে আমরা এ সম্ভাবনার কথা বলব যে, তিনি মুসলমানদের প্রথম যুদ্ধে রক্ষণাত্মক ও পলায়নের কৌশল গ্রহণ করেছিলেন।

তাই আমরা ধরে নিতে পারি, নেতৃত্ব মঞ্চটি নিরাপত্তার দৃষ্টিতে নয়, বরং নেতৃত্বের দৃষ্টিকোণ থেকে চিন্তা করেই প্রস্তুত করা হয়েছিল যাতে করে তিনি সমগ্র রণক্ষেত্রের ওপর দৃষ্টি রাখতে পারেন। কারণ যদি সমরনায়ক সমগ্র রণক্ষেত্রের ওপর নজর রাখতে না পারেন তাহলে তাঁর পক্ষে যুদ্ধকে সঠিকভাবে পরিচালনা করা সম্ভব নয়।

কুরাইশ গোত্রের কার্যক্রম

দ্বিতীয় হিজরীর রমযান মাসের সতের তারিখের সকালে কুরাইশগণ টিলার ওপর হতে বদরের সমতল প্রান্তরে নেমে আসে। যখন মহানবী (সা.) তাদেরকে টিলার ওপর হতে নিচে নামতে দেখলেন তখন আকাশের দিকে তাকিয়ে বললেন, "হে আল্লাহ্! আপনি জানেন কুরাইশরা অহংকার ও গর্বের সাথে আপনার দীনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে এসেছে, তারা আপনার রাসূলকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে। হে প্রভু! আমাকে সাহায্যের যে প্রতিশ্রুতি আপনি দিয়েছেন তা কার্যকরী করুন ও আমার শত্রুদের আজ ধ্বংস করুন।"

কুরাইশদের পরামর্শ সভা

কুরাইশরা বদর এলাকার এক প্রান্তে অবস্থান নিলেও মুসলমানদের সংখ্যা ও শক্তি সম্পর্কে অবহিত ছিল না। তাই মুসলমানদের সৈ সংখ্যা সম্পর্কে অবগত হওয়ার উদ্দেশ্যে কোন সমাবেশের লোকসংখ্যা নির্ণয়ে অভিজ্ঞ উমাইর ইবনে ওয়াহাব নামের এক সাহসী ব্যক্তিকে প্রেরণ করল। সে একটি অে আরোহণ করে মুসলমানদের সেনাছাউনীর চারিদিকে ঘুরে এসে জানাল তাদের সংখ্যা প্রায় তিনশ ’ । তবে সে এও বলল, আরো একবার ঘুরে দেখে আসা উত্তম, কেননা হতে পারে পেছনে অ কেউ লুকিয়ে আছে অথবা কোন সাহায্যকারী দল অবস্থান নিয়ে থাকতে পারে।

সে সমগ্র বদর প্রান্তরে একবার ভালোভাবে অনুসন্ধান চালিয়ে আতংকজনক খবর আনয়ন করল। সে বলল, “মুসলমানদের পেছনে কোন আশ্রয়স্থল নেই, কিন্তু তোমাদের জ মদীনা হতে আগত মৃত্যুর বার্তা বহনকারী উটসমূহকে আমি দেখেছি। ” অতঃপর বলল, “মুসলমানদের এক দলকে দেখলাম তাদের তরবারি ছাড়া আর কোন আশ্রয়স্থল নেই। তাদের প্রত্যেকে তোমাদের এক ব্যক্তিকে হত্যা না করা পর্যন্ত নিহত হবে না। যদি তারা তোমাদের হতে তাদের সমসংখ্যক ব্যক্তিকে হত্যা করে তবে তোমাদের জীবনের মূল্য কি? চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে ভেবে দেখ। ” [৫৭২]

ওয়াকেদী ও আল্লামা মাজলিসী তার বক্তব্যে নিম্নোক্ত কথাগুলোও ছিল বলে উল্লেখ করেছেন: “তোমরা কি লক্ষ্য করেছ তারা নীরব ও কোন কথা বলছে না, কিন্তু তাদের ইচ্ছাশক্তি ও দৃঢ়তা তাদের চেহারায় স্পষ্ট। তারা বিষাক্ত সাপের মতো জিহ্বাকে মুখের চারিদিকে আবর্তন করাচ্ছে ও ছোবল হানার জ প্রস্তুত হয়ে রয়েছে। ” [৫৭৩]

কুরাইশরা দু’দলে বিভক্ত

এই সাহসী বিচক্ষণ সৈনিকের কথা কুরাইশদের ওপর ব্যাপক প্রভাব ফেলল। আত ও ত্রাস সমগ্র সেনাদলকে আচ্ছন্ন করল। হাকিম ইবনে হাজাম উতবার নিকট গিয়ে বলল, “উতবা! তুমি কুরাইশদের নেতা। কুরাইশ তাদের বাণিজ্যপণ্য রক্ষার জ মক্কা থেকে এসেছিল। তাদের

বাণিজ্যপণ্য রক্ষা হয়েছে। তাদের অবস্থানও পূর্ণরূপে সুরক্ষিত। এ অবস্থায় হাদরামীর (হাজরামীর) হত্যা ও রক্তপণ এবং মুসলিমদের মাধ্যমে তার সম্পদ লু ন ব্যতীত আর কোন সমস্যা নেই। তাই তোমরা হাদরামীর রক্তপণ নিজেরাই আদায় করে মুহাম্মদের স যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া থেকে বিরত হও।" হাকিমের বক্তব্য উতবার ওপর আশ্চর্য প্রভাব ফেলল। সে দাঁড়িয়ে জনতার উদ্দেশে আকর্ষণীয় বক্তব্যে বলল, "হে লোকসকল! তোমরা মুহাম্মদের ব্যাপারটি আরবদের ওপর ছেড়ে দাও। যখন আরবরা তার আনীত ধর্মের মূলোৎপাটন করবে ও তার শক্তির ভিতকে উপড়ে ফেলবে তখন আমরাও তার হাত থেকে মুক্তি পাব। আর যদি মুহাম্মদ সফলও হয় সে আমাদের কোন ক্ষতি করবে না। কারণ আমরা আমাদের সর্বোচ্চ ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তার স যুদ্ধ না করে ফিরে যাব। উত্তম হলো আমরা যে পথে এসেছি সে পথে ফিরে যাই।"

হাকিম উতবার কথাটি আবু জাহলকে জানাল। সে সময় আবু জাহল যুদ্ধের বর্ম পরিধান করছিল। উতবার কথা শুনে সে খুবই রাগান্বিত হলো। সে এক ব্যক্তিকে হাদরামীর ভ্রাতা আমের হাদরামীর নিকট পাঠিয়ে জানাল, "যখন তুমি তোমার ভ্রাতার রক্ত ঝরতে দেখছ তখন তোমার স চুক্তিবদ্ধ উতবা জনতাকে তোমার ভাইয়ের রক্তের বদলা নিতে বিরত থাকার আহবান জানাচ্ছে। তাই কুরাইশদেরকে তোমার ভ্রাতার রক্তের বদলা নেয়ার যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে তা স্মরণ করিয়ে দাও ও তোমার ভ্রাতার মৃত্যুর জ মর্সিয়া পড়।"

আবু আমের তার মাথাকে অনাবৃত করে সাহায্যের আহবান জানিয়ে আর্তনাদ করে বলল, "হায় আমের! হায় আমের!"

আবু আমেরের আর্তনাদ ও মর্সিয়া কুরাইশদের ধমনীতে আত্মসম্মানবোধের শোনিতধারা প্রবাহিত করল। তারা যদ্ধের জ সংকল্পবদ্ধ হলো। উতবার আহবান তাদের জোশে স্তিমিত হয়ে গেল। এমনকি গোত্রপ্রীতি ও সম্মানবোধের এ সার্বিক অনুভূতি উতবাকেও প্রভাবিত করল। সেও উজ্জীবিত হয়ে যুদ্ধের পোশাক পরিধান করে যুদ্ধের জ প্রস্তুত হলো।[৫৭৪]

কখনো কখনো যে, ভিত্তিহীন উত্তেজনা ও অনুভূতি চিন্তা ও বুদ্ধিবৃত্তির আলোকে নির্বাপিত করে উজ্জ্বল ভবি তের আশাকে নস্যাৎ করে দেয় এটি তার একটি দৃষ্টান্ত। যে ব্যক্তি কিছুক্ষণ পূর্বেও

শান্তি ও সমঝোতাপূর্ণ সহাবস্থানের আহবান জানাচ্ছিল, সেই গোত্রপ্রীতির গোঁড়ামির অনুভূতিতে সাড়া দিয়ে যুদ্ধের ময়দানে অগ্রগামী হলো।

যে ঘটনা যুদ্ধকে অবশ্য াবী করে তুলল

আসওয়াদ মাখযুমী একজন রুক্ষ্ম মেজাজের লোক ছিল। তার দৃষ্টি যখন মুসলমানদের নির্মিত হাউজের (চৌবাচ্চা) ওপর পড়ল সে তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত নিল এ হাউজ থেকে পানি পান করার অথবা সেটি নষ্ট করার। এজ   সে প্রাণ বিসর্জন দিতেও কু ি ত ছিল না। তাই মুশরিকদের ছাউনি থেকে বেরিয়ে সে হাউজের নিকটে এল। সে সময় ইসলামের মহান সৈনিক হযরত হামযাহ্ (রা.) সেখানে প্রহরারত ছিলেন। সে পানির নিকট পৌঁছে তাঁর স যুদ্ধে রত হলে তিনি তরবারির এক আঘাতে তার এক পা বিচ্ছিন্ন করলেন। এ অবস্থায়ই সে তার উদ্দেশ্য চরিতার্থ করতে পানির দিকে অগ্রসর হলে হযরত হামযাহ্ সেখানে তাকে হত্যা করলেন।

এ ঘটনাটি যুদ্ধকে অবশ্যম্ভাবী করে তুলল। কারণ কোন দলকে যুদ্ধে উদ্দীপিত করার জ   হত্যা অপেক্ষা উত্তম কোন ইস্যু থাকতে পারে না। কুরাইশদের যে দলটির অন্তরে বিদ্বেষের আগুন লছিল ও যুদ্ধের জ   বাহানা খুঁজছিল এজ   উত্তম বাহানা হাতে পেল। এরূপ অস্ত্র হাতে পেয়ে তারা যুদ্ধকে অবশ্যম্ভাবী করে তুলল।[৫৭৫]

মল্লযুদ্ধের শুরু

আরবের প্রাচীন যুদ্ধরীতি ছিল মল্লযুদ্ধের মাধ্যমে শুরু হওয়া। অতঃপর সম্মিলিত যুদ্ধ শুরু হতো। আসওয়াদ মাখযুমী নিহত হওয়ার পর কুরাইশের তিন প্রসিদ্ধ বীর সামনে এগিয়ে এসে মুসলমানদের উদ্দেশে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিল। এরা তিনজন হলো রাবীয়ার পুত্র উতবা ও শাইবা এবং উতবার পুত্র ওয়ালিদ। সুসজ্জিত এ তিন বীর। এরা যুদ্ধের ময়দানের মাঝে অ র পদশব্দ তুলে প্রতিদ্বন্দ্বী আহবান করল। আনসারদের মধ্য হতে তিন সাহসী যুবক আওফ, সাউয ও আবদুল্লাহ্ ইবনে রাওয়াহা মুসলমানদের সৈ ছত্র হতে বেরিয়ে এসে চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করলেন। কিন্তু উতবা যেহেতু জানত এরা মদীনার আনসার সেহেতু তাদের উদ্দেশে বলল, "তোমাদের স আমাদের কোন কাজ নেই।"

অতঃপর এক ব্যক্তি চিৎকার করে বলল, "হে মুহাম্মদ! আমাদের সমমর্যাদার ও সমগোত্রীয় কোন ব্যক্তিকে প্রেরণ কর।" রাসূল (সা.) উবাইদাহ্ ইবনে হারেস ইবনে আবদুল মুত্তালিব, হামযাহ্ এবং আলীকে সামনে এগিয়ে আসার নির্দেশ দিলেন। এ তিন সাহসী বীর নিজ মুখমণ্ডল আবৃত করে সামনে এসে দাঁড়ালেন এবং নিজ নিজ পরিচয় দান করলেন। উতবা এ তিন ব্যক্তিকে প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে গ্রহণ করে বলল, "তোমরা আমাদের সমকক্ষ।"

কেউ কেউ বলেছেন, এ মল্লযুদ্ধে প্রত্যেকে তাঁর সমবয়সীর স যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিলেন। সবচেয়ে তরুণ আলী (আ.) মুয়াবিয়ার মামা ওয়ালিদের স , মধ্যবয়সী হামযাহ্ মুয়াবিয়ার নানা উতবার স এবং প্রৌঢ় উবাইদাহ্ শাইবার স দ্বন্দ্বযুদ্ধে অবতীর্ণ হন। অবশ্য ইবনে হিশাম শাইবাকে হযরত হামযার এবং উতবাকে হযরত উবাইদার প্রতিদ্বন্দ্বী বলেছেন। এখন আমরা দেখব কোন্ মতটি সঠিক। দু'টি বিষয়কে বিশ্লেষণ করলে সত্য আমাদের নিকট স্পষ্ট হবে।

প্রথমত ঐতিহাসিকগণ উল্লেখ করেছেন, আলী ও হামযাহ্ তাঁদের প্রতিদ্বন্দ্বীকে প্রথম আক্রমণেই পরাস্ত করতে সক্ষম হন। তাঁরা তাঁদের প্রতিদ্বন্দ্বীকে হত্যার পরই উবাইদার সাহায্যে এগিয়ে যান ও তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীকে হত্যা করেন।[৫৭৬]

দ্বিতীয়ত আমীরুল মুমিনীন আলী (আ.) মুয়াবিয়ার প্রতি প্রেরিত তাঁর পত্রে বলেছেন,

و عندي السّيف الّذي اعضضته بجدّك و خالك و أخيك في مقام واحد

"আমার নিকট সেই তরবারি রয়েছে যার দ্বারা তোমার নানা (হিন্দার পিতা উতবা), মামা (ওয়ালিদ ইবনে উতবা) এবং ভ্রাতাকে (হানযালা ইবনে আবি সুফিয়ান)- কে হত্যা করেছি। আমি এখনও সেই রূপ শক্তির অধিকারী।" ৫৭৭

এ পত্র হতে স্পষ্ট যে, হযরত আলী (আ.) মুয়াবিয়ার নানা উতবার হত্যায় অংশগ্রহণ করেছেন। অ দিকে আমরা জানি হযরত আলী ও হামযাহ্ তাঁদের প্রতিদ্বন্দ্বীকে কোন প্রতি- আক্রমণের সুযোগ না দিয়েই হত্যা করেছিলেন।

যদি উতবা হযরত হামযার প্রতিদ্বন্দ্বী হতো তবে হযরত আলী বলতেন না, 'আমি তরবারির আঘাতে তোমার নানাকে হত্যা করেছি'। সুতরাং স্পষ্ট যে, হযরত হামযার প্রতিদ্বন্দ্বী শাইবা ছিল এবং হযরত উবাইদার প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল উতবা। তাই হযরত আলী ও হামযাহ্ স্বীয় প্রতিদ্বন্দ্বীকে হত্যার পর উতবাকে হত্যায় অংশ নিয়েছিলেন।

সম্মিলিত আক্রমণ শুরু হলো

কুরাইশদের প্রসিদ্ধ যোদ্ধারা পরাস্ত হলে সম্মিলিত যুদ্ধ শুরু হলো। মহানবী (সা.) তাঁর নেতৃত্বের স্থান হতে নির্দেশ দিলেন মুসলিম যোদ্ধারা যেন সম্মিলিত যুদ্ধ শুরুর পূর্বে মুশরিকদের অগ্রাভিযান প্রতিরোধ করতে শত্রুদের উদ্দেশে তীর নিক্ষেপ করে।

অতঃপর নেতৃত্ব মঞ্চ হতে নিচে নেমে এসে সৈ দলকে বি স্ত করলেন। এ সময় সাওয়াদ ইবনে আজিয়া সেনাসারি হতে এগিয়ে এলে মহানবী (সা.) তাঁর ছড়ি দিয়ে তাঁর পেটে মৃদু আঘাত করলেন ও তাঁকে পিছিয়ে যাওয়ার আদেশ দিলেন।[৫৭৮] সাওয়াদ রাসূলের উদ্দেশে বললেন, "আপনি অ ায়ভাবে আমাকে আঘাত করেছেন, আমি এর কিসাস চাই।" মহানবী (সা.) মুহূর্ত বিলম্ব না করে স্বীয় জামা উঠিয়ে প্রতিশোধ নিতে বললেন। সৈ দল আশ্চর্য হয়ে মহানবীর দিকে তাকিয়ে রইলেন। সাওয়াদ তাঁর পবিত্র বুকে চুম্বন করলেন এবং ঘাড়ে হাত রেখে বললেন, "আমার শেষ জীবন পর্যন্ত আপনার বুকে চুম্বন করতে চাই।"

অতঃপর মহানবী (সা.) তাঁর নেতৃত্ব মঞ্চের স্থানে ফিরে এসে পূর্ণ ঈমানসহ মহান আল্লাহর উদ্দেশে বললেন, "হে প্রভু! যদি এ দলটি আজকে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় তবে পৃথিবীর বুকে আপনার ইবাদাত করার মতো কেউ থাকবে না।"[৫৭৯]

সম্মিলিত আক্রমণের ঘটনাটি বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যসহকারে ইতিহাস গ্রন্থসমূহে বর্ণিত হয়েছে। তাতে এ বিষয়টি নিশ্চিত যে, মহানবী (সা.) নেতৃত্ব মঞ্চ হতে অনেক বারই নিচে নেমে এসেছেন এবং মুসলমানদেরকে আল্লাহর পথে যুদ্ধের জ উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করেছেন। একবার তিনি মুসলমানদের উদ্দেশে উচ্চৈঃস্বরে বলেছেন,

و الذي نفس محمّد بيده لا يقاتلهم اليوم رجل فيقتل صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر إلّا ادخله الله الجنة

"সেই আল্লাহর শপথ, যার হাতে আমার (মুহাম্মদের) প্রাণ নিবদ্ধ, আজকের দিনে যে ব্যক্তি ধৈর্যের সাথে আল্লাহর জ যুদ্ধ করে নিহত হবে, আল্লাহ্ তাকে বেহেশতে প্রবেশ করাবেন।"

সমর নায়কের এরূপ বক্তব্যে সৈ রা কেউ কেউ এতটা অনুপ্রাণিত হলেন যে, ত শহীদ হওয়ার আকাঙ্ক্ষায় স্বীয় বর্ম খুলে রেখে যুদ্ধে লিপ্ত হলেন। উমাইর ইবনে হিমাম রাসূল (সা.)- কে জিজ্ঞাসা

করলেন, "আমার নিকট থেকে বেহেশতের দূরত্ব কতটুকু?" রাসূল বললেন, "কাফিরদের নেতাদের সংে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার পরিমাণ।" তাঁর হাতে কয়েক টুকরা খেজুর ছিল যা তিনি দূরে নিক্ষেপ করলেন এবং যুদ্ধে লিপ্ত হলেন। অতঃপর মহানবী (সা.) এক মুঠো মাটি নিয়ে কাফিরদের উদ্দেশে নিক্ষেপ করে বললেন, "তোমাদের মুখমণ্ডলসমূহ বিকৃত হোক!"[৫৮০] অতঃপর সম্মিলিত আক্রমণের নির্দেশ দিলেন। কিছুক্ষণের মধ্যে মুসলমানদের শিবিরে জয়ের আভাস লক্ষ্য করা গেল। শত্রুরা সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত হয়ে পালাতে শুরু করল। যেহেতু মুসলিম সেনারা ঈমানের বলে বলীয়ান ছিলেন এবং তাঁরা জানতেন হত্যা করা এবং নিহত হওয়া উভয়ই তাঁদের জ কল্যাণ বয়ে আনবে তাই কোন কিছুতেই তাঁরা ভীত ছিলেন না এবং কোন কিছুই তাঁদের অগ্রযাত্রাকে রহিত করতে পারছিল না।

অধিকারসমূহ রক্ষা

দু'ধরনের ব্যক্তির অধিকার রক্ষার প্রতি দৃষ্টি দেয়া প্রয়োজন ছিল; তাদের একদল হলো সেই সমস্ত ব্যক্তি যারা মক্কায় অবস্থানকালীন সময় মুসলমানদের প্রতি সদাচরণ করেছিল ও পৃষ্ঠপোষকতা দান করেছিল, যেমন আবুল বাখতারী- যে মুসলমানদের ওপর আরোপিত অবরোধ তুলে নেয়ার ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা রেখেছিল। অপর দল হলো সেই সকল ব্যক্তি যারা ইসলাম ও মহানবী (সা.)-এর প্রতি অন্তর হতে ভালোবাসা প্রদর্শন করত এবং তাঁদের কল্যাণাকাঙ্ক্ষী ছিল, কিন্তু কুরাইশদের সাথে রণা নে আসতে বাধ্য হয়েছিল। যেমন রাসূলের চাচা আব্বাসের মতো বনি হাশিমের কিছু সংখ্যক ব্যক্তি।

যেহেতু ইসলামের নবী রহমত ও অনুগ্রহের আধার ছিলেন সেহেতু এ দু'ধরনের ব্যক্তির রক্ত ঝরানো হতে নিবৃত থাকতে বিশেষভাবে নির্দেশ দিয়েছিলেন।

উমাইয়্যা ইবনে খালাফকে হত্যা

আবদুর রহমান ইবনে আওফ কর্তৃক উমাইয়্যা ইবনে খালাফ এবং তার পুত্র বন্দী হয়েছিল। আবদুর রহমান ইবনে আওফ ও তার মধ্যে পূর্ব হতেই বেশ বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। তাই তিনি চেয়েছিলেন উমাইয়্যাকে জীবিত অবস্থায় যুদ্ধবন্দী হিসাবে বাঁচিয়ে পরবর্তীতে তাকে মুক্তি দিয়ে সওয়াব অর্জনের।

মক্কায় থাকাকালীন আবিসিনিয়ার হযরত বেলাল উমাইয়্যার ক্রীতদাস ছিলেন। সে সময়ই তিনি মুসলমান হয়েছিলেন। এ কারণে সে হযরত বেলালকে চরম নিপীড়ন করত। সে প্রায়শই তাঁকে উত্তপ্ত পাথরের ওপর শুইয়ে বুকে ভারী পাথর চাপা দিত। এভাবে নির্যাতনের মাধ্যমে সে চাইত তাঁকে ইসলাম হতে পূর্বের ধর্মে ফিরিয়ে আনতে। কিন্তু এত নির্যাতন সত্ত্বেও হযরত বেলাল বলতেন, "আহাদ, আহাদ।" অর্থাৎ আল্লাহ্ এক ও অদ্বিতীয়। এ সময় একজন মুসলমান তাঁকে ক্রয় করে মুক্ত করে দেন।

বদর যুদ্ধের সময় হযরত বেলাল লক্ষ্য করলেন আবদুর রহমান ইবনে আওফ তার পক্ষ নিয়ে তাকে বাঁচানোর প্রচেষ্টা নিয়েছে। তাই তিনি চিৎকার করে মুসলমানদের উদ্দেশে বললেন, "হে আল্লাহর সাহায্যকারী! উমাইয়্যা ইবনে খালাফ কাফিরদের নেতা। তাকে জীবিত ছেড়ে দিও না।"[৫৮১] মুসলমানরা চারিদিক থেকে উমাইয়্যা ইবনে খালাফ এবং তার পুত্রকে ঘিরে ফেলল এবং তাদের উভয়কে হত্যা করল।

যদিও মহানবী (সা.) অর্থনৈতিক বয়কটের সময়ে সাহায্য করার কারণে নির্দেশ দিয়েছিলেন আবুল বাখতারিকে যেন হত্যা না করা হয়, [৫৮২] কিন্তু মাযযার নামক এক ব্যক্তি তাকে বন্দি করে রাসূলের নিকট নিয়ে আসার সময় সে দুর্ভাগ্যক্রমে নিহত হয়।

জানমালের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ

এ যুদ্ধে ১৪ জন মুসলমান ও ৭০ জন কাফির নিহত হয় এবং ৭০ জন মুসলমানদের হাতে বন্দী হয়। বন্দীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল নাদার (নাজার) ইবনে হারেস, উকবা ইবনে আবি মুয়ীত, আবু গাররাহ্, সুহাইল ইবনে আমর, আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব এবং আবুল আস।[৫৮৩]

বদর যুদ্ধের শহীদদেরকে রণক্ষেত্রের এক প্রান্তে সমাধিস্থ করা হয়েছিল যা এখনও বিদ্যমান। রাসূল (সা.) কুরাইশদের মৃতদেহগুলোকে একস্থানে জমায়েত করে একটি কূপে নিক্ষেপ করার নির্দেশ দিলেন। যখন ওকবার মৃতদেহ টেনে- হিঁচড়ে কূপের দিকের নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল তখন তার পুত্র আবু যাইফা তা লক্ষ্য করে বিমর্ষ হয়ে পড়লেন। মহানবী (সা.) তা বুঝতে পেরে বললেন, "তোমার মনে কোন প্রকার সন্দেহের উদ্রেক হয়েছে কি?" তিনি বললেন, "না, তবে আমি আমার পিতাকে জ্ঞানী, ধৈর্যশীল ও সম্মানার্হ ব্যক্তি হিসাবে জানতাম এবং সব সময় ভাবতাম এ বিষয়গুলো তাকে ইসলামের দিকে পরিচালিত করবে। কিন্তু এখন দেখতে পাচ্ছি আমার ধারণা ভুল ছিল। "

তোমরা তাদের থেকে অধিকতর শ্রবণকারী নও

বদরের যুদ্ধের অবসান ঘটল এবং কুরাইশরা চরমভাবে পরাস্ত হলো। তাদের মধ্যে ৭০ জন নিহত ও ৭০ জন বন্দী হয়েছিল, বাকীরা রণক্ষেত্র হতে পালিয়ে গিয়েছিল। তাদের মৃতদেহগুলোকে রাসূলের নির্দেশে একটি বড় কূপে নিক্ষেপ করা হয়েছিল। যখন তাদের মৃতদেহগুলোকে কূপে নিক্ষেপ করা হলো মহানবী (সা.) একে একে তাদের নাম ধরে ডেকে বললেন, "হে উতবা, শাইবা, উমাইর, আবু জাহল... তোমরা কি তোমাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তাকে সত্য হিসাবে পেয়েছ? (জেনে রাখ) আমি আমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে প্রাপ্ত প্রতিশ্রুতি সত্য হিসাবে পেয়েছি। " এ সময় মুসলমানদের মধ্য থেকে কেউ কেউ রাসূলকে প্রশ্ন করলেন, "যারা মৃত্যুবরণ করেছে তাদেরকে লক্ষ্য করে কি আপনি

কথা বলছেন?” রাসূল (সা.) বললেন, “তোমরা তাদের থেকে অধিকতর শ্রবণকারী নও, কিন্তু তাদের উত্তর দানের ক্ষমতা নেই। ”

ইবনে হিশাম বর্ণনা করেছেন, এ সময় রাসূল (সা.) তাদের (মৃতদের) উদ্দেশে আরো বলেন, “কত নিকৃষ্ট আত্মীয় (ও প্রতিবেশী) ছিলে তোমরা! তোমরা আমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছ, কিন্তু অ রা আমাকে সত্য প্রতিপন্ন করেছে। তোমরা আমাকে আমার জন্মভূমি হতে বিতাড়িত করেছ, অ রা আমাকে আশ্রয় দিয়েছে। তোমরা আমার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছ, অ রা আমাকে সাহায্য করেছে। তোমরা কি প্রতিপালকের পক্ষ হতে আগত প্রতিশ্রুতিকে সত্য হিসাবে পেয়েছ?”

যে কবিতাটিতে স্থায়িত্বের রং লেগেছে

উপরিউক্ত ঘটনাটি একটি ঐতিহাসিক সত্য। শিয়া- সুন্নী নির্বিশেষে সকল ঐতিহাসিক এটি বর্ণনা করেছেন। আমরা নিচে এরূপ কিছু ঐতিহাসিক সূত্রের প্রতি ইি ত করব।

রাসূল (সা.)- এর সাহাবী সমকালীন প্রসিদ্ধ কবি হা সান ইবনে সাবিত ইসলামের বিভিন্ন ঘটনাপ্রবাহ নিয়ে কবিতা রচনা করেছেন। তিনি কবিতা রচনার মাধ্যমে ইসলাম ও মুসলমানদের সাহায্য করতেন (তাঁর কবিতা তাদের উজ্জীবিত করত)। আনন্দের বিষয় হলো তাঁর কবিতার গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। বদরের যুদ্ধ সম্পর্কে তাঁর কবিতা রয়েছে যার কয়েকটি ছত্রে এ সত্য ঘটনাটি বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেছেন,

ينـــــــــاديهم رســـــــــول الله لمـــــــــا   قـــــــــذفناهم كبـــــــاب في القليـــــــب

أ لم تجـــــدوا كلامـــــي كـــــان حقـــــا   وامـــــــر الله يأخـــــــذ بـــــــالقلوب

فمـــــا نطقـــــوا و لـــــو نطقـــــوا لقـــــالوا   صـــــدقت و كنـــــت ذا رأى مُصـــــيب

" যখন তাদের কূপের মধ্যে নিক্ষেপ করলাম,
রাসূলুল্লাহ্ (সা.) তাদেরকে লক্ষ্য করে বললেন : আমার কথাকে কি তোমরা সত্য পাও নি?
আল্লাহর বাণী অন্তঃকরণসমূহকে আবিষ্ট করে,
কিন্তু তারা কথা বলে নি।
যদি তারা কথা বলতে পারত অবশ্যই বলত :
তুমি সত্য বলেছ, তোমার মত দৃঢ় ও প্রতিষ্ঠিত। "

মহানবী (সা.)- এর কথিত এ বাক্যটি ما أنتم بأسمع منهم 'তোমরা তাদের থেকে অধিকতর শ্রবণকারী নও' থেকে স্পষ্ট অ কোন বাক্য হতে পারে কি? এ বাক্যটি থেকে বোঝা যায় মহানবী (সা.) তাদের প্রত্যেককে একে একে নাম ধরে ডেকে তাদের অন্তঃসত্তার স কথা বলেছেন।

এ ঐতিহাসিক সত্যকে কোন ভ্রান্ত বি াসের ভিত্তিতে অস্বীকার করার অধিকার কোন মুসলমানের নেই। কোন কোন ভ্রান্ত ধারণায় বি াসী ব্যক্তিরা বলে থাকে যেহেতু এ ঘটনাটি আমাদের বুদ্ধিবৃত্তির ও বস্তুগত জ্ঞানের সে সংগতিশীল নয় সেহেতু এটি সঠিক নয়। আমরা এখানে এ সম্পর্কে বেশ কিছু বর্ণনার উৎসকে নিম্নে উল্লেখ করছি। আরবী ভাষার সাথে সুপরিচিত পাঠকবর্গ মহানবীর বক্তব্য থেকে সুস্পষ্টরূপে বিষয়টির সত্যতা উপলব্ধি করতে পারবেন।[৫৮৪]

বদর যুদ্ধের পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহ

মুসলিম ঐতিহাসিকদের অধিকাংশের বর্ণনা মতে বদরের দিন মল্ল ও সম্মিলিত যুদ্ধ যোহর পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। কুরাইশদের পলায়ন ও কিছু সংখ্যকের বন্দী হওয়ার মাধ্যমে দুপুরের মধ্যেই যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটে। মহানবী বদরের শহীদদের দাফন সম্পন্ন করার পর সেখানে আসরের নামায পড়েন এবং সন্ধ্যার পূর্বেই বদর প্রান্তর ত্যাগ করেন। এ সময় প্রথমবারের মতো তাঁর স ীদের মধ্যে গনীমতের সম্পদ বণ্টনের মতপার্থক্য লক্ষ্য করলেন। তাঁদের প্রত্যেক দল নিজেদেরকে গনীমত লাভের বিষয়ে অ দের হতে অধিক হকদার মনে করতে লাগলেন। মহানবীর নিরাপত্তায় নিয়োজিত সৈ রা যুক্তি প্রদর্শন করলেন, যেহেতু আমরা মহানবীর নিরাপত্তায় নিয়োজিত ছিলাম তাই গনীমত লাভের অধিকার অ দের চেয়ে আমাদের অধিক। যাঁরা গনীমত সংগ্রহের কাজে নিয়োজিত ছিলেন তাঁরাও নিজ যুক্তিতে অধিক দাবি করলেন। যাঁরা শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত শত্রুকে ধাওয়া করেছিলেন এবং অ দের গনীমত সংগ্রহের সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছিলেন তাঁরাও এ যুক্তিতে অধিক পাওয়ার দাবি জানালেন।

কোন একটি সেনাদলের জ অনৈক্য ও বিভেদ অপেক্ষা ক্ষতিকর কোন বিষয় নেই। মহানবী (সা.) সৈ দের বস্তুগত আকাঙ্ক্ষাকে স্তিমিত করার জ তাৎক্ষণিকভাবে গনীমত বণ্টন করা থেকে বিরত থেকে সমগ্র গনীমত আবদুল্লাহ্ ইবনে কা'ব নামক এক সাহবীর হাতে সমর্পণ করে কয়েক ব্যক্তিকে তা বহন ও সংরক্ষণে তাঁকে সাহায্য করার নির্দেশ দিলেন। তিনি এ সম্পদ বণ্টনের সঠিক প্রক্রিয়া অবলম্বনের জ সময় নিলেন। ইনসাফ ও ায়ের দাবি অনুযায়ী এ গনীমতে সকল সৈ র অধিকার ছিল। কারণ সকল সৈনিক এ যুদ্ধে ভূমিকা রেখেছিলেন এবং সৈ দলের এক অংশের সহযোগিতা ছাড়া অ অংশ সফলতা লাভ করতে পারে না। তাই রাসূল (সা.) মদীনায় ফেরার পথে গনীমতকে সকলের মধ্যে সমভাবে বণ্টন করলেন।

রাসূল (সা.) কর্তৃক সমভাবে গনীমত বণ্টনের বিষয়টিতে সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস অসন্তুষ্ট হলে তিনি রাসূলকে বললেন, "সম্মানিত বনি যোহরা গোত্রের আমাকে আপনি ইয়াসরিবের কৃষক, ফল

বাগানের দেখাশোনাকারী ও পানি সেচনকারীদের সমকক্ষ হিসাবে দেখছেন?” তাঁর এ কথায় রাসূল (সা.) খুবই অসন্তুষ্ট হয়ে বললেন, “আমার এ যুদ্ধের লক্ষ্য অসহায় ও নিরাশ্রয়দের সাহায্য করা এবং অত্যাচারীদের নির্যাতন থেকে তাদের রক্ষা। আমি এজ প্রেরিত হয়েছি যে, সকল বৈষম্য ও অযাচিত শ্রেষ্ঠত্বের অবসান ঘটাব এবং মানুষের মাঝে সাম্য ও সমঅধিকার প্রতিষ্ঠা করব।”

গনীমতের এক- পঞ্চমাংশ (কোরআনের নির্দেশমতে[৫৮৫]) আল্লাহ্, তাঁর রাসূল এবং তাঁর বংশের ইয়াতিম, নিরাশ্রয়, মুসাফির ও বঞ্চিতদের জ নির্ধারিত। কিন্তু মহানবী (সা.) এ যুদ্ধলব্ধ গনীমতের এ অংশটুকুও সাধারণ সৈনিকদের মধ্যে বিতরণ করে দিলেন। এমনও হতে পারে যে, কোরআনের এ আয়াতটি তখনও অবতীর্ণ হয় নি অথবা অবতীর্ণ হয়েছিল, কিন্তু রাসূল তাঁর নিজ অধিকার বলে সৈ দের সন্তুষ্ট করার লক্ষ্যে এ অংশ গ্রহণ করা থেকে বিরত ছিলেন।

পথে দু’বন্দীর নিহত হওয়া

মদীনায় ফেরার পথে দু’টি স্থানে রাসূলের নির্দেশে দু’বন্দীকে হত্যা করা হয়। সাফরা নামক উপত্যকায় নাদর ইবনে হারেস যে ইসলামের কঠিন শত্রু ছিল তার প্রাণদণ্ড দেয়া হয় এবং ইরকুস্ যারিয়া নামক স্থানে উকবা ইবনে আবি মুয়ীতের প্রাণদণ্ড কার্যকর করা হয়।

এখানে প্রশ্ন আসতে পারে, বন্দীদের বিষয়ে ইসলামের নির্দেশ হলো তাদেরকে দাস হিসাবে রাখা হবে অথবা দাস হিসাবে বিক্রি করা হবে। কিন্তু কেন এ দু’জনের ব্যাপারে এরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হলো? যে নবী বদরের অ া বন্দীর বিষয়ে মুসলমানদের বিশেষভাবে সদাচরণের নির্দেশ দিলেন কেন এ দু’জনের ক্ষেত্রে ব্যতিক্রমধর্মী সিদ্ধান্ত দিলেন?

বদরের যুদ্ধে কুরাইশদের পতাকাধারী আবু আযিয তার বন্দী অবস্থার কথা এভাবে বর্ণনা করেছে। তার ভাষায়, “যে দিন থেকে রাসূল বন্দীদের প্রতি বিশেষভাবে সদাচরণের নির্দেশ দিয়েছিলেন সে দিন থেকে মুসলমানদের নিকট আমরা খুবই সম্মানিত ছিলাম। তারা আমাদের পরিতৃপ্ত না করা পর্যন্ত নিজেরা খাদ্য গ্রহণ করত না।”

তাই বলা যায় এ দু'ব্যক্তিকে হত্যার পেছনে ইসলামের সার্বিক কল্যাণ নিহিত ছিল- প্রতিশোধের কোন স্পৃহা ছিল না। কারণ তারা ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারীদের হোতা ছিল। তারাই বিভিন্ন গোত্রকে যুদ্ধের জ প্ররোচিত করেছিল। রাসূল (সা.) নিশ্চিত ছিলেন যদি এদেরকে ছেড়ে দেয়া হয় তাহলে তারা নতুন করে ষড়যন্ত্র ও পরিকল্পনা করবে।

মদীনায় মহানবী (সা.)- এর সুসংবাদ প্রেরণ

রাসূল (সা.) আবদুল্লাহ্ ইবনে রাওয়াহা ও যায়েদ ইবনে হারেসাকে দূত হিসাবে মদীনায় মুসলমানদের বিজয়ের বার্তা বয়ে নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন। সে সাথে কাফিরদের পরাজয় এবং উতবা, শাইবা, আবু জাহল, যামআ, উমাইয়্যা, নাবিয়াহ্, মানবা ও আবুল বাখতারীসহ বড় বড় কাফির নেতার নিহত হওয়ার বার্তাও তাঁরা পৌঁছালেন। রাসূলের প্রেরিত দূতরা যখন মদীনায় পৌঁছেন তখন মুসলমানরা রাসূলের ক া[৫৮৬] ও হযরত উসমানের স্ত্রীর দাফনের কাজে নিয়োজিত ছিলেন। ফলে যুদ্ধের বিজয়ের সে রাসূলের ক াবিয়োগের ঘটনা মিশ্রিত হয়ে গেল।

যা হোক, বদর যুদ্ধে মুসলমানদের বিজয়ের ঘটনাটি মক্কার মুশরিক এবং মদীনার ইয়া দী ও মুনাফিকদের মনে আতংক ও ভীতির সঞ্চার করল। কারণ তারা কখনই বি াস করতে পারে নি এরূপ বিজয় মুসলমানদের ভাগ্যে ঘটবে। তাই প্রচার করতে চাইল এ খবর মিথ্যা। কিন্তু মুসলমানদের বিজয়ী দল যখন বন্দীদের সে নিয়ে মদীনায় প্রবেশ করল তখন সকল সংশয় ও মিথ্যার অপনোদন ঘটল।[৫৮৭]

মক্কাবাসীদের নিকট তাদের নেতাদের নিহত হওয়ার সংবাদ

হাইসামানে খাজায়ী প্রথম ব্যক্তি হিসাবে মক্কায় প্রবেশ করে বদরের রক্তক্ষয়ী ঘটনা সম্পর্কে (যাতে তাদের গোত্রপ্রধানরা নিহত হয়েছিল) মক্কাবাসীদের অবহিত করল। আবু রাফে যিনি হযরত আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিবের দাস ছিলেন ও পরবর্তীতে হযরত মুহাম্মদ (সা.) ও হযরত আলী (আ.)- এর প্রিয়ভাজন হিসাবে পরিণত হয়েছিলেন তিনি বর্ণনা করেছেন, “সে সময় ইসলামের আলোয় হযরত আব্বাসের গৃহ আলোকিত হয়েছিল। হযরত আব্বাস, তাঁর স্ত্রী উম্মুল ফযল ও আমি ইসলাম গ্রহণ করেছিলাম। কিন্তু ভয়ে আমাদের ঈমানকে গোপন রেখেছিলাম। যখন ইসলামের শত্রুদের মৃত্যুর খবর মক্কায় পৌঁছল আমরা অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছিলাম। কিন্তু কুরাইশ ও তাদের সমর্থকরা খুবই ব্যথিত হয়েছিল। আবু লাহাব নিজে যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করলেও অ এক ব্যক্তিকে তার স্থলে যুদ্ধ করার জ ভাড়া করেছিল। ঐ মুহূর্তে সে কাবার নিকটবর্তী জমজম কূপের নিকটে বসেছিল। এ সময় খবর পৌঁছল আবু সুফিয়ান ইবনে হারেস (হারব) মক্কায় পৌঁছেছে। সে আবু সুফিয়ানকে খবর পাঠাল যত ত সম্ভব যেন তার স সাক্ষাৎ করে। সে এসে আবু লাহাবের পাশে বসল এবং বদরের ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ দিল। ঘটনার বিবরণ তার ওপর বজ্রপাতের মতো আপতিত হলো এবং সে ভয়ে শিহরিত হলো। সে দিনই সে রে আক্রান্ত হলো এবং বিশেষ কষ্টকর রোগে আক্রান্ত হয়ে এক সপ্তাহ পর মৃত্যুবরণ করল।

রাসূল (সা.)- এর চাচা আব্বাসের বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণের বিষয়টি ইতিহাসের একটি জটিল প্রশ্ন। তিনি এ যুদ্ধে মুসলমানদের হাতে বন্দী হয়েছিলেন। তিনি এ যুদ্ধে মুশরিকদের স বদরে এসেছিলেন, অ দিকে তিনিই সে ব্যক্তি যিনি আকাবার শপথ গ্রহণের দিন মদীনার আনসারদের আহবান জানিয়েছিলেন রাসূলকে সাহায্য করার জ । এ প্রশ্নের সমাধান দিয়েছে তাঁর দাস আবু রাফের বক্তব্য। আবু রাফে বলেছেন, “তিনিও তাঁর ভ্রাতা আবু তালিবের ায় একত্ববাদী ধর্ম ইসলাম ও তার নবীর প্রতি ঈমান এনেছিলেন, কিন্তু সে সময়ের দাবি অনুযায়ী তিনি তাঁর ঈমানকে গোপন রেখেছিলেন এবং এভাবে মহানবীকে সাহায্য করতে প্রয়াস পেয়েছিলেন। তিনি

কুরাইশদের গোপন ষড়যন্ত্র সম্পর্কে রাসূলকে অবহিত করতেন। যেমন উ দের যুদ্ধে কুরাইশদের পরিকল্পনা সম্পর্কে তিনি পূর্বেই রাসূলকে অবহিত করেছিলেন। ”

যা হোক কুরাইশদের সত্তর ব্যক্তির মৃত্যুর খবরটি সমগ্র মক্কাবাসীকে শোকাভিভূত করল এবং তাদের সকল সুখ ও আনন্দকে কেড়ে নিল।[৫৮৮]

ক্রন্দন ও শোকগাথা পাঠ নিষিদ্ধ হলো

আবু সুফিয়ান মক্কাবাসীদের ক্রোধকে উজ্জীবিত রাখা ও তাদের বীরদের রক্তের প্রতিশোধ গ্রহণের স্পৃহাকে জাগরিত করার লক্ষ্যে ক্রন্দন ও শোকগাথা পাঠ নিষিদ্ধ ঘোষণা করল ও কবিতা পাঠের আসর হতে নিবৃত হওয়ার নির্দেশ দিল। কারণ ক্রন্দন ও শোকগাথা পাঠ প্রতিশোধ স্পৃহাকে স্তিমিত করে এবং শত্রুর মনোবলকে বাড়িয়ে দেয়। সে মক্কাবাসীদের জ ফরমান জারি করল যে, মুসলমানদের কাছ থেকে কুরাইশরা রক্তের প্রতিশোধ গ্রহণ না করা পর্যন্ত যেন স্ত্রীদের সে মিলিত না হয়।

আসওয়াদ মুত্তালিব তার তিন পুত্রকে হারানোর ফলে ক্রোধ ও প্রতিশোধের আগুনে দগ্ধ হচ্ছিল। হঠাৎ একদিন এক নারীকে ক্রন্দন ও আহাজারি করতে শুনে মৃতদের জ ক্রন্দনের অনুমতি দেয়া হয়েছে মনে করে খুশী হলো। বিষয়টি নিশ্চিত হওয়ার জ সে এক ব্যক্তিকে ঐ নারীর ক্রন্দনের কারণ জানার জ প্রেরণ করল। ঐ ব্যক্তি খবর আনল, সে নারী তার উট হারিয়ে যাওয়ার ফলে ক্রন্দন করছে। এজ ক্রন্দন করা আবু সুফিয়ানের আইনে নিষিদ্ধ ছিল না। এ কথা শুনে সে এতটা প্রভাবিত হলো যে, দু'লাইন কবিতা রচনা করল।

أ تبكـــــــي أن تضـــــــل لهـــــا بعـــــير   و يمنعهـــــا مـــــن النـــــوم الســـــهود

فـــــلا تبكـــــي علـــــى بكـــــر و لكـــــن   علـــــى بـــــدر تقاصـــــرت الجـــــدود

এর অর্থ হলো :

"ঐ নারী তার হারানো উটের জ রাত জেগে অশ্রুপাত করছে।
তরুণ উটের জ ক্রন্দন করা তার জ মানায় না,
বরং তার উচিত সে সব তরুণ মৃতের জ ক্রন্দন করা
যাদের মৃত্যুর ফলে কুরাইশদের সম্মান ও মর্যাদা ভূলু ত হয়েছে।" [৫৮৯]

বন্দীদের ব্যাপারে সর্বশেষ সিদ্ধান্ত

বদর যুদ্ধে বন্দীদের ব্যাপারে সর্বশেষ সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো যে, তাদের মধ্যে যারা শিক্ষিত তাদের প্রত্যেকে মুসলিম শিশুদের ১০ জনকে শিক্ষা দান করবে। যারা অশিক্ষিত তারা তাদের অর্থনৈতিক পদমর্যাদা অনুযায়ী এক হাজার হতে চার হাজার দিরহাম মুক্তিপণ হিসাবে দিবে। যাদের কোন অর্থসম্পদ নেই তারা কোন মুক্তিপণ ছাড়াই মুক্তি লাভ করবে। এ খবর মক্কাবাসীদের নিকট পৌঁছলে বন্দীদের আত্মীয়স্বজনরা খুব খুশী হলো। তারা তাদের বন্দীদের মুক্ত করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় অর্থ নিয়ে মদীনার দিকে যাত্রা করল। তারা মুক্তিপণ দানের মাধ্যমে নিজ নিজ আত্মীয়দের মুক্ত করে নিল। যখন সুহাইল ইবনে আমর মুক্তিপণ আদায়ের মাধ্যমে মুক্তিপণ লাভ করল তখন রাসূলের এক সাহাবী তাঁর নিকট অনুমতি চাইলেন সুহাইলের সামনের দাঁতগুলো উপড়ে ফেলার জ যাতে করে সে ইসলামের বিরুদ্ধে প্রচারণা চালাতে না পারে। মহানবী (সা.) অনুমতি দিলেন না, বরং বললেন, “এরূপ অ হানি করার অধিকার ইসলাম কাউকে দেয় নি।”

রাসূলের ক া যয়নাবের স্বামী আবুল আস একজন ব্যবসায়ী ও মক্কার সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ছিলেন। তিনি ইসলামপূর্ব যুগে রাসূলের ক াকে বিবাহ করেছিলেন। মহানবীর নবুওয়াত লাভের পর তাঁর স্ত্রী ইসলাম গ্রহণ করলেও তিনি অমুসলিম থেকে যান।

বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে তিনি মুসলমানদের হাতে বন্দী হন। সে সময় তাঁর স্ত্রী মক্কায় অবস্থান করছিলেন। স্বামীর বন্দী হওয়ার কথা শুনে তাঁকে মুক্ত করার জ স্বীয় গলার হার যা তাঁর মা হযরত খাদীজাহ্ তাঁকে তাঁর বিবাহের রাতে উপহার দিয়েছিলেন তা মদীনায় পাঠালেন। মহানবী হযরত খাদীজার হারটির প্রতি লক্ষ্য করে কান্নায় ভেঙে পড়লেন। তিনি তাঁর জীবনের সংকটময় মুহূর্তে হযরত খাদীজার ভূমিকার কথা স্মরণ করে কাঁদছিলেন। কারণ সংকটময় সেই মুহূর্তে হযরত খাদীজাহ্ তাঁর পাশে ছিলেন এবং তাঁর সমস্ত সম্পদ ইসলামের সেবায় বিলিয়ে দিয়েছিলেন।

মহানবী (সা.) মুসলমানদের বায়তুল মাল (সাধারণ সম্পদ) সংরক্ষণে খুব তৎপর ছিলেন। মুসলমানদের অধিকার যেন সংরক্ষিত থাকে এজ তিনি তাদেরকে লক্ষ্য করে বললেন, "এই গলার হারটি তোমাদের সকলের সম্পদ, যদি তোমরা অনুমতি দাও তবে আবুল আসকে কোন মুক্তিপণ ছাড়াই মুক্তি দিয়ে এ গলার হারটি যয়নাবকে ফিরিয়ে দেব।" রাসূলের স ীরা সর্বসম্মতভাবে তাঁর প্রস্তাব মেনে নিলেন। মহানবী আবুল আসকে মুক্ত করে দিয়ে তাঁর কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করলেন যে, যয়নাবকে তিনি মুক্ত করে মদীনায় পাঠিয়ে দেবেন। তিনি তাঁর প্রতিশ্রুতি মোতাবেক যয়নাবকে মুক্ত করে মদীনায় পাঠিয়ে দিলেন এবং ইসলাম গ্রহণ করলেন।[৫৯০]

ইবনে আবিল হাদীদের বক্তব্য

তিনি বলেন, হযরত যয়নাবের এ ঘটনাটি আমার শিক্ষক আবু জাফর বাসরী আলাভীকে বললাম। তিনি ঘটনাটি সত্য বলে যোগ করলেন, ফাতিমার মর্যাদা কি যয়নাবের চেয়ে বেশি নয়? যদি তা- ই হয়ে থাকে তবে কেন খলীফারা হযরত ফাতিমাকে সন্তুষ্ট করার লক্ষ্যে ফাদাক তাঁর হাতে অর্পণ করলেন না? যদিও আমরা ধরে নিই, এটি মুসলমানদের সাধারণ সম্পদ ছিল। আমি বললাম, নবীর হাদিস অনুযায়ী 'নবীরা কোন উত্তরাধিকারী রেখে যান না'।[৫৯১] তাই ফাদাক যেহেতু মুসলমানদের সাধারণ সম্পদ ছিল তাঁদের পক্ষে তা ফাতিমাকে দেয়া সম্ভব ছিল কি? তিনি বললেন, (আবুল আসের মুক্তির জ প্রেরিত) যয়নাবের গলার হারটিও কি মুসলমানদের সাধারণ সম্পদ ছিল না?

আমি বললাম, মহানবী নিজে শরীয়তের প্রবক্তা ছিলেন এবং তাঁর নির্দেশের বিশেষ মূল্য ছিল। কিন্তু খলীফাদের এমন অধিকার ছিল না। আমার শিক্ষক বললেন, আমি বলছি না যে, খলীফারা জোরপূর্বক মুসলমানদের কাছ থেকে ফাদাককে গ্রহণ করে হযরত ফাতিমাকে দিবেন। বরং আমি বলতে চাচ্ছি কেন খলীফা এ বিষয়ে সাধারণ মুসলমানদের সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যমে তা প্রদানের ব্যবস্থা করলেন না। কেন তিনি মহানবীর ায় মুসলমানদের উদ্দেশে বললেন না, "হে লোকসকল! ফাতিমা রাসূলের সন্তান, তিনি চান রাসূলের সময়ের ায় এখনও ফাদাক তাঁর

অধিকারে থাকুক। তোমরা কি রাজী আছ সন্তুষ্ট চিত্তে এ সম্পদটি রাসূলের ক াকে সমর্পণ করতে?

ইবনে আবিল হাদীদ সব শেষে উল্লেখ করেছেন, আমার শিক্ষকের প্রশ্নের জবাবে আমার বলার কিছু ছিল না। তাই তাঁর বক্তব্যকে সমর্থন করে বললাম, আবুল হাসান আবদুল জব্বার খলীফাদের কাজের সমালোচনা করে বলেন, যদিও তাঁদের গৃহীত কর্মপন্থা শরীয়তসম্মত ছিল, তদুপরি এতে হযরত ফাতিমার সম্মান রক্ষিত হয় নি।

ত্রিশতম অধ্যায় : ইসলামের সর্বশ্রেষ্ঠ নারীর বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া

হযরত ফাতিমার বিবাহ [৫৯২]

নারী- পুরুষের যৌনপ্রবণতা ও চাহিদা বিশেষ এক বয়ঃসন্ধিক্ষণে বিকশিত ও প্রকাশিত হয়। সঠিক শিক্ষা- প্রশিক্ষণ না থাকার জ এবং যৌনাকাঙ্ক্ষা ও চাহিদা পূরণ করার উপায়- উপকরণ বিদ্যমান ও হাতের নাগালে না থাকার দরুন যুবক- যুবতী রসাতলে নিমজ্জিত হবার দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে যায় এবং তখন যা ঘটা অনুচিত তা- ই ঘটে যায়।

সর্বজনীন চারিত্রিক শালীনতা ও পবিত্রতা বজায় রাখার সর্বোত্তম পন্থা হচ্ছে বিবাহ। ইসলাম ধর্মও সহজাত মানব- প্রকৃতির বিধান অনুসারে বিশেষ শর্ত ও অবস্থাধীনে নারী- পুরুষকে বৈবাহিক বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার নির্দেশ দেয় এবং তাদেরকে এ ব্যাপারে দায়িত্বশীল বলে বিবেচনা করে। তাই এতদপ্রসে ইসলামী শরীয়ত বিভিন্ন শিরোনামে বেশ কিছু বক্তব্যও রেখেছে যেগুলোর কয়েকটি নিচে বর্ণনা করা হলো :

“পুরুষ ও নারিগণ পরস্পর বিবাহ- বন্ধনে আবদ্ধ হবে এবং দারিদ্র্য ও কপর্দকহীনতার ভীতি যেন তাদেরকে এ কাজ থেকে বিরত না রাখে। মহান আল্লাহ্ তাদেরকে অভাবমুক্ত করে দেবেন।” (সূরা নূর : ২৩)

মহানবী (সা.) বলেছেন, “যে ব্যক্তি কামনা করে যে, সে বিশুদ্ধ ও পবিত্র চিত্তে মহান আল্লাহর সাক্ষাৎ করবে সে যেন বিবাহ করে।” [৫৯৩]

তিনি আরো বলেছেন, “আমি কিয়ামত দিবসে আমার উম্মতের সংখ্যাধিক্যের দ্বারা অ া জাতির ওপর গৌরববোধ করব।”

বর্তমান যুগে বিবাহের ক্ষেত্রে উদ্ভূত সমস্যাসমূহ

আমাদের যুগে বিবাহের ক্ষেত্রে সমস্যা একটি দু'টি নয়। আজ নারী ও পুরুষ প্রতিকূল পরিবেশ ও পরিস্থিতির কারণে বিবাহ- বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারছে না। দেশের সংবাদপত্রসমূহ পারিবারিক বিষয়ে অজ সমস্যার কথা উল্লেখ করছে। তবে অধিকাংশ সমস্যা এই বিষয়কে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হচ্ছে যে, আমাদের সমাজের যুবক- যুবতীরা- যে ধরনের পরিবার ও দাম্পত্য জীবন তাদের প্রকৃত সৌভাগ্যের নিশ্চয়তা বিধানকারী- তাতে মোটেও আগ্রহী নয়। কোন কোন ব্যক্তি বিবাহের মাধ্যমে মূল্যবান ও অতি সংবেদনশীল সামাজিক মর্যাদা ও পদ অধিকার করতে এবং এ পথে প্রচুর টাকা- পয়সা ও সম্পদ অর্জন করতে চায়। আজ যে জিনিসটির প্রতি সবচেয়ে কম মনোযোগ দেয়া হয় তা হচ্ছে চারিত্রিক পবিত্রতা ও শালীনতা। আর যদি তা কখনো কখনো বিবেচনা করা হয় তাহলে তা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অপরিহার্য বিষয় বলে গণ্য করা হয় না। এর প্রমাণস্বরূপ, যে সব পাত্রীর পারিবারিক সুখ্যাতি রয়েছে তাদেরকে বিয়ে করার জ ই সমস্ত চেষ্টা- প্রচেষ্টা নিয়োজিত করা হয়, অথচ এ সব পাত্রী চরিত্র ও নৈতিকতার দৃষ্টিকোণ থেকে ততটা প্রশংসাযোগ্য নয়। কিন্তু সমাজে অনেক গুণবতী ও সচ্চরিত্রের অধিকারী পাত্রী হাড়ভা া দারিদ্র্য ও অভাবের মধ্যে জীবনযাপন করছে অথচ তাদের প্রতি খুব একটা মনোযোগ দেয়া হয় না।

এ সব কিছুর উর্ধ্বে রয়েছে বিয়ের আকদ অনুষ্ঠান এবং এতদসংশ্লিষ্ট আনুষ্ঠনিকতা ও সামাজিক প্রথাসমূহ যেগুলো বর এবং কনের পিতা- মাতাকে ক্লান্ত করে ফেলে। আরেকটি সমস্যা হচ্ছে মোটা অংকের মোহরানা যা দিনের পর দিন ভয় রভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। অবস্থা এতদূর গড়িয়েছে যে, একদল ব্যক্তি বৈবাহিক বন্ধনকে অগ্রাহ্য করে ও দূরে ঠেলে দিয়ে উচ্ছৃঙ্খলতা ও লাগামহীনতার বানে ভেসে গিয়ে নিজেদের যৌনক্ষুধা নিবারণ করছে।[৫৭৪]

এ সব সমস্যার বিরুদ্ধে মহানবী (সা.)- এর সংগ্রাম

এগুলো হচ্ছে এমন সব সামাজিক সমস্যা যা প্রতিটি সমাজেই কিছু না কিছু বিদ্যমান আছে। মহানবী (সা.)- এর জীবনকালকে এ সব সমস্যা থেকে আলাদা করা যাবে না। আরবের সম্ভ্রান্ত বংশীয়রা তাদের ক াসন্তানদেরকে এমন সব পাত্রের সাথে বিবাহ দিত যারা গোত্র, শক্তি ও ধন-সম্পদের দিক থেকে তাদেরই সমকক্ষ হতো। এর অ থা হলে বিয়ের প্রস্তাব দানকারীদেরকে প্রত্যাখ্যান করত।

প্রাচীন এ অভ্যাস ও প্রথার বশবর্তী হয়েই আরবের সম্ভ্রান্ত বংশীয় ও গোত্রীয় নেতা ও সর্দারগণ মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)- এর ক া হযরত ফাতিমা (আ.)- কে বিবাহ করার ব্যাপারে খুব চাপ প্রয়োগ ও জোরাজুরি করেছিল। কারণ তারা মনে করেছিল যে, মহানবী (সা.) এ কাজে কড়াকড়ি করবেন না। তারা ভেবেছিল যে, কনে ও কনের পিতার সন্তুষ্টি অর্জন করার জ তাদের প্রয়োজনীয় যাবতীয় উপায়- উপকরণ (সম্পদ ও সম্পত্তি) রয়েছে। তাছাড়া মহানবী (সা.) তাঁর অ া মেয়ে, যেমন রুকাইয়া ও যয়নাবের বিয়ের ব্যাপার তেমন একটা কড়াকড়ি করেন নি। কিন্তু তারা সকলেই একটি ব্যাপারে উদাসীন ছিল এবং ভেবেও দেখে নি যে, মহানবী (সা.)- এর এই মেয়ে তাঁর অ মেয়েদের থেকে স্বতন্ত্র। ফাতিমা এমন এক মেয়ে, আয়াতে মুবাহালা[৫৯৫] অবতীর্ণ হওয়ার কারণে যিনি অতি সুউচ্চ আধ্যাত্মিক মর্যাদার অধিকারিণী।[৫৯৬] বিবাহের প্রস্তাবকারিগণ এ ক্ষেত্রে ভুলই করেছিল। তারা জানত না যে, প্রস্তাবিত ব্যক্তিকে (কুফু) মহৎ চারিত্রিক গুণাবলী, তাকওয়া- পরহেজগারী, ঈমান ও ইখলাসের দৃষ্টিকোণ থেকে অবশ্যই হযরত ফাতিমার সমকক্ষ হতে হবে। যদি হযরত ফাতিমা (আ.) (পবিত্র কোরানের সূরা আহযাবের ৩৩ নং আয়াত) আয়াতে তাতহীরের কারণে নিষ্পাপ (মাসুমাহ্) হন তাহলে তাঁর স্বামীও তাঁরই মতো নিষ্পাপ হবেন।

ধন- সম্পদ, অর্থকড়ি এবং অ া ব্যক্তিগত সুযোগ- সুবিধা সমকক্ষ ও মর্যাদাবান হওয়ার মাপকাঠি নয়। যদিও ইসলাম বলে থাকে যে, তোমরা তোমাদের মেয়েদেরকে তাদের সমকক্ষ ও

সমান মর্যাদাসম্পন্ন পাত্রদের কাছে বিয়ে দেবে, আসলে ইসলাম এই সমমর্যাদা ও সমকক্ষ হওয়াকে পাত্র- পাত্রী উভয়ের মুমিন ও মুসলিম হওয়ার ভিত্তিতেই ব্যাখ্যা করেছে।

মহানবী (সা.) মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে বিবাহের প্রস্তাবকারীদের এ উত্তর দিতে আদিষ্ট হয়েছিলেন যে, হযরত ফাতিমার বিবাহ অবশ্যই মহান আল্লাহর নির্দেশে সম্পন্ন হবে। আর তিনি এ উত্তর দানের মাধ্যমে প্রকৃত বাস্তবতা সকলের সামনে বেশ কিছুটা উন্মোচন করেছিলেন। এর ফলে মহানবী (সা.)- এর সাহাবিগণ বুঝতে পেরেছিলেন যে, হযরত ফাতিমা (আ.)- এর বিবাহ কোন সহজসাধ্য ব্যাপার নয়। কোন ব্যক্তি বৈষয়িকভাবে যত বড় ব্যক্তিত্ব ও মর্যাদার অধিকারী হোক না কেন সে (এ কারণে) হযরত ফাতিমাকে বিবাহ করতে পারে না। হযরত ফাতিমা (আ.)- এর স্বামী এমন ব্যক্তিত্বসম্পন্ন হবেন- সততা, সত্যবাদিতা, নিষ্ঠা, পবিত্রতা, ঈমান, আধ্যাত্মিকতা ও চারিত্রিক গুণাবলীর মাপকাঠিতে অবশ্যই মহানবী (সা.)- এর পরই হবে যাঁর অবস্থান। আর এ সব বৈশিষ্ট্য একমাত্র হযরত আলী (আ.)- এর ব্যক্তিত্ব ব্যতীত আর কোন ব্যক্তির মধ্যে সন্নিবেশিত হয় নি। তারা পরীক্ষা করার জ হযরত আলীকে মহানবীর ক া ফাতিমাকে বিবাহ করার জ প্রস্তাব দেবার জ উৎসাহিত করতে লাগল।[৫৯৭] হযরত আলীও আন্তরিকভাবে এ ব্যাপারে একমত ছিলেন। কেবল তিনি বিয়ের প্রস্তাব দেয়ার উপযুক্ত পরিবেশ ও পরিস্থিতি সৃষ্টি হওয়ার সুযোগের অপেক্ষায় ছিলেন।

আমীরুল মুমিনীন আলী (আ.) নিজেই মহানবী (সা.)- এর খেদমতে উপস্থিত হলেন এমন অবস্থায় যে, তাঁর পুরো অস্তিত্ব লজ্জায় ভরে গিয়েছিল। তিনি মাথা নিচু করে ছিলেন আর যেন তিনি কিছু বলতে চাচ্ছিলেন, কিন্তু লজ্জা তাঁর বাকশক্তি যেন রহিত করে দিয়েছিল। মহানবী (সা.) তাঁকে কথা বলতে উদ্বুদ্ধ করলেন। তিনি কিছু কথা বলার মাধ্যমে তাঁর মনস্কামনা ও আসল উদ্দেশ্য বুঝাতে সক্ষম হলেন। এ ধরনের বিয়ের প্রস্তাব আসলে ইখলাস, সততা ও আন্তরিকতার পরিচায়ক। বিে বিদ্যমান যাবতীয় শিক্ষাব্যবস্থা এবং মতাদর্শ ও প্রতিষ্ঠান আজও বিয়ের প্রস্তাবকারী যুবকদেরকে এ ধরনের তাকওয়া, বি াস ও নিষ্ঠাপূর্ণ স্বাধীনচেতা মনোভাবের শিক্ষা দিতে পারে নি।

মহানবী (সা.) হযরত আলী (আ.)- এর প্রস্তাবে সম্মত হলেন এবং বললেন, "তুমি একটু অপেক্ষা কর যাতে করে আমি ফাতিমার কাছে এ বিষয়টি উত্থাপন করতে পারি।" যখন তিনি ফাতিমা (আ.)- এর কাছে বিষয়টি উত্থাপন করলেন তখন মৌনতা ফাতিমা (আ.)- এর পুরো অস্তিত্বকে যেন আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল। তখন মহানবী (সা.) উঠে বললেন, "আল্লা আকবর (আল্লাহ্ মহান), ফাতিমার মৌনতাই তার সম্মতি।" [৫৯৮]

তখন হযরত আলী (আ.)- এর সহায়- সম্বল বলতে একটি তরবারি ও বর্ম ছাড়া আর কিছুই ছিল না। হযরত আলী (আ.) বিয়ের প্রাথমিক প্রস্তুতি ও প্রাথমিক ব্যয় যোগাড় করার জ আদিষ্ট হলেন। তিনি বর্ম বিক্রি করে এর সমুদয় অর্থ নিয়ে মহানবী (সা.)- এর খেদমতে উপস্থিত হলেন। মহানবী (সা.) গণনা না করেই ঐ অর্থের একটি অংশ বিলালকে দিলেন যাতে করে তিনি হযরত ফাতিমা (আ.)- এর জ কিছু সুগন্ধি দ্রব্য কেনেন। আর অবশিষ্টাংশ হযরত আবু বকর ও হযরত উমরের হাতে দিলেন যাতে মদীনার বাজার থেকে বর ও কনের জ তাঁরা প্রয়োজনীয় গৃহস্থালী জিনিসপত্র ক্রয় করেন। তাঁরা মহানবী (সা.)- এর নির্দেশে বাজারে গিয়ে নিম্নোক্ত সামগ্রীগুলো ক্রয় করলেন, আসলে যেগুলো ছিল হযরত ফাতিমা (আ.)- এর বিবাহের উপহারস্বরূপ এবং তাঁরা সেগুলো মহানবী (সা.)- এর কাছে নিয়ে আসলেন।

হযরত ফাতিমার বিবাহের উপহার সামগ্রীর বিবরণ

১. একটি কামিজ যা সাত দিরহামে ক্রয় করা হয়েছিল।

২. স্কার্ফ যার মূল্য ছিল এক দিরহাম।

৩. কালো রংয়ের বড় তোয়ালে যা সমগ্র দেহ ঢাকার জ যথেষ্ট ছিল না।

৪. একটি আরবীয় চেয়ার যা ছিল খেজুর গাছের কাঠ ও আঁশ দিয়ে তৈরি।

৫. মিশরীয় কাতাননির্মিত দু'টি তোষক যার একটি ছিল পশমী, অপরটি ছিল আঁশ দিয়ে তৈরি।

৬. চারটি বালিশ যেগুলোর দু'টি পশম এবং অ দু'টি খেজুরের আঁশ দ্বারা তৈরি ছিল।

৭. পর্দা।

৮. মাদুর।

৯. যাঁতা।

১০. চামড়ার তৈরি মশক।

১১. দুধ পান করার জ একটি কাঠের পেয়ালা।

১২. পানি রাখার জ চামড়ার তৈরি একটি পাত্র।

১৩. সবুজ রঙের একটি ঝুঁড়ি।

১৪. কয়েকটি মৃৎপাত্র।

১৫. দু'টি রৌপ্যনির্মিত বাজুবন্দ।

১৬. একটি তাম্রনির্মিত পাত্র।

যখন মহানবী (সা.)- এর দৃষ্টি এ সব জিনিসের ওপর পড়ল তখন তিনি বলেছিলেন, "হে আল্লাহ্! ঐ সব সম্প্রদায় যাদের অধিকাংশ পাত্রই হচ্ছে সিরামিক বা চীনা মাটির তৈরি তাদের চেয়েও এদের সাংসারিক জীবনকে আশীর্বাদপুষ্ট করে দিন।" [৫৯৯]

হযরত ফাতিমার মোহরানাও আমাদের জ শিক্ষণীয় ও সূক্ষ্ম বিবেচনাযোগ্য। তাঁর মোহরানাকে মাহরুস্ সুন্নাহ অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ্ (সা.)- এর সুন্নাহসম্মত মোহরানাও বলা হয়। এর পরিমাণ ৫০০ দিরহাম।[৬০০]

বিবাহ অনুষ্ঠান

বর ও কনের পক্ষ থেকে কিছু সংখ্যক ব্যক্তি নিমন্ত্রিত হয়েছিলেন। হযরত আলী (আ.) তাঁর সম্মানিতা নবপরিণীতা স্ত্রীর সম্মানে একটি ওয়ালীমাহ্ অর্থাৎ বিবাহ উপলক্ষে ভোজ সভার আয়োজন করেন। খাওয়া- দাওয়ার পর মহানবী (সা.) হযরত ফাতিমা (আ.)- কে নিজের কাছে ডাকলেন। হযরত ফাতিমার সমগ্র অস্তিত্ব তখন লজ্জায় ভরে গিয়েছিল। ঐ অবস্থায় অত্যন্ত লাজুকতার সাথে মহানবী (সা.)- এর কাছে পৌঁছলেন। তাঁর পবিত্র কপাল থেকে লাজুকতামিশ্রিত ঘাম ঝরছিল। যখন তাঁর দৃষ্টি মহানবী (সা.)- এর ওপর স্থির হলো তখন তাঁর পা পিছলে গেলে তাঁর প্রায় মাটিতে পড়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল। মহানবী (সা.) ঐ মুহূর্তে হযরত ফাতিমার হাত ধরে তাঁর জ মহান আল্লাহপাকের কাছে প্রার্থনা করলেন, "মহান আল্লাহ্ তোমাকে সব ধরনের স্খলন থেকে রক্ষা করুন।" [৬০১] তখন তিনি হযরত ফাতিমা (আ.)- এর মুখমণ্ডল অনাবৃত করলেন এবং কনের হাত বরের হাতের ওপর রেখে বললেন, "হে আলী! মহান আল্লাহ্ তোমার জ রাসূলুল্লাহর ক াকে বরকতময় করে দিন। ফাতিমা অতি উত্তম স্ত্রী।" এরপর তিনি হযরত ফাতিমা (আ.)- এর দিকে তাকিয়ে বললেন, "আলী অতি উত্তম স্বামী।"

আরেক কথায় মহানবী (সা.) ঐ রাতে আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার পরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেছিলেন। এত প্রগতি ও পূর্ণতাসত্ত্বেও আমাদের বর্তমান সমাজে এ ধরনের আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার অস্তিত্ব নেই। তিনি হযরত ফাতিমা (আ.)- এর হাত ধরে তা হযরত আলী (আ.)- এর হাতে রেখে হযরত ফাতিমা (আ.)- এর কাছে হযরত আলী (আ.)- এর গুণাবলী বর্ণনা করলেন। এরপর তিনি হযরত ফাতিমা (আ.)- এর সুমহান ব্যক্তিত্ব এবং এ কথা যে, 'হযরত আলী (আ.) যদি সৃষ্টি না হতেন তাহলে ফাতিমা (আ.)- এর সমমর্যাদাসম্পন্ন স্বামীই পাওয়া যেত না' স্মরণ ও ব্যক্ত করলেন। পরে তিনি ঘরের কাজকর্ম ও দাম্পত্য জীবনের দায়িত্ব- কর্তব্যসমূহ ভাগ করে দিলেন। তিনি ঘরের অভ্যন্তরীণ কাজকর্ম হযরত ফাতিমা (আ.)- এর ওপর এবং ঘরের বাইরের দায়িত্ব ও কর্তব্য হযরত আলী (আ.)- এর ওপর অর্পণ করলেন।

এরপর কতিপয় ঐতিহাসিকের অভিমত অনুযায়ী মহানবী (সা.) মুহাজির ও আনসার রমণীদেরকে নির্দেশ দিলেন যেন তাঁরা হযরত ফাতিমার উষ্ট্রীর চারপাশে জড়ো হয়ে তাঁকে স্বামীর গৃহে পৌঁছে দেন। এভাবে জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ নারীর বিবাহ অনুষ্ঠান ও শুভ পরিণয় সুসম্পন্ন হলো।

কখনো কখনো বলা হয় যে, হযরত সালমানের মতো অত্যন্ত মর্যাদাবান ব্যক্তিকে মহানবী (সা.) হযরত ফাতিমা (আ.)- এর উটের লাগাম ধরে টেনে নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন। আর এর মাধ্যমে মহানবী (সা.) তাঁর মেয়ের সুমহান মর্যাদা জনসমক্ষে প্রকাশ করেছিলেন। সবচেয়ে মুধুর আনন্দঘন মুহূর্ত ছিল ঐ মুহূর্ত যখন বর ও কনে বাসর ঘরে প্রবেশ করলেন, অথচ তখন তাঁরা উভয়েই লজ্জাবশত জমিনের দিকে তাকাচ্ছিলেন। মহানবী (সা.) সেখানে প্রবেশ করলেন এবং একটি পানির পাত্র হাতে নিয়ে শুভ লক্ষণ হিসাবে তা থেকে হযরত ফাতিমা (আ.)- এর মাথায় এবং তাঁর দেহের চারপাশে ছিটালেন। কারণ এ পানিই জীবনের ভিত্তি। এরপর তিনি বর- কনের জ   মহান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করে বললেন,

اللهمّ هذه ابنتي و أحبّ الخلق إليّ و هذا أخي و أحبّ الخلق إليّ اللهمّ اجعله وليّا و...

"হে আল্লাহ্! এ আমার ক   া এবং আমার কাছে সবচেয়ে প্রিয়। আর হে আল্লাহ্! এ আমার ভ্রাতা এবং আমার কাছে সবচেয়ে প্রিয়! হে আল্লাহ্ এ দু'জনের ভালোবাসার বন্ধনকে দৃঢ় ও মজবুত করে দিন।..."[৬০২]

আমরা এখানে মহানবী (সা.)- এর ক   া হযরত ফাতিমা (আ.)- এর সুমহান মর্যাদার হক আদায় করার জ   নিম্নোক্ত হাদীসটি বর্ণনা করব :

আনাস ইবনে মালেক[৬০৩] বর্ণনা করেছেন : মহানবী (সা.) পুরো ছয় মাস ফজরের নামাযের সময় ঘর থেকে বের হয়ে মসজিদের দিকে রওয়ানা হতেন এবং নিয়মিত তিনি হযরত ফাতিমা (আ.)- এর ঘরের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে বলতেন:

الصّلاة يا أهل البيت، (إنّما يُريد الله ليُذهب عنكم الرّجس أهل البيت و يُطهّركم تطهيرا)

“ হে আমার আহলে বাইত! নামায (নামাযের কথা সর্বদা স্মরণ রেখ)। নিশ্চয়ই মহান আল্লাহ্ চান তোমাদের থেকে- হে আমার আহলে বাইত! সকল পাপ-পঙ্কিলতা দূর করতে এবং তোমাদেরকে পূর্ণরূপে পবিত্র করতে। ”

একত্রিশতম অধ্যায় বনী কাইনুকা গোত্রের ইয়াহুদীদের অপরাধসমূহ :

বদর যুদ্ধ ছিল শিরক ও পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে এক ভয় র ও আতংক সৃষ্টিকারী তুফান যা সমগ্র আরব উপদ্বীপের বুকে বইতে লাগল। এটি ছিল এমন এক উত্তাল ঝাঞ্ঝাবিক্ষুদ্ধ ঝড় যা শিরক ও পৌত্তলিকতার প্রাচীন মূলগুলোর একটি অংশ উপড়ে ফেলেছিল। কুরাইশদের একদল বীরপুরুষ এ যুদ্ধে নিহত হয়েছিল এবং একদল বন্দী হয়েছিল এবং আরেকদল পূর্ণ হীনতা- দীনতা সহকারে ও সম্পূর্ণ অক্ষম ও নিরুপায় হয়ে পলায়ন করেছিল। কুরাইশ বাহিনীর পরাজিত হবার খবর সমগ্র আরব উপদ্বীপে ছড়িয়ে পড়েছিল। তবে এ ঝড়ের পর ভয়- ভীতি ও মানসিক অস্থিরতা মিশ্রিত এক ধরনের থমথমে অবস্থার সৃষ্টি হয়। এই থমথমে অবস্থার কারণ ছিল আরব উপদ্বীপের সার্বিক ভবি ৎ পরিস্থিতি।

আরব উপদ্বীপের মুশরিক গোত্রগুলো এবং মদীনা, খায়বর ও ওয়াদীউল কুরার ধনাঢ্য ইয়া দিগণ সবাই (মদীনার) সদ্য প্রতিষ্ঠিত প্রশাসন ও সরকারের শক্তি ও ক্ষমতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধির ফলে ভীত- সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছিল এবং নিজেদের অস্তিত্বকেই মকি ও ধ্বংসের মুখোমুখি দেখতে পেয়েছিল। কারণ তারা কখনই বি াস করতে পারছিল না যে, মহানবী (সা.)- এর অবস্থা এতটা শক্তিশালী ও উন্নত হবে এবং কুরাইশদের প্রাচীন ও পুরানো শক্তি ও ক্ষমতাকে ভেঙে চুরমার করে দেবে।

বনি কাইনুকা গোত্রের ইয়া দীরা যারা মদীনা নগরীর ভিতরে বসবাস করত এবং মদীনার অর্থনীতি যাদের হাতের মুঠোয় ছিল তারা অ সবার চেয়ে বেশি ভয় ও শ ার মধ্যে পড়ে গিয়েছিল। কারণ তাদের জীবন মুসলমানদের সাথে সম্পূর্ণ মিশে একাকার হয়ে গিয়েছিল। আর মদীনার বাইরে খায়বর ও ওয়াদিউল কুরায় বসবাসকারী ইয়া দীরা যেহেতু মুসলমানদের ক্ষমতা ও প্রভাব বলয়ের বাইরে ছিল সেহেতু তাদের অবস্থা ছিল এদের চাইতে ভিন্ন ধরনের। এ কারণেই বনি কাইনুকার ইয়া দীরা আঘাতকারী ঘৃণ্য স্লোগান ও চরম অবমাননাকর কবিতা রচনা ও আবৃত্তি করে মুসলমানদের বিরুদ্ধে এক সর্বাত্মক ঠাণ্ডাযুদ্ধ শুরু করে দেয় এবং তারা মহানবী

(সা.)- এর সাথে যে সন্ধি চুক্তি করেছিল কার্যত তা ভেঙে ফেলে। আমরা ইতোমধ্যে এ চুক্তির বিস্তারিত বিবরণ উল্লেখ করেছি।

তবে এই ঠাণ্ডাযুদ্ধ এই অনুমতি দেয় না যে, এ সব ইয়া দীর জবাব মুসলমানরা যুদ্ধাস্ত্র দিয়ে দেবে। কারণ যে গিঁট আ ুল দিয়ে খোলা সম্ভব তা অবশ্যই দাঁত দিয়ে কামড়ে খোলা অনুচিত। আর তখন মদীনা নগরীর রাজনৈতিক ঐক্য ও সার্বিক শৃঙ্খলা রক্ষা করা মহানবী (সা.)- এর জ অপরিসীম গুরুত্বের অধিকারী ছিল।

মহানবী (সা.) চূড়ান্ত প্রমাণ উপস্থাপনের জ বনি কাইনুকা গোত্রের বাজারে যে বিরাট সমাবেশ ও জমায়েত হতো সেখানে ভাষণ দিলেন। এ সমাবেশের ভাষণে মহানবী (সা.)- এর ক্ষুরধার দিকটি ছিল বনি কাইনুকার ইয়া দীদের উদ্দেশে প্রদত্ত। তিনি তাঁর এ ভাষণে বলেছিলেন, "কুরাইশদের কাহিনী তোমাদের জ শিক্ষাস্বরূপ। আমি ভয় পাচ্ছি যে, যে বিপদ কুরাইশদের ওপর আপতিত হয়েছে তা তোমাদের ওপরও আপতিত হবে। তোমাদের মধ্যে অনেক জ্ঞানী ও পণ্ডিত ব্যক্তি আছেন। তাদের কাছ থেকে তোমরা যাচাই করে দেখ তাহলে তারাও তোমাদেরকে যতটা পূর্ণতার সাথে সম্ভব ততটা স্পষ্ট করে বলতে পারবেন যে, আমি মহান আল্লাহর নবী। আর এ বিষয়টি তোমাদের আসমানী গ্রন্থেও বিদ্যমান।"

চরম একগুঁয়ে ও দাম্ভিক ইয়া দীরা মহানবী (সা.)- এর ভাষণের ব্যাপারে নীরব থাকে নি, বরং তারা ধারালো কে মহানবীর পাল্টা জবাব দানের জ দাঁড়িয়ে বলতে লাগল, "আপনি ভেবেছেন যে, আমরা দুর্বল ও অক্ষম এবং কুরাইশদের মতো যুদ্ধের কলাকৌশল সম্পর্কে অজ্ঞ? আপনি এমন এক গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছিলেন যারা সামরিক কলাকৌশল ও নিয়ম- কানুন সম্পর্কে অজ্ঞ। আর কাইনুকা গোত্রের বীর সন্তানদের শক্তি ও ক্ষমতা ঠিক তখনই আপনার সামনে উন্মোচিত হবে যখন আপনি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হবেন।"[৬০৪]

বনী কাইনুকার ইয়া দীদের চরম বেয়াদবীপূর্ণ কড়া বক্তব্য এবং তাদের নরম তুলতুলে বীরদের রণসংগীত ও বীরত্বগাথা মুসলমানদের মন- মানসিকতায় বি মাত্র প্রভাব ফেলল না। তবে ইসলামের রাজনৈতিক মূলনীতির দৃষ্টিকোণ থেকে ইয়া দীদের বিরুদ্ধে যুক্তি- প্রমাণ উপস্থাপনের

প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়ে গিয়েছিল এবং এতদভিন্ন আরেক পথে জট (ইয়া দীদের ঠাণ্ডা যুদ্ধের জট) খোলা অত্যাবশ্যক ও অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়েছিল। এর অ থা হলে দিন দিন ইয়া দীদের স্পর্ধা, সীমা লঙ্ঘন ও প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করার প্রক্রিয়া বৃদ্ধি পেতেই থাকবে। এ কারণেই মহানবী (সা.) এমন এক উপযুক্ত সুযোগের অপেক্ষায় ছিলেন যাতে করে তিনি তাদেরকে কঠিন শাস্তি দিতে সক্ষম হন ।

একটি ুলিঙ্গ থেকে যুদ্ধের আগুন প্রজ্বলিত হওয়া

কখনো কখনো অনেক ক্ষুদ্র ঘটনা বিরাট সামাজিক ঘটনা ও পরিবর্তনের সূচনা করে। অর্থাৎ কোন একটি ক্ষুদ্র ঘটনা অনেক বড় বড় ঘটনার উদগাতা হিসাবে কাজ করে।

প্রথম বি যুদ্ধ যা মানব জাতির ইতিহাসের এক বৃহত্তম ঘটনা তা সংঘটিত হওয়ার কারণও ছিল একটি ক্ষুদ্র ঘটনা যা বৃহৎ শক্তিবর্গের হাতে যুদ্ধ বাধানোর অজুহাত ও সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছিল। যে ঘটনা প্রথম বি যুদ্ধ বাঁধার কারণ হয়ে দাঁড়ায় তা ছিল অস্ট্রিয়ার যুবরাজ আর্কডিউক ফ্রান্সিস ফ্রী ান্ডের হত্যাকাণ্ড। এ হত্যাকাণ্ড ২৮ জুন সংঘটিত হয়েছিল এবং এর একমাস ও কিছুদিন পরে ৩ আগস্ট বেলজিয়ামে জার্মানির আক্রমণের মধ্যদিয়ে প্রথম বি যুদ্ধ বেঁধে যায়। এ যুদ্ধে এক কোটি লোকের প্রাণহানি ঘটে এবং দু'কোটি লোক আহত হয়।

বনি কাইনুকার ইয়া দীদের ঔদ্ধত্য ও উগ্রতার কারণে মুসলমানরাও তীব্রভাবে অসন্তষ্ট ও ক্ষুব্ধ হয়েছিল। তাই তারা ইয়া দীদের পক্ষ থেকে অপরাধমূলক কোন কাজ সংঘটিত হওয়ার অপেক্ষা করছিল যা সংঘটিত হলে তারা ইয়া দীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে পারবে। হঠাৎ এক আরব মহিলা বনি কাইনুকার বাজারে এক ইয়া দী স্বর্ণকারের দোকানের পাশে নিজের সাথে আনা পণ্য বিক্রি করছিল। ঐ মহিলাটি সম্পূর্ণরূপে সতর্ক ছিল যেন কেউ তার মুখ দেখতে না পায়। তবে কাইনুকা গোত্রের ইয়া দীরা তার মুখের ওপর থেকে পর্দা সরিয়ে ফেলার জ   জোর- জবরদস্তি করতে লাগল। ঐ আরব মহিলাটি পরপুরুষদের সামনে তার চেহারা অনাবৃত করতে চায় নি বলেই ঐ স্বর্ণকার দোকান থেকে বের হয়ে এসে ঐ মহিলার অজান্তে তার পোশাকের প্রান্ত তার পোশাকের পিঠের অংশের সাথে সেলাই করে দেয়। ঐ মহিলা যখন উঠে দাঁড়াল তখন তার দেহের কিছু অংশ অনাবৃত ও দৃশ্যমান হয়ে গেল এবং বনি কাইনুকার যুবকরা ঐ মহিলাকে নিয়ে ব্য বি প করতে লাগল। মান- মর্যাদা ও সম্ভ্রম প্রতিটি সমাজ ও সম্প্রদায়ের জ   একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলে পরিগণিত। আরবদের মধ্যে এ বিষয়টি এতটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল যে, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। বিশেষ করে, আরবের মরুচারী বেদুইন গোত্রগুলো মান- সম্ভ্রমের সাথে সংশ্লিষ্ট কোন ঘটনাকে কেন্দ্র করে রক্তগ া প্রবাহিত করত। এ কারণেই একজন আগন্তুক মহিলার এহেন

অবস্থা (বিশেষ করে ইয়া দীদের হাতে তার লাঞ্ছিত হওয়া) একজন মুসলমানের আত্মসম্মানবোধকে তীব্রভাবে আঘাত করেছিল। সে তৎক্ষণাৎ অস্ত্র দিয়ে ঐ ইয়া দী স্বর্ণকারকে হত্যা করে। ফলে বাজারের ই দীরাও একযোগে তাকে হত্যা করে।

আমাদের এতে কোন কাজ নেই যে, একজন মহিলার মান- সম্ভ্রমের ওপর হামলা করার অপরাধে ঐ ইয়া দী লোকটির রক্ত ঝরানো যৌক্তিক ও ায়সংগত ছিল কিনা। তবে কয়েকশ ’ ইয়া দী কর্তৃক একযোগে আক্রমণ চালিয়ে একজন অসহায় নারীর মান- সম্ভ্রাম রক্ষাকারী একজন মুসলমানের রক্ত ঝরানো দারুণ অবমাননাকর ও অপমানজনক ছিল। এ কারণেই অত্যন্ত নিষ্ঠুর পন্থায় একজন মুসলমানের হত্যার খবর প্রকাশিত হওয়ার পর মুসলমানদের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে যায় এবং সকল দুর্নীতি ও অপরাধের আখড়া সমূলে ধ্বংস করে দেবার ব্যাপারে তাদেরকে দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করতে উদ্বুদ্ধ করে।

বনি কাইনুকা গোত্রের রণ উদ্দীপনা উদ্রেককারী কবিতা আবৃত্তিকারী বীরেরা অনুভব করতে পারল যে, অবস্থা খুবই স ীন হয়ে পড়েছে। তাই মদীনার বাজার ও রাস্তাঘাট থেকে কেনা- বেচা ও ব্যবসা- বাণিজ্য করা আর তাদের ঠিক হবে না। সুতরাং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সুউচ্চ ও মজবুত দুর্গগুলোর মধ্যে অবস্থিত নিজেদের ঘর- বাড়িতে গিয়ে আশ্রয় নেয়া এবং এ সব কবিতা ও বীরত্বগাথা গাইতে গাইতে পূর্ণ সাহসিকতার সাথে পশ্চাদপসরণ করার মধ্যেই তারা যেন তাদের কল্যাণ দেখতে পেল।

আর ইয়া দীদের এ পরিকল্পনাটি ছিল মারাত্মক ভুল। যদি তারা নিজেদের কৃতকর্মের ব্যাপারে অনুতপ্ত হয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করত তাহলে মহানবী (সা.)- এর যে অতিমাত্রায় ক্ষমা, মহানুভবতা ও উদারতা বিদ্যমান ছিল সে কারণে তারা নিশ্চিতভাবে মুসলমানদের সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারত। তাই দুর্গসমূহে অবস্থান গ্রহণ ছিল যুদ্ধ ও শত্রুতার পুনঃপ্রকাশেরই নিদর্শনস্বরূপ। মহানবী (সা.) মুসলমানদেরকে শত্রু দুর্গ অবরোধ করা এবং বাইরে থেকে দুর্গের ভিতরে সাহায্য ও রসদ পত্রের আগমনে বাধা দেয়ার নির্দেশ দিলেন। তাই বিভিন্ন ব্যক্তির সাথে যোগাযোগ নিষিদ্ধ করা হলো। দুর্গের ইয়া দীরা অর্থনৈতিক অবরোধের কারণে একেবারে নতজানু হয়ে পড়ল এবং

আত্মসমর্পণের কথা প্রকাশ করে তারা ঘোষণা করল যে, মহানবী (সা.) যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন তা তাদের ব্যাপারে প্রযোজ্য হবে।

মহানবী (সা.)- এর সিদ্ধান্ত এটিই ছিল যে, মদীনায় গোলযোগ সৃষ্টিকারী ও রাজনৈতিক ঐক্য বিনষ্টকারীদেরকে কঠোর শাস্তি দিবেন। কিন্তু তিনি মদীনার মুনাফিকদের সর্দার আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাইয়ের পীড়াপীড়িতে শাস্তি প্রদান করা থেকে বিরত থাকলেন। আর এই আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই বাহ্যত ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিল এবং নিজেকে মুসলিম বলে জাহির করত। ঠিক করা হলো যে, বনি কাইনুকা গোত্রের ইয়া দীরা যত শীঘ্র সম্ভব তাদের অস্ত্র ও সম্পদ হস্তান্তর করে মদীনা ত্যাগ করবে এবং উবাদাতা ইবনে সামেত নামক একজন কর্মকর্তার তদারকিতে ও পর্যবেক্ষণে এ কাজগুলো সমাধা করবে। তখন ওয়াদিউল কুরা এবং সেখান থেকে আযরুআত নামক শামের একটি এলাকার উদ্দেশে মদীনা ত্যাগ করা ব্যতীত বনি কাইনুকা গোত্রের ইয়া দীদের আর কোন উপায় ছিল না।

বনি কাইনুকা গোত্রের বহিষ্কারের মাধ্যমে মদীনায় রাজনৈতিক ঐক্য ফিরে আসে। তবে এ বারে ধর্মীয় ঐক্যের সাথে যুক্ত হয়ে গেল মদীনার রাজনৈতিক ঐক্যও। কারণ মদীনায় মুসলমানদের কেবল এক উল্লেখযোগ্য সংখ্যাগরিষ্ঠতা ব্যতীত আর কোন ভিন্ন ধর্মাবলম্বীই দৃষ্টিগোচর হতো না। আর মূর্তিপূজারী আরব বেদুইন ও মুনাফিকচক্র এ অসাধারণ ঐক্যের বরাবরে ছিল নিতান্তই নগণ্য।[৬০৫]

মদনীয় বেশ কিছু নতুন খবর আসতে থাকা

সাধারণত একটি ক্ষুদ্র পরিবেশ ও পরিসরে সংবাদগুলো বিদ্যুৎ চমকানোর মতো অতি তগতিতে একজনের কাছ থেকে আরেকজনের কাছে ছড়িয়ে পড়ে। তাই যে কোন এলাকায় অধিকাংশ চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্র এবং ইসলামবিরোধী সমাবেশসমূহের সংবাদ তাৎক্ষণিকভাবে নিরপেক্ষ পথিক অথবা সচেতন বন্ধুদের দ্বারা ইসলাম ধর্মের কেন্দ্রস্থলে পৌঁছে যেত। এছাড়াও এ ক্ষেত্রে মহানবী (সা.) নিজেই ছিলেন অত্যন্ত সজাগ এবং সূক্ষ্মদর্শী। এ কারণেই বেশিরভাগ ষড়যন্ত্র ও চক্রান্ত অঙ্কুরে বিনষ্ট হয়ে যেত। যখনই সংবাদ আসত যে, কোন একটি গোত্র অস্ত্র ও যোদ্ধা সংগ্রহ করার উদ্যোগ নিয়েছে তখনই তিনি তৎক্ষণাৎ শত্রুর যে কোন অপতৎপরতা নস্যাৎ করার জ সেনাবাহিনী প্রেরণ করতেন অথবা তিনি নিজেই বিদ্যুৎ গতিতে উপযুক্ত সৈ সমেত শত্রু এলাকা ঘেরাও করে ফেলতেন এবং এভাবে তিনি শত্রুর সব ধরনের ষড়যন্ত্রমূলক পরিকল্পনা ও নীলনকশা ব্যর্থ করে দিতেন। এখন আমরা হিজরী ২য় বর্ষের কতিপয় গাযওয়ার (যুদ্ধের) সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দান করব :

১. গাযওয়াতুল কাদার : বনি সালীম গোত্রের কেন্দ্রস্থল ছিল আল কাদার। মদীনায় একটি গোপন খবর এসে পৌঁছায় যে, উক্ত গোত্র ইসলাম ধর্মের কেন্দ্রস্থল অর্থাৎ মদীনা নগরী আক্রমণ করার জ অস্ত্র সংগ্রহে লিপ্ত রয়েছে। মহানবী (সা.) যখনই মদীনার বাইরে যেতেন তখনই তিনি কোন ব্যক্তিকে তাঁর প্রতিনিধি নিযুক্ত করে মদীনার প্রশাসনের যাবতীয় দায়িত্ব তাঁর হাতে অর্পণ করতেন। এবার তিনি ইবনে উম্মে মাকতুমকে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করে একটি সেনাবাহিনী নিয়ে আল কাদার- এর কেন্দ্রস্থলে উপস্থিত হলেন। কিন্তু ইসলামী সেনাবাহিনী পৌঁছানোর পূর্বেই শত্রুবাহিনী ছত্রভ হয়ে গিয়েছিল। মহানবী (সা.) বিনা সংঘর্ষে মদীনায় প্রত্যাবর্তন করলেন।[৬০৬]

২. গাযওয়াতুস সুওয়াইক[৬০৭] : জাহেলিয়াতের যুগের আরবগণ অনেক অদ্ভুত নযর (মানত) করত। যেমন বদরের যুদ্ধের পর আবু সুফিয়ান নযর করেছিল যে, যতক্ষণ পর্যন্ত মুসলমানদের কাছ থেকে নিহত কুরাইশদের প্রতিশোধ নিতে না পারবে ততক্ষণ পর্যন্ত সে নিজ স্ত্রীর সাথে সহবাস করা থেকে বিরত থাকবে। তাই তার এ নযর পুরো করার জ তাকে বাধ্য হয়েই আক্রমণ

চালাতে হয়েছিল। সে দু'শ ' লোক নিয়ে রওয়ানা হয় এবং মদীনার বাইরে বসবাসকারী ইয়া দী বনি নাযির গোত্রের প্রধান সালাম বিন মুশকামের পরামর্শ ও দিক- নির্দেশনায় একজন মুসলমানকে হত্যা করে এবং 'আরিয ' নামক একটি এলাকার একটি খেজুর বাগানে অি সংযোগ করে। এক ব্যক্তি তাৎক্ষণিকভাবে পুরো ঘটনা মদীনায় এসে মহানবী (সা.)- কে অবগত করে। মহানবী মদীনা থেকে বের হয়ে কিছুদূর শত্রুবাহিনীর পশ্চাদ্ধাবন করেন। কিন্তু আবু সুফিয়ান ও তার সৈ রা মুসলমানদের ধরা- ছোঁয়ার বাইরে চলে গিয়েছিল এবং এ পথে শত্রু সেনাদলের ফেলে যাওয়া সুওয়াইকের বেশ কিছু বস্তা মুসলমানদের হস্তগত হয়েছিল। এ কারণেই এ যুদ্ধের নাম হয়েছিল গাযওয়াতুস সুওয়াইক।[৬০৮]

গাযওয়াতু যিল আমর

এ মর্মে মদীনায় একটি সংবাদ এসে পৌঁছায় যে, গাতফান গোত্র একত্র হয়ে মদীনা দখলের পাঁয়তারা করছে। তাই মহানবী (সা.) ৪৫০ জন যোদ্ধা নিয়ে শত্রু সেনাদলের উদ্দেশে রওয়ানা হলেন। শত্রুরা ঘাবড়ে পাহাড়ে আশ্রয় নিল। এ সময় মুষলধারে বৃষ্টিপাত হলে মহানবী (সা.)- এর পোশাক- পরিচ্ছদ ভিজে গেল। মহানবী তাঁর সেনাদল থেকে একটু দূরে থেকে ভিজা পোশাকটি খুলে (শুকানোর জ) একটি গাছে ঝুলিয়ে রাখলেন। আর তিনি একটি গাছের নিচে বসে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। শত্রুরা পাহাড়ের ওপর থেকে মহানবীর গতিবিধির ওপর নজর রাখছিল। শত্রুপক্ষীয় এক বীর যোদ্ধা এ অবস্থার সুযোগ নিয়ে না । তলোয়ার নিয়ে পাহাড় থেকে নিচে নেমে এল। সে মহানবী (সা.)- এর মাথার ওপর তরবারি উঠিয়ে অত্যন্ত কর্কশ ভাষায় বলল, "আজ আমার ধারালো তরবারি থেকে কে তোমাকে রক্ষা করবে?" মহানবী (সা.) উচ্চৈঃস্বরে বললেন, "মহান আল্লাহ্।" এ কথা তার মধ্যে এতটা প্রভাব ফেলল যে, সে খুব ভয় পেয়ে গেল এবং তার দেহ কাঁপতে লাগল। এমতাবস্থায় তার হাত থেকে তরবারি পড়ে গেল। মহানবী তখনই উঠে দাঁড়িয়ে এ তরবারিটা হাতে নিলেন এবং তাঁকে আক্রমণ করে বললেন, "এখন আমার হাত থেকে তোমার জীবন কে রক্ষা করবে?" যেহেতু ঐ লোকটি ছিল মুশরিক এবং তার কাষ্ঠনির্মিত উপাস্যগুলো যে তাকে অত্যন্ত স্পর্শকাতর এ মুহূর্তে রক্ষা করতে অক্ষম এ বিষয়টি খুব ভালোভাবে উপলব্ধি করতে পারল, সেহেতু সে মহানবী (সা.)- এর উত্তরে বলল, "কেউ নেই।"

ঐতিহাসিকগণ লিখেছেন যে, ঐ লোকটি তখন ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। আর ভয় পেয়ে সে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে নি। কারণ পরবর্তীকালে সে ইসলাম ধর্মের ওপর অটল ও দৃঢ় থেকেছে। তার মুসলমান হওয়ার কারণ ছিল তার নির্মল সহজাত প্রকৃতি (ফিতরাত) জাগ্রত হওয়া। কারণ অনাকাঙ্ক্ষিত ও অস্বাভাবিক পরাজয় তাকে অ জগতের প্রতি মনোযোগী ও আগ্রহী করে তুলেছিল এবং সে নিজেও বুঝতে পেরেছিল যে, অ জগতের সাথে মহানবী (সা.)- এর যোগাযোগ ও সম্পর্ক আছে। মহানবী (সা.) ঐ লোকটির ঈমান গ্রহণ মেনে নিলেন এবং তার

হাতে তার তরবারিটা ফেরত দিলেন। সে কয়েক কদম চলে যাওয়ার পর আবার ফিরে এসে মহানবী (সা.)- এর খেদমতে হাজির হয়ে তরবারি রেখে ক্ষমা প্রার্থনা করল এবং বলল, “আপনি যেহেতু এ সংস্কারকামী সেনাদলের সর্বাধিনায়ক সেহেতু আপনি এ তরবারির জ অধিক উপযুক্ত।” [৬০৯]

কুরাইশদের বাণিজ্য কাফেলার গতিপথ পরিবর্তন

লোহিত সাগরের উপকূল মুসলিম সেনাবাহিনী এবং যারা মুসলমানদের সাথে সন্ধি ও মৈত্রী চুক্তিতে আবদ্ধ ছিল তাদের দ্বারা (মুশরিক কুরাইশদের বাণিজ্য কাফেলার জ) অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ ও বিপদসঙ্কুল হয়ে গিয়েছিল। কুরাইশরা পুনরায় পরামর্শ সভার আয়োজন করল এবং নিজেদের অবস্থা পর্যালোচনা করে দেখল। আলোচনা- পর্যালোচনা করার পর সকলেই বলল, "আমাদের ব্যবসা- বাণিজ্য যদি বন্ধ হয়ে যায় তাহলে ধীরে ধীরে আমাদের পুঁজি হারাব এবং এর ফলে আমরা মুসলমানদের কাছে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হব। আর যদি আমরা ব্যবসা- বাণিজ্যে মশগুল হই তাহলেও এ কাজে আমাদের সাফল্যের কোন আশা নেই। কারণ মুসলমানরা এ পথেও আমাদের বাণিজ্যিক পণ্যসামগ্রীগুলো জব্দ করতে পারে।

তখন তাদের মধ্যে থেকে এক ব্যক্তি ইরাকের ওপর দিয়ে শামে যাওয়ার প্রস্তাব দিল। তার প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হলো। কুরাইশদের বাণিজ্যিক পণ্যসামগ্রী বহনকারী বাণিজ্যিক কাফেলা রওয়ানা হওয়ার জ প্রস্তুত হলো। আবু সুফিয়ান এবং সাফওয়ান ইবনে উমাইয়্যা নিজেরাই বাণিজ্য কাফেলার তদারকি ও পরিচালনার ভার নিল। আর তারা ফুরাত ইবনে হাইয়ান নামক বনি বকর গোত্রের এক ব্যক্তিকে এ বাণিজ্য কাফেলার পথপ্রদর্শক করে নিয়ে গেল।

মাকরীযী[৬১০] লিখেছেন, "মদীনাবাসী এক ব্যক্তি পুরো ঘটনা প্রত্যক্ষ করে মদীনায় ফিরে এসে নিজ বন্ধুকে জানায়। অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই মহানবী (সা.) এ ব্যাপারে অবগত হওয়ার পর যায়েদ ইবনে হারেসের নেতৃত্বে একদল সেনাবাহিনী বাণিজ্য- কাফেলাকে বাধা দেয়ার জ প্রেরণ করেন। এ সেনাদলটি দু'ব্যক্তিকে বন্দী ও বাণিজ্য কাফেলা জব্দ করার মাধ্যমে কুরাইশদেরকে নতুন পথে শামের উদ্দেশে সফর করা থেকে বিরত রাখে।

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত

তথ্যসূচী ও টিকা

১. কাযী আবদুর রহমান ইবনে মুহাম্মদ খাদরামী মালেকী (মৃ. ৮০৮ হি.); যদিও তাঁর ‘আল মুকাদ্দামাহ্ ওয়াত তারিখ’ গ্রন্থে কতিপয় ঐতিহাসিক ঘটনার ব্যাখ্যা- বিশ্লেষণে তিনি অনেক ভুল করেছেন, তবুও এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও উপকারী একটি গ্রন্থ যা সম্পূর্ণ নতুন এবং উদ্ভাবনী দিকসম্বলিত।

২. তামাদ্দুনে ইসলাম ওয়া আরাব (ইসলাম ও আরবের সভ্যতা), পৃ. ৯৩- ৯৪।

৩. সাম্প্রতিককালে ইয়েমেন উত্তর ও দক্ষিণ- এ দু’অংশে বিভক্ত হয়েছে এবং প্রতিটি অংশেরই পৃথক সরকার ও সেনাবাহিনী রয়েছে।

৪. ইসলাম ও পাশ্চাত্য সভ্যতা, পৃ. ৯৬।

৫. এতৎসংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্যের জ ‘জুগরফিয়য়ে কেশভারহয়ে ইসলামী’ (মুসলিম দেশসমূহের ভূগোল) নামক গ্রন্থ অধ্যয়ন করা যেতে পারে।

৬. তামাদ্দুনে ইসলাম ওয়া আরাব, পৃ. ৭৮- ১০২।

৭ প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৬।

৮. মুরুজুয্ যাহাব, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩৭৩।

৯. নাহজুল বালাগাহ্, খুতবাহ্ নং ২৬ :

إنّ الله بعث محمّدا (ص) نذيرا للعالمين و أمينا على التّنْزيل و أنتم معشر العرب على شرّ دين و في شرّ دار منيخون بين حجارة خشن و حيّات صمّ، تشربون الكدر و تأكلون الحشب و تسفكون دماءكم و تقطعون أرحامكم، و الأصنام فيكم منصوبة، و الآثام بكم معصوبة

১০.(قل تعالوا أتل ما حرّم ربّكم عليكم ألّا تشركوا به شيئا)

১১. (و بالوالدين إحسانا)

১২. (و لا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم و إيّاهم)

১৩. (و لا تقربوا الفواحش ما ظهر منها و ما بطن)

১৪. (و لا تقتلوا النّفس الّتي حرّم الله إلّا بالحقّ، ذالكم وصّاكم به لعلكم تعقلون)

১৫. (و لا تقربوا مال اليتيم إلّا بالّتي هي أحسن حتّى يبلغ أشدّه)

১৬. (و أوفوا الكيل و الميزان بالقسط)

১৭. (لا نكلّف نفسا إلّا وسعها)

১৮. (و إذا قلتم فاعدلوا و لو كان ذا قربى)

১৯. (و بعهد الله أوفوا ذالكم وصّاكم به لعلّكم تذكّرون)

অনুবাদ : বলে দিন, (তোমরা) এসো, তোমাদের প্রভু মহান আল্লাহ্ তোমাদের ওপর যা হারাম করেছেন তা আমি তোমাদেরকে পাঠ করে শুনাই : তোমরা যেন তাঁর সাথে কোন কিছু শরীক না কর। তিনি নির্দেশ দিয়েছেন : তোমরা যেন তোমাদের পিতা- মাতার প্রতি সদাচরণ কর। দারিদ্র্যের ভয়ে তোমাদের সন্তানদেরকে হত্যা কর না। আমরা তোমাদেরকে এবং তাদেরকে জীবিকা দান করি। তোমরা গোপন ও প্রকাশ্য পাপাচারের নিকটবর্তী হয়ো না। একমাত্র সত্য ও ায্য কারণ ব্যতীত মহান আল্লাহ্ যে সব প্রাণ হত্যা নিষিদ্ধ করেছেন তা তোমরা হত্যা কর না। আল্লাহ্ তোমাদেরকে এর নির্দেশ দিয়েছেন। আশা করা যায় যে, তোমরা তা অনুধাবন করবে। তোমরা যা সর্বোত্তম তা ব্যতীত অ কোন উপায়ে বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়া পর্যন্ত অনাথের সম্পত্তি ও সম্পদের নিকটবর্তী হয়ো না। ায়পরায়ণতার সাথে ওজন ও দাড়িপাল্লা পূর্ণ কর। আমরা কোন প্রাণের ওপর তার সাধ্যাতীত দায়িত্ব চাপিয়ে দেই না। আর যখন তোমরা কোন কথা বলবে তখন ায়পরায়ণতা অবলম্বন করবে, এমনকি নিকটাত্মীয় হলেও। মহান আল্লাহর সাথে যে অ ীকার করেছ তা পালন কর। তোমাদের প্রতি এটিই হচ্ছে মহান আল্লাহর নির্দেশ। আশা করা যায় যে, তোমরা তা স্মরণ রাখবে। ”

২০. আলামুল ওয়ারা, পৃ. ৩৫- ৪০ ও বিহারুল আনওয়ার, ১৯তম খণ্ড, পৃ. ৮- ১১।

২১. নাহজুল বালাগাহ্, খুতবাহ্ নং ১।

২২. কালবী নামে প্রসিদ্ধ নাসসাবাহ্ কর্তৃক প্রণীত আল আসনাম, পৃ. ২৩।

২৩. নাহজুল বালাগাহ্, খুতবা : ৩৬।

২৪. মু’জামুল মাতবূআত, পৃ. ২৯৭।

২৫. সূরা তাকভীর : ৮।

২৬. ইবনে আসীর ‘উসদুল গাবাহ্ ’ গ্রন্থে ‘কাইস ’ ধাতু শিরোনামে তার থেকে বর্ণনা করেছেন : মহানবী (সা.) জিজ্ঞাসা করলেন, এ পর্যন্ত কয়টা মেয়েকে তুমি জীবন্ত দাফন করেছ? সে বলেছিল, ১২টি মেয়েকে। এ কাহিনী মুহম্মদ আলী সালেমীন রচিত হযরত মুহাম্মদ (সা.)- এর জীবনী গ্রন্থের ২৪- ২৫ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

২৭. সূরা নাহল : ৬০।

২৮. তুহাফুল উকূল, পৃ. ৩৩- ৩৪।

২৯. ইসলাম ও জাহেলিয়াত, পৃ. ২৪৫।

৩০. ইবনে খালদুনের মুকাদ্দামাহ্, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৮৫ ও ২৮৬।

৩১. আল- আরাবু কাবলাল ইসলাম (ইসলামপূর্ব আরব জাতি), পৃ. ১২৮।

৩২. আরব জাতির ইতিহাস ও তাদের রীতিনীতিসমূহ, পৃ. ৪৭; ইবনে আসীরের আল- কামিল ফীত তারিখ, ১ম খণ্ড, পৃ. ২০৪।

৩৩. আরবের ইতিহাস, ফিলিপ হিট্টি প্রণীত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১১১।

৩৪.

فليـــــــت لى بِهِـــــم قومـــــا إذا ركبـــــوا   شـــــنّوا الإغـــــارة فرســـــانا و ركبانـــــا

৩৫. সূরা আলে ইমরান : ১০৩।

৩৬. أنصر أخاك ظالما و مظلوما তাদের স্লোগানই ছিল : তোমার ভাইকে সাহায্য কর- চাই সে জালেমই হোক বা মজলুমই হোক। (জালেমকে সাহায্য করার মানে হচ্ছে তাকে জুলুম করা থেকে বিরত রাখা) যদিও মহানবীর হাদীসে উপরিউক্ত বাক্যের সঠিক ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে।

৩৭. বিহারুল আনওয়ার, ২২তম খণ্ড, পৃ. ১৫৫।

৩৮. প্রাগুক্ত, ১৫ তম খণ্ড, পৃ. ৩৯২।

৩৯. সাইয়্যেদ মাহমূদ আলূসীর রচনাবলী, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৮৬- ৩৬৯।

৪০. তুহাফুল উকূল, পৃ. ২৫; সীরাতে ইবনে হিশাম, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪১২।

৪১. সীরাতে ইবনে হিশাম, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪১২।

৪২. গাভীগুলো পানি না খাওয়ার অপরাধে ষাঁড়গুলোকে যে প্রহার করা হতো এ প্রসে এক আরব কবি বলেছেন,

فـــــإنّي إذا كـــــالثور يضـــــرب جنبـــــه   إذا لم يعـــــف شـــــربا و عافـــــت صـــــواحبه

" অতঃপর আমি এখন ঐ ষাঁড়ের ায় যার পা ´দেশে প্রহার করা হয় তখন

যখন তা পান করা থেকে থাকেনি বিরত এবং গাভীগুলো থেকেছে বিরত। "

৪৩. মান লা ইয়াহ্দুরু ল ফাকীহ্, পৃ. ২২৮; জীবজন্তুর অধিকার সংক্রান্ত বর্ণনাসমূহ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করার জ আশ্শুয়ূনুল ইকতিসাদিয়াহ্ গ্রন্থ, পৃ. ১৩০-১৫৯।

৪৪. আত্তাজ, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৭৮।

৪৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৯।

৪৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৪।

৪৭. সাফীনাহ্, رقي ধাতু।

৪৮. ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ও সংগ্রামে সাম্রাজ্যবাদের নীলনকশাসমূহ, পৃ. ৩৮।

৪৯. তামাদ্দুনে ইসলাম ওয়া আরাব, পৃ. ৮৭।

৫০. খসরু পারভেজ থেকে চে স পর্যন্ত, পৃ. ১২০-১২১।

৫১. সুরিয়ানী ভাষায় 'হীরা' শব্দটির অর্থ সংরক্ষিত ও সুরক্ষিত এলাকা।

৫২. ফত ল বুলদান, পৃ. ৪৩৭।

৫৩. সানা মুলূকিল আরদ, পৃ. ৭৩-৭৬।

৫৪. দাইনূরী প্রণীত আল আখবারুত তিওয়াল, পৃ. ১০৯, কায়রো থেকে মুদ্রিত।

৫৫. সীরাতে ইবনে হিশাম, পৃ. ১২২-১২৩।

৫৬. সীরাতে ইবনে হিশাম, ১ম খণ্ড, পৃ. ৭৮-৮১; আমালাকা প্রাক-ইসলাম যুগের একটি আরব গোত্র যারা কালক্রমে বিলুপ্ত হয়ে গেছে।

৫৭. আবুল হাসান বালাযুরী প্রণীত ফুত ল বুলদান, পৃ. ৪৫৭ ও ৪৫৯।

৫৮. আরব জাতি ও সমাজের বিভিন্ন গোত্র, তাদের আচার-প্রথা, আকীদা-বি াস ও কৃষ্টি-সংস্কৃতি ইত্যাদির সাথে পরিচিত হওয়ার জ নিম্নোক্ত দু'টি বই অধ্যয়ন করা উচিত : ক. মাহমুদ আলূসী (মৃ. ১২৭০) প্রণীত 'বুলূগুল আরাব ফী মারেফাতি আহওয়ালিল আরব'; খ. প্রফেসর জাওয়াদ আলী প্রণীত 'আল মুফাসসাল ফী তারিখিল আরাব কাবলাল ইসলাম'; এ গ্রন্থটি ১০ খণ্ডে লেখা। এর সকল অধ্যায় জাহেলী আরব জাতির জীবন সংক্রান্ত।

৫৯. পয়গম্বর হযরত মুহাম্মদ (সা.), রাহনামা প্রণীত, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪২-৪৩; মুহাম্মদ তাকী খান হাকীম 'মুতামাদুস্ সুলতান' 'গাঞ্জে দানেশ' নামক গ্রন্থে কিসরা বা খসরুর সদর দরজার উপরিস্থ প্রশস্ত বারান্দা অর্থাৎ আইভান সংক্রান্ত গবেষণা ও তথ্যানুসন্ধান উপলক্ষে নিগারিস্তানের কার্পেটটি খুব সূক্ষ্মভাবে চিত্রিত করেছিলেন।

৬০. প্রাগুক্ত।

৬১. প্রাগুক্ত।

৬২. সানা মুলূকিল আবদ ওয়াল আম্বিয়া, পৃ. ৪২০।

৬৩. তারিখে তাবারী, ক্রিশ্চিয়ান সনের উদ্ধৃতি অনুসারে, পৃ. ৩২৭।

৬৪. ইরানের সামাজিক ইতিহাস, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬- ২৪।

৬৫. মুসলমানদের পতনের কারণে বি কেন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, পৃ. ৭০- ৭১।

৬৬. ইরান ফি আহিদস্ সাসানীঈন (সাসানী শাসনামলে ইরান), পৃ. ৪২৪।

৬৭. মুরুজুয্ যাহাব, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৬৩- ২৬৪।

৬৮. ইরানের সামাজিক ইতিহাস, পৃ. ৬১৮।

৬৯. ইরানের সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৪৬।

৭০. মুরুজুয্ যাহাব, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৬৪।

৭১. এ ব্যাপারে নিম্নোক্ত গ্রন্থাবলী লক্ষ্য করুন : আল্লামা সুয়ূতীর তাযকিরাতুল মওযূআত, আল লাআলী আল মওযূআহ্ এবং হাইসামীর মাজমাউয যাওয়ায়েদ।

৭২. এ কাহিনী কবি ফেরদৌসী 'শাহনামা'য় পারস্য ও রোমের মধ্যকার যুদ্ধ সংক্রান্ত সম্রাট আনুশীরওয়ানের বিভিন্ন কাহিনী বর্ণনা করা প্রসে উল্লেখ করেছেন। শাহনামা, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ২৫৭- ২৬০; ঠিক একইভাবে ড.সাহেবুয যামানী 'দীবাচেঈ বার রাহবারী' গ্রন্থে খুব চমৎকারভাবে এ কাহিনীর চুলচেরা বিশ্লেষণ করেছেন, দীবাচেঈ বার রাহবারী, পৃ. ২৫৮- ২৬২ এবং মাহদী কুলী খান হেদায়েত প্রণীত গুযারেশনামা- ই ইরান, পৃ. ২৩২।

৭৩. ইরানের সামাজিক ইতিহাস, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৬।

৭৪. সাসানীদের যুগে ইরান, পৃ. ৩১৮।

৭৫. মুরুজুয যাহাব, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৮১।

৭৬. ইরানের সামাজিক ইতিহাস, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৫- ১৯।

৭৭. সাসানী সভ্যতার ইতিহাস, ১ম খণ্ড, পৃ. ১।

৭৮. ইরানের সামাজিক ইতিহাস, ২য় খণ্ড, পৃ. ২০।

৭৯ মনী ধর্মমত আসলে ি ষ্টধর্মের সাথে যারদোশতী ধর্মমতের সংমিশ্রণে উদ্ভব হয়েছিল।

৮০. The Dictionary of the Holy Bible, 'বাবিল' শব্দ।

৮১. সূরা নাযিআত : ২৪।

৮২. সূরা কাসাস : ৩৮।

৮৩. তাফসীরে বুরহান, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৩৫।

৮৪. এখানে ফিতরাতগত তাওহীদ বলতে ঐ স্রষ্টান্বেষী আহ্বানকে বোঝানো হয়েছে যা সকল মানুষ এ ধরনের প্রবণতার ক্ষেত্রে বহিঃস্থ কার্যকারণ ও প্রভাবকের প্রভাবাধীন না হয়েই নিজ অস্তিত্ব ও সত্তার মধ্যে শুনতে পায়।

৮৫. সূরা আনআম : ৭৪; এ আয়াত মূর্তিপূজারীদের সাথে হযরত ইবরাহীম (আ.)- এর আলোচনা ও কথোপকথনের সাথে সংশ্লিষ্ট। আর পরবর্তী আয়াতসমূহ নভোমণ্ডলীয় জ্যোতিষ্ক ও তারকারাজির পূজারীদের সাথে তাঁর আলোচনা সংক্রান্ত।

৮৬. مبانی توحيد از نظر قرآن 'পবিত্র কোরআনের দৃষ্টিতে তাওহীদের মূল ভিতসমূহ' নামক গ্রন্থে আমরা তাওহীদের বিভিন্ন পর্যায় এবং সেগুলোর মধ্যকার পার্থক্য বিস্তারিত বর্ণনা করেছি এবং সেখানে প্রমাণ করেছি যে, মহান আল্লাহর সত্তার ক্ষেত্রে তাওহীদ, সৃষ্টিকর্তার একত্ব ও তাওহীদ থেকে ভিন্ন। আর এ দু'ধরনের তাওহীদ আবার প্রভুত্বের ক্ষেত্রে তাওহীদ থেকে ভিন্ন। এ তিন ধরনের তাওহীদ আবার একটি আরেকটি থেকে ভিন্ন আর এগুলোই হচ্ছে তাওহীদের বিভিন্ন পর্যায়। অনুগ্রহ করে বিস্তারিত জানার জ উপরিউক্ত গ্রন্থ অধ্যয়ন করুন।

৮৭. খোদাগণ বলতে আযর সে সব মূর্তি ও প্রতিমাকে বুঝিয়েছে যেগুলো মূর্তিপূজকদের দৃষ্টিতে খোদায়িত্বের পর্যায়ের অধিকারী; আর খোদা এদের দৃষ্টিতে বি ব্রহ্মাণ্ডের স্টা ও পরিচালকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং খোদার কোন কোন কাজ যার কাছেই অর্পণ করা হবে তাকেই খোদা বলা যাবে। যেমন যে সত্তা পাপ ক্ষমা করার পর্যায় অথবা শাফায়াতের পর্যায়ের অধিকারী হবে সে- ই খোদা বলে গণ্য।

৮৮. মাজমাউল বায়ান, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩১৯ এবং আল মিযান, ৭ম খণ্ড, পৃ. ১৭০।

৮৯ সূরা আম্বিয়া : ৫১- ৭০; ইবরাহীম (আ.)- এর জন্ম এবং মূর্তি ধ্বংস করা সংক্রান্ত বিষয়াদির ব্যাপারে বিস্তারিত জানার জ ইবনে আসীরের 'কামিল ফীত তারিখ', পৃ. ৫৩- ৬২ এবং বিহারুল আনওয়ারের ১২তম খণ্ডের পৃ. ১৪- ৫৫ অধ্যয়ন করুন।

৯০. تالله لأكيدنّ أصنامكم بعد أن تُولّوا مدبرين মহান আল্লাহর শপথ, তোমাদের মরুপ্রান্তরে গমন করার পর আমি অবশ্য অবশ্যই তোমাদের প্রতিমাসমূহের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করব।- সূরা আম্বিয়া : ৫৭।

৯১. বিহারুল আনওয়ার, কোম্পানী কর্তৃক প্রকাশিত, ৫ম খণ্ড, পৃ. ১৩০।

৯২. সা'দুস্ সুঊদ, পৃ. ৪১- ৪২ এবং বিহারুল আনওয়ার, ১২তম খণ্ড, পৃ. ১১৮।

৯৩. তাফসীরে কুমী, পৃ. ৫২ এবং বিহারুল আনওয়ার, ১২তম খণ্ড, পৃ. ১০০।

৯৪. বিহারুল আনওয়ার, ১২তম খণ্ড, পৃ. ১১২; কাসাসুল আম্বিয়া থেকে বর্ণিত।

৯৫. ইবনে আসীরের আল- কামিল ফীত তারিখ, ২য় খণ্ড, পৃ. ১ ও ২১।

৯৬. সীরাতে হালাবী, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৬।

৯৭. কাবার পদসমূহের অস্তিত্ব নিশ্চিতভাবে উক্ত গৃহ নির্মাণ করার সময় ছিল না। তবে বিভিন্ন উপলক্ষ, কারণ ও প্রয়োজনে ধীরে ধীরে এ সব পদের উৎপত্তি হয়েছিল। ইসলাম ধর্মের আবির্ভাবকাল পর্যন্ত পবিত্র কাবা সংক্রান্ত দায়িত্বসমূহ চার প্রকার ছিল। যথা : ক. কাবার তত্ত্বাবধান ও চাবিরক্ষকের দায়িত্ব; খ. সেকায়াত অর্থাৎ হ র দিবসগুলোতে বাইতুল্লাহর যিয়ারতকারীদের জ পানির ব্যবস্থা; গ. রিফাদাত্ অর্থাৎ হাজীদের খাবারের ব্যবস্থা করা এবং ঘ. মক্কাবাসীদের সভাপতিত্ব ও নেতৃত্ব, পতাকাবাহী ও সেনাবাহিনীর সেনাপতির পদ; তবে সর্বশেষ পদটি কোন ধর্মীয় বিষয়সম্বলিত ছিল না।

৯৮. তারিখে তাবারী, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৩।

৯৯. সীরাতে হালাবী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫।

১০০. প্রাগুক্ত।

১০১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬- ৭।

১০২. ইবনে আসিরের কামিল গ্রন্থ, ২য় খণ্ড, পৃ. ১০।

১০৩. ইবনে আসীরের কামিল ফীত তারিখ, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬, তারিখে তাবারী, ২য় খণ্ড, পৃ. ৮- ৯, সীরাতে হালাবী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৮।

১০৪. সীরাতে হালাবী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪১।

১০৫. জনগণের মধ্যে পাপ ও অপরাধের প্রসার আসমানী বিপদাপদ অবতীর্ণ হওয়ার অ তম কারণ। আর এটি মোটেও অসম্ভব নয় যে, অসৎ কীর্তিকলাপ দুর্ভিক্ষ, দুর্যোগ ও বিপদাপদ আনয়নকারী কার্যকারণাদির গতিপথে প্রভাব বিস্তার করে। এ বিষয়টি দার্শনিক নীতিমালার সাথে পূর্ণ সামঞ্জস্যশীল হওয়ার পাশাপাশি পবিত্র কোরআন ও হাদীসেও স্পষ্ট বর্ণিত হয়েছে। (সূরা আরাফের ৯৬ নং আয়াত দ্র.)

১০৬. তবে কেন অ া ব্যক্তি এ প্রস্তাব করে নি?- এর উত্তরে বলা যায় যে, একমাত্র আবদুল মুত্তালিব ব্যতীত সকলেই সম্ভবত পানি পাবার ব্যাপারে হতাশ হয়ে গিয়েছিল।

১০৭. তারিখে ইয়াকুবী, ১ম খণ্ড, পৃ. ২০৬; সীরাতে ইবনে হিশাম, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৫।

১০৮. উপরিউক্ত কাহিনীটি অনেক ঐতিহাসিক ও সীরাত রচয়িতা লিখেছেন। এ ঘটনাটি যেহেতু আবদুল মুত্তালিবের আত্মার বিরাটত্ব ও মহত্ত্ব এবং তাঁর ইচ্ছাশক্তি ও সংকল্পের দৃঢ়তাকে সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত করে এবং

সঠিকভাবে প্রমাণ করে যে, এ মহান ব্যক্তি তাঁর নিজ মানত ও প্রতিজ্ঞার প্রতি কতটা নিষ্ঠাবান ছিলেন! সেহেতু এটি এ দিক থেকে প্রশংসাযোগ্য।

১০৯. সীরাতে ইবনে হিশাম, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৫৩; বিহারুল আনওয়ার, ১৬তম খণ্ড, পৃ. ৯- ৭৪; মহানবী (সা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে : "আমি যিবহ অর্থাৎ কোরবানীর জ মানোনীত দু'ব্যক্তির সন্তান।" এ দু'জনের একজন হযরত ইসমাঈল (আ.) যিনি মুহাম্মদ (সা.)- এর পূর্বপুরুষ এবং অপর জন তাঁর (মহানবীর) পিতা আবদুল্লাহ্।"

১১০. আল কামিল ফীত তারিখ, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৫৩ থেকে সামনে: এ সব ব্যক্তি যারা সেদিন আগুনে জীবন্ত দগ্ধ হয়েছিল তাদেরকে পবিত্র কোরআনে আসহাবুল উখদূদ (অর্থাৎ গর্তওয়ালারা) বলা হয়েছে যা সূরা বুরুজের ৪- ৮ নং আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। মুফা সিরগণ এ আয়াতের শানে নুযূল বিভিন্নভাবে বর্ণনা করেছেন। মাজমাউল বায়ানের ৫ম খণ্ডের ৪৬৪- ৪৬৬ পৃ., সাঈদা, লেবানন থেকে মুদ্রিত।

১১১.

يـــــا ربّ لا أرجـــــو لهــــم ســـــواكا　　يـــــا ربّ فـــــامنع مـــــنهم حماكـــــا

إن عـــــدو البيــــت مـــــن عاداكـــــا　　امـــــــــنعهم ان يخربوافناكـــــــــا

لاهـــــــم ان العبـــــــد يمنـــــــع　　رحلـــــــــه فـــــــامنع رحالـــــــك

لا يغلـــــــــــبن صـــــــــــليبهم　　و محـــــــالهم عـــــــدوا محالـــــــك

"হে মোর প্রভু! আপনাকে ছাড়া আমি চাই না তাদেরকে

হে প্রভু! আপনার ঘরকে রাখুন নিরাপদ তাদের থেকে

তারাই আপনার ঘরের শত্রু যারা করেছে শত্রুতা আপনার সাথে

যদি তারা আপনার গৃহপ্রা ণকে করতে চায় ধ্বংস তাহলে বাধা দিন তাদেরকে।

দুশ্চিন্তার কোন কারণ নেই যদি বান্দা তার ঘর- বাড়ি করে রক্ষা

তাহলে আপনি করুন আপনার গৃহ রক্ষা

অবশ্যই বিজয়ী না হয় যেন তাদের ক্রুশ

আর তাদের শত্রুতামূলক চক্রান্ত যেন না করে আপনার পরিকল্পনাকে পরাভূত।"

১১২. ترميهم بحجارة من سجّيل - পবিত্র কোরআনের এ আয়াতটিতে।

১১৩. আল কামিল ফীত তারিখ, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৬৩।

১১৪. পবিত্র কাবাকে কেন্দ্র করে এর চারপাশে চার ফারসাখ দূরত্বের এলাকাকে হারাম এবং অবশিষ্টকে হিল (حل) বলে।

১১৫.

اليــــــوم يبــــــدو كلــــــه أو بعضــــــه ممّــــــا بــــــدا منــــــه فــــــلا أحلــــــه

" আজ প্রকাশিত হচ্ছে এর পুরোটা বা খানিকটা

যা কিছু এর প্রকাশ পেয়েছে আমি তার কিছুই খুলে ফেলব না।"

১১৬. ইবনে আসীরের আল কামিল ফীত তারিখ, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৬৬।

১১৭. তারিখে তাবারী, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৪।

১১৮. তারিখে ইবনে আসীর, ২য় খণ্ড, প.: ৪; পাদটীকা অংশ।

১১৯. সীরাতে হালাবী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৭।

১২০. তারিখে তাবারী, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬; ইবনে আসীরের আল- কামিল ফীত তারিখ, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪; সীরাতে হালাবী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৮।

১২১. তারিখে তাবারী, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬; ইবনে আসীরের আল কামিল ফীত তারিখ, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪।

১২২. পূর্ববর্তী সূত্র ছাড়াও সীরাতে ইবনে হিশাম, পৃ. ১৬৮; ইমামীয়াহ্ ঐতিহাসিক সূত্র: মানাক্বিব গ্রন্থ ও বিহারুল আনওয়ার, ১৫তম খণ্ড, পৃ. ১১৪।

১২৩. তারিখে তাবারী, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭- ৮; সীরাতে হালাবী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৯।

১২৪. সূরা ত্বাহা : ৪১- ৪৩।

১২৫. সূরা মরিয়ম : ১৮- ৩২।

১২৬. তারিখে ইয়াকুবী, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫; বিহারুল আনওয়ার, ১৫তম খণ্ড, পৃ. ২৪৮; সীরাতে হালাবী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬৪।

১২৭. আল ইমতা ’ গ্রন্থের ৩ পৃষ্ঠায় মাকরীযী মহানবীর জন্মদিন, মাস ও সাল সংক্রান্ত যত অভিমত আছে সেগুলো উল্লেখ করেছেন।

১২৮. কাফী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৩৯।

১২৯.   একমাত্র তুরাইহী ‘মাজমাউল বাহরাইন’ গ্রন্থে ‘শারক’ (شرق) ধাতু সম্পর্কে এমন এক ব্যক্তির উদ্ধৃতি নকল করেছেন যার পরিচয় অজ্ঞাত।

১৩০.   মহানবী (সা.) এ সত্যটি নিম্নোক্ত বাক্যের মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন,

و إنّ الزّمان قد اشتداز كهيئته يوم خلق السّماوات و الأرض "যে বি থেকে সময়ের সূচনা হয়েছিল সেখানেই (আজ) তা (সময়) ফিরে গেল। আর ঐ বি টি হলো ঐ দিন যেদিন মহান আল্লাহ্ আকাশসমূহ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছিলেন।"

১৩১.   বিহারুল আনওয়ার, ১৫তম খণ্ড, পৃ. ২৫২।

১৩২.   সীরাতে হালাবী, পৃ. ৯৭।

১৩৩, অ   এক দল লোকের মতে মহানবীর নাম নয়, বরং এগুলো পবিত্র কোরআনের রুফে মুকাত্তায়াতের অন্তর্গত।

১৩৪.   সীরাতে হালাবী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৯৩; কেউ কেউ বি াস করে যে, طه (ত্বাহা) ও يس (ইয়াসীন) শব্দদ্বয় মহানবীর নামসমূহের অন্তর্গত।

১৩৫.   انسان العيون في سيرة الأمين و المأمون গ্রন্থের ১ম খণ্ড, পৃ. ৯৩-১০০।

১৩৬.   বিহারুল আনওয়ার, ১৫তম খণ্ড, পৃ. ৩৮৪; ইবনে শাহরআশুব প্রণীত মানাকিব, ১ম খণ্ড, পৃ. ১১৯।

১৩৭.   সীরাতে ইবনে হিশাম, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৬২-১৬৩।

১৩৮.   বিহারুল আনওয়ার, ১৫তম খণ্ড, পৃ. ৪৪২।

১৩৯.   সীরাতে হালাবী, ১ম খণ্ড, পৃ. ১০৬।

১৪০.   বিহার, ১৫তম খণ্ড, পৃ. ৩৪৫।

১৪১.   মানাকিবে ইবনে শাহরআশুব, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৪।

১৪২.   সূরা আলে ইমরান : ৩২।

১৪৩.   সীরাতে ইবনে হিশাম, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৬৭।

১৪৪.   সূরা আরাফ : ১৫৭।

১৪৫.   সীরাতে ইবনে হিশাম, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৬৭।

১৪৬. যে ঘরে হযরত আবদুল্লাহর সমাধি অবস্থিত সে ঘরটি কিছুদিন আগেও অর্থাৎ মসজিদুন্নবী চত্বর বিস্তৃত করার পূর্ব পর্যন্ত বিদ্যমান ছিল, তবে সম্প্রতি চত্বরটি বিস্তৃত করার বাহানায় উক্ত ঘর ধ্বংস এবং সমাধির সকল নিদর্শন মিটিয়ে দেয়া হয়েছে।

১৪৭. সীরাতে হালাবী, ১ম খণ্ড, পৃ. ১২৫।

১৪৮. সীরাতে ইবনে হিশাম, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৬৮।

১৪৯. তারিখে ইয়াকুবী, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭ ও ৮; আবদুল মুত্তালিবের সীরাত এবং তিনি যে তাওহীদবাদী মুমিন ছিলেন এবং মূর্তিপূজক ছিলেন না এ ব্যাপারে আলোচনা করার পর ইয়াকুবী উল্লেখ করেছেন যে, ইসলামী শরীয়তে তাঁর প্রবর্তিত অনেক বিধান স্বীকৃত ও গৃহীত হয়েছে।

১৫০. সীরাতে ইবনে হিশাম, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৭৯।

১৫১. তারিখে ইয়াকুবী, ১ম খণ্ড, পৃ. ১২- এর নাজাফ সংস্করণে বর্ণিত আছে : আবু তালিব এ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন নি এবং বনি হাশিমের মধ্য থেকে কোন ব্যক্তিকে তিনি এ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করারও অনুমতি দেন নি।

১৫২. হযরত আবু তালিব তাঁর কবিতায় এ সফর সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন। ইবনে আসাকিরের ইতিহাস গ্রন্থের ১ম খণ্ডের ২৬৯- ২৭২ পৃষ্ঠায় এবং দীওয়ানে আবু তালিব- এর ৩৩- ৩৫ পৃষ্ঠায় দেখুন।

১৫৩. তারিখে তাবারী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৩ ও ৩৪; সীরাতে ইবনে হিশাম, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৮০- ১৮৩। ইবনে হিশাম ঘটনা প্রবাহটি আমাদের প্রদত্ত বিবরণের চেয়েও আরো বিস্তৃত ও ব্যাপকভাবে বর্ণনা করেছেন; তবে এর সংক্ষিপ্ত বিবরণই আমরা ওপরে বর্ণনা করেছি।

১৫৪. সীরাতে ইবনে হিশাম, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৯৪।

১৫৫. পবিত্র কোরআন, তাওরাত ও ইঞ্জিলের তুলনামূলক অধ্যয়ন করে পবিত্র কোরআনে বর্ণিত বিষয়াদি যদি তাওরাত ও ইঞ্জিলের ভা র সাথে মিলিয়ে দেখা হয় তাহলে প্রাচ্যবিদদের আরোপিত এ অপবাদের বৈজ্ঞানিক ও যৌক্তিক মূল্য পরিপূর্ণরূপে স্পষ্ট হয়ে যাবে। আমরা 'রাযে বুযুর্গে রিসালাত ' (রিসালাতের সুমহান রহস্য) নামক গ্রন্থে প্রাগুক্ত তুলনামূলক আলোচনা ও মূল্যায়ন সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। উক্ত গ্রন্থের ২১৭- ২২৩ পৃষ্ঠা অধ্যয়ন করুন।

১৫৬. তাওরাতের সৃষ্টি সংক্রান্ত পুস্তিকায় ২য় ও ৩য় অধ্যায়ে হযরত আদম ও বিবি হাওয়ার কাহিনীটির বিশদ বিবরণ দেয়া হয়েছে।

১৫৭. তাওরাতের ১৮তম অধ্যায়, ১- ৯ নং বাক্য।

১৫৮. ইউহান্নার ইঞ্জিল, ২য় অধ্যায়, ১- ১১ নং বাক্য।

১৫৯. মথির ইঞ্জিল, ২৬ অধ্যায়, ২৭ নং বাক্য।

১৬০. সূরা মায়েদাহ্ : ৯০

১৬১. মথির ইঞ্জিল, ১২তম অধ্যায়; মার্কের ইঞ্জিল, ১৩তম অধ্যায়; লুকের ইঞ্জিল, ৮ম অধ্যায়।

১৬২. ইঞ্জিল ও তাওরাতের কুসংস্কারসমূহ উপরিউক্ত উদাহরণগুলোর মাঝেই সীমাবদ্ধ নয়; এতৎসংক্রান্ত বিস্তারিত জানতে হলে ফাখরুল ইসলাম প্রণীত আনীসুল ইলাম, আল্লামা বালাগী প্রণীত আল দা ইলা দীনিল মুস্তাফা, এ লেখকের অনূদিত গ্রন্থ মারযহায়ে এ ’ জায (মুজিযার সীমা- পরিসীমাসমূহ) এবং মৎ প্রণীত ‘রায়ে বুযুর্গে রিসালাত ’ গ্রন্থ অধ্যয়ন করুন।

১৬৩. মুহাম্মদ আবদু কর্তৃক সম্পাদিত নাহজুল বালাগাহ্, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৯২।

১৬৪. সীরাতে ইবনে হিশাম, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৮৬; আন নিহায়াহ্ গ্রন্থে ইবনে আসীর উপরিউক্ত হাদীসটি উল্লেখ করেছেন এবং তাশদীদ সহকারে أنبّل (উনাব্বিলু) শব্দটি লিপিবদ্ধ করার পর বলেছেন, إذا ناولته النّبل يرمي নিক্ষেপ করার জ যখন তার কাছে তীর পৌঁছে দেবে... نبل ধাতু লক্ষ্য করুন।

১৬৫. আবদু সম্পাদিত নাহজুল বালাগাহ্, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২১৪।

১৬৬. সূরা তাওবার ৩৬ নং আয়াত থেকে প্রতীয়মান হয় যে, উক্ত চার মাসে যুদ্ধ নিষিদ্ধ হওয়ার বিধানটির ধর্মীয় ভিত্তি রয়েছে এবং হযরত ইবরাহীম (আ.)- এর সুন্নাত অনুসরণ করে জাহেলী আরবরা এ বিধানের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করত।

১৬৭. তারিখে কামিল, ১ম খণ্ড, পৃ. ৯৫৮ ও ৯৫৯; সীরাতে ইবনে হিশাম, পাদটীকা, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৮৪।

১৬৮. আল বিদায়াহ্ ওয়ান নিহায়াহ্, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৯২।

১৬৯. যুবাইর রচনা করেছেন :

إنّ الفضـــــــــول تعاقـــــــــدوا و تحـــــــــالفوا   ألّا يقـــــــيم بـــــــــبطن مكّـــــــــة ظـــــــالم

أمـــــــــر عليـــــــــه تعاقـــــــــدوا و تواثقـــــــــوا   فالجـــــــــار و المعـــــــــتر فـــــــــيهم ســـــــالم

“ সাধু- সজ্জনগণ পরস্পর প্রতিজ্ঞা ও চুক্তি করেছে

যে মক্কার বুকে যেন কোন জালেম না থাকে

এমন একটি বিষয় যার ওপর তারা করেছে চুক্তি,

পরস্পরের ওপর করেছে আস্থা স্থাপন

তাই তো প্রতিবেশী ও আগন্তুক তাদের মাঝে নিরাপদ। ”

১৭০. সীরাতে হালাবী, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৫৫- ১৫৭।

১৭১. সাফিনাতুল বিহার, 'নবী ' ধাতু।

১৭২. সীরাতে ইবনে হিশাম, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৬৬।

১৭৩ হালাবী ও যাইনী দাহলানের মতো কতিপয় সীরাত রচয়িতা মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)- এর পশুচারণের অন্তর্নিহিত দর্শন ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ফত ল বারী গ্রন্থের লেখকের অভিমত অনুসরণ করে এমন সব কথা বলেছেন যা যৌক্তিক নীতিমালার সাথে মোটেও খাপ খায় না। মহানবী (সা.)- এর পশুচারণের বিষয়টি যদি সত্যি হয়ে থাকে তাহলে এর কারণসমূহ হচ্ছে ঐগুলো যা ওপরে উল্লিখিত হয়েছে।)

১৭৪. বিহারুল আনওয়ার, ১৬তম খণ্ড, পৃ. ২২।

১৭৫. সীরাতে ইবনে হিশাম, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৫৮; ইবনে আসীরের আল কামিল ফীত তারিখ, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৪।

১৭৬. বিহারুল আনওয়ার, ১৬তম খণ্ড, পৃ. ২২।

১৭৭. তারিখে ইয়াকুবী, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৬, নাজাফ সংস্করণ।

১৭৮. আল খারায়েজ, পৃ. ১৮৬; বিহার ১৬তম খণ্ড, পৃ. ৪।

১৭৯ তাবাকাতে কুবরা, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৩০, দারু সাদের কর্তৃক মুদ্রিত।

১৮০. বিহার, ১৬তম খণ্ড, পৃ. ১৮।

১৮১. নাহজুল বালাগাহ্, খুতবাতুল কাসেআহ্।

১৮২. উসদুল গাবাহ্, 'আফীফ ' ধাতু।

১৮৩. সীরাতে ইবনে হিশাম, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৬।

১৮৪. বিহারুল আনওয়ার, ১৬তম খণ্ড, পৃ. ১৯।

১৮৫. সীরাতে ইবনে হিশাম, ১ম খণ্ড, পৃ. ২০৪।

১৮৬. প্রসিদ্ধি আছে যে, খাদীজার পিতা (খুওয়াইলিদ বিন আসাদ) ফিজার যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করেছিলেন। এ কারণেই তাঁর চাচা তাঁর পক্ষ থেকে বিয়ের আকদ- এর সীগাহ্ (নির্দিষ্ট ফর্মুলা) পাঠ করেছিলেন; এ কারণেই কতিপয় ঐতিহাসিক লিপিবদ্ধ করেছেন যে, খুওয়াইলিদ প্রথমে এ বিবাহে রাজী ছিলেন না; কিন্তু পরে তিনি খাদীজার তীব্র আগ্রহের কারণে রাজী হতে বাধ্য হয়েছিলেন- এটি সর্বৈব ভিত্তিহীন বলেই গণ্য।

১৮৭. মানাকিব, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩০; বিহারুল আনওয়ার, ১৬তম খণ্ড, পৃ. ১৬;

ثمّ إن ابن أخي هذا محمّد بن عبد الله (ص) لا يوازن برجل من قريش و لا يقاس باحد منهم الأعظم منه و ان كان في المال مقلّا فإن المال و ظل زائل

১৮৮. এটিই প্রসিদ্ধ যে, ওয়ারাকাহ্ ছিলেন খাদীজার চাচা। কিন্তু এ ব্যাপারে গবেষণা ও অনুসন্ধানের অবকাশ রয়েছে। কারণ খাদীজাহ্ খুওয়াইলিদের ক া এবং খুওয়াইলিদ আসাদের পুত্র। কিন্তু ওয়ারাকাহ্ নওফেলের পুত্র এবং নওফেল আসাদের পুত্র। অতএব, খাদীজাহ্ ও ওয়ারাকাহ্ উভয়ই পরস্পর চাচাতো ভাই- বোনই হবেন অর্থাৎ একজন চাচা ও অপর জন ভ্রাতুষ্পুত্রী ছিলেন না।

১৮৯. সীরাতে হালাবী, ১ম খণ্ড, পৃ. ১২৩।

১৯০. ইবনে শাহরআশুবের মানাকিব, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৪০; কুরবুল আসনাদ, পৃ. ৬ ও ৭; আল খিসাল, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৭; বিহারুল আনওয়ার, ২২তম খণ্ড, পৃ. ১৫১ ও ১৫২। কেউ কেউ মহানবীর পুত্রসন্তানদের সংখ্যা দু'য়ের অধিক বলেছেন, দ্র. তারিখে তাবারী, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৫; বিহারুল আনওয়ার, ২২তম খণ্ড, পৃ. ১৬৬।

১৯১. শেখ তূসী প্রণীত আমালী, পৃ. ২৪৭।

১৯২. হায়াতে মুহাম্মদ, পৃ. ১৮৬।

১৯৩. আল ইসাবাহ্, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৪৫; উসদুল গাবাহ্, ২য় খণ্ড, পৃ. ২২৪।

১৯৪. ما حجر نطوف به لا يسمع و لا يبصر و لا يضر و لا ينفع - সীরাতে ইবনে হিশাম, ১ম খণ্ড, পৃ. ২২২ ও ২২৩।

১৯৫. ইবনে হিশাম তাঁর সীরাত গ্রন্থের ১ম খণ্ডের ২২৬- ২২৮ পৃষ্ঠায় দীনে হানীফের অনুসারীদের তাওহীদ সংক্রান্ত কবিতার উদ্ধৃতি দিয়েছেন; যাইদ ইবনে আমরের কবিতার শুরুতে রয়েছে :

أربّـــــــا واحـــــــــدا أم ألـــــــــف ربّ أديـــــــن إذا تقسّـــــــــمت الأمـــــــور

" আমি কি এক- অদ্বিতীয় প্রভু কিংবা সহ প্রভুর প্রতি হব বিনয়াবনত

যখন (জগতের) সব বিষয় (হয়েছে) সুবি স্ত ও শৃঙ্খলাবদ্ধ। "

১৯৬. বাইরাহ্ ইবনে ওয়াহাব আল মাখযূমী এ ঘটনাটি তাঁর নিম্নোক্ত কাসীদায় বর্ণনা করেছেন :

رضـــــينا و قلنـــــا العـــــدل أوّل طـــــالع يجيـــئ مـــن البطحـــاء مـــن غـــير موعـــد

ففاجأنـــــا هـــــذا الأمـــــين محمّـــــد فقلنـــــا : رضـــــينا بـــــالأمين محمّـــــد

بخـــير قـــريش كلّهـــا أمـــس شـــيمة و في اليـــوم مـــع مـــا يُحـــدث الله في غـــد

فجـــــاء بـــــأمر لم يـــــر النّـــــاس مثلـــــه   أعـــــمّ و أرضـــــى في العواقـــــب و البـــــدّ

و تلـــــك يـــــد منـــــه علينـــــا عظيمـــــة   يـــــروب لهـــــا هـــــذا الرمـــــان و يعتـــــدي

" আমরা মেনে নিলাম ও বললাম : সে- ই হবে মধ্যস্থতাকারী যে প্রথম

বাতহা থেকে কোন (পূর্ব নির্ধারিত) প্রতিজ্ঞা ছাড়াই এখানে প্রবেশ করবে

আমাদের সামনে হঠাৎ এই আমীন (বি স্ত) মুহাম্মদ উপস্থিত হলেন

(তাঁকে দেখে) আমরা সবাই বলে উঠলাম : আমরা বি স্ত মুহাম্মদকে

মীমাংসাকারী হিসাবে মানতে রাজী

যিনি আজ এবং ভবি তে (সর্বযুগে) চরিত্র- গুণে কুরাইশদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ,

তিনি এমন এক সমাধান দিলেন জনগণ

কখনই এর নজির প্রত্যক্ষ করে নি ইতিপূর্বে

তার এ সমাধানটি ছিল সর্বজনীন এবং সবাইকে করেছিল সন্তুষ্ট

আর এটা তাঁর (পক্ষ) থেকে আমাদের ওপর (তাঁর) সুমহান অবদান ও করুণা। "

দ্র. সীরাতে ইবনে হিশাম, ১ম খণ্ড, পৃ. ২১২- ২৩২; আল কাফী, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২১৭; এখানে সবচেয়ে লক্ষণীয় ও আকর্ষণীয় বিষয় হচ্ছে, পবিত্র কাবাগৃহ নির্মাণ কাজ শুরু করার সময় ঘোষণা করা হয়েছিল :

لا تدخلوا في بنيانها من كسبكم إلّا طيّبا و لا تدخلوا فيها مهر بغي و لا بيع ربا و لا مظلمة أحد من النّاس

" পবিত্র কাবা নির্মাণ কাজে আপনাদের যে আয়- উপার্জন হালাল কেবল তা থেকেই ব্যয় করবেন; যে সব অর্থ অসৎ কাজ, হারাম ব্যবসা, সুদ অথবা জোর- জুলুম করে উপার্জন করা হয়েছে সে অর্থও কাবা নির্মাণ কাজে ব্যয় করতে পারবেন না। " নিশ্চিতভাবে এ সব বিষয় মহান নবীদের থেকে যাওয়া সুমহান আদর্শ ও শিক্ষামালার অন্তর্ভুক্ত যা তখনও জনগণের মধ্যে বিদ্যমান ছিল।

১৯৭. মাকাতিলুত তালিবীয়ীন, পৃ. ২৬; তারিখে কামিল, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৭; সীরাতে ইবনে হিশাম, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৩৬।

১৯৮. নাহজুল বালাগাহ্, খুতবা ১৯০।

১৯৯. তারিখুল খামীস, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৫৮।

২০০. নাহজুল বালাগাহ্, আবদু সংকলিত, খুতবা নং ১৯০; ফাইযুল ইসলাম সংকলিত নাহজুল বালাগাহ্, পৃ. ৭৭৫।

২০১. প্রাগুক্ত।

২০২. নবুওয়াতের আগে মহানবীর ধর্ম সম্পর্কে যাঁরা অধ্যয়ন করতে চান তাঁরা নিম্নোক্ত গ্রন্থগুলো অধ্যয়ন করতে পারেন :

ক. আয- যারীআহ্ : সাইয়্যেদ মুরতাজা আলামুল দা প্রণীত (জন্ম ৩৫৫ হি. ও মৃত্যু ৪৩৬ হি.)

খ. আল- ইদ্দাহ্ : মুহাম্মদ বিন হাসান তূসী প্রণীত (জন্ম ৩৮৫ হি. মৃত্যু ৪৬০ হি.)

গ. বিহারুল আনওয়ার, ১৮তম খণ্ড, পৃ. ২৭১- ২৮১ : আল্লামা বাকের আল মাজলিসী (মৃত্যু ১১১০ হি.) কর্তৃক সংকলিত।

২০৩. হেদায়েতে তাকভীনী : অস্তিত্বজগতে প্রতিটি বস্তু, পদার্থ ও প্রপঞ্চের অস্তিত্বের সুষ্ঠু বিকাশের যাবতীয় উপায়- উপকরণ নির্ধারণ ও সে দিকে সেগুলোকে পরিচালিত করা।

২০৪. এ বিষয়টি নিম্নোক্ত আয়াত থেকেও স্পষ্ট হয়ে যায়। আয়াতটি হলো :

كان النّاس أمّة واحدة فبعث الله النّبيّين مبشّرين و منذرين و أنزل معهم الكتاب بالحقّ ليحكم بين النّاس فيما اختلفوا فيه

"মানব জাতি অবিভক্ত একক জাতি ছিল; তাই মহান আল্লাহ্ নবীদেরকে সুসংবাদদাতা ও ভয় প্রদর্শনকারী হিসাবে প্রেরণ করেছেন এবং যে সব ক্ষেত্রে জনগণ মতবিরোধ করেছে সে সব ক্ষেত্রে ফায়সালা করার জ সত্যসহ ঐশী গ্রন্থও তাঁদের (নবীদের) সাথে অবতীর্ণ করেছেন।" (সূরা বাকারাহ্ : ২১২)

২০৫. নাহজুল বালাগাহ্, ভাষণ ১।

২০৬. সহীহ বুখারী, ১ম খণ্ড, ইলম (জ্ঞান) অধ্যায় পৃ. ৩; বিহারুল আনওয়ার, ১৮তম খণ্ড, পৃ. ১৯৪।

২০৭. সীরাতে ইবনে হিশাম, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৩৬; সহীহ আল বুখারী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩; হাদীসের এ অংশটি যা আমরা এখানে বর্ণনা করেছি তা সহীহ (সত্য) ও নির্ভুল। তবে এ হাদীসের নিচে পাদটীকায় কোন শোভাবর্ধক বাড়তি বর্ণনা নেই; আর যদি থেকে থাকে তাহলে তা অবশ্যই প্রত্যাখ্যাত বলে গণ্য হবে। আমরা মাফাহীমুল কোরআন গ্রন্থের ৩য় খণ্ডে সনদ ও মতনের (মূল পাঠ) দিক থেকে এ হাদীস প্রসে আলোচনা করেছি।

২০৮. এ সব দলিল- প্রমাণের বিস্তারিত বিবরণ ইশারাত ও আসফারের মতো দর্শনশাস্ত্রের গ্রন্থাবলীতে পাঠ করে দেখুন। এ সব দলিল- প্রমাণের মধ্যে কয়েকটি মৎ প্রণীত 'পবিত্র কোরআনের দৃষ্টিতে আত্মার মৌলিকত্ব' এবং 'ইসলামী বি দৃষ্টি' গ্রন্থদ্বয়ে উল্লেখ করা হয়েছে। আগ্রহী পাঠকদেরকে উক্ত গ্রন্থদ্বয় অধ্যয়ন করার অনুরোধ করা হচ্ছে।

২০৯. আমরা যদি বলি, 'সম্ভব', তাহলে তা এজ যে, এ ধরনের ইলহামসমূহের উৎস স্পষ্ট নয়; আর অন্তঃকরণের ওপর যে কোন ধরনের আকস্মিক প্রক্ষিপ্ত ও অনুপ্রবিষ্ট বিষয়াদি যেগুলোর উৎসমূল অজ্ঞাত সেগুলোর

ওপর নির্ভর করা যায় না। অ   ভাবে বলা যায় যে, মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে ইলহাম এবং শয়তানের পক্ষ থেকে ইলহামের মধ্যে অবশ্যই শরীয়তভিত্তিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক মূলনীতিসমূহের আলোকে পার্থক্য করতে হবে।

২১০. বিহারুল আনওয়ারের ১৮তম খণ্ড, পৃ. ১৯৩, ১৯৪, ২৫৫ ও ২৫৬ অধ্যয়ন করে দেখুন।

২১১. (نزل به الرّوح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربيّ مبين) - সূরা শুআরা : ১৯৫। আর সূরা শুরায় উপরিউক্ত সকল পথ ও পদ্ধতি সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। আর এতদপ্রসংে 'রিসালাতে জাহানীয়ে পিয়াম্বারান ' (মহান নবীদের বি জনীন রিসালাত) গ্রন্থ অধ্যয়ন করতে পারেন।

২১২. মাজমাউল বায়ান, ১০ম খণ্ড, পৃ. ৩৮৪।

২১৩. তাবাকাতে ইবনে সা'দ, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৭৯; হায়াতু মুহাম্মদ (সা.), ১ম খণ্ড, পৃ. ১৯৫।

২১৪. তারিখে তাবারী, ২য় খণ্ড, পৃ. ২০৫।

২১৫. তাফসীরে তাবারী, ৩০তম খণ্ড, পৃ. ১৬১, সূরা আলাকের ব্যাখ্যা এবং সীরাতে ইবনে হিশাম, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৩৮।

২১৬. সূরা ত্বাহা : ২৯।

২১৭. هذا النّاموس الّذي أنزل على موسى بن عمران- সীরাতে ইবনে হিশাম, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৩৮; মর ম আল্লামা মাজলিসী বিহারুল আনওয়ার গ্রন্থের ১৮তম খণ্ডের ২২৮ পৃষ্ঠায় আল মুনতাকা গ্রন্থ থেকে এবং و عيسى 'এবং ঈসা' শব্দও বর্ণনা করেছেন; তবে এ কাহিনীর উৎস সহীহ বুখারী ও সীরাতে ইবনে হিশামে و عيسى শব্দটির উল্লেখ নেই।

২১৮. إنّ الله اتّخذ عبدا رسولا أنزل عليه السّكينة و الوقار فكان الّذي يأتيه من قبل الله مثل الّذي يراه بعينه- বিহারুল আনওয়ার, ১১তম খণ্ড, পৃ. ৫৬।

২১৯. মাজমাউল বায়ান, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৮৪।

২২০. লওহে মাহফূয ও বাইতুল মামূর সংক্রান্ত ব্যাখ্যা জানার জ   আগ্রহী পাঠকবর্গকে তাফসীরের গ্রন্থসমূহ অধ্যয়ন করার জ   অনুরোধ করা হচ্ছে।

২২১. মানাহিলুল ইরফান ফী উলূমুল কোরআন, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৭।

২২২. আল মীযান, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৪-১৬।

২২৩. (لا تعجل بالقرآن من قبل أن يُقضى إليك وحيه) "আপনার প্রতি ওহী (অবতীর্ণ) করার আগেই পবিত্র কোরআনের ব্যাপারে ত্বরা করবেন না" - সূরা ত্বাহা : ১১৪।

২২৪. বিহারুল আনওয়ার, ১৮তম খণ্ড, পৃ. ১৮৪-১৯০, ১৯৩, ২৫৩; আল কাফী, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৬০; তাফসীর-ই আইয়াশী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৮০; এ উত্তরটি সহীহ আল বুখারীতে যা বর্ণিত হয়েছে অর্থাৎ সূরা আলাকের নুযূল এবং মহানবীর বেসাত একই সাথে সংঘটিত হওয়ার সেই বর্ণনার সাথে মোটেও সংগতিশীল নয়।

২২৫. সীরাতে ইবনে হিশাম, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৪০।

২২৬. সীরাতে ইবনে হিশাম, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৩৬; এ ঘটনাটি মহানবীর নবুওয়াতে অভিষেকপূর্ব ঘটনাবলী সংক্রান্ত অধ্যায়েও বর্ণিত হয়েছে।

২২৭. শেখ মুহাম্মদ আবদু সম্পাদিত নাহজুল বালাগাহ্, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৮২; মিশর থেকে মুদ্রিত এবং তিনি ঐ একই খুতবায় বলেছেন, اللّهمَّ إنِّي أوّلَ مَنْ أناب وسمِعَ وأجابَ لم يسبِقْني إلّا رسولُ اللهِ بالصّلاةِ "হে আল্লাহ্! নিশ্চয়ই আমি সর্বপ্রথম ব্যক্তি যে তওবা করেছে, শুনেছে এবং আহ্বানে সাড়া দিয়েছে এবং নামায পড়ার ক্ষেত্রে একমাত্র রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ব্যতীত আর কোন ব্যক্তিই আমার চেয়ে অগ্রগামী হতে পারে নি।"

২২৮. আল ইসাবাহ্, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৮০; তারিখে তাবারী, ২য় খণ্ড, পৃ. ২১১; আল কামিল ফীত তারীখ, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৭ ও ৩৮; আ'লামুল ওয়ারা, পৃ. ২৫; এবং উসদুল গাবাহ্, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪১৪।

২২৯. কোন কোন বর্ণনায় পাঁচ বছরের উল্লেখ আছে। আর অগণিত দলিল ও সাক্ষ্যপ্রমাণের ভিত্তিতে বলা যায় যে, এ বছরগুলোর মধ্যে কয়েকটি বছর মহানবী (সা.)-এর নবুওয়াতের অভিষেকেরও আগে ছিল। অর্থাৎ নবুওয়াতে অভিষেকের আগেও কয়েক বছর হযরত আলী (আ.) মহানবী (সা.)-এর সাথে মহান আল্লাহর ইবাদাত-বন্দেগী করেছেন।

২৩০. আল গাদীর গ্রন্থে এ সব ব্যক্তির নাম বর্ণিত হয়েছে।

২৩১. ইকদুল ফারীদ, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৪৩।

২৩২. তাফসীর-ই রু ল মাআনী, ৩০তম খণ্ড, পৃ. ১৫৭; সীরাতে হালাবী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৪৯-৩৫০।

২৩৩. সীরাতে ইবনে হিশাম, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩০০-৩০১।

২৩৪. তাফসীরে কুরতুবী, ১০ম খণ্ড, পৃ. ৭১-৮৩; সীরাতে হালাবী, ১ম খণ্ড, পৃ.৩৪৯।

২৩৫. প্রাগুক্ত।

২৩৬. তাফসীরে রূ ল মাআনী, ৩০তম খণ্ড, পৃ. ১৫৭।

২৩৭. তাফসীরে তাবারীর টীকা সম্বলিত ‘গোরায়েবুল কোরআন ’ (পবিত্র কোরআন সংক্রান্ত আশ্চর্যজনক বিষয়াদি) নামক গ্রন্থ; তাফসীরে আবুল ফাতূহ, ১২শ খণ্ড, পৃ. ১০৮।

২৩৮. মাজমাউল বায়ান, ১০ম খণ্ড, সূরা আদ দুহার তাফসীর।

২৩৯. তাফসীরে তাবারী, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৫২।

২৪০. যানজানী প্রণীত তারীখুল কোরআন, পৃ. ৫৮।

২৪১. পবিত্র কোরআনের পর্যায়ক্রমিক অবতরণের রহস্যসমূহ সম্পর্কে ভালোভাবে অবগত হওয়ার জ ‘খিমা- ই ইনসানে কামেল দার কোরআন ’ (পবিত্র কোরআনে ইনসানে কামিলের স্বরূপ) নামক গ্রন্থের ১৪০- ১৫০ পৃষ্ঠা অধ্যয়ন করুন।

২৪২. সীরাতে ইবনে হিশাম, ১ম খণ্ড; পৃ. ২৪৫- ২৬২।

২৪৩. তারীখে তাবারী, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬১।

২৪৪. গৃহটি সাফা পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত ছিল এবং কিছুকাল আগেও তা ‘খাইযুরান ’ - এর গৃহ নামে প্রসিদ্ধ ছিল।- সীরাতে ইবনে হিশাম, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৬৩ এবং সীরাতে হালাবী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩১৯।

২৪৫. একজন কাজার সুলতান যখন তিনি ইংল্যান্ড সফরে গিয়েছিলেন।

২৪৬. আমরা সর্বসাধারণ পর্যায়ে মহানবী (সা.)- এর ইসলাম ধর্ম প্রচার কার্যক্রমের ব্যাপারে আগামী অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করব।

২৪৭. সীরাতে হালাবী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩২১।

২৪৮. তারিখে তাবারী, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬২- ৬৩; তারিখে কামিল, ২য় খণ্ড পৃ. ৪০- ৪১; মুসনাদে আহ্মাদ, ১ম খণ্ড, পৃ. ১১১ এবং ইবনে আবিল হাদীদ প্রণীত শার নাহজিল বালাগাহ, ১৩শ খণ্ড, পৃ. ২১০- ২২১।

২৪৯. শার নাহিজল বালাগাহ, ইবনে আবিল হাদীদ প্রণীত, মিশরীয় সংস্করণ, ১৩শ খণ্ড, পৃ. ২১৫- ২৯৫।

২৫০. إنّما مثلي و مثلكم كمثل رجل رأى العدوّ فانطلق يريد أهله فخشى أن يسبقوه إلى أهله فجعل يصيح يا

صباحاه- সীরাতে হালাবী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩২১।

২৫১. এ সব ব্যক্তির নাম ও বিশেষত্ব ইবনে হিশাম তাঁর সীরাত গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।

২৫২. সীরাতে ইবনে হিশাম, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৬৫ :

يا أبا طالب إن ابن أخيك قد سبّ آلهتنا و عاب ديننا و سفه احلامنا و ضلّل آباءنا فأمّا ان تكفّه عنا و أمّا ان تخلي بيننا و بينه

২৫৩. সীরাতে ইবনে হিশাম, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৬৫- ২৬৬।

২৫৪. لبئس ما تسومونني أتعطوني ابنكم أغذوه لكم و أعطيكم إبني تقتلونه- তারিখে তাবারী, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬৭-৬৮ এবং সীরাতে ইবনে হিশাম, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৬৬- ২৬৭।

২৫৫. يعطوني كلمة يملكون بها العرب و يدين لهم بها غير العرب

২৫৬. تشهدون : أن لا إله إلّا الله

২৫৭. ندع ثلاث مأة و ستّين إلها و نعبد إلها واحدا

২৫৮. তারিখে তাবারী, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬৬- ৬৭; সীরাতে ইবনে হিশাম, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৯৫- ২৯৬।

২৫৯. فضربه بها فشجه شجة منكرة ثمّ قال أ تشتمه فأنا على دينه أقول ما يقول فردّ ذلك عليّ إن استطعت

২৬০. সীরাতে ইবনে হিশাম, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩১৩; তারিখে তাবারী, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭২।

২৬১. আল কামিল ফীত তারিখ, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৫৯।

২৬২. আল বিদায়াহ্ ওয়ান নেহায়া, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৬।

২৬৩. সীরাতে ইবনে হিশাম, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩১; তাবারী খলীফা আবু বকরের মাথা ফেটে যাবার পুরো ঘটনা তাঁর ইতিহাস গ্রন্থের ২য় খণ্ডের ৭২ পৃষ্ঠায় বর্ণনা করেছেন।

২৬৪. সীরাতে ইবনে হিশাম, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩১৭।

২৬৫. সীরাতে ইবনে হিশাম, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৯৮- ২৯৯।

২৬৬. আল কামিল ফীত তারীখ, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৭।

২৬৭. বিহারুল আনওয়ার, ১৮তম খণ্ড, পৃ. ২০৪।

২৬৮. সীরাতে ইবনে হিশাম, ১ম খণ্ড পৃ. ৩১৮।

২৬৯. তাবাকাতে ইবনে সা'দ, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৩৩; হযরত বিলালের ধৈর্য ও সাহসিকতার ব্যাপারে অধিক তথ্য পাওয়ার জ মাকতাবে ইসলাম, ৯ম বর্ষ, ৫ম থেকে ৭ম সংখ্যায় মহানবী (সা.)- এর মুয়াযযিন বিলাল হাবাশী প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

২৭০. সীরাতে ইবনে হিশাম, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩১৪।

২৭১. উসদুল গাবাহ্, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩০১; আল ইসাবাহ্, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৬৪; আল ইস্তিয়াব, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৬২।

২৭২. السّابقون السّابقون أُولئك المقرَّبون "যারা অগ্রগামী- অগ্রবর্তী এবং প্রথম ইসলাম ধর্ম গ্রহণকারী তারাই (মহান আল্লাহর) নিকটবর্তী।" - সূরা ওয়াকিয়াহ্ : ১০- ১১;

(و السّابقون الأوّلون من المهاجرين و الأنصار و الّذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم و رضوا عنه و أعدّلهم جنّات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذالك الفوز العظيم)

"আনসার ও মুহাজিরদের মধ্যে অগ্রবর্তী ও সর্বপ্রথম ইসলাম ধর্ম গ্রহণকারী এবং যারা তাদেরকে ইহসানের সাথে অনুসরণ করেছে তাদের প্রতি মহান আল্লাহ্ সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছে। আর তিনি তাদের জ এমন সব জান্নাত প্রস্তুত করে রেখেছেন যেগুলোর তলদেশ দিয়ে নহর ও ঝরনাসমূহ প্রবাহিত সেখানে তারা চিরস্থায়ীভাবে বসবাস করবে। আর এটিই হচ্ছে সবচেয়ে বড় সাফল্য।" - সূরা তওবা : ১০০।

২৭৩. লইয়াতুল আউলিয়া, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৫৮-১৫৯; ইবনে সা'দের তাবাকাত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২২৫; আল ইসতিয়াব, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৬৩; আল ইসাবাহ্, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৬৪; আদ দারাজাতুর রাফীয়াহ্, পৃ. ২২৮।

২৭৪. মক্কার মূর্তিপূজকগণ যারা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করত তাদেরকে 'সায়েবী' হয়ে গেছে বলে অভিযুক্ত করত।

২৭৫. ইবনে সা'দের তাবাকাত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২২৩।

২৭৬. তাবাকাতে ইবনে সা'দ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২২১-২২২; আদ-দারাজাতুর রাফীআহ্, পৃ. ২২৫-২২৬ এবং ২২৯-২৩০।

২৭৭. আল কামিল ফীত তারীখ, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৭-৫১; উসদুল গাবাহ্; আল ইসাবাহ্; আল ইসতিয়াব।

২৭৮. মুজিযার প্রকৃত স্বরূপ সম্পর্কে 'রিসালাতে আসমানীয়ে পায়াম্বারান' (মহান আম্বিয়া-ই-কেরামের আসমানী রিসালাত) নামক গ্রন্থ এবং পবিত্র কোরআনের অলৌকিকত্বের স্বরূপ সম্পর্কে 'রিসালাতের দলিল' নামক গ্রন্থ অধ্যয়ন করুন।

২৭৯. আলামুল ওয়ারা, পৃ. ২৭-২৮; বিহারুল আনওয়ার, ১৭তম খণ্ড, পৃ. ২১১-২২২।

২৮০. মাজমাউল বায়ান, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৮৭।

২৮১. আল্লামা শাহরিস্তানী তাঁর 'আল মুজিযাতুল খালিদাহ্' (চিরস্থায়ী মুজিযা) নামক গ্রন্থে (পৃ. ৬৬) উল্লেখ করেছেন।

২৮২. তাফসীরে তিবইয়ান, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৫১৯।

২৮৩. সূরা ইসরা : ৯০

২৮৪. সূরা যুখরুফ : ৩২।

২৮৫. সীরাতে ইবনে হিশাম, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৬১।

২৮৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৬।

২৮৭. বর্তমানকালের ইথিওপিয়া।

২৮৮. إنّ أرضي واسعة فإيّاي فاعبدون

২৮৯. সীরাতে ইবনে হিশাম, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩২১; তারিখে তাবারী, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭০।

২৯০. তারিখে তাবারী, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭০।

২৯১. তারিখে কামিল, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫২- ৫৩।

২৯২. সীরাতে ইবনে হিশাম, ১ম খণ্ড, পৃ. ২২২- ৩২৩ :

كـــــلّ أمــــرئ مــــن عبـــاد الله مضـــطهد   بــــــبطن مكـــــة مقهـــــور و مفتـــــون

انــــــا وجــــــدنا بــــــلاد الله واســــــعة   تنجـــــي مــــن الــــذل و المخــــزاة و الهــــون

فــــلا تقيمــــوا علــــى ذل الحيـــــاة وخـــــز   ي في الممـــــات و عيــــب غـــــير مــــأمون

২৯৩. পবিত্র কাবাঘরের পাশে একটি জায়গা 'দারুন নাদওয়া ' বলে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। কুরাইশরা সেখানে নিজেদের সমস্যা নিয়ে আলোচনা ও পরামর্শ করত।

২৯৪. আত তারিখ আল কামিল, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫৪- ৫৫; তারিখে তাবারী, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭৩।

২৯৫. هو عبد الله و رسوله و روحه و كلمته القاها إلى مريم البتول العذراء

২৯৬. সীরাতে ইবনে হিশাম, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৩৮; ইমতাউল আসমা, পৃ. ২১।

২৯৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭১।

২৯৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮২- ৩৯২; এতদপ্রসে সূরা কাসাসের ৫২- ৫৩ নং আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হয়েছিল।

২৯৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০০- ৩০১।

৩০০. গণক বা জ্যোতিষী ঐ ব্যক্তিকে বলা হতো ি ন যার বশীভূত ছিল এবং যার কে কথা বলত। এ ধরনের ব্যক্তিদের কথাগুলো ছিল প্রধানত ছন্দময়। আর তারা অদ্ভুত ও অভিনব শব্দগুলোই বেশি ব্যবহার করত।

৩০১. সীরাতে ইবনে হিশাম, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৭০।

৩০২. মাজমাউল বায়ান, ১০ম খণ্ড, পৃ. ৩৮৭।

৩০৩. ইউহান্নার ইঞ্জিল, অধ্যায় ১০, ছত্র- ২০ এবং অধ্যায় ৭, ছত্র ৪৮ ও ৫২।

৩০৪.   পূববর্তী আয়াতসমূহ যেভাবে এখানে অনূদিত হয়েছে তদনুসারে শব্দ ও আয়াতসমূহের সর্বনাম পদগুলোর ক্ষেত্রে যে সূক্ষ্মদৃষ্টি আরোপ করা হয়েছিল সেটারই ফলাফল। অতএব شديد القوى এর কাঙ্ক্ষিক্ষত অর্থ ওহীর ফেরেশতা (জিবরাইল) এবং فاستوى وهو بالأفق الأعلى অতঃপর তিনি নিজ আকৃতিতে প্রকাশ পেলেন, উর্ধ্ব দিগন্তে- এ আয়াতটির সকল সর্বনামপদ ওহীর ফেরেশতার দিকেই প্রত্যাবর্তন করে। ঠিক তেমনি أوحى (ওহী বা প্রত্যাদেশ করলেন) এ সর্বনাম পদ (তিনি) ফেরেশতার দিকে, عبده (তাঁর বান্দার প্রতি) এর সর্বনাম (তাঁর) মহান আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করে। এ সব আয়াতের মধ্য থেকে এ অংশটির ব্যাখ্যায় কতিপয় মুফা সির ভুল করেছেন এবং এমন ব্যাখ্যা করেছেন যা সত্য থেকে ব দূর। এ কারণেই কখনো কখনো তাঁরা এ ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন ও বি াস করে নিয়েছেন যে, মহানবী (সা.), মহান আল্লাহকে দেখেছেন। যদি أوحى এবং عبده এর সর্বনামের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করি তাহলে আয়াতের অর্থ অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে যাবে।

৩০৫.   সীরাতে ইবনে হিশাম, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩০০।

৩০৬.   প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬৩।

৩০৭.   মাজমাউল বায়ান, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৩৭; সূরা আবাসার তাফসীরে তাফসীরুল মীযানের ২০তম খণ্ডে আল্লামা তাবাতাবাঈ মনোজ্ঞ ও সাবলীল ভাষায় সূরাটির শানে নুযূল ব্যাখ্যা করেছেন এবং প্রমাণ করেছেন যে, عبس (ভ্রুকুটি করল)- এ ক্রিয়াপদের কর্তাপদ স্বয়ং মহানবী (সা.) নন; তবে وما يدريك (আর আপনি কি জানেন না যে...)- এ আয়াতটিতে মহানবী (সা.)- কেই সম্বোধন করা হয়েছে। আর এ দু'টি বিষয়ের মধ্যে কোন বৈপরীত্য নেই।

৩০৮.   সীরাতে ইবনে হিশাম, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৩৭।

৩০৯.   আ'শার সেই কাসীদাটি থেকে কয়েকটি পঙ্ক্তি এখানে উদ্ধৃত করা হলো :

نبيــــا يـــــرى مـــــالا يــــرون و ذكـــــره   اغـــــار لعمـــــرى في الـــــبلاد وانجـــــدا

فإيــــــــاك والميتــــــــات لا تقربنهــــــــا   ولا تأخـــــذن ســـــهماً حديـــــداً التفصـــــدا

وذا النصـــــب المنصـــــوب لا تنســـــكنه   ولا تعبـــــد الاوثـــــان والله فاعبـــــدا

ولا تقـــــربن حـــــرة كـــــان ســـــرها   عليـــــك حرامـــــاً فـــــانكحن او تابـــــدا

وذا الـــــرحم القـــــربى فـــــلا تقطعنـــــه   لعاقبـــــة ولا الأســـــير المقيـــــدا

وســـبع علـــى حـــين العشـــيات والضـــحى   ولا تحمـــــد الشـــــيطان والله فأحمـــــدا

৩১০. সীরাতে ইবনে হিশাম, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৮৬- ৩৮৮।

৩১১. গারানিক (غرانيق) শব্দটি গিরনাওক (غرنوق) অথবা গারনিক- এরই ব বচন যার অর্থ হচ্ছে এক ধরনের গাংচিল অথবা সুদর্শন যুবক।

৩১২. فاسجدوا لِلّه واعبدوا- যা হচ্ছে সূরাটির সর্বশেষ আয়াত।

৩১৩. তারিখে তাবারী, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭৫- ৭৬।

৩১৪. এ শূ স্থানে تلك الغرانيقُ العلى ও منها الشّفاعةُ ترتَجى- এ দু'বাক্যের অনুবাদ রাখা হলে নিশ্চিতভাবে দেখতে পাবেন যে, এর ফলে তা আদ্যোপান্ত স্ব- বিরোধিতায় পূর্ণ হয়ে যাবে। অনুবাদ : এগুলো (লাত, উয্যা ও মানাত) হচ্ছে উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন বলাকা (সুন্দর যুবা); এগুলো থেকে কেবল শাফায়াতই প্রত্যাশা করা যায়।

৩১৫. সূরা হ ৫২ নং আয়াত।

৩১৬. সূরা হ ৫৩ নং আয়াত।

৩১৭. সূরা হ ৫৪ নং আয়াত।

৩১৮. সীরাতে ইবনে হিশাম, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৫০; তারিখে তাবারী, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭৮। এই চুক্তিটি নবুওয়াতের সপ্তম বর্ষের প্রথম রাতে স্বাক্ষরিত হয়েছিল।

৩১৯. সীরাতে ইবনে হিশাম, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৭৪; তারিখে তাবারী, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭৯।

৩২০. তারিখে ইয়া ' কুবী, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৯; তারিখে কামিল, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬১; তাবাকাতে ইবনে সা'দ, ১ম খণ্ড, পৃ. ২০৮- ২১০।

৩২১. সীরাতে ইবনে হিশাম, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৭৪- ৩৮০।

৩২২. আল্লামা ফখরুদ্দীন রাযী তাঁর প্রসিদ্ধ তাফসীর গ্রন্থে লিখেছেন : এই গায়েবী তথ্য এতটা সত্য ও দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং আছে যে, এ মুহূর্তেও হযরত ফাতিমাতুয্ যাহরা (আ.)- এর বংশধরগণ পুরো বি ছড়িয়ে পড়েছেন, যদিও তাঁদের মধ্য থেকে বেশ কিছুসংখ্যক ব্যক্তি বিভিন্ন ঘটনায় নিহতও হয়েছেন। হযরত যাহরা

(আ.)- এর মাধ্যমে মহানবী (সা.)- এর বংশধারা পৃথিবীর সকল অঞ্চলে বিস্তৃতি লাভ করেছে।- দ্র. মাফাতি ল গাইব, ৩০তম খণ্ড, সূরা কাওসারের ব্যাখ্যা।

৩২৩. ২৪০ পৃষ্ঠা সম্বলিত এ বইটি বৈরুত থেকে প্রকাশিত হয়েছে। প্রখ্যাত লেবাননী কবি বোলিস সালামাহ্ এ পুস্তকটির ওপর একটি সমালোচনা লিখেছেন।

৩২৪. নজদী সৌদি বংশের নামে হিজায, নজদ ও তিহামাহ- এ তিনটি অঞ্চলের নামকরণ করা হয়েছে এবং বিস্তীর্ণ এ ভূ-ভাগ المملكة العربية السعودية 'Royal Kingdom of Saudi Arabia' নামে পরিচিত হয়েছে।

দেখুন একচেটিয়া প্রাধা ও আধিপত্য কতদূর সীমাতিক্রম করেছে।

৩২৫. মহান শ্রদ্ধেয় শিয়া আলেম ও মারজাদের কার্যকর উদ্যোগ ও পদক্ষেপ গ্রহণ করার ফলে এ যুবক অবশেষে সৌদি কারাগার থেকে মুক্তিলাভ করেছেন এবং কিছুদিন আগে তিনি যিয়ারত ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার জ পবিত্র কোম নগরীতে এসেছিলেন। একটি অনুষ্ঠান উপলক্ষে কিছু বন্ধু একত্র হলে সেখানে তাঁর সাথে লেখকেরও সাক্ষাৎ হয়েছিল। তিনি তখন তাঁর মূল্যবান গ্রন্থ সম্পর্কে বেশ কিছু কথা বলেছিলেন।

৩২৬. কখনো কখনো বলা হয় যে, একটি যিয়ারতনামায় (যা দূর থেকে পড়া মুস্তাহাব) আমরা মহানবীকে এভাবে সম্বোধন করি السّلام على عمّك عمرانِ أبي طالباً "আপনার চাচা ইমরান আবু তালিবের ওপর সালাম।

অথচ কেউ কেউ এ যিয়ারতনামা থেকে ধারণা করেছেন যে, তাঁর নাম আবু তালিব এবং তা তাঁর কুনিয়াত ছিল না।

৩২৭. আমীরুল মুমিনীন হযরত আলী (আ.) পিতা আবু তালিবকে বলেছিলেন :

أتـــــأْمرني بالصّـــــبر في نصْــــــرِ أحمـــــدَ و واللهِ مـــا قُلْـــتُ الّـــذي قلـــتُ جارعـــاً

ولكـــــن أحبَبـــــتُ أن تـــــرى نصـــــرَتي وتعلـــــمَ إن لم أزلْ لـــــك طائعـــــاً

" আহমাদকে সাহায্য করার ব্যাপারে আমাকে কি আপনি ধৈর্যাবলম্বন করার নির্দেশ দিচ্ছেন
খোদার শপথ! আমি যা বলেছি তা আসলে মনঃক্ষুণ্ন হওয়ার কারণে বলি নি
তবে আমি পছন্দ করেছি যে, আমাকে আপনি দেখবেন আমি তাঁকে সাহায্য করছি
আর আপনি জানবেন যে, আমি আজও আপনার প্রতি আনুগত্যশীল আছি। "

- মানাকিবে ইবনে শাহরআশুব, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৭, আল জ্জাহ্, পৃ. ৭০।

فـــــلا تحســـــبونا خـــــاذلين محمّـــــداً   لـــــذى غربـــــة منـــــا ولا متقـــــرب

نـــــه ســـــتمنحه منّـــــا يـــــد هاشميـــــة   و مركبهـــــا في النّـــــاس اخشـــــن مركـــــب

৩২৮. সীরাতে হালাবী, ১ম খণ্ড, পৃ. ১২৫।

৩২৯. হযরত আবু তালিবের দিওয়ান, পৃ. ৩৩- ৩৫; তারিখে ইবনে আসাকির, ১ম খণ্ড, পৃ. ৮৪; আর রওযুল আন্ফ, ১ম খণ্ড, পৃ. ১২০; কাসীদাটি নিম্নোক্ত এই পঙ্‌ক্তিটি দ্বারা শুরু হয়েছে :

إنَّ ابْـــــنَ آمنـــــةَ النّـــــبيّ محمّـــــداً   عنـــــدي يفـــــوقُ منـــــازلَ الأوْلادِ

" নিশ্চয় আমিনা তনয় নবী মুহাম্মদ আমার কাছে

আমার সন্তানদের স্থান ও মর্যাদারও উর্ধ্বে। "

৩৩০. তবে এ ক্ষেত্রে আকীদা- বি াস বলতে পবিত্র ইসলামী আকীদা- বি াসকেই বোঝানো হয়েছে, যে ক্ষেত্রে আত্মমুখিতা ও আত্মকেন্দ্রিকতা খোদামুখিতার মাঝে বিলীন হয়ে যায়। তাই এ ব্যাপারে বলা হয়েছে :

قِـــــفْ عنـــــد رأيـــــك   واجتهـــــدْ إنّ الحيـــــاةَ عقيـــــدةٌ وَجِهـــــادٌ

" নিজ অভিমত ও দৃষ্টিভ ির সামনে দাঁড়িয়ে যাও (বলিষ্ঠ চিত্তে দাঁড়াও)

চেষ্টা- সাধনা ও সংগ্রাম কর, কারণ জীবনই হচ্ছে বি াস ও সংগ্রাম। "

৩৩১. মাজমাউল বায়ান, ৭ম খণ্ড, পৃ. ৩৬; আর ইবনে হিশামও তাঁর সীরাত গ্রন্থের ১ম খণ্ডের ২৫২- ২৫৩ পৃষ্ঠায় এ কাসীদার ১৫টি পঙ্‌ক্তি উল্লেখ করেছেন।

৩৩২. و الله لو قتلتموه ما أبقيت منكم أحدا حتّى نتفانى نحن و أنتم - তাবাকাত- ই কুবরা, ১ম খণ্ড, পৃ. ২০২- ২০৩; তারায়েফ, পৃ. ৮৫; আল জ্জাহ্, পৃ. ৬১।

৩৩৩. ইবনে আবীল হাদীদ তাঁর শার নাহজুল বালাগায় (১৪ খণ্ড, পৃ. ৮৪) লিখেছেন : এক শিয়া আলেম হযরত আবু তালিব (রা.)- এর ঈমান সংক্রান্ত একটি পুস্তক রচনা করে তা আমার কাছে পাঠিয়েছিলেন যাতে করে আমি ঐ পুস্তক সংক্রান্ত একটি সমালোচনা লিখি। আমি পুস্তকটির সমালোচনা লেখার পরিবর্তে এ সাতটি কবিতা ঐ পুস্তকের ওপর লিখে দিয়েছিলাম।

৩৩৪. আবু তালিবের দীওয়ান (কাব্যসমগ্র) পৃ. ৩২ এবং সীরাতে ইবনে হিশাম, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৭৩।

৩৩৫. আবু তালিবের দীওয়ান, পৃ. ৩২ এবং সীরাতে ইবনে হিশাম, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৭৩।

৩৩৬. তারিখে ইবনে কাসীর, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪২।

৩৩৭. ইবনে আবীল হাদীদ, ১৪ খণ্ড, পৃ. ১৭৪; দীওয়ানই আবু তালিব, পৃ.১৭৩।

৩৩৮. সীরাতে হালাবী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৯০; তারিখুল খামীস, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৩৯।

৩৩৯. সাইয়্যেদ ইবনে তাউস প্রণীত আত- তারায়েফ, পৃ. ৮৫; ইবরাহীম ইবনে আলী দইনূরী প্রণীত 'গায়াতুস সুউল ফী মানাকিব- ই আলে রাসূল ' গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত।

৩৪০. ইবনে আবীল হাদীদ প্রণীত শারহে নাহজুল বালাগাহ্, ১৪ তম খণ্ড, পৃ. ৭৬।

৩৪১. ইবনে আবীল হাদীদ প্রণীত শারহে নাহজুল বালাগাহ্, ১৪ খণ্ড, পৃ. ৬৭।

৩৪২. উসূল- ই কাফী, পৃ. ২৪৪।

৩৪৩. মাজমাউল বায়ান, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩৯৫।

৩৪৪. সীরাতে ইবনে হিশাম, ২৭তম খণ্ড, পৃ. ২৭।

৩৪৫. এ বিষয়ে গবেষণার জ ওযু, নামায ও আযান সম্পর্কিত 'কাফী ' হাদীস গ্রন্থের আলোচনাটি (৩য় খণ্ড, পৃ. ৪৮২- ৪৮৯) দেখতে পারেন।

৩৪৬. বিশিষ্ট শিয়া ফকীহ শেখ তাবারসী তাঁর মাজমাউল বায়ানে (৩য় খণ্ড, পৃ. ৩৯৫) মিরাজ দৈহিক ছিল বলে শিয়া আলেমদের মধ্যে মতৈক্য রয়েছে বলেছেন।

৩৪৭. দায়েরাতুল মা'রেফ, (عرج ধাতু) ৭ম খণ্ড, পৃ. ৩২৯।

৩৪৮. রাসূল (সা.) বলেছেন, إنّي لست كأحدكم إنّي أظل عند ربّي فيطعمني و يسقيني "আমি তোমাদের কারো মতো নই; আমি আমার প্রতিপালকের নিকট সর্বক্ষণ অবস্থান করি এবং তিনি আমাকে খাদ্য ও পানীয় দান করেন।"- ওয়াসায়েলুশ্ শিয়া, ৮ম খণ্ড, 'কিতাবুস্ সাওম ' 'অবিচ্ছিন্ন রোযা নিষিদ্ধ ' অধ্যায়, পৃ. ৩৮৮।

৩৪৯. ইরানের ইসলামী বি বের অ তম অবদান হচ্ছে এই যে, তা উপনিবেশবাদী আমলের সৃষ্ট পথভ্রষ্ট ধর্মীয় ফির্কা ও উপদলসমূহের মূল কর্তন করেছে এবং সকল মাজহাবকে ইসলাম ধর্মের মৌলিক ও খাঁটি পথের অনুসরণ করার আহ্বান জানিয়েছে। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, এ সব নব আবির্ভূত উপদলসমূহ আসলে সাম্রাজ্যবাদ কর্তৃক সৃষ্ট অথবা তাদেরই ইচ্ছার ফল। আর ইসলামী বি বের পূর্বের সরকার এ ধরনের সাম্প্রদায়িক বিভেদের উদগাতা ছিল। মহান আল্লাহর কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি এ জ যে, (ঐ সব বিচ্যুত ও নব আবির্ভূত ফির্কাসমূহের) মূল কর্তিত হবার মাধ্যমে এগুলোর শাখা- প্রশাখাও কর্তিত হয়ে গেছে।

৩৫০. শেখ আহমদ ‘কাতিফিয়া’ গ্রন্থে- যা ৯২টি প্রবন্ধের সমন্বয়ে ‘জাওয়ামেয়ুল কালাম’ নামে ১২৭৩ হিজরীতে প্রকাশিত হয়েছে সেখানে বলেছেন, দেহ ঊর্ধ্বজগতে যাত্রার সময় প্রত্যেক স্তরের উপাদানকে সেখানেই ত্যাগ করে যায়। যেমন বায়ুকে বায়ুর স্তরে এবং অ কে অ র স্তরে ত্যাগ করে এবং প্রত্যাবর্তনের সময় পুনরায় ঐ স্তর থেকে তা গ্রহণ করে। সুতরাং মহানবী (সা.) মিরাজের সময় তাঁর দেহের চারটি উপাদানকে তার সমস্তরে পরিত্যাগ করেন এবং এ চারটি উপাদানশূ দেহ নিয়ে ঊর্ধ্বলোকে যাত্রা করেছেন এবং এ চার উপাদানহীন দেহ বারযাখী দেহ ছাড়া আর কিছুই নয়। এ দেহকে ‘হোরকুলিয়ায়ী’ বলে অভিহিত করা হয়। শেখ আহমদ ‘শারহে যিয়ারত’ গ্রন্থের ২৮-২৯ পৃষ্ঠায় স্পষ্ট বলেছেন যে, নয় নভোমণ্ডল অতিক্রম করা সম্ভব নয়। এ উক্তি করা সত্ত্বেও তাঁর বিচ্যুতি গোপন রাখার জ তাঁর কতিপয় অনুসারী জোর দাবি করেছেন যে, তাঁদের নেতা মহানবী (সা.)-এর মিরাজকে ‘দৈহিক’ বলে বি াস করেন এবং এ ক্ষেত্রে তিনি প্রসিদ্ধ অভিমতের সাথে ঐকমত্য পোষণ করেন।

৩৫১. আলোর গতি প্রতি সেকেন্ডে তিন লক্ষ কিলোমিটার।

৩৫২. ১৯৬১ সালের ১২ এপ্রিল বুধবার রুশ মহাকাশচারী ইউরি গ্যাগারিন কৃত্রিম উপগ্রহের মাধ্যমে প্রথম ব্যক্তি হিসাবে মহাশূ ভ্রমণ করেন। তিনি ভূমি থেকে ৩০২ কিলোমিটার দূর দিয়ে পৃথিবীর চারিদিকে দেড় ঘণ্টা পরিভ্রমণ করেন। ১৯৬৯ সালের জুলাই মাসে মার্কিন নভোখেয়াযান অ্যাপোলো-১১ তিনজন নভোচারী নিয়ে চাঁদে যাত্রা করে এবং দু’জন নভোচারী চন্দ্রপৃষ্ঠে অবতরণে সক্ষম হন। যদি মানুষ এরূপ কর্মে সক্ষম হয়ে থাকে তবে তাদের সৃষ্টিকর্তা কি সে কর্মে সক্ষম নন?

৩৫৩. শিয়াদের সপ্তম ইমামও মিরাজের উদ্দেশ্য সম্পর্কে অনুরূপ কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন,

إنّ الله لا يوصف بمكان و لا يجري عليه زمان و لكنّه عز و جل أراد أن يشرف به ملائكته سكان سماواته و يكرّمهم بمشاهدته و يريه من عجائب عظمته ما يخبر به بعد هبوطه

- তাফসীরে বুরহান, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪০০।

৩৫৪. ইবনে সা’দ তাঁর তাবাকাত গ্রন্থের ১ম খণ্ডের ১০৬ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন, হযরত আবু তালিবের মৃত্যুর এক মাস পাঁচ দিন পর খাদীজাহ্ (রা.) মৃত্যুবরণ করেন। ইবনে আসির তাঁর ‘কামিল’ গ্রন্থের ২য় খণ্ডের ৬৩ পৃষ্ঠায় হযরত খাদীজার মৃত্যু আবু তালিবের পূর্বে হয়েছিল বলেছেন।

৩৫৫. ما نالت منّي قريش شيئا اكرهه حتّى مات أبو طالب অর্থাৎ কুরাইশ আমার প্রতি অপছন্দনীয় কোন আচরণ করতে সক্ষম হয় নি আবু তালিবের মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত।

৩৫৬. এ দু’ব্যক্তি কুরাইশ ও উমাইয়্যা বংশোদ্ভূত। তায়েফেও তাদের সম্পদ ছিল।

৩৫৭. তাবাকাতে ইবনে সা'দ, ১ম খণ্ড, পৃ. ২১০-২১২; আল বিদায়াহ্ ওয়ান নিহায়াহ্, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৩৭।

৩৫৮. তাবাকাতে ইবনে সা'দ, ১ম খণ্ড, পৃ. ২১৬; সীরাতে ইবনে হিশাম, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪২২।

৩৫৯. الأمر إلى الله يضعه حيث يشاء - সীরাতে ইবনে হিশাম, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪২৬।

৩৬০. সীরাতে ইবনে হিশাম, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪২৫।

৩৬১. তারিখে তাবারী, ২য় খণ্ড, পৃ. ৮৬।

৩৬২. সীরাতে ইবনে হিশাম, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৩১।

৩৬৩. أبايعكم على أن تمنعوني ممّا تمنعون منه نسائكم و أبنائكم

৩৬৪. সীরাতে ইবনে হিশাম, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৩৮-৪৪৪; তাবাকাতে ইবনে সা'দ, ১ম খণ্ড, পৃ. ২২১-২২৩।

৩৬৫. সীরাতে ইবনে হিশাম, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৪৮-৪৫০।

৩৬৬. আ'লামুল ওয়ারা, পৃ. ৩৭; বিহারুল আনওয়ার, ১৯তম খণ্ড, পৃ. ১০-১১।

৩৬৭. তাবাকাতে ইবনে সা'দ, ৭ম খণ্ড, পৃ. ২১০।

৩৬৮. যেহেতু মহানবী (সা.)- এর নবুওয়াত প্রাপ্তির পর থেকে হিজরতের পূর্ব পর্যন্ত এ তের বছরের ঘটনাগুলো ঘটার তারিখ সুনির্দিষ্ট ছিল না তাই পূর্ববর্তী ২৪টি অধ্যায়ে প্রধানত সেগুলোর তারিখ উল্লেখ করা হয় নি। তবে ২৫তম অধ্যায় থেকে ৩১তম অধ্যায় (প্রথম খণ্ডের শেষ) পর্যন্ত হিজরতোত্তর ঘটনাবলী তারিখ (সন) সহ উল্লেখ করা হবে।

৩৬৯. তাবাকাতুল কুবরা, ১ম খণ্ড, পৃ. ২২৭-২২৮; সীরাতে ইবনে হিশাম, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৮০-৪৮২।

৩৭০. সূরা আনফাল, আয়াত ৩০।

৩৭১. তাবাকাতুল কুবরা, ১ম খণ্ড, পৃ. ২২৮; তারিখে তাবারী, ২য় খণ্ড, পৃ. ১০০।

৩৭২. সীরাতে হালাবী, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩২।

৩৭৩. আ'লামুল ওয়ারা, পৃ. ৩৯; বিহারুল আনওয়ার ১৯তম খণ্ড, পৃ. ৫০।

৩৭৪. তারিখে তাবারী, ২য় খণ্ড, পৃ. ১০০।

৩৭৫. তাবাকাতুল কুবরা, ১ম খণ্ড, পৃ. ২২৯। প্রায় সকল ঐতিহাসিক ও জীবনী লেখক এ ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন। আমরা আবরাহার হস্তীবাহিনী ধ্বংসের ঘটনাটি যেভাবে মুজিযা হিসাবে বর্ণনা করেছি এটিও তেমনি। এতে বিকৃতির কোন সুযোগ নেই।

৩৭৬. মুসনাদে আহমাদ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৮৭; কানযুল উম্মাল, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৪০৭; আল গাদীর, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৪-৪৫।

৩৭৭. শারহে নাহজুল বালাগাহ্- ইবনে আবিল হাদীদ, ১৩তম খণ্ড, পৃ. ২৬২।

৩৭৮. সামারাতা ইবনে জুনদুব বনি উমাইয়্যার শাসনকালের একজন চিহ্নিত অপরাধী। ওপরে তার হাদীস বিকৃতির নমুনাটি শুধু এ পর্যন্তই সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং সে বলে যে, (ইবনে আবিল হাদীদের বর্ণনা মতে) আলী সম্পর্কিত যে আয়াতটি কোরআনে অবতীর্ণ হয়েছে তা হলো :

(و من النّاس من يعجبك قوله في الحيوة الدّنيا و يشهد الله على ما في قلبه و هو ألدّ الخصام)

" মানুষের মধ্যে কেউ কেউ আছে যাদের কথা এ পৃথিবীতে তোমাকে প্রতারিত করে এবং সে তার অন্তরে যা আছে সে সম্পর্কে আল্লাহেক সাক্ষী হিসাবে উপস্থাপন করে, অথচ সে আল্লাহর কঠোরতম শত্রু। " (সূরা বাকারা : ২০৪)

সামারাতের অ তম জঘ কাজ হলো সে ইরাকে যিয়াদ ইবনে আবির প্রাদেশিক শাসনকর্তা থাকাকালীন বসরার দায়িত্বে ছিল। সে বসরায় নবীর আ বাইতের অনুরক্ত আট হাজার মুসলামানকে হত্যা করে। যিয়াদ ইবনে আবি তাকে প্রশ্ন করে, "তুমি যে এত লোককে হত্যা করলে, চিন্তা করলে না এর মধ্যে নিরপরাধ ব্যক্তিবর্গও থাকতে পারে?" সে জবাবে বলে, لو قتلت مثلهم ما خشيت "এর সমপরিমাণ আরো মানুষকে হত্যা করলেও আমি শ ি ত হতাম না। " যা হোক এ ব্যক্তির অপরাধের বর্ণনা দেয়া এ ক্ষুদ্র গ্রন্থে সম্ভব নয়। এই একগুঁয়ে দাম্ভিক ব্যক্তিটি হচ্ছে ঐ লোক যে প্রতিবেশীর অধিকার সংরক্ষণ করার ব্যাপারে মহানবী (সা.)- এর নির্দেশ প্রত্যাখ্যান করলে তিনি তাকে বলেছিলেন, إنّك رجل مضار و لا ضرر و لا ضرار في الإسلام "নিশ্চয়ই তুমি কষ্টদানকারী ও অনিষ্ট সাধনকারী। আর ইসলামে যেমন অনিষ্ট নেই ঠিক তেমনি পারস্পরিক অনিষ্ট সাধন ও কষ্টদানেরও অনুমতি নেই। " এ ব্যাপারে অধিক তথ্য ও অবগতির জ ইতিহাস ও রিজালশাস্ত্রের গ্রন্থাদি অধ্যয়ন করুন।

৩৭৯. ইতিপূর্বে আ সুন্নাতের অপর এক ব্যক্তি জাহেয তাঁর 'আল উসমানিয়া ' গ্রন্থে এ বিষয়ে কিছু প্রশ্ন উত্থাপন করেছিলেন। দ্র. শার নাহজুল বালাগাহ্- ইবনে আবিল হাদীদ, ১৩তম খণ্ড, পৃ. ২৬২।

৩৮০. নবী বলেছিলেন, "তোমার কোন ক্ষতিই হবে না। "

৩৮১. বিহারুল আনওয়ার গ্রন্থের ১৯তম খণ্ডের ৩৯ পৃষ্ঠায় ইমাম গাজ্জালীর 'এহ্‌ইয়াউল উলূমুদ্দীন ' গ্রন্থ সূত্রে এটি বর্ণিত হয়েছে।

৩৮২. সূরা তাওবা : ৪০।

৩৮৩. কামিল, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭৩।

৩৮৪. সীরাতে হালাবী, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৭।

৩৮৫. সীরাতে ইবনে হিশাম, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৯১; তারিখে কামিল, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭৫।

৩৮৬. তারিখে তাবারী, ২য় খণ্ড, পৃ. ১০৪।

৩৮৭. উপরিউক্ত তারিখ লেখকের গ্রন্থ্ প্রণয়নের বছরের সাথে সংশ্লিষ্ট।

৩৮৮. আখবারে ইসফাহান- আবু নাঈম, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫২- ৫৩।

৩৮৯. মাকাতিবুর রাসূল, পৃ. ২৮৯।

৩৯০. আল আমওয়াল, পৃ. ২৯৭, মিশরে মুদ্রিত।

৩৯১. আল মাশায়িখুস সুয়ূতী গ্রন্থ্ সূত্রে আত তারতিবুল ইদারিয়া, পৃ. ১৮১।

৩৯২. সহীফায়ে সাজ্জাদিয়াহ্, পৃ. ১৫; সাফিনাতুল বিহার, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬৪১।

৩৯৩. মাজমায়ুর রাওয়ায়িদ, ৯ম খণ্ড, পৃ. ১৯০।

৩৯৪. তারিখুল খামিস, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৬৭।

৩৯৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬৯।

৩৯৬. মাগাযিয়ে ওয়াকেদী, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫৩১।

৩৯৭. তারিখে তাবারী, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৮৮।

৩৯৮. প্রাগুক্ত।

৩৯৯. আল বিদায়াহ্ ওয়ান নিহায়া, ৭ম খণ্ড, পৃ. ৭৪- ৮৩; শারহে নাহজুল বালাগাহ্- ইবনে আবিল হাদীদ ১৪তম খণ্ড, পৃ. ৭৪।

৪০০. তারিখে ইয়াকুবী, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৪৫।

৪০১. আমি স্বয়ং আল আযহার বি বিদ্যালয়ের প্রাক্তন প্রধান শেখ মুহাম্মদ আবদুল হালিমের পত্রে এ বিষয়টি লক্ষ্য করেছি।

৪০২. তারিখে কামিল, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭৪।

৪০৩. রাসূলের জীবনী লেখকদের অনেকেই, যেমন ইবনে আসির তাঁর ‘কামিল’ গ্রন্থের ২য় খণ্ডের ৭৪ পৃষ্ঠায় এটি বর্ণনা করেছেন এবং আল্লামা মজলিসী তাঁর ‘বিহার’ গ্রন্থের ১৯তম খণ্ডের ৮৮ পৃষ্ঠায় ইমাম সাদিক (আ.) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

৪০৪. বিহার, ১৯তম খণ্ড, পৃ. ৭৫।

৪০৫. তারিখুল খামিস, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৩৩; তাবাকাতে ইবনে সা’দ, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৩০-২৩১; বিহারুল আনওয়ার, ১৯তম খণ্ড, পৃ. ৯৯-১০৩।

৪০৬. আমালী, পৃ. ৩০০।

৪০৭. তারিখে কামিল, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭৫।

৪০৮. সওর পর্বতের গুহা ত্যাগের তিন দিন পর।

৪০৯. আমতাউল আসমা, পৃ. ৪৮। সুতরাং নবীর গৃহ অবরোধের ঘটনাটি প্রথম হিজরী সালের ১ রবিউল আউয়ালের তিন রাত্রি পূর্বে ঘটেছিল। নবী (সা.) সোমবার রাত্রিতে গৃহ ত্যাগ করে সওর পর্বতের গুহায় আশ্রয় নেন এবং তিন দিন অবস্থানের পর বৃহস্পতিবার ১ রবিউল আউয়াল গুহা থেকে বেরিয়ে মদীনার পথ ধরেন। তিনি ১২ রবিউল আউয়াল কুবায় পৌঁছেন।

৪১০. উসদুল গাবাহ্, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৯৯।

৪১১. বিহারুল আনওয়ার, ১৯তম খণ্ড, পৃ. ১০৮; তবে তারিখে কামিলসহ অনেক ইতিহাস গ্রন্থে ঐ দু’ইয়াতীম বালক মায়ায ইবনে আযরার অভিভাবকত্বে ছিল বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

৪১২. বিহারুল আনওয়ার, ১৯তম খণ্ড, পৃ. ১০৮।

৪১৩. সীরাতে ইবনে হিশাম, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫০০-৫০১; বিহারুল আনওয়ার, ১৯তম খণ্ড, পৃ. ১২৬।

৪১৪. এখানে প্রথম হিজরী বর্ষ বলতে রবিউল আউয়াল মাসে মহানবীর হিজরতের পরবর্তী দশ মাস বোঝানো হয়েছে।

৪১৫. সহীহ বুখারী, ১ম খণ্ড, ‘কিতাবুল ইলম’ অধ্যায়। পরবর্তী সময়ে মাদ্রাসা মসজিদ হতে পৃথক হলেও মসজিদ সংল স্থানেই তা স্থাপিত হওয়া শুরু হয়। ধর্ম ও জ্ঞান যে পরস্পর অ া ভাবে জড়িত তারই যেন প্রতিচ্ছবি এখানে লক্ষণীয়।

৪১৬. সীরাতে ইবনে হিশাম, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৯৬; তারিখুল খামিস, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৪৫; সীরাতে হালাবী, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭৬। ইবনে ইসহাক তাঁর বর্ণনায় স্পষ্টভাবে উসমান ইবনে আফফানের নাম উল্লেখ করলেও ইবনে হিশাম তা উল্লেখ করেন নি। المواهب اللدنية গ্রন্থের লেখক বলেন, এ দ্বারা উসমান ইবনে মাযউনের কথাই বুঝানো হয়েছে।

৪১৭. সীরাতে হালাবী, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭৬-৭৭।

৪১৮. মুসতাদরাকে হাকিম, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩৮৫ এবং ইবনে মুজাহিম রচিত ‘ওয়াকেয়ে সিফিফন’ গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

৪১৯. মুসনাদে আহমদ ইবনে হাম্বল, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৯৯।

৪২০. আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২১৮।

৪২১. يدعوهم إلى الجنّة و يدعونه إلى النّار

৪২২. সূরা আনকাবুত : ৮।

৪২৩. সীরাতে ইবনে হিশাম, ২য় খণ্ড, পৃ. ১২৩- ১২৬।

৪২৪. ইউনাবীউল মুয়াদ্দাহ্, ১ম খণ্ড, পৃ. ২২৬।

৪২৫. আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ২য় খণ্ড, পৃ. ২২৬।

৪২৬. তাযকিরাতুল খাওয়াস, পৃ. ৪৬।

৪২৭. মদীনার তিনটি ইয়া দী গোত্র বনি কাইনুকা, বনি নাদির (নাজির) ও বনি কুরাইযাহ্, যাদের সে   মহানবী একটি স্বতন্ত্র চুক্তি করেছিলেন যা নিয়ে পরবর্তীতে আলোচনা করব।

৪২৮. সীরাতে ইবনে হিশাম, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫০১।

৪২৯. সীরাতে ইবনে হিশাম, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫০৩- ৫০৪ এবং আল আমওয়াল, পৃ. ১২৫ ও ২০২।

৪৩০. বিহারুল আনওয়ার, ১৯তম খণ্ড, পৃ. ১১০- ১১১। এ চুক্তিনামার পরিপ্রেক্ষিতে মহানবী (সা.) পরবর্তী সময়ে ইয়া দীদের চুক্তিভ র শাস্তি দিয়েছিলেন।

৪৩১. সূরা বাকারা : ৮৮।

৪৩২. তাঁর সে   মহানবীর সংলাপের বিস্তারিত বিবরণ সীরাতে ইবনে হিশামের ১ম খণ্ডের ৫৩৪- ৫৭২ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে। বিহারুল আনওয়ার, ১৯তম খণ্ড, পৃ. ১৩১।

৪৩৩. সীরাতে ইবনে হিশাম, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৫৫- ৫৫৬।

৪৩৪. সীরাতে ইবনে হিশাম, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫০০।

৪৩৫. সীরাতে ইবনে হিশাম, ২য় খণ্ড, পৃ. ২২২; বিহারুল আনওয়ার, ১৯তম খণ্ড, পৃ. ১৮৬- ১৯০; আমতাউল আসমা, পৃ. ৫১; তারিখে কামিল, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭৭- ৭৮; মাগাযী ওয়াকেদী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৯- ১৯।

৪৩৬. মহানবী (সা.) প্রথম হিজরী থেকেই কুরাইশদের বিভিন্ন বাণিজ্য পথে টহলদার সেনা প্রেরণ ও মোতায়েন করেন। এ কারণেই সেনাদল প্রেরণের কোন কোন ঘটনা, যেমন হযরত হামযার নেতৃত্বে এবং উবাইদাতা ইবনে হারেসের নেতৃত্বে সেনাদল প্রেরণের ঘটনাসমূহ প্রথম হিজরীর ঘটনাপ্রবাহে বর্ণনা দান সংগত মনে হলেও যেহেতু দ্বিতীয় হিজরীতেও এরূপ সেনাদল প্রেরণ অব্যাহত থাকে সেহেতু দ্বিতীয় হিজরীর ঘটনাপ্রবাহের সে   সংযুক্ত করে এটি বর্ণনা করা হলো। অবশ্য ইবনে হিশাম ইবনে ইসহাকের অনুকরণে এ ঘটনাসমূহ দ্বিতীয় হিজরীতে ঘটেছিল বলেছেন, যদিও ঐতিহাসিক ওয়াকেদী এর কোন কোনটি প্রথম হিজরীতে ঘটেছিল বলেছেন।

৪৩৭. মুরুযুয যাহাব, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৮৭- ২৮৮।

৪৩৮. বাওয়াত পর্বতটি মদীনা থেকে ৯০ কি.মি. দূরে রাদাভী নামক স্থানে অবস্থিত।

৪৩৯. তারিখুল খামিস, পৃ. ৩৬৩।

৪৪০. কামিল, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৭৮।

৪৪১. সীরাতে ইবনে হিশাম, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬০১; তাবাকাতে ইবনে সা'দ, ২য় খণ্ড, পৃ. ৯। কেউ কেউ এ ঘটনাকে গাজওয়ার অন্তর্ভুক্ত করে বদরের প্রথম গাজওয়া বলেছেন।

৪৪২. কথিত আছে, দ্বিতীয় বি যুদ্ধ পর্যন্ত সৈনিকের হাতে দিকনির্দেশনামূলক পত্র প্রদানের এ প্রথা প্রচলিত ছিল যা সামরিক প্রশিক্ষণ শেষে তাদের সার্টিফিকেটের সে দেয়া হতো।

৪৪৩. ما امرتكم بقتال في الشّهر الحرام

৪৪৪. সূরা বাকারা : ২১৭।

৪৪৫. তাবাকাতে ইবনে সা'দ, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৪১- ২৪২; আলামুল ওয়ারা লি আলামুল দা, পৃ. ৮১- ৮২। ইবনে হিশাম বলেছেন, মহানবী (সা.)- এর মদীনায় হিজরতের অষ্টাদশ মাসের প্রথমে এ ঘটনা ঘটেছিল। ইবনে আসির ১৫ শাবানে কিবলা পরিবর্তিত হয়েছিল বলে উল্লেখ করেছেন। সীরাতে ইবনে হিশাম, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬০৬; কামিল, ২য় খণ্ড, পৃ. ৮০।

৪৪৬. সূরা বাকারা : ১৪৪।

৪৪৭. সূরা বাকারা : ১৪৩।

৪৪৮. সূরা বাকারা : ১৪৩। ঈমান শব্দটি আমল বা কর্ম অর্থে যে সকল স্থানে ব্যব ত হয়েছে এ আয়াতটি তার একটি।

৪৪৯. তোহফাতুল আজেল্লাহ্ ফি মারেফাতিল কিবলা, পৃ. ৭১।

৪৫০. সাদুক, মান লা ইয়াহদারু ল ফকীহ্, ১ম খণ্ড, পৃ. ৮৮; ওয়াসায়েলুশ্ শিয়া, ররে আমালী, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২১৮।

৫৫১. বিহারুল আনওয়ার, ১৯তম খণ্ড, পৃ. ২১৭।

৫৫২. মাগাজী ওয়াকেদী, ১ম খণ্ড, পৃ. ২০।

৫৫৩. যাফরান মরুপ্রান্তর বদর নামক স্থানের নিকটে অবস্থিত। ইবনে হিশাম তাঁর সীরাত গ্রন্থে মদীনা থেকে যাফরান পর্যন্ত যে সকল স্থানে মহানবী বিশ্রাম নিয়েছেন তার উল্লেখ করেছেন। যাফরান থেকে বদর পৌঁছার মধ্যবর্তী সময়ে কুরাইশদের আগমনের সংবাদ প্রাপ্তির ঘটনাও বর্ণনা করেছেন। বদর সিরিয়ার পথে মক্কা ও

মদীনার মধ্যবর্তী একটি স্থান যাতে প্রতি বছর বাজার বসত এবং আরবরা ক্রয়- বিক্রয় ও কবিতা পাঠের আসরের উদ্দেশ্যে সেখানে সমবেত হতো।- সীরাতে ইবনে হিশাম, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬১৩- ৬১৬।

৫৫৪. সূরা হ : ৩৯।

৫৫৫. তারিখে কামিল, ২য় খণ্ড, পৃ. ৮১।

৫৫৬. তারিখে তাবারী, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৩৮; তারিখে কামিল, ২য় খণ্ড, পৃ. ৮২।

৫৫৭. সীরাতে ইবনে হিশাম, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৪৮- ২৪৯।

৫৫৮. إنّما قريش وخيلائها ما آمنت منذكفرت و ما ذلّت منذعزت و لم تخرج على اهبة للحرب- মাগাজী- ওয়াকেদী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৮।

৫৫৯. اذهب أنت و ربّك فقاتلا، انّا معكما مقاتلون

৫৬০. সীরাতে ইবনে হিশাম, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬১৫।

৫৬১. আল ইমতা, পৃ. ৭৪।

৫৬২. তারিখে তাবারী, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৪০।

৫৬৩. মাগাজী- ওয়াকেদী, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৪৮; সীরাতে হালাবী, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৬০, বিহারুল আনওয়ার, ১৯তম খণ্ড, পৃ. ২১৭।

৫৬৪. তারিখে তাবারী, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৪০।

৫৬৫. সীরাতে ইবনে হিশাম, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬১৭।

৫৬৬. সূরা আনফাল : ৭।

৫৬৭. সীরাতে ইবনে হিশাম, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬২০; তারিখে তাবারী, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৪৪।

৫৬৮. তারিখে তাবারী, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৪৫; সীরাতে ইবনে হিশাম, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬২০।

৫৬৯. তাবাকাত, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৫।

৫৭০. سيهزم الجمع و تولّون الدّبر - সূরা কামার, ৪৫।

৫৭১. নাহজুল বালাগাহ্, বাণী নং ২১৪।

৫৭২. সীরাতে ইবনে হিশাম, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬২২।

৫৭৩. মাগাজী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬২; বিহারুল আনওয়ার, ১৯তম খণ্ড, পৃ. ২৩৪।

৫৭৪. সীরাতে ইবনে হিশাম, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬২৩; বিহারুল আনওয়ার, ১৯তম খণ্ড, পৃ. ২২৪।

৫৭৫. তারিখে তাবারী, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৪৯।

৫৭৬. তারিখে তাবারী, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৪৮; সীরাতে ইবনে হিশাম, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬২৫।

৫৭৭. নাহ্‌জুল বালাগাহ্‌, পত্র নং ৬৪।

৫৭৮. সীরাতে ইবনে হিশাম, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬২৬।

৫৭৯. اللهم ان تهلك هذه العصابة اليوم لا تعبد- তারিখে তাবারী, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৪৯।

৫৮০. সীরাতে ইবনে হিশাম, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬২৮।

৫৮১. সীরাতে ইবনে হিশাম, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬৩২।

৫৮২. তাবাকাতে ইবনে সা'দ, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৩।

৫৮৩. সীরাতে ইবনে হিশাম, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭০৬- ৭০৮; মাগাজী- ওয়াকেদী, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৩৮- ১৭৩।

৫৮৪. সহীহ বুখারী ৫ম খণ্ড, পৃ. ৯৭, ৯৮ ও ১১০, বদর যুদ্ধের ঘটনার অধ্যায়; সহীহ মুসলিম, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৭৭, কিতাবুল জান্নাত অধ্যায়; সুনানে নাসায়ী, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৮৯ ও ৯০; মুসনাদে আহমাদ ইবনে হাম্বাল, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৩১; সীরাতে ইবনে হিশাম, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬৩৯; মাগাজী- ওয়াকেদী, ১ম খণ্ড, বদরের যুদ্ধ অধ্যায়; বিহারুল আনওয়ার, ১৯তম খণ্ড, পৃ. ৩৪৬।

৫৮৫. সূরা আনফাল : ৪১।

৫৮৬. কোন কোন ঐতিহাসিক তাঁকে রাসূলের ক া না বলে হযরত খাদীজার পূর্ববর্তী স্বামীর সন্তান বলে উল্লেখ করেছেন। তাঁদের মতে রাসূলের ঔরসে হযরত খাদীজার গর্ভে এক পুত্রসন্তান (যিনি মারা যান) এবং এক ক া সন্তানই (হযরত ফাতিমা) শুধু জন্মগ্রহণ করেছেন।

৫৮৭. এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জ লেখকের ফার্সী ভাষায় লিখিত 'মুনাফিকুন দার কোরআন ওয়া তারিখ ' গ্রন্থ দ্রষ্টব্য। বিষয়টি নিয়ে তিনি 'মানশুরে জভিদ ' গ্রন্থেও আলোচনা করেছেন।

৫৮৮. ফেহেরেসতে নাজ্জাশী, পৃ. ৫।

৫৮৯. সীরাতে ইবনে হিশাম, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬৪৮।

৫৯০. সীরাতে ইবনে হিশাম, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬৫১- ৬৫৮।

৫৯১. نحن معاشر الأنبياء لا نورّث

৫৯২. বদর যুদ্ধের পরই হযরত ফাতিমা যাহরা (আ.)- এর বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়েছিল।- বিহারুল আনওয়ার, ৪৩ খণ্ড, পৃ. ৭৯ ও ১১১।

৫৯৩. মান লা ইয়াহদারু ল ফকীহ্‌, পৃ. ৪১০।

৫৯৪. অত্র গ্রন্থ লেখার সময় ও পরিস্থিতির সাথে এ অংশটি সংশ্লিষ্ট। অতঃপর মহান আল্লাহর প্রশংসা ও তাঁর কাছে কৃতজ্ঞতা এজ যে, আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি ইরানের ইসলামী বি ব সমাজের এ ধরনের অনেক অস্বাভাবিক অবস্থার অবসান ঘটিয়েছে।

৫৯৫. সূরা আলে ইমরান : ৬১।

৫৯৬. নাজরানের ি ষ্টানদের সাথে মুবাহালার ঘটনায় মহানবী (সা.) কেবল আলী, ফাতিমা, হাসান ও সাইন (আ.)- কে নিজের সাথে মদীনার বাইরে নিয়ে গিয়েছিলেন। এ ঘটনার পূর্ণ বিবরণ দশম হিজরীর ঘটনাবলীতে উল্লেখ করা হবে।

৫৯৭. বিহারুল আনওয়ার, ৪৩তম খণ্ড, পৃ. ৯৩।

৫৯৮. প্রাগুক্ত।

৫৯৯. বিহারুল আনওয়ার, ৪৩তম খণ্ড, পৃ. ৯৪; কাশফুল গাম্মাহ্, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৫৯।

৬০০. ওয়াসাইলুশ শিয়া, ১৫তম খণ্ড, পৃ. ৮।

৬০১. বিহারুল আনওয়ার, ৪৩তম খণ্ড, পৃ. ৯৬।

৬০২. প্রাগুক্ত।

৬০৩. মুসনাদে আহমাদ, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৫৯।

৬০৪. আল ওয়াকিদীর মাগাযী, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৮৬।

৬০৫. আল ওয়াকিদী প্রণীত মাগাযী, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৭৭- ১৭৯ এবং তাবাকাতই কুবরা, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৯- ৩৮।

৬০৬. আল ওয়াকিদীর মাগাযী, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৮২; তাবাকাত ই কুবরা, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩০।

৬০৭. আটা ও খেজুর দ্বারা তৈরি এক ধরনের খাদ্য।

৬০৮. আল ওয়াকিদী প্রণীত মাগাযী, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৮১।

৬০৯. মানাকিব, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৬৪; আল ওয়াকিদীর আল মাগাযী, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৯৪- ১৯৬।

৬১০. আল ইমতা, পৃ. ১১২।

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায় : আরব উপদ্বীপ : ইসলামী সভ্যতার সূতিকাগার 9

পবিত্র মক্কার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস 12

মদীনা আল মুনাওয়ারাহ্. 13

দ্বিতীয় অধ্যায় : প্রাক ইসলামী যুগে আরব জাতি 17

হযরত মুহাম্মদ (সা.)- এর যুগে আরব উপদ্বীপ 20

ইসলামপূর্ব আরব জাতি কি সভ্য ছিল? 22

আরবের ধর্মীয় অবস্থা 29

মৃত্যুর পরবর্তী জীবন সম্পর্কে আরবদের চিন্তা 34

সাহিত্য একটি জাতির মন -মানসিকতা প্রকাশকারী দর্পণ. 36

জাহেলী আরব সমাজে নারীর মর্যাদা. 38

আরব জাতির মাঝে নারীর সামাজিক অবস্থান 41

আরবদের সাহস ও বীরত্ব. 44

জাহেলিয়াত যুগের আরবদের সাধারণ চরিত্র 47

জাহেলিয়াত যুগের আরবগণ কুসংস্কার পূজারী ছিল 48

জাহেলিয়াত যুগের আরবদের বি াসে কুসংস্কার 52

কুসংস্কারের বিরুদ্ধে ইসলামের সংগ্রাম 55

ইসলামের আবির্ভাবের সময়ে আরবের সামাজিক অবস্থা 59

হীরা ও গাসসান রাজ্যসমূহ 62

হিজাযে প্রচলিত ধর্ম 65

তৃতীয় অধ্যায় : দুই পরাশক্তি ইরান ও রোমের অবস্থা 67

ইরান : তদানীন্তন সভ্যতার লালনভূমি. 71

খসরু পারভেজের অপরাধসমূহের পর্দা উন্মোচন. 81

সাসানী সম্রাটদের ব্যাপারে ইতিহাসের ফয়সালা 83

ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে সাসানীয় ইরানের দুরবস্থা. 86

ইরান ও রোম সাম্রাজের মধ্যকার যুদ্ধসমূহ 90

চতুর্থ অধ্যায় : মহানবী (সা.) - এর পূর্বপুরুষগণ. 93

হযরত ইবরাহীম খলীল (আ.) 94

মূর্তিপূজার বিরুদ্ধে হযরত ইবরাহীম (আ.)- এর সংগ্রাম. 99

সংলাপ ও আলোচনায় মহান নবীদের পদ্ধতি. 106

হযরত ইবরাহীম (আ.)- এর হিজরত 119

যমযম কূপ আবিষ্কার 121

কুসাই বিন কিলাব 125

আবদে মান্নাফ 127

হাশিম 128

উমাইয়্যাহ্ ইবনে আবদে শামস- এর ঈর্ষা 131

হাশিম- এর বিবাহ 133

আবদুল মুত্তালিব 135

যমযম কূপ খনন 137

চুক্তি স্বাক্ষরের উদ্দেশ্যে আত্মত্যাগ ও নিষ্ঠা 140

হাতির বছরের গোলযোগ 143

আবরাহার শিবিরে আবদুল মুত্তালিব- এর গমন. 148

মুজিযা সংক্রান্ত আলোচনা 152

কুরাইশদের কল্পরাজ্য. 161

মহানবীর পিতা আবদুল্লাহ্. 164

ফাতিমা খাসআমীয়ার কাহিনী. 167

পঞ্চম অধ্যায় : বি নবী মুহাম্মদ মুস্তাফা (সা.) - এর শুভ জন্ম 173

মহানবী (সা.)- এর নামকরণ 183

মহানবীর স্ত পানের সময়কাল. 188

ষষ্ঠ অধ্যায় : মহানবী (সা.) - এর শৈশবকাল 191

সপ্তম অধ্যায় : মাতৃক্রোড়ে প্রত্যাবর্তন 198

ইয়াসরিবে সফর 201

আবদুল মুত্তালিবের মৃত্যু 203

আবু তালিবের অভিভাবকত্ব. 204

শামদেশ (সিরিয়া) সফর 205

অষ্টম অধ্যায় : মহানবী (সা.) - এর যৌবনকাল 214

মহানবীর আধ্যাত্মিক শক্তি 216

ফিজারের যুদ্ধসমূহ 217

হিলফুল ফুযূল (প্রতিজ্ঞা- সংঘ) 221

নবম অধ্যায় : মেষ পালন থেকে বাণিজ্য 224
ইসলামের মহীয়সী নারী হযরত খাদীজাহ্. 231
হযরত খাদীজার বিবাহের প্রস্তাব 237
হযরত খাদীজার বয়স 239
দশম অধ্যায়: বিবাহ থেকে নবুওয়াত প্রাপ্তি পর্যন্ত 240
মহানবীর যৌবনকাল. 242
খাদীজার গর্ভজাত সন্তানগণ. 244
মহানবীর পালক পুত্র. 246
মহানবী হযরত আলীকে নিজ গৃহে নিয়ে আসেন 252
নবুওয়াতের পূর্বে তাঁর ধর্ম. 253
একাদশ অধ্যায় : সত্যের প্রথম প্রকাশ. 256
সমাজ সংস্কারের ক্ষেত্রে নবীদের ভূমিকা 260
হিরা পর্বতে মহানবী (সা.). 264
ওহী অবতরণের শুভ সূচনা 266
একজন বস্তুবাদী ব্যক্তির বি দৃষ্টি. 268
জ্ঞান অর্জনের উৎসত্রয় 273
ওহীর শ্রেণীবিভাগ. 276
দ্বাদশ অধ্যায়: প্রথম ওহী 283
কোন্ দিন প্রথম ওহী অবতীর্ণ হয়েছিল 284
ত্রয়োদশ অধ্যায় : সর্বপ্রথম যে পুরুষ ও মহিলা মহানবীর প্রতি ঈমান এনেছিলেন 290

মহিলাদের মধ্যে হযরত খাদীজাহ্ 292

ঈমানের ক্ষেত্রে সবচেয়ে অগ্রগামী ছিলেন আলী 294

আমিই সিদ্দীকে আকবর. 298

ইসহাকের সাথে খলীফা মামুনের কথোপকথন 300

ওহী অবতীর্ণ বন্ধ থাকা প্রস 302

চতুর্দশ অধ্যায় : গোপনে দাওয়াত 311

নিকটাত্মীয়দেরকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণের আহবান 312

নিকটাত্মীয়দের ইসলাম ধর্ম গ্রহণের আহবান পদ্ধতি. 318

নবুওয়াত ও ইমামত পরস্পর নিত্যস ী. 323

পঞ্চদশ অধ্যায় : প্রকাশ্যে দাওয়াত 324

লক্ষ্য অর্জনের পথে দৃঢ়তা. 327

মহানবী (সা.)- এর ধৈর্য ও দৃঢ়তা 329

মহানবী (সা.)- কে কুরাইশদের প্রলোভন 334

কুরাইশ বংশের উৎপীড়নের একটি নমুনা. 337

মহানবী (সা.)- এর পিছনে আবু জাহলের ওঁৎ পেতে থাকা 343

মুসলমানদের ওপর উৎপীড়ন ও নির্যাতন. 345

ইসলামের প্রথম আহবানকারী 350

গিফার গোত্রের ইসলাম ধর্ম গ্রহণ 353

হযরত মুহাম্মদ (সা.)- এর শত্রুগণ. 354

দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমরের ইসলাম গ্রহণ 356

ষোড়শ অধ্যায় : কোরআন সম্পর্কে কুরাইশদের অভিমত 360

ওয়ালীদের রায়. 362

কুরাইশদের অদ্ভুত অজুহাত. 366

কুরাইশ নেতৃবর্গের বিরুদ্ধাচরণের কারণ 374

মুশরিকদের কতিপয় আপত্তি 378

পবিত্র কোরআনের পর্যায়ক্রমিক অবতীর্ণ হওয়া 379

ধাপে ধাপে অবতীর্ণ হওয়ার অন্তর্নিহিত মূল রহস্য 382

কোরআন ধাপে ধাপে অবতীর্ণ হওয়ার অ া কারণ. 385

সপ্তদশ অধ্যায় : হিজরত. 388

প্রথম হিজরত. 389

হাবাশার রাজদরবারে কুরাইশ প্রতিনিধি. 394

হাবাশা থেকে প্রত্যাবর্তন 400

মক্কা নগরীতে ি ষ্টানদের অনুসন্ধানী দল 402

কুরাইশদের প্রেরিত প্রতিনিধিদল. 403

অষ্টাদশ অধ্যায় : মরিচাপড়া অস্ত্রশস্ত্র 405

ভিত্তিহীন অপবাদ. 408

মহানবীকে পাগল বলে আখ্যায়িত করা 412

পবিত্র কোরআনের বিরোধিতা করার চিন্তা. 417

কুরাইশগণ কর্তৃক পবিত্র কোরআন শ্রবণ বর্জন 421

আইন ভ কারী আইন প্রণেতাগণ 423

জনগণের ইসলাম ধর্ম গ্রহণে বাধা দান 425

ঊনবিংশ অধ্যায় : ‘গারানিক’- এর উপাখ্যান 429

গারানিকের উপাখ্যান কি? 431

ভাষাগত দিক থেকে কাল্পনিক এ উপাখ্যানটি রদ করার দলিল 438

বিংশতিতম অধ্যায় : অর্থনৈতিক অবরোধ ও সামাজিক বয়কট 445

কুরাইশদের ঘোষণা 448

উপত্যকায় বনি হাশিমের নাজুক অবস্থা 451

একুশতম অধ্যায় : হযরত আবু তালিব (রা.)- এর মৃত্যু 456

আবু তালিবের   দ্যতা ও আবেগের উদাহরণ 461

সফরের কর্মসূচীতে পরিবর্তন 464

বি াসের সংরক্ষণ ও সুরক্ষা 465

আবু তালিবকে উদ্বুদ্ধ করার প্রকৃত কারণ 468

আবু তালিব (রা.)- এর ত্যাগের কতিপয় নমুনা 470

আলোচনার রাজনৈতিক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য 474

আবু তালিবের ঈমানের প্রমাণ 475

আবু তালিবের সাহিত্যকর্ম 476

আবু তালিবের ঈমান প্রমাণ করার দ্বিতীয় পদ্ধতি 479

মৃত্যুর সময় আবু তালিবের অসিয়ত 481

শিয়া আলেমদের অভিমত 484

বাইশতম অধ্যায় : মিরাজ 485

কোরআন, হাদীস ও ইতিহাসের দৃষ্টিতে মিরাজ. 486
মিরাজের কোরআনী ভিত্তি. 488
মিরাজ সম্পর্কিত হাদীসসমূহ 490
মিরাজ কখন সংঘটিত হয়েছিল. 491
মহানবী (সা.)- এর মিরাজ কি দৈহিক ছিল? 493
আত্মিক মিরাজ কী? 494
মিরাজ ও বর্তমানের বৈজ্ঞানিক তত্ত্বসমূহ 497
অস্তিত্বজগতের বিভিন্ন পর্যায়ে পরিভ্রমণের উদ্দেশ্য. 501
তেইশতম অধ্যায় : তায়েফ যাত্রা 502
আরবদের প্রসিদ্ধ বাজারসমূহে বক্তব্য দান 509
হ র মৌসুমে বিভিন্ন গোত্রপতিদের প্রতি দাওয়াত 510
চব্বিশতম অধ্যায় : আকাবার চুক্তি 511
বুয়া’সের যুদ্ধ 514
খাজরাজদের ইসলাম গ্রহণ 515
আকাবার প্রথম শপথ 516
আকাবার দ্বিতীয় শপথ. 518
আকাবা চুক্তির পর মুসলমানদের অবস্থা. 521
আকাবা চুক্তি ও কুরাইশদের প্রতিক্রিয়া 523
ইসলামের নৈতিক প্রভাব 526
কুরাইশদের মধ্যে ভীতির সঞ্চার 529

পঁচিশতম অধ্যায় : হিজরতের প্রথম বছরের ঘটনাপ্রবাহ 531
গায়েবী সাহায্য 535
নবুওয়াতের গৃহে শত্রুদের আক্রমণ 539
সওর পর্বতের গুহায় মহানবী 540
মহানবীর সন্ধানে কুরাইশ গোত্র 541
সত্যের পথে জীবন বাজি রাখা 542
ইবনে তাইমিয়ার বক্তব্য. 545
নবী (সা.)- এর হিজরত পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহ 550
গুহা হতে বহির্গমন 552
হিজরী সালের প্রথম পৃষ্ঠা উন্মোচিত হলো. 553
কেন হিজরী বর্ষকে কেন্দ্র করে ইসলামী ইতিহাস আবর্তিত হয়েছে. 554
মহানবীর হিজরতকে কেন্দ্র করে মুসলিম বি র নিজস্ব তারিখের সূচনা. 555
হিজরী বর্ষের প্রবর্তনকারী কে?. 557
হিজরী তারিখ সম্বলিত মহানবীর কয়েকটি পত্র 558
হিজরতের সফরনামা. 564
কুবা গ্রামে রাসূল (সা.)- এর প্রবেশ 566
মদীনায় আনন্দের ঢল 568
নবীর প্রতি মদীনার আনসারদের ভালোবাসার কিছু ক্ষুদ্র নমুনা. 569
নিফাকের উৎপত্তি 572
ছাব্বিশতম অধ্যায় : হিজরতের প্রথম বর্ষের ঘটনাপ্রবাহ 573

মহানবীর প্রথম ইতিবাচক পদক্ষেপসমূহ 574

হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসিরের ঘটনা 576

ভ্রাতৃত্ব বন্ধন : ঈমানের সর্বোত্তম বিচ্ছুরণ 582

হযরত আলীর দু'টি শ্রেষ্ঠত্ব 584

ইয়াসরিবের ইয়া দীদের সে   মুসলমানদের প্রতিরক্ষা চুক্তি 586

ইতিহাসের সর্ববৃহৎ সনদ)চুক্তিনামা(. . . . 588

ইসলামী   কুমতকে উৎখাতের ষড়যন্ত্র. 595

সাতাশতম অধ্যায় :   দ্বিতীয় হিজরীর ঘটনাপ্রবাহ. 598

যুদ্ধ ও সামরিক মহড়া 599

কুরাইশের বাণিজ্য পথ   মকির সম্মুখীন. 600

সামরিক অভিযান ও মহড়ার উদ্দেশ্য 606

মধ্যপ্রাচ্যবিদগণের দৃষ্টিতে এ অভিযানসমূহ. 608

আটাশতম অধ্যায় :   কিবলা পরিবর্তন 612

মহানবীর বৈজ্ঞানিক মুজেযা. 615

উনত্রিশতম অধ্যায় :   বদরের যুদ্ধ 616

যাফরান নামক স্থানের দিকে মহানবীর যাত্রা 618

কুরাইশ যে সমস্যার মুখোমুখি হলো. 621

সামরিক পরামর্শ সভা 623

পরামর্শ সভার সিদ্ধান্ত ও আনসার দলপতির মত. 626

শত্রুর সার্বিক অবস্থা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ 628

আবু সুফিয়ানের পলায়ন. 631
কুরাইশদের মতদ্বৈততা 633
নেতৃত্ব মঞ্চ 635
কুরাইশ গোত্রের কার্যক্রম 638
কুরাইশদের পরামর্শ সভা 639
যে ঘটনা যুদ্ধকে অবশ্যম্ভাবী করে তুলল 642
মল্লযুদ্ধের শুরু 643
সম্মিলিত আক্রমণ শুরু হলো 645
উমাইয়্যা ইবনে খালাফকে হত্যা 647
জানমালের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ 648
যে কবিতাটিতে স্থায়িত্বের রং লেগেছে 650
বদর যুদ্ধের পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহ 652
মদীনায় মহানবী (সা.)- এর সুসংবাদ প্রেরণ 655
মক্কাবাসীদের নিকট তাদের নেতাদের নিহত হওয়ার সংবাদ 656
ক্রন্দন ও শোকগাথা পাঠ নিষিদ্ধ হলো. 658
বন্দীদের ব্যাপারে সর্বশেষ সিদ্ধান্ত 659
ত্রিশতম অধ্যায় : ইসলামের সর্বশ্রেষ্ঠ নারীর বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া. 662
বর্তমান যুগে বিবাহের ক্ষেত্রে উদ্ভূত সমস্যাসমূহ 663
এ সব সমস্যার বিরুদ্ধে মহানবী (সা.)- এর সংগ্রাম 664
হযরত ফাতিমার বিবাহের উপহার সামগ্রীর বিবরণ 667

বিবাহ অনুষ্ঠান 669

একত্রিশতম অধ্যায় : বনী কাইনুকা গোত্রের ইয়া দীদের অপরাধসমূহ 672

একটি স্ফুলি থেকে যুদ্ধের আগুন প্র লিত হওয়া. 675

মদনীয় বেশ কিছু নতুন খবর আসতে থাকা. 678

গাযওয়াতু যিল আমর 680

কুরাইশদের বাণিজ্য কাফেলার গতিপথ পরিবর্তন 682

তথ্যসূচী ও টিকা 683